	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	প্রারম্ভে		১
২।	আর ডেকার্ট	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম-এ, বি-এল	[illegible]
৩।	অনন্তরামের ক্রিয়াযোগসার	অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় এম-এ	৮
৪।	বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় কুমার	ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ এম-এ, পি-এইচ-ডি	১২
৫।	সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজবিষয়ক অনুসন্ধান	ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	১৯
৬।	শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দের চিঠি		২১
৭।	সঙ্ঘবার্ত্তা		২৮
৮।	Life of Mahammad	Swami Abhedananda	1

শাস্ত্রের গৌরব আলোকই ধর্ম্মের যথার্থ প্রকাশক

সমস্ত ধর্ম্মের গৌরব-দীপ্ত প্রধান শ্রেণীর ধর্ম্ম-পুস্তকসকল বিক্রয়ের জন্য আমরা রাখিয়া থাকি।

১।	সাংখ্য দর্শন	১।০	১৯।	পদ্ম পুরাণ	১॥
২।	গীতার ভূমিকা	১।০	২০।	শিব পুরাণ	১॥
৩।	বেদ প্রবেশিকা	[illegible]	২১।	বিষ্ণু পুরাণ	১॥০
৪।	সরল সাংখ্যযোগ	।৶০	২২।	কল্কি পুরাণ	১।০
৫।	পাতঞ্জল যোগ দর্শন	[illegible]	২৩।	নারদ পুরাণ	১।০
৬।	যোগ সোপান	।৶০	২৪	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	২॥
৭।	কর্ম্ম তত্ত্ব	১৲	২৫।	বামন পুরাণ	২৲
৮।	বেদান্ত দর্শন ১ম পর্ব্ব	৩৲	২৬।	অগ্নি পুরাণ	২৲
৯।	গুরু শাস্ত্র	।৶০	২৭।	মার্কণ্ড পুরাণ	১॥০
১০।	পাতঞ্জল দর্শন	১।০	২৮।	দক্ষ পুরাণ	২৲
১১।	সাংখ্য সূত্রম্	১৲	২৯।	[illegible] মহাগ্রন্থ	॥০
১২।	পরলোক রহস্য	।৶০	৩০।	সটীক দশকর্ম্ম পদ্ধতি	১৲
১৩।	বেদান্ত সার	।৶০	৩১।	শ্রীরামকৃষ্ণ দেব	২৲
১৪।	মহাভারত	২॥০	৩২।	বিবেকানন্দ চরিত	৩৲
১৫।	রামায়ণ	১৲	৩৩।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম-৫ম)	৭॥০
১৬।	শ্রীমদ্ভাগবত	১২৲	৩৪।	স্বামী অভেদানন্দ (জীবনী)	১৲
১৭।	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	১।০—৩৲	৩৫।	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (")	৪৲
১৮।	চৈতন্য চরিতামৃত	২॥০	৩৬।	আত্মজ্ঞান (স্বামী অভেদানন্দ)	৸০

ইহা ছাড়া আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলার উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক.

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা, —ফোন বি, বি, ৩৮৭৫

INDIA AND HER PEOPLE

Swami Abhedanads

(New impression)

"This book has more than usual interest as coming from one who knows the Occident and both knows and loves the Orient…It is decidedly interesting…The book has two admirable qualities: breadth in scope and suggestiveness in material."

—*Bulletin of the American Geographical Society*

Demy 8vo. Excellent get-up. Cloth Rs. 3-

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৩নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ২১২৫ ও ৬৪৮৩

কলিকাতা শাখা :	বঙ্গদেশে শাখা :	বঙ্গের বাহিরে :
শ্যামবাজার	নৈহাটি, ভাটপাড়া,	গোদৃলিয়া,
সাউথ্ ক্যালকাটা	সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর	বেনারস।

সুদের হার :—

কারেণ্ট একাউণ্ট	…	১॥
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট	…	৩
স্থায়ী আমানত	…	৪ হইতে ৬

অংশীদারগণকে শতকরা ৫॥০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের জন্য :—

১। "বিশ্ববাণীর" ফাল্গুনে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

২। বিশ্ববাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ ; ছয় মাসের জন্য ১।০, প্রতি সংখ্যা।০, চার আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠান হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক মূল্য ২৸০, ষাণ্মাষিক ১।৵০, প্রতি সংখ্যা।১০।

৩। গ্রাহকগণের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন, বেশী দিনের জন্য হইলে বাঙ্গালা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। কোন কিছু জানিতে হইলে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা টিকিটসহ পত্র দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। টাকাকড়ি চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধাদি **বিশ্ববাণী**, কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—**স্বামী শঙ্করানন্দ** ১নং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ববাণী

৩য় বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৪১ { ১ম সংখ্যা

প্রারম্ভে

অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণায় নিখিল বিশ্বের ব্যথা ও গ্লানিকে সমবেদনার নিঙ্কালো বরণ করার সাধনা যাঁদের সফলতার শুভ্রালোকে ভাস্বর, আজ বিশ্ববাণীর তৃতীয় বর্ষের পুণ্যাহে, সকল দেশের, সকল যুগের সেই মহামানবদের পুণ্যস্মৃতি আমরা শ্রদ্ধার তীর্থবারিতে অভিষিক্ত করি। আজ আমাদের বন্দনা করুক স্পর্শ তাঁদের অন্তর, যাঁদের মহামিলনের আহ্বানে মুখরিত মিলন ও মৈত্রীর পথ।

ক্ষুদ্রতার সীমারেখার পারে বৃহৎ পরিব্যাপ্তির মাঝে আপনাকে সম্যকভাবে জানাই ভারতের উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ। আবার সাগরের তীর হতে অজানা সাগরের পারে তীর্থযাত্রার বহুল বিচিত্র অবদানই পরিয়েছে তার ললাটে দীপ্তোজ্জ্বল জয়টীকা, দিয়েছে তাকে আকুল প্রেরণা শাশ্বতের সন্ধানে পথচারী হবার, জাগিয়েছে তার অন্তরের অন্তরে অনন্ত প্রেমপ্রীতির আদি নির্ঝর। তাই সে কাতর, অকারণ করুণায় নিখিল বিশ্বের বেদনায়।

এই বেদনায় সে হয়ে আছে চির উদ্দীপ্ত। কত সাম্রাজ্যের উত্থান হল, কত সাম্রাজ্য গেল বিস্মৃতির অতলে, ভারতের বাণী যুগে যুগে কালে কালে নটরাজের লীলার তালে তালে চলেছে বেজে। কবে কোন ছায়াময় অতীতে রবিকরোজ্জ্বল এক প্রভাতে বা ধূসর সন্ধ্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা উচ্চারিত 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' আজও তার দীক্ষামন্ত্র। অসীম ঐক্যের এই ব্যাকুলতা, যা মনকে আকুল করে, নিয়ে যায় সকল চিন্তার পারে,—দেশে দেশে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে আজ অবধি। এ বাণীর বাহন ছিলেন যাঁরা, ক্ষুদ্রকে মহানে, বদ্ধকে বিমুক্তে, স্বার্থক পরার্থে পরিণত করার প্রয়াসে ব্রতী ছিল তাঁদের সমুজ্জ্বল।

আজ হতে শতবর্ষ পরে সমসাময়িক ঐতিহাসিকের লেখনীমুখে যখন সে দিন হবে

পিঁব ভারতীয় সন্ন্যাসীদের পাশ্চাত্য অভিযান, তখন হয়ত সে দিনের মানব নির্দ্ধারণ করবে তাঁদের যোগ্য আসন। আজ যেমন আমরা রচনা করি সেই সব বৌদ্ধ শ্রমণদের আসন, যাঁরা বহন করেছিলেন শ্রীবুদ্ধের বাণী অপরান্তে, যবনবিষয়ে, সুবর্ণভূমিতে তাম্রপর্ণীতে। আজ আমরা উৎসুক তথ্য সংগ্রহে যবন ধর্ম্মরক্ষিত স্থবিরের, মহারক্ষিত স্থবিরের, মধ্যম স্থবিরের, শোন ও উত্তর স্থবিরের, মহেন্দ্র স্থবিরের। এমনই একদিন আসবে ভবিষ্যৎ যুগ—যেদিন ব্যাকুল আগ্রহে জানতে চাইবে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থল কোথায়, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ কেমন ক'রে নীত করেছিলেন প্রাচীর অধ্যাত্ম সম্পদ কোন দেশে, কোন সময়ে।

যাঁর অলৌকিক প্রজ্ঞা, অমিত তেজ, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি, গভীর দেশপ্রেম, উদার আন্তর্জাতীয়তা, তাঁর সমস্ত প্রচার প্রচেষ্টাকে দিয়েছে এক কল্যাণময় রূপ, যাঁর সমগ্র রচনার মাঝে পাওয়া যায় অসীম সংযম, বিরাট সংস্কৃতি, অতলস্পর্শী অন্তর্দৃষ্টি—আজ হারিয়েছে ভারত, শ্রীরামকৃষ্ণের উদাত্ত বাণীর আবাহনে প্রবুদ্ধ-আত্ম-প্রত্যয় ভারত, তার প্রীতি, তার শান্তি, তার সংস্কৃতি তার ধর্ম, তার কর্ম; তার দর্শন, তার অপার অনুভূতির সেই মহান প্রতিনিধিকে সেই বরেণ্য আচার্য্য অভেদানন্দকে। যাঁর আশীসের আলোকে হয়েছিল আলোকময় বিশ্ববাণীর পুনর্যাত্রা। যাঁর "মনিবে দেবত্বের' আশার বাণী, 'আত্মজ্ঞানের' সুনিবিড় রহস্য, 'অনুভূতি পথের' বিচিত্র বারতা, পুনর্জ্জন্মবাদের বৈজ্ঞানিক কাহিনী চিন্তারাজ্যের অভিনব সম্পদ, এ সম্পদের অধিকারী তাঁর দেশবাসী সকলেই। কোন সম্প্রদায় বিশেষে তা আবদ্ধ নয়। বিশ্ববাণীর প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমুজ্জ্বল এই অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন বাণী দ্বারে দ্বারে বহন করা। বিশ্ববাণীর চরম লক্ষ্যের পরম সার্থকতা এইখানেই। আজ দেশবাসীকে আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন :—

"সমার্দ্দঃ সব্রতা ভূত্বা বাচ' বদতু ভদ্রয়া।"

আর ডেকার্ট

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল

সূচনা

আর ডেকার্ট আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের জন্মদাতা, অনেকের মতে তিনি আধুনিক ইয়োরোপীয় অঙ্কশাস্ত্রেরও জন্মদান করেন, এবং মনীষী নিউটনের প্রাথমিক জীবনে তাঁহার রচিত জ্যামিতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন পদার্থ বিজ্ঞানেও তাঁহার দান নিতান্ত সামান্য নহে।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে তিনি টুরেইনের অন্তর্গত লাহায়ে নামক স্থানে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আঞ্জুর জেস্যুইটদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে তিনি প্যারিসে অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে কার্য করেন। এই সময় তিনি বোহেমিয়ার রাজার বিরুদ্ধে প্রাগের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি ভ্রমণে নিরত থাকেন, ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্বব্রতী প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ লরেটো গমন করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লা রোশের অবরোধে যোগদান করেন, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০ বৎসর তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদের বিস্তৃতি সাধন ও স্বীয় পুস্তকাবলী রচনা লইয়া নেদারল্যাণ্ডে বাস করেন। শেষ বয়সে তিনি সোয়েডেনের রাণীর আহ্বানে ষ্টকহলম্ যাত্রা করেন। সেখানে তিনি রাণীকে শিক্ষাদান করিতেন এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু উক্ত স্থানের জলবায়ু তাঁহার শরীরে ঠিক সহ্য হইল না, ফলে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী সর্বতোমুখী প্রতিভার আধার মহামতি ডেকার্ট পরলোক গমন করেন।

অঙ্কশাস্ত্রে কৃতিত্ব

অঙ্কশাস্ত্রে ডেকার্টের প্রধান কৃতিত্ব বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতির প্রতিষ্ঠায়, ইহা নির্দিষ্ট রেখা হইতে প্রত্যেক বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করিয়া তাহাদের গাণিতিক বিকাশে স্থানীয় সম্পর্ক হ্রাস করে। এতদ্ভিন্ন তিনি বীজগণিতের সমীকরণ দ্বারা জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন।

পদার্থ বিদ্যায় অবদান

পদার্থবিদ্যায় ডেকার্টের অবদান—রামধনুর বর্ণচ্ছটার ব্যাখ্যা, আলোক বিকিরণ ও বাতাসের ওজন নির্ণয়- বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তাঁহার ধারণা যে জড় পদার্থ চাপের দ্বারা পরিচালিত হয়—পরন্তু অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রভাবে নহে—নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারে ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিগণিত হয়। অথচ তাঁহার আলোক ও গ্রহগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদে অনেক সত্যের আভাস পাওয়া যায়, যাহা নিউটান এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা করিয়াছেন।

দার্শনিক মতবাদ

ডেকার্টের দার্শনিক মতবাদ আলোচনার পূর্বে, তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন; সেই কাল সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। ডেকার্টের আবির্ভাবের পূর্বে দর্শন

মধ্যযুগের ধর্মগুরুগণের মতবাদ ও অ্যারেষ্টটলের 'মতবাদের' উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত। ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে কোনরূপ ধারণা পোষণ করা বা স্বাধীনভাবে চিন্তার আশ্রয়-গ্রহণ করতঃ কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাহস কাহারো হইত না; প্রকৃতপক্ষে ডেকার্টের মতবাদ ধর্মগুরুভয় ও অ্যারেষ্টটলের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দর্শনকে সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

ডেকার্টের পূর্বেও দুই একজন মনীষী অনুরূপ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে লর্ড বেকনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি প্রথম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনকে পৃথক করিবার চেষ্টা করেন। তিনি বলিলেন—"ধর্মসম্বন্ধীয় মতবিরোধ বিশেষ অনিষ্টকর, ধর্মকে কেহ স্পর্শ করিবে না; সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও যেন ইহার সহিত মিশ্রিত না থাকে; বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের মিশ্রণই অবিশ্বাসজনক। সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হইবে, যাহাতে মানসিক মুকুরে বস্তুনিচয়ের প্রকৃতস্বরূপ বিম্বিত হয়, অভিজ্ঞতা হইতেই তাহার উৎপত্তি, নানা জ্ঞানরাজ্য জয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারাই পরিচালিত হইবে, তথা হইতে আরোহণ প্রণালীর সমবায়ে বিস্তৃত উচ্চতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।" এইরূপে কেবল অভিজ্ঞতাবাদের বীজ বপন করেন। পরবর্তীকালে অনেক মনীষী অভিজ্ঞতাবাদের বিস্তৃতি সাধন করেন, তাঁহাদের মতবাদ পরে আলোচিত হইবে।

অন্য একদল দার্শনিক মনে করেন যে, দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহকে অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা চলে না, মানুষের মন চিন্তাপ্রভাবে অভিজ্ঞতার অতীত তীরে বিচরণ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মানবাত্মার অমরত্ব সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ, অথচ তাহা অভিজ্ঞতার অভ্যন্তর প্রদেশে কোনদিনই মিলেনা। মহামতি ডেকার্ট এই মতেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তবে তিনি স্বীয় দার্শনিক মতবাদের প্রাথমিক অবস্থায় সংশয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংশয়বাদ প্রধানতঃ বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাসের ছায়া প্রসারিত করে। সংশয়বাদী মনে করেন, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহার স্থিতি, তাহার সম্পর্কে সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করাই সমীচীন, ডেকার্টও প্রথমে এই মতবাদের প্রয়োগ করেন।

ডেকার্ট অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিধায় দর্শনেও অঙ্কশাস্ত্রের বিধি প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে তিনি দেখিলেন, বিভিন্ন জাতির ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা ও আচার ব্যবহারের তুলনা করিলে অঙ্কশাস্ত্রের নিশ্চয়তা কোথাও মেলে না, অথচ তাঁহার বিশ্বাস হইল, দর্শনে অঙ্কশাস্ত্রের মত নিশ্চয়তা লাভ করিতে না পারিলে প্রকৃত সত্য বলিয়া কিছুকেই গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং তিনি পূর্ববর্তী সমস্ত সিদ্ধান্তকেই সন্দেহ করিতে থাকেন এবং স্বীয় অবিমিশ্র চিন্তার সাহায্যে সত্যতত্ত্ব নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—এমন একটা কিছু চাই যে, বিশ্বসংসারকে সন্দেহ করিলেও যাহাকে সন্দেহ করা চলে না, তাহা কি? তিনি ভাবিলেন—

তাহা সন্দেহ নিজে ? সমগ্র জগতের অস্তিত্ব সন্দেহ করা চলে, কিন্তু সন্দেহকে সন্দেহ করা চলে না ; কিন্তু সন্দেহ করে কে ?—মানুষের চিন্তা. চিন্তা করে কে ?—আমি। সুতরাং যেহেতু আমি চিন্তা করি, সেই হেতু আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না—আমার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই ডেকার্টের প্রধান উক্তি—Cogito, ergo sum ? এই ভাবে তিনি সংশয়বাদের মধ্যে নিঃসংশয়বাদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি নিম্নরূপ :—"আমার মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা বর্তমান, কিন্তু এই ধারণার কর্তা আমি নিজে নহি, যেহেতু ইহাতে যে পরিমাণ সাধ্যের প্রয়োজন, আমার মধ্যে তাহা নাই ; সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর নিজেই ইহার কর্তা, তিনিও নিজেই এই ধারণা আমার মনের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। শিল্পী যেমন স্বীয় বস্তুর উপর স্বকীয় চিহ্ন অঙ্কিত করে, তিনিও ধারণা দ্বারা আমার মনে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

"কিন্তু, ঈশ্বরের ধারণাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপটা নিত্য সত্তা। তাঁহার গুণ সম্বন্ধে বলা চলে যে, তিনি সত্যস্বরূপ, সুতরাং তিনি আমাকে প্রতারিত করিতে পারেন না ; ফলে আমি নিজেও যাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করি, তাহাও নিশ্চয় সত্য। মিথ্যার উৎপত্তি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারেই ঘটে। কারণ আমরা স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে পারি না, তাহার সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। আমাদের অকাল-বিচার দ্বারাই মিথ্যার আবরণ বিস্তৃতি লাভ করে।"

শরীর ও মন—এই দুইটি তাঁহার মতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। একটির সহিত অপরটির কোন সম্বন্ধ নাই, শরীরের গুণ বিস্তৃতি ; মনের গুণ চিন্তা। বস্তুতঃ চিন্তার সঙ্গে বিস্তৃতির কোনরূপ আদান প্রদান থাকা সম্ভব নহে ! চিন্তা ও বিস্তৃতি উভয়েই সত্য। তিনি বলেন "আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি—আমার আত্মা চিন্তাশীল, পক্ষান্তরে উহাকে বিস্তৃত বলিয়া বুঝিবার কোন প্রয়োজন হয় না, চিন্তার সঙ্গে "বিস্তৃতি" গুণ সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই ; পক্ষান্তরে প্রত্যেক বস্তুই দেশে বা স্থানের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে অঙ্কশাস্ত্রের সহায়তায় উহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয়ত অনুভূতি দ্বারাও বহির্জগতের বস্তুনিচয়ের জ্ঞান লাভ হয় এবং অনুভূতি বহির্জগতের বস্তুনিচয়ের উপর নির্ভর করে। আকার, গতি প্রভৃতি বিস্তৃতির বিভিন্ন রূপ, এবং তাহারা বহির্জগতের বস্তুনিচয় মধ্যে গুণরূপে বিদ্যমান, কিন্তু বর্ণ, স্পর্শ, উত্তাপ প্রভৃতি চিন্তা প্রায় আত্মাতেই বিদ্যমান, বহির্জগতে উহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আত্মা ও শরীর তাহাতে সংশ্লিষ্ট তিনি অন্যের উপর ক্রিয়াশীল। শারীরিক ক্রিয়া বিস্ময়ের জনক এবং চিন্তা শারীরিক শক্তি উৎপন্ন করে।" ইহা কিরূপ সম্ভব ? এই সম্বন্ধে ডেকার্ট

বলিতেছেন—"মস্তিষ্কেই Pineal gland নামক পদার্থের ভিতরে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ; এইখানে ঈশ্বরের মধ্যস্থতায় শারীরিক ক্রিয়া বিস্তার হয় চিন্তা সাধারণ গতিতে রূপান্তর লাভ করে।

অবশ্য ডেকার্টের এই মতবাদ ঠিক সমর্থন করা চলে না ; কারণ উহাতে ঈশ্বরের প্রভাব অতি সামান্য আকার ধারণ করে। ডেকার্টের প্রধান দোষ—তিনি আত্মা ও শরীরকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই হেতু ঈশ্বরের সহায়তা গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রতীত হইয়াছে !

ডেকার্টের শিষ্য গেলেন্‌কস্ (Geulinx) সাময়িকবাদের প্রবর্তন করিয়া বলেন যে, ঈশ্বরের আবির্ভাব সব সময় হয় না। যখন কোন চিন্তাকে শারীরিক ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত করা দরকার অথবা শারীরিক ক্রিয়াকে বিস্তারে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন, তখন ঈশ্বর তাহা সংসাধিত করেন।

অন্যতম শিষ্য 'মালব্রাঙ্ক' ঈশ্বরবাদের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বলেন যে, আমরা যাহা কিছু দেখি সবই ঈশ্বরের মধ্যে সংসাধিত হয় ; সুতরাং Pineal gland এ ঈশ্বরের আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপে বলা যায় ; ডেকার্টের দ্বৈতবাদ মালব্রাঙ্কের হাতে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রগতি লাভ করিল।

ডেকার্টের মতবাদের অন্য একটি দোষ এই যে, তিনি সুস্পষ্ট জ্ঞানকে সত্যের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তিনি সন্দেহবাদকে আমল দেন নাই। যে নির্মল বাসন্তী আকাশকে আমরা খালি চোখে দেখিয়া যে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করি, তাহা যে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া ভ্রান্ত ধারণায় পর্য্যবসিত করিতে পারে সেইরূপে চিন্তার ধারাও অনুরূপভাবে সীমাবদ্ধ।

তারপর তিনি ঈশ্বরের সত্যস্বরূপের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহাও দোষাবহ ; যেমন যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ এমন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, যে জ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল তবে এই যুক্তির অন্তহীন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

দার্শনিক প্রণালী

ডেকার্ট দার্শনিক গবেষণায় কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে তাহার একটা প্রণালী নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি বলেন—(১) "কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন জ্ঞানলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না। (২) প্রত্যেক কঠিন সমস্যাকে যথাসময়ে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে। (৩) চিন্তাধারাকে ক্রমশঃ সরল হইতে জটিলের দিকে পরিচালিত করিবে এবং যেখানে বিষয়টির আলোচনায়

স্বাভাবিক শৃঙ্খলা নাই, সেখানেও নির্দিষ্টরূপ ও শৃঙ্খলা বিরাজমান বলিয়া অনুমান করিবে। (৪) আলোচনা এবং গণনায় পূর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, যাহাতে কোন বিষয়ে কোনরূপে ত্রুটি না থাকে।

তাঁহার মতে উপরিলিখিত চারিটি প্রণালী অ্যারিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাই প্রণালী চতুষ্টয়ের সহায়তায় সুস্পষ্ট দার্শনিক জ্ঞান অধিগত করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে।

ডেকার্টের পুস্তকাবলী

ডেকার্টের রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দার্শনিক আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছে।

(১) Discours de la Methode.

(২) Meditationes de Prima Philosophia.

(৩) Principia Philosophiæ.

(৪) Passiones Animæ.

ডেকার্টের নৈতিক আলোচনা

ডেকার্ট নৈতিক বিষয়ে আলোচনা খুব কম করিয়াছেন। তথাপি যাহা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

মানবের প্রাথমিক মনোবৃত্তি ছয়টি—বিস্ময়, প্রেম, ঘৃণা, বাসনা, হর্ষ ও বিষাদ। মনোজগতের অন্যান্য যে সমস্ত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই এই প্রাথমিক বৃত্তি হইতে উদ্ভূত। মনোবৃত্তির মধ্যে পূর্ণতম—ঈশ্বরের প্রতি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি (Intellectual love to God)। এই বিষয়টি ডেকার্টের অন্যতম ভক্ত স্পিনোজার দার্শনিক মতবাদে একটি নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সময়ান্তরে তাহা আলোচিত হইবে। এই পর্যন্ত তিনি অ্যারিষ্টটলের সহিত একমত।

ডেকার্টের মতে পূর্ণতাই সুখ। যখনই আমরা সুখ অনুভব করি, তখনই কোনরূপে অপূর্ণতাজনিত অভাবের হ্রাস হয়। জ্ঞানের দ্বারা মনোবৃত্তির দমনই পুণ্য। তাঁহার মতে জ্ঞানলব্ধ আনন্দ জাগতিক বস্তু হইতে লব্ধ আনন্দ অপেক্ষা উচ্চতর এবং কাম্য।

অনন্তরাম দত্তের "ক্রিয়াযোগসার"

অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়, এম-এ,

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় অনন্তরাম রচিত "ক্রিয়াযোগসারের" দুই-খানি অসম্পূর্ণ পুঁথির সন্ধান দিয়াছেন। (প্রাচীন পুঁথির বিবরণ; ১ম খণ্ড—১ম ও ২য় সংখ্যা) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনও অনুরূপ দুইখানি পুঁথির কথা জানাইয়াছেন, একটি রামেশ্বর নন্দীর অপরটি অনন্তরামের (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩১৬ ও ৪২৮ পৃষ্ঠা)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথিশালায়ও দুইটি "ক্রিয়াযোগ সার" পুঁথি আছে, একটি রামসুন্দরের, অপরটি প্রাণনারায়ণের। সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রাম হইতে অনন্তরাম রচিত আর একটি উক্ত পুঁথির সন্ধান লাভ করিয়াছি। এই পুঁথিসমূহ ব্যাসকৃত সংস্কৃত পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। পদ্মপুরাণ ছয়খণ্ডে বিভক্ত, যথা—সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড, উত্তরখণ্ড ও ক্রিয়াযোগ সার। পদ্মপুরাণ একটি উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ।

আমাদের পুঁথিখানি চট্টগ্রাম কলেজ রোডস্থিত শ্রীযুক্ত চিদানন্দ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট সংরক্ষিত আছে। পুঁথির পত্রসংখ্যা—১২৫, ১৬শ অধ্যায়ে ইহার আখ্যানভাগ বিভক্ত, পুঁথি নকল সমাপ্তির তারিখ—"১২০০ মঘি, ৬ আশ্বিন, রোজ শুক্রবার।" ১২০০ মঘি—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তারিখে মঘিসনের উল্লেখে মনে হয়, পুঁথিখানি চট্টগ্রামেই লিখিত হইয়াছে, কেননা এই মঘি সন অন্য কোথাও প্রচলিত নাই। কিন্তু পুঁথিখানাতে চট্টগ্রামের কথাভাষার রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের নিদর্শন কোথাও পাওয়া গেল না। ক্রিয়ার ব্যবহারে ও প্রাদেশিকত্বের কোন সন্ধান মিলে না। অর্বাচীন রচনা হইলেও আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ ইহাতে বিশেষ লক্ষিত হইল না।

কবির পরিচয় জ্ঞাপক দীর্ঘ শ্লোক হইতে আমরা তাঁহার বংশপরিচয় এইভাবে উদ্ধার করিতে পারি। তীর্থরাজের (?) সন্নিহিত উত্তর সাখাপুর কবির নিবাস। এই সাখাপুরকে আমরা সাহাপুরের বিকৃত উচ্চারণ এবং উভয়কে বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়াই মনে করি। "তির্থরাজ" নদী, পর্বত কি স্থানের নাম তাহা বুঝা যাইতেছে না, কোথাও ইহা ছিল কিনা জানা যায় না। ইহার সন্নিহিত সাহাপুরকে দীনেশবাবু ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী মেঘনানদীর পশ্চিম পারে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কবির পিতামহের নাম এই পুঁথিতে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। দীনেশবাবু ও সাহিত্য বিশারদ মহাশয় কবির পিতামহের নাম যথাক্রমে কবি দুর্লভ ও বৈবস্বত বলিয়াছেন। ইহার তিনপুত্রের নাম আমরা 'রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ' পাইয়াছি বলিয়া কবি অনন্তরাম

রঘুনাথের পুত্র, তাঁহার মাতামহের নাম রামদাস এবং অগ্রজের নাম রামকৃষ্ণ রায়। দুই সহোদরের বিভিন্ন উপাধি—একটু আশ্চর্যের বিষয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামে এখনও একই পরিবারে পিতার 'ভট্টাচার্য' পুত্রের 'মুখোপাধ্যায়' বা পিতার 'দাশগুপ্ত' পুত্রের 'চৌধুরী' প্রভৃতি পদবী দেখা যায়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে 'রায়' সমৃদ্ধি ও মর্যাদা-সূচক অথবা রাজদত্ত খেতাব বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না। পুঁথির মূল রচনার বা কবির আবির্ভাবের কোন সন তারিখ পুঁথিটিতে নাই।

পুঁথিটি পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত। সর্বত্রই এই দুইটি সাধারণ ভণিতা দেখা যায়:—

"কহেন অনন্ত দত্তে   সেজে রঘুনাথ সুতে
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ,
সেজে রঘুনাথ সুতে   রামদাস সুতাসুতে
স্মরিয়া গঙ্গার পদাম্বুজ॥"

এবং-

"পরাশর সুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার।
শ্লোকবন্দে রচিলেক ক্রিয়াযুগসার॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
রচিল অনন্ত রাম হরিগুণানন্দে॥"

বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন মহাজনের শরণ লইয়া কবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়ে।
পদবন্দে রচিলেক চতুর্থ অধ্যায়ে॥

বিশারদ কী কবির দীক্ষাগুরু অথবা পূর্বসূরী?

পূর্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থখানি পদ্মপুরাণের "ক্রিয়াযোগ সার" অংশের অনুবাদ। ধর্মকর্ম হেতু বারমাসে পালনীয় বিধির সুদীর্ঘ বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। "ক্রিয়াযোগসার" নাম হইতেই প্রতীয়মান হয়, ইহাতে নিত্যনৈমিত্তিক আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি পালনকেই মোক্ষলাভের চরম উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মূল ক্রিয়াযোগসারের বিষয় সম্বন্ধে এই অনুবাদে অনেকস্থানে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদ মূলানুগামী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়, পুঁথির সর্বত্রই কবিত্ব প্রায় সাধারণ শ্রেণীর; কেন না মূল পদ্মপুরাণটিই বর্ণনা-প্রধান এবং স্থলবিশেষে সুন্দর বর্ণনা প্রভৃতি থাকিলেও, তাহার অধিকাংশই অনন্তরাম বাদ দিয়াছেন। বাহুল্যভীতিই সম্ভবতঃ ইহার কারণ।

গ্রন্থের কয়েকটি পত্র ব্যাপিয়া বৈষ্ণব-লক্ষণ, বৈষ্ণব-সেবক প্রভৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে, বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবি অতি চরমে উঠিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের পদধূলি জেই ধরে সিরে।
কোটী কোটী জন্ম তার নরক উদ্ধারে॥"

আর এক স্থানে দেখিয়াছি, ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে সখাভাব স্থাপিত হইয়াছে। স্বয়ং নারায়ণ—

করেন গেণ্ডুয়া খেলা ভক্ততনু সম।

এইরূপ বৈষ্ণব প্রবণতার বহু নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দীনেশবাবু এই পুঁথিটি বৈষ্ণবদিগের নিত্যনৈমিত্তিক পাঠ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কবি অনন্তরাম সম্ভবতঃ বৈষ্ণব ছিলেন, ভণিতায় আছে—

"কহেন অনন্ত দত্ত সেজে রঘুনাথ সুত
হরিপদে ভক্তিযুক্ত মন।"

অথবা—

রচিল অনন্তরাম হরিগুণানন্দে।

সাহিত্য বিশারদ মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় পুঁথিতে মাধব ও সুলোচনার যে কাহিনীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মূল পদ্মপুরাণেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের পুঁথি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিদ্বয়েও আমরা উহা পাইয়াছি, ইহাতে মাধব পক্ষিনী নাম্নী মালিনীর মধ্যস্থতায় সুলোচনার সহিত পরিচিত হইয়াছে এবং ইহার পরে সুলোচনা হরণ প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা গল্পটি বেশ জটিল ও কৌতুহলপূর্ণ হইয়াছে, নায়ক-নায়িকার গোপন মিলনে এই মালিনীর মধ্যস্থতা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেরও বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য গ্রন্থের পক্ষিনী মালিনীকে আমাদের কবি, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত—

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥—

রূপে চিত্রিত করেন নাই, সে সচ্চরিত্রা ও সহানুভূতিসম্পন্না।

আর একটি কৌতুহলপূর্ণ গল্প সবিস্তারে বর্ণনা করিতে হয়—প্রনিধি নামে এক বৈশ্য ধনোপার্জনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, তাহার সাধ্বী পত্নী পদ্মাবতী, সখিগণসহ একদিন স্নান করিতে গেলে ধর্মধ্বজ নামক এক কামাচারী চণ্ডালের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। চণ্ডাল তাহার নিকট প্রেম নিবেদন করিলে, সে ও সখিগণ তাহাকে কঠোর-

তাবে ভৎ'সনা করিল ও গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে বলিল। ইহাতে ক্ষোভে সেই চণ্ডাল গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল এবং পরক্ষণেই সুন্দর পুরুষমূর্তি ধারণ করিয়া প্রনিধির অনুরূপ আকৃতি ধারণ করিয়া পদ্মাবতীর স্থানে উপস্থিত হইল। ঠিক সেইদিনই প্রনিধিও বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং পদ্মাবতী কোন স্বামীকে সেবা করিবে স্থির করিতে না পারিয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইল এবং নারায়ণ তাহাকে যুগ্ম-স্বামী সেবার উপদেশ দিলেন। পদ্মাবতী উত্তরে বলিলেন—

সর্বলোকে হাসিব মোরে দেখি কুলক্ষণ।

নারায়ণ তাহাকে যুক্তি দিলেন—

ভোক্তুং তে যৌবনং সাধ্বি সোভনং দ্বিবিধং স্বয়ং।
অনন্তরূপিণা লক্ষ্মীর্যথা ক্রীড়েন্ময়া সহ॥ (পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার)
আমার অনন্ত জান যথাতথা।
তবে কেনে সেবি আমি হেমন্ত দুই জনা॥ (অনন্তরাম)

পদ্মাবতী তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিল।

এই স্কন্দের পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ও সুমধ্যা বেশ্যার কাহিনীটির সহিত বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি উপাখ্যানের অতি সুন্দর সাদৃশ্য আছে। পুরুষোত্তম বহুদিন বেশ্যাসক্ত ও দুষ্ক্রিয়ারত থাকিয়া শেষে সুমধ্যা বেশ্যারই উপদেশে পাপপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং অনুতাপ ও আরাধনা করিয়া শ্রীহরির কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী ইহাতে আছে। এই সমস্তই মূল পদ্মপুরাণের অন্তর্ভুক্ত। এই গল্পগুলির অবতারণার একটিমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, ইহাদের সমস্ত নায়ক নায়িকাই,—তাহারা পাপাত্মা হোক আর পুণ্যাত্মাই হোক, শেষে গঙ্গার পূতজলে স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে নিমজ্জিত হইয়াছে, এবং গঙ্গার মাহাত্ম্যগুণে তাহাদের সমস্ত পাপ স্খালিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা মোক্ষধাম লাভ করিয়াছে কিম্বা বিষ্ণুর চরণতলে স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং উপপাদ্য বিষয়ের সহিত এই গল্পসমূহ সম্পর্কান্বিত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পর্যন্ত সাতখানি "ক্রিয়াযোগসার" পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সর্বদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় আমাদের আবিষ্কৃত পুঁথিটি সম্পূর্ণতম, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের বহু অনুবাদের ন্যায় এই ক্রিয়াযোগসারের অনুবাদ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুবাদ শাখাপুষ্ট করিয়াছে। সুতরাং ইহারও সম্যক্ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কুমার

ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ-ডি

ঈশ্বরগুপ্ত যখন বাঙলা সাহিত্যের মধ্যগগনে সূর্য্যের মত বিরাজিত ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া দৈনিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল তখন (১৮৩৯) আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অতি অপরিণত অবস্থা। নানা দিক দিয়া নানাভাবে গদ্য রচনার চর্চ্চা চলিতে থাকিলেও তখন পর্য্যন্ত যথার্থ সাহিত্য পদ-বাচ্য রচনার সূত্রপাত হয় নাই। সত্য বটে তখন সংবাদ প্রভাকরের মত কাগজ গুপ্ত কবির প্রতিভাপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল কিন্তু এই প্রভা যে পরিমাণে তাপ দিত সে পরিমাণে আলোকদান করিত না। কারণ বাঙলা সাহিত্য তখন সবেমাত্র পল্লীসাহিত্যের উপরের ধাপে উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহার রুচি সম্পূর্ণ শুচি হইয়া উঠে নাই এবং লেখার মধ্যে মধ্যযুগীয় রীতির ঝাঁঝ তখনো বর্ত্তমান। স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে যে বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছিল সেই সকলে আধুনিকত্ব সঞ্চারের প্রয়াস থাকিলেও নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে রচিত বলিয়া উহারা সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। এই কারণে তৎকালীন সাময়িক পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে যে গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক সাহিত্যের শৈশবাবস্থার নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। 'অমৃতং বাল ভাষিতং' কেবল এই কথা মনে করিলেই তখনকার রচনাসমূহকে নিঃসঙ্কোচে সাহিত্য বলা যায় নচেৎ এই সময়কার অসংযত ও গাম্ভীর্য্যহীন রচনায় পূর্ণ সাময়িক পত্রাদির এবং অনুবাদ বা অনুকৃতিমূলক পাঠ্য পুস্তকের প্রবন্ধসমূহকে সাহিত্য বলিতে প্রত্যেক সমালোচকই বোধ হয় কুণ্ঠাবোধ করিবেন। "রসরাজ", 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' ইত্যাদি অশ্লীল ভাষী কাগজের কথা ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর', 'ভাস্করে'র ন্যায় ভদ্র সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সব ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা [কেহ] ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না।

কেবল অশ্লীল ভাষার জন্য নহে, আলোচ্য বিষয়ের লঘুত্ব এবং রচনারীতির নিকৃষ্টত্বের জন্যও এই সকল রচনা সেকালকার ইংরেজীশিক্ষিত ও নব্যরুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট উপেক্ষিত ছিল। তাঁহারা, না এসকল কাগজের জন্য প্রবন্ধ রচনা করিতেন, না এ সকল পাঠ করিতেন। কিন্তু নব শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নব ভাবের ভাবুক এই সকল ব্যক্তিই ছিলেন নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বিধানে সমর্থ; কারণ ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারার অবসান হইয়াছিল এবং সেই হেতু প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা

বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির আশা তখন সুদূর পরাহত। এরূপ অবস্থায় নব্য সম্প্রদায় নব প্রবর্তিত বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট না হইলে ইহার শৈশব আর কতকাল থাকিয়া চলিত তাহা কে বলিতে পারে? নব্য সম্প্রদায়কে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সত্যধর্ম প্রচারের জন্য যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩৯) তাহারই মুখপত্র স্বরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিবিধ বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ পরিপূর্ণ এই পত্রিকা বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা করিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। কেবল সুন্দর গদ্য রচনার ক্ষমতা নহে তাঁহার জ্ঞানার্জনের এবং জ্ঞান বিতরণের স্পৃহাও ছিল অদম্য। এরূপ একজন শক্তিশালী পুরুষের সহযোগিতার ফলে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দেশের শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হইল। ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত নব্য যুবকগণ বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মন দিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর হইতে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে স্বাস্থ্যকর অভিনবত্বের সঞ্চার হইল তাহার ফলে এ সাহিত্য শৈশব ছাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। সমাজের শিক্ষিত এবং নেতৃস্থানীয়গণ ইহাকে বন্ধুর মত গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির গতি যে দ্রুততর হইল তাহা কেবল অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাগুণেই সম্ভবপর হইয়াছে। এই উভয়ের সঙ্গে ইহাদেরই মত আর এক জন প্রতিভাশালী মহাত্মার নাম প্রশংসার সহিত স্মরণীয়। তিনি হইতেছেন সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ একদিকে সাহিত্যকে যেমন প্রাঞ্জলতা, গাম্ভীর্য ও মহিমা দিলেন বিদ্যাসাগরও তেমনি অপরদিকে ইহাতে রীতি, পারিপাট্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্য সঞ্চার করিলেন। তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে মাইকেল-বঙ্কিম-যুগের আরম্ভ সময় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অচির প্রবর্তিত বাঙলা গদ্যের যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সুন্দর আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কৃতিত্ব এই তিন জন মহাপুরুষের। এই সময়কার সাহিত্যের ইতিহাস মুখ্যতঃ ইহাদের তিনজনেরই শিল্পিকুশলতার কাহিনী।

বিদেশী লেখকগণই সর্বাগ্রে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বাঙলা ভাষায় প্রচার করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু একটি ভিন্নদেশীয় ভাষায় তখনো অপরিচিত বা অল্প পরিচিত বিষয় সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তাঁহাদের অনুবাদাত্মক রচনাগুলি তেমন সহজবোধ্য বা হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। ইহার ফলে পাঠক সমাজে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক রচনার প্রচার অতি বিরল ছিল। এই সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতসাধন করিয়াছেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার পশ্চাতে ছিল তাঁহার বিজ্ঞানচ-

পিপাসু মনের স্বাভাবিক প্রেরণা। ইহারই ফলে তাঁহার রচিত প্রবন্ধ নিচয়ে দুর্বোধ্যতা কিছুমাত্র থাকিত না। কিন্তু কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রচনা নহে ধর্ম, দর্শন, পুরাতত্ত্ব আদি বিষয়েও তিনি যে সকল নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন সে সকলও তাঁহার অকৃত্রিম জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গীভূত হওয়ায় পাঠকবর্গকে এক স্বাভাবিক জ্ঞানের রসে অভিষিক্ত করে। বস্তুতঃ, রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের সুস্পষ্ট ধারণা এবং উহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না থাকিলে তাহা লেখার ভিতর দিয়া সুখবোধ্য রূপ ধারণ করে না। অক্ষয়-কুমার দত্তের মত সহজাত জ্ঞানতৃষ্ণা অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই দেখা যায়। তাহার ফলে, যে কিছু বিষয় তিনি শিখিতেন তাহা ভাল করিয়াই শিখিতেন এবং যে বিদ্যা তিনি লাভ করিতেন তাহার সহিত তদীয় প্রাণের যোগ থাকিত। বিদ্যাকে এমন ঘনিষ্ঠ-ভাবে মনের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেন বলিয়া তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ অনায়াসে এক অনায়াস-বোধ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। এই গুণেই তাঁহার গদ্য রচনা বিষয়ের গুরুত্ব সত্ত্বেও পাঠক সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে এবং তিনি আধুনিক বাঙলা গদ্যের এক জন কৃতী সংস্কারক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮২০ অব্দে নবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী চুপী নামক গ্রামে এক বঙ্গজ কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত শান্ত ও নির্ব্বিরোধী ছিলেন কিন্তু এই শান্ত গম্ভীর বালকের কৌতূহলের সীমা ছিল না। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট কাঠাকালির অঙ্ক কসিতে কসিতে, পৃথিবীর পরিমাণ কত কাঠা ইহা জানিতে তাঁহার কৌতূহল হইয়াছিল। এই কৌতূহলই নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে আমরণ তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা সজীব রাখিয়াছিল। কয়েক বৎসর পল্লীর পাঠশালে কাটাইয়া দশবৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরে নিজ পিতার নিকট আসিলেন। পিতা পীতাম্বর দত্ত খিদিরপুরে গঙ্গার ঘাটে স্বল্প বেতনে শুল্ক আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয়কুমার এইখানে আসিলে 'স্কুলবুক সোসাইটির" প্রকাশিত প্রাকৃতিক ভূগোলের এক বঙ্গানুবাদ তাঁহার হাতে পড়ে। উহা পড়িয়া তিনি বুঝিলেন যে বিদ্যুৎ বৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ একান্ত ভ্রমাত্মক। পাঠশালায় পড়িবার কালে তিনি চাণক্য শ্লোক হইতে জানিয়াছিলেন যে বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজা লাভ করে। তাই সর্ব্বস্থানে পূজ্য হইবার মানসে দশ বৎসর বয়সেই তিনি নানা জ্ঞানের আকর ইংরাজী শিখিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিছুদিন তিনি এক ব্যক্তির নিকট ঘরোয়াভাবে পাঠ লইলেন। কিন্তু এই শিক্ষকের ইংরাজী জ্ঞানের স্বল্পতা অনুভব করিয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট এবিষয়ে অনুযোগ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও অভিভাবকেরা তাঁহার ইংরাজী শিক্ষায় যত্ন লইতেছেন না দেখিয়া তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া স্থানীয় মিশনারী স্কুলে প্রবেশ করিলেন। তখনকার দিনে গোঁড়া হিন্দুরা

খৃষ্টানের বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠান বিপজ্জনক মনে করিতেন। তাহাদের ভয় হইত পাছে ছেলে খ্রীষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করে। তাই অভিভাবকগণ অচিরে তাঁহাকে মিশনারী স্কুল ছাড়াইয়া কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে, ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া তথায় পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রায় ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। অক্ষয়কুমার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। পরের বৎসর পরীক্ষার ফল আশানুরূপ উত্তম হওয়ায় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে পঞ্চম শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছুকালের মধ্যে পিতার মৃত্যু হইলে সংসারের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি তখন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন।

বিদ্যালয় ছাড়িবার কিছুদিন পরেই অক্ষয়কুমারের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় ঘটে। গুপ্ত কবির সহিত দেখা করিবার জন্য একদিন তিনি 'প্রভাকর' কার্য্যালয়ে যান। ঘটনাক্রমে সেদিন ঈশ্বরগুপ্তের সহকারী মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন। পত্রিকার জন্য ইংরেজী পত্রের কাগজ হইতে কোন কোন স্থান অনুবাদ করিয়া দেওয়া উক্ত সহকারীর কাজ ছিল। তাঁহার অভাবে গুপ্ত কবি অক্ষয়কুমারকে ঐ কাজটি করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তরে জানাইলেন যে তাঁহার দ্বারা ঐ কাজ সম্ভব নয়, কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনো গদ্য লেখেন নাই। পরবর্ত্তী কালে বাঙলা গদ্যের সংস্কারকরূপে যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন গোড়াতে আত্ম-ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার এই অজ্ঞতা বিশেষ কৌতুকজনক। সে যাহাই হৌক গুপ্ত কবি সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অক্ষয়কুমারকে অনুবাদে হাত দিতে হইল। লেখা সমাপ্ত হইলে তাহা পড়িয়া ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "যিনি বহুদিন অবধি এই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তিনিও এমন সুন্দর লিখিতে পারেন না।" ইহাই অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনার সূত্রপাত। এখন হইতে তিনি প্রভাকরের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপারের পূর্ব্বে তিনি 'আনন্দমোহন' নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হয় না; সেইহেতু অক্ষয়কুমারকে উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইল। এবিষয়ে বন্ধুগণ তাঁহাকে নানা উপদেশ দিলেন। একজন তাঁহাকে দারোগা হইতে প্ররোচনা দিলে তিনি ঐ পদপ্রার্থী হইবার জন্য পুলিশের কার্য্যবিধি পড়িতে লাগিলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই পাঠে বিরক্ত হইয়া তিনি উহা ছাড়িয়া দিলেন। পরে অন্য কোন বন্ধু তাঁহাকে আইন পড়ার পরামর্শ দিলে ইহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, আইন দিন দিন বদল হয় উহা পড়িয়া কি লাভ; যে আইন (নিয়ম) দ্বারা

জগৎ পরিচালিত হয় আমি সেই স্থির ও অচঞ্চল আইন লিখিতে চাই।" এইরূপে সময় গত হইলে একদিন অকস্মাৎ অক্ষয়কুমার নিজ জীবনের কর্ত্তব্য পথ আবিষ্কার করিলেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও অক্ষয়কুমার বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়িয়া দেন নাই। তখন তিনি নিজের চেষ্টায় কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চাঙ্গের গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং জার্মাণ ভাষা শিক্ষা করেন। এইরূপ জ্ঞান-পিপাসু অক্ষয়কুমারের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ঘটনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই উভয়ের পরিচয় সংঘটন করেন। (১৮৩৯) কারণ তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য। অক্ষয়কুমারও এই সভায় সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৪০ সালে উক্ত সভার যত্নে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হইলে অক্ষয়কুমার সামান্য বেতনে ঐ বিদ্যালয়ে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর বৎসর (১৮৪১) তত্ত্ববোধিনী সভার ব্যয়ে অক্ষয়কুমারের রচিত 'ভূগোল' প্রকাশিত হয়।

এই 'ভূগোল' পুস্তকের ভূমিকায় অক্ষয়কুমার যে গদ্যের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তদীয় পূর্ব্বগামী লেখকগণের গদ্য অপেক্ষা বহুগুণে সুমার্জ্জিত ও সরল। ঠিক এই সময়েই তত্ত্ববোধিনী সভার বার্ষিক উৎসবে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা এতদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সঙ্গে এই রচনাদ্বয়ের যতখানি প্রভেদ তদপেক্ষা এদের অনতি পূর্ব্বে প্রকাশিত যে কোনও গদ্য গ্রন্থের ভাষাগত প্রভেদ অনেক বেশী। ভাষা দিব্য অনায়াস গতিলাভ করিয়াছে, জড়তা একেবারে নাই বলিলেও চলে; অথচ এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন গ্রন্থই রচিত বা প্রচারিত হয় নাই।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে অক্ষয় কুমারের এই প্রথম রচনা বিদ্যাসাগরেরও পূর্ব্বে "গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতার" হস্ত হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিল।

ভূগোল প্রকাশের পর বৎসর (১৮৪২) অক্ষয়কুমার 'বিদ্যাদর্শন' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন কিন্তু ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের সঙ্কল্প করিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদক নির্ব্বাচনের জন্য অনেক সভ্যের রচনা পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন যে অক্ষয় কুমারের রচনা "অতিশয় মধুর ও হৃদয়গ্রাহী।" তাহার ফলে অক্ষয় কুমারই উক্ত পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হইলেন। তাঁহার সহিত সর্ব্ববিষয়ে অক্ষয় কুমারের মতের মিল না থাকিলেও দেবেন্দ্র নাথের গুণগ্রাহিতা ও ঔদার্য্যের ফলে পত্রিকা সম্পাদন কার্য্যে উভয়ের সহযোগিতা বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন করিতে করিতে অক্ষয় কুমার অতিরিক্ত ছাত্ররূপে মেডিক্যাল কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন,

উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান অনুশীলন করিলেন। এই রূপে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি তত্ত্ববোধিনীর পাতায় বাঙলা ভাষার ভিতর দিয়া এই সকল বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ইতিহাস এবং পুরাবৃত্তের তথ্যাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে দেখিতে দেখিতে বাঙলা ভাষা সকল রকম ভাব প্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া আর একটি বড় লাভ হইল এই যে, বাঙলা গদ্যের ভাষা বেশ সুশৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে গেলে কোন ভাবকে অস্পষ্ট রাখা চলে না এবং একটি সুবিহিত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে মনোভাবগুলিকে বাঁধিয়া তুলিতে হয়। কাজেই অক্ষয় কুমারের রচনার ফলে বাঙলা গদ্যের প্রাঞ্জলতা ও প্রকাশ ক্ষমতা প্রচুর বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার সম্পাদিত তত্ত্ব বোধিনীর সাফল্য দর্শন করিয়া পরবর্ত্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্র ছিল; তাহাতে লোক হিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনীই সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।"

প্রবন্ধ গৌরবে ও বিষয় বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অল্প দিনের মধ্যেই দেশব্যাপী খ্যাতিলাভ করিল। ইহার গ্রাহক সংখ্যা সাতশত হইয়া দাঁড়াইল। পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্ম্ম বিষয়ক, নৈতিক ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ নিচয় এই বৃহৎ পাঠক সমাজ কর্ত্তৃক কিরূপ আগ্রহের সহিত পঠিত হইত বর্ত্তমানকালে বিবিধ সাময়িক পত্রিকার ছড়াছড়ির দিনে তাহার সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন হইবে। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন যে সারা বাঙলা দেশের লোক উৎসুক ভাবে এই পত্রিকার প্রতিসংখ্যার জন্য অপেক্ষা করিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তত্ত্ববোধিনী বাঙলা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তা ও মতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিবিধ বিজ্ঞান, নৈতিক উপদেশ, নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বিবরণ, সচেতন ও অচেতন বস্তু পদার্থের কাহিনী লইয়া রচিত অক্ষয় কুমারের প্রবন্ধ নিচয় তত্ত্ববোধিনীয় প্রকাশিত হইয়া বাঙালীর ক্রমবর্দ্ধমান বুদ্ধি-বৃত্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে এবং তাহাদের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার নাশের সহায়তা করিয়াছে। এই সময়ে ঈশ্বরগুপ্তের লিপি চাতুর্য্যে সম্পাদিত 'প্রভাকর' প্রাচীন পন্থীদের প্রিয় ছিল, কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী' নবীন বাঙালীর হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিল। এই পত্রিকা দেশবাসীর জ্ঞান তৃষ্ণা বর্দ্ধিত করিল এবং তাহাদের নৈতিক উন্নতির সাহায্য করিল এবং ইহার প্রভাবে নব্য যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতি এবং ধর্ম্ম-সম্পর্কিত তীব্র আগ্রহের সঞ্চার হইল এক কথায় বলিতে গেলে রামমোহন রায় দেশ মধ্যে যে সংস্কার ও প্রগতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যত প্রকারে সম্ভব তাহার পোষকতা করিল।

বিশেষ যোগ্যতার সহিত তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন করিতে থাকিলেও অক্ষয় কুমার মাসিক

৬০৲ বেতন পাইতেন। এই হেতু বন্ধুবৎসল বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্য্যের উপলক্ষেই উক্ত মহাত্মার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। বিদ্যাসাগর অক্ষয় কুমারকে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইনস্‌পেক্‌টারের কার্য্যে নিয়োগের সমস্ত ঠিকঠাক্ করিয়া দিলেন কিন্তু অক্ষয় কুমার এই আর্থিক লাভ দ্বারা প্রলুব্ধ হইলেন না। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনায় নিযুক্ত থাকিলে তিনি দেশে বিদ্যা বিস্তারের সাহায্য করিতে পাইবেন শুধু এই চিন্তার আনন্দেই স্বল্প বেতনের কর্ম্মে সন্তুষ্ট রহিলেন এবং এই পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রার প্রতি উদাসীন হইয়া বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং নানা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রচনার ফলে ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। বারো বছর যাবৎ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে অবশেষে ঐ কাজ ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহার পরে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়া-পীড়িতে অক্ষয় কুমার মাসিক ২০০৲ বেতনে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু পীড়া বৃদ্ধির জন্য একাজও তাঁহাকে অচিরে ছাড়িতে হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁহার কিছু মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিল। ইহাতে তাঁহার আর্থিক অনটন কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার এই বিশেষ বৃত্তি অক্ষয় কুমার অধিকদিন গ্রহণ করেন নাই। স্বরচিত গ্রন্থের আয় হইতে যেমনি তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা দূর হইল তখনি তিনি উক্ত বৃত্তি পরিগ্রহ হইতে বিরত হইলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই তিনি "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশ করেন (১৮৫১)। আর ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী বৎসরে (১৮৫২)। এই পুস্তকের দুই ভাগই জর্জ্জ কুম প্রণীত Constitution of Man নামক গ্রন্থে প্রচারিত তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু ইহতে মৌলিক চিন্তা এবং গবেষণার পরিচয় ও আছে প্রচুর। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় জীবন যাত্রা প্রণালীর তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশের চেষ্টাও ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ভাগ আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়ভাগ সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়; এই গ্রন্থ প্রচারের ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছিল। ইহার প্রেরণায় তৎকালীন ব্যক্তি বর্গের মধ্যে অনেক মহাশয়—বর্দ্ধমানের মহারাজা পর্য্যন্ত মাছ মাংস ছাড়িয়া দেন এবং ভদ্র সমাজে মদ্যের প্রচলন এবং প্রভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

শিক্ষা, সদাচার, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, শরীর বিধান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন মুখ্যতঃ তাহারই কয়েকটি সংশোধিত ও একত্রিত করিয়া ১৮৫২ সালে তিনি

চারুপাঠ প্রথমভাগ নামে এক বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিলেন। চারুপাঠের প্রথম ভাগে অনুসৃত পদ্ধতিতে ১৮৫৪ সালে উহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য যে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই উভয় পুস্তকের সমাদর করিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য তিনি ১৮৫৯ অব্দের পূর্ব্বে চারুপাঠের তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই পুস্তকে 'স্বপ্ন দর্শন' নামে যে তিনটি নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা অক্ষয় কুমারের ভাষার মাধুর্য্য প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই নিবন্ধত্রয়ে অক্ষয় কুমার ঔপন্যাসিক সুলভ কল্পনাশক্তি এবং রচনাভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন অথচ ভাব-গাম্ভীর্য্যে ইহা তাঁহার অন্য যে কোন রচনা হইতে ন্যূন নহে।

হৃদয়-মনস্থির, সাধুবৃত্তি সমূহের সম্যক উদ্বোধন এবং বাহ্য জগতের সহিত মানবমনের পরিচয় সাধন, এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কৌতূহল উদ্দীপন, ইহা ছিল তিন ভাগ চারুপাঠের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান ও সুনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান আপাততঃ একান্ত নীরস এবং আকর্ষণহীন মনে হইলেও বিজ্ঞানপ্রেমিকের অনুরাগ বারিতে সিক্ত হইলে যে কতদূর মনোরম হইতে পারে বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টান্ত চারুপাঠ।

অক্ষয় কুমারের 'ধর্ম্মনীতি' ও 'পদার্থবিদ্যা' যথাক্রমে ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকদ্বয় মুখ্যতঃ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-রাজীর সমবায়ে রচিত। এই উভয়ের মধ্যে 'ধর্ম্মনীতি' বিষয়বস্তু এবং রচনা প্রণালীর জন্য বাঙ্গলা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। গৃহী মনুষ্যের কর্ত্তব্যবিষয়ে এইরূপ সুচিন্তিত পুস্তক আধুনিক-কালেও বিরল। আর ইহার রচনারীতি একান্ত সরল ও সুখবোধ্য। নিতান্ত উপদেশ মূলক রচনা হইলেও ইহার কোন অংশ নীরস নহে। বর্ত্তমানকালেও যদি কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন তবে তাহার সময়ের একান্ত সদ্ব্যবহারই করা হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের পুস্তক 'পদার্থ বিদ্যা' প্রচারিত তত্ত্বের দিক দিয়া সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে সত্য কিন্তু রচনাগুণে উহা সুপাঠ্য রহিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' নামক মহা গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগ যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৮২ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা উইলসন সাহেবের Religious Sects of the Hindus নামক পুস্তকের আদর্শে লিখিত হইলেও এগ্রন্থে অক্ষয়কুমার অনেক নূতন তথ্য এবং মতামত সন্নিবেশ করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র আদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মকর্ম্মাদির যে বৃহৎ ও উপাদেয় বিবরণ তিনি ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকারূপে রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার শ্রমশীলতা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূল গ্রন্থখানি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিচয় হইতে সঙ্কলিত ও পুনর্লিখিত। উপক্রমণিকা রচনার সময় তিনি নিদারুণ শিরোরোগ-গ্রস্ত হইয়া শয্যাগত

ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ম্যাক্সমূলারও অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

'উপাসক সম্প্রদায়' প্রকাশিত হইবার পরে তিনি 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' নামে এক গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ১৮৮৬ অব্দের মে (১২৯৩ বাঙলা সনের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ) তাঁহার আত্মা অমরধামে প্রস্থান করে। পরে এই পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ৺রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমারের প্রবর্ত্তিত গদ্যরীতির প্রধানগুণ ইহার আন্তরিকতা এবং সমুন্নত ওজস্বিতা। কোন লেখকের রীতি হইতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের রচনাবলী পাঠ করিলে মানস চক্ষের সম্মুখে এক অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমী এবং পরমোৎসাহী সংস্কারকের মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে অক্ষয়কুমারের জীবদ্দশায়ই দেশবাসী তাঁহার সমাদর করিয়াছিল। তাঁহার পুস্তকাবলীর এত বহুল প্রচার হইয়াছিল যে তিনি সেই সকলের আয় হইতে জীবনের শেষ কুড়ি পঁচিশ বছর বিশেষ সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ তিনি আত্মসুখ বিধানে ব্যয় করেন নাই। নিজে তালি দেওয়া জুতা জামা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন অথচ দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থীর প্রার্থনার অতিরিক্ত চাঁদা দিতে অক্ষয়কুমার সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত ছিলেন। এবং তিনি উপার্জ্জিত অর্থের প্রায় একচতুর্থাংশ দরিদ্র-সেবায় ও সাধারণ হিতার্থে দান করিয়া গিয়াছেন।

বালিগ্রামে শোভনোদ্যান' নামক বাগান বাড়ীতে অক্ষয়কুমার শেষজীবন অতিবাহিত করেন। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও সেকালে ছোট বোটানিক গার্ডেন নামে খ্যাত ছিল। নানাদেশ হইতে আনীত এত বিচিত্র গাছগাছড়ার সংগ্রহ আর কোন ব্যক্তির বাগানে ছিল না। এই সকলই ছিল অক্ষয়কুমারের বিলাসিতার উপকরণ। উঁহার গৃহসজ্জা ছিল প্রস্তরীকৃত জীব জন্তু ও শঙ্খ শম্বুক এবং চিত্ত বিনোদনের উপায় ছিল রাসায়নিক ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা। বাল্যকালের অভ্যাসমত তিনি বৃদ্ধবয়সে কতিপয় কাককে নিজ আহার্য্যের অংশ দান করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। ছাত্রাবস্থায় মহাকবি হোমার রচিত ইলিয়াড কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া অক্ষয়কুমার জানিতে পারেন যে গ্রীসও এক সময়ে ভারতবর্ষের মত বহু দেবমূর্ত্তির পূজা করিত। শিক্ষকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, গ্রীস এখন একেশ্বরবাদী এবং এক সময়ে গ্রীসবাসিগণ যে সকল দেবতার ভয়ে সশঙ্ক ছিল সেই দেবতারা এখন যাদুঘরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তখন হইতে অক্ষয়কুমার প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস হারাইলে-

ছিলেন। এই ঘটনার কয়েকবৎসর পরে 'তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম মত গ্রহণ করেন। ইহার পরে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠ এবং কঠোর বিচার বুদ্ধির পরিচালনার ফলে তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার কতকটা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনের উপর দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের যে প্রভাব পড়িয়াছিল তাহা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত মুছিয়া যায় নাই এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অকৃত্রিম গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার ফলেই অক্ষয়কুমারের অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভা লোক চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপরেও অক্ষয়কুমারের প্রভাব সামান্য নহে। দেবেন্দ্রনাথ যে শেষ পর্য্যন্ত বেদের অভ্রান্তত্ব বিষয়ে বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন তাহার প্রধান প্রেরণা আসিয়াছিল অক্ষয়কুমার হইতে। ইহাই অক্ষয়কুমারের মনীষার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

(সংস্কার যুগে রাষ্ট্রতত্ত্ব)

এক্ষণে আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু হচ্ছে যে তখনকার কালের (সংস্কার যুগে) রাষ্ট্রীয়তত্ত্ব। হালের ভারতবাসী জনসাধারণের কাছে বহুকালের যথেচ্ছাচার শাসন ও পরাধীনতার ফলে এই ধারণাই হয়ে গেছে যে ভারতবাসীরা চিরকালই খামখেয়ালী, স্বেচ্ছাচারী শাসনের অধীনে বাস করে এসেছে। এই জন্যই আমাদের গল্পে ও গানে প্রভৃতিতে খেয়ালী রাজা বা মন্ত্রী, সহর কোটালদের (নগরপাল) রাজার হুকুম অনুযায়ী হাতীর পায়ের তলায় মানুষকে দলাবার গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে (সংস্কৃত সাহিত্য) এই সব তথ্য এখন আবিষ্কৃত হচ্ছে যে প্রাচীন আর্য্য কৌম (tribes) গুলি democratic republic (সাম্যবাদীয় গণতন্ত্র) রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতো। কুরু-পাঞ্চাল, যদু প্রভৃতি কৌমগুলি এইপ্রকারের oligarchical republic-এর [মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সাধারণতন্ত্রের) অধীনে ছিল। কুরুদের ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি tribal সর্দ্দার ছিলেন।, যাদবদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ,

উগ্রসেন, উদ্ধব প্রভৃতি এই প্রকার tribal head (কৌমনায়ক) ছিলেন। ইহাদের "লোকেশ্বর" বলা হতো (১)। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৮১ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণকে যাদব সঙ্ঘের একজন সঙ্ঘমুখ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার যে রাষ্ট্রে রাজা থাকতো সেখানে তিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হতেন (২)। জয়শোয়াল বলেন, হিন্দুরাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত রাজারা 'Constitutionally' (আইনতঃ) যথেচ্ছাচারী ছিল না। যে রাষ্ট্রে রাজপদ বিবর্ত্তিত হয়েছিল জনসাধারণের নেতৃত্বে অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠান দ্বারা রাজা অভিষিক্ত হলে জনসাধারণের সমিতি, সভা প্রভৃতি দ্বারা রাজার রাজশক্তি পরিচালনা গণ্ডীভূত হতো। The king thus became a constitutional monarch only exercising authority limited by the law.") আবার ব্রাহ্মণ, পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে এবং রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে পুরোহিতদের দ্বারা অনেক স্বেচ্ছাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করাবার কথা আছে। অপরদিকে প্রাচ্যে একরাষ্ট্রের (৩) (monarchyর) উদ্ভব হয়। মগধে আমরা প্রথম সাম্রাজ্যের বীজ বপন হ'তে দেখি। ব্রাহ্মণ সমূহে প্রাচ্যের সম্রাটদের কথা উল্লেখ আছে। আবার মিথিলার রাষ্ট্রপরিচালক বা রাজা প্রজাদের পিতা রূপে বিবেচিত হতেন। এই জন্যে তাঁদের 'জনক' উপাধি দেওয়া হতো (৪) আবার বুদ্ধের সময়ে আমরা দেখি হিমালয়ের সানুদেশে ক্ষত্রিয় কৌমগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে tribal oligarchy প্রতিষ্ঠিত করেছে; কপিলাবস্তুতে ইক্ষাকুবংশীয় শাক্যেরা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। উত্তর বিহারের লিচ্ছবি, বিদেহ, প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কৌমগুলি (জন) সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে Vajjian Confideracy (ভজ্জীয়দের সঙ্ঘ) প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত করার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ছাড়া আমরা মল্ল, কলীয় এই ভজ্জীয়ের ও সংবাদ পাই যাহারা আটটি কুলের (clan) সমবায়ে গঠিত। এদের মধ্যে মিথিলার বিদেহরাই ছিল প্রধান। এই অঞ্চলে এই বিদেহ ছাড়াও অন্যান্য কুলরাষ্ট্র ছিল—যেমন, ভগ্গ, বুলি, কলম, কোলিয়, শাক্য (কপিলাবস্তু) এবং পিপ্পলিবনের মরীয়রা। এই কুলরাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শাক্য কুলে ধর্ম্মসংস্থাপক গৌতমবুদ্ধের এবং জ্ঞাত্রিক বংশে মহাবীরের জন্ম হয়।

এই কৌমগুলির মধ্যে লিচ্ছবি, মল্ল প্রভৃতিকে পরের যুগে মনু "ব্রাত্য" বলেন (মনু—

(১) Dr. Narayan Bandopadhyaya Development of Hindu Polity and Political Theories. Part I, p. 198.

(২) Jaysawal, Hindu Polity—and Dr, Naran Bandopadhya's—Development of Hindu Polity and Political Theories, Part II,

(৩) Ibid, Part I p. 161 (৪) Ibid, p. 162.

(৫) Buddhist Suttas, Sacred Book of the East, Vol XI p. 31.

অধ্যায় ১০। ২২ শ্লোক)। তিনি বলছেন, ক্ষত্রিয়বর্ণের ব্রাত্য থেকে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, নট, করণ, খস এবং দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হয়েছে (মনু ১০।২০)। পুনরায় তিনি বলছেন, যে সব সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন দ্বিজদের সন্তানগণ সাবিত্রী (দ্বিজত্ব প্রাপ্তির দীক্ষা) গ্রহণ করেনি তারাই ব্রাত্য। এই ব্রাত্যদের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণেরা ঘৃণা করতো। তাদের সংবাদ এই যে কপিলাবস্তু থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দের গণরাষ্ট্র ছিল। এই ব্রাত্যদের মধ্যে লিচ্ছবিদের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিচ্ছবিদের নাম পাওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্ত যখন সসাগরা ভারতের সম্রাট হন তখন তিনি গর্ব করে "লিচ্ছবি তনয়া স্বত", ব'লে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বুদ্ধের জীবন চরিতের মধ্যে লিচ্ছবিদের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। মহাপরিনির্ব্বাণ স্বত্তে উল্লেখিত আছে যে বুদ্ধ যখন তাঁহার জীবনকালের শেষদিকে বৈশালীতে আসেন এবং অম্বাকালী প্রদত্ত "আম্রকাননে" অবস্থান করছিলেন তখন লিচ্ছবী প্রধানেরা এই সংবাদ পেয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এই পুস্তকে এই কথা বর্ণনা আছে যে তাহার উত্তম রথে আরোহণ করে বৈশালীতে (বেশালী) আসেন। তাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গায়ের রং নীল (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা)। রিজ ডেভিস এই 'নীল' শব্দের ভাষান্তর করেছেন "dark", তাদের পোষাক এবং গাড়ীর রং ছিল নীল। তাদের গাত্রবর্ণ মলিন (dark), পোষাক ও অলঙ্কারও মলিনবর্ণের (dark), কতকগুলির গায়ের রঙ ফরসা (fair) এবং উজ্জ্বল বর্ণের পোষাক ও অলঙ্কার পরিধান করেছিল। কতকগুলির গায়ের রঙ ছিল লাল এবং লাল পোষাক ও অলঙ্কার পরেছিল। কতকগুলির গায়ের রঙ ছিল শ্বেত এবং তারা সাদা পোষাক ও অলঙ্কার পরেছিল।

লিচ্ছবিদের এই বিভিন্ন রকমের গায়ের রঙ ও পোষাক দেখে Senart ও ডাঃ লাহা প্রভৃতি মনে করেন যে লিচ্ছবিরা সম্ভবতঃ বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিল এবং এই বিভিন্ন রঙের পোষাকের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে পৃথকীকৃত হতো। (৫) এই প্রকারে পৃথিবীর অনেক স্থলেই একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন কুল, বিভিন্ন বেশের দ্বারা নিজেদের পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতো। যথা স্কটল্যাণ্ডে পুরাকালের হাইল্যাণ্ডারদের মধ্যে প্রত্যেক কুলই (Clan) মাথারটুপি (cap) ও পরিধেয় বস্ত্র (tartan) বিভিন্নতার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে পৃথকীকৃত হতো। আর আমরা পূর্ব্বে দেখিয়েছি যে, বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণ কুলগুলি শিখা ও পরিধেয় বস্ত্রের রঙের দ্বারা পৃথকীকৃত হতো। লিচ্ছবিদের বিষয়ে আর একটু বলবার আছে—ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন লিচ্ছবিদের মধ্যে সে সময়ে মৃতদেহকে বর্ষা জন্তু

(৫) Dr. Bimala Charan Law, Kshatriya Clans in Buddhist India p, 68,69.

দ্বারা আহার করার প্রথা এবং তাহাদের আইন তিব্বতীদের সঙ্গে মেলে এইজন্য Vincent Simth (৫'ক) তাদের 'তিব্বতী' জাতীয় বলে নির্দ্দেশ করেছেন।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (৫খ) স্মিথের প্রত্যুত্তরে বলেন লিচ্ছবীরা পারস্যদেশের নিসিবি থেকে ভারতে ও তিব্বতে এসেছিল। এইজন্য তাহারা পারসীদের মত মৃতদেহকে জন্তুদ্বারা আহার করাতো। তিনি আরও বলেন ১০০ খৃঃ অঃ বাঙলার বরেন্দ্র দেশে সিংহ নামে একটি লিচ্ছবী রাজা রাজত্ব করতেন। কিন্তু আমরা দেখি যে শবকে সমাহিত করার প্রথা বেদেই উল্লিখিত আছে।

প্রাচীনকালের আর্য্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে শবকে সংকারের প্রথা প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটি প্রথা ছিল যে মৃতদেহকে লোষ্ট্র প্রস্তরের মত দূরে কোনস্থানে নিক্ষেপ করে পশু পাখীদের দিয়ে খাওয়ান হতো। (অথর্ব্ববেদ ১৮।২।৩৪ দ্রষ্টব্য) (৫গ)। এই সব কারণবশতঃ আমাদের মনে হয় যে লিচ্ছবিরা ভারতীয় কৌমের লোক ছিল এবং তাহারা ভারতীয় ক্ষত্রিয়বর্ণেরই লোক ছিল। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের যে সব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দেখে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহাদের অভারতীয় বৌদ্ধের লোক বলে মনে করেন, অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে এই সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ভারতীয় আর্য্যভাষী বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান (বহুস্বামিত্ব) এখনও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই জন্যে লিচ্ছবিদের এই প্রকার রীতিনীতি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে তাহাদের অভারতীয় বলে মন্তব্য প্রকাশ করা ভুল।

বুদ্ধ ও মহাবীর বর্দ্ধমান যখন মগধে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়কার জৈন ও বৌদ্ধ বৃত্তান্তে আমরা এই সংবাদ পাই যে শৈশুনাগ রাজবংশ মগধের রাজধানী রাজগৃহে রাজত্ব করছিলেন। তখন গিরিব্রজপুর পরিত্যক্ত হয়ে কিঞ্চিৎ নিম্নে সমতল ভূমিতে রাজগৃহ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। এই সময় মগধ প্রতাপশালী হয়ে আশপাশের রাষ্ট্রগুলি বিধ্বংস করে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হতেছিল। এই যুগেতে মগধ অঙ্গকে গ্রাস করেছে এবং উপনিষদের অজাতশত্রু ও জাতকমালার ব্রহ্মদত্তদের রাষ্ট্র কাশী কোশলের

৫ (ক) Vincent Smith—"Tibetan affinities of the Lichchavis" in Indian Antiquary—1903 No,—30 : 233—235.

৫ (খ) Satish Ch. Vidyabhusan—"Pansian origin of the Lichchavis." Indian Antiquary March 1908

৫ (গ) অথর্ব্ববেদ (১৮।২।৩৪)—টীকাকারের মতে বেদের 'পারুপ্ত' অর্থ হচ্ছে—দূরদেশে কাষ্ঠবৎ পরিত্যক্ত। একবারে শবকে দূরে নিক্ষেপ করা বুঝায়। আবার এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৩ অধ্যায়, ব্রাহ্মণ ৯।২৮) দ্রষ্টব্য।

অন্তর্গত হয়েছে এবং পরে ইহা মগধের বিম্বিসারের অধীনে আসে। বুদ্ধ পরলোক গমনের কিঞ্চিৎ পরেই কোশলের রাজা বিড়ূড় শাক্যদের নির্মূল করে, আর মগধ লিচ্ছবি রাষ্ট্র করায়ত্ব করে। ক্রমশঃ কোশল ও অবন্তি মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ভারতের ইতিহাসে আমরা এই দেখি যে ভারতে পূর্ব্ব দেশেই একরাটত্ব অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য স্থাপন আরম্ভ হয়। শৈশুনাগদের পতনের পর যখন নন্দবংশ মগধে রাজত্ব করছিল তখন শেষ নন্দের সময়েই আলেকজাণ্ডারের অভিযান হয়। এই সময় কুসুমপুর অর্থাৎ পাটলীপুত্রে মগধের রাজধানী স্থাপিত ছিল। বুদ্ধের সময়েতেই এই নগর স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে উত্তরে লিচ্ছবি প্রভৃতি প্রবল কৌমদের আটক করিবার জন্যই মগধরাজ পাটলীপুত্র নির্ম্মাণ করেন। বৌদ্ধপুস্তকে লিখিত আছে যে বুদ্ধ নাকি এই সহরের উজ্জল ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে বলে গিয়েছিলেন যে এই স্থান হতেই তাঁর ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত হবে। আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাব অভিযান করেন সেই সময়কার বিবরণীতে আমরা এই সংবাদ পাই যে মগধের রাজা নন্দ তখনকার অতি প্রতাপশালী ভারতীয় রাজা। তার রাজত্ব পশ্চিমে পাঞ্জাবের জলন্ধর হতে আরম্ভ করে পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গ্রীক লেখকগণ তাহাকে প্রাচ্য (Prassii) ও গঙ্গারাঢ়ীদের (Gangaride) দেশের রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। এই সময়ই নন্দবংশজাত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যনামে এক জারজপুত্র আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপস্থিত হন। তিনি নন্দের বিপক্ষে আলেকজাণ্ডারের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন। শশীগুপ্ত (৬) নামে একজন মধ্য এশিয়ার হিন্দু কৌমের লোক আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলে ঢুকে মধ্য এশিয়ায় তাহার তরফে লড়াই করছিলেন। তৎপর তক্ষশীলার রাজা অম্ভীও আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যোগদান করেন, আবার পুরুরাজ পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। শেষে পলাতক চন্দ্রগুপ্ত যেখা বিদেশী বিজয়ীর শরণাগত হন, ইহার কাছ থেকে এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করে আলেকজাণ্ডার বুঝিলেন যে নন্দ অতি প্রতাপশালী রাজা, তাহার ছয় লক্ষ পদাতিক ও বহু সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রভৃতি আছে; চন্দ্রগুপ্ত বিজেতাকে বলেন যে রাজা নন্দ আসলে জারজ এবং নাপিতপুত্র, সেই জন্য জনসাধারণের প্রিয় নহেন। পুরাণের মতে নন্দবংশের স্থাপয়িতা মহাপদ্ম শেষ শৈশুনাগ রাজার ঔরসে এক শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। মহাবোধি বংশানুসারে ইহার নাম ছিল উগ্রসেন, আবার জৈন জনশ্রুতি অনুসারে ইনি একজন নাপিত ছিলেন এবং রাণীর প্রিয়পাত্র হয়ে রাজাকে হত্যা

(৬) [illegible] নাগ:— "ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের রূপ রেখা।" Academy of History হইতে প্রকাশিত। এই নামটা গ্রীকদের দ্বারা হয়েছিল বলেই তাহার পাঠোদ্ধার এতদিন হয় নাই। ইনি বোধহয় হিন্দুকুশ পর্ব্বত মালায় উপরিস্থিত কোন হিন্দুকোমের লোক ছিলেন।

করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মুদ্রারাক্ষস নাটকে নন্দদের উচ্চবংশ বলেই বলা হয়েছে। যাহা হউক পুরাণ অনুসারে নন্দরা একরাট এবং একচ্ছত্র ছিলেন। কোন প্রাচীন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলে গেছেন, আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগের মূলে হচ্ছে নন্দের পরাক্রম শ্রবণে তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার। পুরুরাজের লড়াইয়ের বহর দেখে এবং তৎপর নন্দের মহাপরাক্রম শ্রবণ করে প্রবীন মেসিডোনীয় সৈন্যেরা ভড়কে গিয়েছিলেন। সেইজন্ত তাহারা আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। আমাদের মতে ভারতের উষ্ণ ঋতুর প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে তারা প্রত্যাবর্ত্তন করেছিল এ একটা বাজে ওজর মাত্র। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন ও দক্ষিণ পারস্যের গরম ভারত অপেক্ষা বেশী হতে পারে কিন্তু কম নয়। অধ্যাপক মহাফী বলে "পারস্য সম্রাটের পশ্চিম এশিয়ার লোক থেকে সংগৃহীত সৈন্যদের পরাজয় যত সহজ লভ্য হয়েছিল, পূর্ব্ব ইরাণ এবং ভারতের আর্য্যজাতীয় যোদ্ধাদের জয় করা আলেকজাণ্ডারের তত সহজ হয়নি," আবার অধ্যাপক গ্রোট (৮) বলেন, "পুরুরাজকে বন্দী করাই আলেকজাণ্ডারের প্রথম সফলতা" (অবশ্য পুরুরাজ স্বেচ্ছায় আলেকজাণ্ডারের শিবিরে এসেছিলেন)।

এখন আমাদের বুদ্ধের যুগে প্রত্যাগমন করা যাক। * বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে যে অজাতশত্রু পিতৃহন্তা ছিলেন এবং তাহার বংশে চার পুরুষ পিতৃহন্তারকেরা সিংহাসন পেয়েছিল। + বৌদ্ধ পুস্তকে একটা গল্প আছে যে একবার রাজগৃহে কাষ্ঠনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদে ধুপধাপ আওয়াজ হতে থাকে, দৈবজ্ঞেরা রাজাকে বলেন যে তাহার পিতৃপুরুষের প্রেতেরা পিণ্ডের জন্য এইসব উৎপাত করছে। এই গল্পেতে আমরা এই সংবাদ পাই যে রাজপ্রাসাদও কাষ্ঠনির্ম্মিত হত, আবার মেগাস্থিনিশও বলে গেছেন যে পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদও কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল (এই প্রাসাদের ভিত্তি এখন ভূগর্ভ খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে)। এই ভিত্তির নিদর্শন স্বরূপ শালকাষ্ঠ এখনও দেখতে পাওয়া যায়, এই জন্তই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, যে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পূর্ব্বে ভারতীয়েরা প্রস্তর বা ইটকের বাড়ী নির্ম্মাণ করতে জানত না (কিন্তু সিন্ধুদেশে মোহেনজোদাড়ো ও পাঞ্জাবের হারাপ্পাতে আবিষ্কৃত ইষ্টকনির্ম্মিত সহর ইউরোপীয়দের উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করছে) আশ্চর্য্যের কথা এই যে বুদ্ধের সময়েই উত্তর ভারতের পূর্ব্বভাগে প্রথম অন্তর্ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। তাহার প্রায় দুশো বৎসর পরেই নিখিলভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার উত্তর পশ্চিম সীমা ছিল পারস্যের পূর্ব্বপ্রান্ত। আমরা বৈদিক যুগ থেকে বুদ্ধের যুগ পর্য্যন্ত ভারতে গণরাষ্ট্রের (Republic)

(৮) Grote History of Greece.

* 'সুবর্ণবিলাসিনী' ১ম খণ্ড ১৩৪—১৩৭ পৃঃ ;

+ "মহাবংশ" ৪র্থ অধ্যায়

সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু 'একচ্ছত্র' সাম্রাজ্যের বিবর্ত্তন পূর্ব্ব ভারতেই প্রাই। এই অনুষ্ঠান নিয়ে পণ্ডিতের মধ্যে অনেক গবেষণা আছে। পাঞ্জাবের (১) অথবা কুরু বা পাঞ্চালের বৈদিক বা আর্য্য কৌমদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটার অভিব্যক্তি না হয়ে পূর্ব্বের পতিত ব্রাত্যদের মধ্যে হ'তে কেন ইহার বিবর্ত্তন হল, তাহাই ঐতিহাসিকদের গবেষণার বস্তু হয়েছে। আবার বুদ্ধ সাম্যবাদই প্রচার করে গিয়েছিলেন! তাহার রাজনৈতিক আদর্শ তাহার স্বজাতীয়দের আদর্শের বাইরে যায় নাই অর্থাৎ গণ সাম্য ছিল। অথচ বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রচার কেন্দ্রের স্থলেই এবং পতিত 'ব্রহ্মবন্ধু' ও 'ক্ষত্রিয়বন্ধু'দের দেশেই প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রথম নিখিল ভারতীয় সাম্রাট ছিলেন একজন শূদ্র ইহাই আশ্চর্য্যের কথা!

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের চিঠি

১১, ইডেন হসপিটাল রোড
জুন ৬ই ১৯২৫—কলিকাতা

স্নেহের—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম! তোমরা ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে দিন দিন সংসারে জড়াইতেছ এবং জপ ইত্যাদি করিবার সময় পাও না। তুমি হাতে কাজ করিবে এবং মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিবে। এবং জানিবে যে এই সংসার তোমার নয় ভগবানেরই সংসার। তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তোমার ছেলের সেবা করিবার সময় নারায়ন বুদ্ধি করিয়া সেবা করিবে। রাত্রে শুইবার সময় সমস্ত দিনের কর্ম্মফল ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে এবং সর্ব্বদাই তাহার নিকট ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিবে। এইরূপ সংসারে থাকিলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে। নচেৎ সংসার দুঃখ কষ্ট ও শোকে পরিপূর্ণ। ইহাতে মানুষ যে সুখ পায় তাহা অত্যন্ত অল্পক্ষণ স্থায়ী। মানুষ যাহা চায় তাহাই পায়। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই পাইয়াছ। আবার যখন ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানকে চাহিবে তখন তিনি সংসারের সব জিনিষ উল্টে পাল্টে দিয়া তোমাকে দেখা দিবেন। কিন্তু তোমার মায়া মমতা যতদিন

---

(১) হরপ্রসাদ গ্রন্থমালা প্রথম ভাগ ও N. C. Ban rjee Hindu polity and Politica Theories.

প্রবল আছে ততদিন তুমি ভগবান্‌কে প্রাণের সহিত ঠিক ঠিক চাহিতে পারিবে কি ? ভগবান সকলের বাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেন। তুমি খোকা চাহিয়াছিলে— খোকা পাইয়াছ এক্ষণে তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাক।

তোমরা সকলে আমার শুভাশীর্ব্বাদ লও। ইতি— আশী:

অভেদানন্দ

সঙ্ঘবার্ত্তা

সরস্বতী পূজা—গত ১৯শে মাঘ ১লা ফেব্রুয়ারী অবৈতনিক উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীর অর্চনা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, অঞ্জলিপ্রদান ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বিহারী দাসের ছাত্র বৃন্দ লাঠি, ছোরা ও যুযুৎসু ও শ্রীযুক্ত রাজেন গুহঠাকুরতার ছাত্র শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নানাপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম, ভারোত্তলন, পেশী সঞ্চালন প্রদর্শন করিয়া সমবেত দর্শক ও ছাত্রগণকে আনন্দ দান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ষড়ধিকশততম জন্মতিথি উৎসব, কলিকাতাস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষে কাশীপুর শ্মশানে শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দজীর সমাধি মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছে। ঐদিন কাশীপুর শ্মশানে বিশেষ পূজা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী ভিত্তি স্থাপন করেন।

মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিশেষ পূজা হোমাদি হইয়াছিল। প্রায় দুই-সহস্র ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১০টায় সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলা কথকতা করেন। অপরাহ্নে সলিসিটার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচিত হয়। রাত্রে কীর্ত্তন কলানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয় তাহার সুললিত কণ্ঠে মাথুর কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিং—গত ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবার অন্যান্য বৎসরের চেয়ে অনেক অধিক লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় ১৫০০ লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। নানাস্থান হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মৌলিক মহাশয় উৎসব উপলক্ষে অর্থ দিয়া ও অন্যান্য নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

LIFE OF MAHAMMAD

Swami Abhedanada

Nearly six hundred years after the advent of the glorious son of Man, the Divine powers of the Lord were again manifested in the world through the great prophet of Arabia, the founder of Islam.

He was born in Mecca, the capital of Arabia in the sixth century A. D. Arabia is a peninsula about 400 miles long, washed by the Red Sea and the Gulf of Suez on the west, the Indian Ocean on the south, the Persian Gulf and the Gulf of Oman on the east, and bounded on the north by a portion of Syria. It is a country covered by a vast sandy desert execpting the sea coasts, where green valleys with high mountains and scanty vegetation were at first inhabited by nomadic Arab tribes. Very little of Arabia was known to the civilized world before the time of Mahammed. The Arab themselves knew of nothing beyond their own desert. These tribes claimed their descent from the family of Abraham, lived in small villages along the coasts, roame over the peninsula from place to place upon camels, carrying on a caravan trade among different tribes and speaking the same language; but each tribe enjoyed independence under a crude patriarchal government by its chief. The Arabs were impetuous, restless, lawless, and warlike in their nature.

Pliny says "The Arabian tribes are equally addicted

to theft and to merchandise: the caravans that traverse the desert are ransomed or pillaged ; and their neighbours, since the remote time of Job and Sesostries, have been the victims of their rapacious spirit. A single robber, or a few associates, are branded with their genuine name ; but the exploits of a numerous band assume the character of lawful and honourable war. The temper of a people, thus armed against mankind, was doubly inflamed by the domestic license of rapine, murder, and revenge. Each Arab, with impunity and renown, might point his javelin against the life of his countryman. "The Arabs were addicted to drinking, adultery and gambling. They had neither social nor religious restrictions to marrage or divorce."

A man used to marry an orphan for her money and leave or illtreat her as soon as he had secured it. A divorced woman was not allowed to remarry, as it was considered a slur upon her husband. Revengeful women would not be remained satisfied until blood was shed. Slaves were treated as beasts of burden. Human sacrifices prevailed in the temples, parents dragged their own sons to the alter and buried the female children to propitiate their bloodthirsty idols.

Well has it been said by Gibbon the historian, "In this primitive and abject state, which ill deserves the name of society, the human brute, without arts or laws, almost without sense or language, is poorly distinguished from the rest of the animal creation."

They had no religion higher than gross idolatry of which the chief seat was Kaaba in Mecca or ancient Macoraba, the capital of Macoraba, (The Greeks gave the name Macoraba). The ancient legend of the Arabs tells us that this Kaaba was the most sacred temple in the

country for it was originally built by Abraham. The story runs thus :—Hager, Abraham's wife, wandering through the desert with her little boy in arms, reached at length the valley of Mecca. She, being extremely thirsty left her son Ishmail crying on the ground and began to search to and fro for water. Ishmail kicked around him in childish passion, and lo ! beneath his feet the spot bubled forth into astream of clear sweet water. This was the famous well Zam-Zam. Amelkites and Arab tribes from Yemen attracted by this fountain settled by there. Ishmail grew up among them and married the daughter of their chief. On a subsequent visit the patriarch Abraham, assisted by his son Ishmail, erected the temple where it now stands and established the ancient rites of pilgrimage.

The direct descendants of Ishmail were known as Korish and they were at first the gaurdians of this temple and of the well. Cossai, a Korish chief, became the priest of Kaaba in the fifth century A. D., held the key of the temple and gave food and drink from the sacred well to the pilgrims who gathered there every year. The pilgrims used to visit the Kaaba to kiss the mysterious stone imbedded in the eastern corner and to make seven circuits round the sacred temple. There were many idols in the Kaaba, the chief of which was Hobal (Hebal). Each tribe had its own idol in the Kaaba, numbering about 360, some were shaped like human beings, others like angels, lions and so on. They were called by different names such as Rahel, Al-Lat, Al-Uzza.

Thus the religion of Mecca at the time of Mahammad's birth was a mixture of idol-worship, stone-worship, and sabeanism or the worship of heavenly bodies. The people were extremely superstitious. They recognized Abraham

as the friend of God, whose name in Arabic was Alla-Tala, the most high God, to whom, gods and idols were subordinate.

The worship of Kaaba satisfied the Arab minds, for it was founded upon the patriarchal traditions common at once to Christianity and Judaism. About this time both the Jews and Arabs were expecting a great prophet among their people. Under such conditions the messenger of Lord Alla-Tala appeared in Mecca to establish true religion and destroy the gross idolatry and superstitions of the Arab tribes.

The prophet of Arabia, was descended from the family of Cossai, the priest of Kaaba and the chief of the Korish tribe of Mecca. His father's name was Abdulla or the servant of God and his mother's name Amina. At the age of 25 Abdulla married Amina, and after staying with her for three days left his wife and went on a merchantile expedition to Gaza in the south of Syria: on his return he suddenly died at Medina bequeathing to his widow five Camels, a flock of goats and a slave girl. This little property and the house where Abdulla dwelt were the inheritance which the prophet of Arabia recieved at his birth.

On the 20th of August, in the year 570 A. D. Amina gave birth to a child who was named Mahammad by his grand-father Ab-dul Mutalib. The meaning of the Arabic word Mahammad is "The praised." According to the Arabic custom, a child of better class was never nursed by its mother. So the infant Mahammad at his birth was made over to a nurse Theuba, the slave girl of his uncle. But After few days another nurse Halima of the Beni-Sad tribe, took charge of the orphan child.

and nursed him until he was five years old. During this period Mahammad had several attacks of ecstatic trances which created great alarm in the mind of the nurse, but otherwise he was healthy and robust; and learned to speak the purest Arabic of Beni-Sad tribe. In after years Mahammad never forgot the kindness of Halima his nurse; and he often used to say to his people "Verily I am the most perfect Arab among you; my descent is from the Korish and my tongue is the tongue of Beni-Sad."

Mahammad spent the sixth year of his life with his mother at Mecca. Then he accompained her to Medina to see some of her relatives. He stayed with his mother for a month in the house where his father died, saw his grave and then started for Mecca, but on the way his mother fell sick and died and he returned with his nurse to Mecca. This visit left an indelible impression upon the memory of mahammad. The early loss of his mother made him feel lonely and sorrowful. His young mind began to meditate upon the transitoriness of earthly relation; and as he matured this meditative nature became stronger.

His grand-father Abd-ul-Mutalib took the charge of him and treated him with unusual fondness untill 578 A. D.. when he died. The loss of his loving grand-father was a great shock to the young heart of Mahammad, who was then only eight years old. However, the dying grand-father consigned the gaurdianhship of his orphan grand-child to his son Abu-Talib, who faithfully discharg-ed his duty as long as he lived. Abu Talib's fondness for Mahammad equelled that of his father and he treat-ed his nephew as his own child. He kept Mahammad

under his constant supervision and took him wherever he went. When Mahammad reached his twelfth year Abu-Talib started a mercantile expedition to Syria. But the young Mahammad would not be left behind, he must accompany his uncle and so they went together. On this journey they went through several Jewish settlements and came in contact with the Christians of Syria. This gave a great opportunity to Mahammad to learn the manners, customs, ceremonies and religious beliefs of the Jews and the Christians. His keen intellect, governed by a high spiritual tendency, grasped even at this early age, the minute theological differences that exist between the faiths of the Jews and the Christians.

Nothing of importance is mentioned in the life of Mahammad until he was twenty years old. At this time he took part in a battle which was fought by his uncles against the rival chiefs of other tribes. Mahammad however did not fight, but gathered the arrows of the enemy as they fell and handed them over to his uncles. On one occasion, in his youth, he took up the occupation of a shepherd and as he watched the flocks in lonely desert he often felt the presence of the divine power around him and frequently went into ecstatic trances which were natural to him, and thus communed with the supreme. The historians unanimously declare that in modesty of deportment, purity of manners and in moral virtues, the youth of Mahammad was unrivalled among all the inhabitants of Mecca. It was on account of his pure character that his fellow citizens respected and honoured him and gave him the tittle of Al-Ámin, the faithful. Thus honoured, Mahammad lived a quiet life in the family of his uncle Abu-Talib, until he was obliged to earn his own

livelihood, for Abu-Talib had a large family and but moderate means.

Mohammad was never covetous of wealth nor did he care for the bustle and anxiety of a merchant life. But forced by pecuniary circumstances and requested by Abu-Talib himself, he accompained the caravan of a wealthy Arab lady Khadiza, of the Korish tribe, and started for Syria.

The reflective mind of Mahammad, who was now 25 years old, found another opportunity to imbibe the tenets and beliefs of the Syrian Christians. He observed the rites and ceremonies of the worship of Mary and Jesus on the Cross. After disposing of the merchandise and buying things which Khadiza, the wealthy widow needed, Mahammad returned with the caravan to Mecca. Historians describe the characteristic features of Mahammad in the prime of youth in the following manner :

"Slightly above the middle size, his figure though spare, was handsome and the chest broad and open ; the bones and frame-work large ; and the joints well-knit together. His neck was long and finely moulded. His head, unusually large ; gave space for a broad and noble brow. The hair thick, jet-black, and slightly curling, fell down over his ear. The eyebrows were arched and joined, the countenance thin but ruddy. His large eyes, intensely black and piercing received additional lustre from eyelashes long and dark, the nose was high and slightly aquiline, but fine and at the end attenuated. The teeth were far apart. A long bushy beard, reaching to the breast, added manliness and presence. His expression was pensive and contemplative. The face beamed with intelligence. The skin was clear and soft. His broad back leaned slightly

forward as he walked and his step was hasty, yet sharp and decided like that of one rapidly descending a declivity. There was something unsettled in his blood-shot eyes which refused to rest upon its object. He was the subject of strong passions; when much excited the vein between his eyebrows would mantle and violently swell accross his ample fore-head, yet he was cautious and circumspect, and in action kept ever aloof from danger. He was generous and considerate towards his friends. His commanding mien inspired the stranger with an undefined and indescribable awe; but on closer intimacy apprehension and fear gave place to confidence and love.

He was resolute and tacitern. His singleness of purpose, strength and fixedness of will and a sublime determination made his people bow before him with awe and reverence. Perceiving the noble and commanding qualities of Mahammad, Khadiza was so charmed and fascinated by the wonderful personality of Mahammad that she desired to marry him and through her sister at once proposed to him. Mahammad agreed and their matrimonial relation was established. This union was a very fortunate and a happy one and within the next ten or twelve years Khadiza bore to Mahammad two sons and four daughters.

It was Khadiza who first recognised the prophetic qualities in the character of her husband and surrendered to him her whole heart, soul and faith.

From this time on Mahammad was taken care of by his wife Khadiza and was thus enabled to live a quiet life spending most of his time in retirement and meditation. When he was about thirty-five years old, an unexpected event occured in his life which created some influence in

the prophetic character of our hero. A violent flood swept down the valley of the neighbouring hills around the city of Mecca, and shattered the walls of the holy temple of Kaaba. The Korish priests fearing the utter destruction of the temple wanted to rebuild the walls and put a roof over the holy spot, which was so long without any cover, to prevent the thieves from taking away the precious relics. But the treasury was low and there was no one to meet the expenses. Suddenly the anxiety of the priests was removed by the news that a Grecian ship was driven ashore by a storm on the Red-Sea near Mecca. The Korish chiefs, hearing the news, went to the shore, purchased the timber of the broken ship, and engaged her captain, a skilful Greek architect, Becum by name, to help in the reconstruction of Kaaba. The foundation and walls were built, but a serious discussion arose regarding the spot where the sacred black-stone should be placed in the wall. On account of the difference of opinion the building was suspended for four of five days. The contention among the Korish preists became hot and was about to end in blood-shed, when an old Arab citizen declared "O Korish, hearken unto me, my advice is that the man who chanceth first to enter the court of the Kaaba by the yonder gate, he shall be chosen either to decide the difference amongst us or himself place the stone." The priests and citizens agreed to this proposal with acclamation and waited for the result. It happened that Mahammad was the first man to enter the gate. Seeing him they all exclaimed, here comes Al-Amin, the faithful; we are content to abide by his decision. Receiving the commission, calm and self-possessed, he tried to conciliate them all by taking off his mantle and spreading it on the ground, placing the stone

thereon and asking the chiefs to raise the four corners of the mantle. As they lifted the stone from the ground by holding the corners of the garment, Mahammad directed them with his own hand to the spot where it should be placed, and there it has stood for the succeeding centuries. The reflective mind of Mahammad at once realised that providence has singled him out to be the judge among his people in such a sacred matter. He felt for the people of Mecca, whose immorality and debasement became almost unbearable to him.

Mahammad's heart was longing for divine revealation and he wanted to know the true religion of God. So he retired to the solitary valleys and caves of mount Hira, about three miles north of Mecca. There he would live in a cave for days at a time, sometimes alone, sometimes with his wife Khadiza. This mountain range is stony and barren and has not one single green spot on it. The scenery was dry and dreary under the tropical sun, consequently there was no external attraction for our hero, but his whole soul was now absorbed in spiritual visions which naturally appeared to him. Sometimes he would remain motionless in ecstasy, sometimes he would burst forth in wild rhapsodical language. Sometimes he would repeat in beautiful Arabic poems with such sentiments: "Verily, the man is in the way of ruin excepting such as possesses faith." Sometimes he would pray for guidance to the Supreme Being, who alone, as he believed, could help him. Sometimes standing alone on the mountain top amid the stillness of death which reigned in the desert, he would repeat: "Praise be to God, the lord of all creations; the most merciful, the most compassionate, Ruler of the day of reckoning. Thee do we worship and invoke for

help. Lead us in the straight path."* No doubt such prayer rising from the sincere and earnest soul of Mahammad reached the throne of the Almighty.

In this manner he passed many years, now struggling for spiritual light, now receiving glimpses of Truth, now overtaken by darkness and doubt, again comforted by spiritual visions. Carlyle writes of Mahammad at this stage of life thus, "A silent great soul, he was one of those who cannot but be in earnest, whom nature herself has appointed to be sincere While others walk in formulae and hearsays, contented enough, to dwell there, this man could not screen himself in formulae; he was alone with his own soul and the reality of things. The great Mystery of Existence, as I said, glared in upon him, with its terrors, with its splendours; no hearsays could hide that unspeakable fact, "Here am I." Such sincerity, as we named it, has in very truth something of the divine. The word of such a man is a voice direct from Nature's own heart. Men do and must listen to that as to nothing else, all else is wind in comparison. From of old, a thousand thoughts, in his pilgrimings of, and wanderings, had been in this man. 'What am I? What is this unfathomable Thing I live in which man name universe? What is life; What is death? What am I to believe? What am I to do?' The grim rocks of mount Hira, of mount Sinai. The stern sandy solitude answered not. The great heaven rolling silent overhead with its blue glancing stars, answered not. There was no answer. The man's own soul, and what of God's inspiration dwelt there had to answer."

At last, at the age of forty, he received divine ins-

---

* Sura 1, introduction, Al-Fatihat.

piration, and realised that he was the prophet of his people. At this time Mahammad began to repeat verses which came to him as revealations and which were afterwards embodied in the Koran; in beautiful Arabic full of spiritual fire and wisdom, he would repeat them before his wife and friends and relatives. They would listen with attention and (realising that such beautiful verses coming from one who was utterly illiterate, who did not know how to read and write) they would admire the wonderful power that was playing through Mahammad. His first admirers were Khadiza, his wife and his two adopted sons Zeid and Ally and his bosom-friend Abu-Bekr. He felt a tremendous influence that was overwhelming his whole being, but at times he was not sure whether it was from God or some evil-spirits. During these moments of doubt Khadiza was his comfort and consolation. She would comfort him and confirm his faith in the Lord.

At last Gabriel, the messenger of God, appeared before him and approaching within two bow's length, brought from the most High the memorable Sura 96 which begins; "Recite in the name of thy Lord, who that created all things, who hath created man of congealed blood. Recite by thy most benificial Lord; who taught the use of pen; who teacheth man that which he knoweth not Assuredly. Verily, man becometh insolent, because he seeth himself abound in riches. Verily unto thy Lord shall be the return of all. What thinkest thou as to him who forbideth our servent, when he prayeth? What thinkest thou; if he follow the right direction; or command piety? What thinkest thou; if he accuses the Divine revealations of falsehood, and turn his back? Doeth he not know that God seeth? Assuredly. Verily, if he forbear not, we will drag him by

the forelock, the lying, sinful forelock. And let him call his council to his assistance ; we also will call the infernal guards to cast him into Hell. Assuredly, obey him not ; but continue to adore God ; and draw high unto Him."

Thus receiving the Divine commission from the Lord, Mahammad spoke literally in the name of Lord. For this reason every sura in the Koran begins with "Say," or "Recite." Now he became prophet and vicegerent of the Almighty.

But the people of Mecca did not recognise the Divine commission. He was scorned, abused and called by names. The people would treat him as one insane, as a sorcerer, as one possessed by evil-spirits and so on. Mahammad grieved, and dispirited, wearied and perplexed, stretched himself on a carpet covering his body with his garment and went into the trance of ecstasy. Again the angel appeared to him and commanded him to preach saying "Oh thou that are covered, arise and speak and magnify thy Lord."

Thus we see that Mahammad was not only an inspired prophet but was commissioned by the Lord to preach and summon his people to his religion. These visions are described to be as real as the morning dawn. From this time on revealations began to follow one after another until the last moment of his earthly career.

Mahammad's faith in the Lord become unbounded. He would not take one single step in his actions until he had received a direct command from the Above. When the command came the countenance of the prophet used to be troubled and he would fall on the ground senseless or go into a trance. Oftentimes the inspiration would come unexpectedly without giving any previous warning to him. Mahammad himself said when asked : "Inspiration

cometh in one of two ways; sometime Gabriel communicateth the revealation to me as one man to another; this is easy, and other times, it is like the ringing of the bell penetrating my heart and rending me; and this is which afflicteth me the most." It was on account of these violent inspirations that the hair of the prophet prematurely turned grey. All these revealations are termed the Koran or word of God, the literal meaning of the word being "what is read or recited."

At the age of 44 Mahammad became firmly convinced that he was the Prophet of God and all doubt vanished from his mind. Now Mahammad began to preach against Idol-worship and that "There is but one God and Mahammad his prophet." Disregarding the scorn and abuse of his relatives and of the people he went on preaching the truth and succeeded in adding to the small group of his admirers: viz. his wife, his two adopted sons and Abu-Bekar, his friend. There were 40 converts during the first four years; after three years of private preaching and solicitation the prophet made an open call to the Korish at large. But the Korish objected to this call because they were worshippers of the Idol of Kaaba. They thought that their forefather's religion, the worship of Kaaba, the glory of Mecca and the centre of piligrimage from all Arabia was in great danger. So the Korish were determined to crush the new religion of the prophet and force the followers to abandon it. Now terrible persecution began, hostility was excited and acts of violence, commenced. One of the followers of Mahammad retired with a group of believers to a valley near Mecca for prayer and meditation. On the way they met strong opposition from the unbelievers, ending in fight, and then it was that the first blood was shed in Islam by the

prophets follower Sad, who struck a man with a camel's goad.

As time went on, the followers of Mahammad began to increase in numbers and the jealousy and enmity of Korish were extremely aggravated by the success of the new sect. Mahammad himself being protected by his powerful uncle Abu-Talib remained safe and uninjured, but, his followers were terribly persecuted. Mahammad then commanded his followers to go to Abysinia; and in the 7th month of the 5th year of Mahammad's mission, eleven of his followers with their wives sailed in flight to Abysinia. This is termed the first Hegira. The korish pursued them in vain.

One of his followers then spoke to the Christian king of Abysinia regarding what Mahammad had done for them. "O King" said he, "We were an ignorant people, we worshipped images, ate dead bodies, were lewd, ill-treated our neighbours, and the strong despoiled the weak of their properties. We were long been in this condition when God sent a prophet to us from amongst our own people, whose noble birth, truthfulness, honesty and righteousness were well known to us. He called us to God, to wroship him and him only, and to leave off adoring the idols and stones before which our father and forefather knelt. He ordered us to obey God alone and not to make anyone His equal. He made it incumbent on us to offer up prayers, to give alms, to fast when not sick or travelling. He commanded us to speak the truth, to give back safe and whole what is entrusted to us by others, to be affectionate to our relations and k nd to our neighbours, to shun wicked acts, licentiousness and bloody quarrels: He told us not to bear false evidence, not to deprive orphans of their

properties, not to impute bad motives or be suspicious of women. We have taken his advice and admonitions to heart, have believed in his truthfulness, have followed all the orders which God has made known to us, and have believed in the unity of God. We abstain from what is forbidden, and confine ourselves to what is permitted.

Our people are infuriated at this change in our belief, thoughts and actions They have persecuted us, and done their best to force us back to the idols, images and wicked acts which we have left. When it became impossible to live among them, and when persecution and torture became unbearable, we left our country, and believing you to be a tolerant king have taken refuge in your dominions.'

In the meantime the revealations continued, and Gabriel appeared to Mahammad giving him all instructions regarding the doctrine of Islam such as the pictures of heaven and hell ; of the paradise, the celestial enoyments for the believers, and eternal hell fire for the unbelievers, the resurrection of the body etc.

Now the dispensation of Mahammad was called Islam (surrender of the soul to God) and his followers were named Mussalmans, that is, those who surrender themselves, and unbelievers were termed Kafir. At the age of 50 Mahammad lost his beloved wife Khadiza. So long the prophet was devoted to one wife although poligamy was the prevailing custom of Arabs and a month after this Abu-Talib the uncle and gaurdian of the prophet passed away. He was the prop of his childhood, the guardian of his youth and a tower of defence in his maturity. Now Mahammad was heart-broken. He had lost his best friend

---

Miracle of Mahammad, by Sheikh. H. Kidwai, pp 41-42

and the guardian. From this time on the persecation of the Qorish was directed towards the prophet himself.

At the age of 52 Mahammad, in a vision, being guided by Gabriel, his soul soared to the seventh heaven and appeared in the direct presence of the Almighty, who instructed him to pray five times in the day, instead of three. The Corish now plotted against the life of Mahammad; and so he fled to Median in June 622 A..D. arriving there on the 8th day (June 28th)at the age of 53. All of his disciples and followers, numbering about 100 deserted their homes in Mecca and went to Medina with the prophet; This is the 2nd Hegira.

In Medina he bought a place and within 7 months after his arrival built his first mosque or place for worship. It was called the mosque of Friday (Musjid-al-Juma) Friday became the Sabbath for public worship, because Mah ommad held his first service at Medina on Friday. Maho- mmad spent the rest of his life in Medina and many revealations came at this time.

In 630 A. D. The prophet entered into Mecca commanding 10,000 followers armed in battle-array; took possession of the Kaaba, destroyed the idols and triumphantly established the banner of Islam in the heart of Mecca. After the conquest of Mecca Mahommad said, "O Lord, I have delivered my message and discharged my ministry." Then he returned to Medina where he passed out at the age of 63 in the year 632 A. D., after suffering for two weeks from a severe attack of fever.

No prophet had ever suffered so much persecution nor

had shown so much firmness of faith and trust in the will of his Lord throughout his life and under all circumstances as was shown by the prophet of Arabia. His teachings were simple but full of fire which suited the warlike temper of the Arab nation.

Mahammad by his teachings changed the character of the lawless Arab tribes, gave them laws, made them law-abiding, and from disintagrated and warring factions, created a nation. No prophet could have done anything with these wild fanatical people of the desert of Arabia.

Mahammad preached the unity of God and unity of his prophet, whosoever believes this doctrine receives everlasting life and celestial happiness.

Regarding the glorious work of Mahammad Carlyle writes :—To the Arab nation it was as a birth from darkness into light ; Arabia first became alive by means of it. A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world ; A hero prophet was sent down to them with a word they could believe ; see, the un noticed becomes world-noticeable, the small has grown world-great ; within one century afterwards Arabia is at Grenada on this hand, at Delhi on that ; glancing in valor and splendor and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belief is great, life giving. The history of a nation becomes fruitful, soul-elevating, great, as soon as it believes. These Arabs, the man Mahammad and that one century, is it not as if a spark had fallen one spark, on a world of what seemed black, un-noticeable sand, but lo, the sand proves explosive powder, blazes heaven high from Delhi to Grenada."

চৈত্র সূচীপত্র ১৩৪৭

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীরামকৃষ্ণ	অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ...	২৯
২।	তিব্বতে বৌদ্ধ সংঘের গোড়ার কথা	শ্রীঅজিত ঘোষ	৩০
৩।	দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি	শ্রীমৎ শীলাচার ভিক্ষু	৩৮
৪।	অদ্বৈতবাদ	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৪
৫।	বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী বেদানন্দ	৫৩
৬।	স্বামী অভেদানন্দের চিঠি	...	...
৭।	Is Vedanta Pantheistic	Swami Abhedananda	19

শাস্ত্রের গৌরব আলোকই ধর্ম্মের যথার্থ প্রকাশক

সমস্ত ধর্ম্মের গৌরব-দীপ্ত প্রধান শ্রেণীর ধর্ম্ম-পুস্তকসকল বিক্রয়ের জন্য আমরা রাখিয়া থাকি।

১।	সাংখ্য দর্শন	১০	১৯।	পদ্ম পুরাণ	১॥০
২।	গীতার ভূমিকা	১।০	২০।	শিব পুরাণ	২॥০
৩।	বেদ প্রবেশিকা	২॥০	২১।	বিষ্ণু পুরাণ	১॥০
৪।	সরল সাংখ্যযোগ	।৵০	২২।	কল্কি পুরাণ	১।০
৫।	পাতঞ্জল যোগ দর্শন	৩॥০	২৩।	নারদ পুরাণ	১।০
৬।	যোগ সোপান	।৵০	২৪।	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	২॥০
৭।	কর্ম্ম তত্ত্ব	১৲	২৫।	বামন পুরাণ	২৲
৮।	বেদান্ত দর্শন ১ম---৪র্থ	৯৲	২৬।	অগ্নি পুরাণ	২৲
৯।	গুরু শাস্ত্র	॥৵০	২৭।	মার্কণ্ড পুরাণ	১॥০
১০।	পাতঞ্জল দর্শন	২॥০	২৮।	ধর্ম্ম পুরাণ	২৲
১১।	সাঙ্খ্য সূত্রম্	১৲	২৯।	ভক্তমাল মহাগ্রন্থ	২॥০
১২।	পরলোক রহস্য	।৵০	৩০।	সটীক দশকর্ম্ম পদ্ধতি	১৲
১৩।	বেদান্ত সার	॥৵০	৩১।	শ্রীরামকৃষ্ণ দেব	২৲
১৪।	মহাভারত	২॥০	৩২।	বিবেকানন্দ চরিত	৩৲
১৫।	রামায়ণ	১॥০	৩৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম-৫ম)	৭॥০
১৬।	শ্রীমদ্ভাগবত	১২৲	৩৪।	স্বামী অভেদানন্দ (জীবনী)	৴০
১৭।	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	১॥০—৩৲	৩৫।	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (")	৬৲
১৮।	চৈতন্য চরিতামৃত	২॥০	৩৬।	আত্মজ্ঞান (স্বামী অভেদানন্দ)	৸০

ইহা ছাড়া আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলার উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা,— ফোন বি, বি, ৩৮৭৫

INDIA AND HER PEOPLE

Swami Abhedananda

(New impression)

"This book has more than usual interest as coming from one who knows the Occident and both knows and loves the Orient...It is decidedly interesting···The book has two admirable qualities : breadth in scope and suggestiveness in material."

—*Bulletin of the American Geographical Society*

Demy 8vo. Excellent get-up. Cloth Rs. 3/-

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :— ৩নং হেষ্টার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলি: ২১২৫ ও ৬৪৮৩

কলিকাতা শাখা :	বঙ্গদেশে শাখা :	বঙ্গের বাহিরে :
শ্যামবাজার	নৈহাটি, ভাটপাড়া,	গোধূলিয়া,
সাউথ ক্যালকাটা	সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর	বেনারস।

সুদের হার :—

কারেন্ট একাউন্ট	...	১½%
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউন্ট	...	৩%
স্থায়ী আমানত	...	৪% হইতে ৬%

অংশীদারগণকে শতকরা ৬।০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের জন্য :—

১। "বিশ্ববাণীর" ফাল্গুনে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

২। বিশ্ববাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০; ছয় মাসের জন্য ১॥০; প্রতি সংখ্যা।০, চার আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠান হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক মূল্য ২৸০, ষাণ্মাষিক ১।৵০, প্রতি সংখ্যা।১৲।

৩। গ্রাহকগণের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন, বেশী দিনের জন্য হইলে বাঙ্গালা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। কোন কিছু জানিতে হইলে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা টিকিটসহ পত্র দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। টাকাকড়ি চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধাদি **বিশ্ববাণী**, কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ববাণী

৩য় বর্ষ | চৈত্র—১৩৪৭ | ২য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ভারত-ধর্ম্মের ধারা বহুমুখী, বহুপ্রসারিত
বহুরুচি, বহুপথ, বহুভেদ, বহুমতাম্বিত
মিলেছে তোমার চিত্তে সাগরে তটিনী-ধারা সম,
হে গভীর মহাম্বুধি, অপার ঔদার্য্য অনুপম!
আত্মভোলা শিশু তুমি জ্ঞানভোলা হে ঋষি মহান্‌
জড় স্তব্ধ দেশধর্ম্ম তোমাতে লভিল নবপ্রাণ!
'মানবে মানবে মিত্র, পতিতে আছেন নারায়ণ,
ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদ নাই, প্রেমসূত্রে বাঁধা জীবগণ'—
এ অমূল্য বাণী তুমি অসার কলহময় দেশে
সঞ্জীবনী-সুধা সম বিতরিলে সবার উদ্দেশে।
নবপ্রেমে নবধর্ম্মে নবকর্ম্মে যে নব ভারত
আজিকে উদ্বেল দেখি, নব সত্যে জাগায় জগৎ,
তাহা যে তোমারি দান, তোমারি ভাবের মূর্ত্ত ছবি
বিবেক-আনন্দ যোগী, সে যে কাব্য তুমি তারি কবি।
সে তব মানসপুত্র জগতে দাঁড়াল জ্যোতির্ম্ময়,
তব প্রেমসাম্যমন্ত্র ভেরীরবে ঘোষিল দুর্জ্জয়।
তোমারে প্রণাম করি, নরদেব প্রেমিক উদার
কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্যের অভিনব সৌম্য অবতার॥ *

---

* ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ছাত্র সম্মিলনীর শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে পঠিত।

তিব্বতে বৌদ্ধসঙ্ঘের গোড়ার কথা

শ্রীঅজিত ঘোষ

তখন সবেমাত্র নালন্দার গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হয়েছে। উত্তর-ভারতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যও তখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভারতের বৌদ্ধসঙ্ঘও তখন বেশ শক্তিশালী। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের কথা। বৌদ্ধসঙ্ঘের চিন্তা ও কর্মধারায় এক প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এল। যে কর্মবাদ ও আদর্শকে মুখ্য করে প্রিয়দর্শী অশোকের ধর্মাভিযান চলেছিল, প্রচার ও সংগঠনের ক্ষেত্রে তারই বেদনা আবার সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল। ফলে দেখা গেল, ভারতীয় শ্রমণেরা বৌদ্ধসঙ্ঘের বাণী নিয়ে দেশে দেশে, ভারতের বাহিরে সুদূর দেশের প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়েছেন। এই কর্মতৎপরতা মহাযান বৌদ্ধদের ভিতরেই বেশী এসেছিল। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে, অন্ততঃ বৃহত্তর ভারতে জম্বুদ্বীপের সবটুকুতে এক ধর্মরাজ্যের সংগঠন করবেন। এই নবঅনুপ্রেরণার ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকার্য প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠল। ওদিকে সিংহলে অনুরাধপুরকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধসঙ্ঘ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সেখানেও এক নবীন ধর্মাভিযানের সাড়া পড়ে গেছে। গুজরাত হতে দক্ষিণ ভারতে হীনযানেরা বেশ শক্তি সঞ্চয় করছে। এজন্য হিমালয়কে অতিক্রম করবার বাসনাই মহাযানদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। অবশ্য এর আগে গান্ধারের তক্ষশিলা হতে অনেকটা প্রভাব হিমালয়ের ওপারে গিয়ে পড়েছিল। তবুও দেখা গেল, এযুগের বৌদ্ধ শ্রমণেরা নেপাল ও তিব্বত হয়ে মহাচীনের ভিতর অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য এর আগেই মহাচীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাভ করেছে এবং তার ফলেই এই শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্ ভারতে এসেছিলেন। বৌদ্ধ তন্ত্রযান ধারণী ও মণ্ডলগুলি তখন বেশ ধীরে ধীরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষতঃ বিনায়ক-তন্ত্রে তখন বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব এসে পড়েছিল। সেই তন্ত্র এক দিন তিব্বতে গিয়েও পৌঁছিল। কিন্তু কে নিয়ে গেলেন? কেহ কেহ বলেছেন, যশোগুপ্ত, বুদ্ধনন্দী-প্রমুখ পাঁচ জন বৌদ্ধ শ্রমণ ৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল হতে ভারতের মধ্য দিয়ে চীন যাবার পথে তিব্বতে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভব তাঁদের হাতে বিনায়কতন্ত্র ছিল। তখন প্রায়ই তিব্বতের মত দুরধিগম্য পার্বতীয় প্রদেশ অতিক্রম করে চীনে যাতায়াত চলত। সেই যাতায়াতের পথে হয় ভারতের শ্রমণেরা, না হয় চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অনেকটা প্রভাব আনতে পেরেছিলেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচারে নালন্দাসঙ্ঘের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশী। তখন নালন্দা হতে বেশ সহযোগিতা করা হত বলেও মনে করা হয়। তবে এর কিছু পরে নালন্দাসঙ্ঘ নিজেরাই উৎসাহী হয়ে কাজে নেমেছিলেন। তাঁদের সে কর্মক্ষেত্র ক্রমেই প্রসার লাভ করতে থাকে। ক্রমে নালন্দার ঐতিহাসিক যুগ ৭ম শতাব্দী এসে পড়ল। নালন্দার সমীপে মগধের নালন্দা পরবর্তী শিক্ষাকেন্দ্র বিক্রমশিলার তখনও আবির্ভাব হয় নি। য়ুয়ন্-চোয়ঙ, ঈ-চিঙ প্রমুখ চীনা পরিব্রাজকেরা যখন নালন্দায় এসেছিলেন তার কিছু আগেকার কথা। সমগ্র জম্বুদ্বীপে তখন নালন্দার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। নালন্দার ভিক্ষু ও স্নাতকদের একান্ত চেষ্টায় ও ক্রমবর্ধমান প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে সংস্কৃতি, শিক্ষা ও দীক্ষা দেখতে দেখতে তিব্বত হতে কোরিয়া ও চীনা তুর্কীস্থান, ওদিকে মহাচীন, জাপান ও সুদূর প্রাচ্যে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করল।* এরকম ক্রমবর্ধমান অবস্থায় এমন একটা যুগ এসে পড়েছিল যখন হিমাচলের ওপারে বহির্ভারতীয় দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠায় তিব্বত প্রধানতম সহায়ক কেন্দ্র হয়েছিল। এমন কি, কিছুকাল পরে এমন একটা সময়ও এসেছিল যখন ভারতে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম শক্তিহীন হয়ে পড়ছিল, তখন তিব্বতের বৌদ্ধসঙ্ঘ অতঃপর তিব্বত বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হবে এরূপ আশা পোষণ করেছিলেন। যাহোক, ৭ম শতকে বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রসাধনা তখন বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৌদ্ধ ধারণী ও গুহ্যসমাজের গোপন রহস্য যখন নেপাল ও তিব্বতের পথে এন্‌দেয়ারে, দন্দান-উইলিগ্‌ ও তুন্‌-হুয়াঙ হয়ে মহাচীন ও জাপানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তিব্বত সে তন্ত্রের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে নি। ক্রমে এই তন্ত্রযানের প্রভাবে তিব্বতের বৌদ্ধসঙ্ঘ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই তন্ত্রের কতটুকু প্রভাব নালন্দা হতে এসেছিল তা হয়তো প্রতিপন্ন করা যাবে না, তবে বৌদ্ধধর্ম যে নালন্দারই প্রভাবে তিব্বতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সে বিষয়ে দ্বিমত পাওয়া যায় না। এর জন্য নালন্দার প্রচারকদের নিশ্চয়ই তিব্বতীয় ভাষা শিখতে হয়েছিল এবং প্রয়োজনানুসারে বৌদ্ধ পিটক-সূত্র ও শাস্ত্রগুলিও নিশ্চয়ই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করতে হয়েছিল।

একথা সত্য যে, য়ুয়ন্‌-চোয়ঙের ভারতাগমনের পূর্ব হতেই এশিয়াখণ্ডের নানা দেশের ছাত্র ও পরিব্রাজক নালন্দায় আসতেন। নিশ্চয়ই একে নালন্দার প্রচারকার্যের ফল বলতে হবে।— অবশ্য রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ছিল, কিন্তু সংস্কৃতির আদানপ্রদান যে বৃহত্তম আদর্শের দিক দিয়ে বিবেচনা করা হত—সে কথাই প্রথমে চিন্তা করা দরকার। এ-বিষয়ে ভারতবাসীরা যে কতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, অজন্তার চিত্রসমাবেশে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ উদ্দেশ্য ছাড়া মূল উদ্দেশ্য কিন্তু প্রচারক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। ভারতের জ্ঞানপিপাসু

প্রচারকেরা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বাহন করে বুদ্ধের বাণী দেশদেশান্তরে নিয়ে যেতেন। শত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁদের এই ধর্মাভিযান চলেছিল। অনেকে হয়তো স্বদেশে ফিরতে পারেন নি—ইতিহাসের পাতায় তাঁদের পরিচয় দেখবার সুযোগ নেই। সে যাই হোক, এই প্রচারকেরা শুধু প্রচার করেই ক্ষান্ত হতেন না, যেখানে যেখানে প্রচার করতেন সে-সব স্থানের সুধী-মনীষী ও শিক্ষার্থীদের নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ করতেন ভারতের শিক্ষা, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। এরই ফলে ভারতের বাহিরের দেশগুলি হতে ছাত্র ও মনীষীরা এদেশে আসতে থাকেন। ভারতের শিক্ষাপীঠগুলিতে তাঁদের এই গতায়াত ক্রমেই বেড়ে চলে—নালন্দায় এসে তাঁদের শিক্ষার পূর্ণ সার্থকতা হত। প্রায় সকল বিদেশীরই তখন এমন ধারণা হয়েছিল যে, নালন্দার শিক্ষা-সমাবর্তন না হলে যেন স্নাতক হওয়া সম্ভবপর হত না।

ভারতবাসীদের তথাকথিত প্রচারকার্যের ফলে ও নালন্দার গৌরবাধিষ্ঠানের গুরুত্ব গ্রহণ করেই প্রথম তিব্বতীয় শিক্ষার্থী থোন্‌মি-সম্ভট নালন্দায় এসেছিলেন। হুয়েন্‌-চোয়ঙ যখন নালন্দায় আসেন তার আগেই থোন্‌মি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিব্বতরাজ স্রঙ-সন্‌-গম্‌-পো তাঁকে ভারতীয় লিপিবদ্যা ও ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলি শেখবার জন্য ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া তিব্বতরাজের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, থোন্‌মি বৌদ্ধধর্মের এবং ভারতীয় শিক্ষা ও চিন্তাধারার যথাযথ সত্য ও তথ্য তিব্বতে নিয়ে আসতে পারবেন। থোন্‌মি ছিলেন তিব্বতরাজেরই মন্ত্রী অনুলের পুত্র, অবশ্য উত্তরকালে তিনিও মন্ত্রী হয়েছিলেন। এখন, তিব্বতরাজ স্রঙ-সনেরও কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম দিকে তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন না এবং খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর বড় একটা অনুরাগ ছিল না। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠায় তিনি যে উৎসাহী হয়েছিলেন তার গৌরব একরকম তাঁর চীনা পত্নী ওয়েন্‌-সেঁঙেরই প্রাপ্য। ওয়েন-সেঁঙ ছিলেন চীনের তঙ-বংশীয় সম্রাটের কন্যা। ৭ম শতকের প্রথম দিকে স্রঙ সন্‌ যখন চীন আক্রমণ করেন তখন তিনি ওয়েন্‌-সেঁঙকে বিবাহ করেন। এ বিবাহে না কি চীন-সম্রাটের সম্মতি ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন বৌদ্ধ—অন্য কারণও থাকতে পারে। ওয়েন-সেঁঙ তিব্বতরাজকে বিবাহ করে তাঁকে বৌদ্ধধর্মগ্রহণে বাধ্য করেন। এছাড়া এক জন নেপালী বৌদ্ধ রাজকুমারীও তাঁর মহিষী ছিলেন। এই দুজন মহিষীর দ্বারাই স্রঙ-সন্‌ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। স্রঙ-সন্‌ বেশ পত্নীবৎসল ছিলেন বলেও মনে হয়। কারণ, পত্নীদের দ্বারাই তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হতেন। অনেকের মতে চীন থেকে প্রথম তিব্বতে সভ্যতার আলো প্রবেশ করে। এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে ওয়েন্‌-সেঁঙ চীনা সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন তিব্বতে আমদানী করেছিলেন। চীনের শিল্পকলার অনেক-কিছু তিনি তিব্বতে

প্রচলন করেন। তিনি নিজেও কয়েকটী শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন। থোন্‌মিকে ভারতে পাঠানর ব্যাপারেও তাঁর খুব হাত ছিল, অবশ্য নেপালী রাজকুমারীর প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া এই দুই মহিষীর পরামর্শক্রমেই স্রঙ্-সন্ লাসা নগরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বৌদ্ধকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চীনা শ্রমণ হুয়েন্-চাঙ যখন শিক্ষার্থিরূপে নালন্দার পথে অগ্রসর হন তখন তিব্বতের মধ্য দিয়ে ভারতে আসবার পথ ওয়েন্-সেঙই তাঁকে দিয়েছিলেন।

যাহোক, তিব্বত ত্যাগ করে নেপালের মধ্য দিয়ে থোন্‌মি ভারতের বুকে এসে পড়লেন। কিন্তু ক্রমাগত চলতে চলতে তিনি একেবারে দক্ষিণভারতে হাজির হলেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ লি'পদত্তের কাছে জ্ঞানমার্গের প্রথম স্তরের শিক্ষা লাভ করে 'নাগরী' ও 'গাথা'র অক্ষরবিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তারপর তিনি আসেন নালন্দায়। এখানে তিনি আচার্য দেববিৎসিংহের শিক্ষাধানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রনিচয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। নালন্দা হতে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করে এবং শাস্ত্রাদি সঞ্চয় করে তিনি স্বদেশে ফিরেছিলেন, অন্য কোন তিব্বতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে সেরূপ ঘটেছিল কি না জানি না। তিনি যখন নালন্দায় তখন হুয়েন্-চোয়ঙ সেখানে এসেছিলেন এবং শিক্ষার্থিরূপে অনেক দিন বাসও করেছিলেন। হুয়েন্-চোয়ঙের সঙ্গে সতীর্থরূপে তাঁর পরিচয় ঘটা খুবই স্বাভাবিক এবং হুয়েন্-চোয়ঙের সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও শিক্ষানুশীলনের অভিজ্ঞতার পরিচয় নিশ্চয়ই তিনি কিছু-না-কিছু গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, রাজপৃষ্ঠপোষকতায় ও রাজকর্তৃক যখন তিনি ভারতে প্রেরিত হয়েছিলেন তখন স্বদেশে ফিরে তিনি তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দেশের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

থোন্‌মি যখন নালন্দায় আসেন তখন বৌদ্ধ-সাহিত্যে ও জীবনে হিন্দু-তন্ত্রের প্রবেশলাভ ঘটেছে। বৌদ্ধরা তখন হিন্দুদের শক্তি-পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছেন। ফলে বৌদ্ধ দেবগোষ্ঠির মধ্যে এমন সমস্ত দেবতার আবির্ভাব হল যাঁদের মূর্তিপরিকল্পনায় নিজ নিজ শক্তি-পরিকল্পনাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই সময়েই বৌদ্ধ 'গুহ্যসমাজে'র আবির্ভাব হয়। সেই গুহ্যসমাজের 'মণ্ডলে' পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নিজ নিজ শক্তির উদ্ভব হল। একথা সত্য যে, হিন্দু দেবদেবীর মধ্য হইতেই সমবধারণার ভাবনা নিয়ে বুদ্ধের এই সমস্ত মূর্তি ও বিশেষতঃ শক্তিগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবেই বৌদ্ধদের মধ্যে 'যোগাচার'-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই গুহ্যমত বা যোগাচারের সাধনা ৬ষ্ঠ শতকে উদ্ভব হয়েছিল বটে, কিন্তু তার সুপ্রতিষ্ঠা ৭ম শতকেই হয়। সুতরাং থোন্‌মি যখন ভারতপ্রবাসে তখন বৌদ্ধরা 'সমাধি'র সাধনায় যোগাভ্যাসের আশ্রয় নিয়েছেন। নালন্দাতেও সেই যোগাচারমতের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। থোন্‌মি সেই যোগাচার-তন্ত্রও শিক্ষা করেন। তার পর তিনি দেশে ফিরে,

যান। যাবার সময় তিনি অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুলিপি ও শক্তিপূজা-সম্বলিত অনেক তন্ত্রের পুঁথিও নিয়ে গিয়েছিলেন। মজার কথা এই যে, এর আগেই নেপাল হতে তিব্বতে যোগাচারের প্রবেশলাভ ঘটেছিল। সম্ভবতঃ তিব্বতের যোগাচার-তন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য থোন্‌মিকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছিল। হুয়েন্‌-চাঙ যখন নালন্দা হতে তন্ত্রশিক্ষা নিয়ে স্বদেশের পথে অগ্রসর হন তখনও তাঁকে নেপাল ও তিব্বতের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। তিব্বতে গিয়ে তিনি শক্তি-সংস্কৃতির প্রভাব ও যোগাচার-তন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতের যোগাচারের সঙ্গে তিব্বতের যোগাচারের যে একটা পার্থক্যও এসে গিয়েছিল তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

থোন্‌মির স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তিব্বতের বৌদ্ধ-তন্ত্র আরও একটু শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লাসায় এই যোগাচার-সাধনার কেন্দ্র করা হয়। তিব্বতের বৌদ্ধপ্রধান 'লামা'রা সেই তন্ত্রসাধনার কর্ণধার হয়ে ওঠেন। এর পর ৭ম শতকে তিব্বতের ইতিহাসে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। ৮ম শতকের প্রথম পাদে নালন্দার শ্রমণ চন্দ্রগোমী বৌদ্ধপ্রচারকরূপে তিব্বতে উপস্থিত হন। নালন্দা থেকেই তাঁকে তিব্বতে পাঠান হয়েছিল। তিব্বতের বৌদ্ধসঙ্ঘ তখন তন্ত্রসাধনায় বেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। জ্ঞানমার্গের পথে ধর্মকে আয়ত্ত করা এবং সেই ধর্মকেই আশ্রয় করে প্রকৃত জ্ঞান ও সমুন্নত সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার পথ যোগাচার-সংস্কৃতির প্রসারে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এদিকে ভারতের বৌদ্ধসঙ্ঘও তখন হিন্দুদের পুনরভ্যুত্থানে ধীরে ধীরে অবনতির দিকে চলেছিল। খুব সম্ভব এই অবনতির পথে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একটা সঙ্গতি আনবার জন্য হিন্দুর শক্তি-সংস্কৃতিকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। তবুও নালন্দাসঙ্ঘ যোগাচার-সাধনা গ্রহণ করলেও তাঁদের প্রাচীন ধারাকে বিসর্জন দেন নি। প্রাণপণে তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। বোধ হয়, তিব্বতের ধর্মজীবনেও একটা সঙ্গতি আনবার জন্য চন্দ্রগোমীকে পাঠান হয়েছিল। অবশ্য হিন্দু ও বৌদ্ধের কোন প্রশ্ন সেখানে ছিল না। তিব্বতে তখন এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানমার্গের পথই চাইতেন। শাস্ত্র ও জ্ঞানকে আশ্রয় করে সংস্কৃতির ক্রম প্রগতির সাধনাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। খুব সম্ভব এই অবস্থায় একটা সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল! চন্দ্রগোমী তিব্বতে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং অনেক পণ্ডিতও সে-কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সুতরাং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন তা যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল এরূপ মনে করা যেতে পারে।

চন্দ্রগোমীর পরেই শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের নাম পাওয়া যায়। দুজনেই নালন্দার ভিক্ষু ও বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। শান্তরক্ষিত ছিলেন বাঙালী, বাঙলার এক রাজবংশে তাঁর

জন্ম হয়েছিল; পদ্মসম্ভব ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। এঁদের দুজনের মধ্যে কে আগে এসেছিলেন তা ঠিক করে বলা যায় না। তবে দেখা যায়, দুজনেই সমসাময়িক; তিব্বতে শান্তরক্ষিতের কর্মজীবনে পদ্মসম্ভব তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বোধ হয়, পদ্মসম্ভবই আগে এসেছিলেন; কারণ তাঁর কর্মক্ষেত্রে শান্তরক্ষিতের নাম পাওয়া যায় না। স্রঙ-সন্‌-গম্‌-পোর পৌত্র তিব্বতরাজ খি-স্রঙ-দে-সন্ তাঁদের নালন্দা থেকে আনিয়েছিলেন। এই খি-স্রঙ-দে-সন্‌কেই তিব্বতের ইতিহাসে সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ নৃপতি বলে অভিহিত করা হয়। ৭৫০ হতে ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শান্তরক্ষিত তিব্বতে আসেন। তিব্বতে উপস্থিত হলে তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনায় সম্মানিত করা হয়। এর অব্যবহিত পরেই তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে তিব্বতের প্রথম সম্-য়ে বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়। ভারত হতে আনীত শাস্ত্রনিচয় এই বিহারে রক্ষা করা হয়েছিল। শান্তরক্ষিতই এই বিহারের প্রথম সঙ্ঘাধ্যক্ষ হন এবং সেখান হতেই ৭৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একনিষ্ঠ উৎসাহে ধর্মসংস্কার ও ক্রমোন্নয়নে ব্যাপৃত থাকেন। এই বিহারের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠায় তিব্বতরাজ এবং ভিক্ষু পদ্মসম্ভবের আগ্রহ ও উৎসাহই ছিল সর্বাধিক। তখন তিব্বতে পদ্মসম্ভবের অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা। সেখানে তাঁর নাম ছিল গুরু রিন্‌পোচে। লামার লামাদের মধ্যে তাঁর আসনও ছিল শ্রেষ্ঠ, এমন কি, তাঁকে অমিতাভ-বুদ্ধের অবতারও বলা হত। আবার কখনও বা তাঁর মধ্যে দলাই-লামার আবির্ভাব কল্পনা করা হত, অবশ্য তাঁর এই প্রতিষ্ঠার পরিণতি ঘটেছিল শান্তরক্ষিতের মৃত্যুর পরে। যতদিন শান্তরক্ষিত ছিলেন ততদিন পদ্মসম্ভব তাঁর সহযোগিরূপেই কাজ করেছিলেন। শান্তরক্ষিতের মৃত্যু হলে তিনি তিব্বতের সর্বপ্রধান লামার আসন লাভ করেন। তারপর তাঁর সুপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

খি-স্রঙ বরাবরই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, বিশেষতঃ চীনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল বেশী। কিন্তু তবুও তিনি দেশের ধর্মসংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পরাঙ্মুখ হতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে বৌদ্ধসঙ্ঘ তো ক্রমেই শক্তিহীন হয়ে পড়ছে;— এখন তিব্বতকেই বৌদ্ধজগতের কেন্দ্রস্থল করে তুলতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যতখানি তিনি ধর্মসংস্কারে আত্মনিয়োগ করতে চাইতেন, যুদ্ধের পর যুদ্ধে সে আগ্রহ সফল হতে পারে নি। এভাবে যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়েই তাঁর জীবনের অবসান হয়। অতঃপর তাঁর পুত্র ভে-চিল্-জি-সন্ সিংহাসনারোহণ করে চীনসম্রাট টৈ-সঙের সঙ্গে সন্ধি করেন। তিব্বতের সঙ্গে চীনের এই দ্বিতীয় সন্ধি। এই সন্ধির কথা লাসার দো রিঙে এখনও লিপিবদ্ধ আছে। ভে-চিল্-জি-সনের সাম্যবাদের দিকে ঝোঁক ছিল খুব বেশী। তিব্বতের ইতিহাসে তাঁকে সর্বপ্রধান সাম্যবাদী নৃপতি বলা হয়েছে। তাঁর আদর্শ হল, সকল লোকেই সমান;

সুতরাং সকলের সমান অবস্থায় আসা উচিত। এরূপ তিনি আদেশ দিলেন, যারা বিত্তশালী তারা তাদের বিত্তের অংশ দরিদ্রদের দিক—তাতে সকলেই একটা সাম্য অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। আদর্শ উচ্চ হলেও যথাযথ ফল পাওয়া গেল না। আরও দুবার তিনি চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। ফলে সে উদ্দেশ্য তিনি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তখন তিব্বতে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য খুব বেশী রকম ছিল; তার ফলে বৌদ্ধ ধর্মজীবনের উচ্চতর আদর্শে যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হত।

৯ম শতক হতে তিব্বতের দুঃসময়ের সূত্রপাত হয়। আবার চীনের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হল। দেখতে দেখতে মোঙ্গলদের সঙ্গেও যুদ্ধ বেঁধে গেল। এমনি যুদ্ধবিগ্রহের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমে তিব্বতরাজবংশে অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হল। এভাবে চলতে চলতে শতাব্দীর একেবারে শেষে ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লঙ-দর্ম তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেন। আবার লঙ-দর্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রল্-প-চন্ লঙ-দর্মকে হত্যা করে বসলেন। লঙ-দর্ম ভ্রাতৃহত্যা করে যে বিরোধ ও অশান্তির সূচনা করেছিলেন তার ফল তিব্বতের বৌদ্ধসঙ্ঘকে সাময়িকভাবে বেশ পঙ্গু করে ফেলেছিল। তাই লাসায় এখনও সেই ভ্রাতৃহত্যার স্মৃতি পালন করা হয়। প্রতি বর্ষেই সেই দিন এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যার স্মৃতি-পালনার্থ নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। যাহোক, উক্ত অন্তর্কলহের ফলে তিব্বতের রাজশক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অখণ্ড তিব্বতরাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে কতকগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হল। ১০ম শতকের শেষ দিকেও দেখা গেল, তিব্বতে চার জন রাজা রাজত্ব করছেন। ১১শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বিরোধ অব্যাহত ছিল।

এদিকে নালন্দায় ভাঙনের যুগ এসে পড়ল। মগধরাজ্যেরই মধ্যে নালন্দার কাছাকাছি বিক্রমশিলায় আবার একটা নূতন শিক্ষাকেন্দ্রের অভ্যুদয় হল। দেখতে দেখতে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি নালন্দার বেশ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। এমন কাছাকাছি আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্রের কেন প্রয়োজন হল তার সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। নীতিগত বৈষম্য নিয়ে যে বিক্রমশিলা-বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এমন কথা বলা চলে না। যে কারণে খৃষ্টীয় ৭ম শতকে গুজরাতের বলভী-শিক্ষাপীঠ গড়ে উঠেছিল, সে-কারণে যে বিক্রমশিলার প্রতিষ্ঠা হয় নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিক্রমশিলা নালন্দারই মত বৌদ্ধ মহাযানশাখার অন্তর্ভুক্ত—বলভীর মত হীনযানপন্থী ছিল না। এছাড়া গুজরাতের কাঠিয়াবাড় হতে নালন্দার দূরত্ব অনেকখানি। সুতরাং বলভীর অভ্যুদয়ের সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এমন কি কারণ ঘটেছিল যাতে নালন্দার কাছাকাছি একই নীতি ও পর্যায়ভুক্ত স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বি-শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজন হল? আরও একটু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতকের মাঝামাঝি বাঙলার পালরাজ ধর্মপাল বিক্রমশিলা প্রতিষ্ঠা করবার পর থেকে বিক্রমশিলাই

পালরাজগণের সর্বাঙ্গীন পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে, নালন্দাসঙ্ঘ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা তো পানই নি—বরং পাল-নৃপতিদের নির্দেশে বিক্রমশিলার আচার্যসঙ্ঘকে নালন্দার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত। এই রাজবিদ্বেষের বিরুদ্ধে নালন্দাসঙ্ঘ যে ভাবে আরও দীর্ঘ তিন শ' বছর অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন, সেটুকু যে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণ গৌরবের বশেই সম্ভব হয়েছিল একথা খুবই সত্য। এই তিন শ' বছর পরে নালন্দা ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পতনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল—কোন রকমে অস্তিত্বটুকুই বজায় ছিল। পক্ষান্তরে স্তরে স্তরে বিক্রমশিলার গৌরব ও সমৃদ্ধি বেড়ে চলল, শেষে খ্রীষ্টীয় ১১শ—১২শ শতকে এমন অবস্থায় এল যখন আর নালন্দার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন হয় না। বিক্রমশিলার উদ্ভব, নালন্দার ও বিক্রমশিলার এই বিরোধের রহস্য এবং পরিশেষে নালন্দার পতনের নিগূঢ়তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোন সত্যই আবিষ্কার করা যায় নি। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেছেন, তন্ত্রকে গ্রহণ করেই নালন্দার পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল; কারণ তন্ত্রসাধনায় পরাবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনে বাধা জন্মে। নালন্দার আসল লক্ষ্য ছিল অনুশীলনসাধ্য অপরাবিদ্যার দিকে; সুতরাং নালন্দার পতন হওয়া স্বাভাবিক। এই অনুমান কিন্তু স্বীকার করা যায় না, কারণ তা হলে অপরাবিদ্যাকে গ্রহণ করে, রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেও বিক্রমশিলার উন্নতি সম্ভবপর হত না। আরও একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। সে যুগে তন্ত্রের দুটি ধারা ছিল—একটা ছিল আচারসিদ্ধ, আর একটা দার্শনিক রীতি ও নীতিকে অবলম্বন করেছিল। আচারসিদ্ধ তন্ত্র বাঙলার নিজস্ব-যোগসাধনার অভ্যাসকের পথ তাকে প্রশস্ত। বিক্রমশিলায় তার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল যথেষ্ট। নালন্দা কিন্তু সে প্রভাব স্বীকার করতে পারে নি; এ-কারণে বঙ্গরাজশক্তির আনুকূল্য লাভ করাও বোধ হয় অসম্ভব হয় নি।

যাহোক, নালন্দা-ইতিহাসের এই দীর্ঘ দুঃসময়ে নালন্দা হতে আর বিদেশে প্রচারকদের পাঠান বড় একটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। সেক্ষেত্রে তিব্বতেও শান্তরক্ষিতের পরে আর প্রচারক না যাওয়াই স্বাভাবিক। ওদিকে তিব্বতের রাষ্ট্রীয় অবস্থাও অনুকূল ছিল না। তবুও যদি তিব্বত হতে কোন আমন্ত্রণ নালন্দায় আসত, তাহলেও নালন্দার পক্ষে সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হত। ইতিমধ্যে বিক্রমশিলায় কোন আমন্ত্রণ এসেছিল বলে মনে হয় না, বিক্রমশিলা থেকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাহাকেও পাঠান হয় নি। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে বিক্রমশিলা বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে—বিক্রমশিলার তখন স্বর্ণযুগ বললেও চলে। বৌদ্ধভারতের কেন্দ্রভূমি মগধও তখন আবার শান্ত অবস্থা ধারণ করেছে; নালন্দার গৃহে গৃহে, জনবিরল বীথি ও প্রাঙ্গণতলে, আম্রকুঞ্জে অতীত স্মৃতির নিঃসহায় পুঞ্জীভূত বেদনা প্রায় স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এমনি সময় এবার বিক্রমশিলায় তিব্বতরাজের পক্ষ হতে প্রচারক বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রেরণের জন্য অতি সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ উপস্থিত হল। [ক্রমশঃ]

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি

পণ্ডিত শ্রীমৎ শীলাচার ভিক্ষু, বিনয়সূত্র বিশারদ,
অধ্যাপক নালন্দা বিদ্যাভবন কলিকাতা।

দেবাদিদেব, ব্রহ্মাদিব্রহ্ম, ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ত্রিতাপ-দগ্ধ দেব মানবের হিতসুখ কামনায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া অশীতি বৎসর বয়সে বৈশাখী-পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনীতে কুশীনারার মল্লদের সুরম্য শাল-উদ্যানে যুগ্ম শাল-তরুতলে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর হইতে এই সুব্যাখ্যাত নৈর্ব্বাণিক ধর্ম্মের মূলে দুর্নীতির কীট প্রবেশ করে; তা'ই তাঁহার পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেই প্রথম ধর্ম্মসঙ্গীতির আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। আবার ন্যূনাধিক একশত বৎসরের মধ্যে বৈশালীবাসী দুর্ম্মতিপরায়ণ ভিক্ষুরা সুনির্ম্মল বুদ্ধ শাসনের কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাই পুনরায় দ্বিতীয়বার ধর্ম্ম-বিনয় সঙ্গায়নের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের একশত বৎসর পর বৈশালীবাসী দুর্ম্মতিপরায়ণ বৃজিপুত্রভিক্ষুরা বৈশালীতে দশ বস্তুর (দশ প্রকার আচরণ যাহা ভিক্ষুদের বর্জ্জনীয়) প্রবর্ত্তন করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:

১। কপ্পতিসিঙ্গীলোণকপ্পো। "যেখানে লবণের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে ব্যবহার করিবার জন্য শৃঙ্গাধারে লবণ লইয়া যাইতে পারেন।" [শ্রাবস্তীতে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "সন্নিধিকার ভোজনে পাচিত্তিয়।"

(২) কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো। "মধ্যাহ্নের পর শরীরের ছায়া দুই আঙ্গুল অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ ভোজন করিতে পারেন।" [রাজগৃহে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "বিকাল ভোজনে পাচিত্তিয়।"

(৩) কপ্পতি গামন্তর কপ্পো। "গ্রামান্তরে যাইবেন মনে করিয়া ভুক্তাহার-প্রবারিত ভিক্ষুগণ অনতিরিক্ত ভোজন করিতে পারেন।" [শ্রাবস্তীতে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "অনতিরিক্ত-ভোজনে পাচিত্তিয়।"

(৪) কপ্পতি আবাস কপ্পো। "এক সীমাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপোসথ করিতে পারেন।" [রাজগৃহে কথিত "উপোসথ সংযুক্ত" অনুসারে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "বিনয় বিধান মতে দুক্কট।"

(৫) কপ্পতি অনুমতি কপ্পো। "সংঘের অপর ভিক্ষুগণ আসিলে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিবেন, এই মনে করিয়া উপস্থিত ভিক্ষুগণ বিনয়-কর্ম্ম করিতে পারেন।" [চম্পায়-কথিত "বিনয় বত্থ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ] "বিনয় বিধান মতে দুক্কট।"

(৬) কপ্পতি আচিন্ন কপ্পো। "আচার্য্য ও উপাধ্যায় স্থানীয় স্থবিরদিগের আচরিত প্রথানুসারে ভিক্ষুগণ আচরণ করিতে পারেন।" "বিনয় বিধান মতে [আপত্তির গুরুত্ব হিসাবে] আপত্তি।"

(৭) কপ্পতি অমথিত কপ্পো। ভিক্ষুগণ যথারীতি ভোজন সমাপ্ত করিয়া ক্ষীরভাব পরিত্যাগ করিয়াছে অথচ দধিভাব প্রাপ্ত হয় নাই এই রূপ দুগ্ধ ভিক্ষুরা পান করিতে পারেন।" [শ্রাবস্তীতে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "অনতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয়।'

(৮) কপ্পতি জলোগি কপ্পো। "যে সুরা বা পানীয় রস এখন ও মদ্যভাব প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ সুরা ভিক্ষুরা পান করিতে পারেন।" কৌশাম্বীতে কথিত "সুত্ত বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ]। 'সুরা মেরেয় পানে পাচিত্তিয়'।

৯। কপ্পতি অদসকং নিসীদনং। "কিনারাযুক্ত না হইলে ভিক্ষুগণ প্রমাণাতিরিক্ত আসনেও উপবেশন করিতে পারেন।" [শ্রাবস্তীতে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] 'ছেদনকে পাচিত্তিয়।'

(১০) কপ্পতি জাতরূপ-রজতং। 'ভিক্ষুগণ স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুদ্রাদি গ্রহণ করিতে পারেন।' [রাজগৃহে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ' মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] 'জাতরূপ-রজত প্রতিগ্রহণে পাচিত্তিয়।'

উপরোক্ত দশ বস্তুর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম বস্তু সুত্ত-বিভঙ্গের পাঠানুসারে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বস্তু 'রাজগৃহে উপোসথ সংযুক্ত' ও চম্পায় 'বিনয়বত্থু' অনুসারে নিরূপিত করা হইয়াছে। ষষ্ঠ বস্তু প্রসঙ্গে পালিগ্রন্থাদিতে কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

কথিত আছে এক সময় আয়ুষ্মান যশঃ কাকণ্ডক-পুত্র নামক জনৈক প্রতিপত্তি সম্পন্ন অর্হৎ স্থবির বৃজি-রাজ্য ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালীতে উপনীত হইয়া, মহাবন-কূটাগার-শালায় বাস করেন। তখন বৈশালী-বাসী বৃজি-পুত্র ভিক্ষুগণ উপোসথ দিবসে কাংস্য-পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া ভিক্ষু সংঘের পুরোভাগে স্থাপন করতঃ সমাগত বৈশালীবাসী বৌদ্ধ উপাসিকা ও উপাসকদিগকে বলিতেন :—হে উপাসক উপাসিকাবৃন্দ, আপনারা এইখানে (জলপূর্ণ পাত্রে) কার্ষাপণ, অর্দ্ধকার্ষাপণ, সিকিকার্ষাপণ ও মাসাদি প্রদান করুন। ইহা ভিক্ষু সংঘের

উপকারে লাগিবে। তখন আয়ুষ্মান যশঃ স্থবির ভিক্ষু সংঘের ঈদৃশ 'বিনয়'-গর্হিত কার্য্য দেখিয়া, সমাগত উপাসক উপাসিকাদিগকে বলিলেন ;—হে উপাসক উপাসিকাবৃন্দ, আপনারা কার্ষাপণাদি দিবেন না ; কারণ শাক্যপৌত্রীয় শ্রমণদের পক্ষে ইহা বিনয় নিষিদ্ধ। কিন্তু তাঁহারা স্থবিরের বাক্যের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কার্ষাপণাদি দানে বিরত হইলেন না। এইদিকে বৃজিপুত্র ভিক্ষুরা প্রদত্ত কার্ষাপণাদি গ্রহণ করতঃ রাত্রি শেষে ভাগ করিয়া যশঃ স্থবিরকে তাহার একাংশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভীরু যশঃ স্থবির তাহা গ্রহণ করিলেন না, বরঞ্চ এই গর্হিত কার্য্যের জন্ম তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

তখন বৃজিপুত্র ভিক্ষুরা যশঃ স্থবিরকে বিপন্ন করিবার মানসে 'শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাদিগকে অকারণ নিন্দা, তিরস্কার করিয়াছেন,' এই অজুহাতে যশঃ স্থবিরের উপর 'পটিসারণীয়' দণ্ড কর্ম্মের আদেশ প্রদান করিলেন। [অর্থাৎ কোন শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাকে অকারণ নিন্দা তিরস্কার করতঃ তাহাদের শ্রদ্ধার ব্যাঘাত করিলে তাঁহাকে সেই উপাসক উপাসিকার নিকট যাইয়া তাঁহার অপরাধের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়—'আমার কোন আচরণের দ্বারা যদি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন অথবা দুঃখ পাইয়া থাকেন, তাহা নিজ গুণে ক্ষমা করুণ।'] ঈদৃশ দণ্ড প্রাপ্ত ভিক্ষুর সঙ্গে অন্য একজন ভিক্ষু দিতে হয়। তাই যশঃ স্থবির স্থানীয় জনৈক ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া বৈশালীবাসী বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকা দিগকে এই বলিয়া বুঝাইয়া দেন যে তিনি কাহাকেও মনোকষ্ট দেন নাই, নিন্দাও করেন নাই এবং কোন প্রকার তিরস্কারও করেন নাই। যাহা ধর্ম্ম-বিনয় সম্মত নিয়ম তাহাই তিনি তাঁহাদিগকে জানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাসক উপাসিকারা যশঃ স্থবিরের কথার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিলেন—'শাক্য পৌত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে যশঃ স্থবিরই প্রকৃত শাক্য পৌত্রীয় শ্রমণ নামের যোগ্য, বৈশালীবাসী অপরাপর বৃজি-পুত্রভিক্ষুরা শ্রমণ নামের অযোগ্য।'

অতঃপর তাঁহারা যশঃ স্থবিরকে তাঁহাদের আরামে বাস করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের বাক্যে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া সহচর ভিক্ষুসহ আরামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বৃজি-পুত্রভিক্ষুরা সহচর ভিক্ষুর মুখে যে সংবাদ শুনিলেন তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যশঃ স্থবির বিষম বিপদ ঘটাইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই যে শাক্য পৌত্রীয় শ্রমণ নামের অযোগ্য, তাহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা আরও অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়া (যশঃ গৃহস্থ উপাসক উপাসিকাদের নিকটভিক্ষুদের নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন) এই অজুহাতে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া উৎক্ষেপণীয় দণ্ডপ্রদানের আয়োজন করিলেন—(অর্থাৎ সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া

দিবার আয়োজন করিলেন।) তাঁহাদের কূট চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়া কৌশলে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া যশঃ কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইলেন।

তিনি কৌশাম্বীতে উপনীত হইয়া পাবেয্য ও অবন্তীবাসী ভিক্ষুদের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন,—'বন্ধুগণ আসুন! এই বিষয়ের সুমীমাংসা করুন। অগ্রেই অধর্মের ও অবিনয়ের প্রকাশ এবং ধর্মের ও বিনয়ের বিলয় সূচিত হইতেছে। অগ্রেই অধর্ম ও অবিনয়বাদীর প্রাবল্য এবং ধর্ম ও বিনয়বাদীর দৌর্বল্য প্রকাশিত হইতেছে ইহার সুমীমাংসা ব্যতীত ধর্মের স্থায়ীত্ব অসম্ভব।'

সেই সময় আয়ুষ্মান সম্ভূত স্থবির অহোগঙ্গ-পর্বতে বাস করিতেন। আয়ুষ্মান যশঃ স্থবির আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনার পূর্বাপর সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। সম্ভূত স্থবির ঘটনার পূর্বাপর বিচার করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাস্তবিক বৈশালীবাসী বজ্জিপুত্র ভিক্ষুরা ধর্ম বিনয়ের বহির্ভূত আচরণ করিতেছেন। তাই তিনি যশঃ স্থবিরের পক্ষেই স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন। ইত্যবসরে পাবেয্যবাসী ষাটজন ধুতাঙ্গধারী অর্হৎ ভিক্ষু এবং অবন্তীবাসী অষ্টাশীজন ধুতাঙ্গধারী অর্হৎ ভিক্ষু অহোগঙ্গ পর্বতে আসিয়া সমবেত হইলেন। স্থবিরগণ পরস্পর বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বিষয়টি বড়ই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁহারা সর্বশাস্ত্র বিশারদ, ধর্মপরায়ণ, মাতৃকা-পারদর্শী, পণ্ডিত, মেধাবী, সুবক্তা, ধর্মভীরু সাহসী ও নীতির পক্ষপাতী সোরেয্যবাসী রেবত স্থবিরের নিকট এই বিষয় বিবৃত করা সমীচীন হইবে মনে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

রেবত স্থবির তখন সোরেয্য নামক স্থানে বাস করিতেন। যশঃপ্রমুখ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিতেছেন জানিতে পারিয়া, বিবাদে নির্লিপ্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে সোরেয্য হইতে সাঙ্কাশ্যে, সাঙ্কাশ্য হইতে কান্যকুব্জে, কান্যকুব্জ হইতে উদুম্বরে, উদুম্বর হইতে অর্গলপুরে, অর্গলপুর হইতে সহজাতিতে গমন করিলেন। এদিকে "অহোগঙ্গ-পর্বতে" সমবেত ভিক্ষুগণ তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতে করিতে সহজাতিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া পূর্বোক্ত বিবাদের সমুদয় ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন আর রেবত স্থবির বিবাদে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিলেন না। উপরিউক্ত দশ বস্তুর বিচার করতঃ ধর্মবাদী, অধর্মবাদী সম্বন্ধে ঠিক অবগত হইয়া, ধর্মবাদী যশঃপ্রমুখ ভিক্ষুগণের পক্ষ সমর্থন করিলেন। এদিকে বৈশালীবাসী বজ্জিপুত্র ভিক্ষুরা এই খবর অবগত হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাই তাঁহারাও রেবত স্থবিরকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য, শ্রমণ পরিভোগ্য পাত্রচীবরাদি-বিবিধ উপকরণ লইয়া নৌকাযোগে বৈশালী হইতে সহজাতিতে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অগত্যা তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর সাল্হ নামক জনৈক ন্যায়পরায়ণ স্থবির স্বীয় বিবেকবুদ্ধির দ্বারা বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, প্রাচীনকা বা প্রাচ্য ভিক্ষুগণ অধর্ম্মবাদী এবং পাবেয্যকা বা পশ্চিম দেশীয় অর্থাৎ যশঃপ্রমুখ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী।

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ রৈবত স্থবির সঙ্ঘের নিকট এই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি দান করিলেন যে,—বন্ধুগণ। "যদি এই বিবাদের মীমাংসা এইখানেই করা হয়, তাহা হইলে বৈশালীবাসি বৃজি-পুত্র ভিক্ষুরা পুনরায় তাহা উত্থাপন করিবেন। যদি সঙ্ঘ উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে যেখানেই বিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানেই ইহার মীমাংসা করা হউক।" স্থবিরের কথায় সকলেই একমত হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বৈশালীতে সমবেত হইলেন।"

তখন পথব্যা'র সঙ্ঘ-স্থবির সর্ব্বকামী বৈশালীতে উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুর বর্ষগণনানুসারে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ভিক্ষুর বর্ষগণনানুসারে ১২০ বৎসর হইয়াছিল। রৈবত স্থবির সঙ্ঘের নির্দ্দেশানুসারে প্রাচ্য ভিক্ষুগণের মধ্যে সর্ব্বকামী, সাল্হ, কুব্জশোভিত ও বাসবগামী এই চারিজন সঙ্ঘস্থবির এবং পশ্চিম দেশীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে রৈবত সম্ভূত, যশঃ ও সুমন এই চারিজন সঙ্ঘস্থবির, মোট আটজন সঙ্ঘ স্থবির বিচারক নির্ব্বাচিত হইলেন। এই বিচার সভায় সর্ব্বসাকল্যে ১২০০০০ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় কপ্পতি সিঙ্গীলোণ কপ্পং, কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পং, ইত্যাদি দশটি বিচার্য্য বিষয় নির্দ্ধারিত হয়। সঙ্ঘের সম্মতিক্রমে রৈবত স্থবির সর্ব্বকামীকে একে একে পূর্ব্বোক্ত বিচার্য্য বিষয়-সমূহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনিও সঙ্ঘের অনুমতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত বিনয় বিধান মতে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করেন। এইভাবে বিচার সভার কার্য্য সমাধা করা হইলে, পুনরায় ধর্ম্ম-বিনয় সঙ্গায়নের জন্য উক্ত সম্মিলিত ভিক্ষু হইতে ত্রিপিটক পারদর্শী শাস্ত্রবিদ্, পণ্ডিত, মেধাবী ও ধর্ম্মভীরু ৭০০ শত ভিক্ষুসদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহারাই পুনঃ ধর্ম্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করেন। এই সঙ্গীতির কার্য্য শেষ করিতে আট মাস সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম সঙ্গীতি মুখ্যতঃ বিনয়-সঙ্গীতি এবং গৌণতঃ ধর্ম্ম সঙ্গীতি। ধর্ম্ম-বিনয় সম্ভূত বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করাই প্রথম সঙ্গীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং আনুষঙ্গিকভাবেই তন্মধ্যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির বিচার করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির ব্যতিক্রমের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে বিচারের জন্যই দ্বিতীয় সঙ্গীতির আবশ্যক হইয়াছিল এবং আনুষঙ্গিক ভাবেই তন্মধ্যে বুদ্ধবচনগুলি আবৃত্তি করা হইয়াছিল। বিনয় চুলবর্গের ১২শ খণ্ডকে দ্বিতীয় সঙ্গীতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যে বিবরণ দেওয়া আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মবিনয় আবৃত্তির কথা আদৌ উল্লেখ নাই; অবশ্য ধর্ম্মবাদী বিনয়বাদী এই কথার উল্লেখ আছে এবং বিশেষ করিয়া বিবাদ-মীমাংসার কথাই বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন ঠিক কোন সময়ে, কোন স্থানে আহূত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে একটু মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। চুলবর্গের বিবরণ মতে দেখা যায় বৈশালীর বালুকারামেই দ্বিতীয় সঙ্গীতির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে যে বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায় বৈশালীর মহাবন কূটাগার শালায় দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু সমন্তপাসাদিকা নামক বিনয় অর্থকথা চুলবর্গের সহিত একমত সমন্তপাসাদিকায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহা চুলবর্গের পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয়। চুলবর্গের বিবরণে দেখা যায় বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পর দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয় অবশ্য এই বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থাদিও একমত। চুলবর্গের বিবরণে কোন রাজার উল্লেখ নাই, কিন্তু দীপবংশাদি বংশ জাতীয় গ্রন্থাদিতে দেখা যায় শিশুনাগপুত্র কালাশোকের রাজত্বের সময় এবং তাঁহারই সহায়তায় দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ইহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ চুলবর্গ একটি বিনয় সংগ্রহগ্রন্থ, বিনয় সম্বন্ধীয় বিষয়ের সহিতই ইহার সম্বন্ধ। দশ-বস্তুর বিচারই ইহার প্রাসঙ্গিক, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ইহার প্রসঙ্গ বহির্ভূত কথা পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহে ভিন্ন ভিন্ন আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিবরণগুলির মধ্যে অসঙ্গতি আছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু ইহার বিবরণগুলি ভিত্তিহীন—এই কথা বলা চলে না। যদিও কোন বৌদ্ধগ্রন্থে দ্বিতীয় সঙ্গীতির উল্লেখ নাই, তথাপি দীপবংশাদি বংশজাতীয় গ্রন্থাদিতে অজাতশত্রু হইতে কালাশোক পর্য্যন্ত রাজপরম্পরার যে ইতিবৃত্ত আছে, তাহা হইতে সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক শতাব্দীর মধ্যে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল।

উপসংহারে ইহাই শুধু বলিতে চাই যে—দ্বিতীয় সঙ্গীতি সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রাচীন পালিগ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই শুধু আলোচনা করিলাম। তাহাদের মধ্যে যে সামান্য এক আধটু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তাহা পরিবেশকের বৈকল্যে ঘটিলেও মূলতঃ বিষয়টা ঠিকই বলিতে হইবে। দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন যে হইয়াছিল তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। স্থান সম্বন্ধে যিনি যাহা মোটামুটি বলুন না কেন, বলা যায় যে বৈশালীতেই দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল; কারণ যেস্থানে দশবস্তুর প্রবর্তন করা হইয়াছিল সেইস্থানেই যে ইহার মীমাংসা করা হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর দ্বিতীয়বার ধর্ম্ম-বিনয় আবৃত্তি করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা দ্বিতীয় সঙ্গীতি নামে পরিচিত। সাতশত ভিক্ষুর সম্মিলনে হইয়াছিল বলিয়া ইহা সপ্তশতিক নামে অভিহিত। যশঃস্থবিরের উদ্যোগে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে

যশঃসঙ্গীতিও বলা যায়। বিনয়ের সূত্রানুসূত্রে শিক্ষাপদসমূহের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে বিনয় সঙ্গীতিও বলা যায়। এই সঙ্গীতির কার্য্য আটমাস চলিয়াছিল বলিয়া ইহাকে অষ্টমাসিক সঙ্গীতিও বলা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইল না। বারান্তরে সে সব বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

অতএব মাণ্ডুক্যোপনিষৎ হইতে সখণ্ড সগুণ আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং স্বগতভেদ সিদ্ধ হয় না। একই আত্মার অবস্থাভেদের জন্য স্বগতভেদ স্বীকার করা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত নানা অবস্থার মধ্যে কোন বস্তু অবিকৃত থাকিলে সেই অবস্থাগুলিই তাহার কল্পিত বা মিথ্যা বলা হয়।

যদি বলা হয়—ত্রিপাদ দিবি, অর্থাৎ স্বর্গে 'অমৃত' বলায় এবং একপাদ 'সর্বভূত' বলায় ইহা যে বিরাটের কথা তাহাও বুঝায় না। কারণ, সর্ব্বভূত ও দ্যুলোকাদি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে বা বীজাকারে তাহা ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে; কারণ, "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে আকাশ সম্ভূত হইল—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে আকাশাদির ব্রহ্মে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি জানা যায়, নচেৎ ব্রহ্মের বিকার হয়—বলিতে হয়। অতএব আকাশাদি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত যে আত্মাতে, সেই আত্মারই কথা এই মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হইয়াছে। আর তজ্জন্য এই ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যদ্বারা এই মাণ্ডুক্যোপনিষদের কথিত আত্মা বা ব্রহ্ম, স্বগতভেদবিশিষ্ট হইবে না কেন—ইত্যাদি?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা অসঙ্গত। কারণ, মাণ্ডুক্যোপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মার অবস্থাগত পাদভেদ অভিন্নভাবেই শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। ইহাতে আত্মার স্বগতভেদের কথা একেবারেই নাই। অন্য শ্রুতির অন্য প্রসঙ্গে উক্তির অনুরোধে এই

অবস্থাগত পাদভেদকে স্বরূপগত পাদভেদে পরিণত করা কখনই সঙ্গত হয় না। আর ব্রহ্মে দৃশ্যজগৎ স্বীকার করিলে তাহাকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্ম অবিকারী। তাহার একদেশ বিকারী হইলে আর তাহাকে অবিকারী বলা চলে না। আর ব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী উভয় অংশকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিকারী অংশকে ব্রহ্ম বলিলে 'ব্রহ্ম'-নামের কোন সার্থকতা থাকে না। যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, তাহাই যদি ব্রহ্ম নামের অর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের উক্ত অবিকারী ও বিকারী অংশদ্বয় সমান বৃহৎ আর হয় না। এইরূপে এক্ষেত্রে ব্রহ্মনামের সার্থকতা থাকে না। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদের দ্বারা আত্মার এই পাদচতুষ্টয়কে স্বরূপগত পাদভেদ বলা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্যকে সগুণ ব্রহ্মপর বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। কারণ, সেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (৬।১১) বলা হইয়াছে এবং শেষে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (৬।১৯) ইহাও বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম যে নির্গুণ তাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলিলেন। আর মায়াযোগে সেই ব্রহ্ম যে সগুণ হন, তাহাও "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বর" (৪।১০) এই বাক্যে বলাই হইয়াছে। অতএব "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা, সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (১।১২) এই সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে—বলিতে কোন বাধা হয় না।

যদি বলা যায়—এস্থলে "ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" বলিয়া ব্রহ্মকেই তো ত্রিবিধ বলা হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতারূপে ত্রিবিধ, সুতরাং স্বগতভেদ ব্রহ্মের স্বীকার কেন করা হইবে না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এস্থলে "এতৎ ত্রিবিধং সর্ব্বং ব্রহ্ম" এইভাবে অন্বয় করিব, অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে ত্রিবিধ বলিব না, কিন্তু "এই ত্রিবিধ সর্ব্বই ব্রহ্ম" বলিব। অর্থাৎ "এতৎ" পদের সহিত ব্রহ্মের অন্বয় না করিয়া "ত্রিবিধ"পদের অন্বয় করিব। সুতরাং ব্রহ্মকে আর ত্রিবিধ বলিতে হইবে না। যেমন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে সর্ব্ব বলা হয় না, অর্থাৎ সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলায় যেমন সর্ব্বে সর্ব্বত্ব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এস্থলেও "এই সব ত্রিবিধ" বলায় এইরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ ভাব মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বাক্যদ্বারাও এই মাণ্ডুক্যোক্ত আত্মার স্বরূপগত পাদভেদ করা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর—এখানে উপক্রম উপসংহারের বিরোধ নাই যে, বলাবল বিচার সম্ভব হইবে? কারণ, উপক্রমমধ্যে আত্মাকে চতুষ্পাদ্ বলা হইয়াছে, তাহার তিনটী অবস্থারূপ তিনটী পাদকে নিরাস করিয়া অর্থাৎ অনাত্মা বলিয়া চতুর্থ অবস্থারূপ চতুর্থপাদকে "আত্মা বিজ্ঞেয়" বলায় সেই প্রথম তিনটী অবস্থারূপপাদ এই চতুর্থ পাদের মত নিত্য বলা হইল না।

যশঃসঙ্গীতিও বলা যায়। বিনয়ের সূত্রানুসূত্রে শিক্ষাপদসমূহের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে বিনয় সঙ্গীতিও বলা যায়। এই সঙ্গীতির কার্য্য আটমাস চলিয়াছিল বলিয়া ইহাকে অষ্টমাসিক সঙ্গীতিও বলা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইল না। বারান্তরে সে সব বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

অতএব মাণ্ডুক্যোপনিষৎ হইতে সখণ্ড সগুণ আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং স্বগতভেদ সিদ্ধ হয় না। একই আত্মার অবস্থাভেদের জন্য স্বগতভেদ স্বীকার করা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত নানা অবস্থার মধ্যে কোন বস্তু অবিকৃত থাকিলে সেই অবস্থাগুলিই তাহার কল্পিত বা মিথ্যা বলা হয়।

যদি বলা হয়— তিনপাদ দিবি, অর্থাৎ স্বর্গে 'অমৃত' বলায় এবং একপাদ' সর্ব্বভূত' বলায় ইহা যে বিরাটের কথা তাহাও বুঝায় না। কারণ, সর্ব্বভূত ও দ্যুলোকাদি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে বা বীজাকারে তাহা ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে ; কারণ, "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে আকাশ সম্ভূত হইল— এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে আকাশাদির ব্রহ্মে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি জানা যায়, নচেৎ ব্রহ্মের বিকার হয়—বলিতে হয়। অতএব আকাশাদি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত যে আত্মাতে, সেই আত্মারই কথা এই মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হইয়াছে। আর তজ্জন্য এই ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যদ্বারা এই মাণ্ডুক্যোপনিষদের কথিত আত্মা বা ব্রহ্ম, স্বগতভেদবিশিষ্ট হইবে না কেন—ইত্যাদি ?

তাহা হইলে বলিব- না, তাহা অসঙ্গত। কারণ, মাণ্ডুক্যোপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মার অবস্থাগত পাদভেদ অতিস্পষ্ট ভাবেই শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। ইহাতে আত্মার স্বগতভেদের কথা একেবারেই নাই। অন্য শ্রুতির অন্য প্রসঙ্গে উক্তির অনুরোধে এই

অবস্থাগত পাদভেদকে স্বরূপগত পাদভেদে পরিণত করা কখনই সঙ্গত হয় না। আর ব্রহ্মে ভূমরূপং স্বীকার করিলে তাহাকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্ম অবিকারী। তাহার একদেশ বিকারী হইলে আর তাহাকে অবিকারী বলা চলে না। আর ব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী উভয় অংশকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিকারী অংশকে ব্রহ্ম বলিলে 'ব্রহ্ম' নামের কোন সার্থকতা থাকে না। যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, তাহাই যদি ব্রহ্ম নামের অর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের উক্ত অবিকারী ও বিকারী অংশদ্বয় সমান বৃহৎ আর হয় না। এইরূপে এক্ষেত্রে ব্রহ্মনামের সার্থকতা থাকে না। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদের দ্বারা আত্মার এই পাদচতুষ্টয়কে স্বরূপগত পাদভেদ বলা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্যকে সগুণ ব্রহ্মপর বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। কারণ, সেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (৬।১১) বলা হইয়াছে এবং শেষে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (৬।১৯) ইহাও বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম যে নির্গুণ তাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলিলেন। আর মায়াযোগে সেই ব্রহ্ম যে সগুণ হন, তাহাও "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বর" (৪।১০) এই বাক্যে বলাই হইয়াছে। অতএব "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা, সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (১।১২) এই সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে—বলিতে কোন বাধা হয় না।

যদি বলা যায়—এস্থলে "ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" বলিয়া ব্রহ্মকেই তো ত্রিবিধ বলা হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতারূপে ত্রিবিধ, সুতরাং স্বগতভেদ ব্রহ্মের স্বীকার কেন করা হইবে না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এস্থলে "এতৎ ত্রিবিধং সর্বং ব্রহ্ম" এইভাবে অন্বয় করিব, অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে ত্রিবিধ বলিব না, কিন্তু "এই ত্রিবিধ সর্বই ব্রহ্ম" বলিব। অর্থাৎ "এতৎ" পদের সহিত ব্রহ্মের অন্বয় না করিয়া "ত্রিবিধ"পদের অন্বয় করিব। সুতরাং ব্রহ্মকে আর ত্রিবিধ বলিতে হইবে না। যেমন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্বকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে সর্ব বলা হয় না, অর্থাৎ সর্বকে ব্রহ্ম বলায় যেমন সর্বে সর্বত্ব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এস্থলেও "এই সব ত্রিবিধ" বলায় এইরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ ভাব মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বাক্যদ্বারাও এই মাণ্ডূক্যোক্ত আত্মার স্বরূপগত পাদভেদ করা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর—এখানে উপক্রম উপসংহারের বিরোধ নাই যে, বলাবল বিচার সম্ভব হইবে? কারণ, উপক্রমমধ্যে আত্মাকে চতুষ্পাদ্ বলা হইয়াছে, তাহার তিনটী অবস্থারূপ তিনটী পাদকে নিরাস করিয়া অর্থাৎ অনাত্মা বলিয়া চতুর্থ অবস্থারূপ চতুর্থপাদকে "আত্মা বিজ্ঞেয়" বলায় সেই প্রথম তিনটী অবস্থারূপপাদ এই চতুর্থ পাদের মত নিত্য বলা হইল না।

যদি এইসঙ্গে চারিটী অবস্থা থাকিত, যেমন ছান্দোগ্যোক্ত চারিটী পাদ একসঙ্গে থাকে, এবং সেই চারিটী অবস্থাকে উপক্রমে আত্মা বলিয়া উপসংহারে চতুর্থ অবস্থাকে আত্মা বলা হইত, তাহা হইলে বিরোধ হইত। কিন্তু জাগ্রতাদি অবস্থা এক সঙ্গে থাকে না; অতএব উপক্রম উপসংহারে এস্থলে বিরোধ নাই। এজন্য অরুন্ধতীদর্শন ন্যায়ে প্রথমে আত্মার স্থূল পরিচয় দিয়া শেষে প্রকৃত আত্মার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—বলিতে হইবে। অতএব প্রকৃত আত্মা এক অদ্বৈত—ইহাই বলা এই উপনিষদের লক্ষ্য। এইরূপে এই উপনিষদে এই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। মুক্তিকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে এই মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌খানি ১০৮ উপনিষদের সার। এজন্য ইহার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বস্তুতঃ এই উপনিষদেরই উপর ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্য কারিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং এই কারিকার উপর শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন এবং আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের উপর টীকাও করিয়াছেন। এই কারিকারমধ্যে অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ এই মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও তাহার কারিকার অনুসরণ করিয়া যে তাঁহাদের মতের পুষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। কারণ এই শূন্যবাদী বৌদ্ধমধ্যে দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। একদল শূন্যকে সৎস্বরূপ বা সুখস্বরূপ বলিয়াছেন, অপর দল তাহাকে নিস্তত্ত্ব অর্থাৎ কিছুই না বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই বলেন। ব্যাসাদি ঋষিগণ ও বৈদিক আচার্য্যগণ এই নিস্তত্ত্ব শূন্যবাদীর মতই নানারূপে খণ্ডন করিয়াছেন। শূন্যকে যাঁহারা সৎস্বরূপ বা সুখস্বরূপ বলেন তাঁহাদের মত তাঁহারা খণ্ডন করেন নাই। এই নিস্তত্ত্ব শূন্যবাদী বৌদ্ধই প্রাচীন বৌদ্ধ। ইহারা গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। গৌতম বুদ্ধ, বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যগণকে নিস্তত্ত্ব শূন্য খণ্ডন করিতে দেখিয়া, মনে হয়, মধ্যে মধ্যে শূন্যকে সৎস্বরূপ এবং সুখস্বরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন। পালি ত্রিপিটকে বুদ্ধের উক্তি মধ্যে বিবিধ শূন্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই জন্য বর্ত্তমানের জাপানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধবাক্যানুসরণ করিয়াই শূন্যকে অসৎ বলেন না। তাঁহারা এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিকে বৌদ্ধমতানভিজ্ঞ বলিতেও উৎসাহিত হন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যপ্রভৃতি আচার্য্যগণ যে, ঋষিগ্রন্থের টীকাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঋষিপ্রোক্ত প্রাচীন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন। আচার্য্যগণ সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতের বিবৃতি করিবার জন্য যে মধ্যে মধ্যে গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের এই ভ্রম হয়। বস্তুতঃ প্রাচীন বৌদ্ধমতের অনুসরণকারী আধুনিক একদলও যে ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই হয় না। সেই জন্যই আচার্য্যগণ তাঁহাদের বাক্যের দ্বারা সেই প্রাচীন বৌদ্ধমত বিবৃত করিয়াছেন। প্রাচীন শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ অসংখ্যাতিবাদী ছিলেন, কিন্তু শূন্যকে যাঁহারা সৎস্বরূপ ও সুখস্বরূপ বলেন, সেই বৌদ্ধগণের মত যে

অসংখ্যাতিবাদ নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়। নাগার্জ্জুন এই অসৎ শূন্যকে চতুষ্কোটীবিনির্মুক্ত বলিয়া প্রকারান্তরে অসংখ্যাতিবাদী প্রাচীন বৌদ্ধমতেরই পুষ্টি করিয়াছেন। ফলত গৌতম বুদ্ধের শূন্য যে এই মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও তাঁহার কারিকা অবলম্বনে উদ্ভাবিত, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অব্যবহার্য্য, অলক্ষণ, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অব্যপদেশ্য প্রভৃতি শব্দ নাগার্জ্জুন প্রভৃতির গ্রন্থে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এই মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুরূপ উপনিষদ্ নৃসিংহপূর্ব্ব তাপনীয়মধ্যে 'শূন্য' শব্দই ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জন্য গৌতম বুদ্ধের মতের অবলম্বন যে এই উপনিষৎ ও ইহার কারিকাগ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। বিশেষ এই যে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ বেদমান্য করিতেন আর এই গৌতম বুদ্ধ কিন্তু বেদ অমান্য করিয়াছেন। যাহা হউক এ সকল কথা পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ইহার ষড়্বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গগুলি এই—

(১) উপক্রম—"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং"। ১

উপসংহার "আত্মৈব চতুর্থঃ"। ১২

(২) অভ্যাস—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তম্"। ১২

(৩) অপূর্ব্বতা—"অদৃষ্টমব্যবহার্য্যম্"। ৭

(৪) ফল—"সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ"। ১২

(৫) অর্থবাদ—"আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্" ৯।

(৬) উপপত্তি—"সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরম্" (?)। ১

যাহাহউক এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই প্রতিপন্ন হয়, অজাতবাদ নহে।

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্ত।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

এইবার দেখা যাউক সপ্তম তৈত্তিরীয়োপনিষদে তত্ত্ববোধক বাক্যগুলি হইতে কি রূপ অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় ইহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথমেই দেখা যায়—

১। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ২।১

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। এখানে এই তিনটী পদের দ্বারাই ব্রহ্ম যে "এক ও অদ্বৈত" তাহা জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে "অনন্ত" এই পদের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবেই অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতের সন্ধান প্রদান করা হইয়াছে, অর্থাৎ

যে কোন প্রকারেই বিভ স্বীকার করা হইবে, তাহাতেই অনন্তত্বের হানি হইবে। এ জন্য একপদদ্বারা সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। তদ্রূপ সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ বলাতেও সেই অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, একন্ত এখানে আর পুনরুক্তি করা হইল না। তথাপি সংক্ষেপে এই সত্য বা সৎস্বরূপ বস্তু এক অদ্বৈতই হয়। কারণ, যাহা কিছু "আছে বা নাই" বলা হয়, তাহাতেই সত্তারও একটা জ্ঞান আমাদের হয়। ঘট আছে বলিলে যেমন ঘটসত্তার জ্ঞান হয়, তদ্রূপ ঘট নাই—বলিলে ঘটাভাব আছে—এইরূপ জ্ঞানই হয়। এজন্য যাহা কিছুরই জ্ঞান হয়, তাহাতে সত্তার জ্ঞান অনুবৃত্ত হয়, আর যাহা সকল বস্তুতে অনুবৃত্ত হয় তাহা সেই সকল বস্তু হইতে পৃথকই হয়। এই সকল বস্তুকে উপাধি বলা হয়। এই উপাধিশূন্য সত্তাই বা সত্য বস্তুই অদ্বৈতবস্তু হয়। এজন্য "সত্যং"-পদদ্বারা সেই এক অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। তদ্রূপ "জ্ঞানং" এই পদদ্বারাও সেই এক অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ, জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তুরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। যাহা জানা যায় বা জানা যায় না—এরূপ যাবৎ বস্তুই জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত বা সিদ্ধ হয়। এখন ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি যাবৎ জ্ঞানেই ঘটপটাদি উপাধি হয়। এই উপাধি বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে তাহা এক অদ্বৈত বস্তুই হয়। জ্ঞান ও সত্য—এই উভয়ই উপাধিহীন হইলে অদ্বৈত হয় বলিয়া এবং ও সত্য ভিন্নভাবে না থাকায় এতদুভয়ের দ্বারা অদ্বৈতেই সন্ধান পাওয়া গেল। তদ্রূপ আনন্দ পদদ্বারাও সেই অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া যায়। এইজন্য অন্যত্র ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। এই উপনিষদেও ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান, ও অনন্ত বলিয়া "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" বলিয়া তাহাকে আনন্দস্বরূপও বলা হইয়াছে। অতএব এই "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" শ্রুতির দ্বারা সেই অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতেরই কথা বলা হইয়াছে।

২। তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ,আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ, ওষধীভ্যোঽন্নম্, অন্নাৎ পুরুষঃ, স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।"২।১

অর্থাৎ "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ, সেই পুরুষ হইতেছেন অন্ন-রসময়।"

এস্থলে সেই ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া তাহা হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি বলায় মূলে এক অদ্বৈতেরই সন্ধান প্রদত্ত হইল। জীবের আত্মা ও ব্রহ্ম, উহারা যে অভিন্ন, তাহাই বলা হইলে। এ স্থলে সেই ব্রহ্মরূপী আত্মার সহিত, উৎপত্তির সহায় প্রকৃতি বা শক্তি বা পরমাণু বা কাল প্রভৃতি কোন কিছুরই নাম না করায় দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ কোন মতবাদই উপদিষ্ট হইল না, কিন্তু শুদ্ধ অদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট হইল।

যদি বলা যায়—সেই ব্রহ্মরূপী আত্মা হইতে জীব ও জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—বলায় ব্রহ্মের এক অংশের বিকার স্বীকার করিব? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট বলিব?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, পরবর্ত্তী বাক্যসমূহে এই অন্ন-রসময় ব্রহ্মাত্মরূপী পুরুষের অন্তরে প্রাণময়, তাহার অন্তরে মনোময়, তাহার অন্তরে বিজ্ঞানময় ও তাহার অন্তরে আনন্দময় বলিয়া সেই আনন্দময়ের আশ্রয় ব্রহ্ম—ইহা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইলেও সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় বলায়, ব্রহ্মের এক অংশের বিকার হয় নাই—ইহাই বলিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্মের এক অংশের বিকার স্বীকার অভিপ্রেত হইলে ব্রহ্মের অবশিষ্ট অংশকে প্রতিষ্ঠারূপী পুচ্ছ অর্থাৎ আশ্রয় বলা হইত। কিন্তু তাহা না বলিয়া ব্রহ্মকেই আশ্রয় বলা হইয়াছে। এখানে 'ব্রহ্ম' এই পদের অর্থ ব্রহ্মের অবশিষ্ট অংশ বলিলে 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ সংকোচ করা হইবে। অতএব অদ্বৈত ও সত্য, এবং জীব ও জগৎ তাহাতে কল্পিত বা মায়া মাত্র, অর্থাৎ মিথ্যা—ইহাই এ স্থলে বলা হইল। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহা ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকিলে, তাহা ব্রহ্মে কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ জন্য এই শ্রুতিদ্বারা অপর কোন মতবাদই উপদিষ্ট হয় নাই—বলিতে হইবে। এ স্থলে ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার পাণিনি মুনির গুরু উপবর্ষের মতের অনুসরণ করিয়া আচার্য্য ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই আনন্দময় আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ইহাদের বহুপূর্ব্বেই তাহা নানা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। খণ্ডনের প্রধান কারণ এই যে, আনন্দময় যদি ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে এই আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুচ্ছকে বলা হইত না। বৃত্তিকার মতানুসারিগণের অভিসন্ধি এই যে, আনন্দময় ব্রহ্ম হইলে আনন্দময়ের পুচ্ছাদি অঙ্গ থাকায় ব্রহ্মেরও অঙ্গ থাকিবে। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময়ের যেমন অঙ্গদ্বের কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ আনন্দময়েরও অঙ্গদ্বের কথা বলায় আনন্দময়ও উক্ত অন্নময়াদিরই ন্যায় কোষবিশেষ হইতেছেন, ব্রহ্মরূপ আর হইতেছেন না। অন্ন-রসময়ের অঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

"তস্য ইদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়ম্ উত্তরঃ
পক্ষঃ, অয়ম্ আত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা॥" ২।১

অর্থাৎ "সেই অন্ন-রসময় পুরুষের এই মস্তকই মস্তক, এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ,

এই বাম বাহুই উত্তর পক্ষ, এই দেহের মধ্যভাগই আত্মা, আর এই নাভির অধোভাগ প্রতিষ্ঠারূপী পুচ্ছ। তদ্রূপ প্রাণময়ের অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ অন্নরসময়াৎ, অন্যোঽন্তর
আত্মা প্রাণময়ঃ,তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষ-
বিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষ
বিধঃ, তস্য প্রাণ এব শিরঃ, ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা,
পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

অর্থাৎ "সেই এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে অন্য, অথচ তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণময় আত্মা, তাহার দ্বারা এই অন্নরসময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই প্রাণময় আত্মাও অন্নরসময় পুরুষেরই ন্যায়, সেই অন্নরসময়ের পুরুষাকারতার সদৃশ এই প্রাণময়ের পুরুষাকারতা। তাঁহার প্রাণই মস্তক, দক্ষিণ পক্ষ ব্যান, উত্তর পক্ষ অপান, দেহের মধ্যভাগ রূপ আত্মা আকাশ, এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুচ্ছ—পৃথিবী। তদ্রূপ মনোময়ের অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ প্রাণময়াৎ, অন্যোঽন্তর আত্মা
মনোময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব।
তস্য পুরুষবিধতাম্, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য
যজুরেব শিরঃ, ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তর পক্ষঃ,
আদেশ আত্মা, অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

অর্থাৎ "সেই এই প্রাণময় পুরুষ হইতে অন্য, অথচ অভ্যন্তরে অবস্থিত মনোময় আত্মা, তাহার দ্বারা এই প্রাণময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই মনোময় আত্মাও প্রাণময় পুরুষেরই ন্যায়, সেই প্রাণময়ের পুরুষকার সদৃশ মনোময়ের পুরুষাকারতা, তাহার যজুই মস্তক, দক্ষিণপক্ষ ঋগ্। উত্তর পক্ষ সাম, দেহের মধ্যভাগরূপ আত্মা আদেশ এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুচ্ছ—অথর্বাঙ্গিরস। তদ্রূপ বিজ্ঞানময়ের অঙ্গ স্বরূপ বলা হইয়াছে—

"তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ, অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ
তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাম্
অন্বু অয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ, ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
সত্যম্ উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

অর্থাৎ সেই এই মনোময় পুরুষ হইতে অন্য, অথচ অভ্যন্তরে অবস্থিত বিজ্ঞানময় আত্মা,

তাহার দ্বারা এই মনোময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময় আত্মাও মনোময় পুরুষেরই ন্যায়, সেই মনোময়ের পুরুষাকারতার সদৃশ বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকারতা। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার উত্তর পক্ষ, যোগ তাহার আত্মা, অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ, এবং মহঃ অর্থাৎ বুদ্ধি তাহা প্রতিষ্ঠারূপী পুচ্ছ।

তদ্রূপ আনন্দময়ের অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ, অন্যোঽন্তর
আত্মা আনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব,
তস্য পুরুষবিধতাম্, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরপক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

অর্থাৎ "সেই এই বিজ্ঞানময় পুরুষ হইতে অন্য অথচ অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা আনন্দময়। তাহার দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই আনন্দময় আত্মাও বিজ্ঞানময় পুরুষের ন্যায়। সেই বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকারতার সদৃশ এই আনন্দময়ের পুরুষাকারতা। প্রিয় তাহার মস্তক, মোদ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ তাহার উত্তর পক্ষ, আনন্দ অর্থাৎ সামান্যাকার সুখ তাহার আত্মা বা দেহের মধ্যভাগ। ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠারূপ পুচ্ছ।

এ স্থলে প্রিয় শব্দের অর্থ—অভীষ্ট পুত্রাদিদর্শনজনিত আনন্দ বা সুখ, মোদ শব্দের অর্থ—প্রিয় বস্তু লাভে যে হর্ষ রূপ আনন্দ তাহা, প্রমোদ অর্থ প্রিয় বস্তুর ভোগ জনিত উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত হর্ষরূপ আনন্দ, এবং আনন্দ শব্দের অর্থ সামান্যাকার সুখ বা আনন্দ। অর্থাৎ প্রিয়, মোদ ও প্রমোদমধ্যে যাহা সাধারণরূপে বর্ত্তমান, তাহাই এই আনন্দ পদবাচ্য। এখন এই "আনন্দময় আত্মা" যদি ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গের কথা আর বলা হইত না। বস্তুতঃ এই আনন্দময় আত্মার পুচ্ছকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি আনন্দময় আত্মা হন, তাহা হইলে তিনি আবার তাহার পুচ্ছ হন কি প্রকারে? অঙ্গী ও অঙ্গ তো এক অভিন্ন বস্তু হয় না। অতএব আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম নহেন।

তাহার পর এই আনন্দময়রূপ আত্মার আত্মাকে অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগকে আনন্দ বলা হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময়কে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিলে তাহার অঙ্গরূপ দেহের মধ্যভাগকে আবার আনন্দ বলা যায় কি করিয়া? অঙ্গাঙ্গিরূপে সম্বন্ধ এস্থলে "আনন্দময়" ও "আনন্দ" মধ্যে কিছু ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে আনন্দময়ের মস্তকাদিও আনন্দই হইবে। এইরূপে দেহমধ্যভাগ ও মস্তকাদির মধ্যে আর ভেদ থাকিল না। অথচ শ্রুতিতে এই ভেদ স্বীকার করিয়াই বিভিন্ন অঙ্গের নাম করা হইয়াছে। কিন্তু আনন্দময় যদি ব্রহ্ম বা আত্মা না হন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যভাগ

আনন্দ হইতে পারিবে, এবং দেহমধ্যভাগ ও মস্তকাদির অভেদ শঙ্কা থাকে না। অতএব আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম নহেন।

তাহার পর আনন্দকে শ্রুতিতে ব্রহ্মানন্দবল্লীতেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন:" অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ জানিলে আর কোথা হইতেও ভীত হইতে হয় না। তৎপরে পরবর্ত্তী ভৃগুবল্লীতে "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ ভৃগু আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন, ইত্যাদি। এখন এই আনন্দ যাঁহাতে প্রচুর, তিনি তাহা হইলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন কিছু বস্তুবিশেষ নিশ্চিতই হইবেন। আর তজ্জন্য তাঁহাকে আনন্দময় বলিতে কোন বাধা হইবে না। বস্তুত মাণ্ডুক্যোপনিষদে আনন্দময়কে চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ "প্রাজ্ঞ" এবং "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। যথা—

"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তম্।
সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ
প্রাজ্ঞস্তৃতীয় পাদঃ॥৫। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী এষ যোনিঃ
সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ যেখানে নিদ্রিত ব্যক্তি কোন কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না, তাহা সুষুপ্তস্থান। তাহা একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় আনন্দভোক্তা, চেতোমুখ, সকল ভূতের কারণ, এবং লয়ের স্থান।"

আর যাহাকে তুরীয় বা চতুর্থপাদ বলা হইয়াছে, তাহাকে বলা হইয়াছে—

"অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্
অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সার প্রপঞ্চোপশমং
শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়:" ।৭

অর্থাৎ "যাহা অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চের লয়স্থান, শান্ত শিব অদ্বৈত, তাহাই চতুর্থ, তাহাই আত্মা, তাহাই জ্ঞেয়"। সুতরাং বুঝা যাইতেছে "আনন্দময়" ব্রহ্ম নহেন বা আত্মা নহে কিন্তু তাহা সর্ব্বান্তরতম কোশবিশেষ, তাহার মধ্যে আত্মা বা ব্রহ্ম বস্তু অবস্থিত। জীব আত্মাই যে ব্রহ্ম তাহা এই শ্রুতির প্রথমেই বলা হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।"।২

অর্থাৎ সেই সবই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, সেই এই আত্মা চতুষ্পাদ্।" অতএব আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু তাহা কোশবিশেষ, সুতরাং তাহা সেই কোশবিশিষ্ট আত্মা বা ব্রহ্ম অর্থাৎ সোপাধিক ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর বা প্রাজ্ঞ জীব। এই ঈশ্বর—সমষ্টি, আর

প্রাজ্ঞ তাঁহার ব্যষ্টি। তাহার পর তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং মহানারায়ণোপনিষদে বিরজা হোমের সময় অন্নময়াদির ন্যায় আনন্দময়কেও আহুতি দিবার উপদেশ আছে, যথা—

"অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াত্মা মে শুধ্যন্তাং
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা"

(প্রপাঠক ১০ অনুবাক ৫৭, মন্ত্র ৭ম, নারায়ণোপনিষৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মহানারায়ণোপনিষৎ ৬৬)

অর্থাৎ আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশগুলি শুদ্ধ হউক, আমি বিরজ বিগতপাপ জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।" আরণ্যকে আত্মা এই পদটী নাই। কিন্তু উপনিষদে আত্মা পদটী আছে। আনন্দময় আত্মা হইলে তাহার ত্যাগের বা শুদ্ধির ব্যবস্থা থাকিত না। অতএব এই আনন্দময় আত্মা বা ব্রহ্ম নহেন।

বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বেদানন্দ

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে এক প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল। এই শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড প্লাবন ভারতীয় হিন্দুর ধর্ম্মসংস্কার, সামাজিক জীবন ও শিক্ষার ধারায় নানা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিতেছিল। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপনার আশ্চর্য্য সমারোহ ও মোহময় চাকচিক্যে দেশের যুবকবৃন্দের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত ও বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। পাশ্চাত্যের মনোমুগ্ধকর সভ্যতা, তাহার বিশাল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য, তাহার জড়বাদ ভোগ সর্ব্বস্বতা, দেহাত্মবাদ ইত্যাদি ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের অধিকাংশকেই কুপ্রভাবগ্রস্ত করিয়া ফেলিল। জাতীয় ভাব-বিবর্জ্জিত ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাঙ্গলার যুবক সমাজের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু আচার ব্যবহার, হিন্দুর নৈতিক বিশ্বাস সমস্তই উপেক্ষা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার বিষয় হইয়া উঠিল। ক্রমে তখনকার ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ হিন্দু মত ও সংস্কারকে বর্জ্জন করিয়া নাস্তিক হইতে

লাগিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ, কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি খৃষ্টান মিশনারীরাও এই সময়ে কলিকাতা, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বাঙলার প্রধান প্রধান সহরে ও নগরে প্রবল উৎসাহে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া বহু হিন্দু যুবককে খৃষ্টান করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেশে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু যে শক্তি যে দিব্য মহাজ্ঞান থাকিলে ধর্মভাবকে জাগ্রত জীবন্ত ও সক্রিয় করিয়া জাতির স্বাতন্ত্র্যকে সুদৃঢ় করা যায়, সেই তপস্যার শক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে আদৌ ছিল না। ধর্ম্মের মূলনীতি অপেক্ষা তাঁহারা বরং নানা যুক্তিহীন অসার আচার, ভ্রান্তপ্রথা ও কুসংস্কারকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। বেদবিরুদ্ধ, ঋষিবিরুদ্ধ, বহু ভ্রান্ত আচারে ও কুপ্রথায় তখন হিন্দু সমাজ আচ্ছন্ন ছিল—শুধু কতকগুলি গ্রাম্য কুসংস্কার, লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রীআচারই হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা মোটেই ছিল না বলিয়া তাঁহারা বিধর্ম্মী ও বিদেশীদের দেহাত্মবাদ ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রবল আক্রমণকে কোনক্রমে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। অপর পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি নব্য সম্প্রদায় পাশ্চাত্যভাব ও উপনিষদের সুপ্রাচীন ধর্ম্মাদর্শের সংমিশ্রণে যে ধর্ম্ম আন্দোলন করিতেছিলেন তাহা বহু ইংরাজী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনী ও মানীর নিকট গ্রহণীয় হইলেও বিদেশী পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিচালিত বলিয়া এদেশের মাটিতে তাহা সতেজ উন্নত তরুর ন্যায় শিকড় বাঁধিতে পারিল না। এইজন্য এই সকল সংস্কারপন্থী সম্প্রদায় কোন কোন বিষয়ে দেশের বহু হিতসাধন করিলেও ইহাঁদের প্রচারিত ধর্ম্মমত দেশের জনসাধারণের মধ্যে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত দেহাত্মবাদী, নাস্তিক ও খৃষ্টানদের সর্ব্বনাশকর অভিযান—অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বিদেশী-প্রভাবিত নব্যতন্ত্রের অভ্যুদয়—আবার অন্যদিকে শতাব্দীব্যাপী কুসংস্কার ও অনর্থ আচারের অচলায়তনের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুদের তথাকথিত ধর্ম্মের আস্ফালন ও তাহার 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা'।

ধর্ম্মহীনতা, অনাচার, তামসিকতা, অপবিত্রতা প্রভৃতি নানাবিধ আসুরিক ও অপবিত্রভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশ তখন যেন ঘোর অবনতির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু তাঁহারা কোনদিকেই ধর্ম্মলাভের সুযোগ সন্ধান না পাইয়া বিভ্রান্ত, ব্যাকুল দিশাহারা ও নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। সেই দারুণ ধর্ম্ম-সঙ্কটের দিনে কি হিন্দু কি অহিন্দু কি ভারতবাসী অথবা বিদেশী কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই ভ্রান্তি অজ্ঞতা অথবা বিবেকবুদ্ধির জন্য বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ একটা মহিমামণ্ডিত স্বরূপ বা তাহার একটা বিরাট স্বাতন্ত্র্য আছে।

যখন চারিদিকে এই নিরাশার ঘনঘোর অন্ধকার ভারতের তথা সমগ্র জগতের ধর্ম্ম-আকাশে তিমির অমানিশার সৃষ্টি করিয়াছিল—সেই সময় অকস্মাৎ কোন অদৃশ্য উদয়গিরি হইতে

হইতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল উদয় উষার উদার অরুণ জ্যোতি। বিস্মিত নেত্রে প্রত্যেক মুক্তিকামী দেখিল ভাগীরথী-তীরে দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী তপোবনে সমাসীন জগজ্জনীর বরপুত্র হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনাদ্বারা প্রমাণ করিলেন, "ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন—তিনি এক—কিন্তু তাঁহার বিভিন্ন নাম—প্রত্যেক ধর্ম্মমত তাঁহাকে লাভ করিবার এক একটি পথ। ঈশ্বর, আল্লা, God, Jove হরি, পরমাত্মা জগজ্জননী তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম।" নিজের অপরিমেয় ও অভ্রভেদী ধর্ম্মানুভূতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই বলিতেন, "এখানকার উপলব্ধি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে অনেক দূরে চ'লে গেছে।" অথবা স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে যেমন লিখিয়াছেন, "He (Sri Ramkrishna) has lived that one single life which the whole Hindu nation has lived for ages"—যুগ যুগ ধরিয়া সমগ্র হিন্দুজাতি যে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণের এক জীবনেই তাহা স্তরে স্তরে সমন্বিত হইয়াছে।

ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, পরধর্ম্মবিদ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা ও ধর্ম্মান্ধতা দূর করিবার জন্যই ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁহার জীবন, বাণী সাধনা, আচার ও আচরণ সর্ব্বদাই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাবের নিদর্শন ছিল। "সম্প্রদায়পূর্ণ পৃথিবীতে আর একটি নতুন সম্প্রদায় গড়বার জন্যে ঠাকুর আসেননি"—স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি আসিয়াছিলেন পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসীর সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামী, ধর্ম্মান্ধতা ও দলাদলি ঘুচাইয়া তাহাদের মধ্যে মিলন, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন, "গণ্ডীর ভেতরে থাকলে সত্য লাভ হয় না।" ধর্ম্মসাধনার নামে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে জঘন্য ঘৃণা হিংসা দলাদলি জগতে বিদ্যমান সে সকলকে পরমহংসদেব সর্ব্বদাই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ এইগুলি কোন মতেই ধর্ম্মসাধনার সহায়ক নহে—পরন্তু ধর্ম্মলাভের পথে দারুণ অন্তরায়। এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা পৃথিবীতে শুধু ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, অজ্ঞানতারই প্রসারই করিয়া থাকে। ইহার দানবীয় প্রভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যুগে যুগে মানুষ মানুষের উপর অকারণ অত্যাচার, অবিচার ও নৃশংসতা প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয়পাত্র (Chosen people) এবং অপর সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায় ঈশ্বরের অপ্রিয় বা পরিত্যক্ত নয়। এই যুক্তিবাদের যুগে ইহা মনে করা শুধু অজ্ঞানতারই পরিচায়ক ও উপহাসের বিষয়। সত্য কোনদিনই কখনও কোন ব্যক্তিবিশেষ, পুস্তকবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সত্য চিরদিনই অনাদি অসীম অনন্ত এবং তাহা চিরদিনই সম্প্রদায় বা গোঁড়ামীর প্রাচীরের বহির্ভূত। অন্ধবিশ্বাস, ধর্ম্মান্ধতা, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা, কুসংস্কার অথবা বহুকাল প্রচলিত ভ্রান্তপ্রথা ও জনশ্রুতি প্রভৃতিতে

আবদ্ধ থাকিলে মানুষ কখনই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব সেইজন্য তাঁহার 'শিষ্যবৃন্দ শ্রোতা দর্শনার্থী ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগকে ধর্ম্মের নামে যুক্তিহীন, অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত আচার বিশ্বাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে বলিতেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, "এই দুর্ল্লভ মানুষ জন্ম পেয়ে যে ভগবানকে লাভ করতে চায় না তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই।" সংসারের আপাতরম্য ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া মানুষ শুধু অশান্তি, শোক, জ্বালা, দুঃখ ও মনোকষ্টে পীড়িত হয়। ঠাকুর সেইজন্য বলিতেন, "ভগবানকে না ধ'রে থাকলে সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তি নেই।" সেইজন্য কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি 'মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কী ?' এই কথা পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর উত্তর দিতেন "মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।" ইহার উপায় কি ?—এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিতেন, "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ—বিবেক বৈরাগ্য শুদ্ধাভক্তি আর তার জন্যে আন্তরিক ব্যাকুলতা।"

ধর্ম্মের যাহা মূলনীতি তাহা পালন না করিয়া শুধু বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে বা প্রতিপালনে ধর্ম্মলাভের আশা দুরাশা মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "সংযম সত্যনিষ্ঠা ধ্যানাভ্যাস বিবেক বৈরাগ্য পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্ম্মের এই সমস্ত মূলনীতির অভ্যাস অনুশীলনই ধর্ম্মজীবন যাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা।" কিন্তু আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি, শত শত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জটাজুট তিলক মালা ভস্ম রুদ্রাক্ষ চিমটা গৈরিক ইত্যাদি বাহ্য বেশভূষা ও অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানেরই অধিকতর যত্নশীল ও সমর্থক। সাধু বা ভক্ত বলিয়া যাঁহারা আপনাদের পরিচিত করেন তাঁহাদের অনেকেরই মধ্যে প্রধানতঃ এই সকল বাহ্য আচারের আতিশয্যই দেখা যায়। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার জীবনে এই সকল বাহ্য আচার আচরণ অপেক্ষা সংযম ত্যাগ পবিত্রতা ধ্যাননিষ্ঠা ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণগুলিকেই ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মহাজীবন অনুধ্যান করিলে আমরা স্পষ্টই দেখি যে, আত্মসংযম, বিবেক বৈরাগ্য ধ্যানাভ্যাস পবিত্রতা প্রভৃতির নিয়মিত অনুশীলন না করিলে কোন মানুষ কোনক্রমেই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ "মদীয় আচার্য্যদেব" বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম শুধু বাক্যের আড়ম্বর নয়—ইহা মতবাদ বিশেষ অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করাই ধর্ম্মের কার্য্য। * * মন্দির বা গীর্জ্জা তৈয়ারী অথবা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম্ম হয় না। অথবা কোন গ্রন্থে, বচনে, বক্তৃতা অথবা সঙ্ঘে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের আসল তত্ত্ব—আত্মোপলব্ধি।" এ সম্বন্ধে সিদ্ধ সাধক কবীরও বলিয়াছেন :—

"মুড়মুড়াইকে জটা বনাইকে লাঙ্গা ফিরে ভঁইসা
ভাবভক্তি সাধন না করে মন রেইসা রহে ঐসা"

অর্থাৎ শুধু মস্তকমুণ্ডন, অথবা জটাধারণ কিম্বা গো মহিষাদির ন্যায় বিবস্ত্র হইয়া বিচরণ এবং ভক্তিভাবহীন ও সাধনাবর্জ্জিত হইয়া থাকিলে (ধর্ম্মান্বেষীর) মন পূর্ব্ববৎ অবনতই থাকিবে, কিন্তু কিছুই উন্নত হইবে না। ঠাকুরও তাই বারবার বলিতেন, "যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে সে-ই সাধু—যে যথার্থ কামকাঞ্চন ত্যাগী সে-ই সাধু।" বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ বিশেষ বাঙলার হিন্দুজাতি ধর্ম্মের সার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অসার ভাগ লইয়াই মত্ত ছিল। ধ্যান ধারণা ভক্তি সংযম বিচার অপেক্ষা অনর্থ আচারই হিন্দু সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্যের অভাবে প্রবল হইয়াছিল। সেইজন্য ধর্ম্ম শুধু শাস্ত্র পুঁথির মধ্যেই নিহিত ছিল। জগজ্জননীর বরপুত্র জগজ্জননীর শক্তিতে শক্তিশালী মহামানব রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্ম তথা বিশ্বধর্ম্ম আবার জাগ্রত ও জীবন্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য ও শ্রেষ্ঠতার সত্যই প্রমাণিত হইল।

ধর্ম্মলাভে, ঈশ্বরলাভে, মুক্তিলাভে সকলেরই সমান অধিকার। ইহার মধ্যে ভারতীয় অভারতীয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, গৃহী সন্ন্যাসী, পুরুষ নারী প্রভৃতি ভেদ নাই। সত্য লাভের জন্য যে যোগ্য সে যে জাতি যে দেশ যে বংশের অন্তর্গত হউক না কেন সে-ই সত্যকে লাভ করিবে। ইহাই বিভিন্নযুগে বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মগুরুগণ প্রচার করিয়াছেন—তথাপি ধর্ম্মব্যবসায়ী সঙ্কীর্ণচেতা ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থনীতিকে উচ্ছেদ করিয়া এক অভিনব সাম্য মন্ত্র প্রচার দ্বারা ধর্ম্মসাধনায় আবার সকল জাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। একবার একব্যক্তি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণ-শরীর না হ'লে মুক্তি হবে না।" তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "ওকি কথা? যার ভক্তি আছে—তারই মুক্তি হবে।" তিনি বারবার বলিতেন "ভক্তিমান চণ্ডাল ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ।" পরমহংসদেব মানুষের বংশগরিমা অথবা জাতি দেখিয়া তাহার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করিতেন না। পরন্তু সাত্ত্বিকতা পবিত্রতা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি দেখিয়াই তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করিতেন। সেইজন্যই দেখা যায় তাঁহার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অনেকে সদব্রাহ্মণ বংশে জাত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞতা ত্যাগ, সংযম, ধ্যানসিদ্ধ প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া কায়স্থ বংশজাত স্বামী বিবেকানন্দকে (পূর্ব্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) তিনি আপনার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। স্বয়ং বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করা এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণতার চলবিগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও মানবতম চণ্ডালকেও মূর্ত্তনারায়ণ জ্ঞানে তিনি প্রণাম করিতেন। জাতিভেদের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য তিনি স্বহস্তে পায়খানা ও নর্দ্দামা পরিষ্কার করিয়া নিজের কেশ দ্বারা সেইস্থান মুছিয়া দিয়াছিলেন। জাতিভেদকে পরমহংসদেব কোনদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি উহাকে চিরদিনই ঘৃণা করিতেন। চরিত্রহীন 'ব্রাহ্মণ' অপেক্ষা চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক শূদ্রই তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল।

অনেকের ধারণা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মাদর্শ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। তিনি শুধু সন্ন্যাসীর আদর্শ নহেন, তিনি গৃহীদেরও আদর্শ। তাহা যদি না হইতেন তাহা হইলে ঠাকুরের জগদ্‌গুরু নাম সার্থক হইত না। সেইজন্য একাধারেই ঠাকুর আদর্শ সন্ন্যাসী ও আদর্শ গৃহস্থের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থের আদর্শ জীবন যাপন করিয়া শিক্ষা দীক্ষাদ্বারা স্ত্রীকে ধর্ম্মসাধনায় সহায়িকা, সহচরী ও সঙ্গিনী করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক করা যায়—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন অবলম্বনে ঠাকুর সমগ্র জগৎকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের বিবাহিত জীবন ধর্ম্মজগতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর ঘটনা। ঠাকুর ও শ্রীমা একে অন্যের মধ্যে সদা সর্ব্বদা জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ দেখিতেন। শুধু তাহাই নয় স্বীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে জগজ্জননীর ষোড়শীমাতৃকা মূর্ত্তির যথাবিহিত পূজা অনুষ্ঠান দ্বারা ঠাকুর আপনার সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন সকলের জন্য—তিনি একদেশদর্শী নহেন পরন্তু সর্ব্বভাবময়। গৃহী-সন্ন্যাসী, পুরুষ নারী, হিন্দু-অহিন্দু সকলের জন্য তিনি ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীবৃন্দের শিক্ষার জন্য যেমন ঠাকুর একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ সর্ব্বত্যাগী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ শিষ্যবৃন্দকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি শান্তসংযত ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধনসিদ্ধ গৃহস্থ শিষ্যদেরও জীবন তিনি গঠন করিয়াছিলেন। সকলের জন্যই ঠাকুর আসিয়াছিলেন—কেহই তাঁহার কাছে অনাদর উপেক্ষার ও অবহেলার পাত্র ছিল না। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ঠাকুর ছিলেন সকলের—তাই দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী তপোবন ছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, বাউল, সন্ন্যাসী, মুসলমান খৃষ্টান সকল সাধকেরই মহা মিলনতীর্থ।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মান্বেষী ও সাধকেরা ঠাকুরের কাছে আসিতেন। প্রত্যেক সাধকই ঠাকুরের মধ্যে আপন আপন ধর্ম্মভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতেন। সত্য সত্যই তিনি ছিলেন নিখিল ধর্ম্মভাবের মহা পারাবার। অপার মহাসমুদ্রের তরঙ্গের সংখ্যা যেমন অগণিত তেমনি ঠাকুরের ধর্ম্মভাবেরও ইয়ত্তা হয় না। ঠাকুরকে দেখিয়া শক্তিসাধক বলিয়াছেন, "জগন্মাতার জীবন্ত মূর্ত্তি"—শান্ত সমাহিত অন্তর্মুখী ভাব ও গভীর সমাধিতে ঠাকুর শৈব সাধকদের নিকট 'শিব' বলিয়া প্রতীয়মান। বৈষ্ণবভক্তেরা ঠাকুরের প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা ও মহাভাবের বিকাশ দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন "সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য।" বাসনা-বিমুক্ত ধ্যাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীবৃন্দ ঠাকুরের মুহুর্মুহু নির্ব্বিকল্প সমাধি দেখিয়া বলিয়াছেন 'মূর্ত্তিমান বেদান্ত।' এই প্রকার শিখ, রাধাবৈষ্ণব, বাউল, এমন কি মুসলমান খৃষ্টান সাধকেরাও তাঁহার মধ্যে আপন আপন আপন ধর্ম্মসাধনার পরিপূর্ণতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি নিবেদন

করিতেন। তাঁহার মধ্যে এই সকল ভাবতো ছিলই, তাহাছাড়া আরও কত কি ভাব যে ছিল তাহা বুঝিয়া উঠা মানব বুদ্ধির পক্ষে অসাধ্য। ঠাকুর হিন্দু জাতিতে ও ভারতবর্ষে জন্মাইলেও তাঁহার জীবন কোন দেশ বা জাতিতে আবদ্ধ নয়। তাঁহার মহান আদর্শ সমগ্র মানবজাতিকে মুগ্ধ করিতেছে। স্বর্গীয় ফরাসী মনীষী সিলভ্যাঁ লেভি যথার্থই বলিয়াছেন, "Sri Ram Krishna's name is common property of the whole mankind."

এই প্রকার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরাভিন্ন দিব্যমানব সমগ্র মানব জাতিরই গৌরব। জীবের দুঃখে তিনি ব্যাকুল—করুণার তিনি মহা পারাবার। সংসারদগ্ধ নরনারীর শান্তি সান্ত্বনা ও মুক্তির জন্যই তিনি দেহরূপ স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। অহেতুক প্রেমের সাগর তিনি, তাই পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিত সকলেরই ঠাকুর নিজের কাছে ঠাঁই দিয়াছেন। এই অলোকসামান্য জীবনের অনুধ্যান ও তাঁহার উপদেশ আন্তরিকভাবে পালনেই মানুষের মুক্তি ও পরমকল্যাণ। যে ভাব যে আদর্শ যে মহাশিক্ষা তিনি আপনার জীবনের দ্বারা সকলকে প্রদান ও প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাকে যদি যথাযথভাবে পালন করিতে আমরা সচেষ্ট হই তাহা হইলে আমরা তাঁহার যথার্থ ভক্ত হইতে পারিব। ইহাই তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শনের প্রকৃত পন্থা। নতুবা তাঁহার উপদেশের বিপরীত জীবন যাপন করিয়া শুধু মুখে তাঁহার স্তবস্তুতি বন্দনা করিলে কোনই ফল হইবে না। ইহা যে শুধু ভক্তির আবরণে তাঁহাকে অস্বীকার করা নয় পরন্তু শোচনীয় আত্মপ্রবঞ্চনা। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হইতে হইলে আমাদিগকে সমস্ত অনুদার সঙ্কীর্ণভাব অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে—কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ও সমস্ত মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। মানুষে মানুষে কোন ভেদনীতি রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া অসম্ভব। সেই তীব্রবৈরাগ্য, শুদ্ধাভক্তি, সেই আত্মহারা ধ্যানতন্ময়তা, অনাবিল সারল্য, তুষারশুভ্র পবিত্রতা আমাদের জীবনে প্রতিপালিত না হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক বলিয়া পরিচয় দিবার কোন অধিকারই আমাদের নাই। সেইজন্য আমাদের প্রার্থনা শ্রীঠাকুর আমাদের সাংসারিক মোহমলিনতা কুটিলতা হইতে মুক্ত করুন। আমরা যেন সমস্ত অন্তরে সমস্ত মনেপ্রাণে তাঁহার উপদেশকে জীবনে পালন করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হই, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে আমাদের সকলের জীবন মুক্ত ও অমৃতান্বিত হইয়া উঠুক।

<u>গ্রন্থ সমালোচনা</u> :—সত্যেরপথ বা 'আমি'র সন্ধান—লেখক শ্রীমৎনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক শ্রীজনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য বি,এ। খানিপুর সেবসঙ্ঘ—পোঃ পলাস, ঢাকা। মূল্য ছয় আনা।

এই পুস্তকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকাশক লিখিয়াছেন এবং বইখানি পড়িয়াও দেখা যায় যে

গ্রন্থকার একজন একনিষ্ঠ সাধক—সেইজন্য এই পুস্তকে ধর্ম্ম সাধনার যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে অনেক ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর মনকে তৃপ্তি দান করিবে। কোন জটিল তর্ক বিতর্ক বা পাণ্ডিত্যের বৃথা আড়ম্বর ইহাতে দেখান হয় নাই। সাধনের সাধনায় যাহা অনুভূতিরূপে দেখা দিয়াছে সেগুলির সহিত ভগবদ্‌গীতা প্রমুখ শাস্ত্রের উক্তির সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার উদার চেতা ও মহানুভব ব্যক্তি।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র

Darjeeling
29. 6 '37.

স্নেহের—

তোমার ২৪ তারিখের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি সংসারের বন্ধন অনুভব করিতেছ এবং শান্তি পাইতেছ না—ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার উপায় জানিবে। সংসারে বাস করিতে হইলে পাঁকাল মাছের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে হইবে। এবং সমস্ত কর্ম্মের ফল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিবে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সংসারের কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিবে।

এখনও তবু তোমার সংসারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নাই। তাহাদের ভার বহন করিতে হইলে কতটা শান্তি ও আনন্দ পাইবে তাহা অনুমান করিতে পার! কর্ম্মক্ষেত্রে যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ সেই কার্য্যসকলকে "work is worship" এই ধারণা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছি এই জ্ঞান রাখিবে এবং ইহার ফলাফল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ (Resignation to the will of the Lord) করিলে প্রাণে শান্তি পাইবে। "ফলে সক্তো নিবধ্যতে"। ত্যাগ করা এবং কামাদি রিপু জয় করা কঠিন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে বাস করিলে তাহাদের মনের ভাব তোমার মনে উঠিবে এবং তাহাদিগের পথের পথিক হইতে হইবে। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারের সহিত বিষয় ভোগ করিবার পর ত্যাগের ভাব আসিবে। তখন নিবৃত্তিমার্গে চলিতে পারিবে। কামক্রোধাদির মোড় ফিরাইয়া ভগবানের দিকে চালাইতে হইবে। সকল স্ত্রীলোককে জগন্মাতার মূর্ত্তি জ্ঞান করিবে।

যখনই কামভাব আসিবে তখনই ঐরূপ চিন্তা করিবে। শান্তি পাইতেছ না ভাবিয়া নিজের মনের উপর ক্রোধ করিবে এবং শান্তি প্রার্থনা করিবে। অধিক আর কি লিখিব তোমরা আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

IS VEDANTA PANTHEISTIC ?

Swami Abhedananda

Wherever we go we meet people who ask these questions : "Is not your Philosophy Pantheistic ?" "Is not Hinduism Pantheistic ?" "Has it not been proved that your Vedanta Philosophy teaches Pantheism ?" It is curious to notice how this word "Pantheism" prejudices the minds of the western people. Whenever it is uttered or read or heard of, it is disliked immensely. It changes the whole attitude of the reader or listener.

But if we should ask such persons what they understand by that word, perhaps very few would be able to answer correctly. Moreover, if we ask them "What harm is there in the Hindu belief or in Pantheism ?" they can make no reply. Nevertheless they have a strong impression that it is very wrong to be a Pantheist.

If we undertake to trace the original meaning of the word "Pantheism," we shall have to go back to Greek mythology. There we find that the ancient Greek shepherds used to believe in a god whom they worshipped, and whom they called Pan. They believed that god Pan was the god of the flocks and the shepherds ; that he was the guardian of the fishermen and of the bee-keepers ; he was the patron of all persons occupied in hunting and in fishing. This god Pan has been described poetically as having the head and trunk of a man, with horns and goat's beard, pugnose, pointed ears, and tail, and with goat's feet. He was very fond of music. He was the inventer of the shepherd's lute, which he used to play upon. This poetic description of the god Pan is nothing but the crude, imperfect symbolization of the conceptian of God which the shepherds of those days had. The picture is a symbol of the spirit of nature which exists in man, in beasts, in fishes, in birds, in insects, in plants. The shepherds thus understood the kinship which exists among all living creatures and things. Gradually this idea was changed, and extended. The god Pan became the god of the hills, mountains, rivers, etc, and afterwards he came to be identified with every personified object of nature.

And these were the first meaning of the word "Pantheism." We may call them obsolete forms of "Pantheism." At first, then, there was the worship of the god Pan afterwards the worship of nature in all of its personified objects and forces Pan, means all, and theism means belief in a god. Pantheism in its rudest forms was universal godism. It asserts the consubstantiation of God with nature.

During the centuries, new conceptions, new ideas have been added to the primitive forms of Pantheism, until to-day we hear of many varieties of Pantheism. Poetic, Æsthctic Pantheism, Doctrinal Pantheism, Realistic Pantheism, Philosophic Pantheism, Materialistic Pantheism, Scientific Pantheism, etc. The Poetical, Æsthetic Pantheism is nothing but worship of nature for its beauty or for itself. Doctrinal Pantheism is based on the doctrine that everything—all this universe is the everchanging manifestation of God, and, consequently, by worshipping the objects of nature we worship God. Realistic Pantheism is that in which the natural causes of the phenomenal world are personified and deified. As, for instance, if matter be the cause of all the phenomena, then matter would be the object personified and deified. If heat be the cause of natural objects, then heat would be personified, deified, and worshipped. That is what we call Realistic Pantheism. Spinoza's philosophy or Pantheism is philosophic Pantheism. Spinoza believed that there is one universal being, or substance, which is the cause, and whose attributes are mind and matter, thought and expansion.

Materialistic Pantheism holds that matter is the cause of everything, as we find in the system of Strauss and other materialists. It is sometimes called "Atheistic Physics." Among the Greek philosophers, Xenophon was the first to promulgate the doctrine. The Idealistic school taught Idealistic Pantheism, which tended to absorb the world in God ; while the Materialistic Pantheism of the Ionic school tried to absorb God in the world, and differed from Atheism merely in name. In the epistle of John we find an echo of Idealistic Pantheism, in such passages as "God is love" "Whosoever dwelleth in love dwelleth in God, and God in him."

In modern times the philosophies of Schlegel, Scheling, Hegel, and other German philosophers teach the same Idealistic Pantheism. In the middle ages some of the Christian mystics believed in the Idealistic Pantheism, but could not express their ideas perfectly. Those who did

express them were persecuted. In 1600 Giordano Bruno was burned at Rome for his Pantheistic opinions. When he was asked what he believed in, he said that he did not believe in creation, but he believed in the world as an emanation of the Infinite Mind. He said, "To realize God everywhere, to see God everywhere, and to realize that He alone Is, and all else is perishable phenomena and passing illusion ; that there is one intelligence existing in God, in man. in beast, and in all that we call matter ; this would be the aim of true philosophy." Goethe was an Idealistic Pantheist. Most of the eminent English poets, such as Wordsworth, Shelley, Tennyson, Byron, were Pantheists of their day. In America Emerson is considered by many an Idealistic Pantheist.

But there is still another kind of Pantheism which is known to modern times as Scientific Monism. Herbert Spencer, Huxley, John Fiske, Voltaire, M. Thompson, and several other modern scientists of to-day believe that there is one unknown and unknowable reality, which is the basis of mind and matter, and which is the cause of all phenomenal appearances.

Thus we see there are many kinds of "Panthçism." Such being the case, when we ask "Is Vedanta Panthiestic ?", we shall have to find out what kind of Panthiesm we mean. If we consider the meaning or common conception of Pantheism, which is nothing but this,—the worship of the unconscious or personal nature as God,—then we say Vedanta is not Pantheistic. If we take Webster's definition, that Pantheism is the doctrine which says there is no God but the combined forces or laws that are manifested in the existing universe—then we say Vedanta is not Pantheistic, it does not teach that. Vedanta does not believe in such a God ; consequently, it cannot be Pantheistic. Vedanta does not teach Æsthetic Pantheism, because Vedanta does not teach the worship of nature. It does not teach Realistic Pantheism nor Philosophic nor Idealistic nor Scientific nor Materialistic Pantheism. We cannot limit Vedanta by any of the "isms" of the past, present, or future. None of these 'isms', such as theism, monotheism, deism, pantheism, or monism, can accept all the teachings of Vedanta ; but, on the contrary, Vedanta can embrace a theist and a monotheist with one hand, a deist or pantheist or monist with the other.

You may ask : "How can it be possible to embrace those which are

diametrically opposed to one another? It is possible in Vedanta. Because Vedanta says that all these differences in 'isms' are merely differences of degree and not of kind. Vedanta says that all these 'isms' appear to have their real value when they are understood as relating to the different stages of our spiritual evolution. As the conception of God in us gradually grows higher and higher, so we pass from one 'ism' into another. Each of these 'isms' marks a different stage of spiritual evolution, and Vedanta recognizes them all.

Vedanta accepts the idea that there is a natural evolution of our spiritual conception, and it teaches that each individual mind passes through all the different stages that lie in animism or polytheism on the one hand, and the highest form of monism on the other.

A man who follows the teachings of Vedanta can be a theist, a monotheist, a deist, a pantheist, a monist. He may belong to any sect or class creed or denomination or to any religion, and still be a follower of Vedanta, if he does not limit his God to any peculiarity of doctrine or dogma; if he does not say "My 'ism' alone is true and correct, and all other 'isms' are wrong." Vedanta tells you to belong to any sect or ereed or denomination or religion, but it tells you at the same time not to stop in any of the 'isms'. It bids you go forward, always keeping the mind open to the truth. According to Vedanta, each of these 'isms' is like a class in the school of religion, and the individual soul is a study in that school. If any one stops in one class and spends his life there, thinking that there cannot be anything higher than that, then his progress will cease. Let him know that there are other classes higher than that. Let him strive to attain to those. Let him try to be promoted to those classes. Let him grow—march onward until he reaches the eternal ocean of truth. None of these 'isms' is the reality of God. They are nothing but the names of certain stages in the path of spiritual realization.

When we realize this, why should we find fault with the 'isms'? Why should we hold that this 'ism' is better than that 'ism,' or that 'ism' is better than this 'ism', etc.? If we realize that each one is in the path of that realization of the Eternal Truth, then all quarrels cease forever. There is no fault-finding, there are no curses, no persecutions. As Vedanta teaches this, how can we say that Vedanta is pantheistic?

Vedanta presents two aspects of the same reality: one is the Eternal

Ocean of intelligence, existence, and bliss, without attributes, which is called the absolute; the other aspect of this same reality is said to be "with attributes." That is, when this Eternal Ocean of Truth is related to this phenomenal universe, then it becomes the God, the Creator, the preserver, the father, the mother of the universe. He is a personal God; He has all the attributes which we give to personal God. He is worshipped by all the dualists, theists, monotheists, and all other kinds of dualists that exist upon the face of the earth.

But the same God, the same reality in nature, looked at without reference to the phenomenal world, becomes an impersonal God, an absolute; the "Substantiation" of Spinoza; an animism of the philosopher; the unknown and unknowable of scientific monism. We cannot pray to or worship Spinoza's "Substantiation." What would be the use of praying to that? Absolute cannot be worshipped. There is no such difficulty in Vedanta, because it admits that the personal God is the father or the mother.

"He is the father of the universe, both animate and inanimate. He is worshipped by all, under different names. There is nothing in the universe which can be equal to him; how can there be anything greater?" There are many such expression. But those who do not go beyond this phenomenal existence beyond the relative world do not believe in the existence of that absolute, divine essence. Vedanta has no harsh word to say to these persons It has no quarrel with them; but at the same time it leaves room for those who are philosophical and those who are more advanced in spirituality than an ordinary dualist. But people may think Vedanta is pantheistic, without understanding the meaning of the word. It is not pantheistic. It is a spiritual oneness. It is the sameoneness which we find expressed by the great prophets of the world. We find in the expressions of Jesus, "I and my Father are one." We find it in the expressions of the Hindu sage or prophet, "I am He." The expression is nothing but the spontaneous expression of the realization that lies behind.

Vedanta is not antagonistic to any existing religion, sect, or creed It has no quarrels with Christianity, Mohammedanism, Judaism, or Buddhism. The follower of Vedanta can go to the church, the synagogue the mosque, or the temple, and can worship whetever he pleases. People may call him a Christian, a Mohammedan, a Hindu, or a Buddhist, but he

does not see any difference, except in words. We may worship that eternal being through Jesus or through any other prophet. If we only admit that all these 'isms' are nothing but different stages of spiritual evolution, if we have no quarrel with anybody or sect or creed or denomination; if we are not bound by any sectarian dogma or creed or narrow idea, if we are free from superstition, prejudice, and bigotry—then we are true followers of Vedanta. Pantheism is antagonistic to theism, but Vedanta is antagonistic to none. In panthcism the prevailing idea is that God has been changed into matter and force ; but Vedanta does not teach that. Vedanta says that God is unchangeable ; he can never be changed into any matter or force or anything else ; that matter and force are nothing but the expressions of the Divine Will, which is eternal. That Divine Will is working in nature. The God of Vedanta is a living God. In Him we live, through Him we exist, without Him there cannot be anything.

Vedanta does not teach special creation, but it teaches that the whole phenomena of the universe is the expression or manifestation of the Divine Will. That Divine Will is understood by the modern scientists. and is called by them "the eternal energy." All the laws of nature are nothing but the molds in which that Divine Will works in the universe.

The true follower of Vedanta is sometimes dualistic, sometimes monotheistic, sometimes monistic. When he realizes that his body is the temple wherein dwells that divinity, when he identifies himself with his body, then he says, "I am nothing ; Thou art mine all. Thou art the creator, I am the creature." When he sees the divine image that is within him, he says, "I am part and parcel of Thee." And when he sees this Spirit, which is divine and immortal, he says "I and my Father are one."

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	৯১
২। অদ্বৈতবাদ	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	৯২
৩। ডায়েলেক্‌টিক্ তত্ত্বে শ্রেণীগত বৈষম্য	শ্রীকুমুদবন্ধু সেন	৯৯
৪। পাণিনি	৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১০২
৫। স্বামী অভেদানন্দের চিঠি	... ...	১০৯
৬। কয়েকখানি প্রাচীন দলিল	শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	১১০
৭। জীবন	শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল	১১৬
৮। সংঘবার্ত্তা	... ...	১১৮
৯। The Ideal of Education	Swami Abhedananda ...	33

শাস্ত্রের গৌরব আলোকই ধর্ম্মের যথার্থ প্রকাশক

সমস্ত ধর্ম্মের গৌরব-দীপ্ত প্রধান শ্রেণীর ধর্ম্ম-পুস্তকসকল বিক্রয়ের জন্য আমরা রাখিয়া থাকি।

১। সাংখ্য দর্শন	১।০	১৯। পদ্ম পুরাণ	১॥০
২। গীতার ভূমিকা	১।০	২০। শিব পুরাণ	২॥০
৩। বেদ প্রবেশিকা	২॥০	২১। বিষ্ণু পুরাণ	১॥০
৪। সরল সাংখ্যযোগ	।৵০	২২। কল্কি পুরাণ	১।০
৫। পাতঞ্জল যোগ দর্শন	৩।০	২৩। নারদ পুরাণ	১।০
৬। যোগ সোপান	।৵০	২৪। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	২॥০
৭। কর্ম্ম তত্ত্ব	১৲	২৫। বামন পুরাণ	২৲
৮। বেদান্ত দর্শন ১ম—৪র্থ	৯৲	২৬। অগ্নি পুরাণ	৩৲
৯। গুরু শাস্ত্র	॥৵০	২৭। মার্কণ্ড পুরাণ	১।০
১০। পাতঞ্জল দর্শন	২॥০	২৮। ধর্ম্ম পুরাণ	২৲
১১। সাংখ্য সূত্রম্	১৲	২৯। ভক্তমাল মহাগ্রন্থ	২॥০
১২। পরলোক রহস্য	।৵০	৩০। সটীক দশকর্ম্ম পদ্ধতি	১৲
১৩। বেদান্ত সার	॥৵০	৩১। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব	২৲
১৪। মহাভারত	২॥০	৩২। বিবেকানন্দ চরিত	৩৲
১৫। রামায়ণ	১॥০	৩৩। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম-৫ম)	৭॥০
১৬। শ্রীমদ্ভাগবত	১২৲	৩৪। স্বামী অভেদানন্দ (জীবনী)	।৴০
১৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	১॥০—৩৲	৩৫। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (")	৪৲
১৮। চৈতন্য চরিতামৃত	২॥০	৩৬। আত্মজ্ঞান (স্বামী অভেদানন্দ)	৮০

ইহা ছাড়া আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলার উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা,—ফোন বি, বি, ৩৮৭৫

স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতি-মন্দির

আবেদন

কাশীপুর শ্মশানতীর্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধি-মন্দিরের ঠিক পার্শ্বেই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পার্থিব দেহ আজ একবৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল। কিন্তু সে স্থানে এযাবৎ তাঁহার কোন স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত হয় নাই। ওই স্থানটিতে স্বামিজী মহারাজের একটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ একান্তই প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগত শুভ জন্মতিথি পূজার দিনে (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১) ওই স্থানে স্বামিজীর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন আমাদিগকে উক্ত স্থানটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছেন। কিন্তু ওই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অনুমান পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়িবে তজ্জন্য এই কার্য্যে সাহায্য পাইবার আশায় আমরা আজ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই শুভকার্য্যে যিনি যে প্রকার অর্থ সাহায্য করিবেন তাহা নিম্ন ঠিকানায় একান্ত শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে। ইতি

প্রেসিডেণ্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও সমিতি

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ | চতুর্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সোম

হে রামকৃষ্ণ যে মহামন্ত্র বিশ্বে করেছ দান
মানব সাধন মন্দির মাঝে উঠে তারি জয়গান।
দীন ব্রাহ্মণ নহ তুমি দেব তুমি হে যুগাবতার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার ॥

বালক সুলভ সরলতাভরা মহান জীবন তব
জগতের মাঝে সাধনার রূপ দিয়ে গেছে অভিনব।
সাধক শ্রেষ্ঠ হইলে আপনি বর লভি দেবতার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার ॥

মাটির পুতুলে দেখালে হে দেব দেবতার সন্ধান
আরাধনা মাঝে শিব সুন্দরে করিলে মূর্ত্তিমান।
সাধনায় তব উঠিল বাজিয়া ধর্ম্ম বীণার তার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার ॥

সোনা করি' গেলে ছুঁইলে যাহারে হে গুণি পরশমণি
সকলে তোমাকে ভকতি কুসুমে পূজিছে দেবতা গণি।
স্থান পায় নাই পরাণে তোমার কুহক অহঙ্কার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার ॥

সকল ধর্ম্মে উপাসনা করি' মানিয়া সকল মত
বিশ্ববাসীরে দেখাইলে তুমি "যত মত তত পথ"।
উপাসনা মাঝে আঁখিজল হ'ল তব পূজা উপচার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার ॥

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপ বহু আশঙ্কার উত্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্য মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল মধ্যে পরবর্ত্তী যাবতীয় আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। যাহা হউক এই সব কারণে বৃত্তিকারের অনুসরণ করিয়া আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি এই আনন্দময়কে যে ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২) সূত্রে আনন্দময় শব্দে এই সকল আচার্য্য ব্রহ্ম বুঝিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বৃত্তিকারের মতে প্রথম ব্যাখ্যা করিয়া শেষে নিজ ব্যাসসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যানুসরণ করিয়া আনন্দময় শব্দের অর্থ জীব করিয়া "আনন্দময়"-শ্রুতিশেষে যে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্য আছে, সেই বাক্যের ব্রহ্মকে মুখ্যব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছেন। সুতরাং "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্যের যে ব্রহ্ম, তাহার ব্রহ্মই আনন্দময়ের অঙ্গরূপ ব্রহ্ম নহেন—এইরূপ সূত্রার্থ হইল। এস্থলে আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিলে সূত্রের সঙ্গে শ্রুতির বিরোধ হয়। একথা ভামতীকারও উল্লেখ করিয়াছেন—"বেদসূত্রয়োঃ বিরোধে গুণে ত্বন্যাষ্য কল্পনা ইতি সূত্রানি অন্যথা নেতব্যানি।" আর তজ্জন্য নিজগুরু ব্যাসদেবে দোষ স্পর্শ করে বলিয়া তাঁহার ন্যূনতা পরিহারের জন্য শঙ্করাচার্য্য এই আনন্দময়াধিকরণের সূত্রগুলির অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাসদেবের নির্দ্দোষতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথবা ব্যাসদেবের প্রকৃত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই কথাটি না বুঝিয়া পণ্ডিত রামমিশ্র ও তচ্ছাত্র থিবো সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আজকাল অনেকে বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যা সূত্রের স্পষ্টার্থ অবলম্বনে করেন নাই; অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য ব্যাসমতের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় শঙ্করাচার্য্যই ব্যাসের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে ব্যাসদেব শ্রুতিমীমাংসার মুখে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। ব্যাসদেব নিজ মত প্রকাশের জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। অধিক কি যেখানে তিনি নিজ মত বলিয়াছেন সেখানে তিনি নিজ নামই যোজনা করিয়াছেন। যাহা হউক উদ্ধৃত শ্রুতি হইতে অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ শ্রুতি ও সূত্রের বিরোধ স্থলে সূত্রই অন্যথা ব্যাখ্যাত হয়, ইহা শবরস্বামী মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন। এই কথা বেদান্তকল্পতরু মধ্যেও কথিত হইয়াছে। যথা—"তথাচ আচার্য্য-শবরস্বামী বর্ণয়াম্বভূব লোকে যেষু অর্থেষু প্রসিদ্ধানি পদানি তানি সতি বেদাবিরোধ-সম্ভবে তদর্থান্যেব সূত্রেষু ইতি অবগন্তব্যম্ ইতি" (১২০ পৃঃ)। তাহার পর—

(গ) "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি॥" (২।৪)

অর্থাৎ "যাহা হইতে বাক্য সকল মনের সহিত তাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মের সেই আনন্দকে, যিনি জানেন তিনি কখনও ভীত হন না।"—এখানে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে বাক্য মনের অগোচর বলায়—এক নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত বস্তুর সন্ধান প্রদান করা হইল। অন্য শ্রুতিতে "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" অর্থাৎ দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়—বলায় এবং এখানে সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি ভীত হয় না বলায়—সেই অদ্বৈত তত্ত্বের কথা উপদেশ করা হইল। এখানে "ব্রহ্মের আনন্দ" এইরূপে ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা বলায় ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ নহেন, কিন্তু আনন্দরূপ একটী ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু "রাহুর মস্তক" এইরূপ প্রয়োগে অভেদেও ষষ্ঠী হয় বলিয়া এস্থলেও অভেদে ষষ্ঠী গ্রহণ করাই সঙ্গত। কারণ, "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যে আনন্দ ও ব্রহ্মকে অভেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের আনন্দ এই বাক্যে আনন্দকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। আর এস্থলে ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর বলায় আনন্দকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলা যায় না। আনন্দকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিলে ব্রহ্ম বাক্য মনের অগোচর—ইহা বলা যায় না। কারণ, যাহার ধর্ম্ম থাকে তাহা বাক্য মনের অগোচর হয় না। নির্ধর্ম্মক বস্তুই বাক্য মনের অগোচর হয়। অতএব এস্থলে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষই বলা হইয়াছে। তাহার পর—

(ঘ) "সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তং চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে। (২।৬)

অর্থাৎ "তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। তিনি তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সৃজ্যমান জগতের রচনাদি বিষয়ে আলোচনা করিলেন, তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু সমস্তই সৃষ্টি করিলেন। এই সব সৃষ্টি করিয়া ইহাদের মধ্যে অনু প্রবেশ করিয়া সৎ ও ত্যৎ হইলেন। (সৎ অর্থ মূর্ত্ত এবং ত্যৎ অর্থ অমূর্ত্ত)। নিরুক্ত (সবিশেষ) ও অনিরুক্ত (নির্ব্বিশেষ), নিলয়ন (আশ্রিত), ও অনিলয়ন (অনাশ্রিত), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) সত্য (ব্যাবহারিক) ও অনৃত (প্রতিভাসিক)—এই যাহা কিছু সত্যই হইলেন। তাহা সত্য এই জন্যই বলা হয়।

এস্থলে সেই বস্তু বহু হইলেন বলায় তিনি বহু হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই এক ও অদ্বৈত ছিলেন বলিতে হইবে, এবং যিনি নিজে বহু হন, তিনি নিজে অক্ষুণ্ণই থাকেন বলিয়া পরেও অদ্বৈত আছেন। এইরূপে এই জগতের মূল যে এক অদ্বৈত, তাহা বহু শ্রুতির দ্বারা বলা হইল। আর এক বস্তু এক থাকিয়া বহু হইলে তাঁহার এক-রূপে থাকাই সত্য এবং বহুরূপ ধারণ মিথ্যা বা প্রাতিভাসিকই হয়।

যদি বলা হয়, যে বস্তু বহু হয়, তাহার মধ্যে বহুত্বসাধক তদ্ভিন্ন কিছু না থাকিলে তাহা বহু হয় কি করিয়া? অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতের উপদেশকল্পনা সঙ্গত হয় না। কিন্তু একথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, এস্থলে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত যাহা কিছু সবই সৃষ্ট হইতেছে বল্যয়, সেই মূলীভূত পদার্থমধ্যে অন্য কোন পদার্থের সত্তা কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। এই জন্য সৃষ্টিই মিথ্যা বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এই প্রকার অলৌকিক তত্ত্বের উপদেশজন্য শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। অতএব আশঙ্কা এস্থলে অসঙ্গত।

যদি বলা হয়—তন্মধ্যে অন্য বস্তু না থাকিলেও বহুত্বজননী শক্তিও তো স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহা হইলেই অদ্বৈতহানি হইল।—না, তাহাও নহে। কারণ, তাহা হইলে যে শক্তি সৃষ্টি করিল, সে শক্তি সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকিলে সৃষ্টির পূর্ব্বকাল আর সম্ভব হয় কি করিয়া? অতএব সৃষ্টি যেমন অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা এই শক্তিও তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ আছে কি নাই—কিছুই বলা যায় না। কার্য্য দেখিয়া কারণে শক্তি স্বীকার করা হয় বলিয়া কার্য্য না থাকিলে শক্তিও থাকে না বলিতে হয়। যদি বলা হয় গায়কের গান করিবার শক্তি গান না গাহিলেও তো থাকে, নষ্ট বলা যায় না? না, তাহাও নহে, সে ভবিষ্যতে গান গাহিলে তাহার শক্তি নষ্ট নয় বলা হয়। আর প্রত্যেক বারে একরূপ গানও কেহ গাহিতে পারে না, অতএব কার্য্য না থাকিলে শক্তিও থাকে না। সুতরাং অদ্বৈতহানির সম্ভাবনা নাই।

যদি বলা হয় "সত্যমভবৎ যদিদং কিঞ্চ" অর্থাৎ এই যাহা কিছু তাহা সত্য হইল। এই কথা বলায় জীবজগৎকে সত্যই বলা হইল। আর তজ্জন্য পরমাত্মার এই সব হওয়ায় পরমাত্মাকে অদ্বৈত বলা চলে না। জীবজগৎ মিথ্যা হইলে পরমাত্মাকে অদ্বৈত বলা চলিত। জীবজগৎ সত্য, অথচ অদ্বৈত বলিলে পরমাত্মার বিকার স্বীকার করিতে হয়, নতুবা সেই পরমাত্মার ভিতরে অবস্থিত এই জীবজগতের সূক্ষ্মাবস্থার অভিব্যক্তি বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও অদ্বৈতহানি হয়। এতদুত্তরে বলিতে হইবে—না, একথাও সঙ্গত নহে। কারণ "সত্যং চ অনৃতং চ সত্যম্ অভবৎ যদ্ ইদং কিঞ্চ" ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, যাহা কিছু সত্য এবং অনৃত অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য সে সকলই সেই সত্য ব্রহ্মই হইলেন। অর্থাৎ ইহা সেই ব্রহ্ম মধ্যে বীজাকারেও ছিল না, ব্রহ্মই এই সকল হইলেন ইহাই এস্থলে বলা হইল। কোন আকারে থাকিলে তিনি হইলেন—একথা বলা আর সঙ্গত হয় না।

যদি বলা হয় "যদিদং কিঞ্চ তৎসত্যম্ ইতি আচক্ষতে" এই বাক্যে এই উৎপন্ন জীবজগৎকেই তো সত্য বলা হইল; কারণ, "তৎ" পদের দুইরূপ অর্থ হয় যথা, একটী "সেইহেতু" আর একটীর অর্থ "সেই"। আর "সত্যম্" পদের অর্থ সত্য। সুতরাং উক্ত বাক্যের একটী অর্থ হয় "এই যাহা কিছু তাহা সত্য বলা হয়" আর একটী অর্থ হয়—"এই যাহা কিছু সেই হেতু সত্য বলা হয়"। এই দুই প্রকার অর্থেই জীব ও জগৎকে সত্য

বলা হইয়াছে। আর জীব ও জগৎ সত্য হওয়ায় সেই পরমাত্মা বিশুদ্ধ অদ্বৈত নহে, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বলিতে হইবে।

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, যে জীবজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে সত্য বলায়, সেই সত্য কখনই পরমাত্মার স্থায় সত্য—ইহা বলা হইল না। কারণ, পরমাত্মার উৎপত্তি নাই অথচ সত্য। পক্ষান্তরে তিনি জীব ও জগদ্রূপে উৎপন্ন হইয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। যখন তাহারা সত্য হইয়াছে, তখন তাহারা ব্যাবহারিক বা আপেক্ষিক সত্যই হইতেছে, পরমাত্মার স্থায় নিরপেক্ষ পারমার্থিক সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ কারণরূপে পরমাত্মার সত্যতাই কার্যরূপ এই উৎপন্ন জীব ও জগতে অনুস্যূত হইয়াছে বলিয়া ইহারা সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাই বুঝাইতেছে। কারণের ধর্ম কতকটা যে কার্যে অনুগত হয়, তাহা সর্ববাদিসম্মত বিষয়। অতএব ব্যাবহারিক সত্য এই জীব ও জগদাদি মিথ্যাই হইল, আর তজ্জন্য সেই পরমাত্মা অদ্বৈত, ইহাই সিদ্ধ হইল।

তাহার পর "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" বলায় জীব ও জগৎ কিছুই ছিল না বলা হইল, অর্থাৎ মূলে বা আসলে অদ্বৈতই সিদ্ধ হইল, ইহাই বলা হইল।

যদি বলা হয়, তবে যাহা সৃষ্টি করা হইল, তাহা তো কারণরূপে ছিল, বলিতে হইবে। নচেৎ তিনি নিজেকে বিকারগ্রস্ত করিয়া এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করিলেন—বলিতে হইবে? কিন্তু তিনি অবিকার, ইহা শ্রুতিতে বহুস্থলে কথিত হইয়াছে। অতএব এই সৃষ্টির উপাদান প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি কোন কিছু, সেই আত্মভিন্ন ছিল—বলিতেই হইবে। আর তাহা যদি আত্মা হইতে স্বাধীনসত্তাক হয়, তাহা হইলে দ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় এবং যদি বিশেষ্য-বিশেষণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতবাদ তো সিদ্ধ হয় না।

এতদুত্তরে তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এই সৃষ্টি সেই আত্মবস্তুর শক্তিবিশেষের পরিণতি, এবং সেই শক্তিও অনির্বচনীয়, অর্থাৎ মিথ্যা। আত্মা সেই মিথ্যার অধিষ্ঠান, সুতরাং সত্য, আর অদ্বৈত। অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। অবশ্য এই শক্তিকে নিত্য বলিলে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইত, কিন্তু ইহাকে নিত্যও বলা হয় না. কারণ, তাহাতে কার্যটী নিত্যই হইবে। এজন্য অদ্বৈতবাদ সিদ্ধিতে কোন বাধাই হয় না। এইরূপে আত্ম-বস্তুর শক্তির দ্বারা এই সৃষ্টির উপপত্তি হইতে পারে বলিয়া প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি আত্ম-ভিন্ন বস্তুর সত্তা স্বীকার আবশ্যক হয় না। আর তজ্জন্য এস্থলে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতের সম্ভাবনাও নাই। অলৌকিক তত্ত্বে যে মতে যত অল্পের স্বীকার দ্বারা উপপত্তি হয়, সেইমত তত উত্তম বলিবার রীতি পণ্ডিতসমাজে আছে। অতএব শক্তিদ্বারা সৃষ্টি সম্ভাবনার উপপত্তি হইলে প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি আত্মভিন্ন স্বাধীন সত্তাক বস্তু স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। আর শক্তিও মিথ্যা বলিয়া মিথ্যার দ্বারা অদ্বৈতের হানি হয় না।

যদি বলা যায় এই শক্তিকে অনিত্য বলা হয় কেন? নিত্য আত্মবস্তুর শক্তিকে নিত্যই বলা উচিত। অনিত্য বলিলে তাহার আবার নিমিত্তকারণ অন্য শক্তি স্বীকার করা

আবশ্যক হয়। আর তাহাকে আবার নিত্যা বলা আবশ্যক হয়। এজন্য এই শক্তিকেই অনবস্থাভয়ে নিত্যা বলাই ভাল।

তাহা হইলে বলিব, না, তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে ঐ শক্তির কার্য্যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ক্রম থাকায় আবার তাহার নিমিত্তকারণ কিছু স্বীকার আবশ্যক হয়। অতএব এই দোষ নিত্য ও অনিত্য উভয় পক্ষে তুল্য। আর এই শক্তি নিত্যা হইলে সৃষ্টির কখন লয় বা বন্ধ হওয়া উচিত হয় না। ইহা চিরকালই হইতে থাকিবে। কারণে শক্তি থাকিলেই কার্য্য হয়—ইহাই প্রসিদ্ধ নিয়ম। অতএব নিত্য সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধও হয়। অতএব যাবৎ শক্তি, তাবৎ সৃষ্টি—ইহা স্বীকার করিয়া শক্তিকে অনিত্য বলাই সঙ্গত। বস্তুতঃ নিত্য হইলে নিত্য সৃষ্টি এবং অনিত্য হইলে তাহার কারণ থাকে বলিতে হয় বলিয়া এই শক্তিকে নিত্যানিত্যভিন্ন অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যাই বলিতে হয়। এই শ্রুতির অনুযায়ী ছান্দোগ্য ৬।৩।২ বাক্য ২ পৃষ্ঠা এবং বৃহদারণ্যক ১।৪।৭ বাক্য ২ পৃষ্ঠা স্মরণ করা যাইতে পারে। ছান্দোগ্যে "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য" ইত্যাদি বাক্য দ্রষ্টব্য, আর বৃহদারণ্যকে "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাদ্" ইতি দ্রষ্টব্য। অতএব ভূতসৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া জীব হওয়ার মূলে এক ব্রহ্মই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা হয়, ব্রহ্ম স্বশক্তিবলে জীবজগৎ হইলেও ব্রহ্মের তো অবস্থান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতাদিবাদই সঙ্গত হইবে।

তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। কারণ, এই সৃষ্টিই সত্য নহে যে, সত্য অবস্থান্তর কল্পনা করিব? অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যার পরিণতি মিথ্যাই হয়। ভ্রমবশতঃ জগৎ সত্য জ্ঞান হয় বলিয়া ওরূপ সংশয় আসে মাত্র। স্বপ্ন ইহার দৃষ্টান্ত। স্বপ্নে দৃশ্য সত্য বোধ হয়, সেই স্বপ্নের লয় আবার সুষুপ্তিতে হয়। অতএব জাগ্রতটী আত্ম-শক্তিবশতঃ স্বপ্নের ন্যায় অবস্থা, এবং সুষুপ্তিতে সেই স্বপ্নকারিণী শক্তির যেমন লয় হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানে এই জাগ্রতকারিণী শক্তিরও লয় হয়। এই কারণে শক্তি অনিত্যা, ব্রহ্মই সত্য, সুতরাং অদ্বৈত। আর তজ্জন্য এইরূপে এই শ্রুতি হইতে অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। অদ্বৈতবিরোধী মতবাদিগণ এই শ্রুতির অন্যরূপ ব্যাখ্যায় বহু চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা বিচারসহ হয় না। কেবল তাহাই নহে, এই শ্রুতির দ্বারা সত্তা-ত্রৈবিধ্যও পাওয়া গেল। অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তারও সন্ধান পাওয়া গেল। যাহারা বলেন শ্রুতিমধ্যে এই ত্রিবিধ সত্তার উল্লেখ নাই, তাঁহারা এস্থলটী চিন্তা করিতে পারেন। তাহার পর—

(ঙ) অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে"॥ ২।৭

অর্থাৎ "এই" পদবাচ্য জীব ও জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল, তাহা হইতে সৎ জন্মিল। তাহা নিজে

আপনাকে সৃষ্টি করিলেন, সেই হেতু তাহাকে সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ংকর্ত্তা বলা হয়। এখানে 'অসৎ'পদে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে ; কারণ, ঐতরেয় ও ছান্দোগ্য মধ্যে "আত্মা বা ইদমগ্রে আসীৎ" "সদেব সোম্যেদমগ্রে আসীৎ" বলা হইয়াছে। এখন এই অসদ্ ব্রহ্ম বলায় ইহাতে যে 'বিশেষ' কিছুই নাই, অর্থাৎ তদ্ভিন্ন কিছুই নাই—তাহাই বলা হইল, আর তজ্জন্য সেই অসদ্ ব্রহ্মবস্তু যে অদ্বৈত তাহাই বলা হইল। গুণাদি বিশেষ নিষেধের জন্যই অসদ্ বলা হইয়াছে।

যদি বলা হয়—সেই অসতের মধ্যে কিছু বিশেষ না থাকিলে সৃষ্টি হয় কি করিয়া? অতএব সেই অসৎ মধ্যে অন্ততঃ কিছু জগদবীজ অবশ্য স্বীকার্য।

না, তাহা নহে। কারণ, সেই আশঙ্কা পাছে হয় সেই জন্যই "এই জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল" অর্থাৎ 'কিছুনয়'রূপে ছিল—এই রূপ করিয়া বলা হইল।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে কেন? "কিছুনয়" হইতে কিছু হয় কি করিয়া?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এইজন্যই জগৎকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যার স্বভাবই এই যে, তাহা না থাকিলেও "আছে" বলিয়া প্রতীত হয়।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে এই মিথ্যাই আছে বলিতে হইবে?

তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। কারণ, "যাহা নাই তাহা যখন দৃশ্য হয়" এজন্য তাহাকে মিথ্যা বলা হয় বলিয়া সেই মিথ্যাকে আবার "আছে" বলিলে উক্ত মিথ্যা লক্ষণেরই ব্যাঘাত করা হয়। অতএব সেই অসদ্বস্তুমধ্যে কোন বিশেষ নাই ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—তাহা হইলে সেই অসদ্বস্তুমধ্যে করণরূপও কিছু আছে বলিতে হইবে। কারণ, কর্ত্তার যে করণ থাকে, তাহার কর্ত্তার অঙ্গ বলিয়া কর্ত্তার সঙ্গে তাহাকে অভেদে উক্ত করাও হয়, অতএব এই অসদ্ ব্রহ্ম মধ্যে বিজাতীয় সজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতভেদ আছে, যেমন আমাদের করণ চক্ষুরাদির দ্বারা আমরা কার্য্য করি? চক্ষুরাদি করণের সহিত কর্ত্তা আমাদের স্বগতভেদ স্বীকার করা হয়?

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, শ্রুতিতে এই জন্য "স্বয়ং অকুরুত" বলা হইয়াছে। এস্থলে "স্বয়ং" পদদ্বারা সেই করণাদির নিষেধ করা হইয়াছে। কর্ত্তা ও করণের মধ্যে অভেদ স্বীকার করিলেও কিছু ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। এই ভেদ এস্থলে নিবারণ করা হইল।

যদি বলা হয় করণবিশিষ্ট কর্ত্তাকেও "স্বয়ং" পদদ্বারা নির্দ্দেশ ত করা হয়? অতএব স্বয়ংপদ করণের নিষেধ করিতেছে না?

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 'অকুরুত' বলিলেই তো করণবিশিষ্ট কর্ত্তাকে পাওয়া যাইত। অতএব এস্থলে করণেরই নিষেধ করা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" বলিয়া করণের নিষেধই করা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—স্বয়ং পদদ্বারা অপর অধীন কর্ত্তার নিষেধ করা হইয়াছে ?

তাহা হইলে বলিব, তাহাই তো করণ পদবাচ্য হয়। আর "আত্মানম্" "অকুরুত" বলায় তাদৃশ করণ বা অন্য কোন বস্তুরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। কারণ, নিজের উপর কোন কার্য্যের জন্য অপর কোন কিছুরই সাহায্য আবশ্যক হয় না। অতএব করণাদি অপর যাবদ্বস্তুরই নিষেধ বলিতে হইবে।

যদি বলা হয়, মন না থাকিলে কেহই নিজের উপর কোন ক্রিয়াই করিতে পারে না। অতএব মনঃরূপ করণও অবশ্য স্বীকার্য্য ?

কিন্তু তাহাও এস্থলে সম্ভব নহে। কারণ, আমাদের মন, তখন কর্ত্তা আত্মার সঙ্গে অভিন্নই হয়, আর সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই না থাকায় পরমাত্মার মন স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া "অমনাঃ" ইত্যাদি শব্দে মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।১।২—৩ বাক্যে বলা হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতেও এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য শ্রুতিতে মনের উৎপত্তির কথাও বলা হইয়াছে (প্রশ্ন ১।১।৮১—২।১।৩)। এতদ্ব্যতীত এক ব্রহ্মই যখন সত্য, অন্য সব মিথ্যা, তখন মনও মিথ্যা, সৃষ্টিও মিথ্যা, অর্থাৎ সৎ নাই, তথাপি দেখা যায় বলা হয়, মাত্র। আর তজ্জন্য এই শ্রুতির দ্বারা সেই এক অদ্বৈত তত্ত্বেরই সন্ধান প্রদান করা হইল।

তাহার পর শ্রুতির দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত তো পরিপুষ্ট হইল—ইহাও বলা যায়। কারণ, 'ইদং' পদবাচ্য এই দৃশ্য প্রপঞ্চ অগ্রে অসৎ ছিল বলায় ইহা সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ ছিল, তাহা আর বলা যায় না। অদ্বৈতবাদে একথায় কোন বাধা নাই। কারণ, অদ্বৈতবাদে মায়ার পরিণাম এই জগৎ বলা হয়। সেই মায়া নাই, অথচ প্রতীত হয়, সুতরাং অসৎ হইতে এই সদ্ জগৎ অর্থাৎ সদ্রূপে প্রতীয়মান উৎপন্ন হয়—একথা এই মতে অসঙ্গত হয় না। অতএব এই শ্রুতি অদ্বৈতবাদেরই অনুকূল নহে। একথা প্রশ্নোপনিষদেও আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও ৩।১৪।১ এবং ৬।২।১ বাক্যে এই কথাই আছে। তাহার পর—

(চ) যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। ২।৭

অর্থাৎ "যখন এই জীব এই অদৃশ্য, অশরীর, অনিরুক্ত (নির্বিশেষ), অনাধার ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সেই জীব অভয়প্রাপ্ত হন। আর যখন এই জীব ইহাতে "উদরম্" অর্থাৎ অতি অল্পও অন্তর অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। সেই ব্রহ্মই মননহীন বিদ্বানের ভয়স্বরূপ হন।"

এস্থলে অদৃশ্য, অশরীর, অনিরুক্ত, অনিলয় পদদ্বারা সেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মেরই সন্ধান প্রদান করা হইল। কারণ, অদ্বৈত না হইলে অদৃশ্যাদি বাক্য হইতে পারে না।

ক্রমশঃ।

ডায়েলেক্‌টিক্ তত্ত্বে শ্রেণীগত বৈষম্য

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

ঐতিহাসিক ডায়েলিকটিক্ তত্ত্বের দ্বারা কার্ল মার্কস প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদেরা সাধারণকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, মানবেতিহাসে যুদ্ধ কলহ দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষার মূলে আছেন অর্থনীতি। আদিম যুগে গোষ্ঠীর মধ্যে সমষ্টিভাবে খাদ্যাদি উৎপন্ন হইত এবং ব্যষ্টি ভাবে সকলে নিজেদের ভিতর আপোষ মীমাংসায় তাহার বণ্টন হইত। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে সমবেতভাবে তীক্ষ্ণ প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রে ধনপ্রাণ রক্ষা করিত। প্রস্তর যুগের পর তাহারা তীর ধনুকের ব্যবহার শিখিল। বনজাত ফল শস্য সচ্ছন্দে তাহারা আহরণ করিত, জলাভূমিতে মাছ ধরিত কিম্বা মৃগ পক্ষী শীকার করিয়া মাংস সংগ্রহ করিয়া খাইত। হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা বাসস্থান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ব্যষ্টি ভাবে ইহা করা সম্ভবপর ছিল না। তাই পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া এই সব কাজ করিত। ইহার ফল সমগ্র গোষ্ঠী সমভাবে পাইত। সকলেই সাধ্যানুসারে শ্রম করিত। যাহা কিছু খাদ্যাদি সংগৃহীত হইত তাহা গোষ্ঠীর সম্পত্তি। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে কেহ স্বত্ব বা স্বামীত্ব দাবী করিতে জানিত না। সেই সময়ে কোন শ্রেণীগত বিভাগ বা পার্থক্য গোষ্ঠীর মধ্যে অজ্ঞাত ছিল। কিছুদিন পরে ইহার পরিবর্তন ঘটিল।

অরণ্য প্রদেশে আহার সন্ধানে বা শীকারে—ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা কলহ হইতে লাগিল। যে অস্ত্রশস্ত্র শীকার বা বন্য জন্তু হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা গোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর মারামারি বা দাঙ্গায় চালাইতে হইল। ইহার পরিণাম যুদ্ধ বা সমর। এই যুদ্ধে কেহ নিহত হইত, কেহ পলাইয়া বাঁচিত আবার কেহ শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া ধরা পড়িত। এই বন্দীরাই শেষে ক্রীতদাসের সৃষ্টি করিল। ক্রীতদাসেরা কেহ কেহ জেতার অভিপ্রায়ানুসারে ফল সংগ্রহ করিত, মৎস্য মাংস শীকার করিয়া লইয়া আসিত কিন্তু তাহার স্বত্ব বা স্বামীত্বের দাবি করিত ক্রীতদাসের মালিক বা প্রভু। যে ব্যক্তি অপর গোষ্ঠীর লোককে বন্দী করিয়া আনিত সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিক্রয় করিত, কেহ ইচ্ছা করিলে জেতার নিকট হইতে তাহাকে কিনিতে পারিত, কিম্বা তাহাকে পশুর মত মোট বহন করাইতে অথবা ক্রুদ্ধ হইলে অস্ত্র দিয়া নিহত করিতে পারিত। যাহাহউক ক্রীতদাসের দ্বারা গোষ্ঠীর অনুকূল খাদ্যদ্রব্য এবং শীকারের সংগ্রহশক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে ক্রমে ক্রমে ধাতব পদার্থ আবিষ্কার করিয়া গোষ্ঠীরা তাহার ব্যবহার করিতে শিখিল। প্রস্তর বা তীর ধনুকে তাহাদের আর মন রহিল না।

পেতল টিন প্রভৃতি লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা হল চালনা, বস্ত্রবয়ন এবং আহার বিহারাদির জন্য ধাতুপাত্র নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও শ্রমের পার্থক্য দেখা দিল। ইহার ফলে ব্যক্তিগত উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয়ের সূত্রপাত হইল। গোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর মধ্যে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় হারে আদান প্রদান চলিল। তাহা ছাড়া "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতি তো আদিম যুগ হইতে বিদ্যমান ছিল। যাহারা বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিজীবি তাহাদের সম্পত্তিলাভ করায়ত্ত হইল। ফলে কেহ কৃতদাস কেহ প্রভূত সম্পত্তিশালী, কেহ বা অল্প সম্পত্তিশালী আবার কেহ বা শুধু শ্রমজীবী। কৃতদাসের প্রথায় গোষ্ঠী ভাঙ্গিল।

কৃষি প্রভৃতি শিল্প বাণিজ্যে মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বা শ্রেণীগত পার্থক্য দেখা দিল। উপরোক্ত বিভিন্ন অবস্থায় আর গোষ্ঠীর সমষ্টিগত সম্পত্তির দাবী থাকিল না। কৃতদাস বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকে সামান্য মজুরী দিয়া বলশালী ব্যক্তিগণ সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিল। এইরূপে ব্যক্তিগত অধিকারের সৃষ্টি হইল। সম্পত্তিহীন ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে কৃতদাস হইয়া জীবন রক্ষা করিল। কৃতদাস প্রথা চলিত হওয়াতে শ্রেণীগত আভিজাত্য ও সবহারা দলের সৃষ্ট হইল। ধনীর সহিত নির্ধনের, লুণ্ঠনকারীর সহিত লুণ্ঠিতের, সম্পত্তিশালীদের সহিত সবহারা বা স্বত্বস্বামীশূন্য ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেণীগত সংগ্রাম বা পার্থক্য আনিয়া দিল—কৃতদাসপ্রথা। ফিউডাল বা ভূস্বামী অথবা জমিদারী প্রথায় কৃতদাস, চাষী ও মজুর প্রভৃতি যারা দ্রব্যের উৎপন্নের দিকেই দৃষ্টি রাখা হইত— শ্রমিক মজুর ও চাষীদের অস্তিত্ব গণ্যের মধ্যে আসিত না। দাস বা সার্ফদের হত্যা করিবার আদিমকালের অধিকার উঠিয়া গেলেও তাহারা পণ্যের সামিল ছিল।—কিন্তু সাধারণ চাষীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বোপার্জিত ভূমিতে চাষ করিত এবং কেহ কেহ কারু বা শ্রমশিল্পের দ্বারা নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত, আবার কেহ কেহ নিজ নিজ ইচ্ছামত ছোটখাট কারবার করিত—এই সব কৃষি কারু ও শিল্প বাণিজ্যের উপর অপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ইহা তাহাদের স্বাধীন স্বোপার্জিত বিত্ত সুতরাং বাহিরের লোকের কোন অধিকার বা অংশ ছিল না। ফিউডাল প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেও মূলতঃ—দেশে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল।—ধীরে ধীরে লোহা গলান, তপ্ত লোহা পিটাইয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, লোহার হল এবং তাঁতের চাহিদা দিন দিন বাড়িতে লাগিল. কৃষি ফলপুষ্প শস্যগুল্ম সুসজ্জিত উদ্যানবিদ্যা, দ্রাক্ষা চাষ এবং পশুপক্ষী ও গোপালন ব্যবসায় প্রভৃতির অনুশীলন চলিল। উৎপাদিকা ও উৎপন্নশক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইল—হস্তশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট শিল্প দ্রব্যের কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধিতে। এই নূতন উৎপন্ন শক্তির আবির্ভাবে মজুরের বা শ্রমিকের চাহিদা চারিদিক হইতে বাড়িতে লাগিল। শ্রমিকেরা যাহাতে নানা উৎপন্ন শিল্পের প্রবর্ত্তক হইতে উদ্যোগী হয় এবং এই কাজে তাহাদের যাহাতে

অধিকতর প্রবল ঝোঁক হয় এবং কাজের জন্য যাহাতে আগ্রহ থাকে তাহার দিকে সকলের নজর পড়িল। সাধারণ কৃষি কাজে মজুরদের মজুরী ছাড়া আর কোন স্বার্থ ছিল না। সুতরাং মজুর বা শ্রমিকেরা জমিদার প্রভুর চাষে কেবল চুক্তি মত খাটিত। কিন্তু জমির উর্বরাশক্তি বাড়াইতে জমির পাট করিতে কিম্বা ফসল বৃদ্ধির জন্য তাহাদের কোন আগ্রহ বা মাথাব্যথা ছিল না। কাজেই ভূস্বামিরা মজুরদের খাটাইয়া কোন লাভবান হইতে পারিত না, তাই তাহারা মজুরদের আর কাজে লাগাইত না। সুতরাং জমির চাষী প্রজাদের ভাগবখরায় লাগাইয়া তাহারা চাষের কাজ চালাইত। ইহাতে ভূস্বামীদার জমির সার, কৃষির জন্য হল বলদ কাস্তে প্রভৃতি সরবরাহ করার দায় হইতে বাঁচিয়া যাইত; নগদ কোন মজুরী হাত হইতে দিতে হইত না। বিনা অর্থব্যয়ে তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে নিজের খাস জমির জন্য ফসলের অংশ পাইত কিম্বা উহার বিনিময়ে নগদ অর্থও ঘরে আসিত।

এই ভাবে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামীত্ব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রীতদাস প্রথার সময়ে যেমন উৎপীড়ন নিষ্পীড়ন ছিল এমজুর শ্রমিকদের উপর ঠিক তেমনি চলিতে লাগিল—তবে কিছু রকম ফের। একদিকে শুধু কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থশালীদের কৃপার উপর মজুরদের নির্ভরতা, অপর দিকে অর্থশালী পুঁজীবাদীদের স্বার্থ বা আয় বৃদ্ধি নির্ভর করিত শ্রমিকদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়া—তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া—তাহাদের উৎপন্নদ্রব্য সুলভে ক্রয় করিয়া পুঁজিবাদীরা এইরূপে তাহাদের নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াইত। জমিদারী প্রথার সময়ে এই ভাবে শ্রেণীগত সংঘাতের সূত্রপাত হইল।

ইহার পরিণামে একদিকে শ্রমিক অপরদিকে ধনিক, একদিকে মজুর অপরদিকে পুঁজিবাদী, একদিকে কৃষি বা কারখানার বুভুক্ষু সর্বহারার দল অপরদিকে দরিদ্রের রক্তশোষণকারী কৃষি বা কারখানার মালিকেরা। ডায়েলেকটীক্ তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহা মানবেতিহাসের মূল সূত্র।

বড় বড় অর্থশালী বা পুঁজিবাদিরা ক্রমে ক্রমে কলকারখানার সংখ্যা বাড়াইয়া দেশ বিদেশে পণ্য সম্ভার পাঠাইয়া পুঁজির ওজন ভারী করিতে লাগিল—আর শ্রমিকেরা—মজুরেরা—দেহের রক্ত জল করিয়া কুলিগিরি বা মোট খাটিয়া দিন রাত্রি পশুর অপেক্ষা হীন ভাবে দৈহিক পরিশ্রমে, স্ত্রীপুত্র সংসারের সর্ব ভুলিয়া পুঁজীবাদীদের ধন সঞ্চয় করাইয়া দিতে লাগিল। ইহার ফলে অর্থ বা পুঁজি কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। রাজশক্তি বা দেশশাসন ইহাদের করায়ত্ত হইয়া পড়িল এবং তাহাদের সুযোগ সুবিধার জন্য সরকার মজুরদের কুক্ষিগত করিবার জন্য নূতন নূতন আইন হইতে লাগিল। মজুররা বা শ্রমিকরা কি করিবে? দুই মুঠো তো তাহারা খাইবে? পুঁজিবাদীদের চক্রান্তে আর ছোট ছোট স্বাধীন বৃত্তিজীবীদের মুক্তি রহিল না। কলের প্রতিযোগিতায় হস্তজাত কুটীর শিল্প কি দাঁড়াইতে পারে? কৃষি যান্ত্রিক হলে চাষ হইতে

বেদাঙ্গ বেদের অংশ নহে—বেদের পরিশিষ্ট। এই বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ গ্রহণ হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে 'প্রবচন' আখ্যা দেওয়া হয়—কিন্তু মনু বেদাঙ্গকে 'প্রবচন' (৩) নাম দিয়াছেন। ষড়্‌বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৪) দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (৫) বেদাঙ্গের বিষয়টী উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের কোন নাম দেন নাই। চরণব্যূহ, মনু (৬), মুণ্ডক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে ছয়টী বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে। (৭) কিন্তু বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়সকলের যথাযথ বিবরণ বৃহদারণ্যক ও তদ্ভাষ্যেই পাওয়া যায়। এই বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না, ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রকেই বুঝাইত। ঋগ্বেদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য যেরূপে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। দুর্গাচার্যের বচন (৮) হইতেও তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্ যজুঃ ও অথর্ব বেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যেভাবে গ্রথিত, তাহাতে তাহাদিগকে এক একখানি বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ বলা নিতান্ত যুক্তিহীন নহে।

বস্তুতঃ, পাণিনির পূর্ব হইতেই যে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য শব্দতত্ত্ববিৎ রোট, বার্নেল প্রভৃতি পণ্ডিতও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, একমাত্র অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর বেদাঙ্গ বলিতে কেন যে পাণিনির ব্যাকরণই বুঝিয়াছেন (৯), তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক তাঁহার এই মত যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণিনির বহু পূর্বে যে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল বৈদিক গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ

পারিভাষা

দেখান যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্য কোন্ সময় বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি পাণিনির বহু পূর্বের। বৈদিক সাহিত্যে পরিভাষাগুলি যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল এরূপ কল্পনা করিবারও কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম উদাহরণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, "'শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।'

(৩) "অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ। শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥" —৩. ১৮৪।

(৪) ৪. ৭।

(৫) নিরুক্ত—১. ২০।

(৬) মনু—৩. ১৮৫।

(৭) ষড়্‌বেদাঙ্গ যথা—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চয়ঃ
জ্যোতিষামযনঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব তু॥"

(৮) "ব্যাকরণং অষ্টধা নিরুক্তং চতুর্দশধা" ইত্যাদি।

(৯) Academy, July 1870.

—৭. ১,৮। (১০) অতএব বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটী পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেল। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১১) স্পর্শস্বর ও উষ্মবর্ণের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের (১২) "নহন্ একবচনেন বহুবচনং ব্যবযামেতি", এই বাক্যে বৈয়াকরণিক একবচন ও বহুবচনের কথা দেখা যায়। অধ্যাপক বেবের শতপথ-ব্রাহ্মণের ১০১৮ পৃষ্ঠার টীকায় প্রমাণ করিয়াছেন, যে সময় এই ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছিল সেই সময় ব্যাকরণ এত দূর উন্নত হইয়াছিল যে, ভূ অস্ প্রভৃতি ধাতুর ব্যাখ্যাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল।

এই উক্তির সমর্থনের জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'মদ' ধাতু (১ ১০, ২. ৩, ৩ ৯, ১১), 'স্বধা'—স্তুতি (৩. ৩২, ১৭), অনুবৃত্তি—ক্রিয়া-বৎ (৬. ৮, ১২, ৩২, ৫ ৪) প্রভৃতি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৩) অক্ষর, অক্ষরপঙ্‌ক্তি, চতুরক্ষর, বর্ণকার, পদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। গোপথব্রাহ্মণ যদিও পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগুলির তুলনায় পরবর্তী, তথাপি ইহাতে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার ১. ২৪ সূত্রে আছে—"ওঙ্কারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ কিং প্রাতিপদিকং কিং নামাখ্যাতং কিং লিঙ্গং কিং বচনং কা বিভক্তিঃ কঃ প্রত্যয়ঃ কঃ স্বরঃ উপসর্গো নিপাতঃ কিং বৈ ব্যাকরণং কো বিকারঃ কো বিকারী কতিমাত্রঃ কতিবর্ণঃ কত্যক্ষরঃ কতি পদঃ কঃ সংযোগঃ কিং স্থানানুপ্রদানকরণং শিক্ষকাঃ কিং উচ্চারয়ন্তি কিং ছন্দঃ কো বর্ণঃ ইতি পূর্বে প্রশ্নাঃ।" অতএব, ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ওঙ্কারের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহাতে প্রধান প্রধান পরিভাষার সমাবেশ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামবেদের তাণ্ড্য ও [illegible] ব্রাহ্মণ হইতেও বৈয়াকরণিক অর্থদ্যোতক বহু পরিভাষার নাম পাওয়া যায়, এখানে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য

'শিক্ষা' বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণ ও যথাযথ আবৃত্তি-বিষয়ে শিক্ষা দেয়। অধ্যাপক হোগ (Haug) বলেন, শিক্ষা প্রাতিশাখ্য অপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার বিধি-ব্যবস্থা পরে প্রাতিশাখ্যের নিয়মাদির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ডক্টর বার্নেলও তাহাই বলেন। কেহ কেহ এই শিক্ষাগ্রন্থের এতাদৃশ প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। সকল শিক্ষা-গ্রন্থই যে প্রাচীন তাহা নহে। সমুদয় শিক্ষা-গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে, সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে 'অমোঘনন্দিনী শিক্ষা' (১৪), 'কেশবী শিক্ষা' (১৫),

(১০) Bibl. Indica Edition, by Rajendralal Mitra, p 725.

(১১) ছান্দোগ্য-উপনিষদ্—২. ২২, ৩, ৫।

(১২) Dr. A Weber's Edition, p 990

(১৩) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অধ্যায়—১, ২, ৫।

(১৪) Rajendralal Mitra, "Notices", I p. 72

(১৫) Rajendralal Mitra, "Report", p. 18.

'শিক্ষাসমুচ্চয়' (১৬) ও শ্রীনিবাস-কৃত 'সিদ্ধান্ত-শিক্ষা' (১৭) যে নিতান্ত অর্বাচীন তাহা পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করেন। তবে, 'গৌতমী' (১৮), 'নারদ' (১৯), 'মাণ্ডুকী' (২০), ও 'লোমশনী' শিক্ষা (২১) যে অতি প্রাচীন সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই শিক্ষাগুলি ব্যাকরণ-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে—তবে এগুলিতে উচ্চারণ ও আবৃত্তি, ব্যাকরণের এই দুইটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে মাত্র। অতঃপর প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অনেক কথার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দসকলের উচ্চারণ, উচ্চারণাদির দোষ-গুণ-ভেদ, প্রত্যেক অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, কার্যকারিতা, দুই বা ততোধিক শব্দের সন্ধিবিধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতি এই প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ-বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় নাই। এইগুলিতে শব্দ বা ধাতুর প্রকৃত্যাদির আলোচনাও নাই। তবে, এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কথিত ভাষা ও সঙ্গীতে বিরূপ উচ্চারণপার্থক্য ঘটে তাহা দেখিবার জন্য অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণাদির বিস্তৃত বিধিব্যবস্থা দিবার জন্যই এগুলি রচিত হইয়াছিল। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারি বেদের চারিটী প্রাতিশাখ্য আছে। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যই (২২) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বর্ণ, উচ্চারণ, স্বর প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। যথা "অথ বর্ণ সমাম্নায়ঃ।" "দ্বে দ্বে সবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘে।" "নপ্লুতপূর্বম্।" "ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ।" "শেষা ব্যঞ্জনানি।" শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ও বেদাধ্যয়ন বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছে। ইহার অপর নাম কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য। (২৩) এখানি অতি প্রাচীন কালের রচনা। তবে ইহা যে পরবর্তী কালে বিশেষ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দের উচ্চারণের নিয়ম, সন্ধি, ক্রিয়ার উপর যতিপাতের নিয়ম ও উচ্চারণের নিয়ম, স্বর ব্যঞ্জনের তালিকা, পদপাঠের নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। (২৪) সাধারণতঃ

(১৬) Mysore Cat. No. 57. (১৭) Mysore Cat. No. 51, p. 8.

(১৮) Haug, "Ueber das Wesen" U. S.W.P.N.K.—ইহা তামিলদেশে রক্ষিত।

(১৯) A. C. Burnell, "Notices" I p. 73. অধ্যাপক হোগের মতে ইহার দুই প্রকার মূল বিদ্যমান আছে।

(২০) Haug, U. S.W. P.N.K., p. 52. Weber, "Pratijna Sutra" p. 106f. "Notices", I. p. 73.

(২১) "Report" p. 18. Haug, U.W.S.N.K., P. p. 61 "Notices", i. p. 71.

(২২) ভোজদেবের সমসাময়িক বজ্রটের পুত্র উবটভট্ট 'পার্ষদব্যাখ্যা' নামে ইহার টীকা রচনা করেন।

(২৩) উবটভট্ট ইহার টীকা করিয়াছিলেন। 'জ্যোৎস্না' নামক রামচন্দ্র কৃত আর একটী টীকাও বর্তমান আছে, তবে সেটী আধুনিক।

(২৪) যথা— ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য— ১। অ-কার, ইত্যাদি (৪.৬)। ২। ই, উ, এ

আট জন বৈয়াকরণের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি-নিবাসী বোপদেব তাঁহার ধাতুপাঠের উপক্রমণিকার দ্বিতীয় শ্লোকে এই আট জন শাব্দিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলিঃ শাকটায়নঃ। পাণিন্যমর-জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥" দুর্গাচার্যও তাঁহার যাস্কের টীকায় বলিয়াছেন, 'ব্যাকরণং অষ্টধা' (১. ২.)। এই আট জন শাব্দিকের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণই সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। শাকটায়ন ও জিনেন্দ্রের হস্তলিখিত পুঁথি আজও বর্তমান আছে। তিব্বতীয় ভাষায় 'চন্দ্রব্যাকরণ' অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে। (২৫) ইন্দ্র, কাশকৃৎস্ন আপিশলি ও অমরের নাম সূত্রাদির উদ্ধৃত বচনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রই আদি ব্যাকরণ-প্রণেতা ছিলেন, এই মতই বিশেষ প্রচলিত। সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্যে ইন্দ্র আদি বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। "ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্॥" (বোম্বাই-সংস্করণ, শ্লোক ২)। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও ইন্দ্র-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবদান শতকে লিখিত আছে, সারিপুত্র বাল্যকালে ইন্দ্রব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (২৬) তিব্বতীয় সাহিত্যে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহুবার দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, সর্বজ্ঞ-(শিব-) কর্তৃক প্রথম ব্যাকরণ প্রণীত হয়। কিন্তু এই ব্যাকরণ তিনি কখনও জম্বুদ্বীপে প্রেরণ করেন নাই। তৎপরে ইন্দ্র ইন্দ্রব্যাকরণ

পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ

ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)। ৩। কণ্ঠ্যো ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা) দ। ৪। রেফ (১. ১০। ৫। পঞ্চ-কারক-কারণযোঃ। (৪ ৯)।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য— ১। অ-কার (১. ২১), ইকার (২. ১৮); ঋ-কার (১. ১৩), অ-বর্ণ (৭. ৫), ই বর্ণ ইত্যাদি (১. ৯)। ২। প (৪ ৩০), ন (৪. ৩২), ক (২. ৩)। ৩। ত, উ (৭. ১৩), ১, প (৭. ১৪); র (১ ১৯)। ৪। রেফ (১. ১৯)। ৫। ক-বর্গ (২. ৩৫); চ-বর্গ (২. ৩৬), ট-বর্গ (১৪. ২০)।

কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য— ১। এ-কার, ঐ-কার (১. ৭৩), ৯-কার (১. ৪৩); ই-বর্ণ (১. ১১৬)। ২। উপধাসঃ (১. ৭০), অ (১. ৭১)। ৩। র (১. ৮০), ৪। দ্বঃ (১৩. ১৩২)। [ইহা 'ন' স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে]। ৫। ত-বর্গ (৩. ৯২)।

এই প্রাতিশাখ্যে পাণিনির 'এং' প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।

অথর্ব-প্রাতিশাখ্য—১। অ-কার (১ ৬), ৯-কার (১. ৪), ল-কার (১. ৫), ঋ-কার (১. ২৩)। ২। অ-বর্ণ (১. ৩৭)। ৩। য, র (১ ৬৮), শ বর্ণেষু (২. ৬)। ৪। রেফ (১. ২৮)। ৫। চ-বর্গ (১. ৭), উষ্মীণে (২. ১২), চতুর্বর্ণস্থ (২. ১৪) ইত্যাদি।

(২৫) Schefner, "Neber die logischen und grammatischen Werke, in Tandjur."

(২৬) Burnouf, "Introduction" i. p. 456. "a Seize ansil avait lu la grammaire d'Indra et vaineau tods cense quiudisputaient avec lui"; Wassilycurs, "Der Buddismus" p. 332.

প্রণয়ন করেন ও বৃহস্পতি তাহা অধ্যয়ন করেন। ইহা জম্বুদ্বীপে প্রচলিত ছিল। অতঃপর পাণিনি-ব্যাকরণ এই স্থানে সবিশেষ প্রচলিত হয়। (২৭) 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগরে' লিখিত আছে যে, পাণিনি-ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর হইতেই ইন্দ্রব্যাকরণের চর্চা লোপ পাইতে থাকে।

১৬০৮ খ্রী' (২৮) তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ একখানি ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তারনাথের মতে, সপ্তবর্মা (২৯) (সর্ববর্মা ?) ষণ্মুখকে (কার্ত্তিকেয়কে) ইন্দ্রব্যাকরণ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে বলেন। তৎশ্রবণে কার্ত্তিকেয় বলেন—"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ"। এইটুকু শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ বুঝিয়া ফেলিলেন। উদ্ধৃত সূত্রটী প্রকৃতই কাতন্ত্র বা কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। এছাড়া ইহা ইন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত। তারনাথ সপ্তবর্মাকে কালিদাস ও নাগার্জুনের সমকালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বলেন, পাণিনি-ব্যাকরণের সহিত ইন্দ্র-ব্যাকরণের, কলাপ-ব্যাকরণের সহিত চন্দ্রব্যাকরণের (৩০) ঐক্য আছে। যক্ষবর্মা শাকটায়ন-ব্যাকরণের টীকায় ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রকে আদি বৈয়াকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অধুনা ইন্দ্রব্যাকরণের

(২৭) Wassiljew in Schiefner's translation of Taranatha's Tibetan History of Indian Buddhism, p. 294.

(২৮) Do, German translation, p. 54.

(২৯) সংস্কৃত পুঁথিতে 'সর্ববর্মা' দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারনাথ স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'সর্ববর্মা' ও 'ঈশ্বরবর্মা' এই দুইটাই ভুল।

(৩০) চন্দ্রাচার্যের অপর নাম চন্দ্রগোমি। ইনি মহারাজ কনিষ্কের পরে পূর্বাঞ্চলে 'বরেন্দ্র'-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বাঙলা এই স্থানটী—বাক্‌লা। ভর্তৃহরি-কর্তৃক 'চন্দ্র-ব্যাকরণে'র নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের কোথাও চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। কাশ্মীরপ্রদেশে ডক্টর বুলার চন্দ্রব্যাকরণের 'বর্ণসূত্র' (শিক্ষা) ও পরিভাষাসূত্র ১৮৭৬ খ্রী' প্রাপ্ত হন। তিব্বতীয় ভাষায় চন্দ্রব্যাকরণের উণাদি-বৃত্তি ও উপসর্গ-বৃত্তি সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থকার ভিক্ষু স্থিরমতি নেপালের মধ্যবর্তী পটেন নগরে অবস্থানকালে (৯৫০—১০০০ খ্রীঃ) চন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত 'ধাতুপাঠ' ও 'অধিকার-সংগ্রহ' তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মদাসের 'সূত্রবৃত্তি' ও 'গণপাঠ', আনন্দদত্তের 'সূত্রপদ্ধতি', পূর্ণচন্দ্রের 'ধাতুপারায়ণ' এবং কায়স্থ চণ্ডদাসের 'সম্বন্ধ-উদ্দেশ'ও (চন্দ্রবৃত্তি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ 'সূত্রপাঠ' পাওয়া গিয়াছে। পূর্বে সিংহলে চন্দ্রব্যাকরণ পঠিত হইত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রায় ১২০০ অব্দে সিংহলের বৌদ্ধ যতি 'কাশ্যপ' সংস্কৃত শিক্ষা-সৌকর্যার্থ 'বালাবোধন' নামক সরল ব্যাকরণ রচনা করেন। সিংহলের সর্বত্র ইহার প্রচার হওয়াতে চন্দ্রব্যাকরণের অধ্যয়ন সিংহলে বন্ধ হইয়া যায়। কাশ্যপের ব্যাকরণ অনেকটা 'লঘুকৌমুদী'র মত। জয়াদিত্য ও বামনের 'কাশিকাবৃত্তি'তে চন্দ্রব্যাকরণের মত সমালোচিত হইয়াছে।

কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, পাণিনির পূর্বে পাণিনি-ব্যাকরণের ন্যায় এই ব্যাকরণের সুবিস্তৃত প্রচলন ছিল। পাণিনির পূর্বের দু'চারখানি ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্যাকরণই ইন্দ্রব্যাকরণ নামে অভিহিত হইত। তিব্বতে কলাপ-ব্যাকরণকে ইন্দ্রব্যাকরণ বলিত। বোধ হয়, পাণিনির পূর্বে ইন্দ্রব্যাকরণ-অনুযায়ী যিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিতেন তাহারই নাম 'ঐন্দ্র' রাখা হইত। ~

স্বামী অভেদানন্দের চিঠি

দার্জিলিং

১লা জুলাই

স্নেহের —

অনেকদিন পরে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি নববর্ষের শুভাশীর্বাদ জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে দিবে। গোপালের অসুখ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তাহাকে ও নীহারকে আমার শুভাশীর্বাদ জানাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিবে। সন্তান হইলে তাহার ঠিক ঠিক যত্ন লইতে না পারিলে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ছেলে পুলে মানুষ করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক। সাধারণ লোকে এই সকল বিষয় না ভাবিয়া সংসার করিতে যায় এবং রোগ, শোক ও নানাবিধ কষ্টে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। ইহাই মায়ার খেলা জানিবে। সংসারের সবই অনিত্য এক ভগবানই নিত্য ও সত্য। তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে। সংসারী জীবমাত্রেই স্বার্থ চরিতার্থ করিয়া থাকে। তাহারা নিজের কর্তব্য না করিয়া অপরের দোষ দেখে। তাহাদের স্নেহ ভালবাসা স্বার্থের উপর নির্ভর করে। তোমার যেমন কর্তব্য আছে সেইরূপ তাহাদেরও তোমার প্রতি কর্তব্য আছে। কিন্তু তাহারা স্বার্থপর হইয়া তোমাকে যদি কষ্ট দেয় তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে না। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। আশ্রমের সকলে ভাল আছে এবং কার্য বেশ চলিতেছে। তোমরা সকলে আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ।

লিখিলাম তাতে তুমী আমারে ধরা করিলায় আমী হাজির করিবার দশ মধ্যেও কহিলেক আমার হাজির করনা তবে আমী উহাক্কা লিখিয়া দিলাম ১০৭০ সন হাজার সত্তরি মাসের অগ্রহায়ণের ২ দুই মাস গুদস্ত হাজির করিমু হাজির করিতে না পারী তবে আমী তার বদল তুমার গুলাম হবে তার পীছে ১০৭১ মাস গুদস্ত আমারে ধরা করিলায় আমী হাজির করিবার তাতে আমার বুতে হাজির করাণনা তায় সবব আপনার খুস বজায়ে লিখিয়া দিতেছী আমী তুমার গুলাম হৈলাম তার বদল পরন্তু সে যে কালে তুমার নিকট আইসে তাহাতে আমারে ফারক দিবায় এই নিয়মের তুমার ঠাঁঞি গুলামী পং দিলাম ইতি সন ১০৭০ তারিখ ২৭ আশ্বিন লিখিতং শ্রীরঘুনাথ বিশারদেনেতি

শ্রীকাইকসা

মতং স্বতক"

"পত্র

দেবত্র

"সি সকল মঙ্গলালয় শ্রীরামজীবন চৌধরী মহাশয়েষু শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ সময় পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ। আগে আমী তুমার স্থান হনে ৬ ছয় রূপাইআ লইআ আমার পিতারে দিলাম দিআ আমার পিতা ও মাতা দুইর সম্মতি লৈআ আপনার স্বেচ্ছাতে তুমার সঙ্গে সময় করিলাম তুমার সন্নিহিত থাকিআ তুমার ইষ্টানর ৺পুজা করিমু আর ব্রাহ্মণে যে যে কার্য্য করে তাহে করিমু তুমারে ছাড়িআ অন্যত্র না যাইমু যদি এত আরমত কুন ও দিন করী তবে আমী ৺হনে বিচ্ছেদ হৈ এতদার্থে তুমারে সময় পত্র দিলাম ইতি শন ১০৯৬ শালতে ১ পৌষস্য উভয়াবমতা লিখিত শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যেনদমিতি ॥"

———

[৩]

"শ্রীশ্রীমতী খলতান আওরঙ্গ সা দেব পাদশাহানা

খতি অষ্টনবতিতমোত্তর সহস্রাকে চৈত্রস্য দ্বাদশ দিবসে ৺ মধুলিনি রাজ্যো তদধিকারা-ন্তর্গত গোড় বঙ্গাদিশতো শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর খান মহাশয়ানাং ঢক্কাবস্থিতি কালে শ্রীহট্টাধিকারি শ্রীযুত ইজ্জতুল্লা খান মহাশয়ানামধিকারে পরগণে বানিয়াচং চক্লার্ন্তর্গত মহলা গ্রাম পাটকস্থ শ্রীরামজীবন চতুর্দ্ধরিণঃ শকাশাত ৫০ পঞ্চাশ কার্যাপন্নান গৃহীত্বা তৎ পরগনান্তর্গত তদগ্রাম নিবাসিনা শ্রীবুধিরা তৎ পত্ন্যা শ্রীবেপাই দাস্যা সহ স্বেচ্ছয়া

আম্মোন বিক্রিতমিতি অত্র প্রাপ্তী দুই অক্ষর মান ৫০ পঞ্চাশ কাহন আর এর বাব আমার বাপ নবনির নামে যে ।৵০ ছয় আনা জমা আছিল একে তোমার তালুক শামিল সন ১০২১ সাল হনে উত্তিরদায় শারিজ করি আনিবার নিমাচিমা ইতি সন ১০২৮ সাল তেরিখ ১২ বারই০চৈত্র*

* উক্তআমতা। শ্রীমাধব রা(য়) বিদ্যালঙ্কারেন লিখিতম"

[৪]

"শ্রীশ্রীমতা সুলতান শাহসাহেব পাদপদ্মান।

স্বস্তি পঙ্কোত্তর একাদশ শতাব্দে বৈশাখস্য তৃতীয় দিবসে ৺মধুমদিনি রাজ্যে বঙ্গাধিপতেঃ শ্রীযুত নবাব ইবহাহিম্ খান মহাশয়ানামধিকারে শ্রীঃটাধিকারি শ্রীযুত মীর আল্ খা ফৌজদার মহামহানাধিমাধিনিক বাজুবনভাগ চক্রবকাজ্জর্গত কে যে বে মণ্ডলা পাইকস্থ শ্রীরামজীবন চতুর্ব্বিংশঃ সকাশাত্ সঞ্চিত কাশুপনান গৃহীত্বা ১২ পরগণাজর্গত ইখার নিবাসী শ্রীজীবন দেবেন নিজপুত্রী শ্রীমানাই নাম্নী স্বেচ্ছয়া বিক্রীতেতি অস্য প্রাপ্তি ১ একটী অঙ্কমাল ২॥ দুই কাহন সাড়ে ইতি সন ১১০৪ সাল তেরিখ ৩ বৈশাখ

সাক্ষী শ্রীকৌশল্যা দাসা। শ্রীজীবন দেবরামঃ শ্রীমানাই দাসা। সুতঃ উক্তআমতা। শ্রীমধুদেব শর্ম্মণা লেখিতং সাক্ষী শ্রীমাধবরাম বিদ্যালঙ্কার।"

[৫]

"শ্রীরাম

শ্রীমহম্মদ সাহ ৩

সিদ্ধিরস্তু। পরম ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্বক গত লক্ষ্মণসেন দেবীয় বিংশত্যধিক ষট্শতে লিখামানে যাত্রাব্দেনাপি ৬২০ শাকঃ পুনশ্চরম চট্টবকক্ষেপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি মহাসুরত্রাণ শ্রীশ্রীশ্রী * পালিতে ধরনিমণ্ডলে তৎপ্রবিষ্ট কুতুবী পুরাবস্থিত (১) শ্রীশ্রীমং ফকরুদ্দৌলা খান সমুন্নাসিত মহারাজ শ্রীশ্রীমন্না ধব সিংহ দেব পালিতায়াং মিথিলায়াং গাঁতিতঃ। (২) স্বর্গত সৌরাট্ট গ্রামবাসী সোদর পুত্র সং শ্রী... নয়ন শর্ম্মা জ্যোতির্ব্বিৎ পুত্রকৌমার্যং যথনং প্রযুক্তে ধনগ্রাহকো পোহং শকাব্দাং সৌরাট্ট গ্রামবাসী স্বয়মেব ভূজীদাস পরাক্রীতাসক্ত যথাকে নাপি পরাঙ্কী ব্যসেনাক্রীয়েন নানা মধ্যস্থ কৃত রাজতীঃ সার্দ্ধৈকাদশ মুদ্রা" ম

(১) পাটনা • (২) পরগনা

ন্য মাদাম্মাশ্মিন্ ধনিনি স্বয়মেব ছূণী দাসস্বাত্মানং বিক্রীতবান্
আমাত্ম্য জাতীয়ং গৌর বর্ণং তালিক্ত দশবর্ষ বয়স্কং তুলিয়া নামানং স্বয়ম্
স্বানং বিক্রীতবান যত্র বিক্রীত প্রাপ্তী ১ মুদ্রা মুদ্রা ১১। যদি কাপি প্রপলায্য গচ্ছ
তি তদা রাজসিংহাসন তলাদপ্যানীয় দাস কর্ম্মনি নিয়োজনীয় ইতি অত্রার্থে
সাক্ষিণঃ স্বকরাচৌ সং শ্রীশতজীব শর্ম্ম বলিয়ান সং শ্রীগণপতি মিশ্র সকরাচৌ
সং শ্রীবাসুদেব ঝা বভনিগ্রামনঃ শ্রীবান্ধব ঝা গঙ্গোলী সং শ্রীকৃপারাম
ঝা শতলপা সং শ্রীরামজীব শর্ম্ম ফনদহ সং মহোপাধ্যায় শ্রীরুচিপতি মিশ্র (
পী যাল সং শ্রীজীবং শর্ম্ম বুধবাল সং শ্রী:গোনন শর্ম্মানঃ সৌরাষ্ট্র বাসিনঃ
লিখিত মিদম্ ভয়াত্মজ তা সাক্ষিকাদশাত্মকী মাদায় সকরাচৌ সং শ্রী:াব।
পতি শর্ম্মনেতি শিবং চৈত্রাসিত ৩ কৃষ্ণে শাকে ১৭৫১ সন ১১৩৬ সাল।
সন্তী ছুত্রীঅমাত্মক সাহে এলারত কপেআ দর বিকএনত সহী
পবালীবরিক বর্ষ মধ্যে পড়াল তজো ওবে নিলাকবীম বেটিজ্ন

জীবন

শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল

জীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ; তা'র মাঝে
কত যে গভীর ব্যথা অহরহঃ বাজে
গণনা কে করে তা'রে ? শুধু কল্পনার
ছায়ালোকে নদী বহে মরুভূ মাঝার।

অতীতে ও ভবিষ্যতে পরম যতনে
দূরে রাখ ঠেলি ; অশ্রু আসিলে নয়নে,
মুছি' ক্ষিপ্রকরে অলক্ষিতে, শুষ্ক হাসি
আনো ম্লান ওষ্ঠাধরে ; ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী
পীড়িছে অন্তর যবে, তৃপ্তি-অভিনয়ে
ভুলাও অপরে নিত্য মিথ্যা পরিচয়ে
আবরিয়া চিরন্তন দৈন্য অন্ধকার,
যে ক'দিন আছো, বলো 'সুখের সংসার'
হাসো, নাচো রঙ্গভঙ্গে, উচ্চে গাহি' গান
ক'রে দাও এ দীর্ঘনিঃশ্বাস অবসান।

সঙ্ঘবার্ত্তা

বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব

বিগত রবিবার ১১ই মে ১৯৪১ (২৮শে বৈশাখ ১৩৪৮) শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ভবনে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, অভিসম্বোধি ও মহাপরিনির্ব্বাণ স্মরণে এক বিরাট উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্যজীর ঐকান্তিক চেষ্টা, উৎসাহ ও কার্য্যপটুতায় এই বুদ্ধ-উৎসব প্রতিবৎসরই সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

প্রভাতে যথাবিধানে ভগবানবুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষপূজা, আরাত্রিক, স্তবগান, ভজন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে প্রায় চারিশত ভক্ত নরনারী অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দাস, এম-এ, পি-আর-এস, মহাশয়ের নেতৃত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। কুমারী অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। তাহার পর ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য বৈদিকমন্ত্রে শান্তিপাঠ ও পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একটি বাণী পাঠ করেন। মহাবোধি সোসাইটি হইতে আগত দুইজন সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু পালিভাষায় ভগবান বুদ্ধের স্তবগান করেন। তাহার পর স্বামী বেদানন্দ এই উৎসব উপলক্ষে রচিত তাঁহার একটি কবিতা আবৃত্তি এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধপাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ভদ্রবৃন্দ ভগবান বুদ্ধের অলোক সামান্য জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিভিন্ন অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে জগতের বহুদেশে ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ও তাহার ঐতিহাসিক নিদর্শন উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। রাত্রি দশটার পর সভার কার্য্য শেষ হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

অবৈতনিক প্রাথমিক ও শিল্প বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভা

গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির অবৈতনিক প্রাথমিক ও শিল্প বিদ্যালয়ের ষোড়শ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বেদান্ত সমিতির সভাপতি স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখার্জীর সমর্থনে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত জে পি আগরওয়ালা মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

সভাক্ষেত্রে ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত এন্‌. সি পাল, মঠের সাধুবৃন্দ ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর সমিতির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সদাত্মানন্দজী বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে স্কুলের ক্রমোন্নতি ও শিক্ষার পারিপাট্য ও পরীক্ষায় পারদর্শিতার ফল জানা যায়। বালকবৃন্দের কণ্ঠ সঙ্গীত, সংস্কৃত স্তোত্র, ইংরাজী কবিতা ও "শিবাজী ও শাহাজীর" অভিনয় প্রভৃতি হইবার পর বিখ্যাত ব্যায়ামক্রীড়া শিক্ষক শ্রীযুত নবীগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় বালকগণ নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল দেখাইয়া সকলকে আনন্দ দান করে। পাটকপাড়া মণীন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন, বেদান্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিদ্যাসাগর কলেজের জনৈক ছাত্র হরিদাস মুখার্জী (এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র) প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীর প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ছাত্রগণকে রৌপ্যপদক ও পুস্তকাদি পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীর প্রেরণা ও আশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে ইহা নিশ্চয়ই একটি মস্তবড় বিকাশশীল প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। এই বিদ্যালয়টী এই স্থানের একটী বিশেষ অভাব বিদূরিত করিয়াছে। পবিত্র স্মৃতিপূত, সমুন্নত কর্মরাজির গৌরবে উজ্জ্বল এই বিদ্যালয় নিজের উপরে একটী বিশেষ গুরুভার দায়িত্ব লইয়াছে. তাহা হইতেছে জনগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করা, তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করা। যে প্রকারে সুষ্ঠুভাবে ও ঐকান্তিকতার সহিত এই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপিত হইতেছে এই বিদ্যালয়ের ষোলো বৎসরের ইতিহাস সে সফলতার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জন্য যত কিছু ধন্যবাদ তাহা এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী ত্যাগী সংগঠনকারীদের প্রাপ্য। নবযুগের পত্তিতে যে সমস্ত সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা অনেক পরিমাণে তাহার সমাধান করিয়াছেন। বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক দুর্গতি ও বেকার সমস্যার যুগে কার্য্যকরী শিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দিতে হইতেছে; আমাদের ছেলেরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইয়াই নিজেদের পছন্দমত জীবিকা গ্রহণ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ১৯২৫ সনে এই অবৈতনিক বিদ্যালয় ও কার্য্যকরী শিল্প-শিক্ষায়তন স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কাঠের কাজ, দর্জির কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের আর একটী বিশিষ্ট দিক এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ শিক্ষাদানোন্মুখ ও গ্রহণোন্মুখ বয়স্ক ছেলেদের

জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছেন। তিনি বলেন, ভাগ্যবান তাহারা, ধন্যবাদের পাত্র তাহারা, জ্ঞানের প্রদীপ যাহারা দীপ্যমান রাখিয়াছেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ দান করেন এবং প্রার্থনা করেন যেন এই বিদ্যালয়ের দীপশিখা চিরকাল উজ্জ্বল থাকে।

উপসংহারে তিনি সর্ব্বসাধারণকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থাদি সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য অভাব মোচনের জন্য তিনি নিজেও সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কয়েকজন বালকের আবৃত্তি, সঙ্গীত ও ব্যায়াম প্রদর্শনে প্রীত হইয়া শ্রীযুত ভূতনাথ মুখার্জ্জী, শ্রীযুত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত বিমলকুমার বসু রৌপ্য পদক প্রদান করেন এবং শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, 'মাসপয়লা-সম্পাদক' শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত হরিহর মজুমদার ও ভূপর্যটক শ্রীযুত রমানাথ বিশ্বাস পুস্তকাদি প্রদান করেন। ছাত্রগণের জলযোগাদির জন্য সভাপতি মহোদয় ২৫৲ টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেন।

নড়াইলের জমিদার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে ও বিদ্যালয়ের উন্নতিকামী সর্ব্বসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর রাত্রি ১০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ১৯৪০ সনের কার্য্যবিবরণী

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

পরমপিতা পরমেশ্বরের অশেষ করুণায় গত জানুয়ারী মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সপ্তদশ বর্ষ আরম্ভ হয়েছে। ইহার স্থায়িত্বের জন্য যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, শুভেচ্ছা ও সাহায্য আমরা পেয়েছি তাদের সকলকে এই শুভমুহূর্তে আমাদের আন্তরিক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীভগবানের কৃপায় ও অকৃত্রিম বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় আশা করি, এ বিদ্যালয় দিন দিন আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হবে এবং শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের ও [illegible] ইহা একটী মঙ্গলময় চিরকালীন প্রতিষ্ঠান হোয়ে দাঁড়াবে।

সমিতির এই বিদ্যালয়ের প্রারম্ভের মূলে ছিল, মানবহিতৈষী মহাজ্ঞানী অভেদানন্দ স্বামিজী মহারাজের প্রেরণা। সে আজ ১৯২৪ সালের কথা, যখন তাঁহারই উপদেশ ও উৎসাহে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এই কলিকাতা সহরে এমন একটী বিদ্যালয় স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন, যেখানে বিনা বেতনে কুটির-শিল্প ও লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হবে সর্বসাধারণকে বিশেষতঃ দারিদ্র্য প্রপীড়িত গৃহস্থের সন্তানগণকে। আর ঐ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বালকগণ নৈতিক উন্নতি সাধনে মনোযোগী হয়, সেদিকে যাহাতে তাহাদের চিত্ত

যথার্থ মানবোচিত গুণের বীজ অঙ্কুরিত ও উন্মেষিত হয়, তাহার দিকে থাকবে বিশেষ লক্ষ্য।

উল্লিখিত আশা ও আকাঙ্ক্ষা কার্য্যকরী করবার মানসে স্বদেশপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করে ১১নং ইডেন হস্পিটাল রোডে একটী ভাড়াটিয়া প্রকোষ্ঠে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুরু করেন। ভদ্রবংশীয় গৃহস্থগণের যাহারা নিজেদের অভাব অভিযোগ প্রকাশ কর্ত্তে সর্ব্বদাই সঙ্কোচ বোধ করে থাকেন, কেবল এমনতর দুরবস্থাগ্রস্ত গৃহস্থের সন্তানগণ ঐ বিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছিল। তথাপি ছয় মাস না যেতেই দেখা গেল আর একজনকেও ভর্ত্তি করবার মত স্থান সেখানে নাই।

বেদান্ত সমিতির অনুকূলতায় আলোচ্য বর্ষে বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা ছয় গুণ জায়গা স্কুলের কাজে ব্যবহার করতে পাই। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা হিসাবে এ জায়গাও যথেষ্ট নয়—উপযুক্ত গৃহ নাই বলিয়া। বর্ত্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হবে ৯৯ জন, ও শিল্প বিদ্যালয়ের ৫৬ জন। এই দেড় শতাধিক ছাত্রের মধ্যে প্রায় সকলেরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মাত্র কয়েক জন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান এখানকার ছাত্ররূপে আছে। এদের অভিভাবকগণের দৃঢ় ধারণা—কোমলমতি বালকগণের নীতিশিক্ষায় ও চরিত্রগঠনে এখানে যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, এ অঞ্চলের কোন স্কুলে সেরূপ হয় না।

উক্ত আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে কি কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সংক্ষিপ্ত ভাবে তার একটি বিবরণ এখানে দিচ্ছি। চারজন শিক্ষক প্রাথমিক বিভাগে—শিশুশ্রেণী হতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত যথারীতি শিক্ষা দানে রত ছিলেন। তিনজন শিক্ষকের অধীনে শিল্প-বিভাগে যে সব কুটির শিল্প শিক্ষা দিয়া বেকার যুবকগণকে উপার্জ্জনক্ষম করা হয়েছে, তন্মধ্যে সূত্রধরের কাজ ও দর্জ্জির কাজ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র-গণের শারিরীক উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ বৎসর বিভিন্ন শিশু ক্রীড়ার এবং নির্ম্মল আনন্দ দানের জন্য সঙ্গীত শিক্ষার কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল। এতৎসঙ্গে নৈতিক চরিত্রগঠন, বাল্যাবধি মনে ভগবৎ প্রেম ও জনসেবার প্রতি আগ্রহ জন্মাবার জন্য মাঝে মাঝে ছাত্রদের ক'রে বরেণ্য মহাপুরুষগণের পুণ্য জীবনী আলোচনা কখন বা ছায়া চিত্র যোগে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়েছে। উপযুক্ত স্কুলগৃহের অভাবে ও টাকা পয়সার অস্বচ্ছলতার জন্য সকল শিক্ষক মহাশয়ের এ বৎসর শিক্ষাদান ব্যাপারে বহু বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই উৎসাহী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও যত্ন ছিল বলেই এ বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাথমিক বিভাগে শতকরা ৮০ জন, শিল্প বিভাগে শতকরা ৩০ জন ও গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় ৮ জনের মধ্যে ৭ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

নব বর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় দেশবন্ধু পার্কে যে ব্যায়াম প্রদর্শনী হয়েছিল, তাহাতে Physical

Instructor শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় আমাদের বিদ্যালয়ের ২২ জন ছাত্র-ব্যায়াম পটুতার জন্য প্রশংসালাভ করে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজী ও অভেদানন্দ স্বামিজীর জন্মোৎসবে যে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের পরিচালনায় সেখানে স্বরলিপি গান গেয়ে ৭ জন ছাত্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ব্রহ্মচারী অমর চৈতন্য প্রমুখ শিক্ষকগণের নেতৃত্বে বালকগণ মুসলমানের সঙ্গে সরস্বতী পূজা উৎসব সুসম্পন্ন করেছে। এ উপলক্ষে প্রায় চারশত ভক্তজনের সমাগম হয়েছিল। উৎসব দিবসের সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার প্রিয় শিষ্যগণ, নিজেদের নানা ব্যায়াম কৌশল দেখিয়ে দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। সত্য বলতে কি, অনুষ্ঠানটি সারা দিন ধরে সমাগত সকলের চিত্তে যেন একটী আনন্দের স্রোত এনে দিয়েছিল

এইবার এই বিদ্যালয়ের দু একটী বিশেষ অভাব অনটনের বিষয় বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। প্রধান অভাব হল শিক্ষাদানোপযোগী স্কুলগৃহের। উপযুক্ত গৃহ না থাকায় এবার ২০।২৫ জন মেধাবী দরিদ্র ছাত্র ভর্ত্তি হতে পায় নি। ঘরের জন্য একটা অভাব ১৩৩৯ সাল পর্য্যন্ত আমাদের ছিল না। কেন না তখন স্কুলের জন্য ছিল উঁচু দোতালা টিনের ঘর। দুঃসময় এল ৪০ সালের ফেব্রুয়ারীতে। কোন দৈবচক্রে কে জানে—ঐ মাসে কোন এক সন্ধ্যারাত্রে স্কুলবাড়ীর দোতালার বারান্দার সমস্ত ঘরগুলি আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সে দৃশ্য স্মৃতিপটে এলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে পড়ে। যা হোক ঐ ঘটনার পর থেকে এ পর্য্যন্ত কোন সুযোগ-সুবিধা আসেনি নূতন কোরে ঘর তোলবার। তাই পুরাতন ও আধপোড়া একচালা টিনের ঘরে কোন-প্রকারে স্কুলের কাজ চালিয়ে আসা হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে ঐরূপ ঘরে শতাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা কিরূপ কষ্টকর তা' সহজেই অনুমেয়। দমকা বাতাসের সময় পুরাতন টিনের গুঁড়া ময়লা মাথার উপর পড়ে সকলকে কতনা ব্যতিব্যস্ত করছে!

আবার বর্ষার সময় টিনের নানা জায়গা থেকে ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ে পড়াশোনার বিশেষ বিঘ্ন ঘটায়। আশাকরি স্থানীয় দানশীল মহানুভব ব্যক্তিগণ বিদ্যালয়ের এই দুঃসময়ে উদারতা ও তৎপরতার সহিত অগ্রসর হয়ে উক্ত বিশেষ অভাবটী দূর করে, তাঁদের অর্থের সদ্ব্যবহার করবেন ও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

আরও কয়েকটী অভাবের বিষয়ও এখানে উল্লেখযোগ্য কথা :—

১। দর্জ্জি বিভাগের জন্য একটি সীবন কল ও ১টী টেবিল।

২। শিশু লাইব্রেরীর জন্য একটী আলমারী ও ১০০ শত বই।

৩। বয়ন বিদ্যা শেখাবার জন্য ২টী তাঁত।

৪। প্রাথমিক বিভাগের জন্য ৬টী বেঞ্চ ও ৩টী চেয়ার।

যিনি যে কাজের জন্য যাহা দান করবেন সেই কাজের নামোল্লেখ করে তাহা সম্পাদক বা অধ্যক্ষের নিকট পাঠাবেন। সর্ববিধ সাহায্যদান অতি সাদরে গৃহীত হবে ও পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হবে। আমার মনে হয় স্কুল সম্বন্ধে মোটামুটি সব কথা আপনাদের কাছে বলা হ'ল। উপসংহারে এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকামী সকল বন্ধু বান্ধবকে পুনরায় আমাদের গভীর প্রীতি ও অন্তরের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ শেষ করা গেল।*

হরি ওঁ তৎসৎ

*১৮।৮।৪১ তারিখে বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সদাত্মানন্দজী কর্তৃক পঠিত।

The Ideal of Education

(A speech delivered by Swami Abhedananda at the "Bihar Young Men's Institute," Patna, on January 27, 1925.)

Mr. Chairman and Brethren,

It is with great pleasure that I stand before you this evening to speak on the Ideal of Education as announced by our Chairman. Before going into the subject of this evening, allow me to make a few introductory remarks about my activities in Europe and America. For the last twenty five years I was preaching India before the American public, as also in England and other parts of Europe. My object was to defend India and her culture against the unjust criticisms of the Christian missionaries and other sectarians, who wanted to convert Indians into Christianity and to raise funds for that purpose. I had the honour and privilege of representing India or rather the Indian culture, in various universities of the United States and Canada, where I met some of the greatest professors and educators of the West. I also had the privilege of talking with Professor Max Muller in Sanskrit, and of meeting Professor Paul Deussen who translated sixty of our Upanishads into German, and who was the author of "System des Vedanta" and the "Philosophy of the Upanishads." Professor Deussen once came to India and delivered a lecture in Sanskrit in Bombay. He spoke in Sanskrit to the ekka-drivers who could not understand him. The same venerable Professor Paul Deussen of Kiel University was in London when I was there, and to him I was introduced by my illustrious predecessor the world-renowned Swami Vivekananda. Swami Vivekananda called me over to London in 1896, and after giving me the charge of his work in London, he returned to India—his motherland. I stayed on and carried on the work which he had entrusted to me. Then I was asked to go over to America and make my headquarters in New York. Our Chairman has already said that the Vedanta Society of New York was started by Swami Vivekananda in 1894. This Society was in its infancy when I arrived at New York in 1897. It had only a handful of members at first, but after a hard struggle I succeeded in making it a well-established society. When I landed at New York I was penniless, and during my twenty-five years' stay in the United States I never drew a pice from India. I was entertained by the

American people, who gave me food, clothes, and a house, and took care of me. They also gave me an Ashrama measuring about 320 acres of land in a farm, and a home in the city of New York worth nearly two lakhs of rupees. Now there are four Swamis of our Mission who are working in different centres in the United States of America.

The subject of this evening makes me think of the past glory of India —our holy motherland. The civilization and culture of ancient India were grand and glorious. India has contributed her culture to the Western nations in various branches of knowledge. The world owes its first lessons in Geometry and Algebra (Vijaganita) to India The 47th proposition of Euclid —A square on the hypotenuse of a rectangular triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides—was ascribed to Pythagoras but it was known in India centuries before Pythagoras was born. It is mentioned in the Shulvasutras of the Vedic age. Algebra was introduced into Europe by the Arabs who learnt it in India, and Leonardo da Pisa introduced it into Italy and several countries of Europe in the thirteenth century. In fact, Geometry, Algebra, Trigonometry, all these were first taught in India. The Arabs learnt these from India and carried them into the West. The world owes decimal notation to India. It was unknown to the Greeks and Romans; and Arithmetic as a practical science would have been impossible without decimal notation. The world owes its first lessons in Medicine to India. Although there is a general belief that Europe derived her knowledge of medicine from Greece, still from researches we have gathered that Hippocrates, the father of modern medicine in Europe, who lived about 400 B. C., borrowed his Materia Medica from India. In Chemistry, as also in Surgery, we know from the study of the Sushruta, the Hindus excelled other nations We know from the accounts that have been left to us by Megasthenes, the Greek ambassador, who lived in the court of Chandragupta in the fourth century before Christ, that Alexander the Great used to keep Hindu physicians in his camp because he preferred them to Greek physicians. Nearchus and Arrian spoke highly of the wonderful healing powers of the Hindu physicians.

In various branches of science, philosophy, art, and music, the Hindus were the first teachers. For instance, the Greeks had five notes of music at first, but the Hindus developed seven notes of music and had three octaves long before the Greeks had them. During the Vedic period, Sama Veda used to be sung and chanted with those notes. Wagner's music with its special 'motifs' was indebted to Indian music. Schopenhauer, the great German philosopher, had a

conversation with Wagner on this subject, from which we learn that the great German musician Wagner studied the Latin translation of the Sanskrit science of music, and that he learnt from the Sanskrit science of music those principal 'motifs,' which have made his music so original and so wonderful. In other branches of knowledge also India developed her culture to a great extent, for instance, in Astronomy, and in developing the theory of evolution of the world out of Prakriti, the eternal cosmic energy as described in the Sankhya system of philosophy. All these different branches of study were highly developed in India centuries before Christ, and even today the European scholars admit this fact. I can quote from Sir Monier Monier-Williams, who in his book entitled "Brahmanism and Hinduism" says that "the Hindus were Spinozaites more than 2,000 years before the existence of Spinoza ; and Darwinians many centuries before Darwin ; and Evolutionists many centuries before the doctrine of Evolution had been accepted by the Scientists of our time, and before any word like Evolution existed in any language of the world." His remarks were correct, because we learn from the philosophy of Sankhya that the whole world was not created by an extra-cosmic personal God, who is sitting on his throne above the clouds, but that there was one eternal cosmic energy which was called by the name of Prakriti (the same as the Latin 'procreatrix'), the creative energy of the universe. This energy is indestructible and uncreatable, yet changeable. It is one and eternal. Today Western science admits that there is only one eternal cosmic energy the sum total of which neither increases nor decreases. This fact was established by Kapila, the founder of the Sankhya system of philosophy in the seventh century before Christ. We had our Newton in Aryabhatta who lived about A. D. 476, and who declared that the earth was moving upon its own axis round the sun. Long before the Copernican system of Astronomy was known to the Europeans, this Aryabhatta's system was taught in India, and it was Aryabhatta who first declared that the law of gravitation existed ; he called it 'Madhyakarshana,' i. e. attraction towards the centre. We had our Shakespeare in Kalidasa ; we had our philosopher greater than Kant and Hegel in Sankaracharya, greater than Hume and Berkeley in Vashistha ; and we had materialistic philosophy in the system of Kanada. The atomic theory of Kanada is a wonder to the Western minds, because in such an early age, i. e., in the pre-Buddhistic period, Kanada proved to the world that this external universe was made up of minute particles of matter—'anu' (atoms) which were indestructible. Again, we find

that these atoms of Kanada were not the final particles of the material world, but particles finer than atoms were discovered by Kapila and he called them 'Tanmatras,' which would be similar to the 'electrons' and 'protons' of modern science The 'electrons' are the force centres of negative electricity and the 'protons' are of positive electricity. Such great advancement was made in different branches of knowledge and science in the pre-Buddhistic age, which lasted between 1500 B. C. and 600 B. C. *

Then in moral and spiritual lines the Hindus were the first teachers in the world. Centuries before the Christian era, nay, long before Moses gave the Ten Commandments to the nomadic tribes of Israel, —in that remote antiquity, when the European nations were eating raw animal flesh, living in caves and forests, tattooing their bodies, wearing animal skins, the civilization of India was in its high glory. The dawn of civilization first broke not upon the horizon of Greece, Europe, or Arabia, but upon the horizon of India. India is not a country of today, but she had the sublime teachings of Vedanta long before the time of Moses, when Krishna sang the Bhagavat Gita in the battle field of Kurukshetra. All those who came in touch with India were benefited. During the Buddhistic period, as we know from the edicts of Asoka, Buddhist preachers were sent out to different parts of the then civilized world, from Siberia to Ceylon, and from China to Egypt. Buddhist monks travelled and preached the gospel of love for all, and the highest ethics of humanitarianism in foreign countries. Those teachings of Buddha were afterwards emphasized in the teachings of Jesus the Christ. Christianity can be traced back to the Hindu ideals in many of its doctrines and dogmas The principal part of Christianity, i.e., Baptism, was not known among the Jews of that time, but it came from the banks of the Ganges as Ernest Renan has said in his "Life of Jesus."*

The education of a nation depends upon its ideal of civilization. The Hindu ideal of civilization from pre-historic times was purely moral and spiritual. Consequently, the civilization of ancient India was based, not upon commercial principles of modern times, not upon the selfish ideal of political gain and power over other nations, but upon the eternal spiritual laws which govern our soul. Intellectual culture was not regarded as the highest ideal, but spiritual realization of the relation that exists between the individual soul and the Universal Spirit was the principal aim of education. "Education," as Herbert Spencer has

* See "India and Her People" by Swami Abhedananda.

said, "is the training for completeness of life." Education will bring out the perfection of the man which is already latent in his soul. Education does not mean that a lot of ideas or informations will be poured into the brain of the individual and they will run riot ; but it means the gradual growth and development of the soul from its infancy to maturity. Education should be based upon the spiritual ideal that each individual soul is potentially divine, that it possesses infinite potentiality and infinite possibilty, that knowledge cannot come from outside into inside, but that all knowledge evolves from inside out. No one can teach you, but you teach yourself. Teachers only give suggestions. This should be the principle of education. Today in our universities we find just the opposite principle. A student is allowed to study and memorize the notes of his professors and pass the examinations ; and then he comes out as a 'pash kara murkha'—a learned fool He gets a diploma for his ignorance That is not the ideal of education. Education does not mean intellectual culture, but it means the development and spiritual unfoldment of the soul in all the various branches of learning.

The ideal of education today, in America, is revolutionizing the ideals of the past ages. Today an infant boy or girl of four or five years of age is allowed to go into the kindergarten school-room where all kinds of toys, music-boxes, pictures for painting and drawing, are kept. The children are allowed to go inside that room and they are asked to choose what they would like, in order to know their natural inclinations If any one is attracted to the music-box he would excel in music, and, therefore, such training should be given to him as would make him the best musician of the world : he should not be allowed to go into a college and become a graduate in the literary line, which would mean nothing to him. Someone would be a painter and another would be an athlete. In every branch of learning one must excel. The stereotyped way of getting a degree like B.A. or M.A., and then becoming a clerk is not the ideal of education By following this method we are ruining our young men.

Education should be according to the natural inclination of the individual soul, with the idea that wisdom cannot be drilled into the brain of the individual, that all the books give mere suggestions, and in reaction we get the knowledge of the book. In order to understand a book, our minds must vibrate or be *en rapport* with the mind of the author. Then we get knowledge by itself, for it is a process of transmission. Knowledge does not come from outside. We will have to raise the vibration of our

minds to the level of the vibration of the mind of the author, and then, like wireless telegraphy the wisdom of the author's mind will be communicated to the student's mind. That is the natural principle of proper education Are we doing that? No. But we had that system in ancient India. The present university system is going to be out of place, because in England the professors are beginning to realize the efficiency of our old Brahmacharya Vidyapitha system. A professor would have a few students around him; he would be their guardian, and he would be of pure character, spotless in his ideals; he would be a moral man; he would not be like a man who gets a large pay and lives an immoral life. Such a man is not going to be the ideal teacher And this method is going to be taken up in Europe and America in future. In that system the student will find an example, and an example is better than precept. One living example will change the whole character of the student, and it will mould his career according to the ideal which is before him Therefore the present system of education is not a perfect one

Again, the ideal of a nation should be the ideal of education. Our minds are running towards the spiritual ideal Why? Because we have learnt all these different branches of science from religion. In Europe religion was against scientific culture Christianity stood against all intellectual development, against all science and all improvements. Think of the miserable condition of Galileo who said that the earth was moving The Roman Church put him into a dungeon and tortured him, asking him to retract his statement But Galileo said: "No, you can torture me to-day but the earth still moves. I cannot retract it for it is the truth." That truth is an established fact of modern astronomy The warfare between science and religion in Europe was a long-standing one. It has not stopped yet The fire of Inquisition was kindled, and hundreds were burnt alive at the stake simply because they did not submit their intellect to the dogmas of the Church. Giardano Bruno was burnt alive in the streets of Rome in A. D. 1600 because he was a believer in the one Supreme Spirit whose body was matter and whose mind was the cosmic mind. So, my friends, if religion were powerful in Europe today, there would have been no scientific culture, improvement or discovery; because their religion says of creation in six days out of nothing, while modern science teaches evolution. Religion tells them that the earth was created six thousand years ago before our sun came into existence, but modern Astronomy teaches that the sun was created before the earth; and Geology tells us that our earth is millions of years old, and that the first appearance

of man was about one hundred thousand years ago. How can we reconcile these contradictory statements ? If we accept one we shall have to reject the other. But in our country, my friends, Sanatana Dharma never stood against science or free thought. You may believe in God or you may not ; but so long as you are a moral and spiritual man, you are worshipped and honoured by the masses as the ideal of the nation. Buddha did not believe in a personal God, yet him we regard as an Avatara : Kapila did not believe in a personal God ; in his Sankhya system he says : "Iswara-siddheh" i.e., "There is no proof for the existence of a personal God who is the creator of the universe" Still Kapila was the greatest of all sages

We have hundreds of such cases, because free-thought was the watchword of the Hindus of ancient times. They had no bigotry and no sectarianism ; they did not mean by the Vedas a set of books which must be accepted as true in every letter, but they meant by Veda, 'wisdom' God is the ocean of wisdom, which is eternal and indestructible. There is only one source of wisdom which occasionally reveals itself to mortal minds, and through them the world learns something about the Eternal Truth. Who could have known anything about God if he did not reveal himself to mortal minds ? We know from the life of Mohammed that when he was praying on Mount Heerah, he had a revelation. He was living in a cave in that desert and his heart was longing for a knowledge of the Divine Being, and Truth was revealed to him. Truth is not confined to any particular individual or nation, but it is for everybody. As the sun rises and shines equally upon the heads of all nations, even so does the Sun of Eternal Truth shine and reveal itself among all nations. Whoever will long for such realization will find a way to the attainment of Truth. This conception has made the Hindu mind broad and tolerant. It does not condemn anybody. The Hindu embraces a Mohammedan because Mohammedanism is a path to the realization of Truth. He accepts Christianity because Christ revealed the Universal Truth among the Jews who had sectarian ideals Christ said : "And ye shall know the truth and the truth shall make you free" Our Vedas say the same thing. Where is then the difference ?

The essentials of all religions are one and the same, that is, God-consciousness, self-mastery, self-control and purity. These are the ideals. He is regarded as a civilized man by the Hindus who lives a pure and unselfish life, who is loving, kind and compassionate to all, who conquers avarice by generosity and hatred by love. But a man, who robs others to promote his self-interest, is not a civilized man according to the

Hindu ideal, and I do not believe that he is regarded as a civilized man according to the Mohammedan ideal either. The ideals are the same. A man must not be judged by his outside but by his inner nature, and character. The outward garb, dress, clothes, formality, etiquette, do not amount to anything ; the Lord sees the purity of the heart. "Blessed are the pure in heart : for they shall see God." Purity of heart is the *sine qua non* of God-vision. We must be pure in heart and loving to all, irrespective of caste, creed or nationality. Any education that separates mortals from mortals, that disunites brothers from brothers is not uplifting and should not be the ideal. Therefore, my brethren, I consider that the aim of education should not be mere intellectual culture with commercial ideals, to gain our livelihood in the struggle of competition, but that the ideal of education should be such as will elevate man from his ordinary selfish state into the unselfish universal ideal of God-hood. Anything that will make us kneel down before that grand ideal is uplifting.

(To be Continued)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে	শ্রীবিমলকান্ত লাহিড়ী	১২১
২। তিব্বতের বৌদ্ধ সঙ্ঘ	শ্রীঅজিত ঘোষ	১২২
৩। জীবন-কথা	স্বামী শঙ্করানন্দ	১২৭
৪। মৌর্য্যযুগ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৫
৫। যুগমানব স্বামী বিবেকানন্দ	স্বামী বেদানন্দ	১৪১
৬। বাঙালীয়ান	শ্রীদীবানন্দ ঠাকুর	১৪৯
৭। গ্রন্থ-সমালোচনা	...	১৫২
৮। The Ideal of Education	Swami Abhedananda	41

শাস্ত্রের গৌরব আলোকই ধর্ম্মের যথার্থ প্রকাশক

সমস্ত ধর্ম্মের গৌরব-দীপ্ত প্রধান শ্রেণীর ধর্ম্ম-পুস্তকসকল বিক্রয়ের জন্য আমরা রাখিয়া থাকি।

১।	সাংখ্য দর্শন	১।০
২।	গীতার ভূমিকা	১।০
৩।	বেদ প্রবেশিকা	১।০
৪।	সরল সাংখ্যযোগ	৷৵০
৫।	পাতঞ্জল যোগ দর্শন	৩।০
৬।	যোগ সোপান	।৵০
৭।	কর্ম্ম তত্ত্ব	১৲
৮।	বেদান্ত দর্শন ১ম—৪র্থ	৯৲
৯।	শুক্র শাস্ত্র	৸৵০
১০।	পাতঞ্জল দর্শন	২৷০
১১।	সাংখ্য সূত্রম	১৲
১২।	দেবলোক রহস্য	।৵০
১৩।	বেদান্ত সার	।৵০
১৪।	মহাভারত	২৷০
১৫।	রামায়ণ	১।০
১৬।	শ্রীমদ্ভাগবত	১২৲
১৭।	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	১৷০—৯৲
১৮।	চৈতন্য চরিতামৃত	২৷০
১৯।	পদ্ম পুরাণ	১৷০
২০।	শিব পুরাণ	২৷০
২১।	বিষ্ণু পুরাণ	১৷০
২২।	কল্কি পুরাণ	১।০
২৩।	নারদ পুরাণ	১।০
২৪।	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	২।০
২৫।	বামন পুরাণ	২৲
২৬।	অগ্নি পুরাণ	২৲
২৭।	মার্কণ্ড পুরাণ	১।০
২৮।	ধর্ম্ম পুরাণ	২৲
২৯।	চৈতন্য মহাপ্রভু	১৷০
৩০।	সটীক দশকর্ম্ম পদ্ধতি	১৲
৩১।	শ্রীরামকৃষ্ণ দেব	২৲
৩২।	বিবেকানন্দ চরিত্র	৯৲
৩৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম-৫ম)	৭৷০
৩৪।	স্বামী অভেদানন্দ (জীবনী)	।০
৩৫।	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (")	৪৲
৩৬।	আত্মজ্ঞান (স্বামী অভেদানন্দ)	৸০

ইহা ছাড়া আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলার উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা,—ফোন বি, বি, ৩৮৭৫

স্তোত্র রত্নাকর

স্বামী অভেদানন্দ

বিস্তৃত পূজাপদ্ধতিসহ স্তোত্র রত্নাকরের নূতন সংস্করণ

শীঘ্রই বাহির হইবে

বিশ্ববাণীর গ্রাহকগণের প্রতি

যাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা এখনও বাকী আছে অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

—কার্য্যাধ্যক্ষ "বিশ্ববাণী"

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাংলা পুস্তকাবলী

কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ … …	৷৷০
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড) …	১৲
" " " (২য় খণ্ড) …	১৲
সাধু চতুষ্টয় … … …	৸০
মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১৲
শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান … …	৷৵০
অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১৷০
বৃহন্নলা (কাব্য) … … …	১৷০
ঊষা ও অনিরুদ্ধ (কাব্য) … …	৶০

প্রাপ্তিস্থান—

মহেন্দ্র পাব্লিশিং কমিটি

৩নং গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৮ | পঞ্চম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে

শ্রীনির্মলকান্ত লাহিড়ী এম, এ. বি, সি, এস

মায়ার কাজলে কালিমা লিপ্ত আঁখি
আননে যাদের অবিশ্বাসের হাসি,
জড় বিজ্ঞানে জড়ায়ে ন্যায়ের ফাঁকি—
মিটাইলা দম্ভ ঠাকুর তাদের আসি।

মূর্খ বলিয়া তাহারে করিল ঘৃণা—
জড় প্রতিমায় চেতনা দেখিল যে না
কণ্ঠে যাহার সরস্বতীর বীণা—
বেদ বেদান্ত শিখাবে তাহারে কেবা?

যাহার কৃপায় বাচাল হয়েছে মূকে
যার করুণায় পঙ্গু উতরে গিরি,
সেই ভগবান দেখালে আপন বুকে
ভক্তের তরে কত প্রেম আছে ঘিরি।

এ কলি যুগের হিংসা লোভেরি যুগে
নর নারায়ণ নিত্য হতেছে বলি
তাই ভগবান শ্রীরাম কৃষ্ণ রূপে
নররূপ ধরি কাঁদিয়া গিয়াছে চলি।

ডাকিয়া গিয়াছে মুগ্ধ মানবে ভোলা
ধর্ম্মের লাগি কেনরে দ্বন্দ্ব গ্লানি
যে মতেই চল যে পথ রয়েছে খোলা
খুঁজিলে তাহারে সে যে লবে কোলে টানি।

খুঁজিতে হবে না দূর দুর্গমে ফিরে
ডাকিতে হবে না হর্ম্ম্য প্রাসাদ পুরে
জড় ও চেতনে রয়েছে যে জন ঘিরে
জীবে হের শিব যাইবে অশিব দূরে।

এ ধরার বুকে পাইনি তো মোরা আসি
ঠাকুর তোমার অমৃত পরশ খানি!
শুনেছি গিয়াছ বিলায়ে অমিয় হাসি
—মোরা তো শুনিনি পতিত পাবনী বাণী।

তাই বলে কিগো রহিব ভাগ্যহত?
কেমনে লুকাবে প্রেমের প্রবহ বারি
নররূপ তুমি ধরিলে তারিলে কত?
রেখে গেলে তব নামরূপ দুখ-হারী।

তিব্বতের বৌদ্ধ-সঙ্ঘ

শ্রীঅজিত ঘোষ

[পূর্বপ্রকাশিত 'তিব্বতে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের গোড়ার কথা' নিবন্ধের ক্রমানুবৃত্তি]

দীপঙ্কর অতীশের জীবনাবসানের পর খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১২শ শতকের মধ্যে তিব্বতের ইতিহাসে এক পরিবর্তন এসে পড়ল। এই সময়ে তিব্বতে অনেক বিহার গড়ে উঠে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। এর মূলে ছিল কয়েক জন চরমপন্থী রাজনীতিকের অভ্যুদয় ও তাঁদের দ্বিধাহীন কারসাজি। অবশ্য এ কারসাজি তাঁদের দূরদর্শিতার অনুকূল ছিল। একটা জটিল অবস্থার সুযোগ তাঁরা নিতে পেরেছিলেন। তখন কয়েক জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে অন্তর্কলহ লেগেই ছিল—শক্তিসঞ্চয় করে কেহই সর্বাগ্রগণ্য হ'তে পারেন-নি; এছাড়া সাধারণের মধ্যেও কলহপ্রিয়তা ছিল, নানা রকম সংস্কারের তারা বশীকৃত ছিল। সংস্কার ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে বিহারগুলির নির্মাণ-ব্যাপারে তিব্বতীয় সাধারণের শ্রদ্ধা ছিল খুব বেশী, কারণ তিব্বতের কঠোর শীতে সেগুলি সাত্ত্বিক যাজক-সম্প্রদায়ের বাসের বিশেষ উপযোগী ছিল। দেশের বৃহত্তম আবাসগৃহরূপে এবং সর্বাধিক আশঙ্কাবর্জিত আশ্রয়রূপে

বেশ মজবুত করে সেগুলি নির্মাণ করা হত। এই বিহারগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা মজবুত বিহার ছিল 'সকা'-বিহার। কিন্তু সকা-বিহারের অধিবাসী সাক্যিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রীতিমত বৈশিষ্ট্য স্থান পেয়েছিল। এই সাক্যিকেরা ছিলেন রাজবংশীয়, একাধারে তাঁরা রাষ্ট্রপরিচালক ও ধর্মনিয়ামক ছিলেন। তবে সাধারণ সাক্যিকের মত তাঁরা অকৃতদার ছিলেন না, সুতরাং বৈষয়িক-ব্যাপারে তাঁদের উদাসীনতা না থাকাই স্বাভাবিক। এ-সমস্ত কারণে তাঁরা পাদকীয় রাজবংশে পরিণত হন। পূর্ব-এশিয়ার ইতিহাসে সর্বাধিক সঙ্কটপূর্ণ যুগে তাঁরা তিব্বতের কর্ণধার ছিলেন। ইহা চিঙ্গিজ খাঁ বা জেঙ্গিজ খাঁর বিজয়াভিযান এবং মোঙ্গোল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও তার পরবর্তী কালের ঘটনা।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি চিঙ্গিজ খাঁর বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল কি না জানা যায় না, বা তিনি তিব্বত আক্রমণ করেছিলেন কি না তার কোন প্রমাণ নেই। তবে পরে তিব্বতীয় ধর্ম ও রাষ্ট্রজীবন মোঙ্গোল-রাজশক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তার প্রচুর নিদর্শন আছে। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকে মোঙ্গোল সম্রাট্ খুবিলই খাঁ তিব্বতের পূর্বপ্রদেশগুলি নিজের অধীনে আনেন এবং লামা-যাজকতন্ত্রের সাহায্যে মোঙ্গোল-রাজবংশ ও তিব্বতের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেন। অবশ্য খুবিলই খাঁর ঠিক পূর্ববর্তী সম্রাটের সময়েই এই সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল, কারণ সকা বিহারের সকা পণ্ডিতকে ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গোল-দরবারে উপস্থিত হইতে দেখা যায়. তিনি মোঙ্গোল-সম্রাটকে রোগমুক্ত করেছিলেন। সকা পণ্ডিতের তিব্বতীয় নাম 'স ক্য পন্ চেন্'। তিনি ছিলেন এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও প্রতিপত্তিশালী লামা। সাধারণ জ্ঞান ও ধর্মনৈতিক প্রজ্ঞা, উভয়তেই তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, কয়েকটা বিদেশী ভাষাও তিনি জানতেন।

সকা পণ্ডিতের অব্যবহিত পরবর্তী লামা 'পগ্ সপ'। এছাড়া পগ্ সপ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। এই পগ্ সপ এর সময়েই খুবিলই খাঁ তিব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পগ্ সপ-এর মোঙ্গোল অপভ্রংশ নাম 'বগ্ প'। 'পগ্ সপ' শব্দ সংস্কৃত 'আর্য' শব্দের সমার্থক। তিব্বতের একটা জনপ্রবাদে শোনা যায়, পগ্ সপ-এর জন্মের আগে তাঁর পিতাকে দেবতা গণেশ সমগ্র তিব্বতদেশ দেখিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে এই তিব্বতদেশ তার রাজ্য হবে। যাই হোক, লামা হবার পর পগ্ সপ সমগ্র তিব্বতে ও তিব্বতের বাহিরে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন।

খুবিলই খাঁ মধ্য-এশিয়ার অপরিণত একেশ্বরবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। মোঙ্গোলদিগকে তিনি একটা নির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন এবং তাদের আচার-ব্যবহার ও সাহিত্যের সংস্কার চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি তিব্বতীয় লামার সাহায্য গ্রহণ করেন। লামার সাহায্য গ্রহণ করবার একটা প্রধান কারণ এই ছিল যে, ইতঃপূর্বেই মোঙ্গোল-দরবারে লামার প্রভাব অপ্রতিহত এসে পড়েছিল। নিজ রাজ্যে তিনি সকা-

বিহারের কুবলাইখান লামা পগ্‌স্‌পকে আমন্ত্রণ করলেন এবং ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাছে অভিষেক-ক্রিয়াদ্বারা লামা-প্রভাবিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। পগ্‌স্‌প চীনদেশে মোঙ্গোল-দরবারে উচ্চ আসন লাভ করলেন। সেখানে তিনি অপরিমেয় প্রভাব-প্রতিপত্তি পেলেন। সুতরাং দেখা গেল, একাধারে তিনি লামা, মোঙ্গোল-দরবারের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ধর্মগুরু এবং মোঙ্গোল-সম্রাটের অধীন তিব্বত-রাষ্ট্রের কর্ণধার। মোঙ্গোল-দরবারে তিনি 'থুও-শিহ' উপাধি লাভ করেন এবং এই নামেই তিনি উত্তর-চীনে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। 'থুও-শিহ' অর্থে জাতির শিক্ষাগুরু এবং বৌদ্ধ, লামা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রধানতম ব্যক্তি। খুবিলাইকে তিনি 'হেবজ্র বসিতা'র গুহ্যতত্ত্বের শিক্ষা দেন। 'হেরুক' ও 'হেবজ্র'কে বোধিসত্ত্বের অন্যতম একই রূপ বলে ধরা হয়। 'বসিতা' অর্থে ধারণীর বীজ। সুতরাং হেবজ্র ও হেরুকের মন্ত্রই তিনি খুবিলাইকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অনেকের মতে, হেবজ্রে শৈব-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাই যদি হয়, তা হলে পগ্‌স্‌প তখন শৈব সংস্কৃতিকে চীনে টেনে এনেছিলেন একথা মনে করা যেতে পারে। পগ্‌স্‌পকে খুবিলাই খাঁ মোঙ্গোলদের জন্য যে শুধু একটী নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচলনের ভার দিয়েছিলেন তা নয়, একটী লিপি উদ্ভাবন করবারও ভার দিয়েছিলেন। ফলে, তিব্বতীয় লিপির সাহায্য নিয়ে পগ্‌স্‌প মোঙ্গোলদের জন্য একটী লিপির উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ঐ লিপি মোঙ্গোলদের ব্যবহারের পক্ষে সহজসাধ্য না হয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে এবং লেখার পক্ষে তা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাতে লেখবার সময় অক্ষরগুলি উপর হতে নীচের দিকে লিখতে হত এবং সেগুলি ছিল প্রায় চতুষ্কোণ। এই রকম নানা অসুবিধার জন্য এই লিপি বেশী দিন চলতে পারেনি। পগ্‌স্‌প-এর মৃত্যুর পর তা অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। অতঃপর উইগুর লিপি তার অভাব পূরণ করে। ইতঃপূর্বেই মোঙ্গোলদের জন্য শকা পণ্ডিত ঐ লিপির প্রচলন করেছিলেন। পগ্‌স্‌প-এর উত্তরাধিকারী লামা চোস্‌-কী-হোড়-জের তাকে সংস্কৃত করে মোঙ্গোলদের উপযোগী করে তোলেন। পূর্বে বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ রচনায় এই লিপি ব্যবহার করতেন। পগ্‌স্‌প-এর উপর আর একটী বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। সেটী ত্রিপিটকের একটী চীনা সংস্করণ রচনার ব্যবস্থা করা। সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতীয় ও উইগুর ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা পগ্‌স্‌প ত্রিপিটকের এই নূতন সংস্করণটী সঙ্কলন করেছিলেন।

অনিকো নামে এক জন লামাকে খুবিলাই মোঙ্গোল-রাজ্যে চারু-শিল্পকলা প্রবর্তনের ভার দিয়েছিলেন। অনিকো চিত্রকলা ও ভাস্কর-শিল্পে খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর চীনা শিষ্য লিউ য়ুয়েনের সহযোগিতায় সর্বতোভাবে তিব্বতীয় শিল্পকলার প্রভাব নিয়ে পিকিঙে নানাবিধ শিল্পের প্রবর্তন করেন। বিশিষ্ট ছাঁচে বুদ্ধমূর্তির প্রবর্তন হল, এছাড়া লৌহ ও স্বর্ণের আলঙ্কারিক শিল্পও প্রচলন করা হল। তিব্বত হতে এই শিল্পকলাগুলি মোঙ্গোলরাজ্যে এলেও চীনারা কিন্তু মনে করত যে, এ-শিল্প ভারতেরই জিনিস—তিব্বতের

মধ্য দিয়ে সেগুলিকে তথাকথিত মধ্য-এশিয়ায় আনা হয়েছে। একথা সত্য যে, তিব্বতের শিল্প নেপাল হতে এসেছিল এবং নেপাল তার শিল্প নিয়েছিল বাঙলা থেকে। অবশ্য তিব্বতের ছোট ছোট চিত্র হতে তার বেশ প্রমাণও পাওয়া যায়। তিব্বতীয় লামাদের চিত্রগুলির সঙ্গে নেপালের চিত্রকলার বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। তিব্বতের চিত্রে ও চিত্রিত নিশানগুলিতে যদি চিত্রিত মানুষের চোখগুলি লক্ষ্য করা যায়, তা হলে তাতে বাঙলার বৈশিষ্ট্যের একটা ছাপ দেখা যাবে। বাঙলার এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তী যুগে কালীঘাটের পটুয়ারা চরমভাবে রূপ দিয়েছেন।

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত মোঙ্গোল-দরবারে তিব্বতীয় লামাদের প্রভাব ছিল। য়ুয়েন্ বংশের রাজ্যকালই ছিল মোঙ্গোল বা তথাকথিত চীনদেশে লামাদের একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠাকাল। ঐতিহাসিকদের মতে, ১৩শ শতকে চীনে য়ুয়ন্-বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় লামাদের প্রতিষ্ঠা হলেও ১৪শ শতকের পূর্বে তাদের ধর্মানুশাসন প্রসার লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এই ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই য়ুয়ন-বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রভাবও প্রতিহত হয়। অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে, তিব্বতের প্রভাবে যে মোঙ্গোলীয় বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল তা পুরাপুরি রাজনৈতিক অবস্থায় ও ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। একজন্য তা বেশী দিন অটুট থাকতে পারে নি। যত দিন য়ুয়ন্-বংশ রাজত্ব করেছিলেন তত দিন লামাদের প্রভাব মোঙ্গোল-রাজ্যে অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু য়ুয়েন্ বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে লামা-প্রভাবেরও পতন হয়। ১২৭০ হতে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সক্য-বিহারের লামারাই এক রকম ধর্মনিয়ন্তা ও রাষ্ট্রব্যাপারের পরিচালক ছিলেন। এমন ক্ষমতাও তাঁরা লাভ করেছিলেন যাতে তাঁরা মোঙ্গোলরাজ্যে যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন। ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা দিকুঙে তাদের একটী প্রতিদ্বন্দ্বী বিহারকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। যে সমস্ত লামা মোঙ্গোল দরবারে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সক্য পণ্ডিত, ফগ্-স্প ও চোস্ কী হোড্-জের ছাড়াও আর এক জন বেশ নাম করেছিলেন, তিনি বুন-স্তোন রিন-চেন-গ্রুব। কালচক্রতন্ত্রে রিন-চেন-গ্রুবের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। ঐতিহাসিক বু স্তোন তাঁর শিষ্য। এই বু স্তোনই তিব্বতীয় ধর্মশাস্ত্র সংগ্রথিত করেছিলেন। লামাদের ক্ষমতা বাড়িতে আরও কয়েকটী বিহারের অভ্যুদয় সে যুগে হয়েছিল। তন্মধ্যে ফগ্ মোডু নামক স্থানের বিহার ছিল সর্বাগ্রগণ্য। বহু কাল যুদ্ধ করে এই বিহারের কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এবং তাঁরা একটী রাজবংশও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বংশ কর্তৃক ১৭শ শতক পর্যন্ত তিব্বতের কিয়দংশ শাসিত হয়েছিল।

১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়ন্-বংশের পতন হয় এবং মোঙ্গোল-সাম্রাজ্য মিঙ-বংশের অধিকারে আসে। মিঙ-রাজগণ সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্মকে স্বীকার করেন-নি, বা য়ুয়ন-রাজদের মতন বৌদ্ধধর্মই তাঁদের একমাত্র বিশ্বাস ছিল না এবং লামাদের প্রতিও তাঁদের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তবে, তিব্বতের সঙ্গে তাঁরা সদ্ভাব রাখতে চেয়েছিলেন। একজন্য তাঁরা

তিব্বতকে অধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত করলেন। ফগ্‌মোড্রু রাজবংশের ১০ অপর আটটী বিহারের কর্তৃপক্ষের উপর তাঁরা তিব্বত-পরিচালনার ভার দিলেন। ফলে, যে সক্য-বিহার খুবিলই-এর সময় সর্বপ্রাধান্য পেয়েছিল, ৭০ বৎসর পরে তা অন্যান্য বিহারের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।

এদিকে তিব্বতীয় লামাদের ইতিহাসে আবার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। এই সময় সোঙ-খ-প লামাতন্ত্রের সংস্কার করে ধর্মসঙ্ঘকে নূতন করে গড়ে তুললেন। মিং রাজত্বের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে এই ঘটনা ঘটেছিল। সোঙ-খ-পই লামাতন্ত্রের সর্বশেষ সংস্কারক এবং তাঁর রচিত বৌদ্ধসঙ্ঘই এখন বর্তমান। 'সোঙ-খ-প' তাঁর তিব্বতীয় ডাক নাম। তাঁর প্রকৃত তিব্বতীয় নাম—'জে-রিন্-পো-চে লো-জাং ড্রগ্‌স্‌-প' এবং সংস্কৃত নাম—'আর্যমহারত্ন সুমতিকীর্তি'। তিনি ছিলেন কনস্থ নামক চীনা প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তের আম্‌দো জেলার অন্তর্গত কুম্বুম্‌বিহারের। তিব্বতীয় নাম—'কুম্‌ বুম্‌'-বিহার। নিকটস্থ স্থানের অধিবাসী। মাত্র সাত বছর বয়সে কুম্বুম্‌-বিহারে তিনি দীক্ষা নেন। তাঁর জন্ম, বাল্যজীবন ও দীক্ষাকালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক বিস্ময়জনক কাহিনী প্রচলিত আছে। সে কাহিনীগুলি প্রায়ই অসম্ভব ও অবাস্তব হলেও সেগুলি হতে এটুকু ধারণা করা যায় যে, বাল্যকাল হতেই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। তিনি অনেক গুরুর কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি তিব্বতে এসে সক্য, দিকুঙ ও পরিশেষে লাসায় শিক্ষা নেন। তিব্বতের শিক্ষা হতে তাঁর ধারণা জন্মে যে, বৌদ্ধ লামাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সঙ্গতি নেই। এজন্য লামাপ্রভাব-বহির্ভূত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ও একাগ্রতার সাধনা নিয়ে তিনি ক্রমে তিব্বতীয় ধর্মসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অতঃপর সঙ্ঘের সংস্কারে তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হয়। আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি 'গেলুগ্‌-প' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং উহার অধিনায়করূপে প্রধান লামার (Grand Lama) প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মিক ও সাধারণ লৌকিক ব্যাপারে এই প্রধান লামা ও গেলুগ্‌-প-সম্প্রদায় এরূপ প্রতিষ্ঠা ও অভূতপূর্ব গুরুত্ব লাভ করে যে, উহাই তিব্বতের নির্দিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘে পরিণত হয়ে পড়ে। এই সঙ্ঘ 'পীত-সঙ্ঘ' (Yellow Church) নামেও পরিচিত হয়, কারণ পীতবর্ণকেই তার প্রধান বর্ণ করা হয়—এক রকম প্রতীকস্বরূপ বর্ণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। লাল রঙ বিপরীত ও ধর্মবিরুদ্ধ রঙে পরিণত হয়। এরূপ নির্দিষ্ট হয় যে, যারা নূতন সংস্কৃত সঙ্ঘানুবর্তী তারা পীতবর্ণ টুপি ও কটিবন্ধ ব্যবহার করবে এবং সর্বতোভাবে পীতবর্ণকে প্রাধান্য দেবে, কিন্তু যারা নূতন ধর্মসঙ্ঘের বাহিরে থাকবে তারা লাল রঙ ব্যবহার করবে—হলদে রঙ ব্যবহার করবার অধিকার তাদের নেই। দুটী প্রধান ধারায় সোঙ-খ-পের সঙ্ঘসংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়, একটী কঠোর সঙ্ঘজীবন, তাতে আজীবন কৌমার্য অবলম্বন করতে হবে—নরনারীর আসঙ্গলিপ্সা তাতে থাকবে না, ভাগবত চিন্তা ও প্রার্থনাই

সেখানে প্রাধান্য লাভ করবে, এবং অপরটীতে লামাতন্ত্রের তন্ত্রসাধনার কঠোরতা প্রকৃত ভাবে হ্রাস করা হয়। এ দুটী ধারা তিব্বতীয় জীবনে বেশ খাপ খেয়েছিল এবং ফলে সে নিয়ম রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লাসার নিকটে গন্দন-বিহার নির্মাণ করে তিনি তার প্রথম লামা হয়েছিলেন। গন্দন ছাড়া তিনি সেরা ও ডেপুঙে দুটী ও তাশিলুন্‌পোয় একটী বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

[ক্রমশঃ

জীবন-কথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ—অতঃপর একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট কালী ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে ভগবান আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" শীঘ্রই ভগবানের বাক্য সফল হইল। একদিন ধ্যানযোগে কালী নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হইয়া অত্যদ্ভুত তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করিলেন। পরে তাহা পরমহংসদেবের সমীপে সমস্ত বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন যে উহাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান। তাহার সমস্ত সংশয় দূর হইল, এবং ঈশ্বর-তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধিহেতু নাস্তিকতার অজ্ঞানাবরণ চিরদিনের জন্য কালিপ্রসাদের বুদ্ধি হইতে অপসারিত হইল।

নানাকথা—একদিন কালীপ্রসাদ একা বসিয়া পরমহংসদেবকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান বালকভাবে হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন "ছোকরাদের কেহ কেহ নরেনকে আমার চেয়ে বড় মনে করে, তোকে আমি বুদ্ধিমান বলিয়া জানি তুই কি বলিস?" কালীপ্রসাদ বলিলেন "যে নরেনকে আপনার চেয়ে বড় মনে করে সে কিছুই জানে না এবং আপনাকেও চিনিতে পারে নাই।"

পরমহংসদেব—"কেন?"

কালীপ্রসাদ—"নরেন আপনার হাতের বানান। আপনার শক্তিতেই নরেন যাহা কিছু শিখিয়াছে এবং আপনিই তাহার ইষ্টদেবতা। সে যদি আপনার চেয়ে বড় হয়, তবে আপনার পায়ে মাথা দিয়ে জ্ঞানভিক্ষা করবে কেন? সে যাহা জানে তাহা আপনার কৃপাতেই লাভ করেছে। নরেন আপনার অপেক্ষা বড় অথবা আপনার তুল্য কিরূপে হইতে পারে?"

শ্রীশ্রীঠাকুর কালীপ্রসাদের উত্তর শুনিয়া বলিলেন—

"তোর বুদ্ধি আছে, তুই ঠিক বলেছিস" বলিয়া তাহাকে আদর ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'আত্মজীবনী'র পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন :—

"আমি কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় মগ্ন আছি। একদিন বৈকালে আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিতে গিয়াছি। তিনি আমাকে বলিলেন :

"তোর বাবা আজ এসে বল্লে যে তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছে। আপনি কালীকে একবার তাহার মার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাড়ীতে যাইতে বলিবেন। আমি বলিলাম আচ্ছা, আমি তাহাকে বলিব। তাই আমি তোকে বলছি যে তুই বাড়ীতে যাইয়া থাকিবি।"

"আমি বলিলাম যে আচ্ছা, তৎপর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার সময় আমি পদব্রজে বাড়ীতে গমন করিলাম। পিতামাতা আমাকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন, এবং বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন এবং আহারাদি করিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টাকাল তথায় থাকিতে আমার প্রাণে মহা অশান্তি উপস্থিত হইল, আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন নরককুণ্ডে পড়িয়াছি এবং সংসারের হাওয়াতে আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এই ভাব থামাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। কাশীপুরে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি একটু মিষ্টি মুখ করিয়া পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া এক নিঃশ্বাসে কাশীপুরে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

"কিরে তুই বাড়ী যাস নাই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ গিয়াছিলাম"

"বাড়ীতে থাকিবার জন্য তোর বাবা বলেছিল, থাকিস্ নাই ?"

"ছিলুম তো"

"কতক্ষণ ছিলি ?"

"আধঘণ্টা মাত্র।"

"তবে তুই ফিরে এলি কেন।"

"রাত্রিতে বাড়ীতে থাকিব বলিয়া গিয়াছিলাম এবং পিতামাতাও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, এবং রাত্রিতে থাকিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মহা যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, এখানে আসিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল, মনে হইতে লাগিল যেন আমি নরকে গিয়া পড়িয়াছি। তাই একটু মিষ্টি মুখে দিয়া বিদায় লইয়া দৌড়াইয়া এখানে আসিয়া শান্তি পাইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিলেন 'বেশ করেছিস'। তাঁহার শান্তিময় atmosphereএ থাকিলে শান্তি পাইতাম এবং তাঁহার অপূর্ব ভালবাসার তুলনায় পিতামাতার স্নেহ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত।"

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বৈকালে শুইয়া আছেন, নীচে Lawn-এর ঘাসের উপর একজন পদচারণ করিতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর কালীপ্রসাদকে বলিলেন "দ্যাখ, ওকে ঘাসের উপর চলতে বারণ কর। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। ও যেন আমার বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।" সেই লোকটিকে বারণ করিতে তিনি সুস্থ হইলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায় না। যীশুখৃষ্ট সকল মানবের প্রতি প্রেম বিলাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সকল প্রাণীর ভিতর আত্মবুদ্ধি করিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বৃক্ষ তৃণ প্রভৃতিতে আত্মস্বরূপ অনুভূতি করিতেন।

পাগলিনী—কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য এক পাগলিনী আসিত। তাহার গলার স্বর অতি মধুর ছিল। সে মায়ের গান গাহিলে তাহার ভাব হইয়া যাইত। যখন পাগলিনী উচ্চৈঃস্বরে মধুর কণ্ঠে গাহিত

একবার এস মা এস মা ও হৃদয় রমা পরাণ পুতলি গো,
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, জানগো জননী যে যাতনা সয়ে
(আমার) হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে,
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো।

তখন সকলকে কাঁদাইয়া দিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও তখন ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন। পাগলিনী কাহারও বাধা মানিত না, ফাঁক পাইলেই সে উপরে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে ঘরে আসিতে নিষেধ করিতেন, কারণ তাহার (পাগলিনীর) পরমহংসদেবের প্রতি মধুর ভাব ছিল। একদিন তিনি বিরক্ত হইয়া কালীপ্রসাদ প্রভৃতি সেবকগণকে বলিলেন "ঐ পাগলিনীকে বাগান হতে বার করে দে। ওকে এখানে থাকতে দিসনা। ও ঘরে এলে আমার ভয় হয়।"

কিন্তু সে পাগলিনী কিছুতেই বাগানের বাহিরে যাইবে না। যতবার তাহাকে তাহারা তাড়াইয়া দিতেন, ততবার সে ফিরিয়া আসিত। বাগানের ফটক বন্ধ করিয়া দিলে রাস্তায় বসিয়া থাকিত। কেহ ফটক খুলিলেই সে বাগানের ভিতরে আসিত এবং উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত।

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁহার 'আত্মজীবনীতে' এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: "নিরঞ্জন লাঠি লইয়া তাড়া করিলেও সে তাহা মানিত না। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে এই পাগলিনীর অবস্থা বর্ণন করিলাম। তিনি বলিলেন 'যা, ওকে পুলিশে রেখে আয়।' আমি তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া কাশীপুর থানায় লইয়া গেলাম। পুলিসের constable পাগলিনীকে ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পাগলিনী আবার বাগানে আসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

মা মা ব'লে আর ডাকিব না,
তারা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।

ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী.
(না হয়) দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে তো আর কোলে যাব না।

এই সুন্দর গান তাহার সুমধুর কণ্ঠে শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং ভক্তগণেরও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। এই পাগলিনীকে দেখিয়া ও তাঁহার গান শুনিয়াই গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলে পাগলিনীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

"তখন নিরঞ্জন সেই পাগলিনীকে একখানি ঘরে বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়াছিল, তৎপরে দরজা খুলিয়া দিতেই সে আবার উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিরঞ্জন কাঁচি আনিয়া তাহার লম্বা চুল কাটিয়া দিল। সেই অবধি পাগলিনী চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসে নাই।"

মুরুব্বি গোপাল দাদা—মুরুব্বি বৃদ্ধ গোপালচন্দ্র বসু সিঁতিতে থাকিতেন। তাহার স্ত্রী পুত্র বিয়োগের পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সংসারে বৈরাগ্য আসে। সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসেন। তিনি প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন। তিনি একটু ডুগি বাজাইতে জানিতেন এবং নরেন যখন তানপুরা লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গান করিতেন তখন গোপাল দাদা ডুগিতে ঠেকা দিয়া সঙ্গত করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গোপাল দাদাকে ভাল বাসিতেন এবং প্রবীণ বিচক্ষণ বলিয়া তাহাকে আদর করিতেন। কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান সময়ে গোপালদাদা ঐ বাগানে আসিয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গৈরিক বস্ত্র প্রদান—পৌষ সংক্রান্তি আগত প্রায়। গঙ্গাসাগরে মেলা হইবে এবং জগন্নাথ ঘাটে (কলিকাতায়) বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছে। গোপালদাদা সাধুদিগকে শীতবস্ত্র দান করিবার জন্য ১২ খানি কাপড় কিনিয়া আনিয়াছিলেন এবং গিরি মাটি দিয়া রং করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ১২টী রুদ্রাক্ষের মালাও ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সংবাদ পাইয়া মুরুব্বি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"গেরুয়া কাপড় করা হচ্ছে কিসের জন্য ?"

"জগন্নাথ ঘাটে গঙ্গাসাগরে মেলায় যাইবার জন্য সাধুরা আসিয়াছে, তাঁহাদিগকে গেরুয়া বস্ত্র দান করিবার মানসে বার খানি কাপড় আনিয়া রং করিয়াছি।"

"জগন্নাথ ঘাটের সাধুদের কাপড় দিলে যে ফল হইবে তাহার হাজার গুণ বেশী ফল হইবে যদি এই ছেলেদিগকে এই গেরুয়া কাপড় দেওয়া হয়। এদের মত ত্যাগী সাধু কোথায় পাবি ? এদের এক এক জন হাজার সাধুর সমান। ইহারা হাজারী সাধু।"

ইহা শুনিয়া গোপালদাদার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালাগুলি স্পর্শ ও মন্ত্রপূত করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ এগারজন সেবক-

দিগকে গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা দান করিতে মুরব্বি গোপাল দাদাকে আদেশ করিলেন। তখন গোপাল দাদা তাহাদিগকে গৈরিক বস্ত্রগুলি ও রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দিলেন। তাহারা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতে উপরে গেলেন। তিনি তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বেশে দেখে মহানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। সেই হইতে কালীপ্রসাদ নরেন প্রভৃতি সকলে সাদা কাপড় ত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের জন্যও একখানি গেরুয়া রাখিয়া দিতে বলিলেন। পরে গিরিশ ঘোষ উহা পাইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ভিক্ষা করিবার আদেশ :—গৃহস্থ ভক্তেরা যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতা শ্যামপুকুরের বাসায় লইয়া আসিলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলরাম বসুকে বলিয়াছিলেন "তুমি আমার খাবার খরচটা দিও। আমি চাঁদার খাওয়া পছন্দ করি না"। পরম ভক্ত বলরাম এই আদেশে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিয়াছিলেন, এবং সানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন কাশীপুরের বাগানবাটী ভাড়া করা হইল তখন তিনি শ্রীসুরেশ মিত্রকে বলিয়াছিলেন—"এই সকল গরীব ভক্তেরা কেরাণী, ইহাদের ক্ষমতা নাই যে ৮০৲ টাকা এই বাগানের ভাড়া দিতে পারে। তুমি এই বাগান ভাড়াটা দিও।" শ্রীসুরেশ অবনত মস্তকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

এক্ষণে কাশীপুরের বাগানে যখন সেবকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল এবং তাঁহার সেবা করিবার ও দিবারাত্র watch করিবার জন্য বেশী সেবকের আবশ্যক হইল তখন রামবাবু প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ মাসিক খরচের বিষয় ভাবিয়া পরস্পরে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং ছুটকো গোপালকে খরচের হিসাব খাতায় লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। তখন অনেক সময় বৈকুণ্ঠ সান্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তেরা কাশীপুরে আসিয়া আহারাদি করিতেন এবং রাত্রিতেও বাস করিতেন।

রামবাবু ও গৃহস্থ ভক্তেরা অতিরিক্ত খরচ হইতেছে দেখিয়া এই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, দুইজন সেবকই পরমহংসদেবের সেবার জন্য যথেষ্ট, আর সকলে বাড়ী ফিরিয়া যাউক। এই সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ণে যখন পৌঁছিল তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

"আমার আর এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টানিব নাকি? না, বড়বাজারের মাড়োয়ারীটাকে ডাকিয়া আন্"। (সেই মাড়োয়াড়ী পরে অনেক টাকা লইয়া আসিয়াছিল। ঐ টাকা দেখিয়া তিনি বলিলেন, না তোমার কাঞ্চন গ্রহণ করিব না)।

ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁহার আত্মজীবনীতে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—"তখন নরেন প্রভৃতি আমরা সকলে বসিয়া আছি। আমাদিগকে বলিলেন—'তোরা আমাকে অন্যত্র নিয়ে চল্। তোরা আমাকে যেখানে নিয়ে

যাবি সেখানেই যাব। তোরা আমার জন্ত ভিক্ষা কর্‌তে পার্‌বি? তোরা কেমন ভিক্ষা কর্‌তে পারিস দেখা দেখি। ভিক্ষার অন্ন বড় শুদ্ধ। গৃহস্থের অন্ন খাবার আর আমার ইচ্ছা নাই।' আমরা বলিলাম—অবশ্যই আপনার জন্য আমরা ভিক্ষা করিব।"

"পরদিন প্রাতে নরেন, নিরঞ্জন, ছট্‌কো গোপাল ও আমি শ্রীমার নিকট নীচে ভিক্ষা করিতে যাইয়া বসিলাম—

'অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে
জ্ঞান বিজ্ঞান সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।'

"তৎপর তাঁহার হস্ত হইতে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরা পথে বাহির হইলাম। আমরা কখনও ভিক্ষা করি নাই এবং কিরূপে ভিক্ষা করিতে হয় তাহাও জানিনা। নিরঞ্জন মাথায় গেরুয়া পাগড়ী বাঁধিয়া হিন্দুস্থানী সাধু সাজিয়া 'মাই থোড়া ভিচ্ছা দিজিয়ে' বলিয়া আরম্ভ করিল। আমরা বাঙ্গালাতেই আরম্ভ করিলাম। কোন কোন বাড়ীতে মেয়েরা চাউল, আলু, কাচাকলা, বেগুণ ইত্যাদি ভিক্ষা দিল। কেহ বা নানা কথা শুনাইয়া দিল। কেহ বলিল হোৎকা মিনসে চাকরী করিতে পারিস না, ভিখারী সাজিয়া বাহির হইয়াছিস। কেহ বলিল—ইহারা ডাকাতের দল সন্ধান লইতে আসিয়াছে। আবার কেহ গুণ্ডার দলের লোক বলিয়া তাড়া দিল। আমরা নীরবে এই সকল অবমাননা সহ্য করিয়া অপর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে নিন্দা স্তুতিতে একভাব রাখিয়া ভিক্ষা করিতে শিখাইলেন।

"অবশেষে আমরা যাহা ভিক্ষা পাইলাম তাহা তাঁহার পদতলে সমর্পণ করিলাম। তাহা দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি শ্রীমাকে ঐ ভিক্ষার চাল রান্না করিতে আদেশ করিলেন।

"শ্রীশ্রীমা ঐ ভিক্ষান্নের তরল মণ্ড পাক করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন এবং তিনি উহা মুখে দিয়া বলিলেন—'ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র, ইহাতে কাহারো কোনও কামনা নাই। আজ আমি ভিক্ষান্ন খাইয়া পরমানন্দ পাইলাম।' তারপর আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম।"

ইহার পরে যোগীন, শরৎ, শশী, রাখাল প্রভৃতি সকলেই এক একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন।

কাশীপুর বাগানে যখন অনেক লোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলাতে তাঁহার গলার বিশ্রাম হইত না জানিয়া ডাক্তারগণ তাঁহার নিকট সেবক ভিন্ন অপর কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহারা এই নিয়ম যথাসাধ্য পালন করিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন এক ডাণ্ডা ঘাড়ে করিয়া দরজায় পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন। কোন গৃহস্থ বা ভক্তকে উপরে উঠিতে দেওয়া হইত না।

একদিন অনেকগুলি ভক্ত অনেক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেবকগণ

তাহাদের বয়কুলজা তাঁহাকে জানাইতে তিনিও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"ওরা এতদূর হইতে আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, ওদের আমি দেখিব। তৎপরে তাহারা আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিল। তাহাদের সহিত অধিক্ষণ কথা বলাতে তাঁহার গলায় বেদনা সেদিন বৃদ্ধি পাইল।

কাশীপুরে শিবরাত্রি—কাশীপুর বাগানে শিবরাত্রি একটী স্মরণীয় ঘটনা। আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের স্বহস্ত লিখিত 'আত্মজীবনী'র পাণ্ডুলিপি হইতেই উক্ত ঘটনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন –'শিবরাত্রির দিন আমরা (নরেন, শরৎ, নিরঞ্জন, হুটকো গোপাল ও আমি) নিরম্বু উপবাস করিয়া ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চারি প্রহরে শিবপূজা ও ধ্যান করিয়াছিলাম। নরেন মধুর কণ্ঠে শিবের গান গাহিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শরৎ, নিরঞ্জন ও গোপাল যখন কার্য্যবশতঃ বাহিরে গিয়াছিল তখন নরেন ও আমি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। নরেনের সমস্ত শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। নরেন আমাকে বলিল, আমার উরুতে হাত দিয়া দেখ্ত কিছু অনুভব কর্তে পারিস্ কিনা। তখন আমি তাহার উরুতে হাত রাখিলাম এবং অনুভব করিলাম যেন আমি Electric Battery ধরিয়াছি এবং নরেনের শরীরকে Magnetic Current প্রবল বেগে কাঁপাইতেছে। এই Current এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে আমার হাতও কাঁপিতে লাগিল। (১) এই ঘটনাটী লীলাপ্রসঙ্গে এবং স্বামিজীর জীবনীতে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, স্বামিজী আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। নরেনের মনে হইয়াছিল শ্রীশ্রীঠাকুর যে শক্তি সঞ্চার করেন তাহাও এইরূপ এবং তাঁহার ন্যায় তাহারও অপরের ভিতর শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনের এই অভিমান দূর করিবার জন্য বলিয়াছিলেন 'এখন শক্তি সংগ্রহের সময়, খরচ করিবার সময় নহে।' (২)

"ঐ শিবরাত্রির দিন নরেন 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' নামক গানটী মুখে মুখে রচনা করিয়া মধুর কণ্ঠে গান করিয়া তাঁহাদের সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু অগ্রেই খুলিয়াছিল এবং তাঁহার কৃপায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার আত্মসাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভও হয়।"

---

(১) স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ বলিতেন যে এই শরীরের কম্পন কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণেরই পরিচায়ক। তিনি যখন আমেরিকাতে রাজযোগের ক্লাস করিতেন তখন তাঁহারও এইরূপ অবস্থা হইত এবং তাঁহার শরীরের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটাই যেন কাঁপিতে থাকিত।

(২) স্বামী অভেদানন্দজী স্বামী সারদানন্দজী ও পরে আত্মবোধানন্দ স্বামীকে ঐ অতিরঞ্জিত ঘটনাটি বই হইতে তুলিয়া দিয়া সত্য ঘটনাটি প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।

আমরা গত চৈত্র সংখ্যার উদ্বোধন পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা ১৩৪৭, পৃ, ১৬২-১৬৩) দেখিলাম

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্ম্মানকায় ধারণ—বাগানে একটী খেজুর গাছ আছে। মালী সেই গাছে হাড়ি লাগাইয়া প্রত্যহ খেজুর রস সংগ্রহ করে। একদিন নিরঞ্জন যুক্তি করিলেন যে, তাহারা ঐ জীরেন রস চুরি করিয়া পান করিবে। সকলেই ইহাতে সম্মত হইল। গভীর রাত্রে নিরঞ্জন, হটকো গোপাল প্রভৃতি সেবকেরা খেজুর গাছ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু খেজুর গাছ দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন তাহারা ভাবিলেন ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই খেলা। সেই সময় শ্রীশ্রীমাও জাগিয়া বাগানের দিকে জানালা দিয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর নিরঞ্জন প্রভৃতির সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছেন। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু তখন আপন শয্যায় শুইয়া ছিলেন এবং দুইজন সেবক তাঁহার সেবা করিতেছিল।

ক্রমশঃ

সম্পাদক মহাশয় 'বাংলার ধর্ম্মগুরু' পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "আমরা অবগত আছি যে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একদিন উদ্বোধন কার্য্যালয়ে আসিয়া স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে এই বিবরণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "আমরা যা জানি তা লিখেছি, তুমি সংবাদপত্রে প্রতিবাদ কর।" কিন্তু তিনি জীবিতাবস্থায় তাহা করেন নাই। স্বামী সারদানন্দের মহাসমাধি লাভের পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ উদ্বোধন কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দকে একদিন ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন,—সারদানন্দ আমার সম্বন্ধে শিবরাত্রির ঘটনা ভুল লিখেছে। এরূপ কোনও ঘটনা হয়নি। তুমি লীলাপ্রসঙ্গ হতে এ ঘটনা তুলে দাও।" কিন্তু আত্মবোধানন্দজী লীলাপ্রসঙ্গের উপর হস্তক্ষেপ করতে বিনীতভাবে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছিলেন।"

এক্ষনে আমরা কাহার কথা সত্যবলিয়া মানিব? যাহার জীবনে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাঁহার—না যিনি লোকমুখে শুনিয়া ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার কথা? স্বামী অভেদানন্দজীর স্বহস্ত লিখিত আত্মজীবনী হইতে এবিষয়ক তাঁহার যে উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল তাহাতে দেখিতেছি তিনি ছাড়া ঐ ঘটনার আর কেহ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। স্বামী সারদানন্দ বা অন্য সকলে তখনই ঘটনার কথা জানিতে পারেন, যখন স্বামী বিবেকানন্দকে তাহার 'অভিমান' এর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তিরস্কার করেন। আর একটা কথা, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার শিষ্যকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তাঁহারই অপর এক শিষ্য তাহাকে সেই পথচ্যুত করিয়া নূতন এক পথে লইয়া যাইয়া তাহার সমূহ ক্ষতিসাধন করিতে সক্ষম হইলেন?

তারপর উদ্বোধন সম্পাদক লিখিয়াছেন—"তিনি (স্বামী অভেদানন্দ) জীবিতাবস্থায় তাহা (প্রতিবাদ) করেন নাই।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি ১৯২৬ খৃঃ অব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত "স্বামী অভেদানন্দ" শীর্ষক জীবনীর ১৪ ১৫ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া লীলাপ্রসঙ্গকার ও Life of Vivekananda এর সংগ্রাহকদের উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং ইহা তাঁহার জীবদ্দশাতেই অর্থাৎ দেহত্যাগের ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে এবং স্বামী সারদানন্দজীর জীবিত কালেই হইয়াছিল। ঐ পুস্তক নিশ্চয়ই সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

মৌর্য্যযুগ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ, এম, (ব্রাউন) পি, এইচ্, ডি, (হামবুর্গ)

আলেকজাণ্ডার যখন সিন্ধু-প্রদেশের মধ্য দিয়া পাঞ্জাব আক্রমণ করেন, তিনি এই সব স্থানে কোথাও একজন চক্রবর্ত্তী রাজার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন কৌমাবস্থাতেই ছিল, অর্থাৎ লোক বিভিন্ন জনপদে গণ্ডীভূক্ত হইয়া বাস করিত। ইহারা সেই প্রাচীন বিভিন্ন কৌমদেরই বংশধর ছিল। এই সব কৌমদের নাম আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই। বেদে আমরা কুরুবংশের উল্লেখ দেখিতে পাই। এবং পরে পৌরাণিক যুগে আমরা অশ্বক, অম্বষ্ঠ, মালব বা মল্ল, ক্ষুদ্রক, সৌবীর, গান্ধার প্রভৃতি জাতির নাম উল্লিখিত হইতে দেখি। তখন ভারতবর্ষের এই অংশ একরাটত্ব বিবর্দ্ধিত করিতে পারে নাই, সেইজন্যই এই স্থলের অধিবাসীরা আলেকজাণ্ডারকে বাধাপ্রদানে বিশেষ কৃতকার্য্য হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলার ঐতিহাসিকের (১) কথায় বলি যে পূর্ব্ব হইতে যখন মগধ সিংহবিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠে তখনই ম্যাসিডোনীয় সৈন্যদল ভয়াম্বিত হইয়া পশ্চাৎ গমন করিতে থাকে।

গ্রীক লেখকেরা বলেন যে ভারতের গ্রীষ্মের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সৈন্যেরা বিদ্রোহী হন এবং ইহারই ফলে আলেকজাণ্ডারকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু বহু পরে একজন রোমান্ লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, মগধের একরাট মহাপদ্ম নন্দের প্রতাপ শুনিয়াই ম্যাসিডোনীয় যোদ্ধারা ভীত হয়। একেইত পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের বীরদের শৌর্য্য দেখিয়া তাঁহারা চমকিত হয়। তৎপর এই জাতীয় এক প্রবল প্রতাপ সম্রাটের সম্মুখীন হওয়া তাঁহাদের পক্ষে শক্ত ছিল। এই সময় ম্যাসিডোনীয় স্কন্ধাবারে (camp) চন্দ্রগুপ্ত নামে মগধের একজন পলাতক যুবক আসিয়া জুটিয়াছিল। সে নন্দের শত্রু ছিল এবং তাঁহার সৈন্যের বহর আলেকজাণ্ডারের নিকট বিবৃত করিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ও প্রত্যাগমনের সংবাদ আমরা ভারতের ইতিহাস বা সাহিত্যে পাই না। যথার্থই ঐতিহাসিক নাগ (২) বলেছেন যে, তিনি আঁধির মত আসিয়াছিলেন এবং ঝড়ের মত চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযান ভারতে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই; কিন্তু এতদ্বারা ভারতবর্ষ ও হেলেনিষ্টিক দেশসমূহের সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হয়, এবং হয়ত হেলেনিষ্টিক সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিনিময় হইতে আরম্ভ হয়।

(১) ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী ১খণ্ড দ্রষ্টব্য।
(২) ভারতীয় ইতিহাসকি রূপরেখা—জয়চন্দ্র নাগ।

এই বৈদেশিক অভিযানকালে আমরা প্রবল প্রতাপ একরাট মহাপদ্ম-নন্দের নাম উল্লিখিত হইতে দেখি। পুরাণে তাঁহাকে শূদ্র বংশীয় বলা হইয়াছে। ইহারা মগধে শিশুনাগ বংশের পর রাজত্ব করেন। আজকালকার অনুসন্ধানকারীরা বলেন যে তাঁহার রাজত্ব বঙ্গোপসাগর হইতে জলন্ধর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, মগধ বড় হইয়া কোশল ও লিচ্ছবিদের দেশ গ্রাস করে, এবং নন্দের সময় আমরা উপরোক্ত সংবাদ পাই। ইহার অর্থ যে প্রাচ্যে মগধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌমগুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিয়া একচ্ছত্র শাসনের বিবর্ত্তন করিয়াছে এবং এই বিবর্ত্তনই অশোকের সময় পূর্ণতা লাভ করে। তখন সমগ্র ভারত একচ্ছত্রাধীন হইয়া একজাতীয়ত্ব লাভ করে।

নন্দের পর আমরা চন্দ্রগুপ্তকে উত্তরভারতের সম্রাটরূপে সাহিত্যে উল্লিখিত হইতে দেখি। পুরাণে তাহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে। গ্রীক লেখকগণ বলেন তাহার সহিত পশ্চিম এশিয়ার ম্যাসিডোনীয় রাজা সেলকুসের এক বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একদলের মত, ইহার অর্থ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকুসের কন্যার পানিগ্রহণ করেন। কিন্তু এই সংবাদের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ঐতিহাসিক নারং ভবিষ্য পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই সংবাদের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্য পুরাণ নামটাই একটি সন্দেহ স্থল। এই সংবাদ যে হালের কোন লেখকের দ্বারা তাহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই তাহারই বা প্রমাণ কি? শোনা যায় যে বর্ত্তমান যুগের অনেক নূতন সংবাদও তাহার মধ্যে লিখিত আছে!

চন্দ্রগুপ্ত হইতেই ভারতবর্ষের সঠিক ঐতিহাসিক সংবাদ আমরা পাইতে থাকি, এবং মগধেই সর্ব্বপ্রথম একচ্ছত্র অখণ্ড সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কেন সুদূর গান্ধার ও পাঞ্জাবের বৈদিক আর্য্যদের দুর্দ্ধর্ষ সন্তানেরা ইহা করিতে পারিল না এবং বৈদিক ঋষিদের ঘৃণার স্থল বঙ্গ, মগধ, চের জনপদে ইহা স্থাপিত হইল ইহা এখন সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। যাহাই হউক এই ঘৃণ্য বঙ্গ মগধের লোকেরাই ভারতকে একত্রিত করিয়া এক আইন ও এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিয়াছিল।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে নন্দেরা ক্ষত্রিয়কুল সব ধ্বংস করেন এবং নন্দবংশের পর আর ক্ষত্রিয় বংশ দেশে ছিল না। অন্য দিকে নবাকৃত বৌদ্ধ পুস্তক আর্য্য-মঞ্জুশ্রীমূলকল্প বলিতেছে যে বররুচি নন্দের সভায় থাকিতেন এবং পাণিনি তাঁহার সমসাময়িক লোক ছিলেন। ইহার ব্রাহ্মণদের সহিত বেশ সম্প্রীতি ছিল। নন্দবংশের পর আমরা মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে উত্তর ভারতের সম্রাটরূপে দেখি। পুরাণে কথিত হয় ব্রাহ্মণ কৌটিল্য নন্দবংশের প্রতি বিরূপ থাকায় চন্দ্রগুপ্তকে যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া নন্দবংশ ধ্বংস করেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরাণে কথিত হয় যে কৌটিল্য, চাণক্য এবং বিষ্ণুশর্ম্মা নামেও পরিচিত ছিলেন—তিনি গান্ধারবাসী ছিলেন। কিন্তু হালের কেহ কেহ তাহাকে দক্ষিণাপথ

বাসী (৩) বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু কৌটিল্যের বিখ্যাত পুস্তক অর্থশাস্ত্রে অথর্ব্ব বেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করা এবং অথর্ব্ব বেদের তুক তাক মন্ত্রকে বিশ্বাস করায় তাহাকে গান্ধার দেশীয় লোক বলিয়া সন্দেহ হয়। ভারতের এই অঞ্চলেই ইরাণী মাগী (Magi) ও অথর্ববানদের তুকতাক্ ও ম্যাজিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; অর্থশাস্ত্রে তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মৌর্য্যযুগের প্রকৃষ্ট সাহিত্য হইতেছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। ইহা ভারতীয় সভ্যতার যুগ প্রদর্শক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের লিখিত গানকতক ধর্ম্মপুস্তক হাতে পাইয়া বলিলেন যে হিন্দুরা জগৎ মিথ্যা বলিয়া চোখ বুজিয়া গাছের তলায় বসিয়া থাকে, আর একদল সমাজে থাকিয়া জাত-'মারা-মারি' করেন—ইহাই হইতেছে হিন্দু সভ্যতা! আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও এই ধারণাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষদের কার্য্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করিতেন। এই জন্যই সুদূর দক্ষিণ হইতে যখন অর্থশাস্ত্রের দুই খণ্ড পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় তখন পণ্ডিত মহলে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন ইহা একটা দক্ষিণী জালিয়াতি—কেহ বলিলেন ইহা অপেক্ষাকৃত হালের লেখা—কেহ বলিলেন ইহাতে অনেক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু Meyer বলেন ইহাতে কমই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেহ বলিলেন যে কৌটিল্য এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়া এত বড় পুস্তক কি করিয়া লিখিলেন! ইহা নিশ্চয়ই তাহার নহে—অন্যপক্ষে জয়সোয়াল (৪) বলেন যে ইহা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজকীয় আইন পুস্তক ছিল। এই অর্থশাস্ত্র পুস্তক আবিষ্কৃত হইবার পর পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে অনেক অর্থশাস্ত্রের পুস্তক সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের অর্থ হইতেছে—রাজনীতি-বিজ্ঞান (Political Economy)। ইহা রাষ্ট্রনীতি—অর্থনীতি এবং সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিসমূহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই চক্ষু দিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রকে দেখিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে ধর্ম্ম শাস্ত্রই হইতেছে বলবৎ অর্থাৎ রাজার নিকট তাহাই একমাত্র আইন বলিয়া গ্রাহ্য। অন্য পক্ষে জয়সোয়াল বলেন—অর্থশাস্ত্র হইতেছে রাজার আইন সেই জন্য রাষ্ট্রে তাহাই বলবৎ। আবার বহু পরে শুক্রনীতিতে বলা হইয়াছে দেশাচারই বলবৎ—অর্থাৎ রাজার নিকট তাহাই গ্রাহ্য। যাহাই হউক অর্থশাস্ত্র সমূহে আমরা প্রাচীন হিন্দুদের রাজনীতিক সংবাদ পাই। এই জন্যই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আমাদের নিকট এত চিত্তাকর্ষক (Interesting) পুস্তক। এই পুস্তকে এমন অনেক কথা আছে যাহা স্মৃতি সমূহে এবং হালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অজ্ঞাত যথা:—একজন ব্রাহ্মণের 'অনন্তর' পুত্র অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণের তাঁহার ঠিক নীচের বর্ণের রমণীর গর্ভজাত পুত্র যদি 'মানুষোপেত' হয় অর্থাৎ যদি মানবোচিত গুণ সমূহের অধিকারী হয় তবে তাহার

(৩) J. J. Meyer কৃত অর্থশাস্ত্রের জার্মান অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৪) Jayswal Age of Manu and Yajnavalka.

অপকৃষ্ট গুণ সমূহের অধিকারী ছেলেদের সহিত বিষয়ের সমান বখরা পাইবে ;' এই প্রকারে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের 'অনন্তর' পুত্রেরাও বিষয়ের বখরা পাইবে। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভজাত পুত্রদের সবর্ণ বলা হইয়াছে। শ্লোকটী হইতেছে—"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরনন্তরা পুত্রাস্সবর্ণা একান্তরা অসবর্ণাঃ।" (৫) (৬৫ প্রকরণ পুত্র বিভাগ).

শ্যামা শাস্ত্রী এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদের প্রথম সংস্করণে (1915-Ed). এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়ের পরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র (অনন্তর পুত্র) সবর্ণ"(৬) কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (1923-Ed). তাহা উঠাইয়া দিয়া বলিয়াছেন সবর্ণ (এক) বর্ণের মধ্যে বিবাহজাত পুত্রদের সবর্ণ বলা হয় (৭) অন্য পক্ষে Dr. Meyerএর জার্ম্মাণ অনুবাদ শাস্ত্রীর প্রথম অনুবাদের সঙ্গে মেলে। লেখক উপরোক্ত দুইখানি সংস্কৃত পুঁথি মিলাইয়া এই শ্লোকের এই অর্থ পাইয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভজাত পুত্র সবর্ণ। এতদ্বারা এই অনুমিত হয় যে বর্ত্তমানের পৌরহিত্যতন্ত্র (Priest-craft) পরিচালিত আধুনিক সমাজ পদ্ধতির সহিত মিল রাখিবার জন্যই এই দ্বিতীয় সংস্করণে বোধ হয় এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে 'ব্রহ্মজায়া' ও 'ব্রহ্মগাভী' শ্লোক সম্বন্ধে তিনি এক অতি বিকৃত ব্যাখ্যা লোক সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।

কৌটিল্যের ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াজাত পুত্রদের সবর্ণ বলার সহিত উসনস্ স্মৃতির মত মিলিয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতোব্রাহ্মণ এব সঃ (৮) (Ch iii. folio 3a) ইহার অর্থ হইতেছে যে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়ের কিম্বা বৈশ্যের পরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়।*

কৌটিল্য অবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাঁহার স্বামীর সহিত বনিবনা না হইলে তাঁহার বিবাহ বিচ্ছেদের (Divorce) ব্যবস্থা দিয়াছেন (Ch iii, sloka 155) (৯)। তারপর তিনি স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন, (Book iii ; Ch ii, pp 152) (১০)। তৎপর তিনি শূদ্রদের আর্য্যপ্রাণ বলিয়াছেন. (Ch viii Sloka 184) ; (১১)।

---

(৫) Shyama Sastri—Kautilya Arthasastra Chapter—
vi—200—201 p. p.
vii—202—203 p. p.

(৬) "Sons begotten by Brahmins of next lower caste 'Annantar putras' are called Sabarna !'

(৭) Sons begotten by Brahmins and Khattrias on women of same caste are called Sabarna.

(৮) Kane—History of Dharmasastra pp 112.

* এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনকালের বাস্তবকে আধুনিক পদ্ধতির সহিত মিলাইবার জন্য শ্যামা শাস্ত্রী দ্বিতীয় সংস্করণে শ্লোকের কি ভুল অর্থ করিয়াছেন।

(৯) শ্যামা শাস্ত্রী—English Translation of Kautilya pp 191.

(১০) Ibid— Ditto pp 187.
(১১) Ibid— Ditto pp 187.

তিনি বলিতেছেন, যে শূদ্র জন্মজাত গোলাম নয় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নাই কিন্তু আর্য্যপ্রাণ (আর্য্যত্ব প্রাপ্ত) তাহাকে যদি তাঁহার আত্মীয় বন্ধক দেয় (mortgage), তাহা হইলে তাহাদের ১২ পণ অর্থদণ্ড হইবে ;—

"উদরদাসবর্জমপ্রাপ্তব্যবহারং আর্য্যপ্রাণং শূদ্রং
বিক্রয়াধানং নয়তস্স্বজনস্য দ্বাদশপণো দণ্ডঃ ; (৬৫ দাসকল্প)।"

কারণ কোন আর্য্য গোলামীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না (১২)। পুনরায় একজন গোলামের অর্থ ঠকাইয়া লইলে কিম্বা আর্য্য বলিয়া যে সুবিধাগুলি সে পায় তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিলে (আর্য্যভাব অপহরত : Sloke 182) তাহা লইলে তাহাকে জরিমানা দিতে হয় (১৩)। পুনরায় যে লোক নিজেকে গোলামীত্বে বিক্রি করিয়া ফেলে তাহার পুত্র আর্য্য হইবে—Sloka 182 (১৪)। তৎপর আরও বলা হইতেছে যে একজন গোলাম স্বকৃত রোজগার উপভোগ করিতে পারিবে এবং পিতার অর্থের উত্তরাধিকারী (Inheritor) হইতে পারিবে ; (Sloka 182) (১৫)। পুনরায় একজন গোলামের দেহান্ত হইলে তাহার বিষয় তাহার জ্ঞাতিরা পাইবে (Sloka 183) (১৬)। আবার একজন যে টাকার বিনিময়ে নিজের গোলামীত্ব বিক্রি করিয়াছে সেই টাকা ফিরাইয়া দিলে তাঁহার আর্য্যত্ব ফিরাইয়া পাইবে ; Sloka 182 (১৭)। এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শূদ্র—মৌর্য্য শাসনকালে শূদ্রেরা আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায় পূর্ণ-নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর্য্য শব্দের অর্থ লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা বিতর্ক আছে ; এই স্থলে আর্য্য শব্দর অর্থ স্পষ্টই ধরা পরে। আর্য্য শব্দের অর্থ যিনি নাগরিকের পূর্ণ সুখ সুবিধা (Privileges) ভোগ করেন। এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আর্য্যপ্রাণ ও আর্য্যভাব শব্দের জয়সোয়াল এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে শূদ্রের যত 'আর্য্য' রক্ত আছে সে তত আর্য্যপ্রাণ এবং তত আর্য্যের সুবিধা ভোগকারী (১৮)। এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি হালের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর Race Theory দ্বারা ভারতীয় ইতিহাস ও ধর্ম্মপুস্তক সমূহ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু শ্যামা শাস্ত্রী আর্য্যপ্রাণ অর্থে Aryan by birth বলিয়াছেন এবং আর্যভাব অর্থে 'Privileges he can exercise as an Aryan' বলিয়াছেন। কৌটিল্যের অভিপ্রায় অতি প্রাঞ্জল। মৌর্য্যযুগে রাজমন্ত্রী কৌটিল্য ভারত হইতে গোলামী প্রথা (Slavery) পরোক্ষ উপায়ে (Indirectly) দূর করিবার

(১২) Shyama Sasri—222—223 pp. (১৩) Shyama Sasri—223 pp.
(১৪) „ —224 pp. (১৫) —224 pp.
(১৬) Shyama Sastri—285 pp.
(১৭)—Shyama Sastri—224 pp.
(১৮) Jayswal—Age of Manu and yajnavalka দ্রষ্টব্য।

চেষ্টা করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের প্রধান দুইটী কৃতিত্ব হইতেছে শূদ্রকে আর্য্যত্ব প্রদান করা ও গোলামীপ্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা। এই যুগে পৃথিবীর কোথায়ও কেহই গোলামী প্রথা বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন নাই। কৌটিল্যের সমসাময়িক Aristotle এই প্রথা সমর্থন করিয়াছেন। তৎপর তিনি রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিবার বেলায় বলিয়েছেন ;—

"Native born of high family, influential, well-educated in arts—these are the qualifications of a ministerial officer." (অমাত্য সম্পত) book I. Ch IX. Sloka 15 ; (১৯)।

প্রতিপত্তিশালী, বিভিন্ন কলায় সুপণ্ডিত, উচ্চবংশজাত স্বদেশবাসী ব্যক্তিই মন্ত্রিত্বাদি পদ লাভের যোগ্য অধিকারী। তিনি আরও বলিতেছেন : "He whose family and character are highly spoken of, is well-educated in Vedas and six Angsa···, him shall king employ as high Priest (২০)।

যাহার বংশ এবং চরিত্র মর্য্যাদা সর্ব্বমুখে প্রশংসিত, যে বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী রাজা তাহাকেই প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করিবে।

পুনরায় তিনি বলিতেছেন : "The king shall dismiss the priest who when ordered, refuse to teach the vedas to an outcaste person or refuse to officiate in a sacrificial performance (apparently) undertaken by an outcaste person" (Ajaya Book I, Ch. XX) (২১)।

রাজা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াও যে পুরোহিত একটী নীচবর্ণের ব্যক্তিকে বেদ পড়াইতে অস্বীকার করে অথবা একটী নীচবর্ণের 'অজাজ্ঞা' ব্যক্তি কর্ত্তৃক (আপাতভাবে) প্রবৃত্ত যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে অস্বীকার করে তাহাকে রাজা পদচ্যুত করিবেন।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধে লেখক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

(১৯) Shyama Sastri 15 p.p.
(২০) Ibid 16 p.p.
(২১) Shyama Sastri p.p. 16

যুগমানব স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বেদানন্দ

নব্যভারতের স্রষ্টা দিব্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবন সত্যসত্যই অপরূপ ও অতুলনীয়। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে যাঁরা চিরস্মরণীয়, নমস্য ও চিরবরেণ্য হয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ সেইসব অসাধারণ মহামানবদের সমান পর্য্যায়ে স্বগৌরবে সমাসীন। বর্ত্তমান ভারতের যুগাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই জীবন্ত ও জাগ্রত হয়েছে। বিবেকানন্দের এই আশ্চর্য্য জীবনের পরিচয় দেওয়া সহজ সাধ্য নয়। তাঁর বিরাট জীবনে নানা আশ্চর্য্য ঘটনা, গৌরবময় বহু আখ্যান এবং বিচিত্র বহুমুখী ও বিপুল কর্ম্মশীলতার সমাবেশ। বিরাট ব্যক্তিত্ব, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অপরিমেয় আধ্যাত্মিকতা, সুগভীর জ্ঞান, সুনির্ম্মল চরিত্র, বহুবিদ্যায় নিপুণতা, জীবন্ত জাতীয়তা, জলন্ত স্বদেশপ্রেম, জাতিনির্ব্বিশেষে নিখিল মানবের জন্য নিঃস্বার্থ ও অবিশ্রান্ত ভালবাসা এই সমস্ত সুদুর্ল্লভ সম্পদের সম্মিলনে স্বামী বিবেকানন্দ আপনাতে আপনিই পরিপূর্ণ। প্রকৃতই তাঁর জীবন যেন স্বর্গের কোন সুরভিময় সহস্রদল পদ্মের মতন আপনার অনবদ্য সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব সুন্দর। এই বিচিত্র-কর্ম্মবহুল, অসাধারণ জীবনকে যথাযথ ভাবে পরিচিত করাতে হলে চাই সুদূর প্রসারিত পরিপ্রেক্ষণী, অব্যর্থ অন্তর্দৃষ্টি, অপক্ষপাত ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভূতির তীব্রতা অবধারণশক্তি, মমত্ব বোধ ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি তাঁর ভাবধারা চিন্তাসম্পদ ও কর্ম্মজীবনের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কেননা বিবেকানন্দের মতন কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী যুগস্রষ্টা মহামানবের সম্যক পরিচয় প্রদান শুধু তাঁর অসাধারণ জীবনের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক বর্ণনা দ্বারাতেই সম্ভব হয় না। এই কার্য্য সম্পাদন করতে হলে লেখককে দেখাতে হবে যে যেসময়ে সেই মহামানব জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ে তাঁর দেশের অবস্থা ও সমাজের পরিস্থিতি কী ছিল? কোন্ কোন্ আন্দোলনের তরঙ্গ সেই সময়ে দেশে বয়ে চলেছিল—সেই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের আশা আকাঙ্খা, আগ্রহ, রুচি কোন বিষয়ে ও কোন পথে প্রবাহিত—পাশ্চাত্যদেশের কোন প্রচলিত আন্দোলন দেশের সমাজে কোন পরিবর্ত্তন ও প্রভাব এনেছিল কিনা—সে সময়ে দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অবস্থা কী প্রকার? তার পরে আরও প্রয়োজন যে এই মহামানবের অভ্যুদয় তাঁর দেশের ও জাতির গতিকে কোন পথে নিয়ে গেলো এবং তাতে দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতিমূলক কী পরিবর্ত্তন এসেছিলো? তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে কোন অপূর্ব্বতা আছে কি না? এবং তাঁর দেশীয় পূর্ব্ববর্ত্তী মহামানবদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতির কোন্ সংযোগ, সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ বর্ত্তমান কিনা। দেখাতে

হবে এই মহামানবের চিন্তাধারা, মনীষা, বহুমুখী কর্মশক্তি, ও বিরাট ব্যক্তিত্ব জাতির ইতিহাসে কী নূতনত্ব এনেছে—কোন কার্য্যে তাঁর শ্রেষ্ঠতা ও বিশেষত্ব নিহিত? এছাড়া আরও দেখানো প্রয়োজন তাঁর প্রতিভায় অবদান সমগ্র মানবসভ্যতাকে কোন অভিনব সাংস্কৃতিক ও চিন্তাসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে—আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠতা, উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই সমস্ত দিক ঠিক ঠিক ভাবে পাশাপাশি দেখাতে না পারলে কোন মহামানবের জীবনচরিত সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করা বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই কার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করবার অধিকার নিয়ে অতি অল্প লোকেই জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু একার্য্য অতীব দুঃসাধ্য। তথাপি কোনও মহামানবের সম্বন্ধে আলোচনা যতই অসম্পূর্ণ হোক সে কার্য্যে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও সাধন করে। সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত যুগস্রষ্টা মহামানব সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা একান্ত অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট হবে জেনেও তাঁর উদ্দেশে এখানে নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত কিছু অবতারণা করছি।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা বহুমুখী হয়ে আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশিত। তাঁর কর্মক্ষেত্রের কোন সীমা ছিল না। শুধু ধর্মসাধনা অথবা দার্শনিকতায় নয়—শিক্ষানীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দেশবাসীকে নিজের স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা বহু নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন। সেই কারণে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের মূলসূত্র কী এই নিয়ে সুধী ও চিন্তাশীল সমাজের মধ্যে নানা প্রকার মত বর্ত্তমান। কেউ তাঁকে বলেছেন আদর্শ ধর্মশিক্ষক, কেউ বলেছেন আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক, কেউ বলেছেন মহাকর্ম্মী এই প্রকার আরও কত কি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্মশিক্ষক সিদ্ধযোগী, দার্শনিক স্বদেশপ্রেমিক অথবা মহাকর্ম্মী মাত্রই ছিলেন না। এই সমস্ত এবং আরও বহু সদ্‌গুণের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমাবেশেই তাঁর জীবন বিচিত্রিত। অতএব কোন বিশেষ গুণটি স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব জীবনের মূলসূত্র তা বলা সহজসাধ্য নয়। বিবেকানন্দের জীবনের বিচিত্রতা ও বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে তাঁর অন্যতম জীবন-চরিতকার ফরাসী মনীষী রোমঁ্যা রোলাঁ লিখেছেন :—

"Equilibrium and synthesis in these two words Vivekananda's constructive genius may be summed up. He embraced all the paths of the spirit ; the four Yôgas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action from the most spiritual to the most practical……He was the personification of the harmony of all human energy."*

ভারতকে সর্ব্ববিধ গ্লানি থেকে মুক্ত ক'রে জগতের সমস্ত জাতির কাছে তার সভ্যতা

* Romain Rolland, Life of Vivekananda, Civitas Dei.

সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। তিনি দেখেছিলেন এদেশে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে দেশবাসী অজ্ঞানতা, সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামী, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ও দুর্গতির চরমে এসে পড়েছে। প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার (১৮৯৩) পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রত্যেক স্থান পরিভ্রমণ ক'রে অভিজাত বংশীয় রাজা মহারাজা থেকে কুটীরবাসী নিরন্ন দরিদ্র পর্য্যন্ত এদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হয়ে দেখেছিলেন জাতির বর্ত্তমান অবনতির কারণ কী? এবং কী ভাবে সেই অবনতি থেকে ভারতকে রক্ষা করা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, "আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি দারুণ অন্তরায় আছে। তার মধ্যে 'আমরাই পৃথিবীর একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি,' এই মিথ্যা-শ্রেষ্ঠতার অভিমান একটি। ভারতের বাহিরে অন্য যে সব জাতি আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে এখন আর আমাদের চলবে না। আমরা যে এক সময় তা করেছিলুম সে আমাদের নির্বুদ্ধিতা এবং তার বিষময় ফল এখন আমরা ভোগ করছি।" "যেদিন থেকে ভারতে 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার উৎপত্তি এবং জগতের অন্য সব জাতিদের সঙ্গে তার আদান প্রদান বন্ধ হলো সেই দিন থেকে ভারতের অধঃপতনেরও সূচনা হলো।" "পৃথিবীর অনেক দেশে ঘুরে ঘুরে তাদের সর্ব্ববিষয়ে আশ্চর্য্য রকম উন্নতি এবং আমাদের এই রকম অবনতির কারণ কি তা আমি অনেক চিন্তার পর উপলব্ধি করলুম যে যথার্থ শিক্ষাই তাদের সঙ্গে আমাদের এতখানি পার্থক্যের কারণ। শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা—একমাত্র শিক্ষার বিস্তারেই আমাদের সমস্ত জাতীয় ব্যাধি দূর হয়ে যাবে।"

ভারতের বর্ত্তমান অবনতির কারণ কি? এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত যে জাতিভেদ, পুরোহিতপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার আধিক্য এবং জীবনসংগ্রামে উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, শ্রমশিল্পজ্ঞান ও অর্থনৈতিক অভ্যুদয় লাভের কলাকৌশল না জানা থাকায় বর্ত্তমানে ভারত জগতের অন্য সব জাতির চেয়ে এত অবনত। এদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণেরা চিরকাল দেশের নিম্ন জাতিদের ঘৃণা অবজ্ঞা ও নির্য্যাতন ক'রে আসছে। উচ্চবর্ণের কাছ থেকে বহুশত বৎসর ধ'রে প্রতিপদে অমানুষিক ঘৃণা লাঞ্ছনা আর সহ্য করতে না পেরে নিম্নজাতির অনেকে হিন্দু সমাজ ত্যাগ ক'রে মুসলমান খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে! এদের প্রতি কারুরই সহানুভূতি দয়া অথবা মমতা নেই বরং হিন্দুসমাজে এদের কুকুর শিয়ালের চেয়েও হীন শোচনীয় অবস্থা। ধনী, উচ্চবর্ণ ও পুরোহিতদের অত্যাচারে নির্য্যাতনে অবজ্ঞায় ভারতের নিম্নজাতিরা নিষ্পেষিত ও জর্জ্জরিত। অথচ দেশের লোকসংখ্যার মধ্যে এরাই কোটী কোটী—এদের সংখ্যার তুলনায় উচ্চবর্ণেরা মুষ্টিমেয় মাত্র। মানুষের যে ন্যায্য অধিকার তাই থেকে ভারতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দরিদ্র নরনারী প্রবঞ্চিত—অন্নহীন বস্ত্রহীন স্বাস্থ্যহীন চরম দুর্গতি ও দুর্দ্দশায় তাদের জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে। ধনিকের নির্ম্মম অত্যাচারে শোষিত এই সব লক্ষ লক্ষ নির্য্যাতিত ও উচ্চ-

বর্ণের দ্বারা লাঞ্ছিত নিরীহ নরনারীর দুঃখ, ব্যথা, মনোকষ্ট, দারিদ্র্যের তীব্র অভাব মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত হয়ে অগ্নিগিরির ভীষণ নিঃস্রাব সৃষ্টি করতো। কী করে তাদের উন্নতি হবে এই দারুণ চিন্তায় অস্থির ও বিনিদ্র হয়ে শত শত রাত্রি তাঁর কেটে গেছে। মুষ্টিমেয় ধনী ও মদান্ধ ব্যক্তির বিলাসিতা ও আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে দেশের কোটি কোটি লোক দুর্দশার নিম্নতম স্তরে প'ড়ে থাকবে—এ কল্পনা বিবেকানন্দের চক্ষে বীভৎস বিভীষিকার সৃষ্টি করতো। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, "সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তারা?—না তুমি আমি দু' দশজন বড়ো জাত?" "যতদিন না ভারতের এই কোটি কোটি দরিদ্র উপযুক্ত শিক্ষা পায়, ভাল খেতে পায়, ভালরকম বাসস্থান পায় ততদিন যত বড়ই রাজনৈতিক আন্দোলন করা হোক না কেন তার কোনই ফল হবে না।" দেশের এই উপেক্ষিত চিরদরিদ্র জনসাধারণের দুঃখব্যথা স্বামিজীর বিশাল হৃদয়ে যে কী মর্ম্মঘাতী বেদনা ও ব্যথার দাবানল সৃষ্টি করেছিল তা তাঁর বহু পত্রে ও প্রবন্ধে দেখা যায়। এসম্বন্ধে আমেরিকা থেকে এক শিষ্যকে তিনি লিখেছিলেন, "আমি এই দেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়—তামাসা দেখতে নয়—এসেছি আমার দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের জন্যে একটা উপায় করতে। সে উপায় কি পরে জানবে যদি ভগবান সহায় হন।" অন্য এক স্থানে লিখেছিলেন, "আমার মতে, জনসাধারণকে অবজ্ঞা করাই ভারতের জাতীয় মহাপাপ এবং আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।" "...এসো প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতের জন্যে আমরা প্রার্থনা করি। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্ম্ম প্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের ভালবাসি। তাদের জন্যে ভাবো, তাদের জন্যে কাজ কর, তাদের জন্যে সদা-সর্ব্বদা প্রার্থনা কর। এরাই তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক।" স্বামিজীর দেশপ্রেম শুধু একটা কথার কথা মাত্রই ছিল না—তাঁর স্বদেশপ্রেম ওজস্বী বক্তৃতা প্রদান, অথবা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ নিবন্ধের রচনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সেই জীবন্ত স্বদেশপ্রেম তাঁর প্রবর্ত্তিত বহু বিভিন্ন কর্ম্মের মধ্যে জাহ্নবীধারার মতন প্রবাহিত হয়ে নানা-ভাবে দেশের উপেক্ষিত নির্য্যাতিত নিঃস্ব জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে আসছে। আজ যে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে জনসেবার এতো প্রসার ও প্রচলন হয়েছে তার প্রকৃত প্রেরণা দেশবাসী পেয়েছে ভারতপ্রাণ বিবেকানন্দের জীবন, প্রচণ্ড কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও অগ্নিময়ী বাণী থেকে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এক সময় লিখেছিলেন, "যদি দেশের জন্য মানবের ব্যথা ও ব্যাকুলতা কোনদিন শরীরিণী হইয়া উঠে তবেই বিবেকানন্দকে বুঝা যাইবে।"

দেশের সেবা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ধর্ম্মসাধনারই নামান্তর ছিল। কারণ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের চক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি শস্যবহুল নদী-বহুল এক বিরাট ভৌগোলিক সংস্থান মাত্রই ছিল না। ভারতের প্রত্যেকটি ধূলিকণা ছিল

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে স্বর্গের মহিমায় মহিমান্বিত। সমগ্র দেশ—সমগ্র দেশবাসীর মধ্যেই বিবেকানন্দ দেখেছিলেন তাঁর ইষ্ট দেবতার অনবন্ত চিন্ময় প্রকাশ। দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত সত্তা অবিচ্ছিন্ন ও ওতপ্রোত হয়ে জড়ানো ছিল। সেইজন্যই দেশের যুবকদের কাছে বিবেকানন্দের বাণী, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে দেশ জননী ভারতমাতাই যেন তোমাদের একমাত্র উপাস্যা হন। অন্য সব দেবদেবীকে এখন ভুললে চলবে—এখন একমাত্র ইনিই জাগ্রতা। তোমরা কোন নিষ্ফল দেবতার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছ? একমাত্র ভারতমাতারই সেবা কর।" একবার লাহোরে দু'জন বৈদান্তিক পণ্ডিত স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁর কাছ থেকে ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পরিবর্ত্তে শুধু দেশের দুঃখ অভাব ও দারিদ্র্য ও তার প্রতিকারের কথাই শুনে স্বামিজীকে অনুযোগ করেন যে সেদিন তাঁরা ধর্ম্মের কোন তত্ত্ব শুনতে পেলেন না। তার উত্তরে মানবপ্রেমিক ভারতপ্রাণ স্বামীজি ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন, "প্রত্যেক মানুষ জীবজন্তুর মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করাই বেদান্তের সার কথা —যতদিন ভারতের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন বিবেকানন্দের ধর্ম্ম নেই।"

স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন তা কোন সম্প্রদায়গত, দেশগত বা আচারগত ধর্ম্ম নয়। তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষ, পুস্তকবিশেষ বা মতবাদেই আবদ্ধ নয়। সার্ব্বজনীন ও সনাতন সত্যই স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্ম্মভাবের ভিত্তি। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে কোন ঈশ্বরদ্রষ্টা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের জীবনকে মাত্র অবলম্বন ক'রেই হিন্দুধর্ম্ম গড়ে ওঠেনি। পরন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ যে অনাদি অনন্ত শাশ্বত সত্য, যা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই অবাধিত অপরিবর্ত্তনীয়, সেই সনাতন সত্যের উপরই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি স্থাপিত। এই কারণে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম্ম। সেই কারণেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না—তার ধর্ম্মশাস্ত্র সেই কারণে কখনও মনুষ্য হস্ত রচিত গ্রন্থ হতে পারে না। বেদ অর্থে কোন পুস্তকবিশেষ নয়—পরন্তু অনাদি অনন্ত অসীম অলৌকিক জ্ঞানরাশিকেই বোঝায়। হিন্দুধর্ম্মের যা মূলনীতি তা কোন বিশেষ দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ নয়, তা একেবারে বিশ্বজনীন, সেইজন্য তা সম্পূর্ণভাবে সমগ্র মানবজাতির। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষিরা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক যুগে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আপনাকে এক অপরূপ মহিমা ও অপার্থিব সৌন্দর্য্যে যাঁর অলোকসামান্য মহাজীবনের মধ্যে রূপায়িত করেছিল তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্য সর্ব্বভাবময় দিব্যজীবনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেই স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যা প্রকৃত ধর্ম্ম তার স্বরূপ কতো মহিমময়—তার আদর্শ কী সার্ব্বভৌম ও বিশ্বজনীন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা এবং দিব্যস্পর্শেই মহাজ্ঞান মহাশক্তি লাভ ক'রেই সমগ্র সভ্য জগতের সমক্ষে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামিজী স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের আধ্যাত্মিক আলোকে উপলব্ধি করেছিলেন

যে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা থেকে সর্ব্বোচ্চস্তরের অদ্বৈতবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত সাধনাই সত্য, কোনটিই মিথ্যা নয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত এসব মতবাদ কেউই কারুর বিরোধী নয় পরন্তু একে অন্যের পরিপূরক। সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুযায়ী সাকার নিরাকার প্রত্যেকটি ভাবই সত্য। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম এই ত্রিতত্ত্বের সমন্বয়মূলক এই উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই বিবেকানন্দ সাধন উপলব্ধি ও প্রচার করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম জাতিনির্ব্বিশেষে মুক্তিকামী মাত্রেরই গ্রহণীয় ও বরণীয়।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "Religion is the manifestation of Divinity already in man,"—মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব আছে তার বহির্ব্বিকাশ সাধন করাই ধর্ম্ম। 'মদীয় আচার্য্যদেব' নামক বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে স্বামিজী বলেছেন, "ধর্ম্ম শুধু বাক্যের আড়ম্বর নয়—ধর্ম্ম মতবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতা নয়। সম্প্রদায় বা সমাজে ধর্ম্ম থাকতে পারে না। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করাই ধর্ম্মের কার্য্য। * * * মন্দির বা গির্জ্জা তৈরী কিম্বা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম্ম হয় না। কিম্বা কোন গ্রন্থবিশেষে, কারুর উক্তির মধ্যে অথবা সঙ্ঘে ধর্ম্ম নেই। ধর্ম্মের আসল তত্ত্ব অপরোক্ষানুভূতি। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার করা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া—ঈশ্বরের মধ্যে স্থিতিলাভ করা, ঈশ্বর হয়ে যাওয়া এ-ই হলো ধর্ম্ম।"

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ আপনার পরমারাধ্য ধর্ম্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্ম্মের যে পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করবার সময় কোথাও সেই প্রকৃত ধর্ম্মের চিহ্নও দেখতে পাননি। ধর্ম্মের সারতত্ত্বের পরিবর্ত্তে তিনি দেখেছিলেন সারা ভারত জুড়ে নানাপ্রকার যুক্তিহীন কদর্য্য প্রথা, অলীক ও অলৌকিক বিশ্বাস, অস্পৃশ্যতা এবং বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের আতিশয্য। যুক্তি বিচারের চেয়ে অনর্থ আচার হয়ে উঠেছে প্রবল। তাই এ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "হিন্দুর ধর্ম্ম এখন বেদ তন্ত্র পুরাণ কোথাও নেই—হিন্দুর ধর্ম্ম এখন ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে।…শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? আমি তো ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্ব্বত্রই শ্রুতিস্মৃতিবিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে। লোকাচার দেশাচার ও স্ত্রী-আচার, এ-ই এখন সর্ব্বত্র স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কার কথা শুনছে? টাকা দিতে পারলেই ভট্টাচার্য্যের দল যা তা বিধিনিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন।…শাস্ত্র ফাস্ত্র কি কেউ প'ড়ে—না, প'ড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?"

স্বামিজী দেখেছিলেন এদেশের লোকের বাহিরে ধর্ম্মভাব থাকলেও ভেতরে ধর্মভাবের নামে শুধু আলস্য, মানসিক জড়তা, ভাবপ্রবণতা ও তমোগুণের আধিক্য বর্ত্তমান।" সেজন্য তিনি বার বার বলেছিলেন, "আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম—এদেশের মতন অধিক তামসিক প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভাণ, ভিতরে একেবারে ইটপাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কী কাজ হবে? আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক

জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নাই, উৎসাহ নাই—মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই! কি হবে রে এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা ?…আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন—উত্তম ভোগ—আগে করতে শিখুক—তারপর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি ক'রে মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে।…দেশের লোককে আগে অন্ন সংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস্। কর্মতৎপরতার দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কাণ দেবে না।"

অনেকের মনে এই এক ভ্রান্ত ধারণা আছে যে যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বিজয়ী প্রচারক—অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভারতে প্রচলন করা তাঁর জীবনের অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু স্বামিজীর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে স্বামিজী পাশ্চাত্য সভ্যতার যে দিকটা আসুরিকভাবপূর্ণ, পরস্বশোষক অথবা স্বার্থান্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতাপূর্ণ সেই দিকটার তীব্র ও প্রবল প্রতিবাদ করলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে দিকটা শিক্ষণীয় গ্রহণীয় সুন্দর শাশ্বত ও মহান সেই দিকটার শুধু তিনি পক্ষপাতীই ছিলেন না, বরং তা গ্রহণ করবার জন্য দেশবাসীকে প্রবলভাবেই অনুরোধ করে বলেছেন, "শুধু সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিলে এখন আর চলবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ এখন ভারতের উপর বন্যার মতন বয়ে যাচ্ছে। এখন এই সম্বন্ধে কার্য্যকরী জ্ঞান অর্জন না করলে শুধু ধ্যান ধারণায় বিশেষ কিছু ফল হবে না।" "আমরা বৃথাই পাশ্চাত্যের ঐহিক সভ্যতার (material civilization) সম্বন্ধে অনর্থক নির্বোধের মতন মন্তব্য করে থাকি। এ ঠিক যেন শিয়ালের আঙুর ফল না পাওয়ার জন্য আঙুরকে টক বলার মতন। ধরেই নেওয়া যাক ধর্ম নিয়েই ভারতবাসী থাকলো এবং তার দ্বারা বড় জোড় এক লক্ষ লোক ধর্মলাভ করলে। কিন্তু এই এক লক্ষ লোকের ধর্মলাভ করবার জন্যে দেশের ত্রিশ কোটী লোককে অজ্ঞানতা ও অনাহারের গর্ত্তে ডুবতে হবে? কিসের জন্যে লোকে অভুক্ত হয়ে থাকবে? তোমরা কি জানো কিসের জন্যে মুসলমানদের কাছে হিন্দুদের পরাজয় হয়েছিল? তার কারণ জড়বাদমূলক সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুদের অজ্ঞতা। Material civilization, nay, even luxury is necessary to create works for the poor!"

স্বামিজী ছিলেন একজন প্রকৃত সংস্কারক। রক্ষণশীলতা বা 'প্রাচীন আদর্শ' নিষ্ঠার নামে অমানুষিক ও যুক্তিহীন সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কারের অচলায়তনে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকা সম্পূর্ণ তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, অবরোধ-প্রথা ধনতান্ত্রিকতা প্রভৃতি কুপ্রথাকে ভয়ানক ঘৃণা করতেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "Can you not make a European society with India's religion? I think it is possible and it must be. পুরোহিত-প্রথাকে তোমাদের ধর্ম থেকে উপড়ে ফেলে দাও—আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্মের অধিকারী হও।" সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

বলেছিলেন, "Reforms we should have in many ways, and who will be there such fool as to deny it ?"

যুগস্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের এই বিরাট বিপুল কর্ম্মসাধনা, এই জ্বলন্ত সর্বত্যাগ ব্রত—জীবন্ত স্বদেশপ্রেম আত্মহারা জনসেবার ভাব ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাঙলার যুবকদের মনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করেছে। স্বামিজীর জীবন ও বজ্রবাণী শুধু বাঙলা অথবা ভারতের যুবকবৃন্দের প্রাণে মুক্তি ও মহত্বলাভের অগ্নিপ্রেরণাই জাগায়নি—পরন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবকদের কাছে নবজাগ্রত জাতির বিশ্ববিজয়ী যৌবন মূর্ত্তিরূপে অভিনন্দিত। "বাঙলা দেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়—" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের যুবকদের উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে বলেছিলেন, "His (Swami Vivekananda's) glowing self-sacrifice should inspire the youngmen of our country." ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু বার বহু উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মহাযোগী সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা আজ একেবারে বিস্মৃত। জাতির ইতিহাসে জাতির চিত্তে ভগবান বুদ্ধ, সমর্থ রামদাস স্বামী, গুরুগোবিন্দ সিংহ অথবা স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিই শুধু চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তার কারণ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপ্রাণ মহামানবেরা নিজেদের দেহ মন প্রাণ সামর্থ্য শক্তি প্রতিভা দুর্গতিগ্রস্ত কোটী কোটী দেশবাসীর উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়াস সবই তাঁরা বলি দিয়েছিলেন দেশবাসীর জন্য—সমগ্র দেশের জন্য। এই কারণেই যতদিন ভারতবাসীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন ভারতবাসী কিছুতেই ভুলতে পারবে না স্বামী বিবেকানন্দকে। কারণ ভারতের যুবকবৃন্দ—ভারতের কোটী কোটী নরনারী জানে তাদের কঠোর জীবন সংগ্রামে—দুঃখে বিষাদে দৈন্যে সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করবার শক্তি দেবে বিবেকানন্দের অগ্নিজীবন, আর তাঁর প্রচণ্ড বজ্রবাণী। আর এই জন্যই ভারতীয় যুবকবৃন্দের কাছে বিবেকানন্দ একমাত্র যুগনায়ক ও জীবন্ত আদর্শ হয়ে থাকবেন।

বাঙালীয়ানা

অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর এম, এ,

'জননী ভারতবর্ষ যেদিন সুনীল জলধি হ'তে উঠেছিলেন বিশ্বে সেদিন যে কলরব, যে ভক্তি, যে হর্ষ জেগেছিল'—কবির ভাষাও তাকে বর্ণনা করবার মত সাহস যুগিয়ে উঠতে পারেনি। 'নিত্যালোকচিরবন্দিতপদযুগ নন্দিতবিশ্বনমস্কার' 'চরণকমল পরশ করে ধরণী ধন্য হয়ে জয় মা জগন্মোহিনী জগজ্জননী' ব'লে গেয়ে উঠল।

অতীতের তিমির-যুগে মানুষ যখন পর্যন্ত পাশবিক স্তরকে উত্তীর্ণ ক'রে আসতে পারেনি, যখন সর্বধ্বংসী আত্মপ্রতিষ্ঠার রণ-দামামা বেজে উঠেছিল, যখন অসংখ্য মতের অনৈক্য এবং বহুতার চক্রধাঁধায় সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত তখন তারা ভারতভূমির আবির্ভাবে সকল দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ, সকল অশান্তি-বিপর্যয়ের নিবৃত্তির সূচনা পেয়েই অমন শ্রদ্ধাপুলকিতচিত্ত হ'য়ে উঠেছিল। সেই অবস্থা অনুমান ক'রে কবি বলে উঠেছিলেন বোধহয় এই কথা—

"জয় জয় ভারত নর-অমরাবতি, জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
কর্ম্মদাত্রী তুমি ধর্ম্মদাত্রী তুমি! তব চরণে নতমাথা।

* * *

অভয়বাণী তব নাশি' পন্থাভয় মাভৈ-রবে দিল আশা,
আত্মা অমর বলি' প্রথম প্রচারিল জাগ্রত তব দেবভাষা,

* * *

নিখিললোক যেথা পুণ্যমিলন লভি' ধন্য হইল তব বক্ষে,
নিখিল ধর্ম্ম চির-লোকধর্ম্ম ধরি' শান্তি লভিল নব লক্ষ্যে;
দিকে-দিকে উত্থিত দ্বন্দ্বকলহ যত শান্ত করিয়া মধুমন্ত্রে,
দীপ্তবাণী তব ঝঙ্কৃত করি' দিক বিশ্ববিপুলবীণযন্ত্রে;

—এর মধ্যে সেই অনুমানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির স্তুতিগান শুনতে পাওয়া যায়।

যা কোথাও ঘটা সম্ভব হ'লনা তাই ঘটল সহজেই যেখানে তাকে কবি তীর্থ না বলে পারলেন না। কিন্তু এ তীর্থ মহা-মানবের তীর্থ, নর-দেবতার পুণ্যপীঠ—এখানেই মহামানবের সাগরসংগম, মিলনভূমি।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক হূন-দল পাঠান মোগল একে দেহে হোলো লীন।"

আসল কথা, 'তপস্যাবলে একের অনলে বহুকে আহুতি দিয়ে বিভেদ ভুলে একটি বিরাট

হিয়া' জাগিয়ে তোলার মধ্যেই ভারতের স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট। এই যে স্থিরনিশ্চয় প্রজ্ঞা, বা অন্তর্দৃষ্টি—এরই জন্তে ভারত বুঝেছে—অমেধ্য থেকেও কাঞ্চন গ্রহণ করতে হবে, আর তাই সে করেচে ও আর করেচে বলেই তার ভাব-ঐতিহ্যের মধ্যে এত বৈচিত্র্য অথচ এত সংগুপ্ত সমন্বয়। একথা বৈজ্ঞানিক সত্য যে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণেই কোনো জিনিষের অভিগতি। শুধু আপনাকে নিয়েই কোনো জিনিষ পরিণতি লাভ করতে পারে না।

একথা অবিশ্যি অভিযোগের সীমার বাইরে নয় যে ভারতের ভাবধারার পথ মাঝে-মাঝে রুদ্ধ হয়েচে; কিন্তু তবুও মোটামুটি বলা চলে যে গ্রহণীয়কে গ্রহণ করার বাধা অনতিক্রান্ত থাকেনি।

ভারতের এই যে লক্ষণ এর বেশ স্পষ্টতর ও স্ফুটতর প্রকাশ হয়েচে বাঙলার ভাব-ইতিহাসে। বাঙলাদেশ নোতুনকে, অপরিচিতকে যত প্রস্তুতি আর সপ্রতিভ নির্ভীকতার সংগে গ্রহণ করেচে তত আর কোনো প্রদেশ পারেনি; অর্থাৎ বাঙলাদেশে অপ্রয়োজনীয় পুরাতনের অকুণ্ঠ বর্জন আর জরুরতী জিনিষের অসংকোচ গ্রহণের গতি খুব জলদ্। জীর্ণ, অযৌক্তিক, অবাঞ্ছিত কোন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার হিম্মত বাঙলাদেশের হাড়ে-মাসে মেশানো। কবির ভাষায় মিলবে এর প্রতিধ্বনি:

"গতির ভুখে চলিস রুখে, বাংলা! সোণার তুই মৃগ।

* * *

সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত
চির-যুবন-মন্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিনী,"

তত্ত্ববিদেরা হয়ত বলবেন—এর কারণ বাঙলায় যত ভিন্ন মানব-পরিবারের মিশ্রণ হয়েচে তেমন আর কোথাও নয়।

কিরাতজাতির দেশ, পণ্ডিতবর্জিত দেশ, ম্লেচ্ছদেশ বলে অভিহিত হলেও—এরই জন্তে দেখা যায় বাঙলার সাহিত্যে, সংগীতে, নৃত্যে, চিত্রে, শিল্পে, ভাস্কর্যে, চাষে, ব্যবসায় যাবতীয় ধর্মে কর্মে মৌলিকতা ও নব্যতার চিহ্ন। এর মধ্যে বাঙলার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের দানও যে আছে সেকথা উপেক্ষা করলে সত্যের অঙ্গহানি ঘটে।

তাই বাঙলার কৃষ্টি এত বৈচিত্র্যময়, এত গভীর, এত বিরাট। বাঙলা শ্রদ্ধার সহিত সব কিছু গ্রহণ ক'রে আপনার ক'রে নিয়েচে, কাউকেই, কোন-কিছুকেই সে তাড়ায়নি, ধ্বংস করেনি,—আপনা থেকে যা লোপ পেয়েচে তাই।

বাঙলাদেশ-ই বলতে পেরেচে—

"হৃদে যার ব্রহ্ম আছে সেই ত ব্রাহ্মণ।
বাহ্য পৈতা ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ॥"

মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেচে—

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥"

বাঙলার কবিই বলতে পেরেচেন—

"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।"

বর্ত্তমান যুগেও সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, চিত্রশিল্পে নৃত্যে যে দান বাঙালী দিয়েচে—তা সারা জগত সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করে ধন্য হয়েচে। সত্যিই জগৎ কবি-সভায় মাঝে আমরা গর্ব করতে পারি যে 'বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নহে খর।' পুলকিত হয়ে বলতে ইচ্ছে তো হয়ই—

"বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়েছে মোদের চিত্ত গো।"

কিন্তু তাই বলে নিশ্চিন্ত আত্মতৃপ্তি নিয়ে থাকলে জাতীয় জীবনীশক্তি হবে ক্ষয়িত, আর সে শক্তি না থাকলে যা হয়—গ্রহণ ও দানের শক্তি হবে দূরায়িত।

সে সাবধানবাণী বলবার সময় যে না এসেচে তা নয়। কবিকে বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করে বলতে হয়েচে—

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি॥"

এ কথা সত্যি যে সব যুগেই কিছু একটা জাত সমান ভাবে সজাগ থাকতে পারে না; কিন্তু তাই বলে জাত যদি অসাড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে তাতে চিন্তিত হবার কারণ না থেকেই পারে না।

বাঙালীর বৈশিষ্টের কথা উপলব্ধি করতে হবে প্রত্যেক বাঙালীকে। চাই সেই আত্ম-সম্বিৎ আর নিবোধনা যা তাকে সকল দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠবার পৌরুষ দেবে, দেবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্পকলার, কৃষিব্যবসার নব নব অনাবিষ্কৃত রাজ্যকে আবিষ্কার করবার শক্তি, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও বিধী, দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান সন্ধান করে খুঁজে নিতে হলে।'

জননী, ধাত্রী বাঙলা যে আজ ধূলিশায়িতা, মলিনবেশপরিহিতা তাতে আর সন্দেহ আছে কি? বঙ্গভাষার প্রতি আমাদের এত উচ্ছ্বসিত স্তুতি-ভাবনা থাকলেও, এক সাহিত্য ছাড়া—বিজ্ঞানের ও দর্শনের স্বতন্ত্র বিভাগের সম্বন্ধে, মৌলিক না হলেও, অনুবাদ উল্লেখনীয় রকমের কিছু হয়েচে কি? অর্থনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙলাভাষায় প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখবার সময় কি এখনো আসেনি? না লেখকের অভাব আছে ব'লে বিশ্বাস করতে হবে? অধীনতার কথা বাদ দিয়ে যেটুকু করা যায় সেটুকুও কি হয়েচে বা হচ্ছে?

আত্মচেতনা দেয় উন্নতির প্রেরণা কিন্তু অহমিকা পথ রোধ করে তার। এই অহমিকা যেন বাঙালীর জাতীয় জীবনকে না পেয়ে বসে। যে গোঁড়ামি বা কূপমণ্ডুকতা কোনদিন বাঙালীর ধাতসহ হতে পারেনি আজ তাকে শেকড় গাড়তে দিলে জাতির সংস্কৃতি-প্রাসাদে ধরবে ফাটল।

'পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে বেঁধে বেঁধে না রেখে' মনকে করতে হবে নির্গ্রন্থী। নানা প্রদেশের সাহিত্য থেকে, দেশবিদেশের সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান এক কথায় সংস্কৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ ক'রে করতে হ'বে নব-নবায়মান সৃষ্টি। তবেই সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হবে বাঙালীর গৌরব-প্রতিষ্ঠা, বজায় থাকবে বঙ্গ-কৃষ্টির অনবচ্ছিন্ন ধারা, তবেই বঙ্গদেশকে সম্বোধন করে বলা চলবে—

'আছ তুমি, থাক্‌বে তুমি জগৎ জুড়ে জাগবে যশ।'

নবযুগের সেই সম্ভাবনার বীজ তো বর্তমানের মধ্যেই বপন করতে হবে!

গ্রন্থ-সমালোচনা

(১) **উৎসবের প্রণতি**—প্রথম খণ্ড, (২) **উৎসবের প্রণতি**—দ্বিতীয় খণ্ড, (৩) **ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা** এবং (৪) **নবযুগের শিক্ষা ও সাধনা**—এই চারিখানি পুস্তক আসামের ডি. পি. আই, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ (লণ্ডন), আই-ই-এস মহাশয়ের দ্বারা লিখিত। পুস্তকগুলি সবই সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। ভগবানে ভক্তি, তাঁহার করুণা মহিমা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া প্রথম দুইটি পুস্তক লিখিত। লেখক মহাশয় সুপণ্ডিত, জনহিতৈষী এবং ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। ধর্মবিষয়ে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের মতাবলম্বী হইলেও কোথাও অপর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্বেষ পোষণ করেন নাই। বরং তাঁহার রচনায় অন্যধর্মের প্রতি উদারতা ও সহানুভূতির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। "ছেলে মেয়েদের প্রার্থনা" বইখানিতে বালক বালিকাদের মনে যাহাতে ধর্মভাবের বীজ রোপিত হয় সেই উদ্দেশে গান ও গদ্যে প্রার্থনাবলী গ্রথিত করা আছে। আজকাল এই ধর্মহীনতার যুগে অল্পবয়স্কদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি ও অনুরাগ উদ্দীপিত করা একান্তই প্রয়োজন। এই জন্য এই বইখানি প্রতি বিদ্যালয়ে প্রচারিত হওয়া উচিত। চতুর্থ বইখানিতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন চরিত্র গঠন ও ধর্মলাভই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই সুপাঠ্য সুনীতিপূর্ণ পুস্তকগুলি দেশের ছেলে মেয়েদের প্রত্যেকে পাঠ করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

The Ideal of Education

(*Continued from the last issue*)

Swami Abhedananda

A Hindu philosopher went to Greece and asked Socrates what he was studying. Socrates answered : "My study is the study of Man." The Hindu philosopher smiled and replied : "How can you know anything about man when you do not know God ?" This is an answer that could come from a Hindu alone and not from any other philosopher ; because the Hindu alone from ancient times has regarded the individual soul as a part and parcel of the Divine Being. The divine spark dwells within us ; we must recognize that divine spark in all methods of education. We must regard the child who is born as a living God ; not that it was created out of nothing and a soul was breathed into its body from outside, but that the soul of the child is the maker of its physical body. The soul is eternal and it could never be created. It is the body that could be created. This highest wisdom is given only in the Hindu philosophy of Vedanta and the Western world today recognizes this fact. When Christ said, "The kingdom of Heaven is within you," he perhaps meant the same thing, but the occidentals do not understand his meaning. We orientals understand Christ better than the occidentals do. The other day I was talking with an Englishman in Calcutta and he said that he had a theory that the Hindu mind could understand Christ better than the occidental. I said, "I share that belief, because I know that the occidental mind takes everything too literally, while Christ himself spoke in metaphors and parables which should be understood in the same way as the parables and metaphors of Buddha and Krishna." He replied, "I believe you are right." So, my friends, we Hindus can give a new interpretation to the doctrines of Christianity, and, perhaps, a new interpretation to the ideals of other religions from the highest standpoint of our Vedanta.

Vedanta means the highest wisdom ; it does not mean any book. "Veda" means "wisdom" while "anta" means "end." The word "wisdom" is derived from the same Sanskrit root "vid" to know, and "end" is derived from "anta" which means the same thing. You will be surprised to know that most of the English words that we use now in our colloquial conversation had their origin in Sanskrit words. The word "father,"

in Latin "pater," in Greek "pater," is in Sanskrit "pitar ;" the word "mother," in Latin "mater," is in Sanskrit "matar ;" the word "brother" is in Sanskrit "bhratar ;" the word "daughter" is in Sanskrit "duhitar ;" the word "name" is in Sanskrit "naman ;" the word "serpent" is in Sanskrit "sarpa ;" the word "path" is in Sanskrit "patha ;" the word "soup" is in Sanskrit "supa ;" the word "bond" is in Sanskrit "bandha ;" the word "punch" is in Sanskrit "pancha" which means five ; and the punch which the Europeans drink is called so because it is made up of five ingredients. Therefore, my friends, you can trace most of these English words into Sanskrit roots Æsop's fables and Pilpay's stories were based upon the stories from Hitopadesha. All these animal stories originated in India, and travelled westward into Europe. Thus you see that the culture of the ancient Hindu people was great, and during the Buddhistic age that culture was improved in various lines. Here you had the Nalanda University. Do you know what that University was like ? Ten thousand students used to live there. We read a description of that Nalanda University in the writings of the Chinese traveller Hiuen Tsang, who lived there for many years. He said that from one hundred pulpits instructions were given every day to different classes of students, and that no student disobeyed the orders of the University or its rules and regulations during the seven hundred years of its existence. Think of the discipline which the Nalanda University had. I went to see the ruins of the Taxila University. There also several thousand students used to live. Chinese scholars used to come and study various branches of science and philosophy from the Hindu teachers. The principal of the Nalanda University was Shilabhadra, the teacher of Hiuen Tsang, who was a Bengalee from Gauda, the then capital of Bengal. Dipankar, whose birthplace was Vajrayogini in Vikrampur in East Bengal, was a great philosopher who went to Tibet to preach the gospel of Buddha. Buddhist preachers also went to Egypt, China, and Japan. At one time the inhabitants of Bengal, Bihar and Orissa were all Buddhists, and Beharis and Bengalees were brothers who had one Magadhi language. The Jagannath temple in Orissa was a temple of the Buddhists. There was no caste distinction ; all were brothers. That brotherliness should be revived once more. At that time, of course, Islam had not risen, and Christianity was not there. But still the ideal of universal brotherhood was preached by Buddha; and even Krishna, who antedated Buddha, declared in a trumpet voice before the world :

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥"

"He is a Pandit, a true philosopher and a scholar, who can see the same Universal Spirit in a well-cultured Brahman, in a cow, in an elephant, in a dog, in a pariah."

That has been our ideal but the people have forgotten it, and selfishness has crept in where unselfishness and brotherly feeling should prevail. We learn in our Sanskrit primer :

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্ ।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥"

"This is mine, or this is yours, such distinction is made by low-minded people : but those who are broad and liberal should consider the whole world as their relative." Did not Christ teach : "Love thy neighbour as thyself ?" If your neighbour be a pariah or a Chandala, or a Brahman, or of any other religion, Christian or Mohammedan, him you should regard as your own self, and him you should love as you love your own self. This is our religion. Abandoning this ideal of universal religion, if we simply cultivate our intellect for commercial purposes, will that be the ideal of proper education ? It is degrading the humanity to instal commercialism in the place of universal religion in educational lines. Therefore, my friends, our national ideal should be brought forward and should be emphasized in every branch of our teaching. I do not mean any sectarian religion, I do not mean the worship of idols or iconoclastic ideas, but I mean the universal religion which underlies all sectarian religions, whether it be Islam, or Christianity, or Hinduism, or Buddhism. Among all special religions there is an undercurrent of true religion which is nameless and formless, and that nameless religion should be brought forward.

The non-essential parts of every religion, that is, doctrines and dogmas, rituals and ceremonials, must vary according to the needs of the people. In dress, for instance, I may wear a turban, you may wear some other thing, a cap or a hat ; but that does not change your soul or its nature which is a part and parcel of the Divine Being. For that reason education should be based upon universal principles and not upon sectarian religious ideals. It would otherwise be degrading the humanity.

The object of education should be the attainment of perfection. That is the highest aim of education. In the Vedas we read of two kinds of *Vidya,—Para Vidya* and *Apara Vidya*. *Apara Vidya* is that which explains the laws of nature and describes the causes of various phenomena ; but *Para Vidya* is that by which one attains to God-consciousness, and

that should be the aim of *Apara Vidya.* That is why you are studying all these things. Why do you go to a chemical laboratory ? To study the fundamental elements of all phenomena. Why do you study physics and all the different branches of science ? To know how this world has come into existence. Why do you study anatomy and physiology ? To understand how the organs of your system are working and co-ordinating in harmonious development and how the body grows from a minute cell. Sir J. C. Bose has been studying the plant's life. You have heard him speak of the wonderful truths which he has discovered. One of them is that in the whole world there is one life and not many. The life that is beating in us is pulsating in the plants, and even in a blade of grass. As we eat, so the grass eats ; as we sleep, so the plants sleep. There is a gradual manifestation of life from the lower to the higher in the mineral, vegetable, and animal kingdoms ; and we should study them all so that our knowledge will be complete.

Physically we should develop and train our bodies so that we can have muscles of iron and nerves of steel ; then we should educate our minds so that we may be able to acquire self-mastery, and not remain slaves of passions, desires, and selfishness. Self-conquest should be our ideal in training our minds. In the West there is psychology without a "psyche," which means the soul. There in the study of psychology the existence of a "psyche" is not admitted ; but Hindu psychology is far better. Then we should educate our intellect so that we can see the all-pervading Spirit, and reason that although there are various manifestations yet there is an underlying unity of existence. Unity in variety is the plan of nature, and that plan we should discover by training our intellect. Furthermore, we should realize what is eternal and what is non-eternal, what is unchangeable and what is changeable That would be the function of the intellect which is trained, and which has reached its ideal education.

Proper education should include moral training. The whole of ethics depends upon love, which means not selfish love, but the expression of oneness in spirit. If you love somebody, you become one with the beloved ; otherwise there is no love. Love means the attraction of two souls, which would vibrate in the same degree, and which would be tuned in the same key. Just as in a room if two musical instruments are kept tuned in the same key, and when one is struck the other responds, so is the case with two lovers. When the thoughts and ideas which rise in the mind of the lover will vibrate in the mind of the beloved and produce similar

response, then there is love, and that means oneness in thought and in spirit. Again where there is true love there cannot be any selfishness. If you love anyone you should be ready to give him all that you possess; because you would say, "O my brother ! Thy necessity is greater than mine. Whatever is mine is thine." We must learn to merge our small personality into the bigger personality of humanity. That should be the ideal of moral education; and spiritual education would reach its climax, when the student would realize the truth of that saying, "I and my Father are one," not physically one, not mentally, not intellectually, but spiritually we are one, because there is only one Spirit in the universe. Therefore each soul is a potential Christ, each soul is potentially divine, each soul is Brahmanic, and any system of education which is based upon this fundamental principle of potenial Divinity in the soul of the individual would be considered as the highest.

Now the question may arise, how should we apply this to our social life ? That is very easy. We should not be narrow but we should carry that ideal of unity in variety in all the different stages of our social life. Just as two faces are not alike, so no two minds are alike. Your path is chalked out for you by the Lord himself and I must be tolerant. I must allow you to grow in your own way. Just as in a garden there are different kinds of trees, and you do not try to make two trees look alike. Do you try to make two trees bear the same fruit ? You would be destroying all the trees. So, my friends, this world is a garden and each individual is just like a plant. Let him grow and bear his own fruit. Allow him to grow. That should be your ideal. Why should you hinder his growth and progress ? Take your hands off. Take all the limitations off, and let him grow free, and he will bear the best fruit. But before he can bear the best fruit, you must give him the proper environments. Just as a plant cannot give its best fruit unless you give it proper light and heat, and the nourishment of the earth, air and water, which are the environments under which a plant will bear its best fruit, so you make him manifest the highest ideal of his life by giving him the proper conditions. That is your duty. Why should you hate a Chandala ? Why is he a Chandala ? Because you have made him so. You can make him a Brahman tomorrow if you allow him all the proper environments of a Brahman. Do not blame him because he lives in filth and dirt and is unclean. Why is he so ? Because you have made him like that, and now, after putting him down in the lowest rank and giving him all the conditions that would be degrading to him, you

blame him, condemn him, and hate him. It is not the Chandala who should be blamed, but *you*, the leaders of the society. You have made him so. Therefore, take the blame upon your own shoulders and correct it and make him a saint. Give him proper training, grant him proper education, love him, and give him a chance to stand on his own legs. Do you do that ? No, you don't. Abraham Lincoln, who was the President of the United States some years ago, and who liberated the slaves, was once walking in the streets of Washington with a friend, and found a beetle on the road. It was turned on its back, its legs were up in the air, and it was struggling to stand on its feet Abraham Lincoln stooped down and picked up that beetle and put it on its legs. His friend asked him what he was doing. He said, "I made that poor fellow stand on its own feet." That was his nature. So, my friends, I wish everyone of you would become an Abraham Lincoln. If you see a poor man, make him stand on his own legs ; give him the proper opportunity, do not tyrannize over him, do not call him names, do not condemn him ; but love him as you love your own self. Do you give such instruction in your schools and colleges ? If you do, you are worthy of the place you are occupying. If you try to bring that out in your system of education, the world will bow down to you, and the Lord will be pleased that you have worshipped him in spirit and in the form of human beings. Where shall we find God if we leave all men out ? God is not sitting above the clouds. He is here ; Him I see in your faces, He is the Virat Purusha.

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।"

"The Lord is with infinite eyes, with infinite number of ears, with infinite hands and infinite feet." He sees through all eyes, hears through all ears, works through all hands, and thinks through all minds. The collective Spiritual Being is the Lord, and so long as you separate individuals from the whole, you destroy the relation between the individual and the universe, between man and God. Therefore, my friends, we should learn to see God in man and woman, and love them, worship them, feed them, and educate them. Women should have equal rights and privileges with men. That should be the ideal ; and then the highest perfection which is latent in each soul, and which is described in all the scriptures of the world, will be realized : and such is the object of ideal education. Education should not degrade man or woman, and it should not be for money-making ; but it should be the culture of the soul for the good of all; and that soul-culture will bring in perfection as its ideal, and the whole world will be benefited by such education. I wish to see that day when India will have the privilege of imparting such ideal education in and through all colleges, and schools, both high and primary. Then the plan of the Lord of the universe will be fulfilled and then we shall enjoy peace and happiness in this world and hereafter.

(*Concluded*)

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১। অভেদানন্দ প্রশস্তি	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৫৩
২। বেদান্তে জগৎ কারণ	শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ	...	১৫৪
৩। জীবন-কথা	স্বামী শঙ্করানন্দ	...	১৫৭
৪। অদ্বৈতবাদ	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ	...	১৬১
৫। পাণিনি	৺ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	১৬৫
৬। মৌর্য্য-যুগ	ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ...	...	১৬৯
৭। তিব্বতের বৌদ্ধ-সঙ্ঘ	শ্রীঅজিত ঘোষ ...	...	১৭৩
৮। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ	স্বামী বেদানন্দ ...	...	১৭৬
৯। Vedanta and the Teachings of Jesus.	Swami Abhedananda	...	47

সময়োপযোগী বহুবাঞ্ছিত ব্যবহারিক বই!

দেশের ভাবী আশার স্থল—ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাহিত্য সরস্বতী

তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিকল্পনায় লিখেছেন—

ছেলেদের টিফিন

কি খাব মা, কি খাব মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে,
বাসি ভাত খাও যাদু, ঐ ঢাকা রয়েছে!

কালের গতিতে ছেলেদের ক্ষুধার খোরাক দিতে আজ আর বাসি ভাতের কথা উঠে না, এখন সেখানে এসেছে দোকানের বাসি খাবার, পচা ডিমের তৈরী কেক বিস্কুট ইত্যাদি! ছেলেদের হাতেই টিফিনের ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর দিনে-ডাকাতির সুযোগ দিয়েছি। এরই প্রতিকারকল্পে প্রাণশক্তিসম্পন্ন বহু বহু রুচিকর খাদ্য দেশীয় প্রথায় খুব সহজে ও সুবিধায় বাড়ীতে তৈরী করা যায়, লেখিকা **তাদের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় ও প্রস্তুতপ্রণালী** এই গ্রন্থে প্রকাশ ক'রে ছেলেদের—তথা আমাদেরও সাংসারিক জলযোগের খাদ্যধারার গতির মোড় ফিরিয়ে একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছেন।

দু'শো পাতার বই। চমৎকার ছাপা ও বাঁধাই। —দাম—১৲	প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা রাখা এবং প্রত্যেক মায়ের পড়া উচিত।

আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলার উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা,—ফোন বি, বি ৩৮৭৫

বেদান্তে জগৎ কারণ

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, এম.এ., পি.আর.এস., বেদান্ততীর্থ

আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব-রজ-তমো-গুণের সাম্যাবস্থা-স্বরূপিনী জড়া প্রকৃতিই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদানভূতা। এই প্রকৃতি প্রলয়কালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপিণী হইলেও সৃষ্টিদশায় তাহাতে গুণত্রয়ের সাম্য থাকে না। সৃষ্টিদশায় প্রকৃতি নিয়তপরিণামিনী ও বিক্ষেপশক্তিমতী। কাপিল-সাংখ্যমতোক্ত প্রধানের সহিত রামানুজ-সম্মতা প্রকৃতির এই অংশে সাম্য থাকিলেও একটি বিষয়ে এই দুইটি বিভিন্ন মতোক্ত তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। কাপিলমতে প্রধানের স্বতঃ পরিণাম স্বীকৃত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, রামানুজ বলেন যে, ব্রহ্ম প্রকৃতির নিয়ামক। চেতন জীব ও জড়া প্রকৃতি—এই দুইটি তত্ত্বই ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া রামানুজ মনে করেন। ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত চিজ্জড়তত্ত্বের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—প্রকারীর সহিত প্রকারের যে সম্বন্ধ, বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের যে সম্বন্ধ, শরীরীর সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত চিৎ ও জড়েরও সেই সম্বন্ধ। চিৎ ও জড় সত্য ও নিত্য, কিন্তু তাহাদিগের অভিব্যক্তি ও পরিণাম সর্ব্বদাই ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব, প্রকার-প্রকারি-ভাব বা শরীর-শরীরি-ভাব সম্বন্ধ রামানুজ-সম্প্রদায়ে 'অপৃথক্‌সিদ্ধি' সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। অপৃথক্‌সিদ্ধি বলিলে অবশ্য ইহা বুঝায় না যে, অচিদ্রূপা ভোগ্যবিষয়াকারে পরিণমমানা প্রকৃতি, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের ভোক্তা চিদ্রূপ জীবগণ, ও চিদচিতের নিয়ামক ও প্রেরিতা ব্রহ্মের মধ্যে পরস্পর স্বরূপভেদ কিছুই নাই, তবে উহাতে কেবল বুঝায় যে, ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে পৃথগ্‌ভাবে চিদচিতের স্বতন্ত্র সত্তা সিদ্ধ নহে। চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম এই তিনে মিলিয়া এক বিশিষ্ট অদ্বৈত তত্ত্ব। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীর স্বরূপ, আর ব্রহ্ম এই চিদচিচ্ছরীরের আত্মভূত। অতএব, রামানুজ-মতে প্রকৃতি দৃশ্য জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও প্রকৃতির স্বতন্ত্র কারণতা আচার্য্যের অভিমত নহে। কারণ, প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শরীরভূতা—ব্রহ্ম ব্যতীত উহার পৃথক্ অস্তিত্বই নাই। জগদাকারে পরিণত হইবার সময়েও প্রকৃতি সর্ব্বদাই ব্রহ্মের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই হেতু ব্রহ্মশরীরভূতা প্রকৃতিকে জগদুপাদান বলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হইতেছে, প্রকৃতির আত্মভূত ব্রহ্মকেই প্রকারান্তরে জগদুপাদানরূপে স্বীকার করা। অর্থাৎ জড়বাদীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে রামানুজমতে কেবল প্রকৃতিই জগতের পরিণামী উপাদান বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু আচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতিশরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের যথার্থ উপাদান। অবশ্য এ মতেও কেবল শরীরভূতা জড়া প্রকৃতিরই জগদাকারে পরিণাম হইয়া থাকে, আর শরীরী চেতন ব্রহ্ম সেই পরিণামের নিয়ন্তৃরূপে অপরিণত

অবস্থায় বর্তমান থাকেন। তাই শরীরী স্বতন্ত্ররূপে জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র ; আর শরীরবিশিষ্ট শরীরি-রূপে জগতের উপাদান কারণও বটেন। এই উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আচার্য্য রামানুজ ব্রহ্মকে জগতের 'অভিন্ননিমিত্তোপাদান'— এই পারিভাষিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

কাপিল-সাংখ্য মতে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকৃত হয় নাই (১), তাই তন্মতে প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেশ্বর-সাংখ্য নামধারী পাতঞ্জল যোগ সম্প্রদায়োক্ত দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিতা ও নিয়ন্ত্রিতা প্রকৃতি জগতের উপাদান। (২)

অতএব, এক হিসাবে যোগসম্প্রদায়কেই বিশিষ্টাদ্বৈতমতের আংশিক পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কিন্তু জগদুপাদান সম্বন্ধে এতদূর সাম্য থাকা সত্ত্বেও পাতঞ্জল ও রামানুজ মতের মধ্যে যে বৈষম্য বর্তমান, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(ক) পাতঞ্জল-সম্প্রদায়ে (ও পাশুপত শৈব-সিদ্ধান্তে) (৩) প্রকৃতি ব্রহ্মাধিষ্ঠিতা ও ব্রহ্ম

(১) কপিল সেশ্বরবাদী কিংবা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন—সে তর্ক বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। তবে প্রকৃতির নিয়ামক বা অধিষ্ঠাতা কোন ঈশ্বর আছেন—এরূপ মত কাপিল-সাংখ্যে পরিগৃহীত হয় নাই, আর এই তথ্যটুকুই মাত্র এ প্রবন্ধে আলোচ্য।

(২) "কেচিৎ প্রধানং ত্রিগুণং কারণং প্রবদন্তি তু।
ঈশ্বরস্তদধিষ্ঠাতেত্যাহুরন্যে মনীষিণঃ" ॥
(মণ্ডনমিশ্রের স্ফোটসিদ্ধি'র 'গোপালিকা' টীকায় উদ্ধৃত)

টীকাকার বলিয়াছেন, কেচিৎ = সাংখ্য ও অন্যে = যোগ। অবশ্য যোগমতেও ঈশ্বর যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কারণ, পাতঞ্জল যোগসূত্রে ঈশ্বরলক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে—"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" (যোঃ সূঃ ১।২৪)—ঈশ্বর চেতন সর্বজ্ঞ পুরুষ বিশেষ মাত্র। প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্তা বলিয়া ত তাঁহার কোন বিবরণ যোগসূত্রে দেওয়া হয় নাই। আবার ব্রহ্মসূত্রে যোগমত-খণ্ডন-প্রসঙ্গে আচার্য্য ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন—"তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণম্" (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।৩)। ইহাতে মনে হয়, আচার্য্য শঙ্করের সময়ে প্রসিদ্ধি ছিল যে যোগমতেও স্বতন্ত্র প্রকৃতি জগদুপাদান। অতি সূক্ষ্মভাবে ভগবান পতঞ্জলির মতানুসরণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে তৎপ্রতিপাদিত ঈশ্বর শুধু নামেই কর্তা কাজে নহেন, তিনি পুরুষগণের উপাস্য হইতে পারেন, কিন্তু জগৎসৃষ্টির হেতু নহেন। অন্ততঃ ইহাই শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। আর মনে হয়, স্বয়ং ভাষ্যকার ব্যাসদেবও এই মতের পোষক ছিলেন। কেবল পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানভিক্ষু যোগদর্শনোক্ত ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃবর্গের সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে যোগ সিদ্ধান্ত রামানুজ মতের অনেকটা অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৩) ব্রহ্মসূত্রে ২।২।৩৭-৪১ সূত্রে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠভাষ্য বা শ্রীকরভাষ্য এই পাশুপতশৈব সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। কারণ শ্রীকণ্ঠভাষ্যে বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ ও শ্রীকরভাষ্যে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ।

কর্তৃক নিয়ন্ত্রিতা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা বা পৃথক্‌সিদ্ধিই তত্তৎসম্প্রদায়ে উপন্যস্ত হইয়াছে। এই সকল মতে ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ—উপাদান নহেন; ব্রহ্মাধীন, প্রকৃতিই জগদুপাদান।'

(খ) রামানুজ মতে প্রকৃতি ও ব্রহ্ম অপৃথকসিদ্ধ, অতএব ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান।

রামানুজ-মতে ব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন বলিয়াই সে মত যে শিষ্টপরিগ্রাহ্য হইবার যোগ্য সে বিষয়ে প্রমাণ কি? এই প্রশ্ন যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উত্তর দান প্রসঙ্গে আচার্যপাদ বলিয়াছেন যে, তাঁহার মত স্বকল্পনা প্রসূত নহে—স্বয়ং সূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণই উক্ত মতের পরিপোষক। ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত কারণ ইহা ত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ভেদাভেদ, অদ্বৈত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণই, একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে তিনি যে জগদুপাদানও বটেন—ইহা সকলের স্বীকৃত নহে। ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান এ তত্ত্বটি বাদরায়ণের নিম্নোক্ত সূত্রদ্বয়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—

(১) "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (ব্র সূঃ ১।৪।২৩ -এই সূত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগতের 'প্রকৃতি'ও বটেন। 'প্রকৃতি' 'যোনি' প্রভৃতি শব্দের অর্থ—উৎপত্তি-স্থান অর্থাৎ উপাদান। 'চ'"(ও) পদের দ্বারা ব্রহ্মের অধিকন্তু নিমিত্ত কারণত্বও সূচিত হইতেছে।

(২) "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬)- আচার্য রামানুজ অবশ্য এই সূত্রটিকে দুই সূত্ররূপে বিভক্ত করিয়া পাঠ করিয়াছেন—(ক "আত্মকৃতেঃ" ও (খ) "পরিণামাৎ"। কিন্তু উভয়স্থলেই তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্ম জগতের উপাদান।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিবার আছে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে যে 'ন-বিলক্ষণত্বাধিকরণ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।৪ ১১) আবদ্ধ হইয়াছে, উহাও ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বের পক্ষে একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। উক্ত অধিকরণটির (৪) প্রথম সূত্র "ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ"। ঐ সূত্রে পূর্বপক্ষস্বরূপে আপত্তি করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতেই পারেন না। কারণ, জগৎ জড় ও ব্রহ্ম চেতন। উভয়ের এই স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর জগৎ যে জড় তাহা শ্রুতিতেই উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব জগতের জড়ত্ব অস্বীকার করিয়া এ দোষের হস্ত হইতে নিস্তারেরও আশা নাই।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই আপত্তি নিমিত্তকারণ সম্বন্ধে উঠিতেই পারে না। যেহেতু নিমিত্তকারণ ও কার্য যে একরূপ হইবে—এ বিষয়ে বাঁধাধরা কোন নিয়ম

---

(৪) 'অধিকরণ' বা 'ন্যায়' শব্দের অর্থ এক একটি প্রসঙ্গ (topic); উহা পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট—বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সিদ্ধান্ত (বা সঙ্গতি)।

থাকা অসম্ভব এবং নিমিত্তকারণ ও কার্য্যের বৈলক্ষণ্য যেন একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। পক্ষান্তরে উপাদান কারণ ও কার্য্যের স্বলক্ষণতাই সাধারণ দৃষ্টিতে বিশেষভাবে প্রতীত হইয়া থাকে (৫)।

ন-বিলক্ষণত্বাধিকরণের প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র। এই সূত্রে সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বেদান্তসিদ্ধান্তের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন—উভয়ের স্বরূপ পরস্পর-বিলক্ষণ, অতএব, ব্রহ্ম কিরূপে জগৎকারণ হইতে পারেন—ইহাই পূর্ব্বপক্ষিগণের আপত্তির সারাংশ। বলা বাহুল্য, চেতন কুম্ভকারকে অচেতন ঘটের নিমিত্ত বলিয়া তাঁহারাও নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদিগের এ আপত্তি কখনই ব্রহ্মনিমিত্ত কারণতাবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। প্রতিপক্ষের এ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে ব্রহ্ম জগদুপাদান—এই মতবাদেরই বিপক্ষে। কারণ, তাহা না হইলে এ আপত্তির উত্থাপনই সম্ভব হইবে না। অবশ্য এ আপত্তির উত্তর স্বয়ং সূত্রকারই দিয়াছেন—তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে। কিন্তু বেদান্ত সম্প্রদায়ে ব্রহ্ম যে একাধারে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান বলিয়া স্বীকৃত—সাংখ্যযোগ ও ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্থাপনেই তাহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

জীবন-কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামী শঙ্করানন্দ

বরাবর পাহাড়ে হটযোগী—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন কাশীপুরের বাগানে সন্ন্যাসীবেশে (পরিধানে গেরুয়া, হস্তে কমণ্ডলু ও মুণ্ডিত মস্তক) আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন "৺গয়াধামের নিকট বরাবর পাহাড়ের একটী গুহায় একজন সিদ্ধ হটযোগী দেখিয়া আসিলাম।" অদ্ভুত হটযোগী বলিয়া তিনি তাঁহার খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। উহা শুনিয়া কালীপ্রসাদের মনে সেই হটযোগীকে দেখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী

(৫) মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ ও কুম্ভকার উহার নিমিত্ত কারণ, আর দণ্ড-চক্রাদি সহকারী কারণ। এস্থলে কুম্ভকার চেতন ও ঘট জড়, অতএব, উভয়ের স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য সর্ব্বসম্মত। পক্ষান্তরে উপাদান মৃত্তিকা ও কার্য্য ঘট উভয়েই জড়। ইহাতে বোধ হয় যে উপাদান কারণ ও কার্য্য একজাতীয় অর্থাৎ স্বলক্ষণ হওয়া উচিত।

হইল। পরদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি ৺গয়া পর্য্যন্ত গাড়ী ভাড়া যোগাড় করিয়া একাকী যাত্রা করিলেন। এই তাঁহার প্রথম একাকী সন্ন্যাসী বেশে ও পরিব্রাজকের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ পর্য্যটন। তিনি বরাহ নগরের খেয়া পার হইয়া বালি ষ্টেশন হইতে গাড়ীতে উঠিয়া ৺গয়া ষ্টেশনে পৌছিলেন। সেখানে লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন বরাবর পাহাড় কোনদিকে এবং তদনুসারে চারি ক্রোশ পথ নগ্ন পদে পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া চলিয়া বরাবর পাহাড়ের তলদেশে যে গ্রাম আছে সেখানকার একটী শিবমন্দিরের ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপন করিলেন। তথায় দশনামী সম্প্রদায়ের পুরী আখ্যাধারী জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট সন্ন্যাসপদ্ধতি ও বিরজা হোমের পুঁথি ছিল। সেই পুঁথি হইতে বিরজা হোমের মন্ত্রগুলি, প্রেষমন্ত্র, মঠ, মড়ি, যোগপট্ট ইত্যাদি পুরী নামা সন্ন্যাসীদের সঙ্কেতগুলি তাঁহার খাতায় লিখিয়া রাখিলেন। উহা পরে বরাহ নগরে বিরজা হোম করিবার সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুসারেই ঘটিয়াছিল। তাহা না হইলে কালীপ্রসাদ হঠযোগী সাধুর আড্ডা হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ ছিল।

তৎপর গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে হটযোগীর গুহায় যাইবার রাস্তা ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে সেই গুহার দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল যে, যদি সেই গুহার রাস্তায় কেহ যায়, তাহাকে সেই হটযোগীর শিষ্য পাথর ছুড়িয়া মারে এবং নিকটে আসিতে দেয় না। এইরূপে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল এবং বারংবার সেই পথে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু কালীপ্রসাদ কিছুতেই ভীত হইলেন না। তাঁহার দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, তিনি যে কোনও প্রকারে হউক হঠযোগীর সঙ্গে দেখা করিবেন ইহাতে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাও স্বীকার। এরূপ দৃঢ় সংকল্পে মন স্থির করিয়া কাহারও কথা না শুনিয়া তিনি গুহার দিকে গমন করাই স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতে তিনি নির্ভীক চিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া পাহাড়ের অপ্রশস্ত পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়া চড়াই করিতে লাগিলেন। তিনি অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতেছেন এবং চারিদিকে দেখিতেছেন কেহ পাথর ছুড়িতেছে কিনা। এইরূপে অনেক দূর যাইতে যাইতে হঠাৎ তিনি একেবারে গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটু সমতল স্থানে ধুনীর সম্মুখে সেই জটাধারী হটযোগী এবং তাঁহার শিষ্য বসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে হঠাৎ অতর্কিতে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এবং তখনই দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে প্রস্তর ছুড়িয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। কালীপ্রসাদও অতর্কিতে তাঁহাদের সামনে পড়িয়া চমকিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে প্রস্তর ছুড়িয়া মারিতে উদ্যত হইতে দেখিয়া তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন এবং

"ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা কালীপ্রসাদের সন্ন্যাসীর বেশ ও হাতে কমণ্ডলু দেখিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। পরে সত্যই তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী কিনা জানিবার জন্ত তাঁহার মঠ, মড়ি, যোগপট্ট, প্রেইময় ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়াতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাদরে ধুনির পার্শ্বে বসিতে আজ্ঞা দিলেন এবং যথার্থ সন্ন্যাসী জানিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কালীপ্রসাদ হটযোগ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে গুহার ভিতরে আহ্বান করিলেন। তিনি একা এবং তাঁহারা দুইজন, তাঁহার ভারী ভয় হইতেছিল। যাহোক তিনি সমস্ত ভয় দূর করিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অপর একটী ধুনীর পার্শ্বে তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হইল। হটযোগী ও তাঁহার শিষ্য হিন্দুস্থানী ছিলেন। তাই কালীপ্রসাদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে তাঁহাকে প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। হটযোগী হিন্দী ভাষায় তাহার উত্তর দিয়া তাঁহাকে সেই গুহায় থাকিয়া যোগশিক্ষা করিবার জন্ত আদেশ দিলেন।

কালীপ্রসাদ দেখিলেন গুহাটী সুবৃহৎ এবং তথায় চাউল, ডাল, তরি-তরকারী প্রভৃতি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এক পার্শ্বে একটী পাঠা ও একটী মুরগী বাঁধা রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন ইঁহারা অঘোর পন্থী সাধু—সব আহার করে। তারপর হটযোগীর শিষ্যটীর হাপানি হইয়াছে দেখিয়া কালীপ্রসাদ ভাবিলেন যে তিনি যদি ইঁহার নিকট হটযোগ শিক্ষা করেন তবে তাঁহারও হাপানি হইতে পারে। পরদিন তিনি আরও প্রশ্ন করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্প। কারণ কালীপ্রসাদ ইতিপূর্ব্বেই পাতঞ্জল দর্শন, শিবসংহিতা, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। হটযোগী শুধু 'স্বরোদয়' নামক হটযোগের গ্রন্থপাঠ করিয়া কিছু প্রাণায়াম সাধন করিয়াছেন মাত্র কিন্তু তাহাতে তিনি সিদ্ধ হন নাই। সুতরাং তাঁহার নিকট যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা লইতে কালীপ্রসাদের আর ইচ্ছা হইল না। কিন্তু হটযোগিটী নূতন শিষ্য পাইয়া কালীপ্রসাদকে যোগ শিখাইবার জন্ত যত্নবান হইলেন। সেই সময়ে কালীপ্রসাদের মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উদয় হইতে লাগিল। উভয়ের সহিত তুলনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন হটযোগী একজন অল্পজ্ঞ সাধক মাত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুর যোগ সাধনে সিদ্ধের সিদ্ধ। তখন তাঁহার মন আর গুহাতে থাকিতে চাহিল না। কিন্তু হটযোগী তাঁহাকে সাদরে মধ্যাহ্ন ভোজনে আমন্ত্রণ করিলেন এবং কিছুদিন তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলেন। কালীপ্রসাদ বিষম সমস্যায় পড়িলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন কিরূপে ইঁহাদের নিকট হইতে পলায়ন করা সম্ভব।

তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে ভয় হইল পাছে হটযোগী সব বুঝিতে পারিয়া পলায়নকালে প্রস্তর ছুড়িয়া তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া দেয়। সে যাহা হউক তিনি চিন্তিতে হটযোগীর

নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হটযোগী তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন "তোমারা মাফিক্ শিষ্য বহুৎ ভাগ্‌সে মিলতা হ্যায়।" অর্থাৎ তোমার ন্যায় অধিকারী শিষ্য মিলা ভাগ্যের কথা। তখন কালীপ্রসাদ আরও বিপদে পড়িলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি বৈকালে জল আনিবার ছল করিয়া গুহা হইতে বাহির হইলেন এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পাহাড়ের নীচে গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ধর্ম্মশালায় সেই রাত্রি বিশ্রাম করিয়া পরদিন ভোরে গয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনপ্রাণ তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তদভিমুখে ব্যাকুলভাবে ছুটিতেছিল এবং এক এক মুহূর্ত্ত যেন এক একযুগ বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তারপর গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া আহার করিলেন এবং পরে গাড়ীতে উঠিয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন। কাশীপুরের বাগানে আসিয়া যেন তাঁহার শরীরে প্রাণ আসিল এবং তাঁহার মনে অপার শান্তি উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গেল এবং তিনি অপার আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কথা বলিতে গিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার স্বলিখিত জীবন চরিতের পাণ্ডুলিপীতে লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এতদিন আমায় না বলিয়া কোথায় গিয়াছিলি?" তখন আমি সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"হটযোগীকে কেমন দেখলি?" আমি বলিলাম আমার ভাল লাগিল না। আপনার সহিত তুলনায় সে কিছুই নয়। সেইজন্য আমি ছুটিয়া আপনার শ্রীচরণতলে ফিরিয়া আসিয়াছি। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "যত বড় সাধু বা সিদ্ধযোগী যে যেখানে আছে আমি সব জানি। চারিখুঁট ঘুরে আয় কিন্তু এখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) যাহা দেখ্‌ছিস্ এমনটি আর কোথাও পাবিনি। এই বলিয়া তিনি আমার বুকে পা দিয়া আশ্বাস দিলেন এবং আমি শান্তি ও আনন্দ সাগরে ডুবিয়া রহিলাম।"

"তৎপরে তিনি মাছলের পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে বুঝাইলেন, যে তুলনা না করিলে ছোট বড় বা ভাল মন্দ বোঝা যায় না। আমি বলিলাম সেইজন্য আমি হটযোগীকে দেখিতে গিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন আমি আপনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছি। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তিনি যে কত কৃপা করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমি কোটি মুখেও বর্ণনা করিতে অক্ষম।" [ক্রমশঃ]

অদ্বৈতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

(ছ) যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥২।৯

অর্থাৎ "বাক্য মনের সহিত যাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ, বিদ্বান্ তাঁহাকে জানিয়া কোথা হইতেও ভীত হন না।" এস্থলে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে এই শ্লোকে "কদাচন" পাঠ ছিল, এক্ষণে "কুতশ্চন" পাঠ হইল। ইহার ফলে সেই এক অদ্বৈতের কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। কারণ "কদাচন" পাঠে কাল স্বীকার করা হয় বলিয়া দ্বৈতের সম্ভাবনা থাকিয়া যায় কিন্তু 'কুতশ্চন' বলায় সে সম্ভাবনা রহিল না। যেহেতু "কখনও ভয় পান না" বলিলে ভয়ের "নিমিত্ত" থাকা বারণ হয় না, কিন্তু "কোথা হইতেও ভয় পান না" বলায় সে নিমিত্তও আর থাকিল না। এজন্য (গ) প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

যদি বলা যায় "আনন্দং ব্রহ্মণঃ" বলায় ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দ কেন হইবে? ব্রহ্মের ধর্ম্ম 'আনন্দ' হইবে না কেন? তাহা হইলে ব্রহ্ম হইবেন ধর্ম্মী এবং আনন্দ হইবে তাহার ধর্ম্ম। ন্যায়মতে আনন্দ অর্থ সুখ, আর তাহা গুণ। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা সগুণ ব্রহ্মই পাওয়া হইবে।—না। একথা অসঙ্গত। কারণ, ব্রহ্মের আনন্দ অর্থ করিলে "ভৃগুবল্লী" ৬ষ্ঠ অনুবাকের "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম বলিয়া ভৃগু জানিয়াছিলেন -এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। এখানে ব্রহ্মকেই আনন্দ বলা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে "ব্রহ্মের আনন্দ" এরূপ অর্থ করিয়া ব্রহ্মকে সগুণ বলা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর "ব্রহ্মের আনন্দ" বাক্য ও মনের অগোচর এবং তাহাকে জানিলে ভয় থাকে না—এই কথাটী ওরূপ অর্থে সঙ্গত হয় না। কারণ ব্রহ্মের আনন্দ বলিলে ব্রহ্ম হন ধর্ম্মী আর আনন্দ হন ধর্ম্ম, কিন্তু অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তুতে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভাব সম্ভব হয় না। দ্বৈত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুতেই তাহা সম্ভব হয়। অতএব ব্রহ্ম ও আনন্দ অভিন্নই বলিতে হইবে।

যদি বলা হয়—ব্রহ্ম অদ্বৈতই নহে—বলিব? তাহা হইলে "যাহা হইতে বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়" এই বাক্য বিরুদ্ধ হয়। কারণ, অদ্বৈত বস্তুই বাক্য-মনের অগোচর হয়, দ্বৈত বস্তু কখনও বাক্য-মনের অগোচর হয় না, যাহার ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব থাকে তাহাই বাক্য ও মনের গোচর হয়।

যদি বলা হয়—ব্রহ্ম একেবারে বাক্য-মনের অগোচর নহেন, কারণ, "বিদ্বান্" অর্থাৎ "তাহাকে জানিয়া" এইরূপই এই শ্রুতি বলিতেছেন? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ,

"এই জানা" তাহাকে "জানা যায় না" এইরূপ জানাও হইতে পারে। বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, অর্থাৎ জানা যায় না। অতএব ব্রহ্ম অদ্বৈত, আর তজ্জন্য আনন্দ তাহার ধর্ম নহে, কিন্তু তিনি আনন্দস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম সগুণও নহেন।

যদি বলা হয় "কুতশ্চন" অর্থাৎ কোন কিছু হইতে—বলায় কোন কিছু ব্রহ্ম ভিন্ন থাকা আবশ্যক? অতএব ব্রহ্ম অদ্বৈত নহেন? তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। এই "কোন কিছু" সত্তাবান "কোন কিছু" এরূপ কথা তো এখানে বলা হয় নাই। কল্পিত বিষয় হইতেও তো ভয় হয়। বস্তুতঃ ভয় মনেরই ধর্ম, অতএব এই 'কোন কিছু' কল্পিত "ব্রহ্মভিন্ন" বস্তুই হইবে। অতএব "কুতশ্চন" পদের জন্য ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর জন্য ব্রহ্ম দ্বৈত বা সগুণ নহেন ইহাই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ "দ্বিতীয়াদ বৈ ভয়ং ভবতি" অর্থাৎ দ্বিতীয় হইতে ভয় হয়—এইরূপ শ্রুতি থাকায় এবং "ন হ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিঃ" অর্থাৎ দ্বৈত সিদ্ধ হয় না, "সর্ব্বদা দ্বৈতরহিতঃ" অর্থাৎ সর্ব্বদা দ্বৈত রহিত, "ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনম্" অর্থাৎ ইন্দ্র জালের ন্যায় মায়াময়, স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যাদর্শন" ইত্যাদি বহু শ্রুতি থাকায় এই দ্বৈত কল্পিত বা মিথ্যাই বলিতে হইবে।

তাহার পর ব্রহ্মের আনন্দ যদি ব্রহ্ম সম নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ কেন নহে? যাহা যাহাকে কখনও পরিত্যাগ করে না, তাহা তাহার স্বরূপই হয়। অতএব "ব্রহ্মণঃ আনন্দং" অর্থাৎ 'ব্রহ্মের আনন্দ—এরূপ অর্থ এই বাক্যেরও হইতে পারে না। আর অভেদে ষষ্ঠীরও ব্যবহার আছে। 'যথা রাহুর মস্তক' এস্থলে মস্তকই রাহু—এইরূপ অর্থই হয়।

যদি বলা হয়, অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ, এই কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারময়কে কখনই ত্যাগ করে না, কিন্তু তাহা হইলেও অন্ধকারের গুণ "কৃষ্ণ" ইহা তো বলা হয়? অতএব ব্রহ্ম ও আনন্দ নিত্য হইলেও ব্রহ্ম ধর্ম্মী এবং আনন্দ তাহার গুণ বা ধর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম সগুণ বলিব না কেন? তাহা হইলে বলিব—উহা কল্পিত ভেদসাহায্যেই বলা হয়। অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণস্বরূপ। যেমন 'জল শুভ্রবর্ণ' বলা হয়, উহার শুভ্রবর্ণ কখনও পরিত্যক্ত হয় না, কিন্তু অন্যবর্ণ মিশাইলেও তাহাকে জল বলা হয় বলিয়া "জল শুভ্র" বলা চলে, কিন্তু অন্ধকারে সেরূপ সম্ভবপর হয় না বলিয়া উহাকে "কৃষ্ণবর্ণ" বলা, কল্পনা সাহায্যে বলা—বলিতে হইবে। তাহার পর 'ব্রহ্মের আনন্দ' জানিলে জীব অভয় হইবে কেন? যদি ব্রহ্ম, জীব, আনন্দ ও অভয়ভাব ইহারা অভিন্ন বস্তু না হয়? "আমি অভয়" এ জ্ঞান না হইলে কেহ কখনই অভয় হয় না। অতএব "ব্রহ্মণঃ আনন্দম্" এই বাক্যে 'ব্রহ্মের আনন্দ' এইরূপ অর্থ নহে, কিন্তু "ব্রহ্মই আনন্দ" এইরূপ অর্থ; আর তজ্জন্য ব্রহ্ম সগুণ নহেন। এইরূপে এই শ্রুতির দ্বারা অদ্বৈত তত্ত্বেরই উপদেশ প্রদত্ত হইল।

অতঃপর তৃতীয় ভৃগুবল্লীর প্রথমেই আছে—

(জ) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি;
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি। ৩।১

অর্থাৎ "যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মে, যাহা দ্বারা জাত ভূত সকল জীবিত থাকে, যাহাতে প্রয়াণ করিয়া প্রবেশ করে তাহাই জিজ্ঞাসা কর, তাহাই ব্রহ্ম।" এস্থলে "যাহা" এই 'একবচনান্ত' পদদ্বারা সকলের আদি মধ্য ও অন্তে সেই এক অদ্বৈত তত্ত্বের উপদেশ করা হইল। আর উৎপত্তি স্থিতি লয়ের আশ্রয় "এক" বলায় তাহাতে অন্য কোন বস্তু সত্তা সম্ভব হয় না ইহাও বুঝা গেল।

যদি বলা হয়, যাহা হইতে উৎপত্তি স্থিতি লয় হয়, তাহাতে কিছু "বিশেষ" তো থাকা আবশ্যক, নচেৎ নির্বিশেষ হইতে উৎপত্তি স্থিতি লয় হয় কি করিয়া? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, এস্থলে এই "বিশেষ" সেই বস্তুরই স্বরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মভিন্ন অন্যবস্তু থাকিলে, আর সেই ব্রহ্মভিন্ন অন্যরূপ "বিশেষ" থাকিলে, এস্থলে ব্রহ্মে এই "বিশেষ" স্বীকারের ফলও থাকে। কিন্তু অন্য সব বস্তুই যদি উৎপন্ন বস্তুর অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে এই "বিশেষ" থাকা কি করিয়া সম্ভবপর হয়? অতএব এইরূপ স্থলে সগুণ ব্রহ্মবাদের অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতের আশঙ্কা অসমীচীন। যাহা, যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাতে স্থিত ও বিলীন হয়, তাহা তাহাতে কল্পিতই বলিতে হইবে। এই সমস্তই যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে স্থিত, ও ব্রহ্মে বিলীন হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত ব্রহ্মে কল্পিতই বলিতে হইবে। কল্পিত না বলিলে ব্রহ্মের বিকার বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তাহা অনভীষ্ট। আর তাহা হইলে অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

(ঝ) অহমস্মি প্রথমজা ঋতাস্য পূর্বং দেবেভ্যো
অমৃতস্য নাভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মাবাঃ।
অহমন্নমন্নমদন্তমাদ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্য
ভবাং সুবর্ণজ্যোতীঃ। য এবং বেদ। তৈত্তি ৩।১০

অর্থাৎ "আমি সত্যের অর্থাৎ এই মূর্তামূর্ত জগতের প্রথমজ, অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ। আমি দেবতাদিগের পূর্বে থাকি, আমি অমৃতের নাভি অর্থাৎ কারণ, আমি এই বিশ্বভুবন উপসংহার করি, আমি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়।" এস্থলে আমিই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ বলিয়া অদ্বৈত তত্ত্বেরই উপদেশ প্রদত্ত হইল। কারণ "আমি" বস্তুটী বস্তুতঃ আর "বহু" বা "বিশিষ্টরূপ" নহে। যদি বলা হয় "আমি' বলিতে দেহবিশিষ্ট আমিই বুঝায়, সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতই এস্থলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, "আমার দেহ" এইরূপ অনুভব থাকায় "দেহ" ও "আমি" পৃথক ইহা আমরা বুঝিয়া থাকি। শ্রুতিতেও আত্মা অশরীর, যথা—"অকায়ম্" "অশরীরম্" "অপাণিপাদম্" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অতএব 'আমি' এই বিশ্বভুবনের উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতু বলায় এক বিশুদ্ধ অদ্বৈত তত্ত্বেরই উপদেশ প্রদত্ত হইল।

যদি বলা হয়—জীব, আনন্দময়ে উপসংক্রমণ করিয়া এই শ্রুতি উচ্চারণ করিয়া গান গাহিতে থাকে। যথা—

"স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ আদিত্যে, স একঃ। ৪। স য এবংবিৎ অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য, এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং মনোময়ং আত্মানম্ উপসংক্রম্য এতং বিজ্ঞানময়ং আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ আনন্দময়ং আত্মানম্ উপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপী অনুসঞ্চরন্ এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে—হাবু হাবু হাবু। ৫। অহমন্নম্, অহমন্নম্, অহমন্নম্। অহম্ অন্নাদো, অহম্ অন্নাদো, অহম্ অন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতাস্য, পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য নাভায়ি। যো মা দদাতি স ই দেব মা বাঃ অহম্ অন্নম্, অহম্ অদন্তমাদ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনম্ অভ্যভবাং সুবর্ণজ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ৬।

ইহা সেই গানের মন্ত্র ? অতএব মুক্তিতে জীব গান করে বলিয়া জীবের দেহ মুক্তিতেও থাকে ? কিন্তু এরূপ্ বলাও সঙ্গত নহে, কারণ, এস্থলে আমির স্বরূপই গানে বর্ণিত হইয়াছে। আর 'আনন্দময়' পদে কোশবিশেষ, কারণ, ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ বিকার। ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, সুতরাং এই আনন্দময়কোশাত্মক দেহ আত্মসম নিত্য হইতে পারে না। ইহাতে উপসংক্রমণ করিয়া জীবন্মুক্ত বিচরণ করেন ও গান করেন। অতএব এস্থলে "আমিই এই বিশ্বভুবন উপসংহার করি," বলায় আমারই কল্পনা এই বিশ্বভুবন বলা হইল। এজন্য এস্থলে অদ্বৈতের বিষয়ই কথিত হইয়াছে, বিশিষ্টাদ্বৈত কথিত হয় নাই। জীব জীবন্মুক্ত অবস্থায় এইরূপ আনন্দ ভোগ করে, তখন কামনা আর না থাকায় দেহান্তে ব্রহ্মই থাকিয়া যায়। অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈততত্ত্বেরই উপদেশ করা হইয়াছে, এতদ্দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়—এই বিশ্বভুবন আমি উপসংহার করি—বলায় এই বিশ্বভুবন কল্পিত কেন হইবে ? বিস্তৃত বস্তু সংকোচ করার ন্যায় উপসংহার তো হইতে পারে ? ঘট পটাদি নষ্ট করার ন্যায়ও উপসংহার করা যাইতে পারে ? সুতরাং স্বগতভেদ বা ভেদই স্বীকার করা হয় ? আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয় ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, মনঃ-কল্পিত বস্তুর উপসংহার যতটা পূর্ণ হয়, অকল্পিত বস্তুর উপসংহার ততটা পূর্ণ হয় না। বস্তু সংকোচিত করিলেও বস্তুটাই থাকিয়া যায়, ঘটাদি নষ্ট করিলেও তাহার অংশ থাকিয়া যায়। এতাদৃশ উপসংহার পূর্ণ উপসংহার নহে। এজন্য এরূপ উপসংহার স্বীকার করিলে উপসংহার শব্দের অর্থসংকোচ করা হয়। অদ্বৈতমতে তাহা করিতে হয় না। এজন্য এতদ্দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত সমর্থিত হয় না, কিন্তু অদ্বৈতবাদই সমর্থিত হয়।

এইবার দেখা যাউক—ষড়্বিধ তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গগুলি ইহার কিরূপ—

উপক্রম—"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" ২।১।১

উপসংহার—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ৩।৬।১

অভ্যাস—"স যশ্চায়ং" ইত্যাদি ২।৮।১

অপূর্ব্বতা—"যো বেদ নিহিতং গুহায়াং" ২।১।১

ফল—"অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি" ২।৭।১

অর্থবাদ—"সোঽকাময়ত:" ইত্যাদি ২।৬।১

উপপত্তি—"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" ২।৬।১

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ২।৭।১

এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই প্রতিপন্ন হয়, অন্যবাদ নহে। অবশ্য অন্যমতবাদী এই সকল শ্রুতির উদ্ধারে মতভেদ করিবেন, কিন্তু কতদূর তাহা বিচারসহ ভাবিবার বিষয়।

ইতি তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

পাণিনি

(২)

স্বর্গগত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকল্য, যাস্ক ও গার্গ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় ও অথর্ব প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকল্য, গার্গ, কাশ্যপ, দাল্ভ্য, জাতুকর্ণ্য, শৌনক, উপশিবি, কাণ্ব প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র হইতে পাণিনির পূর্ব্বতন যে কয় জন শব্দতত্ত্ববিৎ ও আচার্য্যের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহা উল্লিখিত হইল—

অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, চরক, চাক্রবর্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর, পৈল, বভ্রু, ভরদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডূক, যস্ক, বড়বা, বরতন্তু, বসিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিলালি, শৌনক ও স্ফোটায়ন। অষ্টাধ্যায়ীর 'যস্কাদিভ্যো গোত্রে' (২ ৪.৬৩), 'বা সুপ্যাপিশলেঃ (৬ ১.৯২), 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' (৬ ১ ১২৩), 'ওতো গার্গ্যস্য' (৮ ৩ ২০), 'লোপঃ শাকল্যস্য' (৮ ৩ ১৯), 'ঋতো ভারদ্বাজস্য' (৭ ২.৬৩), 'তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য' (১ ২ ২৫) ইত্যাদি সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, পাণিনি উক্ত ঋষিদিগের ব্যাকরণ অবগত ছিলেন। কেন-না, পাণিনি ঐ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাগুরি, ঔপমন্যব, যস্ক, গালব, শাকল্য, জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ সংস্কৃত ভাষাকে দেব-ভাষা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা কিয়দ্দিন সংস্কৃতের সহিত ক্রীড়া করিবার পর

পাণিনীয় ব্যাকরণ

ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, স্ফোটায়ন, শাকটায়ন, পাণিনি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ভাষাদেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাসাধ্য পরিমার্জ্জনা করিয়া যান। এই আচার্য্যকুলের মধ্যে দু'এক জন ব্যতীত একমাত্র

পাণিনির গ্রন্থ ও মতের যথেষ্ট প্রচলন ও প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাণিনির ব্যাকরণগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই পুরুষোত্তমদেব-কৃত ভাষাবৃত্তি, ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত শব্দকৌস্তভ, রামচন্দ্র আচার্য-কৃত প্রক্রিয়াকৌমুদী, ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী, বরদারাজ-কৃত লঘুকৌমুদী ও মধ্যকৌমুদী, নাগেশ ভট্ট-কৃত পরিভাষাসংগ্রহ পরিভাষাবৃত্তি ও পরিভাষেন্দুশেখর প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ গ্রন্থরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পাণিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন তাহার নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। সময়ে সময়ে উহাকে 'অষ্টকং' পাণিনিয়ম্'ও বলা হয়। এই ব্যাকরণে আটটী অধ্যায় আছে, প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ এবং সমগ্র ব্যাকরণে ৩৯৮৩টী সূত্র আছে। সুপ্রসিদ্ধ জর্মান শব্দতত্ত্ববিৎ বোট্‌লিঙ্ক বলেন যে, অষ্টাধ্যায়ীর ৪. ১ ১৬৭, ৪. ৩ ১৩২, ৫ ১. ৩৬, ৬. ১. ৬২, ১০০, ১৩৭—এই সাতটী সূত্র পাণিনিবিরচিত নহে, এইগুলি বার্ত্তিকমধ্যে গণ্য, কালক্রমে এগুলি সূত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক অল্‌ত্রেথ্‌ট্ গোল্ড্‌স্টুকর এই মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত সাতটী সূত্রের মধ্যে ৪.৩.১০২, ৫.১ ৩৬, ৬.১.৬২ এই সূত্রত্রয়-সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই তিনটী পূর্ববর্তী সূত্রের বার্ত্তিক বলিয়াই মহাভাষ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর ৮টী অধ্যায়ে সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি ব্যাকরণে যা কিছু আলোচ্য বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূত্রগুলি সর্বতোমুখ হওয়ায় জনসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে পাণিনি-ব্যাকরণকে সংস্কৃত ভাষার প্রাকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। অষ্টাধ্যায়ীর পারিভাষিক শব্দের মধ্যে কতকগুলি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত এবং কতকগুলি পূর্ববর্তী শাব্দিকগণের নিকট হইতে গৃহীত। যেগুলি

অষ্টাধ্যায়ীর বিশেষত্ব

স্বোদ্ভাবিত সেগুলির তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আর যেগুলি তাঁহার পূর্ববর্তিগণের উদ্ভাবিত তন্মধ্যে যেগুলি সম্পূর্ণ সেইগুলির তিনি পুনরায় নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিয়া উৎকর্ষবিধান করিয়াছেন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অনুস্বার, অন্ত, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু, প্রত্যয়, প্রদান, প্রযত্ন, ভবিষ্যৎ (কাল), বর্তমান (কাল)—এই কয়টী শব্দের তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। এদিকে আবার অনুনাসিক, আত্মনেপদ, আমন্ত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ, বিভক্তি, বৃদ্ধি, সংযোগ, সবর্ণ, হ্রস্ব—এই ত্রয়োদশটী ঐন্দ্র শব্দের তিনি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যে এইগুলি 'প্রাক্' বৈয়াকরণদিগের শব্দ বলিয়া বহু বার কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পাণিনি নিজেও ২. ৩. ১৩ সূত্রের 'চতুর্থী' এই শব্দের ব্যাখ্যাকালে 'চতুর্থীতি সংজ্ঞা প্রাচাম্' সংজ্ঞায় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা পূর্ববর্তী বৈয়াকরণের নিকট হইতে গৃহীত। এইরূপ, তিনি ২ ৩.৪৬ ইত্যাদি প্রথমাদির ব্যাখ্যায়ও ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

অতঃপর, তিনি কিরূপে অনুনাসিক ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যার প্রকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাতিশাখ্যে অনুনাসিক বলিলে মাত্র তাহা ঙ, ণ, ং প্রভৃতি কয়েকটী অক্ষরদ্যোতক হইবে ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু পাণিনি উচ্চারণস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সূত্র করিলেন 'মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' (১ ১ ৮)। পাণিনির পূর্ববর্তী কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্যে ১, ৩৫ সূত্রে, অথর্ব-প্রাতিশাখ্যে ১. ৯২ সূত্রে 'উপধা'র উল্লেখ আছে। কাত্যায়নে (২ ১ ১১) 'অন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা' উপাধার এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন 'অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা' (১ ১.৬৫)। পূর্ব সূত্র হইতে এই সূত্রের পার্থক্য অল্পই, কিন্তু এই অল্প পরিবর্তন হইতেই পাণিনিপ্রবর্তিত পদ্ধতির ও পূর্বপ্রচলিত প্রণালীর মধ্যে কি প্রভেদ বিদ্যমান তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। পাণিনিতে 'অলঃ' এই কথাটী যুক্ত হইয়াছে মাত্র। মহাভাষ্যে ইহার এইরূপ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"কিং ইদং অল্‌গ্রহণং অন্ত্যবিশেষণম্‌? এবং ভবিতুং অর্হতি। উপধা সংজ্ঞায়াং অন্ত্যনির্দেশশ্চেৎ সংঘাত প্রতিষেধঃ।" ইত্যাদি (মহাভাষ্য, বারানসী-সংস্করণ ১, পৃঃ ১৬০ প)—অর্থাৎ সংঘাত-প্রতিষেধের নিমিত্তই 'অল্‌' গৃহীত হইয়াছে। পূর্ববর্তীদিগের গ্রন্থে এই সতর্কতার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কেন না, তাঁহারা এরূপ চিহ্ন কখনও ব্যবহার করিতেন না। এইরূপে সর্ববিষয়ে পাণিনির অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দেখাইতে পারা যায়। পাণিনি পূর্ব প্রচলিত পদ্ধতিগুলি যেরূপে সংস্কৃত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে চারিটী বিষয়ের আবিষ্কর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেমন—(১) পাণিনি-কর্তৃক শিবসূত্রের সর্বপ্রথম আবিষ্কার ও প্রত্যাহারদ্বারা তাহার প্রয়োগ, (২) পাণিনি-উদ্ভাবিত অনুবন্ধসমূহ, (৩) কৃৎ, নদী, স্ত্রী, সংখ্যা, ঘ (=-তর,-তম), ঘি (=-ই, উ), ঘু (=দা, ধা ইত্যাদি), টি, ভ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন, এবং (৪) প্রকৃতপ্রস্তাবে গণসমূহের উদ্ভাবন। এই চারিটী বিষয়ে পাণিনির প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পাণিনি সংস্কৃত ভাষার সর্বপ্রধান বৈয়াকরণ। তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষার মেরুদণ্ড না বলিয়া থাকা যায় না। শব্দবিদ্যার অপূর্ব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ-প্রণেতা পাণিনির নাম কি ভারতে, কি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট, সর্বত্রই বিঘোষিত—সুপ্রচারিত। কিন্তু তিনি কোন্ দেশের লোক, কোন্ সময়ে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি কাহার পুত্র ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ নানা মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মত সমালোচনা করিয়া পাণিনির কালনিরূপণের চেষ্টা করা আবশ্যক। পাণিনি কোথাও বলেন নাই যে, তিনি তাঁহার ব্যাকরণের রচয়িতা। কিন্তু তাঁহার বৈয়াকরণ-সূত্রে স্বীয় নাম ও নিবাস গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাত্যায়নের শেষ বার্তিকে (৩১) তাঁহার নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে ব্যাকরণ-প্রণেতা উহাতে তাহাও স্থিরীকৃত

(৩১) Mahabhashya (Kielhorn's Edition), III. p. 457.

হইয়াছে। তিনি কোন্ সময়ের লোক, বা কোন্ দেশে তিনি বাস করিতেন, 'শব্দানুশাসন' আলোচনা করিয়া এতদ্বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সংবাদ পাওয়া যায় না। পাণিনি যে সময়ে জীবিত ছিলেন সেই সময়ের আলোচনা করিলে বোধ হয়, তাঁহার সময়ে দুই শ্রেণীর বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন। এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ পূর্বাঞ্চলবাসী, অপর শ্রেণীর বৈয়াকরণ উত্তরপ্রদেশনিবাসী। পাণিনি তাঁহার সূত্রে ভারতের ভূগোলজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত স্থান নদী ও জাতির নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে পঞ্জাব ও আফ্‌গনিস্থানে অবস্থিত কয়েকটী নাম উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হইল—'বর্ণু' (৩২) (৪ ২. ১৫৩, ৪ ৩ ৯৩), অর্থাৎ 'বর্ণু' নদ ও দেশ. 'কাপিশী' (৩৩) (৪ ২ ৯৯), অর্থাৎ আফ্‌গনিস্থানের সর্বোত্তরবর্তী নগর, 'সুবাস্তু' (৪ ২ ৭৭) বা কাবুলনদের শাখা বর্ত্তমান 'সোয়াত্', 'বরণ' (৩৪) (৪ ২ ৮২), অর্থাৎ সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে আটকের অপর পার্শ্বস্থ 'বরণস্', 'বাহীক' (৪ ২ ১১৭, ৫ ৩ ১১৪), অর্থাৎ 'পঞ্জাব', সকল কর্ত্তৃক স্থাপিত জনপদ 'সাকল' (৩৫) (৪ ২ ৭৫) বা ইরাবতীর পূর্বতীরবর্তী নগর, 'পর্বত' (৩৬) (৪ ২. ১৪৩) বা পঞ্জাবের মধ্যপ্রদেশ, 'মালব্য' ও 'ক্ষৌদ্রক্য' (৩৭) অর্থাৎ 'মালব' ও 'ক্ষুদ্রক' নামক পঞ্জাবের প্রাচীন যুদ্ধকুশল জাতি, বর্ত্তমান কাবুলনিবাসী 'পশু' জাতি (৫ ৩ ১১৭)। এতৎসমুদয় বর্ত্তমান পঞ্জাবের পশ্চিমোত্তরাংশে এবং আফ্‌গনিস্থানের পূর্বসীমার মধ্যে অবস্থিত, অর্থাৎ উত্তরভারতে স্থিত। কিন্তু উত্তরভারতের পূর্বাঞ্চলবর্তী প্রদেশের নামও তাঁহার সূত্রে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের দেশের মধ্যে কচ্ছ (৪ ২ ১৩৩), অবন্তী (৪ ১ ১৭৬), কোশল (৪ ১ ১৭১), করূশ (৪ ১. ১৭৮) ও কলিঙ্গ (৪ ১ ১৭৮) —এই পাঁচটী দেশের নাম পাণিনির সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অবন্তী উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী প্রদেশ, কলিঙ্গ, করূশ ও অবন্তী, পুরাণে বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চাদ্‌বর্তী দেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'রত্নাবলী' নাটকেও কোশল ঐ পর্বতসন্নিহিত প্রদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাণিনিতে দূরবর্তী দক্ষিণাঞ্চলের নাম না থাকায় অনুমিত হইতেছে যে, তৎকালে আর্যগণ বিন্ধ্যপর্বতের পরপারে গমন করেন নাই। তবে তাঁহারা পর্বত পার না হইয়া উহার দক্ষিণ-পূর্বকূলে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি উত্তর ভারতের বৈয়াকরণ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

---

(৩২) বোধ হয়, ইহা য়ুয়েন্‌-চোয়ঙের 'ফলন্‌' ও কানিংহামের 'বান্নু'।

(৩৩) গ্রীক ও রোমানদিগের 'কপিসেনে' ও য়ুয়েন্‌-চোয়ঙের 'কৈপিসে'।

(৩৪) প্রসিদ্ধ পার্বতীয় দুর্গ 'অওর্নস্' এই স্থানেই অবস্থিত ছিল।—রজনী গুপ্তের 'পাণিনি, ১০৯ পৃঃ। Indian Antiquary, I. 22.

মৌর্য্য-যুগ

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কৌটিল্য রাজার মন্ত্রী-পরিষদের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে ইন্দ্রের মন্ত্রী-পরিষদে একসহস্র জ্ঞানী লোক ছিলেন সেই জন্যই তাঁহাকে সহস্রলোচন বলা হয় যদিচ তাঁহার দুই চক্ষু ছিল। এই স্থলে আমরা পুরাণোক্ত ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুর একটী রূপক ব্যাখ্যা পাইলাম (১)। আবার তিনি বৃদ্ধ কিম্বা ব্যধিগ্রস্থ রাজাদের 'নিয়োগ-প্রথা' উপায়ে পুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন (২)। পুনরায় তিনি বলিতেছেন, জাতিচ্যুত লোক, চণ্ডাল, ঘৃণিত পেশার লোক, 'অহং জ্ঞানী' (Egoistic) ব্যক্তি সকলকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা হইবে না। কেবল তাহাদের নিজেদের সমাজের ব্যাপারে তাহার ব্যবস্থা অন্যরূপ (৩)। যে স্ত্রীলোক স্বামীর ঋণের কথা শুনে নাই, তাহাকে তাহার জন্য দায়ী ধরা যাইতে পারিবে না। কেবল গোপালক—একত্রে যাহারা চাষ করে (Joint Cultivator)—তাহাদের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইবে (৪)। আবার কৌটিল্য সমবায় সঙ্ঘের (Trade Guild) ব্যবসায়ীদের উল্লেখ করিয়াছেন (৫)। পুনরায় তিনি শ্রমজীবিদের (সঙ্ঘ-ভ্রাতা) সঙ্ঘের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৬)। কৌটিল্য অব্রাহ্মণ্যবাদীদের উপর যে প্রীত ছিলেন না তাহা এই নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা প্রমান হইতেছে, যখন কোনি চণ্ডাল একজন আর্য্যনারীকে স্পর্শ করে, (৭ক), যে ব্যক্তি দেবতা কিম্বা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্যের দ্বারা, বৌদ্ধ, (শাক্য) আজিবীকদের ও প্রব্রাজিত (exile) নিমন্ত্রণ করে তাহার একশত পণ অর্থদণ্ড হইবে। কৌটিল্য এই স্থলে অব্রাহ্মণ্যবাদীদের উপর প্রীত ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। তিনি অন্য স্থলে বৌদ্ধদের 'পাষণ্ড' বলিয়া গালি দিয়াছেন (৭খ)। ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয় যে এই জন্য বহু বহু শতাব্দী পরে বৌদ্ধ পুস্তক 'আর্য্যমঞ্জুশ্রী মূল কল্পের' গ্রন্থকার কৌটিল্য বা চাণক্যকে মৃত্যুর পর নরকে প্রেরণ

---

(১) S. Sastri—Book I—chap. XV, 29.
(২) " — " —chap. XI. 173.
(৩) " — " —chap. XVII. 35.
(৪) " —Book III—chap. XI.
(৫) S. Sastri—Book III—chap. XII. 179.
(৬) " — " " — " XIV. 179.
(৭ক) " — " " — " XX. 199.
(৭খ) S. Sastri—Book II. chap. 36. 144.

করিয়াছেন (He went to hell) (৮)। তৎপরে তিনি বলিতেছেন, যে রাজাকে অপমান করে বা রাজার স্বার্থ সিদ্ধির বিরুদ্ধ কাজ করে তাহার জিহ্বা ছেদ করিতে হইবে। আবার কৌটিল্য বলিতেছেন, "আমার গুরু বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণের লোকেরা বেশী সাহসী বলিয়া তাহাদিগকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা উচিত।" কিন্তু কৌটিল্য বলেন, না—ব্রাহ্মণ সৈন্যদের লোকে স্তুতি দ্বারা বশীভূত করিতে পারে এইজন্য অস্ত্রে শস্ত্রে সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয় সেপাইরা আরো ভালো কিম্বা বৈশ্য ও শূদ্রসৈন্য সংখ্যাধিক্যের জন্য আরো ভাল (৯)। এই স্থলে আমরা স্পষ্ট দেখি যে পরে ব্রাহ্মণদের দাবী যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাই লড়াই করিত ইহা অসত্য। তৎপর তিনি সৈন্যগঠন প্রণালী বিষয় বলিতেছেন, দশজন সেপাইয়ের উপরে পাদিক (Padik) নামে একজন অধ্যক্ষ থাকিবে, দশজন পাদিক একজন সেনাপতির অধীনে থাকিবে, দশজন সেনাপতি একজন নায়কের অধীনে থাকিবে—(১০)। এতদ্বারা ভারতীয় যুদ্ধ প্রণালী ক্ষেত্রে এক উন্নততর উত্তম ব্যবস্থা সূচিত হইতেছে। ম্যাসিডোনীয় আক্রমণের ফলস্বরূপই কি এই নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, বেদে আমরা এইরূপ সৈন্যগঠন প্রণালীর কোন প্রমাণ পাই না। তৎপর তিনি নানা প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন—যথা—বিভিন্ন উদ্ভিদাদি হইতে গোলক প্রস্তুত করিয়া সৈন্যদের তাবুতে ফেলিবার কথা বলিয়াছেন। এই গোলাগুলি ফাটিলে অগ্নি উৎপাদন করিত। আধুনিক রাসায়নিকদের মতে এই উদ্ভিদগুলির দাহগুণ আছে। এই সব ব্যবস্থার দ্বারা আমরা স্পষ্টই দেখি যে ম্যাসিডোনীয় আক্রমণের পর হইতেই ভারতীয়দের যুদ্ধ প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি একটী আশ্চর্য্য সংবাদ দিয়াছেন, একজন ব্রাহ্মণের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার (funeral rites) সময়ে যে গরুকে হত্যা (sacrifice) করা হইয়া থাকে তাহার হাড়চূর্ণ, মজ্জা বা চর্ব্বী একটা সাপের খোলসের মধ্যে পুরিয়া গরু ও ষাড়ের পিঠে রাখিলে তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায় (১১)। এই স্থলে একটী তুক-তাকের কথাই সূচিত হইতেছে। তৎপর তাঁহার নিকট হইতে অপর কিছু সংবাদ পাই। রাজা একটী গরু, তাহার বৎস ও ষাঁড়কে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবার পর সভায় আসিবেন (১২)। রাজার অন্তঃপুর থাকিত এবং তাহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য সৈন্যদল নিযুক্ত থাকিত। এই অন্তঃপুরে অনেক-গুলি প্রকোষ্ঠ থাকিত। তাঁহার নিজের থাকিবার স্থান ভাণ্ডার (Treasury) গৃহের অনুকরণে নির্ম্মাণ করিতেন কিম্বা মাটীর তলায় ঘর নির্ম্মাণ করিতেন। এই অন্তঃপুরে

(৮) K. P. Jayswal—An Imperial History of India.
(৯) S. Sastri—Book IX—chap. 2. p. 345.
(১০) " —Book X—chap. 6. p. 377.
(১১) S. Sastri—XIV, chap. III, p. 119.
(১২) S. Sastri—Book I, chap. 19. p. 38

সুসজ্জিতা বেশ্যারা (রূপাজীবা) দাসীরূপে নিযুক্ত হইত। এই অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আশীটি পুরুষ এবং পঞ্চাশটি স্ত্রীলোক পিতা এবং মাতার ছদ্মবেশে, বয়স্ক ব্যক্তি এবং নপুংসকেরা নিযুক্ত থাকিত (১৩)। অন্তঃপুর হইতে যে সব জিনিষ বাহিরে যাইত বা ভিতরে আসিত তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার পূর্ব্বে "চিহ্নাঙ্কিত" অর্থাৎ মোহর দ্বারা অঙ্কিত হইত। রাজা শয্যা হইতে উত্থান করিবার পর তীরন্দাজ স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনন্দিত হইতেন (১৪)। বেশ্যারা স্নানাগারে দাসীর কার্য্য করিত ও গাত্র মর্দ্দন করিয়া দিত (১৫)। এই সময়ে দেবদাসী প্রথাও ছিল (১৬)। তৎপরে তিনি বলিতেছেন, কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত পশুদের হত্যা করিবে না। আবার বলিতেছেন, গোবৎস, ষাড়, বৃষ কিম্বা দুগ্ধবতী গাভীদের হত্যা করিবে না। যদি কেহ তাহাদের মারে বা যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করে তবে তাহাদের পঞ্চাশপণ অর্থদণ্ড হইবে (১৭)। কিন্তু তিনি ইহাও বলিতেছেন গোজাতীয় জন্তু, বন্য পশু, হস্তী ও মৎস্য যেগুলি রাজার রক্ষণে (Royal Preserve) আছে সেগুলি বিপজ্জনক হইলে রাজার জঙ্গলের বাহিরে হত্যা করিবে।

পুনশ্চ মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছেন যে সমস্ত জন্তু কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, হিন্দুরা সে সমস্ত পশু হত্যা করে না। আমার মনে হয় পরে 'গোহত্যা পাপ' হিন্দুদের এই সংস্কার ইহা হইতেই উদ্ভব হয়। কারণ বৈদিক সাহিত্যে এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে আমরা গো-বধের উল্লেখ পাই। কিন্তু কবে হিন্দুর নিকট গো-হত্যা পাপ বলিয়া গণ্য হইল তাহা এখনও কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জয়সোয়ালের (১৮) মতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই মৌর্য্যসাম্রাজ্যের আইন পুস্তক ছিল। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে এই আইনের দ্বারা বাধ্য হইয়াই লোকের এই অভ্যাস দাঁড়ায় যে গো-হত্যা পাপ। কৌটিল্য আবার আজকালকার ধরণের Pass-Portএর উল্লেখ করিয়াছেন (১৯)। কৌটিল্যে আমরা বৈদিক যুগের ন্যায় মৃত-দেহকে মাটিতে সমাহিত করা এবং দগ্ধ করা উভয় প্রথার উল্লেখ দেখি। কৌটিল্যে আর একটী বিষয় আমরা পাই যে তৎকালে রাজারা মন্দিরে উপলব্ধ অর্থের অংশ গ্রহণ করিতেন। এ বিষয় কৌটিল্যে উল্লেখ আছে যে নানা প্রকার বুজরুকী (উর্দ্ধবাহু ইত্যাদি) করিয়া লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস উদ্দীপনা করিয়া লোকের নিকট হইতে মন্দিরে প্রাপ্ত অর্থের অংশ রাজা লইতেন। মন্দির ও ধর্ম্মক্ষেত্রসমূহ যে ভারতীয় রাজাদের একটী রোজগারের স্থল

(১৩) S. Sastri—Book I, chap. 20, p. 42.

(১৪) মেগাস্থিনীস চন্দ্রগুপ্তের তীরন্দাজ স্ত্রীলোক প্রহরীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। Book I, chap. 31, p. 42.

(১৫) S. Sastri Book I, Chap. 19—Sl. 44.

(১৬) „ Book II, Chap.—13

(১৭) „ „ II, Chap. 26—122.

(১৮) Jayswal— Age of Manu and Yajnavalka.

(১৯) S. Sastri Book II. Ch. 34.

ছিল তাহার দৃষ্টান্ত আমরা ভারতীয় ইতিহাসে বরাবর পাইয়া আসিতেছি। গজনীর মামুদের সভাসদ ঐতিহাসিক আল্‌বেরুনী সোমনাথ মন্দিরে সঞ্চিত প্রভূত ধন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু রাজারা যাত্রীদের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মন্দিরে ধনাগমের ব্যবস্থা করিত এবং নিজেরা তাহার অংশ গ্রহণ করিত। এই সব তীর্থস্থলে যে নানাপ্রকারের বুজরুকী ও অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করাইয়া অর্থাগমের ব্যবস্থা করা হইত তাহা পারস্য কবি সেখ সাদীর 'ভারত-ভ্রমণের' বৃত্তান্তে পাই; এই বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা 'বোস্তান' নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন।

কৌটিল্য যুদ্ধনীতির সম্পর্কে আরও কতকগুলি কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যথা:— যন্ত্র-পাষাণ (যে যন্ত্র দ্বারা পাথর ছুড়িয়া ফেলা যাইত), গোষ্পানা পাষাণ (Such stones as can be thrown by a rod called Goshpana), লৌহজালিকা (সমস্ত শরীরে লৌহবর্ম), পট্ট (হস্ত ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকার লৌহবর্ম), কবচী (বক্ষদেশ, হাত এবং মস্তক রক্ষা করিবার জন্য খণ্ডীকৃত লৌহবর্ম) (২০)। এই প্রকারের যুদ্ধের উপকরণগুলি আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই না। বৈদিক সাহিত্যে এই প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ নাই। এগুলি ভারতে নবাগত বলিয়াই মনে হয়। লৌহদণ্ড ব্যতীত বাকীগুলি পশ্চিম এসিয়ার উদ্ভূত যন্ত্র। প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার যন্ত্রটীকে পশ্চিম এশিয়ার Catapult (ক্যাটাপুল্ট) বলিয়াই মনে হয়।

এই জন্যই অনুমান হয় যে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর হইতেই এই সব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রামায়ণে আমরা শতঘ্নি বলিয়া একটী যন্ত্রের উল্লেখ পাই। কেহ কেহ মনে করেন এই Catapult কেই রামায়ণে শতঘ্নি বলা হইত। কিন্তু ইতিহাসে ইহার ব্যবহারের কোন উল্লেখ নাই। বরং মহম্মদ বিন্ কাশিমের অধীনে মুষ্টিমেয় আরব সৈন্য ক্যাটাপুল্ট দ্বারা হিন্দুদের পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল (২১)।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা এই পাই যে মৌর্য্যযুগে শূদ্রদের আর্য্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। অযাজ্যদের যজ্ঞেও ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্য করিতে হইত এবং দাস-প্রথা পরোক্ষভাবে (Indirectly) উঠাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মৌর্য্যযুগের এই মাহাত্ম্য, পৃথিবীতে যখন কেহই দাসপ্রথা উঠাইবার চেষ্টা করে নাই সেই সময় ভারতে তাহা উঠাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

---

(২০) S. Sastri Book II, Ch. 18.

২১।—চাক্‌নামা দ্রষ্টব্য।

তিব্বতের বৌদ্ধ-সঙ্ঘ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীঅজিত ঘোষ

১৪১৭ খ্রীস্টাব্দে সোঙ-খ-পের মৃত্যু হয়। তিব্বতে বেশ জনপ্রিয় প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুর পর তিনি দেবরূপ লাভ করেন এবং স্বর্গে দেবগোষ্ঠির মধ্যে তাঁকে আসন দেওয়া হয়। তাঁর স্বর্গারোহণ হ'লে গন্দন-বিহারে একটী বেশ জাঁকালো রকমের চৈত্য নির্মাণ করা হয়েছিল। এই চৈত্যে তাঁর দেহাবশেষ রক্ষা করা হয়। এখনও এই চৈত্যটীকে তিব্বতের সাঙ্ঘিক সম্প্রদায় রীতিমত শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

যাহোক, সোঙ-খ-পের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গেদেন্ ডুব্ বা গে-ডুন্ গ্রুব প্রধান লামার পদ অধিকার করেন। গন্দন-সঙ্ঘে গেলুগ্-প-সম্প্রদায়ে ইনিও পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। প্রধান লামার অধিকার লাভ করলেও ইনি সোঙ-খ পের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন না। সোঙ-খ-পের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে বীয়ম্স্-চেন্-চোস্-জে ও খস্-গ্রুব্-জে অন্যতম। তিব্বতের প্রাচীন চিত্রকলায় সোঙ-খ-পের চিত্রে এ দু'জনকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা যায়। মিঙ-সম্রাট য়ুঙ-লো সোঙ-খ-পকে একবার চীনে পদার্পণ করবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। সোঙ-খ-প নিজে গমন করতে অসমর্থ হয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য বীয়ম্স্-চেন্‌কে পাঠিয়ে দেন। কারও কারও মতে, বীয়ম্স্-চেন্‌কেই সোঙ-খ-পের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বীয়ম্স্-চেন্ চীনে খুব আদর-অভ্যর্থনা লাভ করেন। মিঙ্-সম্রাটদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, লামাদের সাহায্যে তিব্বতে রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব লাভ করা। অবশ্য প্রতিদান-স্বরূপ তাঁরা লামাদের সমগ্র সাম্রাজ্যে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। বীয়ম্স্-চেন্‌ও আপনার শিষ্যবর্গকে নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের বৌদ্ধসঙ্ঘে ধর্মাধিকরণের মুখ্যত্ব লাভ করেছিলেন। যে বর্ষে সোঙ-খ-পের মৃত্যু হয়, বোধ হয় সেই বর্ষেই তিনি চীন-দরবার থেকে প্রভূত সম্মান লাভ করে তিব্বতে ফিরে আসেন। এই বর্ষেই তিনি তিব্বতের সোঙ-খ-প প্রতিষ্ঠিত সেরা-বিহারটীকে কার্যকরী করে তোলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে আবার তিনি চীনদেশে ফিরে যান এবং সেখানে ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। খুব সম্ভব সোঙ-খ পের মৃত্যু হ'লে তাঁরই প্রিয়তম ও প্রধানতম শিষ্যরূপে গন্দনের প্রধান লামার পদ পাবার আশায় তিনি তিব্বতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, গেদেন্-ডুব্ পূর্বাহ্লেই পিতৃব্যের পদ অধিকার করেছেন ও বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন এবং খস্-গ্রুব্-জের প্রতিষ্ঠাও অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে, তখন তিনি চীনে ফিরে যাওয়াই উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক চীনের অন্যতম বৌদ্ধপ্রধান হ-লি-ম-এর সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ এই হ-লি-ম বৌদ্ধ কর্মপ-সম্প্রদায়ের পঞ্চম প্রধান আচার্য ছিলেন। এঁকেও চীনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং ইনিও চীনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশ্য ইনি বীয়ম্স্-চেনেরই সমসাময়িক।

বীয়ম্স্-চেন্ যেমন সেরা-বিহারকে কার্যকরী করে তুলেছিলেন, তেমনি খস্-গ্রুব্-জে ও

তশিলুন্‌পোর বিহারটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিলেন। অনেক সময় বীয়ম্‌স্-চেন্‌কে সেরা-বিহারের ও খস্-গ্রুব্-জেকে তশিলুন্‌পো-বিহারের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। যাহোক, খস্-গ্রুব্-তশিলুন্‌পো-বিহারের লামাপ্রধান বা অধ্যক্ষ হন এবং অমিতাভ-বুদ্ধের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তশি লুন্‌পো-বিহারের অবতারদের পর্যায়ে এঁর স্থান কিন্তু অষ্টম। গৌতমের এক শিষ্য সুভূতিকে প্রথম অবতার বলা হয়, দ্বিতীয় অবতার শম্ভলের নৃপতি মঞ্জুশ্রীকীর্তি; তৃতীয় অবতার অভয়কর-গুপ্ত। অভয়কর এক জন প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত—পালবংশীয় রামপালের সময় তিনি জীবিত ছিলেন; কেহ কেহ তাঁর সময় স্থির করেছেন ১০৭৫ হতে ১১১৫ খ্রীস্টাব্দে, তবে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

গেদেন্-দুব্ গন্দন-বিহারে পিতৃব্যের স্থান অধিকার করে পীত-সঙ্ঘের প্রধান লামা হন। সোঙ্-খ-প সুনিয়ন্ত্রিত নূতন লামাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে প্রথম প্রধান লামা হলেও গেদেন্-দুব্ই প্রথম প্রধান লামারূপে পরিচিত হয়েছিলেন। অবশ্য, নিজেকে নিজে তিনি প্রথম প্রধান লামারূপে প্রচার করেন-নি; এর কারণ কিছু বোঝা যায় না। তিব্বতীয় সঙ্ঘে তিনি অবলোকিতের প্রথম অবতার বলে স্বীকৃত হন। গেলুগ্-প-সম্প্রদায়ে অবলোকিতেশ্বরই প্রধান দেবতা। সোঙ্-খ-পকে প্রথম অবতার না বলে, এমনি তাঁকে অবতারপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না করে গেদেন্-দুব্কে যে প্রথম অবতার বলে স্বীকার করা হয় এর একটা গূঢ় কারণ আছে। সোঙ্-খ-পকে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলা হত; কিন্তু সোঙ্-খ-পের মৃত্যুর পূর্বেই গেদেন্-দুবের জন্ম হয়, সুতরাং সোঙ্-খ-পের আত্মা গেদেন্-দুবের মধ্যে আসতে পারে না এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সোঙ্-খ-পকে আর অবতার বলে স্বীকার না করে গেদেন-দুব্কেই অবতার করা হয়। এদিকে তশিলুন্‌পোয় খস্-গ্রুব্-জেও বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। সমগ্র তিব্বতের ধর্মসঙ্ঘে গন্দন-বিহারের লামাধ্যক্ষের পরেই তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রভাব লাভ করে, এমন কি তিনিও প্রধান লামারূপে পরিচিত হন এবং লাসার লামাধ্যক্ষরূপে অভিহিত হতে থাকেন। মিঙ-সম্রাট্ চে'ঙ হুআ (১৩৬৫—১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দ) তিব্বতীয় সঙ্ঘে এঁদের দু'জনের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে এঁদের দু'জনেরই ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এছাড়া এঁদের দু'জনকেই পূর্বের আট জন লামাপ্রধানের চেয়েও ক্ষমতাপন্ন মনে করে তাঁদের ক্ষমতার অনুকূল যথোচিত অধিকার দিয়ে যান। উভয়েই 'গীয়ল্-পো' উপাধি গ্রহণ করেন। গীয়ল্-পো অর্থে নৃপতি। এঁদের সময় হতেই লামাতন্ত্রে পর্যায়ক্রমিক অবতারবাদের প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এই অবতারবাদের দু'টী ধারা প্রকাশ পায়; একটী ধারায় দেবতারা মানবশরীরে আবির্ভূত হন, আর একটী ধারায় একটী আত্মার অর্থাৎ জীবনের ক্রমান্বয়ে অবস্থান থেকে যায়। প্রধান লামারূপে অবতাররা বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকার লাভ করেন। পীত-সঙ্ঘের লামারা আজীবন কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেন, এজন্য যে বংশে তাঁর জন্ম সেই বংশের এক জনকে বিশেষতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রকে লামাধ্যক্ষরূপে গ্রহণ করা হয়।

গেদেন্-দুব্ ১৩৯১ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৪৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৮৭ বর্ষকাল জীবিত ছিলেন। অতঃপর গে-দুন্ দ্বিতীয় প্রধান লামা হন। গে-দুনের জন্ম হয় ১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দে। তিনি ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৬২ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং এই দীর্ঘকাল ধরেই প্রধান লামারূপে স্বীকৃত হয়েছেন। তবে গেদেন্-দুব্ও বড় কম দিন প্রধান লামা ছিলেন না। কারণ দীর্ঘ ৬১ বৎসর তিনি লামাধ্যক্ষের পদে ছিলেন। গে-দুন্‌কে চীনসম্রাট্ পিকিঙ্এ আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে অসমর্থ হন। তিনি অবতারবাদের কিছু কিছু সংস্কার করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী তৃতীয় লামাধ্যক্ষ সোড্-নম্‌স্। এর জন্ম ১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে। ইনি বেশী দিন প্রধান লামা থাকতে পারেন নি, কারণ ৪৩ বৎসর বয়সে ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর সময়ে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে পাশ্ঘরের মুসলমানেরা তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশ আক্রমণ করে এবং ঐ অংশ তাদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়। সোড্-নম্‌সের প্রধান কাজ, তিনি মোঙ্গোলদের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাঁর পর্যায়ে পূর্বতন আর কোন লামা একাজ করেন-নি। অবশ্য এক সময়ে সক্য পণ্ডিত মোঙ্গোলদের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং মোঙ্গোলরাজ্যের য়ুয়ন্-সম্রাট্ খুবিলই খাঁর রাজ্যকালে পগ্‌স্‌প তাকে সুদৃঢ় করেছিলেন; কিন্তু য়ুয়ন্-বংশের পতনের পর মোঙ্গোলদের সঙ্গে পূর্বতন প্রীতির সম্পর্ক আর কোন ক্ষমতাপন্ন লামা বড় একটা চিন্তা করবার বা কাজে লাগাবার সুবিধা পান নি। মিঙ্ অভ্যুদয়ের পর থেকে মোঙ্গোলদের সঙ্গে চীনের ছোটখাটো যুদ্ধ লেগেই ছিল। এদিকে তুমেদের মোঙ্গোল অধিপতি অল্‌তন্ খগন্ শক্তি-সঞ্চয় করেন। প্রায় ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি তিব্বতের সংস্পর্শে আসেন। সীমান্ত হতে তিনি কয়েক জন লামাকে বন্দী করে আপনার দরবারে নিয়ে যান। চীনের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি চীনকেও অনেকটা শক্তিহীন করে ফেলেছিলেন। ফলে চীনসম্রাট্ তাঁর সঙ্গে একটা সন্ধি করা উচিত বিবেচনা করেন। চীনসম্রাটের ভয় ছিল, হয়তো অল্‌তন্ খগন্ আবার খুবিলই খাঁর মত রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল, মোঙ্গোলরাজ পিকিঙ আক্রমণ করে পুনরধিকার করবার আয়োজন করতে লেগে গেছেন। তিব্বত-সীমান্ত হতে তিনি যে লামাদের নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের তিনি কাজে লাগালেন—অবশ্য তাঁদের উপযুক্ত সম্মানও দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সাহায্যে তিনি সমস্ত বিক্ষিপ্ত মোঙ্গোল জাতিগুলিকে একত্র করে পিকিঙ-অধিকারের জন্য প্রচেষ্ট হলেন। নিজের কার্য-সিদ্ধির জন্য তিনি তিব্বতে প্রধান লামাকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। প্রথমে প্রধান লামা সম্মত হলেন না, কিন্তু দ্বিতীয়বার আমন্ত্রণে তিনি অল্‌তন্ খগনের দরবারে আসতে সম্মত হলেন; খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রাজকীয় শোভাযাত্রায় তিনি অল্‌তনের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন।

[ক্রমশঃ]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

স্বামী বেদানন্দ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগে বিশ্বসাহিত্যের আকাশে সর্ব্বতোমুখী সাহিত্যিক প্রতিভার সহস্ররশ্মি বিকীরণকারী সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে। যে কবি বহুকাল পূর্ব্ব থেকে তাঁর অভীষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন,

"এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে
তার হৃদয় বাঁশি কেড়ে নিয়ে বাজাও গভীরে।"

ভগবান কবির সেই আকুল প্রার্থনা আজ এতদিনে পূর্ণ করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানবের হৃদয়চিত্তবিমোহনকারী সেই বাঁশীর স্বর আজ থেমে গেছে, গীতিমুখর বাণীমুখর মহাকবি আজ সম্পূর্ণরূপে নীরব। সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশ্বভারতীর যে প্রাণময় লক্ষতন্ত্রী বীণা আপনার বিবিধ ও বিচিত্র রাগিণী-ঝঙ্কারে এতদিন প্রতি দেশ প্রতি মহাদেশকে বিমুগ্ধ করে দিত আজ সেই বীণার সুরলহরী মিশে গেছে কোন মহামৌন পারাবারে। আর জগৎ ভারতের বাণীমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের মধুর উদাত্ত কণ্ঠে শুনতে পাবে না ভারতীয় সভ্যতা সাধনা ও সংস্কৃতির নব নব বাণী। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যথা বেদনা আর কা'র লেখনীর ঐন্দ্রজালিকস্পর্শে জীবন্ত ভাষায় মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠবে? ভারতের স্বাজাত্যবোধ ও আত্মসম্মানের জীবন্তপ্রতীকরূপে কে আর আপনার স্বদেশবাসীর উপর অন্যায় অবিচার অবজ্ঞা উপেক্ষার বিরুদ্ধে সেই রকম বজ্রকণ্ঠে সবল প্রতিবাদ করবে? যে আশিটী অম্লান পারিজাত পুষ্পের সুন্দর মালা আপনার অপার্থিব সৌন্দর্য্য ও নন্দনের সুরভিতে এতদিন সকলের নয়ন ও চিত্তকে মুগ্ধ করে দিত, মৃত্যু তার নির্ম্মম হাতে সেই মালা হরণ করে নিয়ে গেছে। সেই শুভ্রবেশ শুভ্রকেশ উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি স্নিগ্ধ আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্ত্তি আজ অন্তর্হিত। সত্যই সেই সৌম্যমধুর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি গীতাঞ্জলির কবিরই উপযুক্ত—রবীন্দ্রনাথের সুন্দর সুঠাম সুগঠিত মূর্ত্তি যেন ছিল রক্তে মাংসে গড়া রবীন্দ্র-কাব্যেরই জীবন্তরূপ।

বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় রবীন্দ্রনাথ গৌরবের এক সমুচ্চ স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক অবদান যেমন অপরিমেয় তেমনি অতুলনীয়। সাহিত্যের এমন কোন বিভাগই নেই যে যেখানে রবীন্দ্রনাথের অমর রচনা সেই বিভাগে অভিনব ভাবসম্পদ চিন্তাসম্পদে সমৃদ্ধ করে নি। রবীন্দ্রসাহিত্য যে-কোন সভ্যজাতির গৌরব ও আগ্রহের বস্তু। সেই কারণে রবীন্দ্রসাহিত্য শুধু বাঙ্গালীকে নয় সমগ্র ভারতবাসীকে সমগ্র সভ্য জগতের কাছে চির গৌরবান্বিত করেছে। ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের

মধ্যে বোধ হয় আজ এমন কেউ নেই যে, যিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে অন্ততঃ কিছু মাত্রও পরিচিত নন। ইউরোপ আমেরিকার সুধী ও মনীষীরাই যে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত এমনই নয় এমন কি সেখানকার অনেক গ্রামবাসী অনেক দরিদ্র শ্রমজীবিদের কাছেও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালার সাহিত্যের ইতিহাসে ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মহাগৌরবময় ও বিস্ময়কর সমগ্র একটা সুদীর্ঘ যুগ। বাঙালার সাহিত্যাকাশকে স্বীয় প্রতিভার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় পরিপ্লাবিত করে বঙ্কিমচন্দ্র অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল বাঙালার সাহিত্যের পূর্ব্বদিগঞ্চল জ্যোতির্ম্ময়—কোন অদৃশ্য উদয়-গিরি থেকে রবির তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, সর্ব্ববিধ নাটক, প্রহসন, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি,

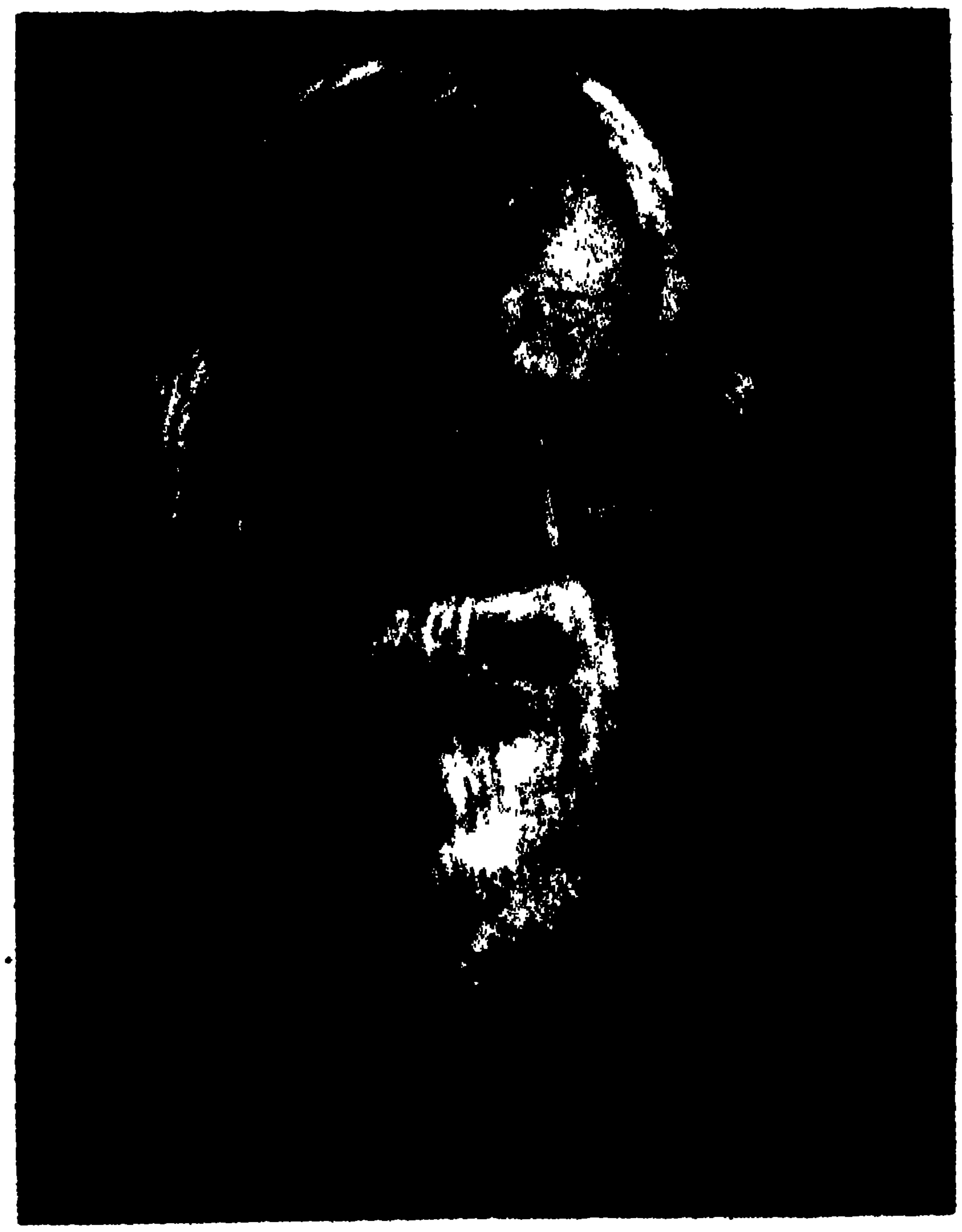

শিক্ষানীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ললিতকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ দুরূহ বিষয়ে নিত্য নানা নবনব চিন্তা, নবনব তথ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ষাট বছরেরও অধিক জগতের সুধী ও ভাবুক সমাজকে এত সম্পদ দান করলেন যে কোনদিনই তার পরিমাণ করা যাবে না। যে সুদুর্লভ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আজ সমগ্র জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন, আর যারা জগতের বিদ্বৎ-সমাজে তাঁর প্রভাব আজ অবাধ অপ্রতিহত, সেই সুদুর্লভ প্রতিভার স্ফুরণ সেক্সপীয়ার ও গ্যেটে ভিন্ন জগতে আর কোন কালে কোনও যুগে কোনও সাহিত্যিকের জীবনে

দেখা যায় নি। আজ তাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে বাঙলার রবীন্দ্রনাথ শুধু বর্ত্তমান যুগেরই শ্রেষ্ঠ কবি নন—তিনি সকল যুগের সকল দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে তার ভাবের নিত্য নূতনতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য মৌলিক চিন্তার অমিত ঐশ্বর্য্য, অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব এবং তার সুমহান সার্ব্বভৌমিক আদর্শ। এই কারণেই রবীন্দ্রসাহিত্য কালের ধ্বংসকারী গতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বহু বহু শতাব্দী ধ'রে নিজেকে অজেয় অপরাজিত করে রাখবে। বহু দিগ্বিজয়ী সম্রাট এবং তাঁদের বিপুল সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও জনবল উত্থিত হয়েছে ও ধ্বংস হয়ে গেছে—কিন্তু শেক্সপীয়ার, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ঐশ্বর্য্যের কোনদিনই ধ্বংস নেই, তারা ধ্বংস হবে না। যুগের পর যুগ তারা দেশে দেশে ভাবুক, চিন্তাশীল রসজ্ঞ ব্যক্তিদের চিত্তকে মুগ্ধ, পুলকিত ও আত্মহারা করে রাখবে।

ভাবের বিশ্বজনীনতাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অদৃষ্টপূর্ব্ব রচনায় বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতিকে সকলদিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন। মানবজাতিকে এক উদার অখণ্ড পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন—সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী হলেও তাঁর রচনায় দেশগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত কোন গণ্ডী স্থান পায়নি। সকল দেশের সকল কালের সকল শ্রেণীর নরনারীর চিত্তকে সমানভাবে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করবে এই মহা আশ্চর্য্যশক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল যেমন বহুমুখী তেমনি নবনব উন্মেষশালিনী। সেই অত্যাশ্চর্য্য সাহিত্য-প্রতিভা আপনার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তিতে সাহিত্য জগতে নিত্য নূতন ভাবরাজ্যের সন্ধানই শুধু দেয়নি, পরন্তু সম্পূর্ণ নূতন একটি বিরাট মহাদেশকে আবিষ্কার করেছে। যা কিছু জীর্ণ গলিত মলিন জীবনহীন প্রাণহীন কুৎসিত কদর্য্য ক্লিষ্ট রবীন্দ্রসাহিত্য তারই বিরোধী। যা কিছু গতানুগতিক অসাড় অচল যন্ত্রীভূত জড়ীভূত তাকে ভেঙে চুরে দিয়ে আবার নূতন সৃষ্টি করাই রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচায়ক। চিরচলিষ্ণু ছিল রবীন্দ্রনাথের চিত্ত—পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, গতানুগতিকতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোথাও নেই। রবীন্দ্র-নাথের ছিল গ্রহণ করবার মিলন করবার সৃজন করবারই মহা প্রতিভা। যে দেশ যে সাহিত্যে যে সভ্যতায় যা কিছু সুন্দর শাশ্বত মহান বিচিত্র বরণীয় রবীন্দ্রনাথের শক্তি-প্রতিভায় তা তাঁর মধ্যে সহজ সুন্দরভাবে মিলিত ও সমন্বিত হয়ে গেছে।

"চারিদিক হতে অমর জীবন, বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব কবে?"

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা কবির জীবনে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ভারতবাসীর চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর ক'রে তার আন্তর্জাতিক দৃষ্টি খুলে-

দিয়েছে—আমাদের বুদ্ধি হয়েছে সংস্কারমুক্ত—রুচি হয়েছে উন্নত ও সুমার্জিত, আমাদের জীবনদৃষ্টি হয়েছে উদার ও অধিকতর প্রসারিত। প্রাত্যহিক তুচ্ছতা তারল্য ও তামসিকতার পঙ্কিল জঘন্যতা থেকে মুক্ত হয়ে সাফল্যের সুমেরু শিখরে ওঠবার জন্য রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রবাণী আমাদের দিয়েছে নিত্য নিয়ত নব নব প্রেরণা।

জগতের প্রত্যেক দৃশ্য আকাশ বাতাস আলোক তরুলতা বন উপবন নদীনির্ঝর পর্ব্বত-প্রান্তর সাগর মহাসাগর এবং প্রত্যেক নরনারীকে কবি সুনিবিড় প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে তাঁর সাহিত্যে তিনি সবাইকে চিরন্তন করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের তৃষা অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল অজানা অসীম অনন্তের প্রতি। এই সুন্দর বিপুলা শ্যামলা ধরণীকে প্রাণে প্রাণে ভালবেসেও কবি সর্ব্বদা ফিরেছেন সেই অসীমের সন্ধানে—সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের কল্পনার গতি চলেছে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে কোন মহা অজানিতের উদ্দেশে—আর তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছে সেই অজানারই অন্বেষণের কথা। সেই উচ্চতম কাব্যঅনুভূতির কোন দুর্জ্ঞেয় স্তর থেকে কবি শুনিয়ে গেছেন বিশ্ববাসীকে কী সব অপূর্ব্ব গান—কী অভিনব কত সব আনন্দের সঙ্গীত। মানবাত্মার মহামুক্তির সঙ্গীত রবীন্দ্রকাব্যের একটা প্রধান সুর। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্ববিখ্যাত কবি শেলীর মনোমুগ্ধকর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ ক'রে বলতে বাধ্য,—

> "That from heaven, or near it
> 　Pourest thy full heart
> In profuse strains of unpremeditated art.
> Higher still and higher
> 　From the earth thou springest,
> Like a cloud of fire,
> 　The blue deep thou wingest
> And singing still dost soar, and soaring ever singest."

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা একান্ত দুঃসাহসিকতার কাজ। এই সাহিত্য এত বিরাট বিশাল দুরূহ এবং সমুদ্রের মতন দিগন্তপ্রসারিত ও অতলগভীর যে যতই এর আলোচনা ব্যাখ্যা ও বিচার করা হোক এর সমগ্র পরিচয় কোনদিনই পাঠক বা শ্রোতার কাছে ফুটে উঠবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মনীষা সত্যই মানুষের কল্পনারও অতীত—সেই মনীষা সেই প্রতিভা ধারণা করাতো দূরের কথা। কোথায় যে তার উচ্চতা, কোথায় যে তার গভীরতা, কোথায় যে তার বিস্তৃতি তা বহু মনীষীও নির্ণয় করতে পারেন নি—সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সেখানে আর কী করবে? রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে

হলে ম্যাথ্যু আরনল্ড (Matthew Arnold) শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে একদা যা বলেছিলেন সেই উক্তির প্রতিধ্বনি ক'রে আমরাও এখানে বলি—

"Others abide our question—Thou art free !
We ask and ask—Thou smilest and art still
Out-topping knowledge ! So some sovran hill
Who to the stars uncrowns his majesty,
Planting his steadfast footsteps in the sea,
Making the heaven of heavens his dwelling place,
Spares but the border, often, of his base
To the foil'd searching of mortality
And thou, whose head did stars and sun-beams know,
Self-schooled, self-scanned, self-honour'd, self-secure,
Didst walk on earth unguessed at. Better so,
All pains the immortal spirit must endure,
All weakness which impairs, all griefs which bow
Find their sole voice in that victorious brow."

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঠিক পূর্ব্বোক্ত ভাবে যাবতীয় সাহিত্যিক প্রতিভা ও গুণের অধিকারী কোন মহামনীষীকে আপনার "বেণু ও বীণা" কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। উদ্দিষ্ট মহাপুরুষের নাম সেই উৎসর্গ পত্রে উল্লিখিত ছিল না। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উৎসর্গ পত্র প'ড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বইখানা যে-অনামিত মহামনীষীকে উৎসর্গ করা হয়েছে তিনি কে? তিনি হয় শেকস্‌পীয়ার নয় রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ উল্লাসে উৎসাহে উত্তর দিলেন, "যদি ঘরেই দেবার মানুষ পাই তবে বাইরে কেন দিতে যাবো?"

সত্যই রবীন্দ্র-সাহিত্য এত বিরাট বিশাল ও বিচিত্র যে এর অস্ফুট আভাসও দেওয়াও এক সাধ্যাতীত কার্য্য। অন্যকথা দূরে থাকুক রবীন্দ্রনাথের এমন এক একটি কবিতাই আছে যে যাদের ব্যাখ্যা ও বিচার করতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে, ইউরোপে ও আমেরিকায় বহু সুধী ও মনীষী রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশালতা ও নিত্য নবীনতার তুলনায় সেসব এখনও যথেষ্ট ও পর্য্যাপ্ত ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকল দিক সর্ব্বতোভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা কবে যে হয়ে উঠবে তা কেউই বলতে পারে না। প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের এমন কোন চিন্তাধারা এমন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নেই যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশাল আয়তনের মধ্যে স্থান পায় নি। একসঙ্গে এত বিভিন্ন বিষয় ও ভাবের সমাবেশ একমাত্র

একজন সাহিত্যিকের একক জীবনে জগতের ইতিহাসে আর দেখা গেছে কিনা জানিনা। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে গ্রহণ করতে হলে তার সকল দিকই গ্রহণ করতে হয়—কোন দিক বাদ দিয়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার সঙ্গে সমগ্রভাবে পরিচিত হওয়া যায় না। বিশ্বকবির বহুমুখী রচনাবলীর মধ্যে মাত্র একটি দিক নিয়ে অপর দিকগুলি গৌণ বাহু ও অপ্রধান ব'লে অস্বীকার করলে তাতে শুধু কবির প্রতিই অবিচার করা হয় না—পরন্তু সাহিত্য-রসাস্বাদনের পরিপূর্ণ আনন্দ থেকে নিজেকে প্রবঞ্চিত করা হয়—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

অবশ্য একথা বললে বোধ হয় নিতান্ত একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হবে না যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি সকল প্রকারে সকল ভাবে ও সকল দিক দিয়ে চিত্রিত হলেও ধর্মভাব ও ঈশ্বরপ্রাণতা ও পরম মুক্তির ক্ষুধা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা বিশেষ দিককে অধিকার ক'রে আছে। আধুনিক যুগের অন্যসব মনীষাসম্পন্ন সাহিত্যিক ও কবিদের সঙ্গে এই খানেই রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম কারণ। সাধারণতঃ দেখা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যিকের রচনাতে ত নয়ই এমন কি শেকস্পীয়ার ইবসেন্ প্রভৃতির ন্যায় মহামনীষী সাহিত্যস্রষ্টাদের রচনাতেও মানব মনোবৃত্তির সর্ব্বোন্নত স্তর ধর্মভাব ও ঈশ্বরপ্রেম স্পষ্টভাবে স্থান পায় নি। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে সাহিত্য সৃষ্টির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ণীত হয় রসসৃষ্টির দিক থেকে। কিন্তু রসসৃষ্টি বলতে গেলে শুধু নরনারীর দৈহিক সম্বন্ধই একমাত্র বোঝাবে আর শান্তরস অথবা বিশ্বপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেমকে বোঝাবে না একথা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সাহিত্য সৃষ্টির মহাপ্রতিভা যাঁর আয়ত্তীভূত সেই মহাশক্তিশালী সাহিত্যিক যে কোন ভাব যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করে স্থায়ী-সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারেন। দৈহিক প্রবৃত্তি চরিতার্থতা, ইন্দ্রিয়বিলাস, প্রমোদলালসার ওপরেও মানব জীবনের যে আরও একটা মহত্তর সুন্দরতর উজ্জ্বলতর কল্যাণময় দিক আছে এ যেন আজকালকার অনেক সাহিত্যিক স্বীকারই করতে চাননা। ভগবান যে আছেন এবং—তিনি যে আমাদের পরম গতি, ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী পরম আশ্রয় ও পরম সুহৃৎ এ সংস্কার বর্ত্তমান শতাব্দীতে বহু সাহিত্যিকের লেখায় পাওয়া যায় না। বরং নিরীশ্বরবাদ অজ্ঞেয়বাদেরই প্রাধান্য সেখানে সেই সব রচনায় অধিকতর ভাবে দেখা যায়। কোন কোন সাহিত্যিকের লেখাতে ধর্মভাবের প্রকাশ দেখা গেলেও তা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট নয়। এই ভীষণ ধর্মহীনতার যুগে রবীন্দ্র সাহিত্যেই শুধু পাই ভগবৎবিশ্বাস, ভগবৎ প্রেম ও ভগবানকে লাভ করবার তীব্র আকুলতা। ভারতীয় ঋষিবৃন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই আমরা দেখি যে এই রক্তমাংসের দেহই মানুষের সব নয় এবং দৈহিক সুখসম্ভোগ সাধারণ মানুষের কাছে অপরিহার্য্য হলেও তা কোনমতেই প্রকৃত মানুষের কাছে চরম ও পরম সত্য ব'লে মোটেই স্বীকার্য্য নয়। মানবাত্মা জন্মহীন মৃত্যুহীন—স্বরূপ তার সত্য নিত্য শুদ্ধ ও চিরমুক্ত। মানবাত্মার

এই নির্মল নিরবচ্ছ অক্ষয় সৌন্দর্য্য ও তার অসীম মহিমার বিজয় ঘোষণা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক উজ্জ্বল অলঙ্কার।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি অথবা মনীষী মাত্রই ন'ন—পরন্তু তিনি যথার্থই একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ও ঈশ্বরপ্রেমিক। যে সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম একদা সেই পরিবারে উপনিষদের আলোচনা, বিচার ও সাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার পুণ্যচরিত্র শুদ্ধজীবন, ঈশ্বরপ্রাণতা, জনহিতৈষিতা, দানশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য সুবিখ্যাত। এই প্রকার আদর্শ পিতার পুত্ররূপে এবং উপনিষদ চর্চ্চা ও সাধনার পবিত্র প্রতিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে প্রাচীন ভারতের তপোবনের ধ্যানমৌন শান্তভাবটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার ক'রে বসেছিল। উপনিষদের সুমহান ও শাশ্বত আদর্শই রবীন্দ্রনাথের জীবনে চিরদিন ধর্ম্মভাবের প্রেরণা দিয়েছে। সেইজন্য কবি হ'লেও তাঁর ধ্যানশীলতা ও শান্তসমাহিত অন্তর্মুখী অপ্রমত্ত ভাব পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যিক ও কবিদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য প্রতিক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ধর্ম্মভাবের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে এমন এক সুমহান আদর্শের দিকে টেনেছে যে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই প্রাত্যহিক তুচ্ছতা তারল্যের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন নি। সেইজন্য "শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি"-কে মানবজীবনের একমাত্র সত্য বলে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর প্রাণ সর্ব্বদা ছুটেছিল সেই অসীম অনন্ত ভূমার সন্ধানে। তার প্রাণ কেঁদে কেঁদে ভগবানকে বলেছে—

"আজ ওই শুভ্র কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে!
দিও নাগো দিও না আর ধূলায় শুতে।"

"ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়
তুমি জান মন তোমারে চায়
অন্তরে আছে অন্তরযামী
আমা হ'তে আমায় জানিছ স্বামি
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জান মম মন তোমারে চায়"

"জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
জানিহে তুমি জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন যে আর নাহিক তোমা সম।
তবু যে ভাঙা চোরা, হৃদয়ে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।"

রবীন্দ্রনাথ রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলি গান অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরম আগ্রহ ও অনুরাগের সঙ্গে গাওয়া হয়। সেইসব গানে বহু প্রকৃত ভক্ত ও সাধক ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত হয়ে থাকেন।

"আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে," "মন্দিরে মম কে আসিল হে," "ওই যে দেখা যায় আনন্দ ধাম, অপূর্ব্ব শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়," "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা," "তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন," 'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামি,' 'সংসার যবে মন কেড়ে লয় জাগেনা যখন প্রাণ," "সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে"—প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গানগুলি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা তা অনেক ব্যক্তিই জানেন না, অথচ তাঁরা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে এই গানগুলি গেয়ে থাকেন।

ভগবানকে কবি যে ভালবাসতেন বা ভক্তি করতেন সে "শুধু নির্জ্জনধ্যানে নয়, শুধু আপনার মনে নয়, কর্ম্মে তোমায় সহজে স্বীকার করিব হে, তোমারি মহিমা যেথায় জাগ্রত রহে।" ভগবানকে ভালবাসতে গিয়ে কবি ভগবানের সন্তান মানবজাতি ও তাঁর সৃষ্টি এই সুন্দর শোভন শ্যামল বিরাট বিপুল বিশ্বকে ভুলে যান নি। সেই জন্য তাঁর প্রিয়গান—

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো।"

আজীবন তিনি ছিলেন মহাদায়িত্বপূর্ণ দেশহিতকর নানা দুঃসাধ্য ও গৌরবময় কর্ম্মে নিয়োজিত। সেই সমস্ত কর্ম্মকে তিনি ঈশ্বর-উপাসনার অন্যতম পদ্ধতি মনে ক'রে সানন্দে সুসম্পন্ন করেছেন। আর সেই কর্ম্মেরই মধ্যে তাঁর প্রাণ সর্ব্বদা অন্তরতম দেবতার পূজার জন্য অধীর আকুল হয়ে উঠেছে। সারা জীবন ভগবানকে ভালবেসেও কবি আদৌ তৃপ্তি পান নি। তাই বারে বারে তিনি গেয়েছেন,

"জীবনে যত পূজা হলো না সারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।"

তবুও ভগবানের করুণা ও প্রেমের ওপর কবির এতখানি বিশ্বাস এত অতল নির্ভরতার ভাব ছিল যে তিনি জানতেন জীবনের অবসানে ভগবান তাঁকে নিশ্চয়ই নিজের কোলে তুলে নেবেন। দেহত্যাগের চার পাঁচ দিন আগেও তাই তিনি গেয়েছিলেন—

"তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব
তোমারি কার্য্য যা সকলি সাধিব
শেষ হয়ে গেলে তুলে নিও কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব।"

"জানিহে নাথ জীবন মম বিফল কভু হবে না
ফেলিয়া দিবে না তারে বিনাশ ভয় পাথারে,
এমন দিন আসিবে যবে করুণা ভরে আপনি
ফুলের মতন তুলিয়া লভি তাহারে।"

আজ কবির মহা গৌরবময় বিচিত্র কর্মবহুল সুদীর্ঘ জীবনের শেষে তিনি প্রয়াণ করেছেন কোন অজানিত লোকে। সমস্ত স্তুতি নিন্দা প্রশংসা বিদ্বেষের পারে আজ তিনি। শুধু পড়ে আছে এখানে সুখদুঃখ হাসি অশ্রুময় স্নেহপ্রীতিভরা তাঁর মহাজীবনের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর বা বাঙালীর কী ছিলেন তা প্রকাশ করবার মতন ভাষা কোন স্বদেশপ্রাণ জাতীয়তাবাদী মহত্বকামী ভারতবাসীর আজ আদৌ নেই। এ শুধু সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবার জিনিষ।

যে কবি দেশে দেশে সমগ্র পৃথিবীতে মানব-ঐক্য মিলনমন্ত্র, বিশ্বমৈত্রীর বাণী চিরজীবন প্রচার করেছেন—বাঙলায় একদা রাখীপূর্ণিমার উৎসব প্রচলনের মূলে যাঁর প্রচেষ্টাই ছিল প্রধান, তিনি বিপুলবর্ষণমন্দ্রমুখরিত সজল শ্রাবণে রাখীপূর্ণিমার দিনেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। সেদিন সন্ধ্যার কী বিষাদ গম্ভীর দৃশ্য! আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে ক্রমশঃ রাত্রির আসন্নতা দেখা দিচ্ছে। চারিদিকে বেজে উঠছে বারে বারে শঙ্খধ্বনি—যেন কবির বিদায়বন্দনা। সেই সময় মনে হলো: কবি যেন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে ঊর্দ্ধে বহু ঊর্দ্ধে কোন অজানিত লোকের উদ্দেশে চলে যাচ্ছেন। আর তাঁর বাণী ভাষাহীন ভাষায় আকাশে বাতাসে চারিদিকে নিঃস্বর নিনাদে ধ্বনিত হয়ে উঠছে—

"উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি,
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চল তলে ঢাকি'
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী॥
যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে
যে মণি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে তাহা মিলায় দিগন্তরে।
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে।"

Vedanta and the Teachings of Jesus

Swami Abhedananda

Wherever there is a decline of religion or a rise of irreligion, the Lord manifests Himself in a human form. The Divine Being thus incarnates in flesh from age to age, wherever such incarnations are needed. These manifestations of Divinity on earth are called in Sanskrit "Avatara", which means "Incarnations of God," or "Descendants of God in a human form" Such descendants of God have appeared among many nations in the past, and will appear among the nations of the future, for God loves all nations, every individual, whether man, woman or child, equally, irrespective of his or her caste, creed or nationality His light, like the light of the sun, shines equally on the head of the every living creature on this earth, and no particular tribe or nation can claim any special favour from that God, who is infinite in love, infinite in wisdom, and omnipresent. His unbounded love and His unlimited justice can never be restrained by anything in the universe. He manifests wherever and whenever such manifestations are needed. Sometimes, perhaps, in India, sometimes in Persia, in Arabia, or in Palestine, or in some other part of the world. And no one can tell where such manifestations again may appear.

But the object of these incarnations of God is the same every where; they come to help mankind, to show to him the path of righteousness, to show how to live the Godlike life; how to realize that Divinity dwells in each individual soul, and that to follow that Divine Will in every action should be the aim of human life.

These Divine incarnations teach us how to conquer selfishness and the evils that proceed from living a life of selfishness; how to be free from that attachment to the lower self, to the things that are transient, and, above all, how to enter into the domain of blessedness, purity and love, which is everlasting and eternal.

Such incarnations of God are born with a knowledge of higher spiritual laws and truths. From childhood their eyes are open to the real nature of things. From the very first they recognize this oneness of the individual soul with the universal spirit. Before they receive instruction from outside, they realize that their real nature is truth—is one with the universal spirit of the Father in Heaven. They know that

the eternal current of Divine Will is incessantly flowing through the river of their lives, and that their physical forms are merely instruments, guided, directed and moved by the All-Knowing power of that Divine Will. They know that the utterances of their own mouths are expressions of that Divine Will. In short, they are the embodiments of purity and righteousness; the personifications of Divinity on earth ; they are those sons of God who have realized and who cannot forget their divine nature.

Such incarnations become the saviors of the world. How ? By showing the path to perfection. The exemplary lives of such incarnations are inspirations to the masses. Such is the nature of the incarnations which have appeared in India and in other places. They are worshipped in the East as Rama or Buddha or Krishna, and in the West as Christ. For we find the same incarnation of Divinity in the life of Jesus of Nazareth, that meek, gentle and self-sacrificing son of man who preached in Galilee the same truth, the same spirituality that was taught and shown in India and in other places long before his birth. He lived the characteristic simple life of the Vedantic sage, trusting always in Divine Will, without thinking of the morrow. This wonderful redeemer, Jesus the Christ, whose life and teachings have transformed the character and brought spiritual light to millions and millions of human beings, was at first surrounded by a handful of disciples, whom he taught how to live the life of blessedness ; how to live and work for others and how to die for others ; and, above all, how to be conscious of that spiritual oneness, which is the aim and end of all religions. In and through his life he taught charity, selfdenial, control of passions, renunciation, universal love, faith in God and the realization that the individual soul is one with the universal spirit. These are the principal points of his teachings

About charity, he said to his disciples : Be kind to all ; be kind to the poor especially ; give freely ; give to the poor whatever they need. "It is more blessed to give than to receive." "With what measure ye mete, it shall be meted to you again,'' etc. About self-denial, he said : "If any man would come after me, let him deny himself." "Whosoever would save his life shall lose it." "What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul ?" He showed in his life how to control passions by practising austerities, by fasting for forty days, and by other ascetic methods. He said to his disciples : "Love thy neighbour as thyself." "Love thine enemies and do good to them that hate thee." He said : have intense faith in God. About unity, he said : "I and my

father are one." "I am in the Father and the Father in me." "I am in you and you are in me." "The God of heaven is within you."

If, on the other hand, we read the sayings of other incarnations of God, such as Rama or Krishna, who flourished in India long before the birth of Jesus, we find the same teachings. In the life of Buddha, who lived about 500 years before the time of Jesus, we find the same practices of charity, self-denial, control of the passions, universal love for all, etc. In India, as it has been said, it is commonly believed that all these great incarnations of God have come and do come to re-establish forgotten truths, to point out the same truths that were discovered ages before their birth. They bring new life to the old truths ; they show how we can live up to those ideals.

If we read the teachings of the Vedantic sages who existed in prehistoric times, we find these spiritual and ethical laws summed up in three simple words :

"Once upon a time a disciple went up to a great Rishi, or seer of Truth, and asked him what he should do to become righteous. The Rishi answered in three words : Damayata, Datta, Dayaddham. The first word, "Damayata, means Subdue thyself, control thy passions, conquer the senses, pride, egotism and selfishness, The second word, 'Datta', signifies Give freely. Be liberal to the poor and the needy. Be charitable to your neighbor and to all. The third word is "Dayaddham', and means Be kind to all. Have pity and compassion for all. Love all as you love yourself."

Thus we find in the oldest teachings expressions of the highest ethical laws, of charity, self-control and universal love. And we know that these spiritual and ethical laws repeatedly have been taught and popularized by the great sages, holy men, prophets and the incarnations of God, who come not to teach anything new, but to give new life to the old sayings—to the old laws that already existed, and which are eternal. Truth is always truth, whether it is discovered to-day or was known thousands of years ago. We should understand that these incarnations did not learn these laws by reading books. They learned from the Divinity within themselves ; they went to the fountainhead of wisdom. If an incarnation of God were to come here to-day, he would teach the same truths which were taught by Jesus, by Buddha, or by any other incarnation of the past.

A disciple went to his master, a great sage who lived in India not very long ago, and asked him this question : "When Jesus was on the cross,

how could he pray for his enemies, inspite of all his sufferings and agony of death ? How could he do that ?" The master replied : "If you drive a nail through a green cocoanut, I mean through the shell of a green cocoanut, you will touch the kernel too, and will make a hole in the kernel. In a green cocoanut, you know, the kernel is attached to the shell, and by driving a nail through the shell, you drive it through the kernel too. But in a dry cocoanut the kernel becomes separated from the shell, and if you drive a nail through the shell, the kernel is not pierced. So", he said, "the ordinary men of the world are like green cocoanuts, but Jesus was like a dry cocoanut. When they pierced his body, which was the mere shell, he was not disturbed. That did not affect his soul. His inner soul was separate from his body, although living within the body ; and that is the reason why he could pray for his enemies."

Whosoever is able to free himself from the attachment of the shell or body can do the same. Vedanta points out the universal law which underlies all the actions of incarnate God.

If an incarnation of God does this thing, others will have the same power when they have attained to the same state. If Jesus cured diseases and transformed the character by a single touch, every one will do the same when he shall have attained to the same spiritual realization. Otherwise how can we account for the miracles which have been accomplished in those countries where Jesus is not accepted as the Saviour ?

Another teaching of Jesus recently have been discovered by some Oriental scholars ; "Raise the stone : there thou shalt find me. Cleave the wood : there am I." Many have tried to explain it, in different ways. It has produced a great discussion among scholars. But Vedanta says the same thing. When a great sage, or a prophet, or an incarnation of God, uses the words 'I' and 'my', he does not use it in the same sense that we do. 'I' and 'my', with him, do not signify physical form : the terms mean spirit : real nature. The Vedantic says : "I am in the sun : I am in the moon : I am in the stars : I am everywhere". He cannot mean his physical form, he means omnipresent spirit. Krishna says : "I am the original : from me proceeds everything : all the universe." And knowing this, wise men worship him with love. He also says : "Give up all the formalities of religion. Come unto me. Take thy refuge in me, and I shall make you free from the senses, the coarse nature."

How can he mean the physical form ? How could he refer to the lower self which commonly is understood by 'I' or 'my' or 'mine' ? He indicates the divine self, that higher spirit which dwells in the human

soul, and which is immortal ; which is perfect, sinless, which is one with God. If we remember this, we cannot mistake the teachings of the masters ; we can understand easily and clearly.

You will notice in the philosophy of Vedanta that it does not say that we are born sinners ; that we are sinful. On the contrary, it teaches that each individual is a child of divinity. We are children of immortal bliss. We cannot be sinners. By "Sin," Vedanta means selfishness which proceeds from ignorance of our real nature. When we forget that we are divine we become selfish. When we think that we are separate from universal spirit, from the universe, from you and from every body, then we become self-centred. All the teachings and commandments of God which we find in different scriptures, "Do not do this," or "Do this or that," are summed up in two simple sentences : Do not be selfish. Be unselfish. That selfishness vanishes when the divine wisdom comes. Divine wisdom is like a fire which burns everything into ashes. "As birds and deer do not approach a burning mountain, so sin cannot come near to the soul which has realized its true nature ; which comprehends that it is one with the universal spirit". Consequently, there is escape from sin.

Jesus said : "Ask, and it shall be given unto you." But he did not say, "I shall ask for you and you will get it." "Knock, and it shall be opened unto you." He did not say, "I shall knock for you and it shall be opened unto you." He said, "Seek, and ye shall find." So we shall have to ask, we shall have to knock, we shall have to seek. And how can we do that ? Vedanta teaches that we shall have to do it in this way : Follow the teachings of those persons who are spiritual, who are strictly moral, who live a righteous life. Follow their example in your everyday life. Try constantly to carry out your idea through your action. Control the passions, subjugate the senses, deny yourself. Endure pain and sorrow without dejection or lamentation. and have faith in the teachings of the masters. Meditate on the higher nature, which is spiritual, which is divine, which is immortal. Do not pray for this thing or that thing. Some say. "Give me this," or "Give me that." They are like beggars. You should not think of your lower self when you pray. Send a current of good thought, of love, towards all living creatures.

When the effect of these efforts is established, then comes renunciation through love, which Jesus taught. "Sell all thou hast, give to the poor, come and follow me," he said, and, according to Vedanta, that kind of renunciation is a high form of love. When a person realizes that he is a spirit, that he is divine, that he is immortal, he can give up

anything he possesses, because he finds that he does not individually possess anything. He says: "Whatever is mine is Thine: whatever is Thine is mine." Such persons are ready to give up their bodies even, if by sacrificing their bodies they can do good to the world, because they are not attached so strongly to their bodies as we are. If we have a little headache, we become miserable; if a little disappointment, we weep and wail. But he who has realized his own real nature, which is divine, which is immortal, which is free from disease and sorrow, is never miserable. If his body is pierced through and through, he laughs, and blesses the evil doer. Such instances are to be found in every country where these incarnations are manifested.

Ethically and spiritually the teachings of Jesus are in complete harmony with those of Vedanta, and the steps towards the attainment of spirituality are identical, but Jesus spoke in parables, while Vedanta affords a rational foundation for ethics and for religion. Vedanta invites all those who wants explanation; who desire to understand why we should be moral; why we should be virtuous and lead a spiritual life; Vedanta invites these and tries to help them.

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অভেদানন্দ-বিংশতিকা	শ্রীগোপী	১৮৫
২। অদ্বৈতবাদ	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ	১৮৭
৩। জীবন-কথা	স্বামী শঙ্করানন্দ	১৯২
৪। আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য	১৯৬
৫। মহারাজ সকাশে	শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল	২০৭
৬। পাণিনি	৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	২১০
৭। নিবেদন		২১৬
৮। গ্রন্থ-সমালোচনা		২১৭
৯। Ego and Egoism	Swami Abhedananda	53

সময়োপযোগী বহুবাঞ্ছিত ব্যবহারিক বই !

দেশের ভাবী আশার স্থল—ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাহিত্য সরস্বতী

তাঁর নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিকল্পনায় লিখেছেন—

ছেলেদের টিফিন

কি খাব মা, কি খাব মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে,
বাসি ভাত খাও যাদু, ঐ ঢাকা রয়েছে !

কালের গতিতে ছেলেদের ক্ষুধার খোরাক দিতে আজ আর বাসি ভাতের কথা উঠে না, এখন সেখানে এসেছে দোকানের বাসি খাবার, পচা ডিমের তৈরী কেক বিস্কুট, ইত্যাদি ! ছেলেদের হাতেই টিফিনের ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর দিনে-ডাকাতির সুযোগ দিয়েছি। এরই প্রতিকারকল্পে প্রাণশক্তিসম্পন্ন বহু বহু রুচিকর খাদ্য দেশীয় প্রথায় কত সহজে ও সুবিধায় বাড়ীতে তৈরী করা যায়, লেখিকা তাদের **কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় ও প্রস্তুতপ্রণালী** এই গ্রন্থে প্রকাশ ক'রে ছেলেদের—তথা আমাদেরও সাংসারিক জলযোগের খাদ্যধারার গতির মোড় ফিরিয়ে একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছেন।

দু'শো পাতার বই। চমৎকার ছাপা ও বাঁধাই। —দাম—১৷৽	প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা রাখা এবং প্রত্যেক মায়ের পড়া উচিত।

আমাদের নিকট ইংরাজী ও বাংলার উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক পাওয়া যায়।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা,—ফোন বি, বি ৩৮৭৫

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

	Rs.	As.	P.
Dissertation on Painting	2	8	0
Reflections on Woman.	1	4	0
Appreciation of Michael Dutt & Dinabandhu ...	0	4	0
Energy.	0	12	0
Metaphysics.	0	12	0
Mind.	0	12	0
Natural Religion.	0	12	0
Principles of Architecture.	2	8	0
Kurukshetra (An Epic in English) ...	2	8	0
Lectures on Education.	1	0	0
Status of Women.	0	8	0

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) প্রত্যেকটা	১।০
কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ	।।০
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড) ...	১৲
" " " (২য় খণ্ড) ...	১৲
সাধু চতুষ্টয়	৸০
মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১৲
শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান	।৵০
অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১।০
বৃহন্নলা (কাব্য)	১।০
ঊষা ও অনিরুদ্ধ (কাব্য)	।৴০

প্রাপ্তিস্থান—

মহেন্দ্র পাব্লিশিং কমিটি

৩নং গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্ববাণীর গ্রাহকগণের প্রতি

যাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা এখনও বাকী আছে অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

—কার্য্যাধ্যক্ষ "বিশ্ববাণী"

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৮ | সপ্তম সংখ্যা

অভেদানন্দবিংশতিকা

শ্রীগোপী

কালীপ্রসাদেন কৃতাবতারম
কালীপ্রসাদামলনামধেয়ম্।
অভেদবুদ্ধিং সুখদুঃখযুগ্মে
পাভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণস্য গুরূত্তমস্য
ভৃঙ্গায়মাণং চরণারবিন্দে।
সচ্চিন্মরন্দং মধুরং পিবন্ত—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

বিশিষ্টমষ্টাদশহায়নেঽপি
বৈরাগ্যচিন্তাকুলিতান্তরস্থম্।
স্বায়ুঃক্ষয়েনিষ্ফল আত্মদুঃখ –
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

দেবীশ্চ দেবান্ স্বগুরোঃ প্রসাদাৎ
সংবীক্ষ্য চাত্যদ্ভুতবিশ্বরূপে।
অথাগুণব্রহ্মণি সম্প্রতিষ্ঠ—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

সঙ্গাজ্জগৎপ্রাণদরামকৃষ্ণ
দেবস্য সন্দীপ্তবিরক্তিদীপম্।
বিদ্যার্থিভাবেঽপি সমাপ্তবিদ্য—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্॥

অনন্তরং শ্রীভগবৎপ্রসাদা—
দাসাদ্য দেশং ভজনানুকূলম্।
কালং নয়ন্তং তপসা যতীন্দ্র —
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্॥

স্বপূর্বজন্মাশ্রিতযোগচর্য্যাং
সম্পূর্ণতাং নেতুমিহাবতীর্ণম্।
ভাবং বহন্তং বসুদেবসূনো—
রভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্॥

অথাযথাচার্য্যবরস্য লীলা—
সহায়ভূতাং তনুবাঙ্‌মনোভিঃ।
শুশ্রূষমাণং ধৃতভক্তিভাব—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

"ন তে পুনর্জন্ম কদাপি সম্ভবে
ন্নিলীয়সে চিন্ময়সী"তি বাক্যম্।
স্বদেশিকেনাখিলচক্ষুষোক্ত—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্॥

শ্রীরামকৃষ্ণস্য চ মাতৃদেব্যাঃ
স্তোত্রং বিনির্মায় নিতান্তরম্যম্।
স্বরান্ সুধানিষ্যন্দিতাং নয়ন্ত—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

শ্রীসারদায়াঃ স্তুতিতোষিতায়া—
"ত্বদাননে নৃত্যতু ভারতী"তি।
লব্ধাশিষং সৎকবিকোকিলং তং—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

তপো বদর্যাদিষু তীর্থযাত্রাং
কাশীপ্রয়াগাদিষু সাধয়ন্তম্ ।
পুনানমাসেতু হিমাদ্রিদেশ—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

অথাঙ্গলক্ষৌণিতলং বিবেকা—
নন্দস্য নির্দেশত এব গত্বা।
নিনাদয়ন্তং নিগমান্তশঙ্খ—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

অনন্তরং ভৌতিক ভোগতপ্ত—
মামেরিকাদেশমবাপ্য কামম্ ।
বর্ষন্তমাধ্যাত্মিকসূক্তিধারা—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

বেদান্তসঙ্ঘৌ নগরদ্বয়েঽত্র
সংস্থাপ্য বর্ষৈর্বহুভিঃ শ্রমেণ।
প্রজ্বালয়ন্তং পরমাত্মবোধ—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রমসঙ্ঘদেহে
তৎসঙ্ঘনেত্রা নিহিত স্বভারম্ ।
প্রবাহয়ন্তং নবজীবশক্তি—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

সংস্থাপ্য বেদান্তমঠে বিশিষ্ট
স্থলদ্বয়ে পাবন ভারতোর্ব্যাম্ ।
সনাতনং তত্ত্বমুদীরয়ন্ত—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ॥

মন্ত্রোপদেশৈরথ ভারতানাং
পাশ্চাত্যদিঙ্মণ্ডলবাসিনাং চ।
সংন্যাস চর্যা পথনায়কাগ্র্য—
মভেদদেবং গুরুমাশ্রয়েঽহম্ ।

যতিনো গৃহিণশ্চ মন্ত্রদানৈঃ
কৃতিনঃ কর্তুমহো ! কৃতপ্রযত্নম্ ।
প্রণয়ৈকনিধিং প্রশান্তরম্যং
প্রণমামঃ স্বতরামভেদদেবম্ ॥

সমস্ত্রৈশ্চরিতৈঃ শুভৈ রচনয়া গ্রন্থপ্রকাণ্ডব্রজ
স্যাত্যন্তোজ্জ্বলয়া বিচার কলয়া সম্ভাষণৈঃ সুন্দরৈঃ।
তত্ত্বজ্ঞোগ্যপথেষু নম্রজনতাং সঞ্চার্য্য সচ্চিৎপদং
সম্প্রাপ্তং যতিনায়কোত্তমমভেদানন্দমারাধয়ে ॥

অদ্বৈতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

ঐতরেয়োপনিষৎ :—

(ক) "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎকিংচন
মিষৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।" ১।১

অর্থাৎ "এই সব অগ্রে একই আত্মা ছিল। অন্য কিছু "মিষৎ" অর্থাৎ সক্রিয় অর্থাৎ ব্যাপারবৎ ছিল না। তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন—আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব।" এস্থলে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'একই আত্মা ছিল' বলায় এক অদ্বৈতেরই কথা বলা হইল।

যদি বলা হয়—"আর কিছু ক্রিয়াশীল বা সক্রিয়বস্তু ছিল না" এই কথায় নিষ্ক্রিয় বস্তু, যথা কণাদমতের পরমাণু বা সাংখ্যমতের প্রকৃতি, ইহারা ছিল—ইহা ত সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলই আত্মা ছিল, সুতরাং অদ্বৈতবস্তু ছিল—একথা সঙ্গত হয় না। "সক্রিয় অন্য কিছু ছিল না" এই নিষেধ সক্রিয়স্বরূপ বিশেষণেই প্রযুক্ত হইবার কথা; সুতরাং নিষ্ক্রিয়রূপ বিশেষ্য 'অন্য কিছুতে" প্রযুক্ত হওয়া সঙ্গত নহে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অন্য কিছু ছিল না এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। যেমন 'নীল ঘট নাই' বলিলে নীলবর্ণরূপ বিশেষণেই বাধা হয়, ঘটরূপ বিশেষ্যে বাধা হয় না। অর্থাৎ লাল ঘট থাকিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা হয় না। এস্থলেও তদ্রূপ সক্রিয় বস্তুরই নিষেধ হইল, নিষ্ক্রিয় পরমাণু বা প্রকৃতির ত নিষেধ হইল না, সুতরাং এই শ্রুতির দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—একথাও সঙ্গত নহে; কারণ, বিশিষ্টবিষয়ক নিষেধের নিয়ম এই যে, যদি বিশেষ্যের নিষেধে বাধা থাকে, তবে বিশেষণ নিষেধ স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ নীল ঘট নাই বলিলে লাল ঘটের নিষেধ হয় না, অর্থাৎ লাল ঘট থাকিতে পারে বলা হয়, কেবল নীল ঘটেরই নিষেধ হয়, যদি বিশেষ্য "ঘটের" নিষেধে কোন বাধা না থাকে। অর্থাৎ যেখানে লাল কাল নানারূপ ঘট আছে বলিয়া জানা থাকে, অর্থাৎ ঘটসামান্য নিষেধে বাধা থাকে, সেখানে 'নীল ঘট নাই' বলিলে কেবল নীলবর্ণের ঘটের নিষেধ হয়, অর্থাৎ বিশেষণেরই নিষেধ হয় বলা হয়। কিন্তু যদি লাল কাল ঘট আছে বলিয়া জানা না থাকে, অর্থাৎ ঘটসামান্যনিষেধে যদি বাধা না থাকে, তাহা হইলে নীল ঘট নাই বলিলে কোন ঘটই নাই বুঝাইতে কোন বাধা হয় না, অর্থাৎ বিশিষ্টনিষেধে বিশেষ্যবিশেষণ উভয়েরই নিষেধ হয়। প্রকৃতস্থলে, প্রথমে বলা হইল "এই সব পূর্ব্বে একই আত্মা ছিল।" এতদ্বারা এক আত্মাভিন্ন আর কিছুই

ছিল না, অর্থাৎ সামান্যভাবে আত্মভিন্নের নিষেধ করা হইল—ইহাই বলা হইল। তাহার পর বলা হইল "অন্য কিছু সক্রিয় ছিল না।" এখানে "অন্য কিছু" বিশেষ্য হইল, এবং "সক্রিয়ত্ব" বিশেষণ হইল। এখন যদি "ছিল না" এই নিষেধদ্বারা কেবল বিশেষণ সক্রিয়ত্বের নিষেধ করা যায়, সুতরাং "নিষ্ক্রিয় কিছু ছিল"—বলা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে, কারণ, সেখানে "একই আত্মা ছিল" বলিয়া "অন্য কিছু" রূপ বিশেষ্যের নিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সকলরূপ বিশিষ্টেরই নিষেধ করা হইয়াছে। বিশেষ্যনিষেধে বাধা দেওয়া হয় নাই। অতএব এস্থলে "ছিল না" এই নিষেধটী বিশিষ্ট-নিষেধে বাধাপ্রযুক্ত কেবল বিশেষণের নিষেধ নহে, কিন্তু বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়েরই নিষেধ হইল, অর্থাৎ "নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" বাক্যে অন্য কিছু, কি সক্রিয়, কি নিষ্ক্রিয়, আত্মভিন্ন কিছুই ছিল না, ইহাই বলা হইল। ইহাই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, যথা—

"ন অন্যৎ কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি, মিষৎ……ব্যাপারবদ্-ইতরদ্ বা যথা সাংখ্যানাম্ অনাত্মপক্ষপাতি স্বতন্ত্রংপ্রধানম্, যথাচ কাণাদানাম্ অণবঃ, ন তদ্বদ্ ইহ অন্যৎ আত্মনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে। কিং তর্হি? আত্মা এব এক আসীৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ।"

অর্থাৎ "ন অন্যৎ কিঞ্চন" অন্য কিছুই ছিল না, "মিষৎ" অর্থ—নিমেষক্রিয়াযুক্ত অর্থাৎ ব্যাপারযুক্ত অর্থাৎ তদ্ভিন্ন (কিছুই ছিল না), যেমন সাংখ্যগণের অনাত্মপক্ষপাতি স্বতন্ত্র প্রধান, এবং যেমন কণাদমতাবলম্বিগণের অণু সকল, নিষ্ক্রিয়, তদ্বৎ এখানে আত্মভিন্ন অন্য কোন বস্তুই ছিল না। তবে কি ছিল? উত্তর একআত্মাই ছিল—ইহাই অভিপ্রায়।"

সুতরাং এই সকল পূর্ব্বে একই আত্মা ছিল, অন্য কিছু সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কিছুই ছিল না—ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। অতএব এতদ্দ্বারা এক অদ্বৈততত্ত্বই উপদিষ্ট হইল বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়, তাহা হইলে 'অন্য কিছু' এই বিশেষ্য পদে "মিষৎ" অর্থাৎ ব্যাপারবদ্ এই বিশেষণটী দিবার কি প্রয়োজন ছিল? অর্থাৎ "আত্মা বা ইদমেবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন" এই পর্য্যন্তই বলিলেই ত হইত? অর্থাৎ মিষৎ পদের ব্যর্থতাপত্তিই হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এস্থলে "মিষৎ" পদটী ব্যর্থ হয় নাই। কারণ "এ সব পূর্ব্বে একই আত্মা ছিল" বলিলে আত্মাকে অপ্রত্যক্ষ নিষ্ক্রিয় বস্তু বলিয়াই জ্ঞান হইবে; কারণ, বিশুদ্ধ এক বস্তুতে কোন ক্রিয়াই সম্ভবপর হয় না, আর ক্রিয়া না থাকিলে প্রায় প্রত্যক্ষও হয় না। এখন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টরূপ সক্রিয় বস্তুগুলি না থাকিলে আত্মার ন্যায় অপ্রত্যক্ষ নিষ্ক্রিয় বস্তু, যথা পরমাণু প্রধান প্রভৃতি, তাহারা ত থাকিতে পারিবে, তাহাদের ত নিষেধ করা হইল না এইরূপ একটা সংশয় থাকিতে পারিবে। এজন্য সেই নিষ্ক্রিয় বস্তুগুলির নিষেধ করিবার নিমিত্ত "মিষৎ" বিশেষণটী গৃহীত হইয়াছে। আর আত্মা যে নিষ্ক্রিয় তাহা "স ঈক্ষত" এই পরবর্ত্তী বাক্য হইতেও মনে উদয় হইবে। কারণ, ঈক্ষণ ক্রিয়ার

পূর্ব্বে আত্মার ঈক্ষণ ছিল না, বলিতে হইবে, আর তজ্জন্য আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়াই মনে হইবে। অতএব "মিষৎ" পদটী ব্যর্থ বিশেষণ নহে।

অথবা "মিষৎ" পদের সার্থকতা অন্য প্রকারে প্রদর্শন করিতে পারা যায়, যথা—মিষৎ অর্থ ক্রিয়াশীল বা ব্যাপারবৎ। আত্মা ভিন্ন কিছু সবই ক্রিয়াশীল। পরমাণু প্রকৃতি যাহা কিছু সকলই ক্রিয়াশীল। কারণ, তাহারা পরিবর্ত্তনশীল, তাহারা কখন একরূপ থাকে না। আর যাহা সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তনশীল বা সক্রিয়, তাহা কখনও নিষ্ক্রিয় সম্পূর্ণভাবে হয় না। নিষ্ক্রিয় হইলে তাহাতে ক্রিয়ার আবির্ভাব হইতে পারে না। যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল তাহার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। এজন্য তাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা। অন্য কিছুকে মিষৎ পদদ্বারা বিশেষিত করায় আত্মভিন্ন যাহা কিছু সবই মিথ্যা—ইহা বলাই মিষৎ পদের উদ্দেশ্য।

যদি বলা যায়—পরমাণুবাদীর মতে ত পরমাণু ক্রিয়াশীল নহে, এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতিও সাম্যাবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে? সুতরাং তাহাদিগকে সক্রিয় বলিলে সঙ্গত হয় না। কিন্তু একথাও অসঙ্গত।—কারণ যাহা স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়, তাহাতে ক্রিয়া জন্মিতে পারে না। পরমাণু যদি ঈশ্বরেচ্ছায় মিলিত হইয়া ক্রমে সক্রিয় হয়, তাহা হইলে সেই সক্রিয়ত্ব ধর্ম্ম তাহাতে অব্যক্ত ছিল, বলিতেই হইবে। তাহা না হইলে পরমাণুজন্য ঘটাদির পরিবর্ত্তন হইতে পারিত না। তদ্ব্যতীত পাকে পার্থিব পরমাণুর রূপাদির পরিবর্ত্তনও সম্ভব হইত। আর এই "রূপ" পরিবর্ত্তন হয়, অথচ পরমাণুর পরিবর্ত্তন হয় না—বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে সেই পরমাণুকে নীরূপ এক সময় বলিতে হয়। কিন্তু নীরূপ পরমাণু ত স্বীকার করা হয় না। অতএব পরমাণুরও পরিবর্ত্তনরূপ ক্রিয়া আছে। তদ্রূপ প্রকৃতিও সাম্যাবস্থায় ক্রিয়াশীল থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপে মিষৎ পদদ্বারা আত্মভিন্ন সবই ক্রিয়াশীল বলিবার জন্য মিষৎ পদের গ্রহণ বলা যায়।

তাহার পর এস্থলে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এস্থলে "এক এব" অর্থাৎ "একই" বলা হইয়াছে। "এক আত্মা এব" এভাবে একারের প্রয়োগ নাই, সুতরাং "এক আত্মাই ছিলেন" এরূপ না বলিয়া "একই আত্মা ছিলেন" বলা হইল। ইহাতে আত্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না—ইহাও বলা হইয়াছে। "নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" এই পরবর্ত্তী বাক্যটী তাহারই বিস্তার। আর "এক আত্মাই ছিলেন" বলিলে আত্মত্বজাতিবিশিষ্ট বহু আত্মা স্বীকারের সম্ভাবনা হইত, কিন্তু "আত্মা একই ছিলেন" বলিলে এক আত্মা ছিলেন ও আত্মভিন্ন কিছুই ছিল না—আত্মত্বজাতিমান্ আত্মারও নিষেধ হইল—ইহাও বলা হইল। "নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" বাক্যটী "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" বাক্যের বিস্তার বলিয়া মিষৎ পদে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয়ই গ্রহণ করা আরও সঙ্গত হইল।

যদি বলা যায়—পরবর্ত্তী বাক্যটীকে পূর্ব্ব বাক্যের বিস্তার কেন বলিবে? তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্ব বাক্যটী বিধিপর বাক্য এবং পর বাক্যটী নিষেধপর বাক্য বলিয়াই পরবর্ত্তী

বাক্যকে পূর্ববাক্যের বিস্তাররূপ বলা যায়। দুটীই বিধিপর বা নিষেধপর হইলে তাহা হইতে পারিত না বটে। অতএব ঐ শ্রুতির দ্বারা এক অদ্বৈত তত্ত্বেরই উপদেশ প্রদত্ত হইল বলা যায়।

যদি বলা হয় এস্থলে যখন "আসীৎ" অর্থাৎ ছিলেন বলা হইল, তখন সৃষ্টির পর তাঁহার বিকৃতি ঘটিয়াছে, এখন আর তিনি আত্মা নাই ইহাই বলিতে হইবে? এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, না, তাহা নহে, কারণ পরবর্ত্তী বাক্যে তিনি ক্রমে ক্রমে বহু প্রকার সৃষ্টি করিতেছেন বলা হইয়াছে। যথা—

স ইমান্ লোকান্ অসৃজত **।২।

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্ নু সৃজা ইতি **।৩।

অর্থাৎ "তিনি (আলোচনা করিবার পর) এই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন *২। তিনি ভাবিলেন এই যে লোক সকল আমি সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমুদয়ের রক্ষার্থ লোকপাল সৃষ্টি করিব **।৩।" অতএব সৃষ্টির পর তিনি অবিকৃতই, ছিলেন, আর তজ্জন্যই সৃষ্টি মিথ্যা। অর্থাৎ আমাদের মনঃকল্পনার সৃষ্টিতেও যেমন আমরা অবিকৃত থাকি, তদ্বৎ তিনি অবিকৃতই আছেন বলিয়া আমাদের কল্পিত সৃষ্টির ন্যায় ইহা মিথ্যা।

যদি বলা যায়—তিনি যখন সত্যসঙ্কল্প তখন তাঁহার সৃষ্টি সত্যই হইবে? তাহা হইলে বলিব—তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার মত সত্য না হওয়ায়, তাঁহার তুলনায় মিথ্যাই হইবে। স্বপ্নে যেমন আমাদের সৃষ্টি সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও স্বপ্নসৃষ্ট বস্তু আমার ন্যায় সত্য নহে বলিয়া আমরা তাহাকে মিথ্যা বলি, এস্থলেও সত্যসঙ্কল্প আত্মার সৃষ্টি মিথ্যা হইবে। সত্য আর আপেক্ষিক সত্য একরূপ সত্য নয়, এজন্য আপেক্ষিক সত্যকে মিথ্যা বলা হয়।

যদি বলা হয়—স্বপ্নদর্শনেও যে ভয়হর্ষাদি বিকার হয়, তাহা জাগ্রতেও ত থাকে। অতএব তাহা মিথ্যা কেন? তাহা হইলে বলিব—স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় যে মিথ্যা, তাহা ত তখনও স্বীকার করা হয়। জাগ্রতে স্বপ্নদর্শনের ফল থাকে, স্বপ্নটী ত থাকে না। অতএব স্বপ্নদৃষ্টবিষয় মিথ্যাই হয়।

যদি বলা হয়—আত্মা যে সৃষ্টি করেন, তাহা তাঁহার এক দেশ বিকৃত করিয়া করেন, অতএব সৃষ্টি সত্যই বলিব? কিন্তু তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, এক দেশ বিকৃত হইলে, সে দেশ অন্য দেশ হইতে ভিন্নই বলিতে হইবে, আর তজ্জন্য সেই বিকারযোগ্য দেশকে আর আত্মা বলা চলে না। এই সকল কারণে আত্মা স্বস্বরূপে থাকিয়া যখন জীবজগতে পরিণত হয় তখন, এক আত্মাই সত্য আর এই জীবজগত মিথ্যা। এইরূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা হয়—"এই সব পূর্ব্বে একই আত্মা ছিল" বলায় কালের সত্তা ত স্বীকার করা হইল? এবং "তিনি আলোচনা করিলেন" বলায় তাঁহার আলোচনার জন্য কিছু ত ছিল বলিতেই হইবে? এইরূপে কাল থাকায় দ্বৈতাপত্তি হয়, এবং অন্তঃকরণ থাকায় তাঁহার

স্বগতভেদও স্বীকার করিতে হয়? অতএব দ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদই সিদ্ধ হয়, অদ্বৈত কি করিয়া সিদ্ধ হয়? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সৃষ্টিই যখন মিথ্যা স্বীকার করা আবশ্যক হইতেছে, তখন এই কাল এবং এই অন্তঃকরণ, উভয়ই মিথ্যা হইতেছে। কাল কেহ দেখে না, কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা হয়, এই কার্য্য যখন অচিন্ত্য মিথ্যা মায়া শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন তাহা স্বীকার করিয়া এবং অন্তঃকরণ স্বীকার করিয়া স্বগত-ভেদ স্বীকারের আবশ্যকতা কি? স্বপ্নে কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সবই উৎপন্ন হয়। এই মায়াশক্তি "সদসদ্‌ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়া!" বলিয়া মিথ্যা বলা হয়। ইহাকে আছে বলিলে দোষ, না বলিলেও দোষ।

বস্তুতঃ অন্য শ্রুতিতে তাহার যে মন নাই, তাহা বলাই হইয়াছে, যথা—"অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাগ্ অমনঃ" (বৃঃ ৩।৮।৮) অর্থাৎ তাহার চক্ষু নাই, শ্রোত্র নাই, বাক্ নাই, মন নাই" ইত্যাদি ব্রহ্মোপনিষদে "স্বয়ম্ অমনস্কম্ অশ্রোত্রম্ অপাণিপাদম্" বাক্যে ব্রহ্ম মনঃশূন্য বলাই হইয়াছে।

তাহার পর মনেরও উৎপত্তিও কথিত হইয়াছে যথা—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী॥" কৈবল্য ১।১৫

অতএব এই অন্তঃকরণ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করা যায় না। আর ক্রিয়ার দ্বারা কাল অনুমেয় বলিয়া এবং সেই ক্রিয়া মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া কাল নামক কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদও স্বীকার করা যায় না।

বস্তুতঃ শ্রুতিতেও ইহাকে এইরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সে সকল শ্রুতি জগন্মিথ্যাত্ব প্রকরণে প্রদর্শিত হইবে। অতএব এই শ্রুতিদ্বারা সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

জীবন-কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামী শঙ্করানন্দ

নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি—নরেন্দ্রনাথের kidney trouble ছিল এবং মধ্যে মধ্যে তিনি gall stoneএর ব্যথায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেন। কালীপ্রসাদ, শরৎ প্রভৃতি সকলে তখন তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার ব্যথার উপশম করিবার চেষ্টা করিতেন। এই শারীরিক যন্ত্রণা হইতে মনকে উচ্চ স্তরে রাখিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন ও গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন।

একদিন কাশীপুরের বাগান বাড়ীর নীচের হলঘরে তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া ধ্যান করিতেছিলেন এবং দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অখণ্ড ব্রহ্মে মন স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই ভাবে চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মন ব্রহ্মে একাগ্র হইয়া নিবিকল্প অবস্থায় পৌঁছিয়া নিরোধ সমাধিতে মগ্ন হইয়া রহিল। তখন বাহ্যজগৎ ও দেহজ্ঞান লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে মন ডুবিয়া গেল। এই অবস্থায় অল্পক্ষণ থাকিবার পর তাঁহার মন নীচে নামিয়া আসিল। তৎপর বার বার চেষ্টা ও ধ্যান করিয়াও ঐ অবস্থা আনিতে পারেন নাই। তখন নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি যাহাতে সেই আনন্দ-সাগরে সর্ব্বদা থাকিতে পারি দয়া করিয়া তাহা করিয়া দিন।" শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া কালীপ্রসাদ শরৎ প্রভৃতির সম্মুখে বলিলেন, "এখন না পরে হবে"। নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া জিদ্‌ করিতে লাগিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন "আমার আর কিছুই ভাল লাগে না—সর্বদা সেই নিবিকল্প অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা হয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"সে ঘরের চাবী আমার হাতে, তুই এখন আমার কাজ কর, পরে সময় হইলে আমি চাবি খুলিয়া দিব। তখন তুই নিজ স্বরূপ জান্‌তে পেরে এই দেহটাকে "থু" করে ফেলে দিবি। এখন আমার কাজ কর।" নরেন চুপ হইয়া ঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

এই উপলব্ধির পর নরেন্দ্রনাথ দুইটী গান রচনা করেন। "নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি" এবং "এক রূপ অরূপ নাম বরণ" তিনি এই দুইটী গান তাঁহার দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠে গাহিয়া সকলকে আনন্দ দিয়াছিলেন।

গায়ত্রীর আবাহন শ্রবণ—একদিন নরেন্দ্রনাথ কালীপ্রসাদ শরৎ প্রভৃতিকে বলিলেন "আমি ধ্যান করিতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম অনন্ত আকাশে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে এবং এক বৃদ্ধ ঋষি শূন্যময় পৃথিবীর বক্ষে দাঁড়াইয়া পূরবী রাগে গাহিতেছেন "আয়াহি বরদে

দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী, গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।" তিনি যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সঙ্গিগণকে গাহিয়া শুনাইতেন। কালীপ্রসাদের সেই স্বর এত ভাল লাগিয়াছিল যে তিনি তাহার হুবহু অনুকরণ করিতে পারিতেন। সেই জন্য সিষ্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে স্বামিজীর ঐ আবাহন মন্ত্র একমাত্র অভেদানন্দ ঠিক ঠিক অনুকরণ করিতে পারিতেন।

বুদ্ধচরিত—কাশীপুরের বাগানে কালীপ্রসাদ, শরৎ সকলে নরেন্দ্রনাথের সহিত সকল ধর্মের এবং সকল অবতারের বিষয় আলোচনা করিতেন। বুদ্ধদেব কি প্রচার করিয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য, ব্রাহ্ম সমাজের সাধু অঘোরনাথ প্রণীত বুদ্ধচরিত তাঁহারা পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ, তারক ও কালীপ্রসাদ বুদ্ধদেবের ত্যাগ ও কঠোর তপস্যার কথা আলোচনা করিয়া বিহ্বল হইয়া যাইতেন। ইহাতে ললিতবিস্তারের যে সকল কথা উদ্ধৃত ছিল তাহা কালীপ্রসাদ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই গুলির মধ্যে বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সবচেয়ে অধিক হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল এবং যখন আবৃত্তি করিতে থাকিতেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"

তখন তাঁহার মন সেই অপূর্ব কঠোর তপস্যার চিত্রের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিত। এই শ্লোকটী তাঁহার মুখে সর্বদা লাগিয়া থাকিত। এইভাবে শ্রীবুদ্ধের জীবনী আলোচনা করিতে থাকায় তাঁহাদের তিনজনেরই শ্রীবুদ্ধের তপস্যার স্থান দেখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল।

বুদ্ধগয়া—তাঁহারা এই চিন্তায় দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন অবশেষে বুদ্ধগয়া যাওয়াই স্থির হইল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার স্বহস্ত লিখিত অপ্রকাশিত জীবনচরিতে লিখিয়াছেন "১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে একদিন নরেন, তারক ও আমি কলিকাতা হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে কাশীপুরের বাগানে আসিলাম। আসিবার পথে শ্রীবুদ্ধের জীবনী আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় কাশীপুরের বাগানে আসিয়া আমাদের বুদ্ধগয়া দেখিবার ইচ্ছা এত বলবতী হইল যে আমরা আর থাকিতে পারিলাম না। তখন নরেন বলিল 'চল আমরা কাহাকেও কিছু না বলিয়া বুদ্ধগয়া দেখিতে চলিয়া যাই।' নরেন তখনি তিনজনের রেল ভাড়া যোগাড় করিয়া প্রস্তুত হইল। আমরাও গেরুয়া, কৌপীন, বহির্বাস ও একখানি কম্বল লইয়া প্রস্তুত হইলাম। বরাহনগরে খেয়াপার হইয়া বালির দিকে চলিলাম। রাস্তার ধারে একটী মুদির দোকানের দাওয়ায় রাত্রি কাটাইলাম। অতি প্রত্যূষে বালি ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া পরদিন আমরা গয়াক্ষেত্রে পৌঁছিলাম। গয়াধামে দর্শনাদি

করিয়া বুদ্ধগয়া পদব্রজে চলিলাম। তথায় ৮ই বা ৯ই এপ্রিল, শ্রীবুদ্ধদেবের মন্দিরে তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত মূর্তি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। সন্ধ্যার পর আমরা মন্দিরের পশ্চাৎভাগে যথায় বোধিদ্রুম ছিল, তথায় বসিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলাম। শ্রীবুদ্ধদেব যথায় বসিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন সেই বজ্রাসনে সম্রাট অশোক এক প্রস্তর নির্মিত বেদী করাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই বেদীর উপর বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তারক ও আমি বোধিদ্রুমের পাদদেশে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলাম। এইরূপে শ্রীবুদ্ধের ভাবে তন্ময় হইয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যানে অতিবাহিত হইল। প্রত্যুষে আমরা সকলে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া আবার ধ্যানে বসিলাম। নরেন্দ্রনাথের বাম পার্শ্বে আমি এবং আমার বাম পার্শ্বে তারক বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন।

"ধ্যান সমাপনান্তে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন 'বেদীর উপর বুদ্ধমূর্তি হইতে তোমার পার্শ্বে তারকদাদার দিক দিয়া একটী জ্যোতিঃ pass করিয়া গেল। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে স্বামী শিবানন্দ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য ঘটনার বিপরীত ও অতিরঞ্জিত।) কিন্তু আমরা (আমি ও তারক) ঐ জ্যোতিঃ সম্বন্ধে কিছুই অনুভব করি নাই। তথাপি আমার ভিতরে শান্তির স্রোত বহিতেছিল।".

সেইদিন তাঁহারা ফল্গুনদীতে (বুদ্ধচরিতে নিরঞ্জনা নদী) স্নান করিয়া বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সকল দর্শন করিয়া গ্রাম হইতে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তখনও ভারী শীত এবং শীতবস্ত্র না থাকাতে রাত্রিতে তাঁহাদের আর নিদ্রা হয় নাই। সেই দেশের মড়ুয়ার রুটী নরেন্দ্রনাথের পেটে সহ্য না হওয়াতে তাঁহার Diarrhœaর মত হইয়াছিল। ঘন ঘন বাহ্য হইতে লাগিল। তারক ও কালীপ্রসাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং নরেন্দ্রনাথের আরোগ্য কামনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি অবসানে নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হইলেন—তখন তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে এখানে থাকিয়া মড়ুয়ার রুটী আহার করিলে সকলের পেটের অসুখ হইবে; সুতরাং এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাহাদের হাতে এমন পয়সা নাই যে রেল ভাড়া দিয়া যাইতে পারেন। তিন জনই অল্পবয়স্ক—তাঁহারা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এখন কি করা যায়।

ইতিপূর্বে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে ফল্গুনদীর অপর পারে বুদ্ধগয়ার মোহন্ত হিন্দু দশনামী সন্ন্যাসী, তিনি খুব উদারচেতা ও সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁহারা তখন সেই মোহন্তের নিকট গমন করাই স্থির করিলেন এবং ভাবিলেন নরেন্দ্রনাথ যদি মোহন্তকে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরের দ্বারা আকৃষ্ট করিতে পারেন তবে হয়ত তাঁহাদের পাথেয়ও জুটিয়া যাইতে পারে। এই সংকল্প করিয়া তাঁহারা ফল্গুনদীর বালির চড়ার উপর দিয়া হাটিতে লাগিলেন। সকাল বেলা—ফল্গুনদীর বালি তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা তাহাতে খালি পায়ে হাটা খুবই কঠিন। তাঁহারা সেই শীতকালের ঠাণ্ডা বালির উপর দিয়া নগ্নপদে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ

অতিক্রম করিয়া পরপারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের কোমল পদ সেই শীতের ঠাণ্ডা বালিতে যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহারা পদে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে পদব্রজে গমন করিয়া তাঁহারা মঠে উপস্থিত হইলেন এবং মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেখানকার সাধুরা তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত থাকিতে স্থান দিলেন এবং পঙ্কতে (পংক্তি ভোজনে) নিমন্ত্রণ করিল।

তাঁহারা মঠটী ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ইহা ফল্গুনদীর তীরের উপর অতি রমনীয় স্থানে অবস্থিত। চারিদিক খোলা এবং অত্যন্ত নির্জ্জন। তথায় দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি আখ্যা ধারী বহু সন্ন্যাসী থাকেন। তাঁহারা মঠের বৃহৎ জমিদারিতে চাষ আবাদাদি কৃষি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। এই বিরাট ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। মঠ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও জ্ঞানই ছিল না। সে যাহা হউক, মধ্যাহ্ন সময়ে পংক্তি ভোজনের পূর্ব্বে তাঁহারা আহূত হইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিতে এই দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "তখন একজন সন্ন্যাসী সাধু তারস্বরে চীৎকার করিয়া তিনবার "পঙ্গতকি হরিহর মহাপুরুখো" * বলিয়া সকল সাধুদিগকে আহ্বান করিলেন। ইহাই তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টার ন্যায় ছিল। ঐ আহ্বান শব্দ শ্রবণ করিয়া যাঁহারা ক্ষেতে আবাদ করিতেছিলেন এবং যাঁহারা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা সকলে মঠের ভোজনাগারে সমবেত হইলেন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে এক পার্শ্বে বসিয়া পলাশ পাতায় রুটি, ডাল, ও মিষ্টান্ন তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলাম। তৎপর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে ওদেশে সাধু মাত্রকেই "মহাপুরুষ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। কারণ তাঁহারা সংসার ত্যাগী। তখন হইতে আমরা পরস্পরকে "মহাপুরুষ" বলিয়া আহ্বান করিতে শিখিলাম। তৎপরে যখন আমরা কাশীপুরের বাগানে ফিরিয়া আসিলাম তখন মধ্যাহ্নে বা সায়াহ্নে ভোজনের সময় সেই পঙ্গত কি হরিহর মহাপুরুখো বলিয়া সকলকে আহ্বান করিতাম এবং যখন যে কেহ আহার করিতে আসিত তখন সকলে মিলিয়া বলিতাম, এইযে মহাপুরুষ আসুন। এইরূপে স্বামী শিবানন্দ (তারকদাদা আমাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া) মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।"

সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মোহন্ত মহারাজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নরেন্দ্রনাথ তানপুরা লইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। মোহন্ত মহারাজ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া একাগ্র চিত্তে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠের স্বরলহরী যেন সুধাকরের ন্যায় পান করিতে লাগিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে যখন জানিতে পারিলেন তাঁহাদের পাথেয় নাই; তখন তিনি পাথেয় স্বরূপ কিছু অর্থ নরেন্দ্রের হাতে দিয়া দিলেন।

* ওদেশে 'ষ'কে 'খ'র মত উচ্চারণ করিয়া থাকে। সঃ

তাঁহাদের মন তখন গয়া হইতে উধাও হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট চলিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে হওয়ায় তাঁহাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট ও অনুশোচনা উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি না লইয়া তাঁহার অসুখের সময় এইভাবে কিছু না বলিয়া আসা যে মহা অন্যায় হইয়াছে এই কথা তাঁহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইহার উপর নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখ—অল্প বয়স কোথায় গেলে যে সাহায্য পাইবেন তাহা জানেন না। কলিকাতায় যাইবার পুরা ভাড়া নাই। সকলেই তখন কলিকাতায় চলিয়া যাওয়াই উচিত ইহাই স্থির করিলেন। তাঁহারা মোহন্তের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় নিরঞ্জনা নদী পার হইয়া গয়াধামে উমেশ বাবু নামক এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। সেখানে নরেন্দ্রনাথ দুর্বল শরীর থাকা সত্ত্বেও দেব দুর্লভ কণ্ঠে গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। উমেশবাবু তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত থাকিতে দিয়াছিলেন। তৎপর দিবস বিদায়ের সময় উমেশবাবু তাঁহাদের পাথেয় কিছু কম পড়িয়াছে জানিয়া ভাড়ার টাকা পুরণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা গাড়ীতে আরোহন করিয়া সন্ধ্যার সময় কাশীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথের জন্য অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি মহানন্দিত হইলেন। তাঁহাকে আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "তুই যাবি কোথায়? মা তোকে আমার কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন। আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতে হইবে। তুই যাবি কোথায়?" তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুর কালীপ্রসাদকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিতে বলিলেন। এবং তাঁহার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। (ক্রমশঃ)

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

(১)

পলাশীর প্রায়শ্চিত্তের কিছুকাল পর দেখা গেল, দিক্‌ব্যাপী তমোরাশি ছিন্ন করিয়া বাঙ্গালার পুনরুত্থানের জ্যোতির্ময় আলোকস্তম্ভের একটি ক্ষীণ-অগ্নি-সূত্র দূর গগনপ্রান্তে চিক্ চিক্ করিতেছে! যাহা প্রথমে ছিল ক্ষীণ, ক্রমে ক্রমে তাহা এতই তীব্র হইয়া উঠিল যে, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে লাগিল বিস্ময়ের কাকলি! দেবতাহীন পুরাতন জীর্ণ মন্দিরের দ্বারপথে তখন নূতন জাগ্রত দেবতা নবীন বেশে প্রবেশ করিবার জন্য আসিলেন; কেহ বা শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িল, কেহ বা স্তম্ভিত হইয়া নবদেবতার পথ রোধ

করিয়া দাড়াইল। সেই কলকোলাহলের সূত্র ধরিয়া মোহাপহত মূর্চ্ছিত বাঙ্গালার দেহে ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত হইতে লাগিল। শেষে একদিন অখ্যাত দক্ষিণেশ্বর ভগবানের চরণধূলিস্পর্শে বিশ্বের তীর্থ হইয়া উঠিল এবং তথায় দেবতার মন্ত্রপূত হোমকুণ্ড হইতে যে সকল দৈবী-ভাবশিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গগন মণ্ডল আলোক-সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল, তাহাদেরই কতকগুলি প্রদীপ্ত স্ফুলিঙ্গ কুড়াইয়া লইয়া এক সময়ে যে দুই মহাবীর জড়বাদপূর্ণ পাশ্চাত্যভূখণ্ডে অঞ্জলি অঞ্জলি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ।

রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বাঙ্গালার নব অভ্যুত্থানের প্রাণদাতা শক্তিদাতা মাঙ্গলিক অগ্নিস্বরূপ, তাঁহাদিগের মধ্যে সগৌরবে নাম করিতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী অভেদানন্দের। ইঁহাদিগকে ছাড়িলে বাঙ্গালার পুনরুত্থানের কাহিনী চিরদিন ম্লান হইয়াই রহিবে। বাঙ্গালার পুনরুত্থানের ইতিহাস যেমন ভাষা ও ভাবের জয়বার্ত্তার ইতিহাস, যেমন উহা বাঙ্গালার বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, যেমন উহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের ইতিহাস, নূতন ও পুরাতনের রণোন্মত্ততার ইতিহাস—তেমনি উহা ধর্ম্ম ও সমাজের দেহ-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

ঊনবিংশ শতকে বাঙ্গালায় নানাদিক হইতে যেরূপ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল, ধর্ম্ম ও সমাজের দিক হইতেও তেমনি সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন—হে সংস্কারক! বিশ্বাস কর যে যত মত তত পথ। আসল ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া গড়া যায় না। নানা দেশের নানা মতের সংমিশ্রণ করিয়া তোমার নিজের জন্য ধর্ম্মের একটা নূতন রূপ দিতে পার—কিন্তু সে প্রতিমা অন্তরের বেদীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না! তোমার যে সনাতন ধর্ম্ম-বস্তুটী আছে তাহাই তোমার ধর্ম্ম থাকুক—তাহাকেই আবর্জ্জনা-শূন্য কর, পঙ্ক-শূন্য কর, মলিনতা শূন্য কর—শেষে জীবনে মরণে তাহাকেই জড়াইয়া ধর। তোমার জীবনের সার্থকতা সেইখানে। সেই ধর্ম্মকেই নিজের জীবনে পরিস্ফুট কর—এক কথায় তুমি ধর্ম্ম হও—তাহাতেই তোমার পরিপূর্ণতা, আর কিছুতে নহে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বার্ত্তাই চিকাগো ধর্ম্মমহামণ্ডলে বিবৃত করিয়া নরনারীকে বিস্মিত ও মোহিত করিয়াছিলেন এবং আমেরিকার নানাস্থানে এই বার্ত্তাই বহন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেখানে তখন ভারতের সেই "অরেন্ন মস্কের" চরণতলে ভারে ভারে অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগত তখন—সেই প্রথম বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, ভারত অন্য বিষয়ে দরিদ্র হইলেও ধর্ম্ম-বাণিজ্যের মহাজন—সে মহাজন আবার বিনামূল্যে তাহার ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দেয়—তাহার সার্ব্বভৌম বেদান্তবাণী সপ্তস্বরা বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া প্রতিনিয়তই শুনাইতে চাহে—তাহার ধর্ম্মজীবন দ্বৈপায়নতাহীন—মানবমণ্ডলী তাঁহার ভাই—নারী সমাজ তাহার মাতৃ-বিগ্রহ—পৃথিবীর সকল দেবায়তনেই তাহার জীবন্ত দেবতা বিরাজ করেন।

এমন একটা কথা যে মানুষ প্রথমবার শোনে সে বাক্যহীন হইয়া যায়! বার বার দিনের পর দিন যে শোনে সে তখনকার মত মুগ্ধ হয় এবং হরিণ যেমন অশরীরী সৌরভের পশ্চাতে পশ্চাতে ধায়—কোথায় ফুল, কোথায় গন্ধ করিয়া, সে-ও তখন সেইরূপই ছুটিতে থাকে! আমেরিকার লোকও তদ্রূপই করিয়াছিল। কিন্তু শিকল-দেবীর আকর্ষণ—অর্থাৎ সংস্কারের টান সাধারণ মনুষ্য-জীবনে দুর্লংঘ্য!' সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, আজকাল শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি যে, সকল সংস্কারের পারে ছিলেন যে জাগ্রত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ -তিনিও নাকি শেষ পর্য্যন্ত সংস্কারের শৃঙ্খলকে কাটিতে পারেন নাই—তিনি যে 'ব্রাহ্মণ' সে সংস্কার নাকি তাঁহার ছিলই!! (১) সুতরাং আমেরিকার অনেক লোকই স্বামী বিবেকানন্দের মুখে অনন্তরূপী বেদান্তধর্ম্মের নানারূপ দেখিয়াও যে শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব-সংস্কারের শৃঙ্খলেই বদ্ধ থাকিতে চাহিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

তপোলব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে লোকচরিত্র বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা স্বামী বিবেকানন্দের ছিল। প্রথমে আমেরিকায় এবং পরে ইংলণ্ডে থাকা কালে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আমেরিকান্-চরিত্রে দৃঢ়তার একান্তই অভাব। নূতন কিছু একটা ধরিতে তাহারা যেমন ক্ষিপ্র, উহা ছাড়িতেও তাহারা তেমনি ক্ষিপ্র। কিন্তু ইংলণ্ডের লোক তেমন নহে। কোন নূতন তত্ত্বকে তাহারা সহজে গ্রহণ করে না, কিন্তু একবার ধরিলে সহজে তাহা ছাড়েও না! (২) আমেরিকান্-চরিত্রের এই দিকটা মনে রাখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দের নিউইয়র্ক অঞ্চলে স্থাপিত ধর্ম্মব্যাখ্যার ক্লাশগুলিতে তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মীতার প্রভাবে বহুলোক আকৃষ্ট হইলেও স্বামীজি যে ভাবরাশি

(১) 'উদ্বোধন' আফিস হইতে প্রকাশিত এবং স্বয়ং স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ কর্তৃক লিখিত পরিচয়-পত্র সম্বলিত—শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা, ২৫৫ এবং ২৭৭ পৃষ্ঠা। "সন্ধ্যাবেলা ভাতের পায়েস আনা হইলে তিনি বল্লেন—আমায় বসিয়ে দাও; বসে বসে আমার খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।......নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর ইঙ্গিতে জানাইলেন—'ওদের (লাটু ও বুড়ো গোপালকে দেখাইয়া) বিছানাটা ছেড়ে দিতে বল।.....ঠাকুর জানাইলেন—'ভাত যে রে?...ওরে ব্রাহ্মণ-শরীর যে রে! এটার ব্রাহ্মণ-সংস্কার যাবার নয়! ইত্যাদি।"

(২) In America he found that the public was most enthusiastic and responsive in taking up new ideas; but in England he discovered that though his hearers were more conservative in their declarations of acceptance and praise, they were all the more fervent and staunch, once they had convinced themselves of the worth of a teacher and his ideas.—The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol II, P. 409. আমেরিকায় বহুদিন বাসের ফলে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও সে দেশের লোকের এইরূপ মনোবৃত্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি:—"যদি আমি পঁচিশ বৎসর স্বামীজির কাজে লেগে না থাকতাম তবে পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য-ক্ষেত্র কি প্রসার হত? দু'দিন বাদে পাশ্চাত্যেরা স্বামীজির বাণী ভুলে যেত।"—স্বামী অভেদানন্দ,—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

প্রচার করিতেন, অনেকেই হয়ত তাহা যথাযথরূপে গ্রহণ করিতে পারিত না। আমেরিকার প্রচার কার্য্য তাই তাঁহার মনোমত ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। তাঁহার প্রতি যাহারা অতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেও আবার কেহ কেহ তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেন। (৩) কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সনাতন ভারত ধর্ম্মের ভাবধারা ধীরে ধীরে আমেরিকার চিন্তাজগতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাক্ষ লোকের ক্লাশ এবং নানাস্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য নিত্য আহ্বান ও জড়বাদের কোলাহলপূর্ণ বাণিজ্য নগরী নিউইয়র্ক স্বামীজির আর ভাল লাগিল না। তিনি অচিরকাল মধ্যে নিউইয়র্ক হইতে দূরে অবস্থিত নিভৃত ও সাধনোপযোগী থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে গমন করিলেন। তখন তিনি চাহিতেছিলেন "The only right sort of people are those whom the Lord sends—that is what I understand in my life's experience. *They alone can* and will help me. *As for the rest, Lord bless them in a mass and save me from them.*" (৪) থাউজাণ্ড-আইল্যাণ্ড-পার্কেও সেইরূপ আগ্রহশীল মাত্র দ্বাদশ জন শিষ্য বা ছাত্র পাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—ইহারাই আমার সত্যকার শিষ্য—"And he told us that he accepted us as real disciples⋯ (৫)।

আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র তিন মাস প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত দেব-শক্তি তাঁহাকে ইংলণ্ডে বহুজনপূজ্য করিয়া তুলিল। তিন মাস পরে তিনি যখন পুনরায় আমেরিকায় আসিলেন (ডিসেম্বর ১৮৯৫) তখন তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছে এবং ইংলণ্ডে কার্য্যের সাফল্য দেখিয়া মনও প্রফুল্ল হইয়াছে। দুই মাস মাত্র নিউইয়র্কে প্রচার কার্য্য করিয়া (ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬) তিনি কয়েকজনের অনুরোধে তথায় একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিলেন। সনাতন ধর্ম্মের সার সত্য প্রচার করিবার জন্য কয়েকজন সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ প্রচারক প্রস্তুত করিতে না পারিলে আমেরিকার কার্য্য যে আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিবে না এই চিন্তাই তাঁহাকে বিষণ্ণ করিত। শেষে তিনি তাঁহার আমেরিকান্ শিষ্যবর্গের মধ্যে কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের

(৩) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), vol. II Pages—383-385

(৪) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), vol. II. Page—384.

cf.—*Not content with the success of his work in America*, the Swami as early as August 1894 meditated a trip to England—The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), vol II. Page 381.

(৫) The life of the Swami Vivekananda (Mâyaboti, 1915) vol. II Page 389.

উপর নিউইয়র্ক সমিতির ভারার্পণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। "Before departing from America he had similarly felt a deep anxiety about leaving the work there without having trained competent teachers, who must be Sanyasins, to continue the Vedanta movement there. To this must be attributed his act of making from amongst his American disciples several sannyasins in New York, who after his departure carried on his propaganda with great enthusiasm winning new adherents in the cause." (৬)

আমেরিকানদিগের লঘু মনোবৃত্তির বিষয় স্বামীজির জানাই ছিল এবং তিনি যে তাঁহার নব দীক্ষিত আমেরিকান্ শিষ্যমণ্ডলীর উপর নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, স্বামীজির ইতিবৃত্তকারগণ ইঁহাদিগকে যেরূপ উৎসাহ সম্পন্ন কর্ম্মবীর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন | "Who after his (Swamiji's) departure carried on his propaganda with great enthusiasm winning new adherents to the cause" | তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপভাবে স্বামীজির আশানুরূপ কাজ করিতে পারেন নাই! আমরা আরও দেখিতে পাই যে, নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির প্রধান প্রধান সদস্যগণ (The chief members of the Society) had been urging upon the Swami the advisability of sending for one of his *Gurubhais* to conduct his classes and work in general during his absence" (৭) প্রধান প্রধান সদস্যগণকর্তৃক এইরূপ ভাবে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদিগের পরামর্শকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে লণ্ডনে আসিয়া E. T. Sturdy সাহেবের অতিথিরূপে অপেক্ষা করিতে জানাইলেন।

১৮৯৬ সালের ১৫ই এপ্রিল নিউইয়র্ক ত্যাগ করিয়া স্বামীজি লণ্ডনে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ১লা এপ্রিল তারিখেই লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীজি পরমানন্দে গুরুভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন এবং পূর্ণ উদ্যমে লণ্ডনে প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিয়া জুন মাসেই তিনি স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। কি ভাবে এবং কি বিষয়ে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে বিশেষভাবে তাহা জানাইয়া, দিয়া স্বামীজি

(৬) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915). vol. III. p. 54.

(৭) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol II. page—431.

J. J. Goodwin সাহেবের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে আমেরিকায় পাঠাইলেন। (জুন, ১৮৯৬)।

আমেরিকার নবদীক্ষিত সন্ন্যাসিগণ যদি সত্যই "Great enthusiasm"এর সহিত কার্য্য করিতেন তাহা হইলে একজন গুরুভ্রাতাকে আমেরিকায় প্রেরণ করিবার জন্য স্বামীজিকে এত ব্যাকুল হইতে হইত না! স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় যে কেন্দ্রে কার্য্য আরম্ভ করিলেন তথায় অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার কার্য্যকুশলতা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। গ্রীণএকার কনফারেন্সে প্রচারের পর তিনি বোষ্টন্, ব্রুকলিন এবং নিউইয়র্কে গমন করিয়া বক্তৃতাদি করিলেন এবং সকল স্থানেই সমাদর লাভ করিলেন। নিউইয়র্কে যাহাতে নিয়মিত ভাবে এবং সু-সংহতির সহিত বেদান্ত প্রচারিত হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি শেষে নিউইয়র্কে রহিয়া গেলেন। He then settled down in New York to carry on the Vedanta movement in a *regular and well organised way*. (৮)

স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং লণ্ডনে বেদান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন—যেন শক্তিশালী চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এক মাসের মধ্যেই লণ্ডন নগরী নড়িয়া উঠিল এবং স্বামীজির বাণী শুনিবার জন্য নরনারী আকুল আগ্রহে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। অল্পদিন পরই স্বামী অভেদানন্দ স্বামীজির আহ্বানে লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১৮৯৬) এবং একমাস পরেই (২৭ অক্টোবর, ১৮৯৬) তাঁহাকে Christo Theosophical Societyতে বেদান্তের পঞ্চদশীর উপর ভিত্তি করিয়া বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল।

বক্তৃতা দিতে হইবে শুনিয়াই স্বামী অভেদানন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তাহা হইবারই কথা, কারণ তিনি জানিতেন যে, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত কিন্তু ইংরাজিতে এণ্ট্রান্স পাশ করা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্র মাত্র! সুতরাং ইংরাজের দেশে ইংরাজ নরনারীর সম্মুখে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিবারই কথা। তিনি বলিয়াছেন—"আমি বল্লুম, আমি কি ক'রে লেক্‌চার দেবো? এ-ই সমস্ত দিন খুটো-পুটি! যখন বল্লুম, তবে শিখিয়ে দাও কি রকম ক'রে আরম্ভ করতে হয়—কি ক'রে শেষ করতে হয়। তখন (স্বামীজি) বল্লেন—আমায় কে শিখিয়েছিল? যার মুখ দেখে আমি বলেছি, তুমিও তাকে দেখেই বল! হলোও তাই!" (৯) তিনি ছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের "আপন হাতে ও ছাঁচে গড়া, প্রভুর পরম প্রিয় ও বুদ্ধিমান শিষ্য।" (১০) সুতরাং বক্তৃতামঞ্চে উঠিবা মাত্র সরস্বতী আসিয়া তাঁহার কণ্ঠে আবির্ভূতা হইলেন।

---

(৮) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915)—vol III. page 56.

(৯) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ।

(১০) শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর পত্র—বিশ্ববাণী, কার্ত্তিক—১৩৪৬ এবং শ্রাবণ ১৩৪৭

সুশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ—এমন কি স্বয়ং স্বামীজি পর্য্যন্ত সেই বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। নবাগত যুবক সন্ন্যাসী সেই একটি বক্তৃতাতেই লণ্ডনের মত স্থানে তাঁহার নিজের স্থান করিয়া লইলেন। স্বামীজির বন্ধু ও ভক্ত, কর্ম্মসহায় ও গুণগ্রাহী কাপ্তান সেভিয়র কহিলেন—"স্বামী অভেদানন্দ দেখিতেছি জন্মাবধিই বাগ্মী। তিনি যেখানে যখন যাইবেন, সেখানেই জয়লাভ করিবেন।" (১১) স্বামীজি বলিলেন—'আজ যদি আমি এই জগৎ হইতে চিরদিনের মত মুছিয়া যাই, তাহা হইলে তোমার মুখে পৃথিবী আমার বার্ত্তা শুনিতে পাইবে।' (১২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৯৬ সালের ২৭ অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দের এই সুবিখ্যাত প্রথম ইংরাজি বক্তৃতা প্রদত্ত হয় এবং স্বামীজি ডিসেম্বর মাসে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারের ভার স্বামী অভেদানন্দের উপর অর্পিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি লণ্ডনের ন্যায় সুবৃহৎ রাজধানীতে এরূপভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের বিদায় অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত বহু নরনারী আনন্দ ও শান্তির জন্য এই নবাগত যুবক সন্ন্যাসীর মুখের দিকেই চাহিয়াছিলেন।—He had now made a place for himself in the huge metropolis and it was to him that the gathering unconsciously turned for solace…(১৩)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে সঞ্জীবিত স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে যে অসীম প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া অশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে পরেই তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত হইয়া মাত্র দুই মাসের মধ্যেই যে স্বামী অভেদানন্দ সেই সুবৃহৎ রাজধানীতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন—"Had now made a place for himself"—ইহার জন্য কি পরিমাণে লোকোত্তর শক্তির প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনিও ছিলেন ঠাকুরের আপন হাতে গড়া'ত বটেই, ঠাকুরের নিজের "ছাঁচে গড়া", তিনি ছিলেন তাঁহার "পরম প্রিয় ও বুদ্ধিমান শিষ্য"—শুধু ইহাই নহে, তিনি ছিলেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কালী—ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান।" "ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান" ছিলেন তিনি এবং ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজির উপযুক্ত গুরুভাই" (১৪)। মনে হয় এই জন্যই তাঁহার লণ্ডনের কৃতীত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। উহা ছিল এমনই অসাধারণ যে উহার সৌরভ সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল এবং ১৮৯৮ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখের New York Tribune নামক পত্রে তাঁহার প্রচার কার্য্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল—"Had been working successfully in London."

(১১) বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬। (১২) The Life of Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol III, page 56. (১৩) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol III Page 60.
(১৪) শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজির পত্র—বিশ্ববাণী, কার্ত্তিক—১৩৪৬

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া লণ্ডনের কার্য্য বন্ধ করিয়া স্বামী অভেদানন্দকে নিউইয়র্কে যাইতে হয় (জুলাই ১৮৯৮)। রাজযোগ ইত্যাদির ক্লাশ যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাকে একবৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, নিউইয়র্কে যাইবার জন্য তাহাকে "disband" করিতে হইল ! (১৫) ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তখন নিউইয়র্কে তাঁহার উপস্থিতির একান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল। স্থানান্তরে বলিয়াছি যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতে দেখা যায় যে নিউইয়র্কের প্রচারকার্য্য যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত হয় সে জন্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজ "Settled down in New York" (১৬)। তিনিত একজন যশস্বী প্রচারকরূপেই পরিচিত হইয়াছিলেন। (১৭) তবুও লণ্ডনের সুব্যবস্থাকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য (সে কালের যে কত দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা অবশ্য তখন কেহই জানিত না) "Temporarily" নষ্ট করিয়াও স্বামী অভেদানন্দকে নিউইয়র্কে যাইতে হইয়াছিল কেন—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। স্বামী সারদানন্দের একটি উক্তি হইতে জানা যায় যে তাঁহার কাজ নিউইয়র্কে নহে—কেম্ব্রিজে বেশ "ভাল জমিয়াছিল।" সে উক্তিটি এই :—"কেম্ব্রিজে বেশ লেকচার জম্‌লো, নানা জায়গা থেকে লোক আস্‌তে লাগলো, মনে করলুম এইখানে একটি মঠ ক'রে কাজ করবো, কিন্তু যে সময় কাজটা বেশ জাকিয়ে উঠেছে, স্বামীজির এক চিঠি গেল—'শরৎ চলে আয়'... এইত পুঁটলি পাটলা গুটিয়ে দিলুম চম্পট।" (১৭) নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিকে সুগঠিত করিবার জন্য তিনি আদৌ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাঁহা জানা যায় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বামীজি ভারত হইতে তখন যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলে কেম্ব্রিজের কোন "কাজ" বন্ধ হইল এবং লণ্ডনেরও ক্লাশ ভাঙ্গিল ! স্বামী সারদানন্দ মহারাজ দেশে ফিরিলেন আর স্বামী অভেদানন্দ চলিলেন আমেরিকায় ! লণ্ডনে তিনি তখন কিরূপ দক্ষতার সহিত বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই জানিতে পাওয়া যায় :—"We notice that the Swami Abhedananda...... continued them (Classes in London) ably and daily added to his own power as a teacher......His exposition of Vedanta was very lucid and instructive...There was no doubt that he was becoming more and more popular," (১৮)

(১৫) The Life of the Swami Vivekananda (Mayboti 1915)—vol. III. P, 343.

(১৬) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol III. Page 56.

(১৭) বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু ২য় খণ্ড—লেখক।

(১৮) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—Vol III Page 343.

নিউইয়র্কে কোন গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া না থাকিলে এরূপ একজন সুদক্ষ কর্মীকে লণ্ডনের কার্য্য তখনকার মত বন্ধ করিয়াও নিউইয়র্কে প্রেরণ করার কি আবশ্যকতা ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে নিউইয়র্কের প্রয়োজন এতই গুরুতর ছিল যে, সেজন্য লণ্ডনের মত একটি প্রসিদ্ধ কার্য্যকেন্দ্রের পরিচালককে নিউইয়র্কেই প্রেরণ করিতে হইয়াছিল !

স্বামী অভেদানন্দ যখন (৬ই আগষ্ট, ১৮৯৭) নিউইয়র্কে আসিয়া পৌছিলেন তখন তিনি একেবারেই কপর্দ্দকহীন—"I was penniless when I landed at the dock" (১৯)। সে যাহা হউক, আসিয়া দেখিলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে নামে মাত্র একটি বেদান্ত সোসাইটী স্থাপিত করিয়াছিলেন। Miss Phillips ছিলেন তাহার সম্পাদিকা এবং Mr. Van Huagen, Miss Waldo and Mr and Mrs. Goodyean ছিলেন তাহার সদস্য।" (২০) স্বামীজির জীবন চরিত পাঠে জানা যায় যে, তিনি নিউইয়র্ক হইতে ইংলণ্ড যাইবার পূর্ব্বে মিষ্টার লেগেট নামক নিউইয়র্কের একজন ধনাঢ্য নাগরিককে তথাকার বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি করিয়া যান। (২১) সেই সময়ে তাঁহার কার্য্যে নিষ্ঠাসম্পন্ন বলিয়া যাহারা তাঁহার নিকট পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম—Miss Mary Phillips, Mrs. Arthur Smith, Mr and Mrs. Goodyean এবং Miss Emma Thursby। এক বৎসর পর স্বামী অভেদানন্দ আসিয়া দেখিলেন, এই নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে মাত্র Miss Phillips এবং Mr. ও Mrs. Goodyean বেদান্ত সোসাইটীতে আছেন !

১৮৯৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটীর সে সময়কার সদস্যগণ বৈঠক করিয়া স্থির করিয়াছিলেন কি করিলে বেদান্ত সোসাইটীকে "organise" অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়—on April 4th the members of the Vedanta Society hold a meeting at Mr. Leggets' Library at 4 p m. to consider the ways and means of organising the Vedanta Society of New York." (২২) সমিতি পূর্ব্ব হইতেই "organised" থাকিলে এরূপ বৈঠক করিবার প্রয়োজন হইত না !

যদিও লেগেটের লাইব্রেরিতেই সদস্যদিগের এই বৈঠক হইয়াছিল, কিন্তু তখন লেগেটকে বেদান্ত সোসাইটীর সভাপতিরূপে পাওয়া যায় নাই ! সমিতি আমেরিকান্ বিধানানুযায়ী

(১৯) My Diary—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। বিশ্ববাণী, চৈত্র—১৩৪৪

(২০) ঐ ঐ

(২১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915—vol II Page 430.

(২২) Leaves from my Diary—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। বিশ্ববাণী—আষাঢ়, ১৩৪৬

"Incorporated" হওয়ার পর (২৮শে অক্টোবর—১৮৯৮) স্বামী অভেদানন্দ দেখিলেন, সমিতির জন্ত একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেই ভাড়া অগ্রিম দিবার জন্ত একজন অর্থশালী ব্যক্তির প্রয়োজন। তিনি তখন বাধ্য হইয়া লেগেটকে ধরিলেন। লেগেট প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কহিলেন—সভাপতি হইবার মত বিদ্যা-সামর্থ্য তাঁহার নাই! যিনি সভাপতি হইবেন তাঁহার পণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন। যাহা হউক, মহারাজ তাঁহাকে বিশেষরূপে ধরায় তিনি শেষে সমিতির প্রথম সভাপতি হইতে সম্মত হইয়াছিলেন—"But I pursuaded him to take that position and succeeded at last in making him the first President of the Vedanta Society." (২৩)। এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় (যে কোন কারণেই হউক) স্বামিজী কর্তৃক নির্দিষ্ট সভাপতি লেগেট বা অন্যান্য সদস্যদিগের মধ্যেও অনেকের সহিতই এক বৎসরের মধ্যেই বেদান্ত সোসাইটীর কোন সম্পর্ক ছিল না! তখন নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটী বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠানের নাম মাত্রই ছিল—আর ছিল তাহার চারিজন মাত্র সদস্য। এইরূপ অবস্থাগত একটি "Nominal" বা নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তখন যে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করা সম্ভবই ছিল না, এমন অনুমান করিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না! ১৮৯৮ সালের ৬ই আগষ্ট যে সমিতির চারিটী মাত্র সদস্য থাকার কথা মহারাজের ডায়েরিতে জানিতে পাই—১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় সেই সমিতির সদস্য সংখ্যা হইয়াছিল যোল শত! (২৪) এবং সেই সদস্যদিগের মধ্যে ছিলেন নিউইয়র্ক এবং তন্নিকটবর্তী স্থানের ও পার্শ্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গণ্যমান্য সুশিক্ষিত সুধীবর্গ! ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেখিলেন যে, সমিতির নিজস্ব একটি গৃহ পর্য্যন্ত হইয়াছে তখন পরমানন্দে গুরুভাইকে বলিয়াছিলেন—"আমি তিনবার নিউইয়র্কের দ্বারে করাঘাত করিয়াছি, কিন্তু নিউইয়র্ক সাড়া দেয় নাই। তুমি যে সমিতির একটি স্থায়ী বাড়ী করিতে পারিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমি খুবই খুসি হইলাম।" (২৫)।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সত্য প্রতিষ্ঠাতা যে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, ইহার পরেও কি তাহা বলিতে আর সন্দেহ থাকে? তাঁহার অসাধারণ সংগঠন কৌশলে, ত্যাগ, চরিত্রমহত্ব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অপরিসীম অধিকার—তাঁহার ভয় লেশশূন্য, স্বার্থহীন ও অপরিমেয় কার্য্যপ্রচেষ্টা প্রভৃতি এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরিসীম করুণাই নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিকে তাঁহার কর্মকেন্দ্র করিয়া দিয়া তাঁহারই অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মনোহর বাগ্মীতারস্বার। মাকিণে যে শুধু

---

(২৩) My Diary—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। বিশ্ববাণী—ভাদ্র, ১৩৪৬
(২৪) Worcester Evening Gazette, Nov. 11th—বিশ্ববাণী—শ্রাবণ, ১৩৪৭
(২৫) স্বামী তপস্বী—ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য—(রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি—১৩৩৩)।

বেদান্তের প্রচারই করিয়াছিল তাহা নহে—মার্কিণীদের অনেকের দ্বারা বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলিকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করাইয়াছিল যে সেখানকার পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশাইধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি নব মতের উদ্ভব হইয়াছিল! কিরূপে এই মহৎ ও বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সে একটি অতি বিস্তৃত ও চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক কাহিনী। যদি সম্ভব হয় পরে তাহা বিবৃত হইবে।

উপসংহারে আমাদের পূর্ব্ব প্রশ্নে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে—আমেরিকায় কি এমন গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল যে স্বামীজি লণ্ডনের প্রচারকার্য্যকে বন্ধ রাখিয়াও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে তথা হইতে নিউইয়র্কে আসিতে দিয়াছিলেন! এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর হয়ত আমরা মহারাজের নিকট পাইতে পারিতাম, কিন্তু তাঁহার দেহরক্ষার পূর্ব্বে এ প্রশ্ন তেমনভাবে কাহারও মনে হয়ত উঠে নাই। নিম্নলিখিত বিবরণটীর প্রতি মন দিলে এই প্রশ্নের কতকটা মীমাংসা হইতে পারে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজের ভারত আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতি একখানি মানপত্র প্রদান করেন। সেই সভায় বরোদার গায়কোয়ারও সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন (১৯০৬ সালের ১৪ই মে)। মানপত্রে এইরূপ আছে:—"নয় বৎসর ধরিয়া আপনি আমাদের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কত কষ্ট, কত বাধা এমন কি শত্রুতার পর্য্যন্ত সম্মুখীন হইয়া বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের অভীষ্ট পথে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি যখন নিউইয়র্কে প্রথমে আসেন তখন, যাহারা ইতঃপূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের চতুর্দ্দিকে সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র জনকয়েক আগ্রহশীল ছাত্রকেই আপনি পাইয়াছিলেন। ইহাদিগকে লইয়াই আপনি কার্য্য আরম্ভ করেন।……আজ বেদান্ত সোসাইটীর যে সুদৃঢ় মন্দির রচিত হইয়াছে, আপনি তাহার প্রত্যেকখানি প্রস্তর এক এক করিয়া গ্রথিত করিয়াছিলেন।……" (২৬)

বিবরণটী পাঠ করিলে এইরূপই মনে হয় যে সে সময় নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটীকে বেষ্টন করিয়া একটা শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সোসাইটীর অগ্রগতি যাহাতে অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহার জন্যও চেষ্টা হইয়াছিল! এক কথায় বলিতে গেলে হয়ত অবস্থাটী এইরূপ গুরুতরই হইয়াছিল যে একান্ত সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে সোসাইটীকে অর্পণ না করিলে উহার নামই মুছিয়া যাইতে পারিত! এইরূপ ভাবে সোসাইটীর অপমৃত্যু ঘটিলে শুধু যে নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচারের আশা দুরাশা হইয়া উঠিত তাহা নহে—ঝটিকার সেই আঘাত সমগ্র আমেরিকার গায়েও লাগিবার সম্ভাবনা ছিল! মহারাজের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি ও অশেষ কার্য্যকুশলতার উপর স্বামীজির এতই অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচারের পরিকল্পনাকে সর্ব্বাংশে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি একমাত্র স্বামী অভেদানন্দের

(২৬) The Swami Abhedananda's Lecture and Addresses in India—Published by Ramakrishna Vedanta Society, Calcutta.

উপরই নির্ভর করিতে পারিতেন—আর কাহারও উপরে তেমন নহে। অনুমান হয় এই জন্যই মহারাজকে লণ্ডন ছাড়িয়া নিউইয়র্কে যাইতে হইয়াছিল! নিউইয়র্কে আসিয়া স্বামীজি যখন দেখিলেন যে, সকল বাধা-বিঘ্ন কাটাইয়া তাঁহার মনের মত করিয়াই বেদান্ত সোসাইটীকে স্থায়ী ভিত্তির উপর গঠন করিয়াছেন, তখন সেই প্রেমমন্দিরকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—তোমাকে আরও দশ বৎসর এখানে থাকিতে হইবে! মহারাজ নানা আপত্তি করিলেও স্বামীজি সে সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং শেষে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—"তোমাকে আর উপদেশ দিব কি? সোসাইটীর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরই অর্পণ করিয়াছি। তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া চালাইও।"—"I have no directions to give I leave the work entirely to you." (২৭)

মহারাজ সকাশে

শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল

গীতা*

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেদজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী গুরু আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধ হইলে ও ভগবানকে কাতর হইয়া ডাকিলে গুরু আপনি মিলে। সেই জগৎগুরুই গুরু। গুরুকে স্বয়ং ভগবান মনে করিতে হয়। গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট ও প্রশ্ন করিলে তিনি উপদেশ দেন। সমস্ত মন্ত্রের বইই কিনিতে পাওয়া যায়। সে মন্ত্রপাঠে কিছুই হয় না। বইয়ের মন্ত্রগুলি dead letter গুরু ছাড়া কেহ স্বর্গের চাবি দিতে পারে না। সে জন্য সৎ গুরু লাভ করিতে হয়। সৎ গুরু লাভ অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। গুরু মন্ত্রের মধ্যে ভাব ও শক্তি দিয়া থাকেন।

গুরুর উপদেশে জ্ঞান চক্ষু খোলে। জ্ঞান হইলে জীব আর মোহপ্রাপ্ত হয় না। তখন ইহা আমার, আমি অমুকের ছেলে এরূপ আমিত্ব বুদ্ধি থাকে না। ঈশ্বর আমাদের ছাড়া

---

(২৭) The Swami Abhedananda's Lecture and Addresses in India—Published by Ramakrishna Vedanta Society, Calcutta.

* বেদান্ত সমিতি তখন ৪০নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রতি সপ্তাহে তিনদিন করিয়া গীতা, ও উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু ২৪।৭।২৫ তারিখের গীতা ক্লাশের যতটুকু নোট করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অংশ বিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

বাহিরে বা স্বর্গ বলিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাই। ভাল মন্দ যাহা কিছু আমাদের মনে হয়, তিনি সাক্ষী স্বরূপ সবই দেখেন।

ঈশ্বর কিরূপে দেহের মধ্যে আছেন তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে না। সেজন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক দেখে। যে নিজেকে অমুকের ছেলে বা ভাই বলিয়া পরিচয় দেয়, সেই বদ্ধজীব। সে কিছুই বুঝিতে পারে না।

গুরুর উপদেশে ও আশীর্ব্বাদে মহাপাপীও জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞান বড় সহজ জিনিষ নহে। গুরু জ্ঞানের বীজ দেন। উপযুক্ত যত্ন করিলে, অঙ্কুর, বৃক্ষ, ফল ও পরে ফল দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত যত্ন নিজেকেই করিতে হয়।

* * * *

আমরা তিন প্রকার কর্ম্মের দাস যথা—(১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ ও (৩) আগামী। গুরুর জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্ম ভস্মীভূত হইতে পারে কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম অকাতরে ভোগ করিতে হয়। যেমন অনেক ঘর বিশিষ্ট রিভলবারে গুলি সাজান আছে। যে গুলিগুলো ছোড়া হয় নাই, সেগুলি ইচ্ছা করিলে আর ছোড়া না হইতে পারে কিন্তু যদি কোনটার ঘোড়া টিপিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার উপর যে গুলি ছোড়ে তাহার আর কোনও কর্তৃত্ব থাকে না। অথবা মনে কর, শিকারীর পিঠে চামড়ার থলিতে যে সমস্ত তীর থাকে, সেগুলি আর ছোড়া না হইতে পারে কিন্তু যদি কোনও তীর ছোড়া হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ছোড়া তীরের উপর শিকারীর আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

* * * *

স্বামী তুরীয়ানন্দ ডায়েবেটিস্ ও কার্ব্বাঙ্কল রোগে অসহ্য কষ্ট পাইয়া শেষে দেহ ত্যাগ করেন। এত কষ্ট পাইয়াও তিনি ভগবানে বিশ্বাস হারাণ নাই এবং সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। জ্ঞানে মনের অশান্তি, ব্যাধি, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়। সেজন্য জ্ঞানই পরম পবিত্র এবং জ্ঞানীর সংস্পর্শে যে থাকে, সেও পবিত্র।

রাজযোগের সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান আপনি আসে. ইহাকে কেহ দিতে পারে না। মাটি চাপা আর্শির উপর হইতে মাটি সরাইয়া দিলে, আর্শির উপর যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ বদ্ধ-জীবের মধ্যে অবিদ্যা, কাম ইত্যাদি ময়লার দ্বারা বুদ্ধি চাপা পড়িয়া আছে। এই সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দিলে শুদ্ধ চিত্তের শক্তি আপনা আপনি আসে। চিত্ত শুদ্ধি বিশেষ আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধি হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। মলিন চিত্তে ঈশ্বর দর্শন হয় না। মলিনতা দূর করিবার জন্য সাধন ভজনের আবশ্যক। যোগীরা যোগ, উপাসনা, জপ, তপ ইত্যাদির দ্বারা মনের মলিনতা দূর করিয়া জ্ঞানের অধিকারী হয়। ইহা শীঘ্র হয় না। সেজন্য অধীর হইলে চলে না। ইহা আপনিই আসে। অধিকারী

হইতে কিছু বাকী থাকিলে, ঈশ্বর দর্শন হয় না। সকলেই মুক্ত হইবে। শুদ্ধ ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান একই জিনিষ। ভক্ত ও জ্ঞানীতে তফাৎ নাই।

* * * *

গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে অচল বিশ্বাস থাকার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান, গুরুভক্তি পরায়ণ ও সংযতেন্দ্রিয় হইলে জ্ঞান আসে ও ভগবান লাভ হয়।

গৃহস্থেরা নানা কারণে হঠযোগ ও প্রাণায়াম করিতে পারে না। ভিতরে বিশ্বাস থাকিলে, সৎগুরু পাইলে এবং সংযতেন্দ্রিয় হইলেই চলিবে।

জ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শান্তি বা মুক্তি অল্পদিনে পাওয়া যায়।

অশান্তি থাকিতে সুখ হয় না। প্রথমে জ্ঞানলাভ, পরে শান্তি এবং পরে পরমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি।

কুচিন্তা প্রথমে নষ্ট করিতে হইবে। এই কুচিন্তা নষ্ট করিতে সৎসঙ্গ লাভ এবং ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হয়। ভোগের জিনিষ প্রতিহত হইলে ক্রোধ আসে। ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ আসিলে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে সময়ে স্মরণশক্তি থাকে না এবং বুদ্ধিরও নাশ হয়। শেষে মানুষ অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে। সেজন্য সাংসারিক লোককে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হয়। জ্ঞান বিচার সর্ব্বদা প্রয়োজন।

যেখানেই থাক সৎসঙ্গ করিবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে।

শ্রদ্ধাহীন, মূর্খ এবং অবিশ্বাসীর নাশ হয়। ইহলোকে সুখ নাই, পরলোকেও নহে।

সংশয় (doubt) আসিলে শ্রদ্ধা আসে না। লোকে সেই জন্য আগে ফল চায় কিন্তু সাধন না করিলে ফল কি আপনি আসবে ?

দুটী শক্তি চলেছে—

Faith—Constructive force

Doubt—Destructive force. সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

যাহার বিশ্বাস আছে তাঁহার সবই আছে—ইহার নাম শ্রদ্ধা। এই বিশ্বাসবলে দেশের লোকে সামান্য ধূলা মাটীতে রোগ সারায়।

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞান আসে।

পাণিনি

(৩)

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

পাণিনি কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তৎসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে পাণিনির সময়-নিরূপণের পূর্বে পৌর্বপর্য্যানুসারে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতগুলি একে একে উল্লেখ করিতেছি।

সুপণ্ডিত কোল্‌ব্রুক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বৈয়াকরণবর পাণিনির কালনির্ণয়-বিষয়ে কোন সন-তারিখের অবতারণা করেন নাই।

কোলব্রুক ১৮০১ খৃ

পাণিনি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তদ্বিচারে তিনি একমাত্র বলিয়াছেন যে, পাণিনি পৌরাণিক ঋষিগণের ন্যায় সুপ্রাচীন কালে বিদ্যমান ছিলেন। "Panini, the father of Sanskrit grammar, lived in so remote an age, that he ranks among those ancient sages, whose fabulous history occupies a conspicuous in the Purans, or Indian theogonies"—On the Sanskrit and Prakrit Languages, by H. T. Colebrooke, Asiatik-Researches, VII 202.

প্রত্নতাত্ত্বিক বোট্‌লিঙ্কই পাণিনির কালনিরূপণ-ব্যাপারে সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তাঁহার 'পাণিনি' নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে 'কথাসরিৎসাগর' হইতে

বোটলিঙ্ক ১৮৪০ খ্রী

সোমদেব ভট্টের একটী কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদনুসারে পাণিনি 'বর্ষ' নামক এক ব্রাহ্মণের শিষ্য। ইহাতে লিখিত আছে, চন্দ্রগুপ্তকে পূর্বতন 'নন্দ' নৃপতির রাজত্বকালে বর্ষ পাটলীপুত্রে বাস করিতেন। গ্রীক ইতিহাসপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারতবাসীদিগকে গ্রীকশাসন হইতে বিমুক্ত করিয়া ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। সুতরাং বোট্‌লিঙ্ক বা কথাসরিৎসাগরের উপকথার মতে পাণিনি অন্ততঃ ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বোট্‌লিঙ্ক একথাও বলিয়াছেন, 'রাজতরঙ্গিণীতে' লিখিত আছে যে, অভিমন্যু চন্দ্র ও অন্যান্য বৈয়াকরণগণকে পতঞ্জলির মহাভাষ্য কাশ্মীরে প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন। বোট্‌লিঙ্কের মতে অভিমন্যু ১০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন।'(৩৮) ইহা হইতে ইনি স্থির করিলেন ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্র

(৩৮) Otto Bothlingk's Panini, p. xvii.

কাশ্মীরে মহাভাষ্য প্রচার করেন। (৩৯) কাজেই, ইহার ৫০ বৎসর পূর্বে যে পাণিনি-সূত্রের পতঞ্জলি-মহাভাষ্য প্রণীত হইয়াছিল তাহাও তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কের অদ্ভুত শক্তিবলে প্রমাণ করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও নিশ্চয় করিয়া লিখিলেন যে, পতঞ্জলি ও পাণিনি উভয়ের আবির্ভাবের মধ্যকালে কাত্যায়ন, পরিভাষাকার ও কারিকাকার এই তিন জনও বর্তমান ছিলেন। তাহাকে পাণিনির সময় ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্ধারণ করিতেই হইবে। সুতরাং প্রত্যেক দ্বিতীয়ের মধ্যে ৫০ বৎসর ধরা উচিত তাহা স্থির করিলেন। এইরূপে বোট্‌লিঙ্ক পাণিনির সময় ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া অবধারণ করেন। তাঁহার প্রদত্ত সময়ের সহিত যে তাঁহার পদাঙ্কানুসারী লেখকদিগের সময়ের অনৈক্য নাই, তাহা দেখাইতে তিনি যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সেই অসার যুক্তিসকলের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বোট্‌লিঙ্ক স্বকপোল কল্পনাবলে পাণিনির যে সময় নিরূপণ করিলেন, পরবর্তী পণ্ডিতগণ সেই সময়টীকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ আবার তাঁহার মতের একটু-আধটু এদিক্-ওদিক্ করিয়া আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ রোটের নাম করা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার 'Literature & History of the Veda' নামক পুস্তকে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পাণিনির নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত কাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। (৪০)

লাসেন বোট্‌লিঙ্কের মতের পুনরুক্তি করিয়াই পাণিনির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। (৪১) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রেনো'র (Renaud) 'Memoirs on India after Arab, Persian and Chinese Writers' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি চীনা পরিব্রাজক যুয়ন্-চোয়ঙের (৬২৯-৬৪৫) গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত চীনা পরিব্রাজক পাণিনির দ্বিবিধ অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন,

---

সিংহলীয় ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ'-মতে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করেন। বুদ্ধ-নির্বাণের ৪০০ বর্ষ পরে কনিষ্কের আবির্ভাব হয়। অভিমন্যু ইহার পরবর্তী। সুতরাং এই মতানুসারে ১০০-১২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অভিমন্যুর সময় বোট্‌লিঙ্কের মতের পোষণ করিতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক লাসেন বহু প্রাচীন মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া খ্রীষ্টীয় ৪০ ও ৬৫ অব্দের মধ্যবর্তী কাল অভিমন্যুর কাল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। —Indische Alterthums-kunde, ii. p. 413. গোল্ডস্টুকর এই মতের পক্ষপাতী (Panini, p. 85, 86.)। লাসেনের মতে, কনিষ্ক ৪০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। স্থানান্তরে তিনি কনিষ্কের আবির্ভাব ও রাজ্যকাল ১০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার পরবর্তী অভিমন্যু ও চন্দ্র খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ব্যক্তি হইয়া পড়েন।

(৩৯) Otto Bothlingk's Panini, p. xvii.
(৪০) Literature and History of the Veda, 1840, p. 16,
(৪১) Indian Antiquities. I., 1847, p 737.

প্রথমতঃ পাণিনি এরূপ সময়ে জীবিত ছিলেন যে সময়ে মানব-পরমায়ু বর্ত্তমান কাল হইতে দীর্ঘতর কাল স্থায়ী। দ্বিতীয়তঃ পাণিনি বুদ্ধের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন, অর্থাৎ ২য় বিক্রমাদিত্যের সময় বা কনিষ্কের ১০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। পূর্বোক্ত এই উক্তির বলে এবং পাণিনি যে 'যবনানী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ 'গ্রীকলিপি' এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অল্‌ব্রেথ্‌ট বেবের বোট্‌লিঙ্কের মত স্বীকার করেন নাই। ইহার জন্য তিনি কতকগুলি যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাণিনি যে শুধু বুদ্ধের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি আলেকজান্দারের ভারতাক্রমণেরও পরে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা তিনি নাকি পাণিনিসূত্রে পাইয়াছেন। হুয়েন্‌-চোয়াঙের মতে, পাণিনি বুদ্ধদেবের ৫০০ বৎসর পরে এবং কাত্যায়ন বুদ্ধের ৩০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। বেবের এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, কাত্যায়ন কাত্যবংশীয় কোন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব—ভাষ্যকার না হইলেও হইতে পারেন। হিন্দুদিগের চতুর্থ আশ্রম যে ভিক্ষু-আশ্রম ও তখন তাঁহাদের পরিধেয়ও যে কাষায়বসন তাহা তিনি সেণ্ট পিটার্স্‌বর্গ সংস্কৃত অভিধান ও উইল্‌সনের অভিধানে পাইয়াছেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে, পাণিনিসূত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পরিধেয়কে লক্ষ্য করিয়াই ভিক্ষু, ভিক্ষা, কাষায় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি স্থির করিয়াছেন যে, পাণিনি ১৪০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ কনিষ্কের ১০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। (৪২) বেবের পাণিনীয় সূত্রে প্রযুক্ত 'যবন' ও 'যবনানী' শব্দে 'গ্রীক' ও গ্রীকলিপি' বুঝিয়াছেন। এখন, যবনানী-সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন। পতঞ্জলির পূর্ববর্ত্তী পাণিনির বার্ত্তিককার-কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি উভয়েই যবনানী অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। যবনী শব্দের অর্থ, যবন-স্ত্রী। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, যবন শব্দটী যখন জাতিবাচক তখন উহা যে নিশ্চয়ই পাণিনির পূর্বে ভারতে প্রচলিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পাণিনি যবন শব্দ এসিয়ার বা ইউরোপীয় 'গ্রীক' অর্থে কখনই প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ শব্দ আসিরীয় বা পারস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যবন শব্দটী হিব্রু Yavan শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। হোমারে ইহা Jaoves বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি-ব্যাকরণের কাশিকাবৃত্তিতে 'যবনাঃ শয়ানাঃ ভুঞ্জতে' এই বাক্যটী পাওয়া যায়। 'যবনগণ শয়নাবস্থায় আহার করে' এই পদ্ধতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এক সময়ে 'যবন' শব্দদ্বারা পারসীকদিগকেই বুঝাইত। অবেস্তায় স্পষ্টই লিখিত আছে, অবেস্তার সময়ে হিন্দুদিগের সহিত পারসীকদিগের মিলন হইত। কালিদাস রঘুবংশে 'পারসীক' অর্থে 'যবন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অমরসিংহও পারসীক জাতিকে যবন বলিয়াছেন। গোল্ডস্টুকর

(৪২) History of Indian Literature, by Weber, p. 199.

'যবনানী' অর্থে বলিয়াছেন, পারস্তদেশে প্রচলিত কীলকলিপি বা cuneiform writing, ইহা কখনই সেমেটিক লিপি নহে। ইহার অন্য প্রমাণস্বরূপ মহাভারতের সভাপর্বে নকুলের দিগ্বিজয়-বিষয়ক শ্লোক, গার্গী-সংহিতার শ্লোক, ভট্টাচার্য, সিংহাচার্য, উৎপল ও বরাহমিহিরের জ্যোতিষগ্রন্থের শ্লোক প্রভৃতিও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। (৪৩) ইহা পরে 'আরব' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৮০, ২৩, ২১।

(৪৩) "ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্
পহ্লবান্ বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্ ॥
ততো রত্নান্যুপাদায় বশে কৃত্বা চ পার্থিবান্।
ন্যবর্ত্তত কুরুশ্রেষ্ঠো নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ ॥
শিবীংস্ত্রিগর্ত্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্ ;
তথা মাধ্যমকেয়াংশ্চ বাটধানান্ দ্বিজানথ ॥
পুনশ্চ পরিবৃত্যাথ পুষ্করারণ্য বাসিনঃ।
গণানুৎ সবসংকেতান্ ব্যজয়ৎ পুরুষর্ষভ ॥"
—মহাভারত, সভাপর্ব, নকুলদিগ্বিজয়।

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক শাস্ত্রমিদং স্থিতং।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে।" (গার্গী সংহিতা।)

"রব্যুদয়ে লঙ্কায়াং সিংহাচার্য্যেণ দিন গণোঽভিহিতঃ।
যবনানাং নিশি দশভির্মুহূর্ত্তৈশ্চ তদগুরুণাং ॥"
—সিংহাচার্য।

"উদয়ো যো লঙ্কায়াং সোঽস্তময়ঃ সবিতুরেব সিদ্ধপুরে।
মধ্যাহ্নো যমকোট্যাং রোমক বিষয়ে অর্দ্ধরাত্রঃ স্যাৎ ॥"
— বরাহমিহির।

"ততঃ সাকেতমাক্রম্য পাঞ্চালান্ মথুরাং তথা।
যবনা দুষ্টবিক্রান্তা প্রাপ্যন্তি কুসুমধ্বজম্ ॥"
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে—গার্গী-সংহিতা।

"সাকেতং স্যাদযোধ্যায়াং কোশলানন্দিনী চ সা"।
—যাদবকোষ।

"মধ্যদেশে ন স্থাস্যন্তি যবনা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
তেষামন্যোন্য সংভেদা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
আত্মচক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং পরমদারুণম্।"
—যাদবকোষ।

"ভদ্রারিমেদমাণ্ডব্যসাল্বনীপোজ্জিহানসংখ্যাতাঃ।
মরুবৎসঘোষযামুন সারস্বতমৎস্যমাধ্যমিকাঃ ॥"
—বৃহৎসংহিতা।

পূর্বযবনের এবং বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে (৩. ১, ২, ৮) ও চতুর্থ অংশে (৩. ১৫ ইত্যাদি, পশ্চিম-যবনের উল্লেখ আছে, ইহারা পারসীক জাতি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যানিস্‌লেয়স্ জুলিএন-(Stanislaus Julien) সম্পাদিত য়ুয়ন্-চোয়ঙের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। জুলিএন যে কেবল রেনোর মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তাহা নহে, এই চীন পরিব্রাজক-প্রদত্ত আরও কয়েকটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জুলিএনের মতে, কনিষ্কের রাজত্বকালে পাণিনির গ্রন্থ প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে উহার বহুল প্রচারও হইয়াছিল। তিনি বলেন, পাণিনির জন্মভূমিতে তদীয় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। অবশ্য পাণিনি কনিষ্কের কত পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা জুলিএনের লেখনী হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় না। এই সমস্ত বিবরণ দেখিয়াই বোধ হয় ম্যাক্সমূলর সাহেব তাঁহার ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় (১৮৫৭ খ্রীঃ) বেবের-প্রদত্ত পাণিনির কাল খণ্ডনপূর্বক পুনরায় বোট্‌লিঙ্ক-স্বীকৃত পাণিনিকালই যথার্থ বলিয়া লিখিয়া থাকিবেন। ম্যাক্সমূলর পাণিনির কালনিরূপণ-সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরের সোমদেব ভট্টের (৪৪) 'কথাসরিৎসাগর' হইতে একটী গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাহিনীটীর মর্ম এই—"পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের এক অনুচর গৌরীর শাপে বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বী নগরীতে কাত্যায়ন-বররুচিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কিছু পরেই আকাশবাণী হইল যে, এই শিশু শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষপণ্ডিতের নিকট সর্ববিদ্যা শিক্ষা করিবে; ইহার নাম বররুচি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে ইহার রুচি হইবে। বাল্য হইতেই তিনি অসীম বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসীম ছিল। এক দিন তিনি এক নাটকের অভিনয় দেখিয়া তাহা মাতার নিকট আদ্যন্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন। উপনয়নের পূর্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া সমস্তই তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পরে

(৪৪) নরেন্দ্র কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। ইহার বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে কাশ্মীর-রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভোগীন্দ্র ইহার বংশধর। ভোগীন্দ্রের পুত্র সিন্ধুভট্ট, তাঁহার পুত্র প্রকাশচন্দ্র, পৌত্র ক্ষেমেন্দ্র। ক্ষেমেন্দ্র আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্তের ছাত্র। ইনি মহারাজ অনন্তদেবের সময়ে (১০২৮—৮০ খ্রীঃ) কাশ্মীরে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'সেব্য-সেবকোপদেশ', 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা', 'ঔচিত্যবিচারচর্চা', 'সুবৃত্ততিলক', 'বৃহৎকথামঞ্জরী', 'ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র', 'ভারতমঞ্জরী', 'রামায়ণমঞ্জরী', 'দশাবতারচরিত্র', 'কালবিলাস', 'লোকপ্রকাশ', 'সময়মাতৃকা', 'ব্যাসাষ্টক' ও 'নৃপাবলী' (১০২০—৪০ খ্রীঃ)। এই কয়খানি গ্রন্থ ক্ষেমেন্দ্র রচনা করেন। ইহার পুত্র সোমেন্দ্র ভট্ট বা সোমদেব ভট্ট। ক্ষেমেন্দ্র মহারাজ অনন্তদেবের পত্নী রাজমহিষী সূর্যমতী দেবীর মনোরঞ্জনার্থ 'বৃহৎকথামঞ্জরী' রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থ শেষ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে সোমদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থ সমাপন করিয়া সূর্যমতীর চিত্তবিনোদন করেন। ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী'র মূল সংস্কৃত 'বৃহৎকথা'। এই গ্রন্থখানি আবার গুণাঢ্য নামক গ্রন্থকারের পৈশাচী ভাষায় লিখিত উপাখ্যানপুস্তক 'বৃহৎকথার' অনুবাদ।

তিনি বর্ষমুনির শিষ্য হন ও পাণিনিকে পরাভূত করেন। শেষে পাণিনি মহাদেবের আশীর্বাদে পুনরায় জয়লাভ করেন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধনিবৃত্তির জন্য পাণিনির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সমগ্র পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি পাণিনি-ব্যাকরণ সংশোধন ও সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শেষে তিনি মগধরাজ নন্দের মন্ত্রী হন।" এই কাহিনী-অনুসারে ম্যাক্সমূলর পাণিনিকে নন্দের সময়ের অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাজেই, এই কথাসরিৎসাগরের উপাখ্যান হইতে প্রমাণিত হইতেছে মাত্র যে, কাত্যায়ন-বররুচি ও পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু, ম্যাক্সমূলর তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে লিখিত 'ষড়্দর্শনের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পাণিনির কাল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি বড় বেশী কিছু যুক্তি দেখান নাই। দিনেমারি পণ্ডিত ওয়েস্টেগার্ডও (Westergard) বোট্‌লিঙ্ক-নিরূপিত কালের কাছাকাছি সময়ে পাণিনির বিদ্যমানতা স্থির করিয়াছেন। তবে তিনি অন্যবিধ যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে, অশোকের রাজত্বকালে সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা কহিত তাহা অশোকের উৎকীর্ণ শিলালিপির ভাষা। উক্ত ভাষাসম্বন্ধে বিচারকালে এই দিনেমার পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, ভাষার পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে বলিতে হইবে পাণিনি নিশ্চয়ই অশোকের বহুপূর্বে অন্ততঃ ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। আবার, ওয়েবের-প্রদর্শিত যুক্তি-অনুসারে বলিতে হয় যে, পাণিনি প্রাচীন ও অর্বাচীন ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখাইয়াছেন। [৫৫] ইহা হইতে ওয়েস্টেগার্ড [৫৬] এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন—পাণিনি (অষ্টাধ্যায়ী, ৪. ৩. ১০৫) প্রাচীন ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অর্বাচীন ব্রাহ্মণের উল্লেখের নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত উদাহরণনিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাত্যায়ন এই স্থলে বলিয়াছেন—'তুল্যকালত্বাৎ'। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, পাণিনি ও যাজ্ঞবল্ক্য সমসাময়িক, অথবা পাণিনি যাজ্ঞবল্ক্যের কিঞ্চিৎ পরবর্তী। যাজ্ঞবল্ক্য বুদ্ধদেবের জন্মভূমি বিদেহের রাজা জনকের সভায় থাকিতেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার গ্রন্থের কোথাও বুদ্ধ বা তাঁহার উপদেশের নাম উল্লেখ করেন নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও যাজ্ঞবল্ক্য বা জনক উভয়ের কাহারও নাম নাই। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, যাজ্ঞবল্ক্য বুদ্ধদেবের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন. পরন্তু, তিনি নবব্রাহ্মণ-প্রণেতা বলিয়া প্রখ্যাত থাকায় বুদ্ধের অল্পকাল পূর্বেই তিনি জীবিত ছিলেন মনে করা যুক্তিসঙ্গত। কাজেই প্রমাণিত হইতেছে, পাণিনি বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু, ওয়েস্টেগার্ড, বুদ্ধদেবের নির্বাণ-কাল ৩৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ স্থির করায় বোধ হইতেছে যে, পাণিনি অবশ্যই প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। [ক্রমশঃ]

---

(৫৫) Indische Studien, I. 1859,57,146.

(৫৬) On the Oldest Period of History, p. 76.

নিবেদন

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রণীত "The Path of Realization" নামক ইংরাজী পুস্তকের ভ্রম-তালিকা (Errata) ছাপান হইয়াছে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই বইখানি কিনিয়াছেন তাঁহারা মঠের পুস্তকপ্রকাশ বিভাগের ম্যানেজারের নিকট এই বিষয় উল্লেখ করিয়া পাঁচ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইয়া দিলে তাঁহাদিগের নিকট উহা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

* * * *

বিশ্ববাণীর পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামিজী মহারাজের "Jewish and Hindu Festivals" নামক ইংরাজী বক্তৃতার একাধিক স্থলে আমাদের অনবধানতাবশতঃ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলি যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট ও স্বীকৃত হয় নাই এবং তদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদও রহিয়া গিয়াছে। পরে ইহা নির্ভুল আকারে ছাপাইবার ইচ্ছা রহিল।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্ররত্নাকর গ্রন্থটির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে ইহার পূজার অংশ বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের নিকট ইহার পূর্ব্ব সংস্করণ আছে তাঁহারাও এই নূতন সুদৃশ্য সংস্করণটি কিনিলে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

* * * *

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নূতন গ্রন্থমালা প্রকাশিত করিবার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে তাহা হইতে কোন্ পুস্তক প্রথমে বাহির হইবে সে সম্বন্ধে অনেকে জানিবার জন্য উৎসুক হওয়ায় সকলের অবগতির জন্য জানান হইতেছে "True Psychology" নামে স্বামিজী মহারাজের যে বক্তৃতাবলী এখনও পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত আছে তাহাই সর্ব্বপ্রথমে ছাপাইতে আমরা মনস্থ করিয়াছি। এই বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। এ কার্য্য শেষ হইতে কিছু সময় লাগিবে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইতে পারে।

* * * *

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের উদ্যোগে মঠ-ভবনে প্রতি রবিবার সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত" সুললিত সঙ্গীত-যোগে কথকতা করিয়া ভক্তসাধারণের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কথকতাভঙ্গীদ্বারা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় বাণী প্রচার প্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

গত ২৮শে শ্রাবণ মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুর সহরে তিনি ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে কথকতা করেন। দীর্ঘ দ্বাদশদিনব্যাপী তত্রত্য ভক্তগণ এই সুমিষ্ট সুমধুর কথকতা

শ্রবণে অপার আনন্দ ও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়িবাবুকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুনরায় তিনি অনুরাগী গুণমুগ্ধ ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পাবনা, জামসেদপুর ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে কথকতা করিয়াছেন। সম্প্রতি ভক্তবৃন্দের সাদর আহ্বানে ফরিদপুর সহরে তিনি গমন করিয়াছিলেন। সহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তাঁহার কথকতাভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক ও মৌলিকতাপূর্ণ। তিনি সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকার একজন কৃতবিদ্য লেখক ও যশস্বী ব্যক্তি। কথকতার সময়ে তিনি সুমিষ্ট স্বর-লহরীতে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবু শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণের জীবনী ও বাণী উদ্ধৃত করিয়া তুলনামূলক ভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কথকতাপ্রণালীর সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব হইতে হইতেছে এই যে, ইহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসন্তান শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির পুস্তকাদি হইতে বিস্তৃত বাণী আহরিত ও আলোচিত হইয়াছে। যুগাবতারগণের বাণী, উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাজি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবুর সহজ সাবলীল বলার ভঙ্গীতে সর্ব্বসাধারণের কাছে অতি সহজেই পৌঁছাইবে আমরা আশা করি। এই ভাববিপ্লবের দিনে জনগণকে শাশ্বত শান্তির পথ দেখাইতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবুর এই কথকতাপ্রণালী সম্পূর্ণ কার্য্যকরী ও যুগোপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার এই 'প্রচারের' আদর হয় এবং জনগণ নারায়ণের জন্য তাঁহার এই কল্যাণ প্রচেষ্টা যাহাতে জয়যুক্ত হয় শ্রীভগবান সমীপে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ভ্রম সংশোধন

বিশ্ববাণীর বিগত আশ্বিন ১৩৪৭ সংখ্যায় "ধর্ম্মপ্রচারে স্বামী অভেদানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধের ফুটনোটে আমি লিখিয়াছিলাম, "'মহারাজের কথা' নামক পুস্তকেই স্বামিজীর উপদেশ বাণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্বামিজীর প্রদত্ত বাংলায় উপদেশাবলীর মধ্যে উক্তগ্রন্থই একমাত্র নির্ভরযোগ্য· · "

এবিষয়ে স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামিজীর উপদেশ ও বাণী অন্য যে সকল গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি কোন কটাক্ষ করিবার আমার আদৌ অভিপ্রায় ছিল না।

স্বামী বেদানন্দ

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভারতের দুই কর্ম্মবীর—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা। প্রাপ্তিস্থান : অতিআধুনিক সাহিত্য ভবন, ৬।১বি, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবন, বাণী ও মহাগৌরবময় কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই পুস্তিকায় লেখক যেভাবে এই দুই মহামানবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন সংক্ষেপ আকারে হইলেও তাহাতে তাঁহাদের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে একটি আভাষ পাওয়া যায়। পুস্তকের ভাষা বেশ স্বচ্ছ ও সাবলীল। লেখকের এই প্রচেষ্টা উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

EGO AND EGOISM

Swami Abhedananda

All our actions both physical and mental are based on the sense of I This sense of I is common to all living creatures. As through the sense of I wé move our bodies, perceive external objects, seek pleasure and avoid pain, so the lower animals do these acts directed by the same sense of I. If we go down in the animal kingdom to the lowest form of an amœba, even there we shall find the faint expression of the sense of I. If you put an amœba under a powerful microscope and make experiments by throwing a ray of light on it or touching its body very gently with a soft feather, then you will notice that it will move and in order to avoid that sensation will run away from that place. But if you continue to touch it gently without hurting it, it will not move. It has no distinct mouth but it eats animal or vegetable particles through any point of its surface. It moves by sending out protuberances and then dragging its body behind. This kind of experiment will show that even an amœba has the feeling of sensation, and as all feeling of sensation presupposes the sense of I, we will have to admit that even in an amœba there is the presence of that feeling or awareness which we call the sense of I.

In every particle of living matter there is a germ of psychic life. Wherever there is the expression of vitality there we find powers of directing, or moving, or governing, rearranging material particles, powers of analysis, powers of preparing and providing for further developments. Do they not show that there is a psychical factor behind them ? This elementary form of the feeling or awareness or the sense of I or अहंकार, as it is called in Sanskrit, which we find in the amœba, gradually develops and appears as identified with the various forms and stages through which the amœba passes in the course of evolution. In each amœba there is an innate tendency to evolve and to appear in various forms ; actuated by that tendency it divides and subdivides itself into cells and unites them together and builds up its own body, produces organisms of different kinds according to the desires in different stages and ultimately creates the most complicated organism of human body. If there be no sense of I at the back, my body will not move, my senses will not act, my nervous system will stop and all the organs will lose their activity and life. I am the

mover and worker in this body, I am the manufacturer of the brain, nerves, muscles, bones and so forth. This sense of I is the conscious ego in us. The moment this sense of I arises it limits the ego by the opposite idea of 'not-I.' When the ego is conscious of itself it knows that there is something which is not-ego. The consciousness of this distinction between I and not-I is what we call egoism. Therefore egoism depends upon the relation between I and not-I or ego and non-ego. The true nature of the ego is diametrically opposite to that of non-ego. If the one be light the other will be darkness. If the one be sentient the other will be insentient, if the one be the illuminator the other must be the object illuminated. But at present our ego and non-ego are so blended together that we cannot separate the one from the other. The true nature of the ego is the spirit or Atman which like a witness beholds Buddhi or the instrument of understanding which is the first manifested phenomenon of the non-ego, and being reflected on it becomes identified with it as it were. Consequently the apparent ego (জীবাত্মা) or I myself am a phenomenon on the one hand and the real spirit on the other As a phenomenon it is apparently combined with the understanding (বুদ্ধি) and it is the real spirit when separated from the understanding. When I am a phenomenon or combined with the understanding I appear as identified with the changes of the understanding (বুদ্ধি). This identification of the seer or Atman with the understanding or Buddhi is the true nature and meaning of egoism or I-hood.

This understanding manifests itself as time, space and causality. First of all it ranges the sensations in succession, that is, in time ; secondly it takes each sensation as an effect and thirdly it projects the same in space where it appears as a material object. If we observe closely we shall find that we cannot know the objects of the external world *per se*. We can know the changes or modifications of our mind. Mind can know its own changes. After a little more contemplation we find that the idea of causation we do not learn from outside but from within. The mental changes when projected outside become the causes. The evidence of physical causation is in fact the evidence of mental changes. Let us take an illustration. When we see a flower, we think that the colour of the flower is in the flower, independent of its relation to ourselves or to the percipient mind. We ordinarily accept it as a fact. But a physiologist will tell us that it is not so. The colour does not exist as such in the flower, but there is a certain kind of vibration in the flower which when coming in contact with a percipient mind through the optic nerve takes

the form of that sensation which we call colour. Such being the case how can we say that the colour of the flower is the cause of such a sensation? Perception of an object is neither purely subjective nor purely objective, but it is the blending of the subjective and objective elements. The moment we take the sensation or mental modification as an effect we project another set of mental changes in space and call it the cause. We cannot know matter, nor motion outside of our mind. There is an element of the subject and of the object in our mind. The knower within us is the subject and the changes or the modifications that we know are the objects of our knowledge When those changes are projected outside, they appear as external objects. But in fact they are the representations of the mental changes in space

The nature of the knower again is the blending of the understanding and the pure consciousness, which is equal to conscious ego. But the Atman is beyond understanding and consequently independent of time, space and causality. Ego is changeable while the Atman is unchangeable. Ego is phenomenal while the Atman is absolute. When viewed through the glass of understanding my real nature appears in a phenomenal form as my body, extended in space, existing in time and subject to all the changes of the sense organs and the mental functions which evolve out of the same substance which produces understanding. Birth, growth, decay and death are the changes of the body in time by causality ; consequently when I become identified with those changes of the body I think that I am born, I grow, I decay, I shall die. If the body is fat I think I am fat, if it is thin I think I am thin, If the colour be fair I think I am fair ; and likewise I am blind, deaf and so forth. Similarly I think that I am one with the mental changes, such as I am intelligent or stupid, I am a thinker, I am angry, I am jealous, I am happy and so forth. In the same manner we impose the immortal nature of the spirit upon the perishable body and senses and think that we shall not die. This identification is the effect of the imperfect understanding or ignorance of the true nature of the spirit and it is the cause of egoism. The only thing that is nearest to me is my ego. It is accessible to me in two ways, first from outside representation as a body and secondly from within, i. e., as a soul.

As I do not doubt my inward consciousness, so I do not doubt that all human beings are conscious of themselves. In the same manner I do not doubt that the lower animals are conscious of themselves. The difference between the lower animals and man is the difference in the organisation of the instrument of understanding. Although there are innumerable

stages in the animal kingdom as regards their external appearance they are identical as regards their conscious state or the sense of I in them. In the vegetable and the inorganic world this consciousness is not manifest. But in the vegetable kingdom are manifested nourishment, propagation, the digestive organs in the roots, the respiratory organs in the leaves and so forth. The activity in the organism of a plant is like the subconscious activity in our body. Science cannot draw a sharp line of distinction between the organic forces and the inorganic forces manifested variously in the physical and chemical nature. They differ in degree, not in kind. Even the inorganic bodies have a kind of egoism. That is cosmic egoism. The very existence even of a non-ego depends upon the distinction between ego and non-ego. Every motion in the universe is the product of the activity of the cosmic ego and that which resists that motion is the non ego. This distinction between ego and non ego along with individual consciousness we find equally in lower animals and in man. But the lower animals cannot know egoism objectively, they can know it only subjectively.

From egoism proceeds will. Willing is desiring and desiring involves not-having, consequently it is a wanting, and therefore it is a suffering. If there be intense willing, there will be intense egoism at the back which produces all sorts of evil thoughts, ill-feeling, envy, malice, jealousy, hatred and so forth. The more we are attached to our egoism the more miserable we are. This strong attachment is what is called selfishness. When we are selfish we do not recognise another's egoism, we become blind to his rights and sufferings, our sole aim becomes centred in that lower ego, we want to enrich our ego by wealth, name and fame either by injuring others or by depriving them of their rights. Two principal cravings of that egoism are nourishment and propagation. These two when attended with strong egoism are the causes of gluttony, unchastity, avarice and other vices.

As every ego has a double character of being such-and-such and, in addition, of being mine, so each ego commands a certain sphere or circle of egoism. The inorganic bodies possess the space which they occupy. That is their sphere of egoism. Similarly the egoism of plants and trees occupy a certain sphere of space. Lower animals gradually manifest their egoism from the narrowest to the widest range. But when we come to man we find in him the highest development of egoism which forces him to deny the rights and possessions of all other living creatures and makes him think that they have been created for his use and ultimately he denies

the rights of his fellow brethren. Such is the tendency of human egoism. If there were no such tendency in human heart this world would have been heaven. There would have been no necessity of government, police, regulations, law courts and social laws. What is the object of all these but to check this tendency? The tendency of denying others' rights and possessions and of enriching oneself with all that one can get hold of is the cause of all discord, disharmony, quarrel, war, theft, murder and so forth. When this thirst for enriching oneself becomes tremendously powerful in a nation, that nation wants to take possession of all the land that is on the earth, that nation wants to conquer the whole world by inventing machines which will kill thousands at a time and then after conquest to hold it looting the conquered nations, robbing them of their property, wealth and so forth and treating them as slaves and at the same time thinking that it is acting according to the will of God, who, as it were, told it to do so.

Men have divided the whole earth; they would have divided the moon if they could reach it. Thus this strong attachment to egoism is the root of all wickedness, vice, misery, and suffering. There are three ranges of egoism in an individual. First what he is, secondly what he has and thirdly what he represents. The first is his body and his life. The second range consists in wealth, property and so forth. The third is honour, rank, name, fame and so forth which depend upon others' opinion about him. The invasion of these three territories of an individual is what we call wrong or wicked deed or sinful act. Therefore wrong or wicked deed is of three kinds, first to the body, that is, murder, injury, slavery etc.; secondly, wrong to what one possesses, such as theft etc.; thirdly, wrong to honour etc., such as insult etc.

সম্পাদক—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী সদ্রূপানন্দ কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নাগপরলা প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৮ | অষ্টম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অনন্তকালের বীণা বাজে তব এ বিশ্বসংসারে,
সে বীণার সুরে সুরে গ্রহতারা নৃত্যকরে নভে,
মৃত্যুরে করেছ ভৃত্য হে জ্যোতিষ্ক, তব উগ্রতপে,—
তাই তুমি চিরন্তন।

যুগে যুগে তিমির সংহারে
ধরণীর সর্ব্বপ্রান্তে আপনারে করেছ বিকাশ ;
এ বিরাট ধরণীরে সাজায়েছ কাব্যে অভিনব,
কীর্ত্তির হিমাদ্রি রচি চিত্ত-গঙ্গা সৃষ্টি করি' তব
বিশ্ব চিত্ত লোকে তুমি স্থাপিয়াছ,—তারি ইতিহাস
চিন্ময় অক্ষরে লেখা।

কবিবর! বহুপুণ্যফলে
পেয়েছিল বঙ্গমাতা দারিদ্র্যেরে পর্ণগেহ মাঝে,
সর্ব্বহারা মানবেরে শক্তি দিয়া নিয়েছিলে কাছে,
ক্লৈব্য তার দূরে গেল তেজোগর্ভ তব মন্ত্রবলে।

যেথায় রহ না বন্ধু! লহ মোর আত্মার প্রণাম,
স্বদেশের যাত্রিদল যাহাদের করে গেলে দান
গানের পাথেয় তব, তাহাদের অশ্রুভরা গান
পাঠাইয়া দিনু কবি পূর্ণকরি দিও মনস্কাম
তবপুণ্য আশীর্ব্বাদে। হে রবীন্দ্র, গেছ অন্তরালে
বিশ্বাস হবে না কভু, তুমি আছ স্মৃতিচক্রবালে।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লণ্ডনের ক্লাসের ও তথায় প্রচারকার্য্যের সমুদয় ভার দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতে আগমন করেন তখন নিশ্চিতই মনে মনে বুঝিয়া আসিয়াছিলেন যে, যোগ্যব্যক্তির করেই কার্য্যভার দেওয়া হইল। তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়াছেন যে, স্বামীজির অনুপস্থিতিতেও স্বামী অভেদানন্দের লণ্ডনের কাজ ভালই চলিতে লাগিল। স্বামীজির অধ্যাপনার গুণে ক্লাশের ছাত্র সংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল— "Swami Abhedananda···continued them (classes) ably and daily added to his own power as a teacher" (১)

মহারাজ যে তখন শুধু লণ্ডনেই ক্লাস করিতেন, তাহা নহে। উইম্ব্রেডন্ এবং অন্যান্য স্থানেও তাঁহাকে ক্লাস লইতে হইত। বড়দিন ও নববর্ষের (১৮৯৬-১৮৯৭) উৎসবাদির পর মহারাজ ১৮৯৭ সালের ১২ই জানুয়ারি হইতে লণ্ডনে বেদান্ত সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। সে বক্তৃতাগুলি ছিল যেমন মনোরম ও প্রাঞ্জল, তেমনি সেগুলি ছিল জ্ঞানগর্ভ ("was very lucid and instructive")। বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থাও ছিল নূতন। সপ্তাহের প্রথম ভাগে একদিন প্রভাতে যে বিষয়ে বক্তৃতা হইত, সন্ধ্যা কালে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগের নিকটেও আবার সেই বক্তৃতাটাই করা হইত। সায়ংকালের কিয়দংশ এবং পরদিন প্রভাতে শ্রোতৃবর্গের প্রশ্নাদির উত্তর দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই ভাবে অধ্যাপনা হওয়ায় সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিল কারণ প্রত্যেকেই আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইত। এই ভাবে মহারাজ যে ক্রমেই বেশী লোকপ্রিয় হইতেছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ("There was no doubt that he was becoming more and more popular.") (২) ঠিক এই সময়েই নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি হইতে বারংবার জরুরী আহ্বান আসিতে লাগিল ("urgent and repeated calls from the Vedanta Society of New York") (৩)। মহারাজ লণ্ডনের ক্লাস তখনকার মত ভাঙ্গিয়া দিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। (জুলাই, ১৮৯৭)।

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol III, Page 343.

(২) ঐ

(৩) ঐ

১৮৯৭ সালের ৬ই আগষ্ট সেণ্টপল্ জাহাজ আট্‌লাণ্টিক পাড়ি দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র নিউইয়র্ক সহরের ডকে আসিয়া ভিড়িল। স্বামী অভেদানন্দ যখন ডকে নামিলেন তখন তিনি একেবারে কপর্দ্দকহীন ছিলেন—"I was penniless when I landed at the dock"। (৪) মহারাজ তখন পর্য্যন্ত জানিতেন কিনা বলা যায় না যে, স্বামীজির বিশ্বাস ছিল যে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই স্বামীজির কার্য্য বেশী সুচারুরূপে চলিয়াছিল। তিনি কলিকাতায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন:—ইংরেজরা নির্ভীক, বীর ও ধীর স্থির জাতি। তাদের মাথায় যদি কোনরূপে একটা ভাব প্রবেশ করাইতে পারা যায়, উহা তাহাদের মস্তিষ্ককেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে—ছুটিয়া বাহির হইয়া পলায় না, কারণ এই জাতির এতই কর্ম্মশক্তি এবং যে কোন একটা বিষয়কে ব্যবহারিক জীবনে খাটাইবার প্রবণতাও ইহাদের এত বেশী যে মাথায় কোন একটা ভাব প্রবেশ করিলেই উহা সেইখানেই গাছের মত বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে ফলপ্রসূ হয়। অন্য কোন দেশে এমনটি দেখা যায় না। (৫) যাহা হউক, পরে মহারাজ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের কার্য্যে লাগিয়া না থাকিতেন তাহা হইলে আমেরিকানরা স্বামীজির বাণী ভুলিয়া যাইত। (৬)

মহারাজ জাহাজ হইতে ডকে নামিলেন। তাঁহার সঙ্গে তখন ছিল বেদ, উপনিষদ এবং ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধে এক বাক্স সংস্কৃত পুস্তক। তিনি এগুলি স্বামীজির কথা মত ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন। শুল্ক আদায়কারী কর্ম্মচারিগণ আসিয়া সেই পুস্তকের বাক্সটী ধরিলেন! সে সময় যুক্তরাজ্যে ডিংলে বিল্ নামে শুল্ক সম্বন্ধীয় একটি কড়া আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই বিধানের বলে বিদেশী দ্রব্যের উপর

(৪) My Diary—Swami Abhedananda—বিশ্ববাণী, চৈত্র, ১৩৪৪। বেদান্ত মঠের স্বামী শঙ্করানন্দ লিখিয়াছেন—(বিশ্ববাণী, ভাদ্র, ১৩৪৭) "স্বামী বিবেকানন্দ ভারত প্রত্যাগমনকালে স্বামী অভেদানন্দের আমেরিকা যাওয়ার পাথেয় Mr. Sturdyর হাতে দিয়া আসেন।" স্বামীজির সুবৃহৎ জীবনচরিতে (Mayaboti 1915—vol III) এরূপ কোন বর্ণনা পাই নাই। মহারাজের ডায়েরিতেও (যে পর্য্যন্ত 'বিশ্ববাণী'তে মুদ্রিত হইয়াছে) এরূপ কোন ইঙ্গিত পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্বামী শঙ্করানন্দ সম্ভবতঃ এখন পর্য্যন্ত অমুদ্রিত কোন প্রমাণ অবলম্বনে উহা লিখিয়া থাকিবেন। তবে একটা কথা এই মনে হয় যে, মহারাজ ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে লণ্ডন পরিত্যাগ করেন এবং স্বামীজি ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। মহারাজের নিউইয়র্ক আগমনের সাত মাস পূর্ব্বেই কি তবে স্বামীজি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে মহারাজকে নিউইয়র্কেই পাঠাইতে হইবে!

(৫) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti. 1915) vol III, Page 66. এই প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের ৩৬২ হইতে ৩৬৫ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

(৬) বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

অত্যন্ত বেশী মাশুল ধরা হইত। মালের আনুমানিক মূল্য যত, মাশুল নির্দ্দিষ্ট হইত তাহার অর্দ্ধেক!

মহারাজ তখন ছিলেন এক্কেবারে কপর্দ্দক শূন্য, কারণ মিষ্টার ষ্টার্ডি তাঁহাকে পাথেয় ও পথের পাই-খরচ মাত্রই দিয়াছিলেন, তাহার উপর তখন তিনি ছিলেন একেবারেই নিঃসঙ্গ ও বান্ধব বিহীন। মহারাজ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন! স্বামী সারদানন্দ যখন লণ্ডন হইতে আমেরিকায় প্রেরিত হন তখন তাঁহার সঙ্গী ছিলেন স্বামীজির বিশেষ ভক্ত মিষ্টার গুড্‌উইন্। (৭) কিন্তু মহারাজকে একাকীই আসিতে হইয়াছিল। জাহাজখানি নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে ডকে আসায় তাঁহাকে লইবার জন্যও কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলনা।

মহারাজ কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে পুস্তকগুলি সংস্কৃতে লেখা এবং বিক্রয়ের জন্য নহে—তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য। যাহা হউক, অনেক বাদানুবাদের পর শুল্ক আদায়কারী কর্ম্মচারিগণ মহারাজকে বিনা মাশুলেই পুস্তকগুলি লইবার অনুমতি দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমেরিকার মাটীতে পা দিবামাত্রই কপর্দ্দকহীন অবস্থায় তিনি প্রথমে যে অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন তাহা এই ভাবে কাটিয়া গেল।

একে একে সকল যাত্রী, যে যাহার মত প্রস্থান করিল। মহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একা ডকের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। কৈ, তাঁহাকে লইতে ত কেহ আসিল না! এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে তিনি একখানা গাড়ী করিয়া বরাবর মিস্ মেরি ফিলিপ্‌সের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সে বাড়ীর নম্বরটী তাঁহার কাছে ছিল বলিয়াই তিনি সেই অতিশয় বৃহৎ বাণিজ্যনগরীতে তাঁহার প্রথম আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন! এই মিস্ ফিলিপ্‌স্ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একজন ছাত্রী এবং তাঁহার কথা মতই নিউইয়র্ক সোসাইটীর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিষ্টার ভ্যান্ হ্যাগেন্ ছিলেন হল্যাণ্ডবাসী। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচয়ের পর তাঁহার যোগের ক্লাসে উপস্থিত হইয়া হ্যাগেন্ ক্রমেই বেদান্ত ও রাজযোগের দিকে আকৃষ্ট হন এবং নিজেকে স্বামীজির একজন ব্রহ্মচারী-শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিতেন। ইনি ছিলেন স্বামীজি কর্ত্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত নামে-মাত্র নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ৪।৫ জন সদস্যের মধ্যে একজন। মহারাজের সহিত কথায়-বার্ত্তায় তিনি এতই মাতিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিপুলকায়া রাজনগরী নিউইয়র্কের নানা দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই ভাবে মহারাজের নিউইয়র্কে প্রথম কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

১৮৯৭ সালের ১২ই আগষ্ট ছিল স্বামী অভেদানন্দের পক্ষে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন,

(৭) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol III, Page 48.

কারণ সেইদিনই তিনি নিউইয়র্কের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইবার প্রথম সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই দিনই তাঁহার সহিত স্বামীজির শিষ্যা মিস্ ওয়াল্‌ডোর (হরিদাসী) পরিচয় হয় এবং এই দিনই গুড্‌ইয়ার দম্পতীর সহিতও তাঁহার আলাপ হয়। ইঁহারা তিন জনেই ছিলেন স্বামীজির ছাত্র এবং নিউইয়র্ক সোসাইটীর সদস্য। মহারাজ যাহাতে স্বামী বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী ও ভক্তদিগের সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারেন সেই জন্য মিস্ ফিলিপ্‌স্ সেদিন তাঁহার গৃহে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করিয়া মহারাজকে প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সান্ধ্যসম্মিলনীতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যখন দেখিলেন স্বামী অভেদানন্দ বালকের ন্যায় সরল, তাঁহার ব্যবহার একেবারেই অনাড়ম্বর—যখন তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রীভগবানের উপর তাঁহার অনন্ত বিশ্বাস এবং সত্যের প্রতি অসীম নিষ্ঠা তখন তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, শিশুসুলভ পবিত্রতার প্রতিমূর্তি এই তরুণ সন্ন্যাসীই স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য প্রতিভূ। লণ্ডনে স্বামীজি যে ক্লাস আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার লণ্ডন ত্যাগের পর ইনিই অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাহা পরিচালনা করিতেন, সেখানে কি কি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইত ইত্যাদি নানা কথা এবং বেদান্তদর্শন ও রাজযোগ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে মহারাজের সরল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বিশেষ ভাবে সভাস্থ নরনারীর মনোরঞ্জন করিল। মিস ফিলিপ্‌স একে একে তাঁহাদিগের সকলের সহিত মহারাজের পরিচয় করাইয়া দিলেন

স্বামী বিবেকানন্দের যে সকল বন্ধু নিউইয়র্কে ছিলেন, নিউইয়র্কে আসিয়াই মহারাজ তাঁহাদিগের নামে পরিচয়-পত্র চাহিয়া স্বামীজিকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহাতে মহারাজকে প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করেন সে জন্যও সেই পত্রে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। নূতন স্থানে গিয়া পূর্ব্বতন কর্ম্মী ও নেতার নিকট হইতে এই সাহায্য পাইবার আশা করা নূতন কর্ম্মীর পক্ষে খুব একটা বড় কথা নহে—বরং ইহাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করিতে হয়। কিন্তু স্বামীজি ছিলেন অন্য ধাতুতে গঠিত। তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল—স্বাবলম্বী হও। পত্রের উত্তরে কলিকাতা হইতে স্বামীজি জানাইলেন—'আমার বন্ধু-বান্ধবের উপর নির্ভর করিও না। নিজে এমন বন্ধু করিয়া লও যাহারা তোমার সহায় হইবে—নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও এবং সকল বাধার সহিত যুদ্ধ কর!'—("In reply Swami Vivekananda wrote to me…that I must not depend on his friends, that I should stand on my own foot and struggle." (৮)

নিরান্ধব এবং ভিন্ন মত ও ধর্ম্মাবলম্বীর দেশে নাম মাত্র সম্বল একটা বেদান্ত-প্রচার-কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে সুপরিচালিত করিবার জন্য যিনি প্রচারকরূপে প্রেরিত

(৮) My Diary—স্বামী অভেদানন্দ। বিশ্ববাণী—চৈত্র ১৩৪৫।

হইয়াছেন, এমন একটা আদেশ যে তাঁহার পক্ষে কতদূর উৎসাহভঙ্গকর ও কঠোর তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না, কিন্তু বুঝিয়াছিলেন মহারাজ! তাঁহার ন্যায় অমিত আত্মিক বলে বলী পুরুষ ভিন্ন অপর যে-কেহ এইরূপ আদেশ পাইলে নিশ্চিতই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইতেন এবং একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেন! যাহার নিকট হইতে বড় পাওয়ার বেশী আশা করা যায়—যাঁহারা একখানি পত্রে পথের সমস্ত বাধা দূর হইয়া যাইবে বলিয়া বিশেষ ভরসা থাকে, সেই স্থান হইতে যদি প্রত্যাখ্যানের এইরূপ আঘাত আসে, তাহা হইলে, সাধারণ যে-কোন ব্যক্তিকেই হতবুদ্ধি হইতে হয়! কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি জানিতেন, ঠাকুর তাঁহার হৃদয়ের সবখানি জুড়িয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে সঙ্ঘনেতার আদেশ যতই কেন কঠোর না হউক, তাঁহাকে একটুও দমাইতে পারিল না! আত্মিক্ বলে বলী যাহারা, পথের বাধা তাঁহাদিগকে আরও দৃঢ়রূপে সঙ্কল্পবদ্ধ করে—সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে না।

স্বামীজির নিকট হইতে এইরূপ পরামর্শ পাইয়া স্বামী অভেদানন্দ প্রথমে খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন ("I was very much surprised at this advice"), কিন্তু সে বিস্ময়ের ভাব মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। তিনি আদৌ হতাশ হইলেন না। ভগবানের ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরতা তখন এক অটল সঙ্কল্পে তাঁহার হৃদয়কে উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। তিনি স্থির করিলেন, সেই অসীম নির্ভরতাকে অবলম্বন করিয়া, বীর সৈনিকের পণবদ্ধ হৃদয় লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন—ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, এই কর্ম্মের ফলাফল কি, এসকল চিন্তা মনে আদৌ স্থান দিবেন না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই মহৎ বাণী তখন তাঁহার অন্তরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচ ন। তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন, নিজের কার্য্যের দ্বারা জগৎকে দেখাইবেন যে সত্যসত্যই তিনি একজন কর্ম্মযোগী ও সন্ন্যাসী। (৯)

ঠিক এই সময়েই হউক বা ইহার অল্পকাল পরেই হউক—"আমেরিকার কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদানের কিছু পরেই দুর্ব্বার প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে সম্পত্তি সম্পন্ন অনেকে যখন ধ'রে বসলো, সেখানকার মঠের অধ্যক্ষ যে চিরকাল ভারতের সন্ন্যাসীরাই হ'বে তা নয়, তারা খুসি মত যে-কোন-লোককে নিয়ে এসে বসাতে পারবে, স্বামীজি তৎক্ষণাৎ সেই

(৯) I was inspired with grim determination to depend entirely upon the will of our Lord and to go on working with the resolute heart of a brave soldier, neither thinking of the morrow nor of the results of my work. I remembered the saying of Krishna in the Bhagavat Gita—"To work thou hast the right and not to the fruits thereof", and resolved that I shall prove by my works that I am a true Karmayogi and a real Sannyasin.—My Diary—স্বামী অভেদানন্দ। বিশ্ববাণী, চৈত্র—১৩৪৫।

তরুণ বয়সেই তাদের সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে নির্ভয়ে নব উদ্যমে বেদান্ত সোসাইটী নিজেই গড়লেন।" (১০)

যাহাদিগকে লইয়াই নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটী, যাহাদিগের সহানুভূতি ও বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ—যাহারা ইচ্ছা করিলে এক ফুৎকারেই বিদেশী ও বিধর্মী যে-কোনো সন্ন্যাসীকেই তাঁহার সংগঠন-কার্য্য সহ উড়াইয়া দিতে পারে, আবার যাহাদের সংহতি হইলে সোসাইটীর মন্দির স্বর্ণমণ্ডিত হইতে দণ্ডেকও লাগে না। তাহাদিগের নিকট হইতে এইরূপ প্রবল বাধা আসিলে অতি বড় বীর্য্যবান কর্ম্মীকেও প্রায় হতচেতনই হইতে হয়! ইহার উপর যদি আবার তাঁহাকে নানাবিধ ক্লেশ এমন কি শত্রুতারও সম্মুখীন হইতে (১১) সংগঠন কার্য্যে সফল হইতে হয় তাহা হইলে কোন জগজ্জয়ী বীরের বিজয়-মুকুট অর্পণ করিয়া তাঁহাকে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীরদিগের মধ্যে অন্যতম প্রধান বলিয়া বিশিষ্ট আসন প্রদান করিব তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" ভগবানের এই বাণী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল মার্কিনের নিউইয়র্কে লোকোত্তরচরিত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনে। সে কাহিনী ক্রমে ক্রমে বলিবার ইচ্ছা আছে।

ক্র

পাণিনি

(৪)

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

যদিও গোল্ডস্টুকরের পাণিনি-সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির স্থানবিষয়েই প্রধানতঃ আলোচনা হইয়াছে, তবুও তিনি পাণিনি ও বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে পৌর্বাপর্য-বিষয়ে পাণিনির কাল একেবারেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। 'নির্বাণোঽবাতে' (৮. ২. ৫০) এই সূত্র হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৌদ্ধমত প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি জীবিত ছিলেন। (৪৭) এইরূপ স্থির করিবার কারণ এই যে, লাসেনের মতানুসারে তিনি ৫৪৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দকে বুদ্ধদেবের

(১০) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ (প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)।

(১১) The Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India—Vedanta Samity.

(৪৭) Goldstuker's Panini, p 225-7, 231.

নির্বাণকাল স্থির করেন। গোল্ডস্টুকর ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে 'পাণিনি' নামক যে অপূর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ ও সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু, তিনি যে মাত্র কতকগুলি বৈয়াকরণিক সূত্রসাহায্যে পাণিনির কাল, দেশ ও তৎকালীন গ্রন্থসমূহের অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন তাহা আমরা কখনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। গোল্ডস্টুকর কয়েকটী যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাজসনেয়ি-সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, শতপথ-ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্‌সকল, অথর্ববেদ প্রভৃতি পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। 'পাণিনির একমাত্র অপরাধ, তিনি সূত্রে ও গণে এই শব্দ বা শব্দাংশগুলি ব্যবহার করিলেও ইহাদের তিনি ব্যাখ্যা দেন নাই। গোল্ডস্টুকর বলেন যে, পাণিনি-সূত্রমধ্যে অথর্ববেদের উল্লেখ নাই। সুতরাং, তিনি একেবারেই সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, পাণিনি অথর্ববেদ জানিতেন না, অথর্ববেদ পাণিনির পরে রচিত হইয়াছে।

অথর্ববেদ-সংক্রান্ত গোল্ডস্টুকরের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভুল। পাণিনিসূত্রে আমরা 'আথর্বনিকস্যেকলোপশ্চ' (৪ ৩.১৩৩), 'কপিবোধাদাঙ্গিরসে', 'দাণ্ডিনায়নাহাস্তিনায়নাথর্বণিক' (৬.৪)—এই সমস্ত সূত্রে 'অথর্ব' ও 'আঙ্গিরস' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি ছাড়িয়া দিয়া ঋগ্বেদেও আমরা 'অথর্ব' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। গোল্ডস্টুকর বলিয়াছেন, অথর্ব শব্দে অথর্ববেদ বা আঙ্গিরস শব্দে অথর্বাঙ্গিরস বুঝাইবে, পাণিনি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। আমরা বলি, পাণিনি কোথাও ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দে ঋগ্বেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ বুঝাইবে তাহাও তো স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই! ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষৎ, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্তই পাণিনির পরে রচিত বলিয়া গোল্ডস্টুকর নিতান্তই ভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। পাণিনি-সূত্রপাঠে জানা যায় যে, তিনি ব্যাস ও তাঁহার নিম্নতম পাঁচ জন শিষ্য-প্রশিষ্যকে জানিতেন, যুধিষ্ঠিরাদির নামও তাঁহার অবিদিত ছিল না। ব্যাসাদি ন্যায়, সাংখ্য, আরণ্যক ইত্যাদি অবগত ছিলেন—সকল দেশের গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ আছে, অথচ পাণিনির তাহা অবিদিত ছিল, ইহা কিরূপ কথা! 'নির্বাণোঽবাতে' এই সূত্রটী পাণিনির ব্যাকরণে পাওয়া যায়। গোল্ডস্টুকর ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন—অভিধান, মহাকোষ বা ইতিহাস প্রণয়ন করেন নাই। নির্বাণ শব্দের 'মোক্ষ' অর্থ বুদ্ধের শিষ্যগণ স্বীকার করিবেন, ব্যাকরণ লিখিতে বৈয়াকরণ তাহা স্বীকার করিবেন কেন? নির্বাণের ব্যাখ্যা নাই বলিয়া তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী, এরূপ বলা সমীচীন নহে। আর একটী কথা, যদি গোল্ডস্টুকরের মতে পাণিনি উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-যুগের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি লৌকিক ভাষায় ব্যাকরণ লিখিতে গেলেন কেন? তাহা হইলে কি সে সময় লৌকিক গ্রন্থাদি বিদ্যমান ছিল? এদিকে আবার পাণিনির সূত্রোল্লিখিত শৌনকাদি শাব্দিক ও আচার্যদিগকে প্রক্ষিপ্ত না বলিলে তাঁহারা যে পাণিনির পূর্বে আসিয়া পড়েন'। গোল্ডস্টুকর বলেন যে, ঋক্-প্রতিশাখ্য পাণিনির পরে রচিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যের বর্ণনীয়

বিষয়গুলি পাণিনির সূত্রাপেক্ষা বিস্তৃতি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, ইহাই গোল্ডস্টুকরের মত। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য ঋগ্বেদের শাকল-শাখার সহিত সম্পর্কিত। পাণিনি ব্যাকরণ বেদের শাখাবিশেষ বা সংস্কৃত-সাহিত্যের জন্য লিখিত হয় নাই। সর্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করাই পাণিনির উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই, বৈদিক ব্যাকরণ তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই কারণে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যকে কখনই পাণিনির পরবর্তী বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, উভয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাদৃশ্য খুবই অল্প। পাণিনিতে একটী সূত্র আছে—'অরণ্যান্মনুষ্যে', অর্থাৎ মনুষ্য অভিধেয়ে 'আরণ্যকঃ' পদ নিষ্পন্ন হইবে; যথা, 'আরণ্যকা মনুষ্যাঃ'—অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা হইতেই গোল্ডস্টুকর স্থির করিলেন যে, পাণিনির সময়ে বা তৎপূর্বে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না। কিন্তু, মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদের সময়ে ছিল, অথচ পাণিনির সময়ে 'আরণ্যকে'র অস্তিত্ব অসম্ভব—আশ্চর্য যুক্তি।

'On the Question of Panini's Date' নামক প্রবন্ধে (৪৮) অলব্রেখট্ ওয়েবর (Albrecht Weber) দেখাইয়াছেন যে, গোল্ডস্টুকর 'নির্বাণোঽবাতে' এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ভুল। পরন্তু এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ যাহা তদ্দ্বারা পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্বে জীবিত ছিলেন কিনা তাহা স্থিরীকৃত হয় না। বরং ওয়েবর পাণিনির গ্রন্থ হইতে এমন একটী শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা হইতে বিপরীত অর্থ প্রমাণিত হয়। (৪৯) গোল্ডস্টুকর বা ওয়েবর উভয়েরই যুক্তি সন্তোষজনক নহে। লাসেন (Indische Alterthumskunde, 1867) ওয়েবরেরই বিবরণের পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। পার্থক্য এইটুকু দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার অনুমিত কাল ৩৫০ না হইয়া ৩৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনফী (Benfey) তাঁহার ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এক অদ্ভুত মতের প্রস্তাবনা প্রকাশ করেন। তিনি নন্দের রাজত্বকালে বর্তমান পাণিনির গুরু বর্ষবিষয়ে সোমদেবের যাহা উক্তি তাহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই, তাঁহার রাজত্বকালে পাণিনির লেখা বর্তমান ছিল, বোট্‌লিঙ্কের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার গ্রন্থমধ্যে 'যবনানী' শব্দটী উদাহরণস্বরূপ দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন যে, পাণিনি প্রায় ৩২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁহার ব্যাকরণ শেষ করিয়াছিলেন। কাজেই, তাঁহার গ্রীক লিপি অনুধাবনে ও কাহারও সাহায্য ব্যতীত শিখিবার যথেষ্ট সময় ছিল। এরূপভাবে কোন গ্রন্থকারের সময়নিরূপণ নিতান্তই হাস্যরসাত্মক।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন (৫০), যে ধর্মাশোক ২৬০ হইতে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী তাম্রশাসনে লেখা আছে যে, তিনি

(৪৮) Indische Studien, V. 1862.

(৪৯) Weber's Indische Studien, p. 137.

(৫০) Indian Antiquary, I. 10

শালাতুরীয় বা পাণিনির গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বার্নেল (৫১) পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফেলিয়াছেন। ইঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, পাণিনির কালসম্বন্ধে অন্যান্য মতে যাথার্থ্য বড়ই কম। কাজেই তিনি নিজে একটা সময় খাড়া করিয়া তাহার সামঞ্জস্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। বার্নেলের উক্তি এই—"The result, as now accepted, is that he lived in the 4th. century B. C., I cannot see there is any reason why he should not be placed nearly a century later, which would remove some difficulties that the earlier date presents." ইহার পর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক পিশেল (Pischel) পাণিনির সময়-সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। গোল্ডস্টুকর পাণিনির যে সময় স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পিশেল-প্রদত্ত সময়ের এক শত বর্ষ ব্যবধান।

(৫১) Aindra School, 1875, p. 44.

(ভ্রমসংশোধন)

অনবধানতা বশতঃ গত শ্রাবণ মাসে নিম্নোক্ত ফুট নোট তিনটি ছাপা হয় নাই, পাঠক-বর্গের সুবিধার জন্য উহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(৩৫) আলেকজান্দার এই 'সাঙ্গল' বা সাঙ্গল নগর ধ্বংস করেন; তদবধি এই নামের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। পাণিনি-সূত্রে এই নগরের নামোল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হইতেছে যে, পাণিনি নিশ্চয়ই আলেকজান্দারের পূর্ববর্তী।

(৩৬) ইহা য়ুয়ন্-চোয়ঙের—'প-লো-কে-তো'।

(৩৭) এ দুইটী নাম সূত্রে নাই। তবে টীকাকারগণ ৫.৩.১১৪ সূত্রের টীকায় ইহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের উল্লিখিত 'মালী' ও 'ক্ষুদ্রক' জাতির সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে।

নিবেদন *

শ্রীনলিনীবালা বসু

আজি তব জন্মোৎসব ! শুভ জন্মতিথি
আবার ফিরিয়া এলো ধরণীর পরে,—
উঠিয়াছে অভ্রভেদী তাই পুণ্য গীতি ।
দেবতার পুষ্পহার অবিরাম ঝরে ।

ধন্য করি জন্মভূমি অতীতে যে দিন,
তোমার চরণ রেণু স্পর্শিল মেদিনী
নিবিড় তিমির নিশি পোহালো সে দিন,
প্রথম অরুণালোকে হাসিল ধরণী ।

জাগিয়া বিপুলা মহী হেরিল সম্মুখে
প্রকৃতি দূতের নব হৈমদ্যুতি রথ—
আনন্দ সংবাদ বহে ;—অসীম পুলকে
উজলিল প্রেমালোকে অনন্তের পথ !

লোক লোকান্তরে মেলি' দিব্য লিপিখানি
ফিরে গেল দেবদূত ! অনন্ত গগনে
প্রদীপ্ত তারকাপুঞ্জে লেখা সেই বাণী,
চিরস্থায়ী ; যেন পড়ে সবার নয়নে ।

চেয়ে আছে সে লিপির অনির্ব্বাণ ভাষা
জাগিয়াছে কি আহ্বান ছত্রে ছত্রে তার !
অসীমের কি মধুর, কি অনন্ত আশা
কি আনন্দ চিত্ত রাজ্যে করেছে বিস্তার !

---

* শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর ৭৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত ।

তব লিপি অনুসরি' হে দীন শরণ !
নিখিল ধরণী চলে ; পুণ্যময় বায়ু
তোমার পরশে বহে' চন্দ্রমা কিরণ—
তোমার তনুর জ্যোতি ;—বৃদ্ধি করে আয়ুঃ।

বিকাশে অযুত পদ্ম পদস্পর্শে তব,—
উত্তাল সাগর বহে চুম্বিয়া চরণ—
শিরোপরে চন্দ্রাতপ নব-নীল নভ ;
জলদ-ধারায় তব করুণা প্লাবন।

তোমার প্রকাশ হেরি উদয় অচলে,
তোমারি বারতা শুনি সিন্ধু শঙ্খ নাদে,—
তোমার চরণ বিশ্ব মানস কমলে ;
তোমার বন্দনা ধরা কোটী কণ্ঠে সাধে।

অপরূপ তব রূপ হে অরূপ ! আজি
আঁখি না ধরিতে পারে ; নিখিল ব্যাপিয়া
বিরাজিত তুমি প্রভু ! রিক্ত ফুল সাজি
কি দিয়ে পূজিব তোমা না পাই ভাবিয়া।

মানস পূজায় তবে এসো বিশ্বগুরু !
অশ্রুজলে অর্ঘ্য ধরো,—বেদনা চন্দনে
'অভিলাষ' পুষ্প লও ; এ হৃদয়-মরু—
ফোটেনি কমল তাই ব্যথা জাগে মনে।

হে বিশ্ব শরণ দেব ! এই নিবেদন,
যে দিন জীবন-রবি হবে অস্তমিত—
সহস্রার দল মাঝে রাখিয়া চরণ—
সে দিন শুনায়ো মোরে তোমারি সঙ্গীত।

শ্রীমৎ অভেদানন্দ মহারাজজীর স্মরণে

শ্রীরঙ্গলাল ভৌমিক বি-এল

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্ব্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

—স্বামী অভেদানন্দ।।

অদ্বৈত বেদান্ত ও অখণ্ড ঐক্যের একনিষ্ঠ প্রচারক আত্মজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব ভেদবিহীন দৃষ্টি সার্থকনামা নির্ভীক সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর জীবন ও বাণী সম্যক আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনন্যসাধারণ প্রতিভা সাপেক্ষ। আমার পক্ষে সে চেষ্টা দুরূহ। মহামানবগণকে না জানা দুর্ভাগ্য, ভুল করিয়া জানা ততোধিক দুর্ভাগ্য, কিন্তু নিজ অজ্ঞতা ও অসামর্থ্য বশতঃ তাঁহাদের সম্পর্কে অপরের মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া পাপ। তাই আমি অতি সাধারণ ভাবে এই মহাপুরুষের মহান জীবনের দুই চারিটী কথা বলিবার চেষ্টা করিব মাত্র। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ন্যায় মুক্তাত্মা সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনালোচনা করিতে যাইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে তারিখ মাস উল্লেখে বৃত্তান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গেলে কোনও লাভ নাই। তাঁহাদের এই সব কার্য্যাবলির ভিতর হইতে ও তাঁহাদের প্রচারিত অমূল্য ও অমর বাণী সমূহ হইতে মানব আদর্শ ও জীবনযাত্রার প্রকৃত পথনির্দ্দেশের অনুসন্ধান আবশ্যক। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই। তাই দুই চারিটী ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যতীত আমার আর কিছু বলার সামর্থ্য হয় নাই। মহৎ জীবনের বিশ্লেষণে সম্যক ফলবান হইতে না পারিলেও আলোচনা নিরর্থক হয় না। ইংরেজ কবি ঠিকই বলিয়াছেন "By admiration we live." মহত্ত্বের ও মহান আদর্শের মহিমা কীর্ত্তন নিজেদের অন্ততঃ কথঞ্চিৎ অগ্রগতির সহায়ক হয়। এই সাহসেই আমি নিজ শক্তি সামর্থ্যের অভাব সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেছি। ত্রুটী বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্বাশ্রমে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র। তাঁহার পিতা স্বর্গগত রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত বিদ্যালয় Oriental Seminaryতে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম নায়ক, পরমহংসদেবের অপর মন্ত্রশিষ্য প্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ঐ বিদ্যালয়ে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবরের পুণ্য দিনে জন্মগ্রহণ করেন ও জগৎ

কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমগ্র বিশ্বে অদ্বৈত বেদান্তের বিজয়দুন্দুভি ও বিশ্বমানবতার বাণী উচ্চরবে নিনাদিত করিয়া এবং ভারতের অতি গৌরবের দিনে যাহা একদা তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব প্রেমের অমর সংবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচার করিয়া পরিণত বয়সে গৌরবমণ্ডিত মস্তকে আত্মজ্ঞানের মহিমা লাবণ্যচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মরদেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবনাদর্শ ও অমর লেখনীপ্রসূত যে বিরাট সম্পদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অন্তর্নিহিত প্রেরণা অনাগত ভবিষ্যতে মানবমনকে শান্ত সমাহিত করিয়া প্রেম ও শান্তির ইঙ্গিত প্রদান করিবে।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল জ্যোতি যাঁহারা ভারতের দেশ সমূহে বিচ্ছুরিত করিয়া জগৎ-সভায় ভারতের জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতমগণ মধ্যে অন্যতম।

জীবন প্রভাতেই তাঁহার হৃদয় পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাপরম্পরার অন্তরালে তৎসমুদয়ের মূলীভূত কারণানুসন্ধানে ও যোগাভ্যাসে আকৃষ্ট হয়। সদ্গুরু লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলে। ব্যাগ্র ব্যাকুল একনিষ্ঠ প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। কিশোর বয়সেই তাঁহার সদ্গুরু লাভ হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কালীপ্রসাদ যুগাবতার ভগবান পরমহংসদেবের কৃপা লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ কি ১৮ বৎসর।

প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ আপন পূত: স্পর্শে তাঁহার অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি সঞ্চয় করেন। কিশোর কালীপ্রসাদ সেই লোকাতীত শক্তিপ্রভাবে কঠোর তপস্যায় যোগীজনবাঞ্ছিত সমাধি লাভ করেন এবং সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনপথের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানান্বেষণে তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অতুলনীয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনে তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দর্শন, বিজ্ঞান, গূঢ়তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি মানব জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থসমূহ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর সন্ন্যাস গ্রহণে কালীপ্রসাদ স্বামী অভেদানন্দ নামে অভিহিত হন। বর্ত্তমানে বিশ্ববিখ্যাত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদি আশ্রম বরানগরে "দানাদের কুঠিতে" যুবক কালীপ্রসাদ তীব্র তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। যে ঘরে তিনি তপোরত থাকিতেন তাহা কালী তপস্বীর ঘর বলিয়া পরিচিত হয়।

কিছুকাল ঐরূপ তপজপে কাটাইয়া পরিব্রজ্যা গ্রহণে স্বামী মহারাজ সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। ঐ সময়ে আত্মদর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি কিছুকাল দেবাত্মা হিমপর্ব্বতের নির্জ্জন গহ্বরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। আত্মার সম্পদে সমৃদ্ধ যাঁহারা তাঁহারা সমস্ত

জগৎকে আপন জ্ঞানে নিজ আবিষ্কৃত তত্ত্ব বিশ্ববাসীকে বিলাইয়া দিতে সমুৎসুক। স্বামিজী মহারাজ মানব কল্যাণের মহৎ ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে গিরিগুহায় তপশ্চরণে নিজ মুক্তি কামনা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সত্যের, প্রেমের, আনন্দের বাণী বিশ্বময় প্রচার করিতে বাহির হইয়া পড়েন।

সঙ্ঘনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বেদান্ত প্রচার কার্য্যে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় বৎসরাধিক থাকার পর তাঁহাকে আমেরিকায় যাইতে হয়। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মোক্ষমূলার, কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ মনীষী Paul Daussen প্রভৃতির সহিত স্বামিজী মহারাজের ভারতীয় দর্শনালোচনা হয়। স্বল্পকাল মধ্যে তিনি ইংলণ্ডের নানাস্থানে নানারূপে ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করিয়া যশস্বী হন। পরবৎসর স্বামিজী মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে প্রচার কার্য্যে আমেরিকা মহাদেশে গমন করেন। বেদান্তের বাণী তদ্দেশ ও কালোপযোগী ও তাহাদের চিন্তাধারায় সহজবোধ্য ও গ্রহণীয় করিয়া প্রচারোদ্দেশে স্বামী অভেদানন্দ মানব-জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জ্জন করিতে অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে তাঁহাকে আমেরিকায় একই সময়েই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইয়াছিল। তিনি শরীরতত্ত্ব, স্নায়ুবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিশ্বালয়ের অধ্যয়ন নিরত ছাত্রের ন্যায় শিক্ষা করিয়াছিলেন। Harvard University প্রভৃতি আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ও মনীষী দার্শনিকগণের পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাবলী অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিতেন, আবার পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান-ভাণ্ডার তাঁহাদের নিকট উন্মুক্ত করিতেন। ঐরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিচয় ও আদান প্রদানের ধারা অধিকতর বিস্তার ও পুষ্টি-লাভ করে। নিউইয়র্ক সহরের বেদান্তসমিতির সভাপতিরূপে সমগ্র আমেরিকাখণ্ডে বেদান্তের বাণী ও ভারতীয় সংস্কৃতির বহুল প্রচারে তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার সমগ্র বিজ্ঞজনমণ্ডলীর সহিত দর্শন বিজ্ঞান আলোচনায় ও ভারতের মর্ম্মবাণী প্রচারে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর কাল কঠোর শ্রম করিয়াছিলেন ও তাঁহার ও তাঁহার দেশবাসীর প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্ন সভ্যতার জনগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক Unitarian Minister Dr. Culter স্বামিজীর হিন্দু-ধর্ম্মাদর্শ সম্পর্কীয় বক্তৃতা শ্রবণে বলিয়াছিলেন "স্বামিজী আপনাকে আমি উৎকৃষ্টতর হিন্দু করিতে পারিয়াছি কিনা জানি না কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে আপনি আমাকে উন্নততর খৃষ্টান করিয়াছেন" এই একটী কথাতেই সমন্বয় আচার্য্য পরমহংসের কৃতি সন্তানের ধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী প্রচারের সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

দীর্ঘকাল আমেরিকা দেশে বেদান্ত প্রচারের পর গৌরবমণ্ডিত শিরে স্বামী অভেদানন্দ

১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফিরিবার পথে স্বামিজী হনলুলুর Pan Pacific Educational Conferenceএ ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি চীন, জাপান ও মালয় ভ্রমণ করেন এবং বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তত্তৎদেশীয় সভ্যতা, সাধনা ও কনফিউসিয়ান বৌদ্ধ ও তৎ ধর্ম্মসম্বন্ধেও আলোচনা করেন ও গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতাবলী প্রদান করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

দেশে ফিরিয়া স্বামিজী রামকৃষ্ণবাণী ও বেদান্ত প্রচার কল্পে কলিকাতায় ও দার্জ্জিলিংএ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন ও বিশ্ববাণী নামে মাসিকপত্র প্রচারে তাঁহার অমূল্য উপদেশ দেশময় বিস্তারের সুব্যবস্থা করে। স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সভাপতি থাকা কালে ১৯৩৭ সনের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা মহানগরীতে তদীয় গুরুদেব যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উৎসবে একদিনের সম্মিলনীতে সভাপতিরূপে স্বামিজীর আগমন মাত্র পৃথিবীর সর্ব্বদেশাগত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ তাঁহাকে যেরূপ সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদান করেন তাহা হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম বিশ্ববাসী মহামনাগণের হৃদয়ে কি উচ্চ সম্মানের আসন তাঁহার জন্য চির প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

স্বামী অভেদানন্দের বাণী বেদান্তের আদর্শ প্রচারের বাণী। বহু বিচিত্রকে নিয়ে এক সুসঙ্গত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অখণ্ড সুষমার বাণী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সম্প্রসারিত বিশ্ব ও বিশ্বাতীত বৈচিত্র্যের মূলীভূত ঐক্যের সন্ধানের আত্মদর্শনের বাণী। তাঁহার বাণী সমন্বয়ের বাণী। কর্ম্ম, ভক্তি এবং জ্ঞানের সাধনার ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন মানবের শক্তি নিষ্ঠা ও আবেষ্টনের উপযোগী সাধনা সহায়ে একই গন্তব্য বিষয়—ভগবতানুভূতি বা আত্মজ্ঞান, অর্জ্জনে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোনও কলহ দ্বন্দ্বের কারণ থাকিতে পারে না। উদ্দেশ্য সকলেরই এক। একটী পথ দিয়েই যে সবাইকে যেতে হবে তার কোনও মানে নাই। ঐক্যানুভূতির সম্প্রসারণই প্রেম। প্রেম যত বেড়ে যাবে মানব তত শান্তি পাবে। ভেদ বিদ্বেষের বেদনা, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত জনিত ক্ষোভ তত কমে যাবে। স্বামিজী বলিতেন, পূবে যত অগ্রসর হবে পশ্চিম তত দূরে সরে যাবে। সৎবৃত্তি অনুশীলন করিলেই অন্য বৃত্তিগুলী আপনা থেকেই পালায়। অখণ্ডকে খণ্ড করে দেখলেই দুঃখের আরম্ভ। সাধনার দ্বারা অখণ্ডকে অখণ্ড ভাবে দেখতে পারলে সঠিক জীবন মুক্ত। শুভ অশুভ সকল অবস্থাতেই যিনি অবিচলিত থাকতে পারেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। তাই বলে কাঠের মত জড় হতে হবে না—সুখ দুঃখের অতীত হতে হবে। অর্থাৎ কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করবে কিন্তু কর্ম্মে বা ফলে আসক্ত হবে না। ভগবানকে আমাদের ভিতরই পেতে হবে। শ্রমিকের শ্রমসাধ্য কর্ম্ম, বুদ্ধিজীবীর প্রতিভা সাপেক্ষ কর্ম্ম, সাধকের আধ্যাত্মিক কর্ম্ম সকলই ভগবানের আরাধনা। ভালবাসা ব্যক্তি বিশেষে অর্পিত হলে ক্ষণস্থায়ী হয়। ভালবাসার পাত্রের নাশের সহিত দারুণ দুঃখ ও ক্ষোভ

উপস্থিত হয়। ভালবাসা তাই অবিনশ্বর আদর্শের উপর স্থাপিত করিতে হয় অর্থাৎ সর্ব্বভূতে প্রেম অভ্যাস করতে হয়; ইহাই ভগবৎ সাধনা—তা যে ভাবে যে আদর্শ গ্রহণ করুক না কেন।

আবার বলতেন ঈশ্বর ঈশ্বর করছ, কে ঈশ্বর! আকাশে কি বসে আছেন? তাকে কি করে সেবা করবে? এই সমস্ত মনুষ্য সমষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখ। তাকে বলা হয় বিরাট পুরুষ। এই ভাবে তোমার সংসারে স্ত্রী পুত্রের ভিতর—নমঃশূদ্র চণ্ডাল ব্রাহ্মণ এই সবার ভিতরে যে নারায়ণ আছেন তাকে দেখ। আর এই ঈশ্বর বুদ্ধি করে মান যশ স্বার্থ সিদ্ধি কিছুর দিকে লক্ষ্য না রেখে তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের সেবা করে যাও। স্ত্রী, শূদ্র সম্বন্ধে তাঁহার বাণী খুব উদার। শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে বলতে গিয়া তিনি বলিতেন এই জিনিষটা আমাদের দেশে নাই। এই দেখনা যারা খেটে খায় তারা কত নীচুতে পড়ে আছে। ভেবে দেখ এই জন্যই কি জাতি হিসাবে আমরা সবার চেয়ে পেছিয়ে পড়িনি? নারীদের কথা বলতে বলেছেন এদের গয়না টাকা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের ঘরে শিকলি দিয়ে রেখেছে। তারা যেন পুরুষের ভোগের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। চিরকালটা হাতাবেড়ী নিয়েই কাটাবে। এই কি জীবনের উদ্দেশ্য? মেয়েদের কি আত্মা নেই? তাদের কি আত্মজ্ঞান হবে না?

এইরূপে বিশ্ব-প্রেম, ধর্ম্ম সমন্বয়, অনাসক্ত আদর্শ প্রীতি, অহৈতুকী ভক্তি, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সত্য শিবসুন্দরের অবস্থানের অনুভূতি, স্ত্রী শূদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবে নারায়ণ দর্শনাদি বহু গভীর তত্ত্ব সমূহ স্বামিজী বক্তৃতায়, লিপায়, সর্ব্বোপরি নিজ জীবন যাপন প্রণালীতে সহজ সরল ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন।

আমি সেই রামকৃষ্ণ শিষ্য মহামানব স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতেছি।

শক্তি-পূজা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

১ শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন "ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।" ব্রহ্ম কি কোন নাম বা সংজ্ঞা বাচক? বৃহত্বাদ্ ব্রহ্মমুচ্যতে। বৃহৎ বলিয়াই ব্রহ্ম বলি। যিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার—তিনি তো বাক্য মনের অতীত আমাদের ক্ষুদ্র মন বুদ্ধি সেখানে পৌঁছতে পারে না। "এক সের ঘটীতে কি পাঁচ সের জল ধরে?" —যে শক্তি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন, এই ত্রিগুণাত্মিকা জগত যাঁর শক্তিতে উদ্ভূত, চালিত এবং বিলীন হচ্চে—তিনি মহাশক্তি প্রকৃতি স্বরূপিনী—ব্রহ্মশক্তি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেবী সূক্তে আছে—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বিনোভা ॥

অর্থাৎ আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু দ্বাদশ আদিত্য এবং অন্যান্য অসংখ্য বিশ্বদেবগণকে নিয়ন্ত্রিত এবং অনুপ্রাণিত করে বিচরণ করি। আমি মিত্র বরুণ উভয়কে ও ইন্দ্র ও অগ্নি দুইজনকে এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে ধারণ করে থাকি।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥

অর্থাৎ আমি শত্রুহন্তা সোমকে ধারণ করছি, বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা। পোষণকর্ত্তা সূর্য্যকে আর বীর্য্য-ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতা ভগদেবতাকে ধারণ করে রয়েছি, আমি হবিঃ প্রদানকারী যজ্ঞ-সাধককে ও শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্মানুষ্ঠানকারীকে কর্মফল বিধান করে থাকি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥

আমি পরমেশ্বরী স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগতের আমি নিয়ন্ত্রী, আমি অভিষ্ট ও ধনৈশ্বর্য্য কর্মফলদাত্রী, আমি ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী অপরোক্ষানুভূতি জ্ঞানস্বরূপিনী, যজ্ঞরূপা সমুদায় উপাদানের প্রধান মূল তত্ত্ব আমি, তাই দেবতারা চরাচরাত্মক জগতে সর্ববস্তুতে এবং সর্বভূতগণের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট—আমাকেই উপাসনা করে।

দেবীসূক্তে—বৈদিক ঋষিদের নিকট সেই ব্রহ্মশক্তি এই ভাবে প্রকাশ পেয়েছিলেন। শ্রুতিতে এই মহাশক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে কেনোপনিষদে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত রয়েছে। সংক্ষেপে তা এখানে বিবৃত করছি। দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা বিজয়ী হয়ে উল্লাসিত হয়েছে; বিজয় গর্বে তাঁরা আপনাদিগকে বলশালী মনে করে সবাই বলতে লাগল—"বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।" এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।" দেবতাদের এই অভিমান জানতে পেরে তাদের কল্যাণের জন্য ব্রহ্ম তাঁদের ইন্দ্রিয় গোচর হলেন। নূতন অপরিচিত অদ্ভুত পুরুষ দেখে দেবতারা অগ্নিকে বলিলেন "জাত বেদ কে এই যক্ষ জেনে এস।" অগ্নি সেই অদ্ভুত পুরুষের সমীপে গেলে পর তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? অগ্নি বললেন—"আমি জাতবেদ, অগ্নি।" যক্ষ তাঁর নাম শুনে বললেন—তোমার বীর্য্যের পরিচয় কি? অগ্নি বললেন—"জগতের সমস্ত দ্রব্যকে আমি পুড়িয়ে দিতে পারি।" যক্ষ তখন অগ্নির সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করে বললেন—"এইটীকে দগ্ধ কর। অগ্নি সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করে বিফল হয়ে দেবতাদের কাছে গিয়ে জানালেন—ইনি কে তা জানতে পারলাম না।" তখন দেবতারা বায়ু দেবতাকে পাঠালেন,—বায়ুকে যক্ষটী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" পরিচয়ে বায়ু বললেন "আমি মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু।" যক্ষ প্রশ্ন করলেন—"তোমার কি বীর্য্য?" বায়ু বললেন আমি সব গ্রহণ করতে পারি,—অর্থাৎ আমার বেগে সব স্থানচ্যুত হয়ে আমার বেগে চলে আসে।"

যক্ষ তাঁর সম্মুখে তৃণটী রেখে বললেন "দেখি একে তুমি উড়িয়ে নিয়ে গ্রহণ কর।" বায়ু প্রাণপণ শক্তি প্রকাশ করে তৃণটীকে নড়াতে পারলেন না। বায়ু হতাশ হয়ে দেবতাদের কাছে গিয়ে বললেন যে, "এই অদ্ভুত মানুষের পরিচয় জানতে পারলাম না।"

তখন দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন "হে মঘবন্ তুমি জেনে এস এই অদ্ভুত পুরুষটী কে? কিন্তু ইন্দ্র গিয়ে দেখতে পেলেন যে কেউ সেখানে নেই। ইন্দ্র সেই অদ্ভুত পুরুষের পরিচয় জানবার জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন। যে আকাশে সেই যক্ষ আবির্ভূত হয়েছিলেন সেখানে তিনি ধ্যানস্তিমিত লোচনে দেখলেন পরম সুশোভনা স্ত্রী মূর্তি উমা হৈমবতীকে। ইন্দ্র মহাশক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী উমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "এই অদ্ভুত পুরুষ কে?" তদুত্তরে উমা ইন্দ্রকে বললেন—ইনি ব্রহ্ম। এঁর বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমান্বিত মনে করছ"—"ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ উমার বাক্যেই ইন্দ্র জানতে পারলেন ইনি ব্রহ্ম।

এই আখ্যায়িকার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি—মহাশক্তির কৃপাতেই ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হয়। বেদ ও উপনিষদে দেবীসূক্তে, রাত্রিসূক্তে এবং উপনিষদে আমরা শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই।

অগ্নির সাতটী লোল জিহ্বার নাম আমরা মুণ্ডকোপনিষদে পাই যথা—

"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী—
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা।

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি এবং দেবী—এই সাতটী লেলায়মান অগ্নির জিহ্বা।—আহুতিসমূহ এই সাতটী জিহ্বাদ্বারা গৃহীত হয়ে—সাধককে দেবতাদের একেশ্বর অধিপতির নিকট নিয়ে যায়। সপ্ত জিহ্বাই মহাশক্তির প্রতীক। সপ্ত জিহ্বার যে নামগুলি উল্লিখিত হয়েছে সেইগুলি পৃথক ভাবে স্বতন্ত্র দেবীরূপে উত্তরকালে পূজিত হয়েছে।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে—

তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

তাঁরা ধ্যান যোগে সমাধি সহায়ে দেখতে পেলেন সেই নিগূঢ়া ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্ম শক্তিকে যিনি নিখিল বস্তুর কারণ সমূহ কাল ও প্রাণীদিগকে পরিচালনা করছেন।—

"ন তস্য কার্য্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ ॥

তাঁর কার্য্য কারণ নাই, তাঁর সমান বা তাঁর শ্রেষ্ঠও কেউ নেই, এরই বিচিত্ররূপিনী পরাশক্তির কথা শোনা যায়। এই পরাশক্তির জ্ঞান ও বল ক্রিয়াই স্বাভাবিকী।

ঋগ্বেদাদি এবং উপনিষদগুলির আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে শক্তিপূজা নূতন নয়। প্রাচীন ঋষিরা মহাশক্তিকে বা ব্রহ্মশক্তিকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবেই দেখতেন। শুধু তাই নয়—উমা হৈমবতীর কৃপায় ব্রহ্মের পরিচয় ঘটে। যে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন যে প্রকৃতি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে বিশ্বের লীলা প্রকাশ করছেন, যে প্রকৃতি অপূর্ব কর্মচক্র প্রবর্ত্তন করে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথে জ্ঞান-অজ্ঞানের আলোছায়ায় জীবকে সুখদুঃখ ও পরাশান্তি ভোগ করাচ্ছেন—সেই প্রকৃতি—সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তির তুষ্টিবিধান ও উপাসনা না করলে কেহ এই দূরতিক্রমণীয় মায়াকে অতিক্রম করতে পারে না।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী" অর্থাৎ তুমি স্ত্রী তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে ॥

তিনি স্ত্রীও নন পুরুষও নন নপুংসকও নন। যখন তিনি যে ভাবে শরীর ধারণ করেন তখন তিনি সেইরূপেই প্রকাশ পান। তিনি কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি কখনও বা নপুংসক বা উভয়লিঙ্গ। দেবী স্বয়ং দেব্যুপনিষদে বলছেন "অহং ব্রহ্ম স্বরূপিনী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ। শূন্যাকাশূন্যঞ্চ। অহমানন্দানানন্দা।—বিজ্ঞানাবিজ্ঞানেঽহম। বেদোঽহম-বেদোঽহম্। বিদ্যাঽহমবিদ্যাঽহম্। অজাঽহমনজাঽহম্।" অর্থাৎ আমি ব্রহ্মস্বরূপিনী,—আমিই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ। আমি শূন্য ও অশূন্য। আনন্দ ও অনানন্দ। আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান। আমি বেদ বা জ্ঞান আমি অবেদ বা অজ্ঞান। বিদ্যাঅবিদ্যা আমি। আমিই আদি ও অনাদি। সুতরাং স্ত্রী পুরুষভাবে উপাসনা সাধকের ভাবানুযায়ী। কেহ নিরাকার ব্রহ্মের সমাহিত হবার জন্য নির্বিকল্প বা নির্বীজ সমাধির জন্য কঠোর সাধন করছেন, কেহ রূপের মাধুর্য্যে অখিল রসামৃতসিন্ধুর পঞ্চ রসে উপাসনা বা সেবা করছেন, কেহ তাঁকে পরম পিতা পরমেশ্বর বা মহেশ্বর বলে ডাকছেন আবার কেহ বা "মা জগজ্জননী জগদম্বে" বলে সন্তান ভাবে বিভোর হয়ে ভাবমুখে আছেন। কিন্তু সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনাই সবাই করছে। যার যেমন আধার বা অধিকার,—যার যেমন ভাব বা প্রত্যয়, যার যেমন ইচ্ছা বা রুচি। সরল মনে শুদ্ধ চিত্তে তাঁর পূজা না করলে সাড়া পাওয়া যায় না। ফাঁকি দিয়ে বা বাক্যের ও বুদ্ধির বাহাদুরী দেখিয়ে ধর্মসাধনা হয় না। এই জন্য শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান বা পূজার দ্বারা চিত্ত-

শুদ্ধি করতে হবে। চিত্ত-শুদ্ধি মানে কায়মনবাক্যে পবিত্রতা—যেখানে কামনার লেশ থাকবে না। যেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী ; বিষয় হতে যেখানে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হয়েছে, মন, চিত্ত, সংযত হয়েছে, অহং নাশ হয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ইষ্টে যোগযুক্ত—এই ভাবে যার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে সেই যথার্থভাবে জগন্মাতাকে সরল ভাবে ডাকতে পারে। তারই ঠিক ডাকার মত ডাকা হয়, তাই মা জগদম্বা তার সম্মুখে আবির্ভূত হন। ইহাই সাধন বা উপাসনা। তন্ত্র : তন্ত্রেই জগন্মাতার উপাসনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আবহাওয়া এদেশে শিক্ষিত ভারতবাসীদের ভিতর প্রবেশ করে তন্ত্রের বিপক্ষে তাদের মনকে বিষযুক্ত করেছিল। উড্রফ সাহেবের বই পড়ে কোন কোন শিক্ষিত ভারতবাসীর তন্ত্রের উপর শ্রদ্ধা ও কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐতিহাসিকেরা তন্ত্রকে বৌদ্ধপরবর্ত্তী বা বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন যুগের সৃষ্টি বলে প্রচার করে থাকেন। কোন কোন পণ্ডিত আবার তন্ত্রকে ভারতের বাইরে থেকে আমদানী ধর্ম বলে নির্দেশ করেন। দুঃখের বিষয় যারা এইসব মতামত প্রকাশ করে থাকেন—তারা অনেকেই ধর্মসাধনা সম্বন্ধে অজ্ঞ, ধর্মে তাদের আস্থা নেই—এবং তন্ত্রাদি বিষয়ে তাদের কোন ধারণা নেই বললে হয়। কতকগুলি অনাচারী ধর্মব্যবসায়ী ধর্মহীন কপট ব্যক্তিদের আচরণ ও ব্যাখ্যা শুনে তারা তন্ত্রের সমালোচনা করেন। থাক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বাদানুবাদের কথা অপ্রাসঙ্গিক। তন্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন—তাই ঐতিহাসিকেরা এর ইতিহাস খুঁজে পান না। বৌদ্ধধর্মের বহু পূর্বে এমন কি বৈদিক যুগ থেকে শক্তি পূজা প্রচলিত হয়েছে। কোন পীঠে আমরা দেখতে পাই relic worship বা স্মারক অস্থির পূজা। দেবীর অঙ্গের ছিন্নাংশের উপাসনায় পীঠের উৎপত্তি। বেদীর মধ্যে সেই অঙ্গচিহ্ন থাকে। যে দেশে যে দেবমূর্ত্তি প্রচলিত তাহার আকারেই বিগ্রহ। কোথাও প্রতিষ্ঠা হয়েছে বা কোথাও হয়নি। এই তন্ত্রধর্মের এরূপ বহুল প্রচার হয়েছিল যে শুধু এই ধর্ম ভারতেই আবদ্ধ থাকে নি—ভারতের বাইরে গিয়ে দেবীর পীঠ স্থাপিত হয়েছিল। তন্ত্রসাধনা গুপ্তভাবে আচরিত হত বলেই এর ইতিহাস লুপ্ত হয়েছে। তন্ত্র এত উদার যে ভারতে যখন যে দার্শনিক মতবাদ বা সিদ্ধান্ত আচার্য্যেরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন—শক্তি পূজায় ও তন্ত্রশাস্ত্রে সাধকেরা বা কৌল আচার্যেরা তা গ্রহণ করেছেন। এতে কোন দ্বিধা করেন নি। তাই তন্ত্রে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। সাধনার অন্তরালে ও বাস্তবভাবে তা অঙ্গীভূত হয়ে অনন্তভাবরূপিণীর ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

অধিকারী ভেদে তন্ত্রে তিন প্রকার সাধনা মুখ্যরূপে চলিত রয়েছে, দিব্যভাব, বীর ভাব ও পশুভাব। দিব্যভাবে ও পশুভাবে শুদ্ধাচার জপ ও শুদ্ধভাবের উপাসনা। বীরভাবে বীরাচারী সাধকেরা মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মিথুন প্রভৃতি পঞ্চ মকার অবলম্বন করেন বলেই তন্ত্রের নাম শুনিলেই লোকের মনে ঘৃণা ও বীভৎস রসের উদ্রেক হয়। কুলার্ণবে তাই বলেছেন—

"মদ্যপানে মনুষ্যো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানে রতা সর্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ ॥
মাংস ভক্ষণ মাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্বে পুণ্যভাজো ভবন্তুহ।
স্ত্রী-সম্ভোগেন দেবেশ যদি মোক্ষং লভেতে বৈ।
সর্বোঽপি জন্তবো লোকে মুক্তা স্যুঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ।

অর্থাৎ যদি মানুষ মদ্য পান করে সিদ্ধিলাভ করত তবে সব পামর মাতালই সিদ্ধ হত। মাংস ভক্ষণে যদি পুণ্যগতি হত তবে যত মাংসাশী লোকই পুণ্যভাগী হতে পারত।—স্ত্রী-সম্ভোগে যদি মোক্ষ লাভ হত তবে পৃথিবীর জীব-জন্তু সকলেই স্ত্রী-সম্ভোগে মুক্তি পেত।—" এর গূঢ় অর্থ আছে। মদ্য মাংস প্রভৃতি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গুপ্ত সাধনার জন্য বাইরে এই সব শব্দ প্রকাশ করা হত কিন্তু প্রকৃত সাধনায় এর স্থান নেই। তাই উক্ত তন্ত্রেই বলা হয়েছে—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্য সাধকঃ।

আবার কৈবল্যতন্ত্র বলেছেন—

যদুক্তং পরমংব্রহ্ম নির্বিকারাং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদকং জ্ঞানং তন্মদ্য পরিকীর্ত্তিতম্।

এক তন্ত্র যোগ-সাধনার অঙ্গরূপে মদ্যকে নির্দেশ করছেন—ব্রহ্মরন্ধ্রে থেকে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয় তাই মদ্য। আবার জ্ঞানী সাধক বলছেন যে নির্বিকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্মে যে জ্ঞানানন্দ জন্মে তাই মদ্য। এইভাবে আগমসার তন্ত্রে বলছেন মাংস মানে বাক্‌সংযম।—

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া—তদংশান রসনা-প্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধকঃ ॥

মৎস্য সাধনা মানে প্রাণায়াম।

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ ॥

গঙ্গা অর্থে ইড়া ও যমুনা মানে পিঙ্গলা এই নাড়ীর মধ্যে যে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে তাই মৎস্য। এই মাছ যে ভক্ষণ করে অর্থাৎ কুম্ভকে স্থিতি করে সেই মৎস্য সাধক।

মুদ্রা সাধনা—সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।

আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্।
সূর্য্য কোটী প্রতিকাশং চন্দ্র কোটী সুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতম্।

মস্তকে সহস্রদল কমলের কর্ণিকার মধ্যে কূটস্থ মহাকুণ্ডলিনী যুক্ত যে আত্মা রয়েছেন—যিনি

পারদের ন্যায় নির্মল শুভ্র, কোটী সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান এবং কোটী চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ সুশীতল তাঁকে যিনি জানতে পেরেছেন তিনিই মুদ্রা সাধক। এখানে আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলে মুদ্রা সাধককে নির্দেশ করছেন।

মৈথুনকে পরমতত্ত্ব তন্ত্র বলেছেন। এই মৈথুনেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। মৈথুন কি? কুলকুণ্ডলিনী যখন শিবের সহিত যুক্ত হন সেই অবস্থার নাম মৈথুন।

"রেফাস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারাশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।
আকার হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদোচ্যতে।

কুলকুণ্ডলিনীতে কুঙ্কুমাভাস অর্থাৎ রক্তবর্ণ তেজস্তত্ত্ব আকাররূপ হংস অর্থাৎ আত্মা রয়েছেন—শ্বাসপ্রশ্বাসদ্বারা অজপারূপে যখন আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মযোনির মধ্যে বিন্দু স্বরূপ মকারের মিলন হয়—এই মিলন মানে ঊর্দ্ধে স্থিতি লাভ—সেই আত্মারামের অবস্থাই মিথুন। মোট কথা প্রণব (অ, উ, ম ওঙ্কারে) অজপাজপে যখন কুণ্ডলিনীস্থিত আত্মা সহস্রারে মহাশিব বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন—সেই শিবশক্তির মিলনকেই মিথুন বলে। প্রতিমা প্রভৃতি প্রতীক সম্মুখে রাখিয়া সাধক যেমন ইষ্টের ধ্যান বা পূজা করে থাকে সেইরকম বীরাচারীরা বাহিরে প্রতীক সামনে রেখে যোগযুক্তভাবে অজপাজপ ও ধ্যান করবে। প্রবৃত্তিপরায়ণ অসংযত ভোগলুব্ধ সাধকেরা যে মৌলিকী প্রতীককে তাদের ভোগের উপকরণ করবে তার আর আশ্চর্য্য কি? যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ত্যাগের জলন্ত বিগ্রহ ছিলেন আজ তার সম্প্রদায়ে যে নেড়ানেড়ী বৈষ্ণব ও সেবাদাসীর ছড়াছড়ি—তাহার জন্য কি মহাপ্রভুর ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম দায়ী? তন্ত্র বা তন্ত্রোপাসনা এই অধঃপতনের জন্য তেমনি দায়ী নয়—অনধিকারী ও ভ্রষ্ট গুরু ব্যবসায়ীরাই অবনতির মূল।

তন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানী হয় নি। সাধনার বাস্তব রূপেই হয়।" শক্তিপূজার যথার্থ তত্ত্ব ভুলেই আমরা শক্তিহীন হচ্ছি। শক্তিপূজার অভাবে আমরা দিন দিন অবনতির চরম পঙ্কে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছি। তন্ত্র মহাসমন্বয়ের ধর্ম। জগতের ধর্মের যত রূপ আছে তা তন্ত্র সাধক জানতে পেরে তন্ত্রে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। তন্ত্রের মত সাম্যবাদী শাস্ত্র জগতে বিরল। কৌল চণ্ডালও ব্রাহ্মণের মত পূজনীয়। ভৈরবীচক্রে সকলেই একবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। দেবীর প্রসাদ কুকুরের উচ্ছিষ্ট হলেও পবিত্র, যে কোন জাতের দ্বারা স্পৃষ্ট হলেও তার পবিত্রতা নষ্ট হয় না। শ্রীক্ষেত্রে নীলাচলে জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য—শক্তি পূজারই নিদর্শন। মাষকলাইর পিঠা আদা প্রভৃতি বিষ্ণুনৈবেদ্যে ব্যবহৃত হয় না। পূজকেরা সকলেই শাক্ত বা কৌল। নারকেলের জল শঙ্খের মধ্য হইতে নিবেদিত ভোগে পড়িলে তবে মহাপ্রসাদ বলে বাহিরে আসে। নীলাচলে জগন্নাথ সাক্ষাৎ

দক্ষিণা কালিকা, সুভদ্রা ভুবনেশ্বরী এবং বলরাম স্বয়ং ভৈরব। জগন্নাথই স্বয়ং বিমলা—তাঁরই শ্রীঅঙ্গে দেবীর চিহ্নাদি আছে, এখন যাঁকে বিমলা বলা যায় তিনি পার্শ্বদেবতা—তাঁর অন্নভোগ নেই। জগন্নাথের মহাপ্রসাদই তাঁকে সমর্পণ করা হয়। বৈষ্ণব আধিপত্যের পরে শারদীয় পূজায় কদিন গোপনে রাত্রে এই বিমলার নিকট পূজায় আমিষ নিবেদিত হয়ে থাকে। এই পূজা পূর্বে জগন্নাথের নিকট হত। রামানুজী প্রভাবের পর জগন্নাথ বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হয়েছে, তবুও আজ পর্যন্ত চিরপ্রচলিত পূজার নিয়ম চলিত রয়েছে—তা কেউ বন্ধ করতে পারে নি। তন্ত্রোক্ত বিধানে পূজার পর আবার গোপাল মন্ত্রে পূজা ও নিবেদন করা হয়। শ্রীজগন্নাথের সেবা পূজা যে তন্ত্রোক্ত বিধানে হয়ে থাকে তা পাণ্ডারা পর্যন্ত স্বীকার করে থাকে। যাক তন্ত্রে সাত প্রকার আচারই নির্দেশ আছে। যথা:—

সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি॥

অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উত্তম বেদাচার, তন্মধ্যে বৈষ্ণবাচার শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবের চেয়ে দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার থেকে বামাচার উত্তম, বামাচার থেকে সিদ্ধান্তচার উত্তম—সিদ্ধান্তচারের চেয়েও কৌল উত্তম। কৌলাচার অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নেই। রুদ্রযামলে আছে পঞ্চমকার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হলেও তন্ত্রে সকলকে অধিকার দেওয়া হয় নি।

"কুলদ্রব্যং নিষেবতে যদা সত্ত্বাধিকা মতি।
অন্যথা সেবনং কুর্য্যাৎ পতনায়ৈব কল্পতে॥

অর্থাৎ যখন সত্ত্বপ্রধান মন থাকবে তখন কুলদ্রব্যের (পঞ্চমকারের) সেবা করবে। অন্যথা পতন হবে।

অনেক ভোগলুব্ধ ব্যক্তি তন্ত্রের বিশেষতঃ বামাচারের ভক্ত। তারা বোঝে পঞ্চমকারই পরম ধর্ম। তা খেয়ে মার নাম জপ করলেই সিদ্ধি। এটা মূর্খের ধারণা।

শক্তি পূজা—ব্রহ্মের উপাসনা। পিতৃভাবে উপাসনা বেদে আর খৃষ্টধর্মে দেখতে পাওয়া যায়। "ওঁ পিতানোঽসি" মন্ত্রে ঋষিরা ব্রহ্মকে চিন্তা করতেন। কেহ কেহ বলে এখানে পিতা অর্থে পিতা মাতা উভয়কেই বোঝায়। গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্ট বলচেন—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ"—

অর্থাৎ আমিই পিতা আমিই মাতা, আমিই বিধাতা পিতামহ ব্রহ্মা। মাতৃভাবে ব্রহ্মোপাসনা গীতাতেও উক্ত হয়েছে। মাতৃভাব সহজ ও স্বতোচ্ছ্বাসাদি ভাব।—"মা"—শব্দ দুঃখে কষ্টে সব সময়েই মানুষের অন্তরে উদিত হয়।—"মা" নামের শক্তিতে মানুষ ইন্দ্রিয় জয়

করতে সক্ষম হয়, অন্তর্মুখী হতে শেখে, দুর্বল অবসন্ন চিত্তে মহা বল আনতে পারে, ঘোর নৈরাশ্যে হতাশায় ও নিঃসহায়ে "মা"র নামে মানুষ শ্রেষ্ঠ অবলম্বন পায়। সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় যে ব্রহ্ম তাকে ধারণা করতে পারে? কিন্তু "মা" বলে ডাকলে বুক ভরে যায়—একটা অজানিত শক্তি দেহ মনে প্রাণে সঞ্চারিত হয়—তাই শক্তিপূজা করিতে বিধি। সিদ্ধ রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে বহিবে ধারা।
ওমা হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে　　　মনের আঁধার যাবে ছুটে
ওমা ধরাতলে পড়বে লুটে তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ　　　ঘুচে যাবে মনের খেদ
ওরে শত শত সত্য বেদ—তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে　　　মা বিরাজে সব ঘটে
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে—তিমিরে তিমির হরা।

এতো ব্রহ্মেরই উপাসনা—মাতৃভাবে তাঁকে ডাকলে মাতৃরূপে এসে তিনি অবিদ্যার পারে সেই জ্যোতির্ময় লোকে নিয়ে যান—যেখানে ব্রহ্মানুভূতি হয়। আমাদের বাংলাদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবে বিভোর হয়েছিলেন।—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখতে পাওয়া যায়—

"রুক্মিণীর ভাবে গোপীনাথে কোলে করি।
মহালক্ষ্মী ভাবে উঠে খট্টার উপর।
সম্মুখে রহিলা সভে যোড় হস্ত করি
"মোর স্তব পড়" বোলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
"জননী আবেশ" বুঝিলেন সর্বজনে।
সেইরূপে সভে স্তুতি পড়ে প্রভু শুনে।
কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহ চণ্ডী স্তুতি।
সভে স্তুতি পড়েন—যাহার যেন মতি।
"জয় জয় জয় জগজ্জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া।

সভে কহিলা মাতা! তোমারি শরণ।
শুভদৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন।"
এই মত সভেই করেন নিবেদন।
ঊর্দ্ধবাহু করি সভেই করেন ক্রন্দন॥

গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন।

* * * *

চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব ক্রন্দন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন।
মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এইমত সভারে দিলেন পুত্রভাব॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।
স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥
কমলা পার্বতী দয়া মহা নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগতজননী॥

নদীয়া চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র মাতৃভাবে বিভোর হয়ে স্বয়ং জগজ্জননী হয়েছিলেন এবং ভক্তদের স্তন্যদান করে তাদের মাতৃভাবে ভাবান্বিত করেছিলেন! তাই যারা শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বৈষ্ণবাগ্রণী—তারা তাঁকে "মা" "মা" বলে স্তবস্তুতি করেছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে তাঁরা ভাবমুখে স্তন্যপান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস বলছেন—

"নাচিলা জননী ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সভার পুরিলা আশ স্তন পিয়াইয়া॥
সপ্তদিন শ্রীআচার্য্য-রত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জলে।
দেখায়ে সুকৃতি সব মহাকুতূহলে॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্য মন্দিরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহো নাহি ধরে॥
লোকে বলে কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে—ফুটীয়া যেন পড়ে॥

শ্রীবৃন্দাবনে গোপীরা কাত্যায়নীর পূজা করে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পেয়েছিলেন, ভগবান-শ্রীগৌরচন্দ্রও নিজে মাতৃভাবে মাতৃরূপ ধারণ করে—তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠীকে মাতৃপূজা করতে শিখিয়ে ছিলেন। শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সুদুর্লভা বিষ্ণুভক্তি পাওয়া যায়।—আজ শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যে জগত টলমল করছে—তিনি ছিলেন মাতৃভাবের বিরাট বিগ্রহ। জগজ্জননী যেন তাঁর দেহে ভাবঘন মূর্ত্তিতে বিরাজ করছেন। ভাগীরথীকূলে দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীর মূলে তিনি "মা" "মা" বলে যে শক্তিমন্ত্রে আবাহন করেছিলেন—সেই ধ্বনি এখনও

জগতের অণুপরমাণুতে ধ্বনিত হচ্ছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাই আজ মাতৃনামের আহ্বান—"বন্দে মাতরম্।" আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মহাশক্তির নামে "মা" "মা" রবে আজ সাধকের চিত্ত মুখরিত। আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র "মা" "মা" ডাকে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে আন্দোলিত করেছিলেন।—আজ পণ্ডিচারীতে যোগী শ্রীঅরবিন্দ মাতৃনামের সাধনায় বিভোর হয়ে মৌনভাবে কত বাণী বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ যে মাতৃনামের বীজ ছড়িয়ে গেছেন তা কাটিয়ে সে গভীর পার হওয়া একালে সাধকের পক্ষে সাধ্যাতীত।

এই শক্তি সাধনায় বাঙ্গালী দুর্গোৎসব, কালীপূজা জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি শক্তিপূজায় যে সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠান করেছে—তা ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। মহামায়া যে আমাদের সাজানো প্রতিমার "মা"নন তিনি যে আমাদের সত্যিকার "মা"। আবাল বৃদ্ধবনিতার "মা"—তিনি যে আমাদের সুখ দুঃখে "মা" আনন্দে নিরানন্দে "মা" উৎসব-ব্যসনে "মা"। আমাদের হাসিকান্নায় মিশানো "মা" তাই আজ মহামায়ার আগমনে গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণত হয়ে বলছি—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্ত—পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমস্তুতে॥

সঙ্ঘবার্ত্তা

আচার্য্য শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব—

বিগত সোমবার ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ (২৯ ভাদ্র ১৩৪৮) কৃষ্ণানবমী তিথিতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ষট্সপ্ততিতম শুভজন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ এবং ভক্তবৃন্দ মঙ্গলারতির সময় "বিশ্বস্রষ্টা পুরুষস্বমাত্তঃ" এবং "প্রকৃতিং পরমাং" স্তোত্র দুইটি ভক্তিবিগলিতস্বরে পাঠ করিবার পর কয়েকটি ভজন সঙ্গীত সকলের সমবেত কণ্ঠে গীত হইয়াছিল। তাহার পর আশ্রম মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজী মহারাজের সুবৃহৎ তৈলচিত্র নানা বর্ণময় সুন্দর

সুগন্ধী ফুল, পুষ্পমালা ও বিবিধ পত্রদ্বারা সুচারুরূপে সুসজ্জিত করার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষপূজা চণ্ডীপাঠ ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের শয়নকক্ষে ও বসিবার ঘরে তাঁহার শয্যা আসন ও প্রতিকৃতি-গুলি অতি অপরূপ রূপে বিভূষিত করা হইয়াছিল। এমন একটি সুগম্ভীর পবিত্র ও অপার্থিব ভাব এই উৎসবের দিন পূজনীয় স্বামিজী মহারাজের কক্ষে বিরাজ করিতেছিল যে উৎসবে আগত শত শত ভক্ত নরনারী সেই ঘরে প্রণাম করিবার সময় যেন স্বামিজী মহারাজের দ্যুতিদীপ্ত জ্ঞানগম্ভীর আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্তির পবিত্র সান্নিধ্য অনুভব করিতেছিলেন। প্রত্যেকেরই মনে হইতেছিল যেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাযোগী তাঁহার নীরব আশীর্বাদে উপস্থিত সকলকে ধন্য করিতেছেন।

মধ্যাহ্নে বেলা এগারটার সময় সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনলীলা কথকথা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। এই কথকতা গানে কয়েক বত শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

তাহার পর বেলা দুইটা হইতে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত নরনারী আশ্রমের বিরাট প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া দরিদ্রনারায়ণগণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা এই উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

বৈকালে পাঁচটার সময় কীর্তন কলানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার সম্প্রদায়ের সহিত অললিত সুমধুর স্বরে "মাথুর-কীর্তন" গান করিয়া বহু শত শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করেন। কীর্তন শেষ হইবার পর আবার অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় উৎসব শেষ হইয়া যায়। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিঙ্এ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব

গত ১২ই সেপ্টেম্বর সোমবার দিন শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ৭৬তম জন্মোৎসব স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম এবং সহস্রাধিক লোককে বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হয়। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় বাঙ্গালী এবং নেপালী স্বেচ্ছাসেবকদের পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈকাল ৬ ঘটিকায় নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাব্লিক হলে রায় বাহাদুর শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতি সভার অধিবেশন হয়। দার্জ্জিলিঙ্এ এত বড় জনসভা এই বোধ হয় প্রথম,—হলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও তিল ধারণের

স্থান ছিল না। স্থানাভাবে হলের বাহিরে বহু ভদ্রলোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের প্রাঞ্জল বক্তৃতায় লোক-সমূহ বিশেষ আকৃষ্ট হয়। বক্তৃতার পর আশ্রম স্কুলের বাঙ্গালী ছেলেদের "ভক্তির-জোর" এবং নেপালী ছেলেদের "মহামায়া" অভিনয় দ্বারা লোকজনের আনন্দ বর্দ্ধন করা হয়। জনসাধারণের এরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত ভাব দেখিয়া পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজীর প্রতি তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।

অভেদানন্দ সমাধি মন্দির :—কাশীপুর শ্মশান তীর্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধি মন্দিরের ঠিক পার্শ্বেই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পার্থিব দেহ অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল। তাঁহার অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সাহায্য ও সহানুভূতিতে গত [illegible]শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথিতে, ঐ স্থানে তাঁর একটী সমাধি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শ্রীভগবানের কৃপায় ঐ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যেই সমাধা হইবার সম্ভাবনা। এই শুভকার্য্যে সর্ব্ববিধ সশ্রদ্ধ সাহায্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠের প্রেসিডেণ্ট বা সম্পাদক কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে।

স্বামী অভেদানন্দজীর স্মৃতি-সভা

[illegible] কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "শিক্ষাতীর্থ" নামক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার স্বামী অভেদানন্দজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এবং ক্ষুদিরাম বসু লেনস্থ "সেবাশ্রম সঙ্ঘে" এক স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন বিদ্যাসাগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়। "শিক্ষাতীর্থের" প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রীর আশীর্ব্বাণী এবং স্বামীজীর প্রতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাবাণী পঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁর আশীর্ব্বাণীতে বলেন,—"আমি জানিলাম তোমরা স্বর্গীয় স্বামী অভেদানন্দজীর জীবন ও লেখা লইয়া আলোচনা করিবে। আমি তাঁহাকে জানিতাম এবং এই জন্যই বলিতে পারি ইহা খুবই ভাল। সংকল্প ও সংপ্রসঙ্গ ইহাতেই হইতে পারিবে। আমি আশা করিতেছি ইহা তোমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া সিদ্ধির পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের কল্যাণ হউক!"

ইহার পর মৃণালকান্তি মণ্ডল, রণজিৎ সিংহ দত্ত রায় এবং অংশুমান ঘোষ তিনটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের প্রচারকার্য্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর অবদানের আলোচনা করেন। "সেবাশ্রম সঙ্ঘের" অধ্যাপক শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার বসু এম. এ. পুরাণরত্ন মহাশয় স্বামীজীর ব্যক্তিগত জীবনসম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন, "Swamiji was a perfect getle-man—a gentleman in the sense of an ideal man." আমরা বাঙ্গালায় সাধারণতঃ gentleman বলতে শুধু ভদ্রলোক বুঝে থাকি! কিন্তু ইংরাজীতে gentleman-এর মানে

এর চেয়েও ঢের বেশী! Newman, Asquith প্রমুখ পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ 'gentleman' এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে এ শব্দের মানে হচ্ছে 'a perfect being'। বক্তা মহাশয় আরও বলেন যে স্বামীজী ছিলেন একজন মস্তবড় জ্ঞানযোগী। তিনি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে যে বিশাল জ্ঞান ও বিরাট দার্শনিক-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা একমাত্র বিবেকানন্দের সঙ্গেই তুলনা হতে পারে! "স্তোত্র রত্নাকর" গ্রন্থে, স্বামীজীর যে সকল সংস্কৃত স্তোত্রাবলী আছে তা তাঁকে অমর করে রাখবে। এই স্তোত্রগুলি ভাবে, সম্পদে ও মাধুর্যে একমাত্র আচার্য্য শঙ্করের স্তোত্রাবলীর সঙ্গেই তুলিত হবার যোগ্য।

তারপর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল মহাশয় স্বামীজীর সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দেন এবং বলেন স্বামীজীর আদর্শই তাঁকে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রাখবে মানব মনে। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর জীবনের বৈচিত্র কর্মক্ষেত্র নিয়ে আলোচনাকালে বলেন "স্বামীজীর সম্বন্ধে যা সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা তা হচ্ছে এই যে তিনি ছিলেন একজন উচুদরের বৈদান্তিক। মুসলমান আক্রমণের ফলে ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মে ও শাস্ত্রে নানারূপ কলুষ ও অনাচার প্রবেশলাভ করে এবং ইংরাজ আমলে সেগুলি জাতির প্রাণকে নানা জীর্ণ আচারের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। মানুষ তখন সত্যিকারের বেদান্তধর্ম হারিয়ে ফেলে। এই সময় ধর্মজগতে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁর সাথে সাথে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত শিক্ষা পুনরুত্থানের যে চেষ্টা আরম্ভ করেন সেই আরব্ধ চেষ্টাকে চরম রূপ দান করেন তারই গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ। বেদান্তের ব্যাখ্যাতা হিসাবে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন!"

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
"শিক্ষাতীর্থের সেক্রেটারী"

গ্রন্থ সমালোচনা

সূত্ত-নিপাত— অনুবাদক ভিক্ষু শীলভদ্র

প্রাপ্তিস্থান মহাবোধি সোসাইটি, ৪ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের যাঁহারা নিয়মিত পাঠক তাঁহাদের নিকট ভিক্ষু শ্রীমৎ শীলভদ্র মহাশয়ের নাম বিশেষ পরিচিত। ইতিপূর্ব্বে তিনি Dr Paul Carus-এর "The 'Gospel of Buddha" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের "বুদ্ধবাণী" নাম দিয়া একটি অতি সুন্দর সচিত্র অনুবাদ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রদ্ধেয় শীলভদ্র মহাশয় কৃত খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'থেরী গাথার' অনুবাদ সর্ব্বসাধারণে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তিনি উক্ত নিকায়ের অন্তর্গত 'সূত্ত নিপাত' সুষ্ঠুভাবে অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধধর্মানুরাগী সুধীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু শীলভদ্র মহাশয় অনুবাদকার্যে সিদ্ধহস্ত; সূত্তগুলির মূলানুগত সুন্দর, সুললিত, চিত্তাকর্ষক বাংলা অনুবাদ পাঠকবর্গকে আনন্দ দান করিবে। বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার অনুবাদ নৈপুণ্যের যশ আরও বর্দ্ধিত হইল। শারিপুত্ত লিখিত 'নিদ্দেশের' বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইলে সূত্ত-নিপাতের কোন কোন অংশের অন্তর্নিহিত অর্থ সাধারণের নিকট আরও বোধগম্য হইবে বলিয়া মনে হয়। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সত্যই খুব মনোরম হইয়াছে। বহু চিত্রাদি সম্বলিত এই সুন্দর পুস্তকখানি ধর্ম্মলিপ্সু পাঠক মাত্রেরই আদরণীয় হইবে।

EVOLUTION AND RELIGION

Swami Abhedananda

May we hear that which is auspicious to us, may we see divinity in all living creatures, and feel the presence of the almighty everywhere as within ourselves, may all the acts of our bodies, and the thoughts of our minds be directed to the service of that almighty Being, may we have peace in our souls ; peace, peace, peace be unto us all

The subject for this afternoon is Evolution and Religion If we study the scriptures of the different religious systems of the world, we find that from ancient times human minds have tried to trace the origin, cause, and source of this world ; these scriptures have recorded the experiences of human beings in their attempts to find out the proper solution of the problem of creation, and to know from what source the phenomena have come into existence When the primitive man found himself surrounded on all sides by huge walls of high mountains, the snow-capped peaks of which, piercing the cloud and defying the changes of weather, stood like gigantic pillars to support, as it were, the blue canopy overhead. When the same primitive man watched the everflowing, never-resting streams of mighty rivers, which poured into their beds volumes of water every moment, rushing head long to meet as it were, some distant ocean. When he saw around him tall trees with spreading branches, and beautiful foliage, bearing fruits delicious in taste, plants with flowers and variegated foliage, and when his eyes were dazzled with the sight of the grand harmonies of the heavens overhead, he exclaimed with faltering voice and trembling heart. "How grand ! how majestic ! how beautiful ! how powerful are all these things around me ! What are they, why do they exist, whence did they come ?" These questions of the primitive man were the beginning of all questions about nature , they were the beginning of all researches and investigations in the domain of the universe.

In the whole animal kingdom, human beings alone are asking such questions. In the Rig Veda (the most ancient scriptures of the world) similar questions have been preserved in their original sense, and have been handed down to us ; the Vedic poets asked again and again : "Where is the first ? who is the 'I' ? from what grew the heavens and the earth ? whence this manifold creation ? who knows the secret ?" Do we not

ask the same questions to-day ? Is it not true that all the scientists, and all the great thinkers and philosophers of the world, have asked similar questions from time to time ? The human mind cannot rest satisfied with simple perception of surrounding object, it must ask "From whence do they come ?" "Whither do they go ?"

Various answers have been given to these questions by different thinkers and inspired seers of truth. Some of these answers were merely grand imagery, some were mixed with poetical imagination, mere poetry, others were mythological stories and descriptions. Thinkers in some countries said water was the cause of the phenomenal universe ; others said fire was the cause, from fire had proceeded the sun, moon, etc. Some other poets imagined that there must be a maker of the heavens and the earth, a maker who had fashioned the world, like a carpenter who makes a chair or table, or a potter who fashions a jar. That maker must be like a human being with human qualifications and attributes, only infinitely bigger in size, and more powerful than any ordinary mortal. From this anthropomorphic conception of an invisible maker grew this theory of creation.

The ancient Semitic tribes had a theory of creation by which they explained the origin of the phenomenal world, and it has been accepted for two thousand years by millions of Jews, Christians and Mahometans of different countries. This theory was based upon the belief that the maker of heaven and earth by his supernatural powers produced the world out of nothing, at a definite period of time and it was considered to be a miracle ; the same creator was supposed to have lived for an eternity before he made up his mind to create the world, and ever since the six days of creation were over he has been resting ; he created not only the worlds, the planets, and everything of the universe, but also their contents, those of the inorganic world first and then the organic world. A similar description of the world of creation we find in the Zend Avesta, the scriptures of the Parsees, but the errors of this theory are apparent to many thoughtful minds. In the Middle Ages men could not express their opinions freely, or write in scientific terms what they thought, and in fact all scientific investigation ceased.

It was the nineteenth century that gave birth to the science of evolution in Europe ; although in the eighteenth century Kant, the great German philosopher, and Laplace attempted for the first time to explain the origin of the creation of the universe by Newtonian laws and for the first time tried to trace the beginning of the world into the vast mass of

nebulous matter. Although they tried by his nebular hypothesis to explain the mechanical formation, and the separation of the different planets, still the theory of evolution was not fully established before the time of Darwin and Haeckel who were the pioneers that advanced this theory in the proof of their search after the true solution of the problem of creation; they tried their best through observations and experiments to discover the laws that govern the universe, and they suceeeded.

This theory of evolution has demolished the structure of the belief in supernaturalism and many of the miracles, and has established the unity of nature and made evident the uniformity of all natural laws. We know now that this universe is infinite and unbounded in extent; it is empty in no spot, but everywhere filled with some substance; however fine and attenuated that substance may be, still it is there. The facts of evolution have opened our eyes to the truth that this world was not created six thousand years ago, but that it is beginningless and endless; it is eternal.

The material of the world goes through various transformations as liquid, gaseous, solid before a planet or a cosmic body becomes habitable, either by vegetables or animals; a large mass of the vegetable substance, or whatever it may be called, passes through the gaseous state, liquid state, solid state and when it is cooled becomes the home of various plants and animals of different kinds; this process may take millions of years and then, in course of time the solid body begins to dissolve and gradually involves into its original nebulous material, or ethereal substance. Ascending through the process of evolution, matter gradually passes from one form to another until organic life is possible. Every period of evolution is followed by a cycle of involution or dissolution, as it is called by some of the scientists. Dissolution means disintegration of the solid mass and the reversion to the primordial condition.

All these planetary systems, the suns, moons, stars and all other cosmic bodies are subject to this evolution and involution. Our mother earth, millions and millions of years ago, was formed out of a portion of the substance of solar system and now it is habitable; we find many plants and flowers; but the time will come when she will grow cold and lifeless and will eventually fall back into the sun, but do you think the material, the substance of this earth will be destroyed, annihilated? No, it will remain and in course of time another form will appear.

By this theory of evolution we can also explain the origin and growth, step by step of all human beings; we know that human beings are not

ask the same questions to-day ? Is it not true that all the scientists, and all the great thinkers and philosophers of the world, have asked similar questions from time to time ? The human mind cannot rest satisfied with simple perception of surrounding object, it must ask "From whence do they come ?" "Whither do they go ?"

Various answers have been given to these questions by different thinkers and inspired seers of truth. Some of these answers were merely grand imagery, some were mixed with poetical imagination, mere poetry, others were mythological stories and descriptions Thinkers in some countries said water was the cause of the phenomenal universe ; others said fire was the cause, from fire had proceeded the sun, moon, etc. Some other poets imagined that there must be a maker of the heavens and the earth, a maker who had fashioned the world, like a carpenter who makes a chair or table, or a potter who fashions a jar That maker must be like a human being with human qualifications and attributes, only infinitely bigger in size, and more powerful than any ordinary mortal From this anthropomorphic conception of an invisible maker grew this theory of creation.

The ancient Semitic tribes had a theory of creation by which they explained the origin of the phenomenal world, and it has been accepted for two thousand years by millions of Jews, Christians and Mahometans of different countries. This theory was based upon the belief that the maker of heaven and earth by his supernatural powers produced the world out of nothing, at a definite period of time and it was considered to be a miracle ; the same creator was supposed to have lived for an eternity before he made up his mind to create the world, and ever since the six days of creation were over he has been resting ; he created not only the worlds, the planets, and everything of the universe, but also their contents, those of the inorganic world first and then the organic world. A similar description of the world of creation we find in the Zend Avesta, the scriptures of the Parsees, but the errors of this theory are apparent to many thoughtful minds. In the Middle Ages men could not express their opinions freely, or write in scientific terms what they thought, and in fact all scientific investigation ceased.

It was the nineteenth century that gave birth to the science of evolution in Europe ; although in the eighteenth century Kant, the great German philosopher, and Laplace attempted for the first time to explain the origin of the creation of the universe by Newtonian laws and for the first time tried to trace the beginning of the world into the vast mass of

nebulous matter. Although they tried by his nebular hypothesis to explain the mechanical formation, and the separation of the different planets, still the theory of evolution was not fully established before the time of Darwin and Haeckel who were the pioneers that advanced this theory in the proof of their search after the true solution of the problem of creation; they tried their best through observations and experiments to discover the laws that govern the universe, and they suceeeded

This theory of evolution has demolished the structure of the belief in supernaturalism and many of the miracles, and has established the unity of nature and made evident the uniformity of all natural laws We know now that this universe is infinite and unbounded in extent; it is empty in no spot, but everywhere filled with some substance; however fine and attenuated that substance may be, still it is there. The facts of evolution have opened our eyes to the truth that this world was not created six thousand years ago, but that it is beginningless and endless; it is eternal.

The material of the world goes through various transformations as liquid, gaseous, solid before a planet or a cosmic body becomes habitable, either by vegetables or animals; a large mass of the vegetable substance, or whatever it may be called, passes through the gaseous state, liquid state, solid state and when it is cooled becomes the home of various plants and animals of different kinds; this process may take millions of years and then, in course of time the solid body begins to dissolve and gradually involves into its original nebulous material, or ethereal substance. Ascending through the process of evolution, matter gradually passes from one form to another until organic life is possible. Every period of evolution is followed by a cycle of involution or dissolution, as it is called by some of the scientists. Dissolution means disintegration of the solid mass and the reversion to the primordial condition.

All these planetary systems, the suns, moons, stars and all other cosmic bodies are subject to this evolution and involution. Our mother earth, millions and millions of years ago, was formed out of a portion of the substance of solar system and now it is habitable; we find many plants and flowers; but the time will come when she will grow cold and lifeless and will eventually fall back into the sun, but do you think the material, the substance of this earth will be destroyed, annihilated? No, it will remain and in course of time another form will appear.

By this theory of evolution we can also explain the origin and growth, step by step of all human beings; we know that human beings are not

the effects of special creation by some supernatural being, or extra-mundane God, but the results of the evolution of the germs of life which existed from the beginningless past, either as animals or vegetables ; so we have not come into existence out of nothing, but we existed before this body was formed, in some form or other ; now we are living ; after death which means disintegration of the body (that is, the individual involution), we continue to exist, taking fresh forms again and again. The difference between lower animals and human beings is not of kind, but is one of degree.

Such being the conclusions of modern science we find ourselves utterly helpless when we try to harmonize these conclusions with the old-fashioned ideas of creation in Judaism, Christianity, Mahometanism and Zoroastrianism. Several attempts have been made by various thinkers in different countries to show the harmony that is supposed to exist between theology and the conclusions of modorn science. No religion can stand unsupported by logic or science ; in fact the theories of special creation that had been given by religions were supposed to be revealed truths , but in the light of modern science they are now regarded as irrational, untrue and unscientific.

The result of all this is : "How shall we think ?" This is the most difficult thing to do, we must think in our own minds ; some of those who think have lost their way ; they study science and there they stop ; many of them have said, "What is the use of studying religion, let us be contended with the study of science, that is all there is ; we do not know there is an eternal energy out of which all this matter, mind and everything have come into existence ; matter is indestructible, uncreated energy is indestructible,

The question arises, is it possible for a religion to have its foundation upon this theory of evolution as well as upon the truths that have been discovered by modern science ? has there ever been any such religion which does not teach special creation, but the existence through the doctrine of evolution, or the origin, growth and dissolution of the universe in the same way as modern science does ? The answer to this question is in the affirmative, yes, it is possible for a religion to have its foundation upon the doctrine of evolution and upon all the truths that have been discovered by modern science, because the object of religion is to discover the Truth. Science also tries to discover the truth and to explain it in terms of logic. And it is also true that there has been such a religion that does not advocate any theory of special creation out of nothing, but which exists through the doctrine of evolution ; this needs explanation.

India has given to the world a religion which explains through evolution, the origin, source of the phenomenal universe ; it is a religion which is not based upon any dogma or doctrine which is not supported by reason or science . it is a religion which has been in existence for ages and which has stood the ravages of time and brought consolation to the soul of millions, answering all the questions that have disturbed their minds , a religion which is not based upon any book but upon Truth and nothing but Truth. As early as seven hundred years before the birth of Christ, there appeared in India scientists and philosophers who studied nature ; through observations and experiments they discovered the laws of nature and for the first time, logically established the theory of evolution.

The first of these scientists and philosophers was Kapila, who is called the father of the evolution theory in India. His theories spread all over India and even outside of India ; all the immediate nations who came in contact with India were influenced more or less by the system of scientific philosophy of this great Kapila. His system was known as the Sankhya system. The idea of religion found amongst the Greek philosophers and neo-Platonists has been traced back to the influence of the Sankhya school : they came in contact with India and it is now proved that India had communication with these countries ; also in ancient times philosophers came to the school of Socrates.

Plato knew some of the philosophers. Alexander brought many of these great thinkers with him. Well has it been said by Sir Monier Monier-Williams in his "Brahminism and Hinduism" that "the Hindus were Spinozites more than two thousand years before the existence of Spinoza , and Darwinians many centuries before Darwin , and Evolutionists many centuries before the doctrine of Evolution had been accepted by the scientists of our time and before any word like evolution existed in any language of the world." Huxley knew this—he said in several places that "the doctrine of evolution was familiar to the Indian sages and philosophers ages before Paul of Tarsus was born."

In ancient times, long before it was known in any other country, this Kapila, the ancient philosophor, denied the existence of a personal creator, that is, a creator who sits outside the universe and fashions the universe as a potter fashions a jar ; he declared that something cannot come out of nothing ; this is known as a scientific fact, and he explained the building up of the cosmos by the gradual evolution of one eternal energy, called in Sanskrit Prakriti ; and he discovered the unity and eternity of nature as well as the uniformity of the laws of nature ; wherever light and heat

exist, that law is universal : if you can discover any law that governs your body, that law must be everywhere under similar conditions, and he also proved that dissolution or destruction of a thing meant nothing but the reversion of an effect to its original causal state ; when an effect goes back to its causal state, that is what we mean by destruction.

These truths which were discovered in India centuries before the birth of Christ have now become established facts, standing upon the rocks of the fundamental principles of modern science. The ancient seers of truth preached a religion which explained, through reason and logic, the origin, growth and dissolution of the universe, not by assuming any particular supernatural being, but by discovering the law of evolution that exists in nature, a natural law. This religion is known as the Vedanta religion ; it teaches : "Before the beginning of the manifestation of this phenomenal world there existed one infinite, absolute, universal Being, upon whose bosom rested the whole phenomenal universe in the germ state, or in the form of potential energy. 'We know the laws of correlation of forces and persistence of energy ; they have shown us that the various forces, like heat, light, electricity, magnetism, attraction, repulsion and all others, are nothing but so many manifestations or expressions of the universal energy ; this energy can neither be increased nor diminished, the sum total is always the same ; it is the source of all forms existing in the universe ; innumerable suns, moons, stars and planetary systems have come out of this one eternal energy through the process of evolution."

Again we find in Vedanta : "From this undifferentiated energy has come the vital force, mind, all the sense powers, powers of preception, intellect, as well as ether, heat, light, water and all that is liquid, gaseous and solid." This energy is described as insentient ; it is not intelligent energy, but the supreme Being, that absolute Being, upon whose bosom that energy rests, is the source of all intelligence, consciousness, knowledge ; all knowledge comes from that source ; having received the spiritual influx of that supreme Being, this universal energy begins to evolve and manifest itself in various forms of force and matter, and having gone through different stages of evolution, it is sometimes latent, sometimes manifest ; at first it was undifferentiated, now it is differentiated.

After the dissolution of the entire universe, if we can imagine such a thing, darkness exists in heat and light, so there will not be any darkness.

In order to fulfil the desires of the individual souls which rest latent in the cosmic mind at the time of the dissolution, the mother energy produces this phenomenal world, clothes these souls with various forms,

whether animal or human, and makes them go onward from stage to stage in the wheel of evolution ; this wheel of evolution is rotating from the beginningless past and will continue until the endless eternity, there is no rest. How many times have we taken bodies ? and how many times shall we do the same ? Who can tell ? Do you know how many times you have come into existence on this earth or on some other planet ? You may say some scriptures have said you did not exist before ; what proof is there that you did not exist before ? When everything is indestructible and uncreated, human souls must have existed ; if matter be uncreatable, force or energy be uncreatable, do you think human souls will be creatable ?

Some souls go to heaven, and after reaping the results for a certain length of time, and enjoying the pleasures of the celestial abode, come back perhaps to this earth to fulfil other desires which existed in a latent state in their souls. They all are subject to the law of evolution. These heavens are in the domain of the phenomenal universe. Vedanta is the only system of philosophy that teaches that heaven is also subject to change, and it leads human minds to go beyond heavens.

Some people go through different sufferings, both here and hereafter, and all these sufferings are the results of acts, either vicious or virtuous, but the ultimate aim of Religion of Vedanta is to have perfect liberation of the individual soul from this wheel of evolution and to be free from the causes that make you go through the different stages of evolution. As long as you have desires you must find some way of fulfilling those desires , find out how many desires you have at present, and you will see how strong they are. If you can draw a line and say "I have so many desires" you will find in three days you have other desires.

According to Vedanta, each soul must struggle for liberation, freedom from this wheel ; the aim is to get out of this course of involution and evolution as quickly as possible. (Of course you cannot lose your individuality and identity, even when you are out of this wheel). It also tells us that when you have attained to that liberation you have attained perfection with eternal rest, peace and unbounded happiness. Freedom from sickness, sorrow, birth and death, the soul is absolutely free.

This being the ideal, we must try to realize it ; as it is said in Vedanta, "This world can be realized by knowing the supreme which is called Brahman, that absolute, infinite source of intelligence, consciousness and bliss ; by knowing *that* we can be free from the wheel of evolution and involution, for that infinite Being remains always unaffected by it."

The supreme Being is free from the wheel of evolution and gives us freedom . we can attain to that liberation through this knowledge or realization, of the supreme Being. Modern science cannot be called religion, although it explains the theory of evolution, or the process of the formation of this world by discovering the laws of nature. Science is not religion, there is a great deal of difference between these.

We must not forget the true meaning of religion, "The perception of the infinite under such conditions as are able to influence the moral character ," then we shall see the difference that exists between science and religion ; then we shall be able to know how a religion can be based upon scientific truths, and how the Religion of Vedanta fulfils all the intellectual, moral and spiritual demands and aspirations of the human soul. In the first place, we already see that the ideal of Vedanta is the perception of the infinite or the realization of that supreme source of intelligence, consciousness and bliss, being and becoming conscious of the infinite within ourselves and perceiving the finite within the infinite and the temporal within the eternal, therefore it is religion.

Second, the duty of religion is to teach us not to do what our animal or selfish nature urges us to do. Vedanta philosophy also tells us we must renounce our attachment to sense-pleasures and comforts of the body , you must curb your desires and direct them toward the realization of that supreme Being, and create an extreme longing for freedom and liberation of the soul. Science, whether it is modern or ancient has no such ideal, therefore it cannot be called religion, but Vedanta is both a science and a religion : a science because, it accepts all the truths discovered by modern science, and explains, through logic and reason, how the evolution of the universe has come and is going on. It is a religion because it directs our energy toward the realization of that freedom ; it has fulfilled all the conditions of science and religion The condition of science is that there must be supremacy of reason over belief, and that is fulfilled in Vedanta, because it tells us not to accept anything upon hearsay or the decisions of others, not to believe in anything which does not harmonize with the scientific truths, and does not appeal to our reason ; therefore it is science. I have already explained why it is religion.

It also explains the origin and future of the individual souls, which modern science cannot do, because science must be based upon sense-perception, and it can never go beyond sense-perception and when it tries to go, it is no longer science, it is in the realm of metaphysics, or philosophy. It also explains the relation of the finite to the infinite, what

relation exists between the temporal and the eternal, and why we should seek the finite in the infinite and the infinite in the finite ; infinite cannot be limited by finite but is pervading and existing in and outside of it.

It is said that Supreme Source of existence, intelligence, and bliss called Brahman, is worshipped by all nations under different names, Jehovah, Jahveh, Father in heaven, or Allah, or Ahura Mazda, or Christ, or Buddha ; no matter what name we give or what attributes we ascribe to him, he is beyond human conception, beyond the reach of our thoughts, our mind and intellect, but at the same time he is near to our bodies, minds, and souls—he *is* the soul of our souls, the life of our life, the ultimate basis and foundation . in him we live, through him we exist and without him there can be nothing, therefore it is said : Thou shalt realize that supreme infinite Being in every form whence all the animate and inanimate objects of the world have proceeded, by which they live and into which they return at the time of dissolution ; knowing that alone thou shalt attain perfect freedom and liberation from the wheel of evolution and enjoy everlasting happiness, eternal peace, even in this life."

সম্পাদক—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী সদ্রূপানন্দ কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাসন্তী প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.	As.
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA ...	3	8
India and Her People (New Impression.) ...	3	0
Self-Knowledge	1	8
Path of Realisation	2	0
Divine Heritage of Man	2	0
Spiritual Unfoldment	1	8
Reincarnation	1	8
Philosophy of Work	1	12
Lectures and Addresses in India	2	4
How to be a Yogi	2	0
Great Saviours of the World	1	8
Human Affection and Divine Love (New Edition) ...	1	0
Religion of the 20th Century (New Edition) ...	0	8
Sri Ramakrishna (New Book)	0	4
Does the Soul exist after Death (New impression) ...	0	4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood. of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

19B, Raja Raj Krishna St,

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৪৮ { নবম সংখ্যা

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর—

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

"মু মিচ্ছ কহিব নি"
তীর্থের গুরু—পাণ্ডার মুখে
শুনেছিনু বাণী বহু দিন আগে
        এখন নিভৃতে
        চিত্তে অজানিতে
করে তাহা কানাকানি
"মু মিচ্ছ কহিব নি।"

নীল দরিয়ার
        দোলন লীলায়—
সিনান-নৃত্য সারি,
সেদিন মন খুশী ছিল ভারি।
    ডাকিয়া আদরে
      পাণ্ডা ঠাকুরে
        কহিনু মিনতি করি—
"জগৎ নাথের মহিমার কথা
কিছু শুনাও চিত্ত ভরি।"

মুণ্ডিত শিরে—শিখার গুচ্ছ—
অলক তিলক ভালে,
তাম্বুল রাগ যুক্ত অধরে
        দোলাইয়া শির
        পাণ্ডা প্রবীর
নির্ভর ভরা—স্বরে—
করিল প্রচার—
        মহিমা অপার
ভকতি অশ্রু নীরে।

        কহিনু ঠাকুর—
        একথা প্রচুর
শুনেছি পুরাণে পুঁথিতে,—
        কহ মহাশয়—
        যদি পরিচয় কিছু.
পেয়ে থাক লভিতে—।

মুক্ত করিয়া শিখার গ্রন্থি
        আঁটিয়া বাঁধিয়া নিল,
খুশীর পুলক আঁখি তারকার
আলোক দোলন দিল,
        নিকটে আমার
        আনিল তাঁহার—
দেহভার-খানি টানি

বিগত যুগের মহাসমরে
তীর্থপুরীর সাগর নীরে
রণ দুর্মদ 'জারমন' তরী
এমডেন্ "আয় খিলা" ;
সঞ্চারি ঘন দেব দরিয়ায়
ধ্বংসের ঘোর মত্ত নেশায়
ভীম হুঙ্কারে গরজন তুলি
দেব ঘুম ভাঙ্গি দিলা।"

কোটী তপনের প্রলয় বহ্নি
ঝাপি তারকায় জ্বালি
খর পরতাপ
জগতের নাথ
চাহিলা চক্ষু মেলি।

ক্রুদ্ধ প্রভুর
রক্ত আঁখির
প্রলয় নৃত্য দেখি
ডুবমণ তরী
ভয়ে থরথরি
দ্রুত চলি গেলা ভাসি।

করি সমাপন
দেব কীরতন
অবনত করি শির,
স্মরি দেবতায়...
পাণ্ডা সদাশয়
মুছিল অশ্রু নীর।

বুঝিনু সকলি
শুনিলাম শুধু—
একটী সত্য সুর—
"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ—
তর্কে বহুদূর"—

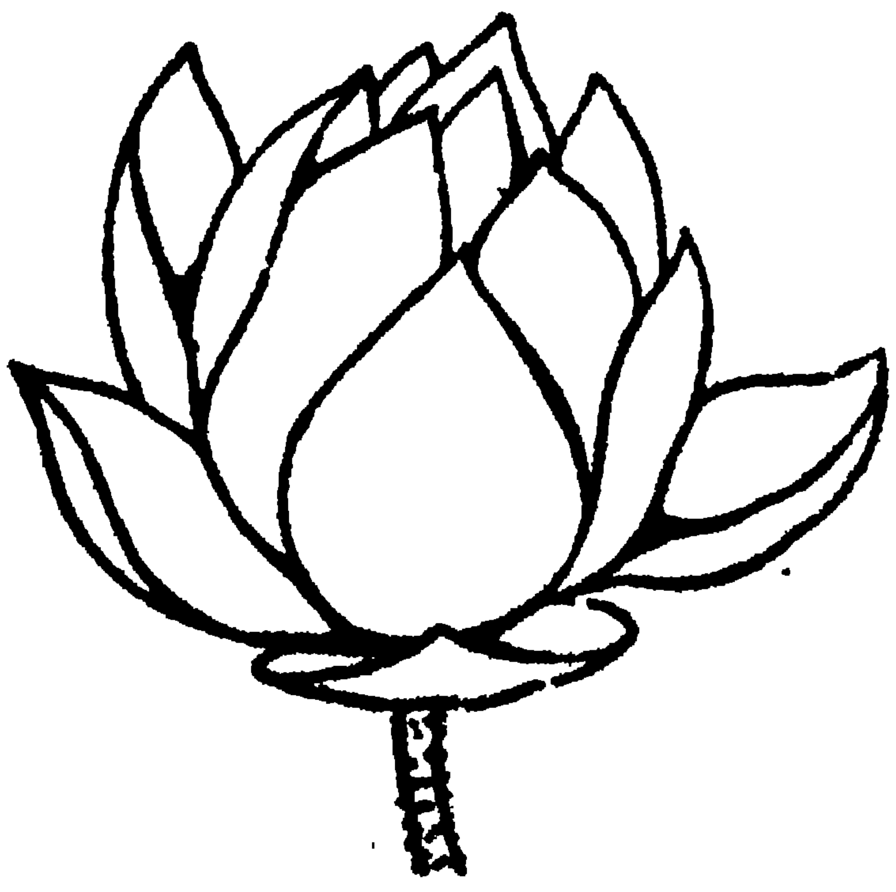

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

(৩)

প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামী অভেদানন্দ মাদ্রাজের "ব্রহ্মবাদিন্" নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধের নাম ছিল 'হিন্দু-প্রচারক।' ১৩৪৭ সালের ভাদ্র মাসের "বিশ্ববাণী" পত্রিকায় সেই প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সেই প্রবন্ধে মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম প্রচারের ধর্ম নহে একথা যাহারা বলেন তাহারা ভ্রান্ত। তরবারির মুখে ধর্মপ্রচারের বৃত্তান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সেরূপ ভাবে প্রচারের ধর্ম হিন্দু ধর্ম নহে, উহা তেমন ধর্মও নহে—একদিন যাহার প্রচার-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে জীবন্ত মানবকেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে হইয়াছিল! চৈতন্য ও সজীবতা ব্যতীত জীবন যেমন, প্রচার ব্যতিরেকে ধর্মও তেমনি। উহা তখন বদ্ধহীন, অনুদার ও মানবের কল্যাণ করিতে অসমর্থ। কালে কালে প্রত্যেক ধর্মই নানা আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং মানবকে সঙ্কীর্ণমনা করিয়া তোলে। অন্য কথায় ইহারই নাম ধর্মের গ্লানি। ভগবান্ তখন মানুষের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যান এবং মোহান্ধ মানব তাহার শূন্য মন্দিরে পূজার শঙ্খ বাজাইয়া মনে করে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

ধর্মের এইরূপ গ্লানি ঘটিলে অবতার বা অবতারপ্রতিম পুরুষদিগের আবির্ভাব হয়। তাহারা তখন সকল মলিনতা দূর করিয়া দিয়া ধর্মের পবিত্রতা ও সার্ব্বভৌমিকত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণ মানবসমাজ তখন সেই সকল মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি, ঐশ্বরিক অনুভূতি ও ধর্মজীবনে নানাবিধ উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ধন্য হয়। ধর্মশাস্ত্রের যে সকল বাণীর অর্থ ও সার্থকতা এতদিন তাহারা হারাইয়াছিল এবং সদর্থের পরিবর্ত্তে কদর্থ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতেছিল, কিম্বা দুর্ব্বোধ বলিয়া যেসকল বাণীকেই তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছিল—মহাপুরুষ প্রচারকগণ নিজ নিজ জীবনের আদর্শকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞানের নবীন আলোকসম্পাতে সেই সকল বাণীর প্রকৃত মর্ম বিশ্বের মোহান্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট উপস্থিত করেন। মানুষ তখন অনায়াসে বুঝিতে পারে যে, সাম্প্রদায়িকতা ধর্ম নহে, সঙ্ঘের মতবাদ ধর্ম নহে—ধর্মে সঙ্কীর্ণতার কোনও ক্ষেত্র নাই। উহা আকাশের ন্যায় উদার ও সাগরের ন্যায় গভীর। এই মহাপুরুষগণ তখন পৃথিবীর ধর্মশাস্ত্রের যে নবীন ভাষ্য ঘোষণা করেন মানব তাহাই গ্রহণ করিয়া ভাগবতজীবন লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হয়।

মহারাজ তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালের ধর্মপ্রচারকগণ তাঁহাদিগের আপন আপন যুগের মানবগণের উপযোগী করিয়া হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মনের ক্ষুধা মিটাইয়াছিলেন। সেই সকল প্রচারক ছিলেন প্রত্যেকেই এক এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহাদিগের সুপবিত্র চরিত্র এবং ভাগবত জীবন সহজেই অন্যের হৃদয় আকর্ষণ করিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই সেকালের লোকে শিখিত, কেমন করিয়া ধর্মজীবন লাভ করিতে হয়। বলিতে গেলে মানব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কাহিনী, ভারতের এই সকল মহর্ষিদিগের ধর্মপ্রচারের কাহিনী—সার্বভৌম বেদান্ত-ধর্মের উদার বিশ্লেষণের মনোহর ইতিবৃত্ত। সেকালে যে নানা ভাবে এই কাহিনী প্রচারিত হইত—পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মশাস্ত্রগুলি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

বৌদ্ধ ধর্মকে ভারত হইতে উৎখাত করিয়া যখন কুমারিল ভট্ট দেখা দিলেন তখন বেদের মহিমা কুমারিকা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইতে লাগিল এবং বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধেরাও ক্রমে ক্রমে নানাভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছায়াতলে আসিয়া দাঁড়াইল। কুমারিলের পর ভারত-গগন উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিলেন শ্রীশঙ্কর। তাঁহার কমণ্ডলু হইতে নিক্ষিপ্ত বারিস্পর্শে হিন্দুধর্ম এক নব শক্তি লাভ করিল। তিনি বেদান্তের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বৈদিক সৌধ নির্মাণ করিলেন। উপনিষৎ যে অদ্বৈতবাদ ঘোষণা করেন, শ্রীশঙ্কর তাহাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। শঙ্কর বুঝিয়াছিলেন যে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন এই উদার ধর্মমত প্রচার করিবার যোগ্যতা আর কাহারও নাই। কারণ সন্ন্যাসীর জীবনই ত্যাগের ও পবিত্রতার জীবন—উহাই আধ্যাত্মিক অনুভূতির জীবন। যাহাদিগের মধ্যে সে ভাব নাই বা কম আছে তাহারা ধর্মপ্রচারক হইবার যোগ্য নহে—ইহাই ছিল শ্রীশঙ্করের সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়।

মহারাজের প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পাঠ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই বাণীই মনে পড়ে—"প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি ক'রে এই জগৎ প্রকাশ করছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা। তিনি সাক্ষাৎকার হ'য়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দু'দিন লোকে শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি? যতক্ষণ তুমি বল্‌লে, ততক্ষণ লোকে বল্‌বে, 'আহা ইনি বেশ বল্‌ছেন!' তুমি থামবে, তারপর কোথাও কিছু নাই। যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জ্বাল রয়েছে' ততক্ষণ দুধটা ফোঁস্ ক'রে ফুলে ওঠে। জ্বালও টেনে নিলে, আর দুধও তেমনি কমে গেল। আর সাধন ক'রে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা' না হ'লে প্রচার হয় না। আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। (১)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাণী—শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী সঙ্কলিত।

পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম বার নিউইয়র্ক ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে বেদান্ত ধর্ম প্রচারের ভার দিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যেই কেহ কেহ নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির প্রচারকরূপে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাসীও হইয়াছিলেন। যদিও স্বামীজীর জীবন-চরিতে দেখিতে পাই যে, স্বামীজী কর্ত্তৃক আরব্ধ প্রচারকার্য্য ইঁহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত করিয়াছিলেন এবং নূতন নূতন লোক আনিয়া প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন, (২) কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে ইঁহারা বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাহা যদি পারিতেন তবে অল্পকাল পরেই স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে নামে মাত্র একটি বেদান্ত সমিতি পাইতেন না! (৩) নিউইয়র্কের এই নবীন আমেরিকান্ সন্ন্যাসীদিগের অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্ধৃত বাণীর মধ্যেই তাহার সন্ধান মিলিবে—"আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ, ঐ দু'দিন লোকে শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি?"

এই নবীন সন্ন্যাসিবর্গ "আদেশ" পান নাই বলিয়াই "either sincere" থাকা সত্ত্বেও নিউইয়র্কে কিছুই করিতে পারেন নাই! এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের আর একটি বাণীও মনে পড়ে—"যে লোক শিক্ষা দেবে তার যদি চাপরাস না থাকে তা' হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হলে কার কি রোগ বুঝতে পারা যায়, তাতে ঠিক ঠিক উপদেশ দেওয়া যায়।' (৪)

স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার প্রবন্ধ "হিন্দু প্রচারকের" একস্থানে বলিয়াছেন—শ্রীশঙ্করের পর সমুদিত হইলেন রামানুজ, মধ্ব, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক প্রভৃতি এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে শাশ্বত হিন্দুধর্ম প্রচার করিলেন। ইঁহারা সকলেই ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত ভক্তিমার্গে তখন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভারতের মানবমণ্ডলী, সেই এক অনাদি প্রেমময় ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইল—বন্যায় ভাগীরথী যেমন সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয় সেইরূপ। তাহার পর কালক্রমে যখন ভারতে

(২) Before departing from America he (Swami Vivekananda) had similarly felt a deep anxiety about leaving the work there without having trained competent teachers, who must be Sannyasins, to continue the Vedanta movement there. To this must be attributed his act *of making from amongst his American disciples several Sannyasins in New York, who after his departure carried on the propaganda, with great enthusiasm winning new adherents to the cause.*—The life of the Swami Vivekananda (Mayaboty 1915), vol III, page 54.

(৩) My Diary—Swami Abhedananda। বিশ্ববাণী।

(৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা-সার—শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী সঙ্কলিত।

মুসলমান প্রবেশ করিল তখনও দেখা যায় যে, হিন্দু-বেদান্তবাদই মুসলমান ধর্ম্মকেও নবরূপ দিয়া সুফী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই ভাবে ভারতে ধর্মপ্রচারের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া মহারাজ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগের ভারতে সেইরূপ প্রচারকের অভাব—যিনি একালের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত, শুধু ভারতের নহে—মহাভারতের অভিজ্ঞতায় যিনি শক্তিমান্ এবং যুগধর্ম নিত্যই যাঁহাকে নবীন চিন্তাধারায় সিক্ত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। এইরূপ সুযোগ্য ধর্মপ্রচারক যদি প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া সমগ্র বিশ্বে ধর্মপ্রচার করেন তবেই পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম বিরাজ করিবে এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্মে ধর্মে বিরোধের যে দাবানল এখন জ্বলিতেছে তাহা অচিরে নির্ব্বাপিত হইবে।

যদিও প্রচারক হইবার অনেক পূর্ব্বে মহারাজ এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন কিন্তু এগুলি এখন পড়িলে মনে হয় যেন বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়া তিনি ইঙ্গিতে নিজেরই আত্মচরিত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাইব যে তিনি নিজে ছিলেন ঠিক এইরূপ সর্ব্ব-গুণান্বিত ধর্মপ্রচারক। "চাপরাস" তাঁহার ছিল বলিয়াই নিউইয়র্কের (বলিতে গেলে মার্কিণেরই) লোক তাঁহার কথা যে ভুলিবার জন্যই শুনিয়াছিল, তাহা নহে, তাহারা উহা গ্রহণ করিবার জন্যই শুনিয়াছিল। তাঁহার তপস্যালব্ধ শক্তি-বলে সেই খৃষ্টানের দেশেও বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলি সমাদৃত, গৃহীত এবং অনেকের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং সে দেশের চিন্তাজগতে বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিল! কিরূপে তাহা ঘটিয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা বলিব। মার্কিন-চিন্তাজগতে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁহার ন্যায় ক্ষণজন্মা ধর্মপ্রচারক ভারতের ইতিহাসে অত্যন্তই দুর্লভ।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"যিনি আচার্য্য, তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করার জন্য ঢাল তলোয়ার চাই; আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়।" স্বামী অভেদানন্দের সমগ্র জীবন এই "ঢাল তলোয়ার" সংগ্রহের জীবন। কিরূপে তিনি সেই "ঢাল তরোয়াল" সংগ্রহ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু তাহার আভাষমাত্রই দেওয়া সম্ভব। বিশদ বিবরণের স্থান নাই; বাল্যকাল হইতে, ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনরিতে অধ্যয়ন কাল পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ। দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পর হইতেই পাশ্চাত্ত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার অবাধ অধিকার জন্মিয়াছিল!

কাশীপুর উদ্যান-বাটিকায় যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসা হইতেছিল তখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার প্রধান সেবক স্বরূপ (Personal attache to His holiness Sree Ramkrishna Paramahansa)" (৫) প্রাণপণে শুশ্রূষা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও "পাশ্চাত্ত্য

(৫) "কালী তপস্বী" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে ১৩৩৩ সালে শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০ পৃষ্ঠা।

দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্ত অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠে মনোনিবেশ করিলেন এবং ক্রমে Ganot's Physics, Herschel's Astronomy, Jhon Stuart Mill's Logic, Three Essays on Religion, Lewis History of Philosophy, Hamilton's Philosophy প্রভৃতি গ্রন্থ সম্যক্ আয়ত্ত করিলেন।..... তখন ভগবান্ বলিলেন, তুইত ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি। কিন্তু তিনি কালীকে বই পড়িতে নিষেধ করিলেন না।......তাহার অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া একদিন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন, 'ছেলেদের মধ্যে তুই-ই বুদ্ধিমান, নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, সেইরূপ তুইও পারবি।" (৮) মহারাজ নিজেও বলিয়াছেন "ঠাকুরের সেবাও করতুম, আবার রাত জেগে জেগে পড়তুম।"

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইলে তাহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সেখানে মিলিত হইয়া কি ভাবে কঠোর তপস্যা এবং অধ্যয়নে দিনপাত করিতেন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান" নামক পুস্তকে তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

সেই গ্রন্থের "পড়াশুনা" ইতি শীর্ষক অধ্যায়ে দত্তজা মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই সময়ে ত্যাগী ভক্তদের ভিতর কয়েকটী ভাব বা ভাগ হইল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন পড়াশুনার দিকে মন দিলেন। হিন্দুর সমস্ত গ্রন্থ, খৃষ্টান গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থের বিশেষ আলোচনা হইল।......এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সকল আনাইয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে পড়িতে লাগিলেন। কালী বেদান্তীও এই দলের ভিতর। পড়াশুনা যখন চলিল তখন রীতিমত ভাবে গ্রন্থ পাঠ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। ঠিক যেন পরীক্ষা দিতে যাইবে এই ভাবে পড়াশুনা চলিতে লাগিল। আর এক ভাব হইল,

(৮) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ—১০ পৃষ্ঠা এবং ঐ ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা। 'উদ্বোধনের' সম্পাদক মহাশয় "অজ্ঞাত নামা লেখকের" গ্রন্থ বলিয়া স্বামী অভেদানন্দের একমাত্র জীবন চরিত "কালী তপস্বী" গ্রন্থখানিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন! আমার লিখিত 'বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু', নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আমি "কালী তপস্বী" অবলম্বনে অনেক কথা বলিয়াছি। সেজন্ত উদ্বোধনের সম্পাদক মহাশয় উষ্মা যুক্ত হইয়া আমাকে ধমক দিয়াছেন! সে ধমক সন্ন্যাসীর ধমক বলিয়া আশীর্ব্বাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি এবং তাঁহাকে জানাইতেছি যে, ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি লইয়া আলোচনা করিলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে, গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেই—তাহা যে অপ্রমাণিক হইয়া যায় তাহা নহে। সম্প্রতি 'বেদান্ত মঠে' অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে উক্ত গ্রন্থের লেখক এখনও জীবিত আছেন এবং কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। মুদ্রণের সময় (১৯২৬ খৃঃ অঃ) এবং তাহার বহুবৎসর পর পর্য্যন্ত বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেন্টরূপে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ইহা অনেকেই জানেন। গ্রন্থে কোন ভ্রম থাকিলে তিনি অবশ্যই তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন! সুতরাং 'কালী তপস্বী' যে বিশেষরূপে প্রামাণিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

তাঁহাদের মত হইল যে সাধন ভজন তপস্যাই হইল প্রধান বস্তু। পড়াশুনার আর আবশ্যক নাই। কঠোর তপস্যা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি হইল প্রধান জিনিষ।…শরৎ মহারাজ পড়াশুনার দিকের লোক, খুব অতিরিক্ত না হ'লেও, তিনি পড়াশুনার পক্ষপাতী ছিলেন। …যাহোক্ শশী মহারাজ পড়াশুনার দিকেরই লোক। কিন্তু যোগেন মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ ও তারকদা এরা পড়াশুনার দিকের লোক নন। ইঁহারা সাধনমার্গের লোক। সাধন, ভজন, জপ ও ধ্যান ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইঁহারা পড়াশুনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু বলিতেন।" (৭)

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ বলিয়াছেন—"মঠে দেখ্‌তুম কালী ভাই কোন কৃচ্ছু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাইতো না। রাতদিন কেবল পড়াশুনা করতো। ফুরসুৎ পেলে লোরেন ভায়ের সাথে তর্ক জুড়ে দিত।…মঠে সকলকে খুব পড়াশুনা করতে দেখতুম, তাই একদিন শরোট্ ভাইকে বল্লুম্—হ্যারে! তোরা এত পড়াশুনা করিস্ কেনো? স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে আবার গাদা গাদা বই পড়িস, তোদের কি পাশের পড়া পড়েছে?……উনি (ঠাকুর) ত এতো কথা বল্‌তেন, বাকী উনাকেত পড়াশুনা করতে দেখ্‌তুম না।…হামার কথা শুনে শরোট্ ভাই বল্লে—দেখ! যারা আচার্য্য হোয়ে জগৎকে শিখাবে, তাদের পড়াশুনা করতে তিনি মানা করতেন না, জানিস্ ত? হামনে বুঝ্‌লুম যে, তিনি যার যেমন ভাব তাকে তেমনি বুঝিয়েছেন।" (৮) এই সময়ে স্বামী অভেদানন্দের কিরূপ ভাব ছিল তাহার আভাষ পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তিতে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের' তৃতীয় খণ্ডের ৩০২ পৃষ্ঠায় ৮ই এপ্রিল ১৮৮৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীম-র ভিতর যে কথোপকথনের বিবরণ আছে তাহারই এক স্থানে দেখা যায় (৩০৬ পৃষ্ঠায়) স্বামীজী বলিতেছেন—"কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কত্তে হয়? আগে ভক্তি পাকুক।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আবাল্য স্বামী অভেদানন্দের ভাব ছিল জ্ঞানের ভাব। আমরা জানি প্রহ্লাদাদি ভক্ত জ্ঞানের দ্বারায় ভগবানকে পাইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন লোকগুরু হইয়াছিলেন তখন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিতে শুনি—"জ্ঞান আর ভক্তি

(৭) 'উদ্বোধনের' সম্পাদক মহাশয় স্থির চিত্তে 'বাঙ্গালার ধর্মগুরু'তে এই অংশ পাঠ করিলেই দেখিতে পাইতেন যে উহা আমার "মন্তব্য" নহে—উহা দত্তজা মহাশয়ের বর্ণনা! ইতিবৃত্তকাররূপে আমি গ্রন্থে সেই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র এবং পাদটীকায় দত্তজা মহাশয়ের পুস্তকের উল্লেখও করিয়াছি। সম্পাদক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"লেখক কি বলিতে চান যে, মহাপুরুষ মহারাজ সন্ন্যাসীর পক্ষে 'অতিরিক্ত' অধ্যয়নকে দ্বিতীয় স্থান দিয়া অশাস্ত্রীয় ও অসঙ্গত কাজ করিয়াছেন?" উত্তরে এই বলিতেছি যে, আমি শুধু ঐতিহাসিক বিবরণগুলি নানা গ্রন্থ হইতে তুলিয়া এক স্থানে বসাইয়াছি মাত্র—কোন মতামত প্রকাশ করি নাই।

(৮) শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়।

এক। এই দেখ ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের স্তবে তিনটি ভাব আছে। আগে দ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত, তারপরে তুরিও বা অদ্বৈত। ভক্তবীর হনুমানেরও তাই। Christএর মধ্যেও তিন ভাবই ছিল ....এদিকে শঙ্করের ভিতরও পাই যখন তিনি বলেছিলেন—

"দাসস্তেঽহং দেহদৃষ্ট্যাঽস্মি শম্ভো
জাতস্তেঽংশো জীবদৃষ্ট্যা ত্রিদৃষ্টে।
সর্বস্যাত্মন্নাত্মদৃষ্ট্যা ত্বমেব—
ইত্যেবং মে ধীর্নিশ্চিতা সর্বশাস্ত্রৈঃ ॥

জ্ঞান চাই। এর অভাবে দেশটা অধঃপাতে যেতে বসেছে। এখন সব নকল ভক্তি দেখে দুঃখ হয়—ফক্কুড়ো emotionalism (ভাবপ্রবণতা)।" (৯)...জ্ঞানলাভের ইচ্ছা চাই! জ্ঞানই শক্তি—Knowledge is power। যেমন Electricity, যা জানলে ভয় থাকবে না—সহজেই ব্যবহার করতে পারবে। জ্ঞানের চর্চা করো। নাচা-কোঁদা ক'রে দেশটা মাটী হলো।" (১০) টোকা পরতে হবে না। এ কি? এটা যে fire of knowledge (জ্ঞানাগ্নি) (১১)—তার Symbol (প্রতীক)। মনকে জোব্বা পরাও—Clothe yourselves with the fire of knowledge (জ্ঞানাগ্নিময় হয়ে থাকো)। অজ্ঞানীর কাছে আত্মা অপ্রকাশিত—ঢাকা আছে।...যেমনি আত্মজ্ঞ পুরুষের আবার জ্যোতি দেখা যায়। আমি বলরাম বাবুর দেহত্যাগের পর তাঁকে দেখেছি জ্যোতির্ময়—অন্ধকার পালিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরেরও আছে—মরবার সময় মুখ থেকে জ্যোতি বেরোয়। Search light-এর মতন কোথায় কি আছে দেখিয়ে দেয়। তাই বলি তোমরা জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা কর।" (১২)

এই প্রসঙ্গে মহারাজের আর একটী বাণী উদ্ধৃত করিব—উহা মূলতঃ কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে—জ্ঞান ও ভক্তির কথা পূর্বেই বলা হইল। মহারাজ বলিতেছেন "বৌদ্ধদের পতনের যুগে তান্ত্রিক মতের কর্মকাণ্ড বাংলা, আসাম ওদিকে কাশ্মীর—এই সব জায়গায় খুব ছেয়ে গেছলো। এখন এই দুর্গাপূজায় যে ছোট ছোট হোম হয় সেগুলো হচ্ছে বড় বড় যজ্ঞের বাচ্চা।...তা এসব কী হবে? আকাশে দেবতারা ঘুমুচ্ছে। নিজেদের ভিতর দেবতাকে জাগাও। চন্দ্র, সূর্য্য, শনি—এদের পূজা ক'রে কী হবে? এরা তো গ্রহ মাত্র। পৃথিবীকে ফুল জল দিয়ে পূজা করে কী হবে? বরং মাটীতে লাঙল দাও। Irrigation-এর চেষ্টা করো তবে না শস্য বেশী হবে?....কর্মকাণ্ড একটা আহাম্মুকি। Common sense (সাধারণ জ্ঞান) দেশ থেকে উড়ে চলে গেছে। দেবতারা খেতে আসবে! তা ক'রে

(৯) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ।
(১০) ঐ ১৬ পৃষ্ঠা।
(১১) ঐ ১৮ পৃষ্ঠা।
(১২) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ। ৫৪ পৃষ্ঠা।

বসে আছে!···আমরা গরুড় পাখীর স্তব আওড়াচ্ছি, ওরা পাঁচশো ফিট লম্বা এরোপ্লেন তৈরী করছে। এ সব মানুষেরই বুদ্ধি। এক বুদ্ধি আছে—সে ভগবানের। মানুষের বুদ্ধি সেই অনন্ত জ্ঞানের টুকরো। খাটালেই হলো। তোমার Back ground-এ (পশ্চাতে) অনন্ত বুদ্ধি আছে—খাটাও। আর এই জ্ঞানকে এদেশে শুধু ভক্তি ভক্তি ক'রেই ডোবালে। এ যুগে বিবেকানন্দই জ্ঞান-চর্চ্চার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন।" (১৩)

মহারাজের বাণী আর এ স্থানে সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন নাই। যেগুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে অনন্ত জ্ঞান লাভ করাই ছিল তাঁহার তপস্যা। বরাহনগর মঠে যখন তিনি সেই তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখনই বাধা প্রাপ্ত হইলেন! সে কথা পরে বলিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সাধন-ভজন ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। হৃষিকেশের ষড়দর্শনবিৎ অসাধারণ পণ্ডিত ধনরাজগিরিমহারাজের নিকট তৎপূর্বেই তিনি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিষ্যের অসামান্য প্রতিভা দর্শনে গিরিমহারাজ এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, পরে যখন স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"অভেদানন্দ? অলৌকিকী প্রজ্ঞা!"

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে, সে সময় "ত্যাগী ভক্তদিগের ভিতর কয়েকটী ভাব বা ভাগ" ছিল। যে কয়েকজন ভক্ত পড়াশুনার দিকে খুব মন দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একজন, কিন্তু "যোগেন মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ ও তারকদা—এঁরা এত পড়াশুনার দিকের লোক নন। ইঁহারা সাধনমার্গের লোক! সাধন, ভজন, জপ ও ধ্যান ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইঁহারা পড়াশুনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু বলিতেন!" (১৪) "তারক ও নিরঞ্জন মঠ তত্ত্বাবধান করিতেন।···একদিন শশী মহারাজ কালীকে গোপনে জানাইয়া দিলেন যে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন হেতু তিনি জনৈক গুরুভ্রাতার বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে প্রহার দ্বারা মঠ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এক দুরভিসন্ধির আয়োজন চলিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, উক্ত গুরুভ্রাতার মতে মঠে শাস্ত্রাধ্যয়ন করা অন্যায়; যেহেতু পরমহংস-দেব নিজে লেখাপড়া করিতেন না।···যাহা হউক, পাছে মঠে গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয় এই আশঙ্কায় কালী পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন।" (১৫) কে কে এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, ভক্তদিগের মধ্যে অনেক সময় তর্ক

(১৩) মহারাজের কথা ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা।

(১৪) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৫) কালী তপস্বী—ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত। ৫৫ পৃষ্ঠা।

বিতর্ক এমন কি শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের ভাষায় "বহু কথা কাটাকাটি" পর্য্যন্ত হইত—শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ভাব ছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ কি ভাবে মিসন্ গঠন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, একদিন "কথা কাটাকাটি" হইয়াছিল তাহাই লইয়া। (১৬) শুধু ইহাই নহে, 'কথা কাটাকাটি' হইতে হইতে কোন সময়ে যে "হাত তোলাতুলি" পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"কাশীপুরে একদিন ঠাকুর সকলকে ডেকে বল্লেন—'দ্যাখ্, দলাদলি করিস নি। মিলে মিশে থাকলে সকলেই আনন্দ পাবি, আর দলাদলি করলে দুঃখ কষ্টে পড়বি।' সেদিন সব নিজেদের মধ্যে তর্ক করেছিলো, তর্কের পর হাত তোলাতুলি করেছিলো। তর্ক করতে ঠাকুর কাউকে মানা করেন নি, বাকী তর্ক-জোরে দল পাকাতে খুব নিষেধ করতেন।" (১৭) ত্যাগী ভক্তদিগের মধ্যে যে "মনকষাকষি" হইত শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ তাহার স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"এক জায়গায় দল বেঁধে থাকতে গেলেই খুঁটিনাটি বাধে, পরস্পর মন কষাকষি হোতে থাকে। বাকী মঠবাড়ীতে হামাদের মধ্যে মনকষাকষি ছিল না। যার যা মনে হতো, বল্তো, বাকী তার পরেই সব গোল মিটে যেতো। এমন সব কথা বল্তো, যা শুনলে রক্ত গরম হ'য়ে যায়, বাকী জপ ধ্যান করায় তখন সকলার মধ্যে একটা সংযম ভাব এসেছিলো—কেউ কারুর কথা গায়ে মাখ্তো না।" (১৮)

অক্লান্ত তপস্যার প্রভাবে যিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা এক প্রেমানন্দময় লোকে বিচরণ করেন, তিনি কখনই কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারেন্ না। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, যিনি ষড়যন্ত্র করেন তাঁহার পক্ষে প্রেমানন্দময় লোকে বিচরণ করা কি সম্ভব?' ইহার উত্তরে শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের বাণী অবলম্বন করিয়া বলিতে হয় যে, শুধু প্রহার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র নহে, নিজেদের মধ্যে তর্ক করিতে করিতে 'হাত তোলাতুলি" পর্য্যন্ত করাও তাঁহার পক্ষে ততক্ষণই সম্ভব, যতক্ষণ তিনি "অক্লান্ত তপস্যার প্রভাবে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী" না হইতেছেন! ইহাই মানব চরিত্র। মানব যখন দেবতা হন তখন তাঁহার চরিত্রে দেবত্ব প্রস্ফুটিত হয়—তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানব মানবই, তাঁহার বেশী আর কিছু নহেন। বরাহনগর মঠে যখন মানব দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ের কথাপ্রসঙ্গে 'ষড়যন্ত্রের' কথা বলা হইয়াছে—মানুষের দেবত্ব লাভের পরের অবস্থাপ্রসঙ্গে নহে! উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—যেদিন চাকুরির সন্ধানে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বিফল-মনোরথ নরেন্দ্রনাথ অক্টারলোনি মনুমেণ্টের পদতলে ক্লান্তদেহে শুইয়া পড়িলেন, সেদিন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একজন ব্রাহ্মবন্ধু গাহিয়া উঠিলেন—"বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—।" বন্ধুকে ধমক দিয়া নরেন্দ্রনাথ

(১৬) শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতি কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। ৩৩২ পৃষ্ঠা।
(১৭) ঐ ২৭৬ পৃষ্ঠা।
(১৮) ঐ ৩০১ পৃষ্ঠা।

বলিয়া উঠিলেন—"নে নে চুপকর্! ক্ষুধার তাড়নায় যাদের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পেতে হয় না—গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাদের নাই—টানা-পাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের কাছে ও গান বেশ লাগবে! আমারও একদিন লাগ্‌তো!"—দেবতার দয়ার প্রতি যিনি সহসা বিশ্বাস হারান্ উক্তি ইহা তাঁহার ইহা মানুষ নরেন্দ্রনাথের উক্তি! কালিফোর্ণিয়ায় একটী বক্তৃতায় স্বামিজী বলিয়াছিলেন—'আমি কতবার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়াছি। কতদিন অনাহারে যাপন করিয়া পথ চলিতে অক্ষম হইয়াছি।...কিন্তু শেষে হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে—আমার আবার মৃত্যুভয় কি? আমার জন্মও নাই, মরণও নাই, ক্ষুধাও নাই—তৃষ্ণাও নাই। সোঽহং সোঽহং।...হে মহেশ্বর, তোমার সকল শক্তি প্রকাশ কর, স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার কর—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।" ইত্যাদি। ইহা দেবপদারূঢ় নরেন্দ্রনাথের উক্তি—মানুষ নরেন্দ্রনাথের উক্তি নহে!

হৃষিকেশাদি নানা তীর্থে এবং বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে বহু তপস্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজের চিত্তকে শুদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া স্বামী অভেদানন্দ যখন লণ্ডনে আসিলেন তখন যে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের "আপন হাতে ও ছাঁচে গড়া" একখানি সুশাণিত তরবারি হইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ভাব বিস্তার করিবার পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন, লণ্ডনে প্রদত্ত বহুল প্রশংসিত তাঁহার প্রথম বক্তৃতাই তাহার 'প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরে তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছে—"দেখ, বিবেকানন্দ কি আমি যা কিছু করলুম সে সব তাঁরই (শ্রীশ্রীঠাকুরের) শক্তি। অশরীরী হয়ে তাঁরই ভাব আমাদের মধ্যে খেল্‌ছে।... স্বামীজীর সঙ্গে আমি যতদিন থেকেছি ততদিন আর কে ছিল বলো? তিনটে Continentএই (মহাদেশেই) তাঁর সঙ্গে ছিলুম। আর তাঁর ভাব আমি বুঝি না? আমি কি এখানে আলাদা কিছু করছি? ঠাকুর বল্‌তেন, 'নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি, তিনি যে আমায় কী ভালবাস্‌তেন তা আর কী বলবো।" (১৯)

লণ্ডন হইতে মহারাজ নিউইয়র্কে আসিলেন। "ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে সত্যের উপলব্ধি এবং এদেশে (ভারতে) পরিব্রাজক অবস্থায় সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র আয়ত্ত করার পরে আমেরিকায় গিয়েও এই সত্যকে কালোপযোগী ক'রে প্রচার করবার জন্যে স্বামীজীকে জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হয়েছিল। এ রকমেই তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।

"ওদেশে অবস্থান কালে Clark university-র Summer School for Teachersএ যোগদান ক'রে একনিষ্ঠ ছাত্রের মত Physiology, Neurology, Anatomy, Anthropology প্রভৃতি নানা বিষয় তিনি শিক্ষা করেছিলেন। এক সময়ে Harvard Universityতে Professor Royce, Professor William James প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীদের পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাও শুনেছিলেন......Spiritualism সম্বন্ধেও স্বামীজীর

(১৯) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ। ১০-১১ পৃষ্ঠা।

অনেক কিছু জানা শোনা ছিল। ·····Christianity সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান ছিল অসাধারণ।"

"বহু যুক্তির অবতারণার দ্বারা মায়াকে 'সদসদ্‌ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়া' ইত্যাদি ব'লে, পরে ত্রিকালে অবাধিত সৎ-এর যথার্থ রূপ যে ভাবে আচার্য্য শঙ্কর ধরেছিলেন, স্বামীজী সেই পথে না গিয়ে বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের আলোকে সহজ সরল ভাবে সর্ব্বসাধারণের কাছে ঔপনিষদিক সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করেন।"

"দেশে বিদেশে মহারাজ বুঝিয়ে গেছেন ভারতের চিরন্তন আদর্শ। এই আদর্শ উপলব্ধি ক'রে ঋষিদের মতন তিনিও বারবার বলেছিলেন—এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। কত অশান্ত হৃদয় শান্তি পেয়েছে কত বেদনাতুর পেয়েছে সান্ত্বনা। মানুষ যে অমৃতের সন্তান, আনন্দরাজ্যের উত্তরাধিকারী —এসব কথা শুনিয়েছেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তাদের কাণে—যারা দেখেছে সামনে অনন্ত নরকের বিভীষিকা, যারা dogmaকে সত্য ব'লে মেনে, দর্শহীন হ'য়ে শান্তির আশায় নাস্তিক সেজেছে।" (২০)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ "এদিকে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু ভিতরে পুরো জ্ঞান ছিল। মহা মহা পণ্ডিত কাবু হ'য়ে যেত। বলতেন—মা জুগিয়ে দেয়। আর অনর্গল ব'লে যেতেন, যেন স্রোত বয়ে যেত।" দেখিতে পাই কি লণ্ডনে কি আমেরিকায় প্রভুর সেই প্রিয় শিষ্য স্বামী অভেদানন্দকে প্রভুও "জুগিয়ে" দিয়েছেন বাক্যের পর বাক্য—ভাষ্যের পর ভাষ্য—যুক্তির পর যুক্তি—ভাবের পর ভাব। এমন শিষ্যও যদি ধর্মপ্রচারে কৃতকার্য্য না হইবেন তবে আর কে হইবে? শ্রীশ্রীমা যাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসুক'—তাঁহার নিকট যে মার্কিনের মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্কে পরাভূত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? মার্কিনে সভার অন্তে বক্তাকে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়া শ্রোতাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হয়। কি প্রশ্ন হইবে বক্তার তাহা জানা থাকে না। অথচ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সদুত্তর দিতে হয়। যে দেশের এই নিয়ম সে দেশেও মহারাজের মুখে প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া "প্রশ্নকারীর দল অবাক হইয়া বলিতে বাধ্য" হইত—Swamiji is a wizard in answering questions"—প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বামীজী যেন একটি যাদুকর?

স্বামীজীর লেখায়—"ভাবের উচ্ছল আবিলতা, চিন্তার বিলাসিতা, যুক্তির দাম্ভিকতা এ সবের পরিচয়" পাওয়া যায় না। পাই অপ্রতিরোধ্য যুক্তির সাবলীল গতি, তাহার তীব্রতা তাহার অমোঘ শক্তি—আর পাই সত্যকে নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করিবার ন্যায়ানুমোদিত কৌশল। সেই সকল যুক্তি-তর্কের পশ্চাতে দেখা যায় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিচারণা। যখনই যে বিষয়টীর আলোচনা করিয়াছেন তখনই তাহার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। আত্মসমাহিত জ্ঞানই তাঁহাকে এই সম্যক্ দৃষ্টি দিয়াছিল। সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য

(২০) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ। অবতরণিকা।

তাঁহার তপস্যা ছিল জীবন ব্যাপী। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ বলিতেন—"ভিতরে বস্তু না থাকলে ফাকা কথায় কিছু হয় না। ভিতরে ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম চাইই-চাই তবে লোকে বিশ্বাস করবে।…আগে নিজের চরিত্র গড়ে তোলো। লোকে তোমার চরিত্র দেখে তোমার কাছে আসুক, তখন প্রচার করতে নেমো। এখন তোমার কথা কে শুনতে চাইছে? তুমি ত গায়ে প'ড়ে তোমার কথা অপরকে শুনাতে যাচ্ছ। এখন তারা বুঝছে—তোমার গরজ। তাই তোমার কথা নিবে না। বাকী যখন তারা বুঝবে যে, তোমার কোন গরজ নেই, তাদের গরজে তোমার এত কথা বলা, তখন তুমি যা' বলবে তারা তা' মেনে নিবে। তোমার কথার কোন অন্যথা করবে না। তখন তোমার প্রচারে তাদের উপকার হবে।" (২১)

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের এই উক্তি শুনিলে মনে হইবে তিনি যেন স্বামীজী এবং মহারাজকে মনে করিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন!

স্বামী অভেদানন্দ

[পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের জীবনচরিত প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'শিক্ষাতীর্থের' সম্পাদক তাহার উপাদান সংগ্রহের জন্য সুধী ও মনীষীবৃন্দের নিকট ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করিলে তাঁহারা স্বামিজী মহারাজ সম্বন্ধে যে সমস্ত রচনা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহাদেরই কয়েকটি 'বিশ্ববাণী'র বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। এই সকল রচনায় স্বামিজীর প্রতি তাঁহাদের নিবিড় শ্রদ্ধার ভাবে পাঠকগণ মুগ্ধ ও আনন্দিত হইবেন।]

যে সুদূর যুগে ভারতের মনীষিগণ জ্ঞানের স্নিগ্ধ আলোক পৃথিবীর অন্ধকারময় বক্ষে প্রসারিত করিয়াছিলেন, সেই যুগ এখন অনেক পশ্চাতে চলিয়া গিয়াছে; এমন এক সময় ছিল, যে সময় গর্বিত প্রতীচীর ভৌতিক দৃষ্টি সেই অতি দূরবর্তী যুগের কোন সন্ধান রাখিত না। অতীতের এক শুভদিনের শুভমুহূর্তে এই ভারতেই একজন ত্যাগব্রতী তেজঃপ্রদীপ্ত নবীন সন্ন্যাসী প্রতীচীর বক্ষে দাঁড়াইয়া গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করিলেন, আজ পর্যন্ত প্রতীচী যাহা জানিয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ। এই বিশ্বজগতের অন্তরালে তাহার প্রতি অণু-পরমাণুকে ব্যাপ্ত করিয়া এক অখণ্ড সত্তা বিরাজ করিতেছে; তাহাই প্রকৃতপক্ষে জানিবার বস্তু; তাহাকে না জানিয়া আর অন্য সমস্ত বস্তুকে জানিলেও, সেই জানা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; আর, অন্য কোন বস্তুকে না জানিয়াও সেই একমাত্র অখণ্ড সত্তা বস্তুকে জানিতে পারিলে মানুষের আর অন্য কিছু জানিবার অপেক্ষা থাকে না, মানুষ তাহাতেই পূর্ণতালাভ করে। এই নবীন সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

(২১) শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। ৩৮৯-৩৯১ পৃষ্ঠা।

স্বামী বিবেকানন্দের পরে পাঞ্জাবের বিদ্বান্ ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী স্বামী রামতীর্থ বেদান্ত-প্রচারের উদ্দেশ্যে* নূতন পৃথিবীতে গিয়াছিলেন, যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার এই অভিযানের কোন স্থায়ী ফলের সংবাদ আমরা জানিতে পারি নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচ্যকে ভারতের অপূর্ব জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমৃতরাশি জ্ঞান-পিপাসুগণের মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্বামীজী নানাকারণে দীর্ঘকাল প্রতীচ্যে অবস্থান করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার সেই জ্ঞান-সত্রের অধ্যক্ষতার ভার স্বামী অভেদানন্দের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। †

স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং যোগ্য গুরুভাই ছিলেন। পূর্বজন্মের শুভ-সংস্কারের বশে জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার ভিতরে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং সাধন-ভজনের বিপুল স্পৃহা জাগিয়াছিল, তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের দর্শনের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

যাহার ভিতরে পূর্বজন্মের শুভ-সংস্কারের ফলে সাধু সঙ্গের স্পৃহা জাগে, ভগবান তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেন। ভগবানের কৃপায় স্বামী অভেদানন্দ পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার কৃপার পাত্র ও প্রিয় শিষ্য হইয়াছিলেন; সেই কৃপার ফল পরবর্তী জীবনে তাঁহার মধ্যে পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ উভয়েই অতিশয় বিচারশীল ছিলেন; তাঁহাদের ভিতরে গঠনমূলক কার্য্য করার অপূর্ব শক্তি ছিল। যদি তাঁহারা পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ না করিতেন, তাহা হইলে, আজ আমরা "শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়"কে যে অবস্থায় জগতে দেখিতে পাইতেছি ইহার এইরূপ উন্নত অবস্থা কতদিনে কি ভাবে হইত, তাহা বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র মনে করিয়া স্বামী অভেদানন্দের উপরেই প্রতীচীর জ্ঞানসত্রের অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ সুদীর্ঘকাল প্রতীচীতে অবস্থান করিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের বাণী সেই দেশের জ্ঞানপিপাসুগণের মধ্যে এমন সুন্দরভাবে বিতরণ করিয়াছেন যে, তাহার ফলে সে দেশের বহু ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

যিনি অন্যকে শিক্ষা দিবেন, তাঁহার নিজের শিক্ষা অতি উন্নত হওয়া আবশ্যক; এইরূপ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের মধ্যে মাধুর্য্য এবং আচরণের মধ্যে মহত্ত্ব পরিস্ফুট হওয়া চাই। ইহা না থাকিলে সেই শিক্ষকের শিক্ষা জন-সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

* ১৬ই নভেম্বর ১৯০২ খৃঃ অঃ আমেরিকায় পদার্পণ করেন। বিঃ সঃ

† স্বামী বিবেকানন্দজীর আহ্বানে স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৬ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডে এবং ৭ই আগষ্ট ১৮৯৭ খৃঃ অঃ আমেরিকায় গমন করেন। বিঃ সঃ

স্বামী অভেদানন্দের ভিতরে এই সকল সদ্‌গুণ পূর্ণরূপেই বিদ্যমান ছিল ; তাই তিনি প্রতীচীর জাত্যদৃপ্ত বহির্মুখ সভ্যতাভিমানী জন-সমাজে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতীচীর জ্ঞান-সত্রের অধ্যক্ষ নির্বাচনে যে যথেষ্ট দূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্বামী অভেদানন্দের পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীতেই প্রমাণিত হইয়াছিল।

এই পদদলিত দীন ভারতের পুরাতন বাণী নূতন যুগের নূতন সমাজে প্রচার করিয়া যিনি বা যাঁহারা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার নূতন জগতের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জগতের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা কোন দেশ-বিশেষ বা জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নয়—তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি—তাহার উত্তরাধিকারী সকল দেশের সকল মানবসমাজ। যাঁহারা এই সম্পত্তিকে তাহার যথার্থ অধিকারী সেই বিশ্বমানব-সমাজে বণ্টন করিবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে অনেক উচ্চ স্তরে অবস্থিত. এইরূপ মহাপুরুষদের দ্বারা জগতের সকল মানব-সমাজ উপকৃত হয়। এইরূপ মহণীয় ব্যক্তি যে দেশে যে ভাবে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি সকলেরই বরেণ্য—সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এই রকমেরই একজন মহাপুরুষ এবং তিনি তাঁহার জীবন এই মহণীয় কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে নিজেদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, অধ্যাপক

মানুষের হৃদয়ের গভীরতার মধ্যে এমন একটী উৎস আছে যেখান হইতে বিশ্বরহস্যের মূল উৎসটী নিরন্তর ঝরণা ধারায় মহামন্দাকিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। আমরা নিরন্তর আমাদের নানা মোহ ও ছলনার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখি বলিয়া সেই মহাউৎসের রস হইতে বঞ্চিত হই। উপনিষদের ঋষিরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। তাঁহারা তাঁহাদের এই অন্তরের উৎসের মধ্যে নিত্য অবগাহন করিতেন, সেইজন্য এই উৎসের স্বচ্ছন্দবেগে তাঁহাদের বাণীতে ক্ষরিত হইয়া পড়িত। তাঁহারা যে মহাসত্যকে পূর্ণ-আলোকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহা দেশ কাল ও সভ্যতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। ইউরোপীয় ও আমেরিকার সভ্যতার সহিত আমাদের সভ্যতার দেশগত ও কালগত, ব্যক্তিগত বা সভ্যতাগত পার্থক্য থাকিলেও, সে পার্থক্য এই মহাসত্যের জ্যোতির নিকট নিতান্তই ম্লান। সেই জন্যেই ঋষিরা বলিয়াছেন, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। তাঁহাদের বাণী কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নহে, সমগ্র বিশ্বের জন্য। সেইজন্যেই এই উপনিষদের বাণী আমাদের পাশ্চাত্যকালের সমস্ত সংস্কৃতিকে, সমস্ত ধর্ম্মকে অভিসংস্কৃত করিয়াছে। বৌদ্ধযুগের যে সংস্কৃতি তৎকালীন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে ব্যাপ্ত

হইয়াছিল, তাহাও এই উপনিষদের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রাচীনকালে কেবল এশিয়াখণ্ড নহে কিন্তু ইউরোপের প্রান্তভূমি পর্য্যন্ত এই বাণী নানা আকারে সাধুদের সাধনার মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইদানীন্তনকালে যখন আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমাদের সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে, ইউরোপীয় জীবনযাত্রা প্রণালীকে আমাদের আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলাম, তখন স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমেরিকায় ভারতবর্ষের এই অমোঘবাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মহাগৌরবের বোধিবৃক্ষের বীজ আমেরিকাভূমিতে প্রোথিত করেন। স্বামী অভেদানন্দ আপ্রাণ সাধনার বারি সঞ্চারে এই বীজটীকে পত্রপুষ্পে শোভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমেরিকার নানাস্থানে তাঁহার এই দেদীপ্যমান কীর্ত্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। আজকালকার দিনে যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উদ্যোগে সকলেই ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যখন অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাই আমাদের কাছে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে হইতেছে তখনও যাঁহারা এই উপনিষদের মহানন্দের মহাবাণীকে আপন সাধনার দ্বারা বিরাট বিশ্বের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া মহামানবের মহা ঐক্যের চরম উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আমাদের উন্মত্ত চেষ্টাকে সৌম্য ও শান্তির দিকে আকৃষ্ট করেন, মহা-অদ্বৈতই যে মানবের মহামিলন এই বিষয় আমাদের সচেতন করেন, তাঁহারাই যথার্থ অন্ধকার হইতে আমাদের আলোকের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এই সমস্ত মহাপুরুষেরাই যথার্থতঃ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও গৌরব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা করেন। স্বামী অভেদানন্দ এই কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার বিজয়-পতাকা চিরউড্ডীন হইয়া জ্যোতিঃসঙ্কেতে ভারতবর্ষীয়দের চিরমঙ্গল ও চিরসত্যের দিকে আহ্বান করিবে।

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র

The Ramakrishna Vedanta Society,
19B, Raja Rajkrishna Street,
Calcutta Feb 26th 1934

কল্যাণীয় র—,

তোমার 5th তারিখের পত্রখানি এবং ভূমিকম্প Relief fund-এর দরুণ ৫৲ টাকা M.O. যথাসময়ে পাইয়া প্রীত হইয়াছি। ঐ টাকা Relif fund-এ জমা দেওয়া হইয়াছে।......

তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা পদ্ধতি জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ তদ্বিষয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে উত্তর দিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি দীক্ষা ও মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছ কিনা? দীক্ষিত না হইলে পূজার অধিকারী হওয়া যায় না। যাহার নিকট দীক্ষা লইবে তিনি তোমাকে নিত্যপূজা কি প্রকারে করিতে হয় তাহা শিখাইয়া দিবেন। যদি তোমার দীক্ষাগুরু উহা না শিখাইয়া থাকেন তাহ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যে সাধু রেঙ্গুনের সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজা করিয়া থাকেন—তাঁহার নিকট হইতে নিত্যপূজা পদ্ধতি শিখিয়া লইবে। পুস্তক পাঠ করিয়া উহা শিক্ষা করা যায় না জানিবে। অধিক আর কি লিখিব। আমার স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে ভাল আছে এবং সমিতির সমস্ত কুশল। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। -ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

প্রেম

শ্রীনদীয়াবিহারী দাস

(আমেরিকার দার্শনিক লেখক থরো (Thoreau) কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে।)

পুরুষ এবং রমণীতে কি পার্থক্য থাকায় একে অন্যের প্রতি আসক্ত হয় এ প্রশ্ন অনেকের মনকে আলোড়িত করিয়াছে কিন্তু ইহার প্রকৃত মীমাংসা যে কি সে বিষয়ে অতি অল্প ব্যক্তিই প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এখানে এ কথাটা আমাদের মানিয়া নিতেই হইবে যে পুরুষকে জ্ঞানরাজ্যের অধিকারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রেমরাজ্যের ভার রমণীর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও প্রেম যে এইরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে ইহাও সত্য নহে। 'সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় পুরুষ যেন রমণীকে বলিতেছে "তোমার কি আর একটু জ্ঞান বাড়িবে না?" রমণী যেন পুরুষকে বলিতেছে "তোমার হৃদয় কি আর একটু কোমল হইবে না?" জ্ঞান অথবা প্রেম লাভ ইহাদের কাহারও ইচ্ছাধীন নহে; কিন্তু তথাপি পুরুষ ও রমণী উভয়েরই যদি জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী না হয় তাহা হইলে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেম জন্মিতে পারে না।

আমরা যে সকল বৃত্তিকে মানবের উৎকৃষ্টতম গুণ বলিয়া থাকি তাহাদের স্বরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা একই জিনিষের অভিব্যক্তি মাত্র। সৌন্দর্য্যে সেই প্রকৃত সত্তার দর্শন, সঙ্গীতে উহার শ্রবণ, সুগন্ধে উহার আঘ্রাণ, সুমধুর বাক্যে উহার আস্বাদ, এবং নিখুঁত স্বাস্থ্যাবস্থায় উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। পার্থক্য শুধু বহির্বিকাশে। অন্তর্জগতে যে একত্ব রহিয়াছে তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না।

দিবাবসান কালে গগনমণ্ডলে অস্তগামী রবির কিরণমালায় যে অনুপম সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে নায়ক নায়িকার প্রেমোজ্জ্বল বদনমণ্ডলে সেই একই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই একই সৌন্দর্য্য গতপ্রায় দিবসের অর্দ্ধ নিমীলিত ভ্রূযুগলে এবং প্রেমিকার ব্রীড়া সঙ্কুচিত নয়নযুগলে বিরাজিত হইয়া থাকে। এখানেই আমরা ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে মহত্ত্বের অথবা সসীমের মধ্যে অসীমের আভাস পাইয়া থাকি। এমন প্রেমিক জ্যোতির্বিদ কে আছেন যিনি প্রণয়িনীর চক্ষুর অন্তরালে যে কি খেলা চলিতেছে তাহা বলিয়া দিতে পারেন?

সৌন্দর্য্যের স্বভাব এই যে উহাতে মানবপ্রাণ আপনা আপনিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সুন্দর ফুল ও ফল দেখিয়া মোহিত হই কিন্তু উদ্যানজাত পুষ্পাবরণের (calix) মধ্যে এমন কোন সুন্দর কোরক বা সুমিষ্ট ফল আছে যাহার সহিত নারীহৃদয়ের গুপ্ত সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে। চিত্তের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের পবিত্রতার উপর নির্ভর করিয়া নম্রবদনে সে যখন বিশ্বজগতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখন সর্গরাজ্যও ফিরিয়া তাকাইতে বাধ্য হয় এবং সমস্ত প্রকৃতি অবনত মস্তকে তাহাকে সাম্রাজ্ঞী বলিয়া গ্রহণ করে। এই প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত পুরুষহৃদয় নিত্য বীণাতন্ত্রীর মত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে।

প্রেমের ব্যাপারটী এমনই সাধারণ যে প্রথম দৃষ্টিতে ইহার কোন বিশেষত্বই আমাদের চোখে পড়ে না। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, কত শত যুবক যুবতী সেই বিরাট শক্তির নিকট আপনাকে লুণ্ঠিত করিয়াছে তথাপি সমগ্র জগৎ উহার নিকট এক অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এমন কি সর্ব্বাবস্থায়ই সমগ্র জগৎ ইহার মাধুর্য্যে মুগ্ধ—বিরক্ত বা নিরাশ হওয়ারও কোন শঙ্কাই নাই, কারণ প্রেম ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার ফল নয়। অপূর্ণ মানবের ভিতর দিয়া উহার বিকাশ হইলেও উহা নিজে পূর্ণ। মানুষ সসীম সান্ত প্রেম অসীম অনন্ত। ধরামণ্ডল ধনধান্যে পূর্ণই হউক আর নাই হউক, আর্য্যের আবাসভূমিই হউক অথবা অনার্য্যের ক্রীড়ানিকেতনই হউক, অমৃতপূর্ণই হউক অথবা জলশূন্য মরুপ্রান্তরই হউক, সুখস্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণই হউক অথবা দিগ্‌দিগন্তরব্যাপী হাহাকারপূর্ণই হউক প্রেম স্বায় স্বগীয় প্রভাবে আকাশের নিত্যনূতন সৌন্দর্য্য, উষার অরুণ কান্তিতে, প্রবহমান সুরভির বায়ুর সুগন্ধে, জলরাশির নীলাভ লাবণ্যে, বিহঙ্গমের সুমধুর কূজনে, বসন্তের কোকিল কাকলীতে, ভ্রমর ভ্রমরীর মধুর গুঞ্জনে, ময়ূর ময়ূরীর নৃত্যে সর্ব্বত্রই আপনাকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবেই রাখিবে।

আমাদের বাস্তব প্রাণের ভিতর দিয়া সম্ভবতঃ এমন একটুকু সংস্কারগত স্বার্থচিন্তা থাকিয়া যায় যাহা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় এবং একান্ত মুগ্ধ প্রেমিককেও কিছু না কিছু সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। এই চিন্তা, পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব-কল্পনা—প্রেম পাছে নিরাশায় পরিণত হয়, তাহারই আশঙ্কা—কারণ প্রণয়ী প্রণয়ে মজিয়া গেলেও জ্ঞানহারা হয় না, স্থায়ী প্রেমেরই অনুসন্ধান করে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আদর্শ প্রেমের দৃষ্টান্ত কত অল্প আর বিবাহের সংখ্যা কত বেশী! মনে হয় মানুষ

এখানে তার প্রতিভাকে তুচ্ছ করিয়া কি অসঙ্কোচে প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলে। এমন মানুষ থাকিতে পারেন যাহার চিত্ত প্রীতিরসে ভরপুর কিন্তু তিনি হয়ত তখনও তাহার প্রণয়িনীর সন্ধান পান নাই। অধিকাংশ বিবাহের মূলেই সদ্বিবেচনার চেয়ে ভাবপ্রবণতাই অধিকতর প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভাবপ্রবণতার সহিত স্বচ্ছ চিত্ত বা সদ্বিবেচনার স্বাভাবিক যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিণয় ব্যাপারে—বুদ্ধির কোন অধিকার থাকিলে অধিকাংশ বিবাহই সংঘটিত হইত না এবং তাহাতে স্বর্গীয় ভাবের বাধা থাকিলেও অতি অল্প বিবাহই সংঘটিত হইত।

* মানবের প্রেম কখনও ঊর্দ্ধগামী কখনও নিম্নগামী হয়। দিব্যালোক সকলেই আমাদের সম্মানের পাত্র কিন্তু এই জগতে তাহারাই বিশেষভাবে আমাদের সম্মানের পাত্র তাহাদিগকে আমরা প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি। এই প্রকার বর্ণনায় প্রেমের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় কি?

আপাততঃ প্রেম সম্বন্ধে লোকের যাহাই ধারণা থাকে না কেন প্রকৃত পক্ষে প্রেম অতি কঠোর সমালোচক। তাহার কাছে মুক্তি নাই, মার্জ্জনা নাই, "স্নেহও" ক্ষমা করিতে জানে কিন্তু "প্রেম" তা জানে না।

তোমার প্রণয়িনী কি এমনই যে তোমার মহত্ত্বের বিকাশে, তোমার বিশেষত্বের পরিচয়ে তোমার প্রতি তাহার আসক্তি বা আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে? যদি তাহাই হয় তবে তোমার কর্ত্তব্য তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ রহিত করা। কারণ তাহা হইলে দৈবাৎ তোমার কোনও দোষ দর্শনে তাহার প্রেমও সঙ্কুচিত হইতে পারে। তার প্রীতি যাচ্ছের পথা যেন উত্তরোত্তর উন্নতি লাভের পন্থাই হয়। *

প্রেম যে শুধু চিত্তকে আলোকিত করিবে তাহাই নয় কিন্তু প্রদীপ্ত বহ্নিজ্বালার ন্যায় চিত্তের কুপ্রবৃত্তিসমূহকে ভস্মীভূত করিবে।

যেখানে অন্তর্দৃষ্টি বা বিবেচনার ত্রুটী ঘটে সেখানে পূতচরিত্র ব্যক্তিরও আচরণ পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতে পারে।

একজন যথার্থ মরমী পুরুষের হৃদয় শুধু উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্ত্রীলোকের হৃদয় অপেক্ষাও অধিক নারীজনোচিত।

প্রবৃত্তি অন্ধ কিন্তু প্রেম অন্ধ নয়। কোন দেবতাও ইহার মত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে জানে না। তখন বক্তৃতা ও ভালবাসায় প্রাণ যেমন খেলে কল্পনাও তেমনি খেলিয়া থাকে।

* এই স্থলে বিদগ্ধ মাধবের (৩১৮ পৃঃ) একটী শ্লোক অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়ং চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসঃ শ্রিয়ং বিভ্রতি।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥"

ইহাদের একটী অবমানিত হইলে আর একটী বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণতঃ কল্পনাই পূর্ব্বে ব্যথিত হইয়া দাঁড়ায়। কারণ কল্পনা প্রাণের চেয়ে বেশী ভাবপ্রবণ। প্রাণে যে আঘাত করে তাহাকে বরং মার্জ্জনা করা যায় কিন্তু কল্পনাকে যে আঘাত করে তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। কল্পনা জ্ঞানময়ী। কিছুই ইহার দৃষ্টির সীমা এড়াইতে পারে না। হৃদয় ইহার শাসনাধীন। পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া উপত্যকার অধোমুখ রবি-কিরণস্নাত সুদূর প্রসারিত তরুবীথির দিকে যখন তাকাই প্রাণ তখন সেখানে উড়িয়া যাইতে চায় কিন্তু কল্পনা তাহাকে সবলে টানিয়া রাখে —ঐ উন্নতশির পাষাণ হৃদয় পর্ব্বতের নীরব কঠোর নির্দ্দেশাজ্ঞায় সে যে বাধিত হইয়াছে, তাহার ডানা দুখানি যে ভাঙ্গা গিয়াছে সে যে আর উড়িতে পারে না। নীচের দিকেও না। কোন কবি বলিয়াছেন আমাদের হৃদয় ভালবাসায় অন্ধ কিন্তু কল্পনার যে ভুল ভ্রান্তি নাই। ইহার ভাণ্ডারে সমস্তই সঞ্চিত থাকিয়া যায়, ইহা ভাবুক নয়, যুক্তির উপর ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত এবং মনের সমস্ত জ্ঞান ইহারই আয়ত্ত।

প্রেম রহস্যের মধ্যেও রহস্যতম। যে মুহূর্ত্তে প্রণয়ী বা প্রণয়িনী একে অন্যের নিকট ভাষা দ্বারা স্বীয় প্রেম ব্যক্ত করেন সেই মুহূর্ত্তেই প্রেম অন্তর্হিত হয়। সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে প্রণয়ীযুগল পরস্পর পরস্পরকে ভাল না বাসিলে প্রেমের সার্থকতা হয় না কিন্তু আমাদের মনে হয় যে প্রীতির যিনি বিষয় তাহাকে স্বীয় প্রীতি জানিতে না দিয়া এবং কোন বিনিময়ের অপেক্ষা না রাখিয়া শুধু ভালবাসিয়া যাওয়াই ভালবাসা। তাই প্রেমিক কবি গাহিয়াছেন, "লুকিয়ে ভালবাসব তারে জানতে দিব না।" প্রীতি চিত্ত হইতে অপসৃত হইলেই ভাষা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা রূপ কৃত্রিমতার আশ্রয় লইতে হইয়া থাকে। প্রেম কিছু বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ইহা যোগীর মত নীরব। ধ্যানের দ্বারাই সমস্ত জানিয়া লয়। প্রীতির রাজ্যের মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার অফুরন্ত প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর নীরবে অথচ অব্যর্থ যথাযথভাবে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।

প্রেমিক মুখের কথায় কাণ দেয় না। মুখের কথা হয় মিথ্যা না হয় পুরাতন। কিন্তু বুকের কথা প্রাণের তারে নিয়তই স্তব্ধ রজনীর ঝিল্লীঝঙ্কারের মত বাজিতে থাকে।

বহুদিক হইতে কলুষ আসিয়া প্রেমকে স্পর্শ করিতে চায়। ইহার পবিত্রতার জ্ঞান উভয় পক্ষের সমান না থাকিতে পারে। প্রেমিক যদি জানে যে তাহার প্রণয়িনী বশীকরণ বা যাদুমন্ত্রের আশ্রয় লইয়াছে তাহা হইলে তাহার মোহ কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না?

দরদস্তুর যদি ব্যবসায়ে নিন্দনীয় হয় তাহা হইলে প্রেমে যে তাহা ততোধিক নিন্দনীয় তাহা কি আর বলিতে হইবে? প্রেম তীরের মত সহজ এবং সরল গতি চায়। প্রেমের ব্যাপারে আর একটা বড় বিপদ্ এই যে প্রেমিক যদি শুধু ইহাই ভাবেন যে তাহার প্রতি তাহার প্রণয়িনীর ব্যবহার যথোচিত হইতেছে কি না কিন্তু তাহার দেখা উচিত যে সর্ব্বত্রই তাহার প্রণয়িনীর ব্যবহার যথোচিত হইতেছে? প্রেমিক প্রণয়িনী হইতে কোন

পক্ষপাতিত্ব আকাঙ্ক্ষা করে না। প্রেমিক যেন ইহাই বলে যে আমি যতটুকু তোমার প্রীতির যোগ্য আমাকে ততটুকু ভাল বাসিও।

তুমি যেমন আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাস তেমনি ভাবে কি তুমি তোমার বুদ্ধির দ্বারা আমার দোষগুণ বিচার করিতে পার? তুমি আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিলেও, আমার প্রতি তোমার হৃদয় করুণায় কোমলতায় পূর্ণ থাকিলেও তুমি কি (প্রয়োজন হইলে) আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পার?

তুমি কি দ্যুলোক ভূলোক এবং অন্তরীক্ষ ছাইয়া থাকিতে পার যাহাতে আমি যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই তোমার দেখা পাইতে পারি? সমস্ত ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যদিয়া আমি তোমাকেই খুঁজিব এবং সকলের মধ্যেই আমি তোমাকেই ভালবাসিব। (অর্থাৎ এজগতে যেখানে যখন যাহাকেই ভালবাসিনা কেন আমি ভাবিব যে আমি একমাত্র শুধু তোমাকেই ভাল বাসিতেছি।)

আমার যদি কোনও গুণ থাকে তবে আমার দোষও থাকিতে পারে। তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া আমি ইহা ইচ্ছা করিনা যে তুমি আমার দোষগুলিকেও ভালবাস—তুমি আমার দোষগুলি ঘৃণাই করিও। আমার দোষগুলি তুমি পছন্দ করনা বলিয়া আমি মনে করিব না যে তুমি আমাকে একেবারেই ভালবাস না।

প্রেমিককে শুধু সত্যবাদী হইলেই চলিবে না। তাহাকে এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে যে সত্যবলার ফলে যদি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলেও সে পরাঙ্মুখ হইবে না।

এই প্রবন্ধে যাহা বর্ণিত হইল এই প্রকার কবিত্বপূর্ণ সম্বন্ধ যাহার সহিত হইতে পারে এমন লোকের দর্শনপ্রাপ্তি অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। জগতে অতি অল্প লোকেই একথাটী বলিতে পারেন—

"মনের মানুষ আমি মনে এঁকেছিনু
যেই মত এঁকেছিনু সেইমত পা'নু।"

তাহার কাছে আমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ থাকিবে না, তাহার কাছেই আমার নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিব, সে ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকিবে না। এমন সঙ্গিনী জগতে খুবই বিরল যাহাকে রূপের এবং গুণের অনবরত অজস্র অতি মাত্রায় প্রশংসা করিলেও তাহা অযোগ্য হইবে না। আমি আমার সখীকে তাহার মানবীয় স্বরূপের ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে দেখিতে এবং তথায় তাহাকে জানিতে এবং তাহার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি। আমার মনে হয় অনেকে প্রীতিকে দ্বেষের মত ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। সাধারণতঃ লোক যথার্থ প্রীতি অপেক্ষা সংসারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর কাজ লইয়া ব্যস্ত। তাহারা শুধু নগদ বেতন পাইতে চাহে। তাহাদের প্রাণে এতটা কবিত্ব নাই যে একটী নারীকে তাহারা এই প্রকার আরাধনা উপাসনার বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে।

এই প্রকার বৃথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষা তাহারা একটা ভাঙ্গা কলস মেরামত করা অধিক মূল্যবান মনে করিবে।

বেড়াইতে গিয়া কেবল অপরিচিতদেরই দর্শন পাওয়া। এবং ঘরের মধ্যে একটী প্রাণী আছে যে তোমাকে জানে এবং তুমি যাহাকে জান তাহার সঙ্গে দিন কাটান এ দু'য়ে কত বৈষম্য? একটী আদর্শ ভাই বা ভগিনী ঘরে পাওয়া, ক্ষেতের ভূমির তলে সোনার খনি অথবা তোমার দরজার পার্শ্বস্থ প্রস্তরস্তূপে হীরক খণ্ড পাওয়ার তুল্য। কিন্তু এই সব কত দুর্লভ। সে ভাই বা ভগিনী তোমার দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের ভাগী হইতে পারে। তখন পৃথিবীতে কত সুন্দর জিনিষ নূতন ভাবে দেখা দেয়। তোমার ভ্রমণের সাথী কি একটী দেব বা দেবীকে করিবে, না একটি ক্ষেতের চাকর বা অসভ্য চাকরকে সঙ্গে নিয়া চলা ফেরা করিবে? কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য হরিণ বা শশক যেমন বৃদ্ধি করে সেরূপ কি একটী সঙ্গীর সাহচর্য্য করে না? বহিঃ প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুই এই সম্বন্ধ স্বীকার করিবে এবং ইহার বশ্যতা মানিয়া চলিবে। যেমন মাঠের শস্য তেমনি প্রাঙ্গনের ফলপুষ্প। তখন ফুল ফুটিবে পাখী গান করিবে কিন্তু একটী অভিনব উদ্দীপনা লইয়া! বৎসরে অমন তোমার ভাগ্যে অধিকতর সুন্দর ও পরিষ্কার দিন আসিবে।

প্রেমের অবলম্বন ক্রমশঃ প্রসারিত হয় এবং অনন্তকাল বাড়িতে বাড়িতে যাহা কিছু কমনীয় সমস্তকে ছাইয়া ফেলে পরিশেষে যাহা কিছু প্রেমময় তাহাতেই প্রেমিকের আত্মা অধিষ্ঠান লাভ করে এবং ক্ষুদ্র মানব সশরীরী প্রেমরূপে গৌরবমণ্ডিত হইয়া দাঁড়ায়।

মহারাজের উপদেশ

শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল

উপনিষৎ ক্লাস। ২৬।১।২৫

খাবার জিনিষগুলি একটী ভাল আর একটী মন্দ এইরূপ করিয়া বিচার করাতেই আমাদের মনে সুখ বা দুঃখের ভাব আসে। কিন্তু খাওয়ার জিনিষগুলি এমন ভাবে বিচার করিতে হয় যেন সাধারণ খাবার জিনিষগুলি গ্রহণ করিতে মনে দ্বিধা না আসে। আর এমন ভাবে অভ্যাস কর্ত্তে হবে যেন জিহ্বার ভালমন্দ আস্বাদন করিবার শক্তি একেবারে চলিয়া যায়। যখন আমি মধুকরী কর্ত্তাম তখন লোকের বাড়ী ভিক্ষা কর্ত্তে যে যা দিতো সব ঝুলিতে দিতে বল্তাম। কেউ বা দুটী চাল ভাজা, কেউবা একটু গুড়, কেউবা ঘাসের দানার রুটী আধখানা ও একটু তরকারী, এই সব ভিক্ষা দিতো। পশ্চিমের

লোকেরা বাঙ্‌লা দেশের লোকের মত যা রাঁধা নয় এমন জিনিষ ভিক্ষা দেয় না। তারা বোঝে সাধুরা আবার কোথায় রান্নাবাড়া কর্বে? তাই তারা রান্না জিনিষ সাধুদের ভিক্ষে দেয়। পশ্চিমের লোকেরা রান্না হয়ে গেলে ২।৪ খানা রুটী আলাদা করে রেখে দেয়। সাধুরা ভিক্ষা কর্ত্তে এলে তা থেকে আধখানা বা কেউ একখানা ক'রে রুটী ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা ক'রে যা পেতাম সব এক সঙ্গে ক'রে চটকাতাম, তাই ৩।৪টা লাড়ুর মত ক'রে খেতাম। জিভে ভালমন্দ আস্বাদন করার শক্তি এইরূপ ক'রে নষ্ট করবার চেষ্টা করতাম।

ভালমন্দ বিচার ক'রে সমস্ত কাজ কর্ত্তে হয়। কিন্তু সাংসারিক লোক সাধারণতঃ তা করে না। যখন লোকে ধাক্কার উপর ধাক্কা খায় তখন ভগবানে মন আসে। যার সবাই মরে যায় তার উপর ভগবানের অসীম দয়া কিন্তু সাংসারিক লোক সে ভাব নিতে পারে না! কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে দুঃখ প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, দুঃখে পড়লে ভগবানের কথা প্রায়ই স্মরণ হবে। ধাক্কা না খেলে শিক্ষা হয় না।

প্রাকৃতিক সমস্ত জিনিষই আমাদের সকল সময়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। বুদ্ধিবলে মানুষ এ সমস্ত গুলিকে জয় করিয়াছে। মানুষেই শেষে ভগবানত্ব লাভ কর্বে। অজ্ঞান দূর করিয়া সকলকে জ্ঞানী হইতে হইবে।

বাহিরের দিক থেকে আমাদের যেমন মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে, আমাদের নিজেদের ভেতরেও সেইরূপ শত্রু আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অবিদ্যা ও অজ্ঞান এই এই অষ্ট পাশ ছিন্ন করিয়া আমাদের মুক্ত হ'তে হ'বে, এরাই আমাদের শত্রু।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাকে দেখা যায় না। এই সব ইন্দ্রিয়গুলি যথাক্রমে রূপ, রস, গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ অনুভব করাব জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নিজের নিজের কাজ করে। যে ধীরশক্তি এই বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারিয়াছেন তিনি আত্মাকে দেখিতে পান। এই ইন্দ্রিয়গুলি অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য। আত্মাকে দর্শন করিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

যাহাতে তোমার আসক্তি আছে তাহারই তুমি দাস। যেটী না হ'লে তোমার চলে না যাহাতে তোমার এরূপ আসক্তি আছে, সেটী বিবেক বিচার করিয়া অভ্যাস ত্যাগ করিতে হয়। আসক্তি থাকলেই বন্ধন, সেটী ত্যাগ কর্ত্তে হলেই এই অভ্যাস ত্যাগ কর্ত্তে হবে। আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত লড়াই করিতেছি। মনের জোরে জিতিতে হবে।

যারা বালকবৎ অজ্ঞ তাহাদের আসক্তির উপর কোনও control নাই। আসক্তির জন্য তাদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কর্ত্তে হয়! জ্ঞানী ধীরব্যক্তি সত্যকে জানিয়া অমরত্ব লাভ করে; তারা অনিত্য জিনিষ চাহে না।

শুকদেব মুক্তপুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই যখন সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন, "হে পুত্র, তুমি কোথা যাইতেছ"? তখন শুকদেব তাঁর পিতাকে বলেছিলেন "কে কাহার

পুত্র? তুমি আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছ কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুবার তুমি আমার পুত্র ছিলে।

দেহ নিত্য নহে। যদি নিত্যই হবে তবে ইহার নাশ হয় কেন? দেহের চৈতন্য নাই। দেহ কি এই টেবিলটাকে জানতে পারে? তাহা পারে না। তুমি অর্থাৎ চৈতন্যবান পুরুষই ইহাকে টেবিল ব'লে জানতে পারে। যিনি জানতে পারেন তিনি নিত্য। তাঁর কখনও নাশ নাই।

যার যাতে আসক্তি আছে মৃত্যুর পর তার তাতেই আসক্তি থাকে এবং যে জিনিষের উপর আসক্তি, তা পাবার জন্য চারিদিকে হাতড়াইয়া বেড়ায়। মৃত্যুর পর মানুষের স্বভাব বদলাইয়া যায় না। মৃত্যুটা ঘুমের মত। একজন চোর যদি ঘুমায়, ঘুম থেকে উঠে, সে কি সাধু লোকের মত হবে? সে যেমন চোর ছিল, তেমনই থাকবে।

আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে accidentally (আকস্মিক ভাবে) কিছুই ঘটে না। সমস্তই Law (আইন) অনুসারে হ'য়ে থাকে। জীবনে ভালমন্দ যা কিছু আমরা পাই তজ্জন্য আমাদের কর্ম্ম-ই প্রধান। কোন কাজের কি ফল সেইটা আগে জানতে হয়। প্রকৃতির নিয়ম uniform. তোমার জন্য একরূপ, আর আমার জন্য অন্যরূপ, একরূপ হয় না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। তা যেই হাত দিক না কেন, তারই হাত পুড়ে যাবে।

মাতালের ছেলে মাতাল হয় কেন? Like attracts like. মাতালের মৃত্যুর পর, তার আত্মা প্রেতলোকে ঘুরিতে থাকে। অন্য অন্য প্রকৃতির আত্মাও মৃত্যুর পরে এই প্রেতলোকে থাকে, তারা জন্মাবার জন্য সুযোগ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ছেলে জন্মাবার কালে পিতা মাতার যেরূপ মনের গতি থাকবে, ঠিক সেইরূপ আত্মা প্রেতলোক হইতে আসিয়া গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে, যে লোক যেরূপ প্রকৃতি, জিনিষ বা আত্মাকে চায় না, সেই লোকের নিকট হইতে সেই প্রকৃতি, জিনিষ বা আত্মা তফাতে থাকে।

যতদিন আমাদের সে শিক্ষা সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন আমাদের সেই শিক্ষা ধরিয়া থাকিতে হইবে। Stop not until the goal is reached.

Pre-existence and Immortality

Swami Abhedananda

One of the fundamental principles of the philosophy and religion of Vedanta is the immortality of the human soul. According to the teachings of Vedanta, each individual soul is immortal by nature. However sinful it may appear to be from the moral standpoint, it will continue to exist after the death of the body. It cannot be annihilated or destroyed into nothingness. It can never cease to exist.

On this point the religion of Vedanta differs from the dogmas of those dualistic religions which maintain that immortal life can be obtained only by a few chosen ones as a special gift of God while others will perish. Many of the orthodox Christian theologians hold that the soul's continued life after death in eternal future is not a natural gift but a special gift, being conditioned upon the proper use of this life. They think that immortality is a reward of merit, or of good works, or of an ethical life or faith in the Christ. Here we may ask, who will decide how many degrees above zero one must be, morally, in order to obtain the gift of immortality ?

If we examine minutely we shall find that this dogma of conditional immortality is not based upon a rational foundation. It makes God, the merciful Father, partial and unjust. How can we imagine that a just, impartial and merciful Father will grant immortality to some of His children and allow the rest to perish, simply on account of their immoral acts or mistakes ? The religion of Vedanta does not teach this dogma of conditional immortality, but, on the contrary, it says that immortal life cannot be a reward or a gift of any superior being, because that reward or punishment is nothing but the result or reaction of our own actions ; and since every human action is finite or limited by time and space, and consequently non-eternal, it cannot produce an eternal effect in the form of immortal life. No human action, either of the mind or of the body, however good or virtuous it may be called, can produce an eternal effect, that is, an effect unlimited by time or by space. It will then be against the law of cause and sequence, which makes every effect or result similar to its cause, both in nature and quality.

There is another important point on which the conception of immortality in Vedanta differs from that of Christianity. Christianity, believing in the theory of special creation of the individual soul at the time of birth, denies the pre-existence of the human soul previous to the

birth of the body, yet it admits the continuity of the soul after death in an eternal future. This doctrine again is not based upon a rational foundation, nor is it supported by any fact of nature, because it is impossible for a thing which has a beginning in time to last for ever. No one has ever seen or heard of any substance which began to exist at a certain time but continued for ever in future. Can we imagine a stick, the one end of which is in our hand and the other end is endless, unlimited? No, it is impossible. We cannot think of a thing which has a beginning or a limit either in time or in space, on one side, and on the other side is unlimited by either time or space. As we cannot imagine any earthly object, or material thing, of such a nature, how can we imagine that the soul, which had its birth in time and space, will continue to exist for ever? We cannot conceive of a soul which came into existence at the time of birth and will remain for ever after death in eternal future or endless time. Therefore, immortality, which means the eternal continuity of existence, presupposes the existence of the soul previous to the birth of the body. If we believe in the immortality of the human soul we shall have to admit its pre-existence also, because that which is born must die, and everything that has a beginning must have an end. This is the law of nature. We cannot go against it.

The laws of nature are always uniform and universal; there is no such thing as an exception. All exceptions are governed by other laws which we may or may not know; they are only the expressions of different laws. Anything that is born must be subject to death, and that which has a beginning must have an end. If we wish to be endless or immortal in future we must have to admit that we were beginningless or immortal in the past. Here some people may think how is it possible that we existed in the past? If you apply that law, that because we exist to-day we could not come into existence out of nothing, then you will get a glimpse of the idea of pre-existence. And for this reason Vedanta teaches both immortality and pre-existence. No theory of immortality can be perfect or complete without admitting the pre-existence of the soul. No theory has successfully proved the necessity of an eternal future life in the case of one whose existence in the past has been proved to be unnecessary. If you say that your pre-existence was unnecessary so your immortal life will be equally unnecessary. If the world could get along without you before why should it not get along without you hereafter? What necessity will there be for an immortal life in future if you did not exist before? If you have come into existence all of a

sudden, you can go out of existence all of a sudden. Who will prevent us from becoming such an ephemeral substance ?

In Vedanta, true immortality means eternal existence in the past as well as in the future. Pre-existence and immortality are so closely related to each other that if we deny one we cannot accept the other. For logically, we shall be incorrect ; we shall, go against the laws of nature and our statement will be founded, not upon rational ground, but upon some dogma or doctrine which has no foundation. In Vedanta, therefore, we learn that each individual soul existed before the birth of the body. If we believe that we shall continue to exist after death we shall have to admit that we existed in the past, otherwise we cannot have immortal life in future. We have not come into existence for the first time out of nothing, but our present is a connecting link in the chain of our past and future existence. We may not know it, we may not possess the memory of our past lives ; still we existed just the same.

Here it may be asked, if we existed before our birth why do we not remember ? This is one of the strongest objections often raised against the belief in pre-existence. Some people deny the existence of the soul in the past simply because they cannot remember the events of the past. Others again, who hold memory as the standard of existence say, if our memory of the present ceases to exist at the time of death, with it we shall also cease to be ; we cannot be immortal ; because they hold that memory is the standard of life, and if we do not remember why then we are not the same beings.

Vedanta answers these questions by saying that it is possible for us to remember our previous existences. Those who have read "Raja Yoga" will recall that in the 18th aphorism of the third chapter it is said : "By perceiving the *Samskaras* one acquires the knowledge of past lives." Here the *Samskaras* mean the impressions of the past experience which lie dormant in our subliminal self, and are never lost. Memory is nothing but the awakening and rising of latent impressions above the threshold of consciousness. A Raja Yogi, through powerful concentration upon these dormant impressions of the subconscious mind, can remember all the events of his past lives. There have been many instances in India of Yogis who could know not only their own past lives but correctly tell those of others. It is said that Buddha remembered five hundred of his previous births. Krishna says, in the "Bhagavad Gita" : "Both thou and I, Arjuna, have gone through many births ; thou knowest them not ; but I know them all." This shows that Krishna remembered them because he

was a Yogi ; and Arjuna could not remember because he had not the power to do so.

Our subliminal self, or the subconscious mind is the storehouse of all the impressions that we gather through our experiences during our lifetime. They are stored up, pigeon-holed there, in the Chitta, as it is called in Vedanta. "Chitta" means the same subconscious mind or subliminal self which is the storehouse of all impressions and experiences. And these impressions remain latent until favourable conditions rouse them and bring them out in the plane of consciousness. Here let us take an illustration : In a dark room pictures are thrown on a screen by lantern-slides. The room is absolutely dark. We are looking at the picture. Suppose we open a window and allow the rays of the midday sun to fall upon the screen. Would we be able to see those picture ? No. Why ? Because the more powerful flood of light will subdue the light of the lantern and the picture. But although they are invisible to our eyes we cannot deny their existence on the screen. Similarly, the pictures of the events of our previous lives upon the screen of the subliminal self may be invisible to us at present, but they exist there. Why are they invisible to us now ? Because the more powerful light of sense-consciousness has subdued them. If we close the windows and door of our senses from outside contact and darken the inner chamber of our self, then by focussing the light of consciousness and concentrating the mental rays we shall be able to know and remember our past lives, and all the events and experiences thereof. Those who wish therefore to develop their memory and remember their past should practise Raja Yoga and learn the method of acquiring the power of concentration by shutting the doors and windows of their senses. And that power of concentration must be helped by the power of self-control That is, by controlling the doors and windows of our own senses.

These dormant impressions, whether we remember them or not, are the chief factors in moulding our individual characters with which we are born, and they are the causes of the inequalities and diversities which we find around us. When we study the characters and powers of geniuses and prodigies we cannot deny the pre-existence of soul. Whatever the soul has mastered in a previous life manifests in the present. If we possess the wisdom and knowledge which we gathered in our previous lives, then it matters very little whether or not we remember the particular events, or the struggles which we went through in order to gain that knowledge. Those particular things may not come to us in our memory, but we have

not lost the wisdom. Now, study your own present life and you will see that in this life you have gained some experience. The particular events and the struggles which you went through are passing out of your memory, but the experience, the knowledge which you have gained through that experience, has moulded your character, has shaped you in a different manner. You will not have to go through those different events again to remember; how you acquired that experience is not necessary; the wisdom gained is quite enough.

Then, again, we find among ourselves persons who are born with some wonderful powers. Take, for instance, the power of self-control. One is born with the power of self-control highly developed, and that self-control may not be acquired by another after years of hard struggle. Why is there this difference? Bhagavan Sri Ramakrishna was born with God-consciousness, and he went into the highest state of Samadhi when he was four years old; but this state is very difficult for other Yogis to acquire. There was a Yogi who came to see Ramakrishna. He was an old man and possessed wonderful pewers, and he said: "I have struggled for forty years to acquire that state which is natural with you." Sankaracharya, the great commentator of the Vedanta philosophy, wrote his commentary when he was twelve years of age, and there are very few thinkers and philosophers in the world who can understand the spirit of his writings. They are so deep and so sublime that ordinary minds cannot grasp them. There are many such instances which show that pre-existence is a fact, and that these latent or dormant impressions of previous lives are the chief factors in moulding the individual character without depending upon the memory of the past. Because we cannot remember our past, because of the loss of memory of the particular events, the soul's progress is not arrested. The soul will continue to progress further and further, even though the memory may be weak.

Each individual soul possesses this storehouse of previous experiences in the background, in the subconscious mind. Take the instance of two lovers. What is love? It is the attraction between two souls. This love does not die with the death of the body. True love survives death and continues to grow, to become stronger and stronger. Eventually it brings the two souls together and makes them one. The theory of pre-existence alone can explain why two souls at the first sight know each other and become attached to each other by the tie of friendship. This mutual love will continue to grow and will become stronger, and in the end will bring these lovers together, no matter where they go. Therefore, Vedanta

does not say that the death of the body will end the attraction or the attachment of two souls, but as the souls are immortal so their relation will continue forever. But we must not forget here that that relation and that love must be mutual. If you love some one and that person does not love you then it will be one-sided. It will not bring the two souls together. There must be mutual attraction. In Vedanta we learn that as immortality means the continued existence in eternal future, so pre-existence means the continued existence in the eternal past; the one cannot exist without the other. And each of these only expresses the one half of our soul-life, which is eternal, and both of these together make a complete whole; that is the eternal soul-life. It existed before, and it was always unborn, and therefore it will continue to exist in future for ever. Our present life is the resultant of the past, and our future will be the resultant of the present. Nothing will be lost.

Modern spiritualism has thrown a little light upon the future, that even the departed spirits do remember their past relations. This shows that memory does not depend entirely upon the physical organism, but memory goes with the soul wherever the soul goes. That is the real memory. The physical organism may be destroyed; it is only through which the subliminal self is reproducing powers which are latent in it So our present life is the resultant of the past; it contains all the previous impressions and experiences of past lives; only under certain conditions can they be remembered. But here we must remember that immortality does not necessarily imply that we should go to heaven to eternally enjoy the celestial pleasures, or to go to eternal perdition in order to suffer punishments on account of our evil deeds These ideas are not necessarily included in the meaning of immortality. According to Vedanta, immortality includes the meaning of progress, growth and evolution of the soul from lower to higher stages of development; it also includes the idea that each individual soul will manifest the powers which are already latent in the soul by going through different stages of growth and development until perfection and omniscience and omnipresence are acquired. In order to attain to this, in order to accomplish this highest end, the soul must manifest itself in various stages of life and gain experience after experience. That cause which brought us on the plane of existence will continue to bring us here again in future. If the same cause remains in us, even after the death of the body, then nothing can prevent us from coming back to this plane of existence in order to fulfil our desires and purposes. This idea leads to the theory of rebirth and reincarnation of

the individual soul. The rebirth and reincarnation of the individual soul is based upon the truth of the eternality of the soul-life which is expressed by pre-existence and immortality. The exodus of the soul after death into heaven or into some realm of punishment or lower realm depends entirely upon the thoughts and deeds of the individual soul, and the soul's stay in these realms is temporary, dependent upon the condition of reaping the results of those thoughts and deeds That is, the soul will remain there as long as it has not thoroughly reaped the fruits of its thoughts and deeds. At the expiration of that time the inmates of heavens and other realms will come back on this plane in order to gain further experience, to gain more powers, more knowledge, until perfection is reached. Vedanta does not say that heaven is eternal, but the soul has the power to transcend heaven and go beyond all celestial realms; why should we be limited to one particular spot ? If we do not care to return to this realm we shall be dissatisfied even when we have gone to heaven. Then will come the time when we shall try to go further beyond until we have become absolutely perfect and omniscient and omnipresent. Therefore it is said in Vedanta : Even the highest heaven is temporary and non eternal. The realms that exist between the earth and the highest heaven mark only the phenomenal growth and progress of the individual souls Those who go there and remain there are subject to birth and rebirth. They will come back again. But those who have attained to perfection transcend all heavens, understand eternal life and remain perfect for ever and ever.

স্মরণে

শ্রীনলিনীবালা বসু

ভগবান প্রজাপতি বিশ্বসৃষ্টির পরিকল্পনা করিবার পর—তাঁর মন হইতে মানসপুত্র রূপে যাঁরা জন্ম পরিগ্রহ করেন তাঁরাই জগতের আদিপুরুষ ও ঋষিসত্তম। জন্ম গ্রহণ করিয়াই সৃষ্টির আদি রহস্য পরিজ্ঞাত হইবার জন্য নির্জন হিমাচল বক্ষে নিঃসঙ্গ ভাবে তাঁরা আত্মধ্যানে নিমগ্ন হন, বহু কাল তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকিবার পর সেই আত্ম সমাহিত সাধুগণের হৃদয় জ্ঞান সূর্য্যের ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং তাঁহারা মায়াবগুণ্ঠন মুক্ত প্রকৃতির অপার রহস্য দর্শন করেন।

চৈতন্যময় আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার পর তাঁরা সমাধি হইতে উত্থিত হন—এবং জগতের কল্যাণের জন্য এই আত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভের পথ সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করেন। স্থূলবুদ্ধি ও ক্ষীণশক্তি মানবসমাজের কল্যাণের জন্য। তারপর হইতেই সত্যপথ লাভেচ্ছু ঋষিগণ তাঁহাদের নির্দ্দেশিত পথে গমন করিয়াই পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। আর যুগে যুগে এই ভারতবর্ষ সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিগণের চরণস্পর্শে ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে।

এই সেদিনও এই ভারতবর্ষই এক লোকোত্তর মহাপুরুষের দিব্য আবির্ভাবে কৃতার্থ হইয়াছে—এবং আজ তাঁহারই বন্দনাগানে আর তাঁহারই স্মরণোৎসবে সকলে একত্র হইয়াছে—

অতীত কোন শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগৃহখানিকে সুপবিত্র করিয়া যে দেবোপম শিশুটী জন্ম গ্রহণ করিল তাহার ইতিহাস কেহ জানে না—তাঁহার বাল্য ও কৈশোর প্রবাহমান দক্ষিণ সমীরণে সঞ্চরণশীল পুষ্প-কলিকাটীর মত কি লীলায় অতিবাহিত হইয়া গেল তাহারও সন্ধান কেহ তেমন ভাবে রাখে নাই, কিন্তু সেদিন প্রভাতের অরুণরাগরঞ্জিত গৈরিক বসনাবৃত হইয়া তরুণ পুরুষটী জগতের জনগণকে দেখা দিলেন বিস্মিত বিশ্ব সেই দিনই তার মুগ্ধ হৃদয়ের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁহাকে নিবেদন করিল।

তারপর নিখিল চিত্ত পদ্মের দলের উপর দণ্ডায়মান হইয়া এই অলোকসামান্য সন্ন্যাসী তাঁর অনন্ত গভীর অন্তরের প্রেম করুণাধারা স্বর্গ হইতে নিঃসৃত অলকানন্দার মতই সমগ্র মানবশিরে বর্ষণ করিলেন; কত উষার আলো তাঁর উন্নত শির-প্রভা মণ্ডিত করিয়া গেল, কত পূর্ণিমার চন্দ্র তাঁহাকে হিমকৌমুদীধারায় স্নাত করিল, পুষ্প তাঁহাকে সুরভি—বনস্পতি তাঁহাকে ঔষধি, বায়ু তাঁহাকে সুগন্ধি, এবং জগৎজননী জাহ্নবী তাঁহাকে অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিলেন; আর প্রশান্ত আকাশ তার অযুত লক্ষ তারকা-চক্ষু মেলিয়া এই মহা অভিনন্দন দর্শন করিল।

জগৎকে তিনি কি দিয়াছেন? তিনি জগৎকে দিয়াছেন এক অমূল্য সম্পদ,—নিত্য

শাশ্বত নিধি; যাহা লাভ করিলে মানুষ ইহ জীবনেই আধ্যাত্মিক পরম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়; অমরত্ব লাভ করে।

তিনি নিজ জীবনে সত্যকে আত্মাকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন,—এবং হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা যে সত্যের মুখ আবৃত তাহা অপসারিত করিয়া দেখাইয়াছেন তাঁহাদিগকে, যাহারা সত্য ধর্ম্মের জন্য আগ্রহশীল।

অনন্ত আকাশস্পর্শী সুমেরু শৃঙ্গ হইতে ঘন নীল সমুদ্রতল পর্য্যন্ত আলোড়নকারী সঙ্গীত তাঁহারই কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল; সেই সুমধুর সঙ্গীত প্রবাহ চিরদিন তমসাচ্ছন্ন মোহমুগ্ধ মানবপ্রাণে ব্যাকুল উন্মেষণা জাগাইয়া তুলিবে অমর বস্তু লাভের জন্য।

যে উচ্চ হইতে উচ্চতম জ্ঞানরাশি তাঁহার অন্তরকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল যে মহান ভাবে তিনি সেই অসীম পুরুষের সহিত অভেদ এই দিব্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সে জ্ঞান তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যগণের মধ্যে—অধিকারী ভেদে যথোপযুক্ত-ভাবে দান করিয়া গিয়াছেন।

কি সুন্দর ছিল তাঁর দেবোপম কান্তি! কি অসাধারণ ছিল মানসিক গঠন,—সেই আনন্দময় পুরুষ একাধারে সর্ব্বগুণের সমষ্টি ছিলেন,—তাঁর অনুপম সুন্দর আকৃতিতে যেমন কুসুমের কমনীয়তা—চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, সূর্য্যের জ্যোতি, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য—এবং আকাশের বিশালতা বিরাজিত ছিল অলোকসামান্য চরিত্রেও তেমনি শুকদেবের সারল্য—বশিষ্ঠের জ্ঞান, ব্যাসদেবের মনীষা এবং বৃহস্পতির গুরুভাব বিদ্যমান ছিল। আনন্দের সুধাপাত্র হস্তে লইয়া মর্ত্ত্যভূমে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন দীন হীন পতিত সকলের জন্যে;—ঐশ্বর্য্যের বিরাট অট্টালিকা হইতে নামিয়া পথের প্রান্তে তাঁহার আসন পাতিয়া ছিলেন যেখানে ধনী, দরিদ্র, রাজা প্রজা সকলকে সমান ভাবে তাঁহার স্নেহের অভয়স্পর্শ কল্যাণ আশ্রয় লাভ করিবে কিন্তু সেখানেই সেই পথের প্রান্তেই তাঁহাকে ঘিরিয়া এক অনিন্দিত বৈকুণ্ঠধাম গড়িয়া উঠিয়াছিল যেখান হইতে রিক্ত হস্তে কখনো কেহ ফেরে নাই।

আজ নরলীলা সম্বরণ করিয়া স্ব-ধামে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু তাঁর বৈকুণ্ঠ আনন্দহীন হয় নাই; প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ ভিত্তিতল যে পরম দেবতার পদস্পর্শে পরশমণিতে পরিণত হইয়াছে;—এখানে যে কিছু যা কিছুই আসুক—সে যত মলিন, যত বিবর্ণ, যত অঙ্গারই হোক না কেন বিশুদ্ধ কাঞ্চনখণ্ডে পরিণত না হইয়া উপায় নাই।

আজও যে তাঁহার মন্দিরতলে উৎসব সমারোহ পূর্ব্বনিয়মে অনুষ্ঠিত হইতেছে শুধু সেই জন্যই; কারণ তাঁর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী শিষ্যগণের প্রাণে বিপুল প্রেরণা রহিয়াছে—ভাব প্রবাহে শোকের দৈন্যের নিরুৎসাহ ভাব কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

যখন তাঁর ভক্তগণ শিষ্যগণ উৎসবানন্দে একত্র হন, তখন যদিও অন্তরের অন্তস্তল হইতে তাঁর মহা বিরহের আর্ত্ত হাহাকার অধীর বেগে গর্জ্জায়মান মহা সমুদ্রের মতই উদ্বেল হইয়া উঠে—তবুও প্রাণে আশ্বাস থাকে যে এই দিব্যধাম যেখানে আনন্দের মধুচক্র বিরাজিত

ছিল, যদি শান্তি থাকে—যদি আনন্দ থাকে তবে—তাহা এইখানেই পাওয়া যাইবে ; এই জন্যই মঠের মহানুভব সন্ন্যাসীগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত সকলেই বৎসরে একবার মন্দিরে একত্র হইয়া তাঁহার পরম প্রসাদ লাভ করিয়া যাইবেন। শূন্য হৃদয়ভাণ্ডার শান্তিপূর্ণ করিয়া লইবেন। তাঁদের আরও ইচ্ছা এই যে গুরু মহারাজ দূর প্রবাসী অথবা গ্রামান্তরবাসী অগণিত ভক্তগণ যাঁরা হয় তো তাঁহার অদর্শনে নিজেদেরকে নিরাশ্রয় মনে করিয়াছেন, এবং ভাবিয়াছেন যে মঠে আর তাঁহাদের কেহ নাই কিছু নাই, তাঁহাদের জানাইয়া দিবেন যে গুরুজীর আশ্রয় চিরদিনের—তাঁর স্মরণ নিত্যকালের—তাঁর মঠে—তাঁর আরব্ধিত সকল প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কাজ—মঠের সন্ন্যাসী ভ্রাতাগণের সহিত ভাগ করিয়া লইবার অধিকার সকলেরই আছে।

যতদিন পৃথিবীতে তিনি প্রকাশিত ছিলেন ততদিন তাঁর প্রিয় শিষ্যগণ সর্ব্বরূপ দায়িত্ব ও প্রয়োজন তাঁর উপর নির্ভর করিয়া শিশুর মত নিশ্চিন্ত ছিলেন—মহামহীরুহ ছায়াবরিত ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষের ন্যায়,—কিন্তু যখন সে দিনের সে সুখের দিনের চির অবসান ঘটিয়া গেল—তখন অতীতের সেই শান্তিময় গৌরবময় দিনের কথাগুলি স্মৃতিভাণ্ডারে অক্ষয় মণি-মঞ্জুষার মতো সযত্নে রক্ষা করিয়া যথার্থ কর্ম্মযোগীর মত বিপুল কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ভার গ্রহণের জন্য তাঁরা বাস্তব জগতে নামিয়া আসিলেন এবং সকলকে ইহার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিলেন।

যথার্থ ভাবে আধ্যাত্মিক জগতে সন্ন্যাসী শিষ্যগণই তাঁদের গুরু মহারাজের ভাব সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন এং তাঁহার কার্য্য সকল অকুণ্ঠ সাহসের সহিত সম্পন্ন করিবার এবং অনন্ত কালের জন্য তাঁর পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহারাই লাভ করেন, এই জন্যই তাঁরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও গুরুদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণই অনুভব করিয়াছেন যে মহারাজের অপার ভাবপ্রবাহ—বর্ত্তমান সময়ে সকলের মধ্যে প্রসারের কত আবশ্যক এবং সকলের একত্র হওয়া কত প্রয়োজন। কাজেই আজিকার এই সম্মিলন এক দিনের নহে—মনে করিতে হইবে—যুগ প্রয়োজনে যাহাদের আবির্ভাব তাঁহাদের তিরোভাবেও তাঁহাদের কার্য্য-প্রয়োজন সমাধা করিয়া থাকে—সুতরাং যখনই সংসারের কলকোলাহল—মনের নিভৃত প্রদেশের দ্বারে করাঘাত করিবে—যখনই মন বিক্ষুব্ধ এবং চিত্ত মোহনিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে—তখন এই দেবমন্দিরে এই গুরুপাদপীঠে শান্তি ও আনন্দ লাভের আশায় সকলে আসিয়া সম্মিলিত হইবে এবং তখন অন্তর হইতে স্বতঃই প্রার্থনাবাক্য উত্থিত হইবে—

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।"

গ্রন্থ সমালোচনা

নবযুগের মানুষ—লেখক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩৫, মূল্য এক টাকা। ৬১।বি, ঈশ্বর মিল লেন "শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয়" হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"নবযুগের মানুষ" নামক এই গ্রন্থখানিতে বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম্মশিক্ষক ও মহামনীষী দার্শনিক পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মহাজীবন, বিচিত্র কর্ম্মশক্তি, অনন্যসাধারণ মনীষা ও লোকোত্তর চরিত্রের পরিচয় দানের চেষ্টা করা হইয়াছে। যে ধর্ম্মান্দোলনের মহাকার্য্যকে বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ সুদীর্ঘ পঁচিশবৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে অদম্য উৎসাহে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের এই বিচিত্র কর্ম্মবহুল বিরাট মহাজীবনের কাহিনীর যথার্থ পরিচয় দেওয়া সংক্ষেপে সম্ভব নয়। ইহা একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থের আয়তন সাপেক্ষ বর্ত্তমান গ্রন্থে স্বামিজীর বহুমুখী ও বিরাট জীবনের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বল্প পরিসর হইলেও ইহার আলোচনা ও বর্ণনার শক্তি পাঠক মাত্রকেই মোহিত করিবে।

এই গ্রন্থের লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উৎসাহী তরুণ ছাত্র। স্বামিজীর জীবনের যে চিত্র তিনি নিবিড় শ্রদ্ধা ও নিপুণতার সহিত আঁকিয়াছেন তাহা সত্যই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। লেখক এই গ্রন্থে শুধু স্বামিজীর জীবনের বিস্ময়কর কাহিনীরই বর্ণনা করেন নাই। পরন্তু স্বামিজীর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী হইতে বিশেষ বিশেষ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বামিজীর অপূর্ব্ব চিন্তাধারার একটা আভাসও তিনি দিয়াছেন। ধর্ম্মগুরুরূপে কোথায় তাঁহার অভিনবত্ব, বিচিত্রতা ও বিশেষত্ব—ভারতবর্ষ ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার বাণী কি ইহাও এই গ্রন্থে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া "ভারতের দুই কর্ম্মবীর" নামক অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধেও গ্রন্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, স্যার সি, ভি, রমণ, দার্শনিক-প্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ মনীষীরা পূজ্যপাদ স্বামিজীর উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভে সুসজ্জিত করিয়া লেখক এই গ্রন্থটিকে পাঠক সমাজের কাছে আরও আগ্রহের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা পূর্ব্বাপর বেশ স্বচ্ছ ও সাবলীল। বইটির বাঁধানো সুন্দর, দুইখানি চিত্র ইহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। ভূমিকায় লিখিত মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরাও বলি, "বাঙ্গালার গৃহে গৃহে এই আলেখ্যখানির প্রচার হউক, এবং স্বামিজী মহারাজের জ্যোতির্ম্ময় জীবনের দীপ্তি বঙ্গীয় যুবসমাজকে আলোকিত ও উদ্বুদ্ধ করুক—ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।"

নিবেদন

কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে ৺শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজা উপলক্ষে গত ১০ই আশ্বিন হইতে ১২ই আশ্বিন দিবসত্রয় শ্রীমন্দির ও প্রাঙ্গণাদি পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। সাধুবৃন্দ প্রত্যহ সম্মিলিত ভাবে চণ্ডীপাঠ করেন। বহু অনুরাগী ভক্ত বাঙ্গালীর এই শারদোৎসবের দিন কয়টিতে মঠপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া মহামায়ার পূজানন্দে যোগদান পূর্বক মায়ের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

* * *

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে তাঁহার স্বরচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত" হইতে গত আশ্বিন মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কথকতা করিয়া ভক্ত সাধারণের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন।

৪ঠা আশ্বিন রবিবার বহু অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের আগমন ও হৃদয়ের বিদায়।

১১ই আশ্বিন রবিবার (ক) শ্রীপ্রভুর সহিত রাখালের মিলন। (খ) নিত্য নিরঞ্জনের মিলন এবং সুরেন্দ্র, মনোমোহন ও রাজেন্দ্রের বাটীতে শ্রীপ্রভুর মহোৎসব।

১৮ই আশ্বিন রবিবার — ক) শ্রীপ্রভুর সহিত নরেন্দ্রের মিলন - (খ) বিভিন্ন ভক্তের সহিত বিভিন্ন লীলা।

২৫শে আশ্বিন রবিবার (ক) শ্রীপ্রভুর সহিত মাষ্টারের মিলন (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত কথোপকথন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ফ্রী লাইব্রেরী, ফ্রী রিডিং রুম, ফ্রী প্রাইমারী স্কুল ও ফ্রী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য একশত পাঁচ টাকা পাওয়া গিয়াছে, এতদ্ব্যতীত প্রায় একশত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অর্থকষ্ট অবস্থায় অতি সাধারণ ভাবে চারিখানি মাত্র গৃহ নির্ম্মিত হইবে। মোট আটশত টাকা হইলে উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করা যাইবে। স্কুলগৃহের যেরূপ জীর্ণ অবস্থা, তাহাতে সেখানে কোন কাজ-কর্ম্ম করা বিপজ্জনক লাইব্রেরীও সাময়িক ভাবে ভিন্ন গৃহে স্থানান্তরিত হইয়া সেখানে কোনপ্রকারে কাজ চালান হইতেছে।

এই জনহিতকর কার্য্যে সর্ব্ববিধ সশ্রদ্ধ সাহায্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠের প্রেসিডেন্ট বা সম্পাদক কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে

* * *

পাবনায় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ৭৬তম জন্মোৎসব পাবনা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক ও ভজন, বেলা ৮টায় পূজনীয় স্বামীজি মহারাজের জীবন-কথা আলোচনা তৎপরে বিশেষ পূজা, হোম এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৪॥০-টায় স্থানীয় টাউনহলে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজীর সহপাঠী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা

বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রীগণ স্বামী অভেদানন্দ রচিত স্তোত্র সুমধুর কণ্ঠে গান করে। ইহার পর ব্রহ্মচারী পরেশচৈতন্য 'স্বামী অভেদানন্দের দান' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সরকার বি, এস্-সি "মহারাজের উপদেশ" আলোচনা করেন। অতঃপর স্থানীয় কলেজের ছাত্র শ্রীমান আশুতোষ সাহা ও শ্রীমান অনিলচন্দ্র দাস স্বামীজির জীবনী ও তাঁহার অবদান সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহীরূপে বর্ণনা করেন। তাহার পর শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহারাজ অশ্রুগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে স্বামীজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া বলেন— পৃথিবীর কাছে বেদান্ত ধর্ম্মকে প্রচার করিয়াছেন স্বামী অভেদানন্দ। বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই দুইটি প্রধান শিষ্য যুগ যুগ ধরিয়া মানবের আধ্যাত্মিক জগতে নেতৃত্ব করিয়া যাইবেন। বর্ত্তমান জরাগ্রস্ত ভারত যেদিন গা ঝাড়িয়া দাঁড়াইবে— সেদিন মাতিয়া উঠিবে এই মহাপুরুষকে লইয়া। বর্ত্তমান যুগে মানবের উপযোগী করিয়া ধর্ম্মকে মানবের সর্ব্বকর্ণে এমন সহজ ও সরল ভাবে প্রচার ইঁহাদের মত আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। মানবজাতির পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণরূপ মহাভাবসাগর উঠিয়াছে এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের দ্বারা বিতরণে বিশ্বমানব তাহা পাইয়াছে। ঘরে ঘরে বাঙ্গালী ইঁহাদের পূজা করুক। যে জাতির মধ্যে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব সেই জাতি কৃতজ্ঞ হউক। নিজেদের মধ্যে নূতন নূতন বিবেকানন্দ অভেদানন্দ ডাকিয়া আনুক।" সভাপতির বক্তৃতা অন্তে একটী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত হয় এবং সভার কার্য্য শেষ হয়।

* * *

পাবনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা

অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও পাবনা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বেদান্তসমিতি ভবনে শ্রীশ্রীশারদীয়া মাতার অর্চনা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৺পূজার কয়দিন জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে ভক্তগণ মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছে এবং পংক্তিভোজনে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি পূজা রাত্রে বিশেষভাবে আরত্রিকাদি করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র অধিকারী মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। স্থানীয় আশ্রমের পূজা পাবনা সহরবাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

* * *

শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী পরমারাধ্যা শ্রীসারদাদেবীর ৮৯তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে আগামী ২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান ও কীর্ত্তনাদি হইবে।

সম্পাদক—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী সদ্‌রূপানন্দ কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৩।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মানসরূপা প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অভেদানন্দ স্মৃতি গ্রন্থপ্রচার অর্থ ভাণ্ডার

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতামালা ও রচনাবলী ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের ধর্ম, দর্শন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নব নব মৌলিক তথ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে পৃথিবীর যে কোন সুসভ্য দেশের গৌরব ও বিস্ময়ের বস্তু। তাঁহার বহু গ্রন্থ প্রকাশিত, বহুল প্রচারিত হইলেও এখনও প্রায় আড়াইশ বক্তৃতা অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এইগুলি প্রকাশ করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। তাহারই জন্য আজ আমরা দেশবাসীর দ্বারে উপস্থিত—আশা করি তাঁহারা এই গুরু-কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমাদিগকে আনন্দের সহিত সাহায্য করিবেন।

এই মহান উদ্দেশ্যে প্রেরিত অতি সামান্য দানও শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে।

বিনীত—
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা।

প্রাপ্তি স্বীকার

	জের		জের ৭৫৩৸৶০
১।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (খড়্গপুর)	...	২৲
২।	,, কানাইলাল আচার্য্য (রাজসাহী)	..	১৲
৩।	Mr. Starfck (America)	.	২০৲
৪।	Mr. C. Venkat Chelapatti (Madras)	..	২৲
৫।	শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ব্যানার্জ্জি (মুঙ্গের)	..	।০
৬।	,, মতিলাল বসু (টাঙ্গাইল)	...	২৲
৭।	,, রমেশচন্দ্র দত্ত (রেঙ্গুন)	...	২৲
৮।	,, যশোদাকান্ত রায় (টাঙ্গাইল)	..	১৫৲
৯।	,, প্রমোদরঞ্জন মুখার্জ্জী (মেদিনীপুর)	...	।০
১০।	,, উপেন্দ্রকুমার দত্ত (কলিকাতা)	...	৫৲
১১।	,, সুবোধকুমার ঘোষ (ঐ)	...	২৲
১২।	,, যশোদাকান্ত রায়, টাঙ্গাইল (২য় দফা)	...	১৫৲
১৩।	,, ,, (৩য় দফা)	...	১৫৲
১৪।	,, অধীরকুমার দাস ও অনাথবন্ধু বিশ্বাস, জামসেদপুর		৬৲
১৫।	,, যশোদাকান্ত রায়, টাঙ্গাইল (৪র্থ দফা)	...	৪।০
১৬।	,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু (যশোর)	...	১৲
১৭।	,, সুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ	...	১৲
১৮।	,, রমেশচন্দ্র দত্ত, রেঙ্গুন (২য় দফা)	...	১।০
			৮৫০৶০

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA.

		Rs.	As
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA	...	3	8
India and Her People (New Impression.)	...	3	0
Self-Knowledge ...	...	1	8
Path of Realisation ...	...	2	0
Divine Heritage of Man ...	...	2	0
Spiritual Unfoldment ...	...	1	8
Reincarnation ...	...	1	8
Philosophy of Work ...	...	1	12
Lectures and Addresses in India ...	...	2	4
How to be a Yogi ...	...	2	0
Great Saviours of the World ...	...	1	8
Human Affection and Divine Love (New Edition)	...	1	0
Religion of the 20th Century (New Edition)	...	0	8
Sri Ramakrishna (New Book) ...	...	0	4
Does the Soul exist after Death (New impression)	...	0	4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

19B, Raja Raj Krishna St,

Calcutta.

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ | দশম সংখ্যা

বুদ্ধ ও পাতঞ্জল-যোগ

[শ্রীঅধরচন্দ্র দাস এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি]

অনেকের ধারণা এই যে বুদ্ধদেব এক নূতন ধর্ম্মপন্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করেন বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কেবল বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত এবং আত্মমনন নিদিধ্যাসন, এককথায় যোগসাধনা বলিয়া তখন কিছুই ছিল না। বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করিলেই উপরোক্ত মতবাদ যে ভ্রান্ত তাহা প্রতীয়মান হইবে। অরাড় ও রুদ্রক যে বুদ্ধের দুইজন গুরু ছিলেন তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—তাঁহাদের নিকট হইতে বুদ্ধ কি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন? অরাড় ও রুদ্রক সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে দুইজন সাংখ্যাচার্য্য ছিলেন এবং কপিল প্রবর্ত্তিত যোগপন্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে গৌতম তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যোগের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরে নিজ জীবনে ধ্যান ধারণা প্রভৃতির চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া যোগের লক্ষ্য সমাধি অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, পাতঞ্জল যোগদর্শন বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যোগপন্থা ও যোগসূত্র, যোগভাষ্য ইত্যাদি এক নহে, বরং যোগসূত্র যোগভাষ্য যোগপন্থার পূর্ব্ববর্ত্তী অস্তিত্ব সূচনা করে। ইহার প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে। বৈদিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির মধ্যবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস সম্যক্ ভাবে এখনও আলোচিত হয় নাই। তবে বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই বিষয় সম্বন্ধে অনেক নির্ভরযোগ্য অনুমান করিয়াছেন। রিস্ ডেভিডস্ তাঁহার 'বৌদ্ধ ভারত' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনেক নগ্ন সন্ন্যাসী দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধনাতে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং অনেক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অনেকে আবার তার্কিকও ছিলেন; তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেন এবং ধর্ম্ম-সাধনা,

আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক জটিল সমস্যাসমূহের আলোচনা করিতেন। উপরন্তু আমরা দেখিতে পাই যখন গৌতম ভূতলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, তখন অন্তরীক্ষে দেবগণ সানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবগণের আনন্দোৎসবে আকৃষ্ট হইয়া হিমালয়স্থ 'অসিত' নামধেয় জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাদের আনন্দের হেতু জিজ্ঞাসু হইয়া অবগত হইলেন যে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্ম-সংস্থাপনোদ্দেশ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন তিনি কপিলবাস্তু নগরীতে উপস্থিত হইয়া নবজাত বোধি-সত্ত্বকে দর্শন করিবার জন্য মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য নালক সহ আকাশ পথে রাজা শুদ্ধোধনের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। সেই সময়ে ত উড়ো-জাহাজ ছিলনা তবে সন্ন্যাসী 'অসিত' আকাশ পথে উড়িয়া আসিলেন কি প্রকারে? আসল কথা এই 'অসিত' ছিলেন একজন যোগী, যোগ-সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার অণিমা লঘিমা ইত্যাদি সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধির কথা আমরা যোগশাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে দেখিতে পাই। অপরন্তু বোধি লাভের পর বুদ্ধ অনেক সাধু সন্ন্যাসীদিগকে আপন ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকই তপস্বী ছিলেন। কাশ্যপগণ ও যে পঞ্চ সন্ন্যাসীকে বুদ্ধ বারানসী মহানগরীতে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলই যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। অতএব যোগসাধনা, তপশ্চর্য্যা যে বুদ্ধের জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় আর্য্য সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং বুদ্ধ স্বয়ং যে সেই যৌগিক সংস্কৃতের নিকট বিশেষ ঋণী তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে বুদ্ধের সাধনায় ও শিক্ষায় কোন নূতনত্ব নাই। উপনিষদের অনেক স্থানে ব্রহ্ম—পারমার্থিক তত্ত্ব যে বাক্য মনের অতীত তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনঃ'; আবার কঠোপনিষদে—'নৈব বাচা ন মনসা, প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা'—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' ইত্যাদি। যাহা জগতে সত্য-স্বরূপ, শাশ্বত, তাহা অচিন্ত্য, অতীন্দ্রিয়, বাক্য মনের অগোচর। অথচ উপনিষদেই দেখিতে পাই—সত্যানুসন্ধিৎসুরা বিশেষজ্ঞদিগকে প্রশ্ন করিতেছেন—'কিং ব্রহ্ম?' এবং যাহাকে বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না, মন ধারণা করিতে পারে না, যাহার সীমানা নাই, যাহা অসীম ও অনন্ত তাহাকে মানসিক কল্পনা সাহায্যে এবং যাহা বাক্যদ্বারা অনভ্যুদিত তাহাকে বাক্‌চাতুর্য্যে রূপায়িত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা উপনিষদের ঋষিদের মধ্যেই রহিয়াছে। শ্রীবুদ্ধ সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন যে আত্মোপলব্ধির ব্যাপারে বাগাড়ম্বরের অবকাশ নাই। 'শান্তোঽয়মাত্মা'—সেখানে ইন্দ্রিয়, মনের চাঞ্চল্য, বাসনার আবিলতা নাই। "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান-মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"—আমাদের ইন্দ্রিয় বহির্মুখী, তাহাদ্বারা কেবল বহির্জগতের জ্ঞান হয়। উহা 'চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশিত করিতে পারে না। আত্মা ধ্যানগম্য;

সর্ব্ব চিত্তবৃত্তি নিরোধাবস্থায় আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেই চরম অবস্থা সহজ-লভ্য নয়। আমাদের সাধারণ জীবনযাপন উহার পরিপন্থী। অতএব আমাদিগকে সমাহিত চিত্তে শরীর ও মনের সম্যক্ সংযম সাধন করিতে হইবে। এই সংযম সাধনের উপায় স্বরূপ পুরাকালে অষ্টাঙ্গিক যোগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।* যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি পাতঞ্জল যোগের বিভিন্ন অঙ্গ। বুদ্ধ স্বয়ং যে এই যোগপথ অবলম্বন করিয়া সমাধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট। আমরা আজকাল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের যে মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি দেখিতেছি তাহাতে বুদ্ধ পদ্মাসনে সমাসীন দেখিতে পাই। উহা কেবল ভাস্কর ও শিল্পীদের কল্পনা প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আসলে উহারা অতীতকালের একটা বাস্তব ঘটনা প্রস্তরের ও রংএ রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। সে যাহাই হউক, যদিও বুদ্ধ আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া সমাধি লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি হুবহু পাতঞ্জল যোগ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পান নাই। ইহার কারণ যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ পাতঞ্জল যোগ কঠোর তপস্যা সাপেক্ষ; প্রকৃত বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে কেবল হাত, পা, নাক, কাণ দ্বারা কতগুলি কসরৎ করিলেই বিশেষ কিছু হয় না। দ্বিতীয়তঃ সকলের পক্ষে বুদ্ধের মত বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন থাকা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম-জীবন এমন কিছু অদ্ভুত নয় যে ইহা স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে কোন প্রকারেই খাপ খাইতে পারে না। বুদ্ধ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নৈতিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। ইহা চিরন্তন সত্য এবং আধ্যাত্মিক জগতের গোড়ার কথা। ইহা পাতঞ্জল যোগে যম ও নিয়মে নিবদ্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধ এই মূল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সহজ এবং সরল ভাবে সাধারণ্যের উপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত চাঞ্চল্য অনেকাংশে প্রশমিত হয় এবং তখন পারমার্থিক তত্ত্বের মনন নিদিধ্যাসন সম্ভব হয়। সেই হেতু বুদ্ধ সচ্চিন্তা, সম্যক্ কল্পনা, সম্যক্ বাসনা, ইত্যাদি, এককথায় সাধু জীবন ও সৎ জীবিকা এত প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন। বুদ্ধের সাষ্টাঙ্গিক যোগে 'সমাধি' শেষ অঙ্গ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যোগের আরম্ভ এবং পাতঞ্জল যোগে যাহা 'ধ্যান' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহা তাহা ভিন্ন কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহার অর্থ এই যে অহিংসা, প্রেম, সাম্য ইত্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মন শান্ত সমাহিত হইয়া সাধনোন্মুখ হয়। ধর্ম্ম পরমার্থোপলব্ধির উপায় স্বরূপ, এবং বুদ্ধ তাঁহার সাষ্টাঙ্গিক যোগ প্রবর্ত্তন করিয়া যুগোপযোগী ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছেন :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

বুদ্ধের জীবন ছিল আধ্যাত্মিকতার প্লাবন। বহু নর-নারী বুদ্ধের কৃপায় চির শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে বুদ্ধই ছিলেন বেদ তন্ত্র, তাঁহার বাণী মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন:—

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

বিকৃত বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্ সি

বিজ্ঞানের কথা মনে পড়লে আমাদের সামনে তার ভয়াবহ ছবি ভেসে ওঠে। নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণস্বর 'সিরিন' বেজে উঠছে, সাথে সাথে বিমান অনুসন্ধানী তীব্র আলোক স্তম্ভ শূন্যে উজ্জ্বলিত হ'য়েছে, দূর পাল্লা কামান গর্জ্জে উঠছে। ভীষণ ঘণ্টাধ্বনি ক'রে বেগে ছুটে চলেছে দমকল, তার পেছনে এম্বুলেন্স। বিজ্ঞানাগারে যে রস চোলাই হচ্ছে তাতে ছায়া পড়েছে করাল মৃত্যুর। বায়ু বিকম্পনী বিমানের শূন্য অভিযানে আর হর্ষ জাগায় না, শঙ্কার সাথে মনে জাগে বোমার বিধ্বংসী শক্তির কথা। আজ বিজ্ঞানের স্নিগ্ধ সৌম্য দেবমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সংহারী দানব মূর্ত্তিটি প্রকটিত হ'য়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের নিন্দাভাজন হ'য়েছে। কিন্তু দোষটা কি সত্যি বিজ্ঞানের? বিজ্ঞান হ'ল যন্ত্র। যন্ত্র দিয়ে আমরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নি। বিষপ্রয়োগে মানুষকে হত্যা করতে পারি, আবার নিয়মিত মাত্রায় সেবন করিয়ে তাকে ব্যাধিমুক্তও করতে পারি। হত্যার অপরাধ কি বিষের? বিষ ভালমন্দ কিছুই নয়, তার স্বেচ্ছাগত কোন উদ্দেশ্য নেই, ভালমন্দ সবটাই প্রয়োগ কর্ত্তার উপর নির্ভর করছে।

বেকার সমস্যার সৃষ্টি হ'য়েছে, আধুনিক যান্ত্রিক যুগে। বৈজ্ঞানিক শ্রম-লাঘব করে যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন; শেষ পর্য্যন্ত দোষটা তাঁরই ঘাড়ে পড়ল, যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন বলে। দোষত তাঁর নয়। দোষ হল সেই দুষ্ট পদ্ধতির, যাতে উৎপন্ন দ্রব্যের সাথে শ্রমিকের দৈনন্দিন কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করলে না।

গত দু'শ বছরে বৈজ্ঞানিকের বিনিদ্র প্রচেষ্টায় আমরা যে সম্পদের অধিকারী হ'লাম তার সম্ভার রূপ আমাদের স্তম্ভিত করেছে। দুষ্ক-বিরল পল্লী তার উদগ্র যারণরূপ

দেখাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের আদি যুগে, যাঁরা আধুনিক আবিষ্কার উদ্ভাবনীর মনের গড়েছিলেন তাঁদের অন্তরে এই মারণ যন্ত্রের বিন্দুমাত্র আভাষ ছিল কি? জ্ঞানাহরণের অদম্য অনুসন্ধিৎসায়, সত্যের অনুসন্ধানে তাঁরা জাগতিক আনন্দ, আরাম, যশ, ধন, সব কিছু থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছিলেন। সেছিল আনন্দের অনুসন্ধান; অর্থাহরণের প্রচেষ্টা আদৌ তাতে ছিল না। মানুষের হাতে মারণশক্তির সংহত ক্ষমতা আনার দায়ীত্ব বৈজ্ঞানিকের থাকতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল না কোন দিন। আলফ্রেড নোবল যেদিন ডিনামাইট তৈরী করেছিলেন, রসায়নী শীলি যেদিন বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস আবিষ্কার ক'রেছিলেন সেদিন তাঁদের অন্তরের আনন্দ ছিল নির্মল, যার মধ্যে ভবিষ্যতের কোন দিনে, এদের কোন অপপ্রয়োগের কথা স্থান পায়নি।

সমাজের সুখ সুবিধার মুখ চেয়ে চেয়ে বিজ্ঞান ধাপে ধাপে গড়ে উঠছিল। ব্যক্তি বা সমষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তার আয়তন বেড়ে উঠেছে, বিস্তৃত হ'য়েছে। আর এর পেছনে আত্মভোলা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষিত সত্যের তিল তিল আহরণ রয়ে গেছে। একজন রাজনীতিজ্ঞ মাইকেল ফ্যারাডেকে বলেছিলেন, "আপনার এ সব গবেষণার কাজ দেখে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে, এসব কি হবে, এসব কি কোন কাজে লাগবে?" ফ্যারাডে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "মশায় বলতে পারেন শিশু কি কাজে লাগে?" বাস্তবিকই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। শিশু বড় হ'য়ে কি হ'য়ে উঠবে কেউ কি বলতে পারে? ফ্যারাডের সেই বিদ্যুতের শিশু-গবেষণা পরবর্ত্তীকালে বিরাট বিদ্যুৎশিল্পের রূপ নিয়েছে; সমাজের কত কল্যাণ করেছে। আবার মনে হয় পাস্তুরের কথা। তাঁর একাগ্র গবেষণার ফলে আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসা ও সংক্রামক ব্যাধির রোগ-বীজতত্ত্ব এত পরিণত হ'য়েছে।

সত্যের উদ্ঘাটনে, আনন্দ অনুভূতির ভেতর দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা, মানব সমাজের কল্যাণার্থে তার বিকৃতি হল। তখন ফলিত বিজ্ঞানের দিকেই ঝোঁকটা পড়ল বেশি। বিজ্ঞান বলতে কেবল পুঁথিগত তথ্য বোঝাল না,—বোঝাল তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। এটা হল বিভিন্ন সমবেত শক্তির ফল। প্রথমে এল সরল বৈজ্ঞানিকের নিঃস্বার্থ কৌতুহলের চরিতার্থতা, তারপর এল আর একদলের প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের অদম্য আকাঙ্ক্ষা, আর তার সাথে এসে জুটল যুগধর্ম আর মানবপ্রকৃতির সর্ব্বনাশী প্রভাব, অর্থগৃধ্নু বণিক। এই অপূর্ব্ব সমবায়িক মন্থনে বিজ্ঞানে উঠল অমৃত, যতদিন ক্ষমতা প্রয়োগের ভার ছিল সেই নিস্পৃহ আনন্দ অভিসারী বৈজ্ঞানিকের উপর। কিন্তু বাস্তব কলঙ্কিত যুগে অর্থ ঘটালে অনর্থ। বণিক চাইল ব্যয়িত অর্থের বিপুল অঙ্ককে শতগুণ করে তুলতে। অর্থলুব্ধ করে তুলল বিজ্ঞানসেবীদের। সারা বিজ্ঞানের উৎপাদন শক্তি সংহত হ'ল বণিকদের হাতে। তাদের লাভের অঙ্ক বেড়ে চলল চক্রবৃদ্ধিহারে, যে বিজ্ঞান অনুশীলনে একদিন উঠেছিল অমৃত আজ তাতে উদ্গীরিত হচ্ছে গরল, যা' সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞানের নব অভ্যুদয়ের যুগে মানুষ দেখেছিল সুখ সমৃদ্ধ জনসমাজের স্বপ্ন। সে হয়েছিল প্রকৃতির উপর বিজয়ী,—ভূগর্ভ নিহিত তেল, খনিজ রাসায়নিক, সাগরে সঞ্চিত রসায়ন সম্ভার, আকাশস্থিত বিদ্যুৎ, ভেষজ, বনৌষধি, উদ্ভিদ ও পশুকুলজাত বিবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সঞ্চয়ন ও রূপায়ন করে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ব্যবহারে সমৃদ্ধ সমাজের স্বপ্ন সত্য, প্রত্যক্ষ ব'লেই মনে করছিল। এমন সময়ে মহামারণ বিভীষিকা সবই ওলট পালট করে দিলে। বিজ্ঞানের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ সুরু হল। জগৎ যে ধ্বংসোন্মুখ, সে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের জৈব বা অজৈব বহিঃ প্রকৃতির উপর প্রভুত্বের জন্তেই যে এমন ঘটেছে, তা' বলতে পারিনে। আমরা বহিঃ প্রকৃতিকে পদলুণ্ঠিত করেছি সত্য, কিন্তু নিজেদের স্বভাবকে দমন করতে পারিনি। আর পারছিনে সংযত করতে অর্থনৈতিক, সামাজিক আর সম্প্রদায় বিশেষের লুব্ধ প্রবৃত্তিকে, যা' শতাব্দীপুঞ্জিত হ'য়ে আজ সঞ্চিত হয়েছে। তবে উপায় কি? এ ধ্বংস-গতি কি রোধ করা যাবে না? উপায় আমাদেরই হাতে। ব্যক্তির বা খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বার্থ দমন করে, জাতিগত, বিশ্বগত স্বার্থ, বহুজনহিতের দিকে নজর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে। অতি-উৎপন্নের অভিশাপ আর তার জন্তে বেকার সমস্যার মুক্তির উপায় আমাদেরই মাঝে। ধ্বংস, সৃষ্টি আর রক্ষার বীজ একই রাসায়নিকে নিহিত রয়েছে। আজ আমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র আত্মঘাতী হ'য়ে উঠেছে, তার মূলে র'য়ে গেছে মাথাচাড়া-দিয়ে-ওঠা মানব মনের দানবীয় বৃত্তি। বিষ্ণুর পাদপদ্ম চাপা দিয়ে সে মাথাকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিকের প্রাচীন আদর্শকে আবার ফিরে পেলে তবে এটা সম্ভব হবে। আমরা এমন একদল বৈজ্ঞানিকের মুখচেয়ে আছি, যাঁরা ভোলানাথের মতই বেহিসাবী, মুক্তহস্ত, যাঁরা, তমস্ অপাবৃণু, বলে আমাদের আহ্বান করবেন।

প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক দায়ীত্বপূর্ণ পরিস্থিতির পেছনে থাকতেন সর্ব্বত্যাগী আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্মণ। ছাত্রের শিক্ষার ভার ব্রাহ্মণের উপর; রাজত্বের, দেশের মঙ্গলের ভার ব্রাহ্মণের উপর। আবার রাজনীতি ক্ষেত্রের পরিচালনা করছেন ব্রাহ্মণ। তাঁরা দেশের দশের কল্যাণব্রতী। জাতিগত ব্রাহ্মণের নয়, কর্ম্ম ও বৃত্তিগত ব্রাহ্মণের কথা বলছি। অর্থ ও ভোগবিলাস-বিরক্ত, ব্রহ্মণ্যবৃত্তিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞানের অপরিমেয় শক্তিকে সংহত করে দেশের ও জাতির মঙ্গল করে আবার নিয়োজিত করতে পারেন। তাঁদের পরহিতব্রতী জীবনের সংস্পর্শে এসে পরবর্ত্তীকালের শিক্ষার্থীরাও তাঁদেরই মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে বিজ্ঞানের সেবা করবে, আনন্দের জন্তে—বিশ্বের বিস্ময় রহস্তের ভিন্ন ভিন্ন সমাধান করে অখণ্ড তৃপ্তিলাভ করবার জন্তে। সে জ্ঞানে সে সুদিন কবে আসবে!

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

(৪)

চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় উপস্থিত হইবার জন্ম স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় আসিয়াছিলেন তখন তিনি একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন না। তাঁহার সহিত যে অর্থ ছিল তাহা মহাঅধিবেশনের বৈঠক পর্য্যন্ত টিকিবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি অল্প ব্যয়ে বাস করিবার জন্ম কয়েকদিন বোষ্টন নগরে ছিলেন, কারণ তখনও ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশনের বিলম্ব ছিল। দুইএক দিন মাধুকরী করিবার কালে তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে প্রত্যাখ্যাত হইতে হইয়াছিল এবং একটা রাত্রি রেল-ষ্টেশনের বৃহৎ প্যাকিং বাক্সকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কাটিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশনের প্রথম দিন হইতেই তিনি বিশ্বের জয়মাল্য লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার কিছুমাত্রও অসুবিধা না হয় তাহাই করিবার জন্ম তখন বহুলোকে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। মহাসভার অধিবেশন অন্তে তিনি যখন মার্কিণ দেশের নানা-স্থানে বক্তৃতা দিতেন তখন লেকচার-বুরো শ্রোতাদিগের নিকট টিকেট বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতেন। সেই অর্থের যে অংশ স্বামীজি পাইতেন তাহাতেই তাঁহার নিজের খরচ-পত্র অনায়াসে চলিয়া যাইত।

স্বামী অভেদানন্দ যেদিন নিউইয়র্কের ডকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেদিন তাঁহার সহিত কপর্দ্দক মাত্রও ছিল না। চিকাগো-ধর্ম্মসভার পর স্বামীজি যেখানেই যাইতেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত জনসাধারণের জয় প্রশস্তি, সুতরাং তিনি যখন যেখানে গেলেন সেইখানেই দেখিলেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম শতশত নর-নারী সমুপস্থিত। স্বামী অভেদানন্দের সে সুযোগ ঘটে নাই। তিনি নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন একজন অপরিচিত কপর্দ্দকশূন্ম সন্ন্যাসী মাত্র। তাঁহার ডায়েরিতে দেখি—

"আমার কাজ-চালানোর জন্ম কোনরূপ সঞ্চিত অর্থ ছিল না। কেহ এককালীন কোন চাঁদাও দেয় নাই। আমাকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজেকে চালাইতে হইত, শয়নকক্ষের ভাঁড়া দিতে হইত এবং রেস্তরাঁর আহার্য্যেরও দাম দিতে হইত। আমার হাত-খরচ এবং আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয় আমাকে বহন করিতে হইত। আমার ধর্ম্মব্যাখ্যার ক্লাশ ও বক্তৃতা হইয়া গেলে একটি ঝুড়ির ভিতর স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দিতেন, শুধু তাহাই আমার সম্বল ছিল। কিন্তু এরূপভাবে বেশী অর্থ পাওয়া যাইত না। যাহা পাইতাম তাহাতে আমার ব্যয় সংকুলান হইত না বলিয়া আমাকে নিতান্ত

প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধা হইতেও বঞ্চিত রাখিতে হইয়াছিল। আমার ছাত্রগণ আমাকে (প্রতিদিন) আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন, আমিও বাধ্য হইয়াই সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতাম।" (১)

মহারাজের শ্রোতৃবর্গ যখন জানিতে পাইলেন যে আহারাদির ব্যয় পর্য্যন্ত বহন করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই এবং তাঁহাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করে তেমনও কেউ নাই, তখন তাঁহাকে উপবাস হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কেহবা রাত্রে, কেহবা দিবসে তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন। (২) একদিন নয় দুইদিন নয়—এইভাবে তাঁহাকে সুদীর্ঘ ষোলো মাস কাটাইতে হইয়াছিল। শুধু তাঁহার অপরিমেয় কর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে একদিনের জন্তও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই। নিজের সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত ভুলিয়া, ফলাফলের দিকে না চাহিয়া তিনি অসীম ধৈর্য্যসহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবরাশি মানবহিতার্থে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের "আপন হাতে ও ছাচে গড়া" ছিলেন তিনি, ছিলেন তিনি "প্রভুর প্রিয়শিষ্য" এবং জানিতেন যে ঠাকুর, স্বামীজি ও শ্রীশ্রীমার শক্তি "তাঁহার ভিতরে খেলা করিত।" সেই জন্তই এইরূপ অসহায় অবস্থার মধ্যেও এবং নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াও তিনি মার্কিণে একটি নবীন ধর্ম্মজগৎ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন—অনন্ত ভাবময় ঠাকুরের ভাবরাশিকে নূতন নূতন রঙ্গে রাঙাইয়া তিনি অকাতরে দুই করে অঞ্জলি অঞ্জলি বিলাইতেন। স্বয়ং ঠাকুর তাঁহাকে চালাইতেছিলেন, সুতরাং না চলিয়া তাঁহার উপায় ছিল না!

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন—"কায় মন বাক্য যদি এক হয়, এক মুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটী ভুলো না। বাধা যতই হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিষ যতই নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথমে তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই—সিদ্ধিও নাই।" স্বামী অভেদানন্দের আমেরিকায় প্রচার-জীবনে এই সত্যটী বেশ খুবই স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছিল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বহু বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

নিউইয়র্কে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন স্বামী অভেদানন্দকে মিস্ ফিলিপ্‌সের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তাঁহার নিউইয়র্কে আগমনের আট দশ দিবস পর মিস্ ফিলিপ্‌স্ নিজে কয়েকটী বন্ধুবান্ধবকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহারাজের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই ২৫শে আগষ্ট ১৮৯৭ সাল তাই মহারাজের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতেই তিনি নিউইয়র্কের এবং নিকটবর্ত্তী নানা স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল বিশিষ্ট নরনারী-

---

(১) Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী, জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৬

(২) ঐ —বিশ্ববাণী, অগ্রহায়ণ—১৩৪১

দিগের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করা। তিনি জানিতেন যে, এইখানে অকৃতকার্য্য হইলেই আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের উপর বজ্রপাত হইবে এবং স্বামীজির আরব্ধ ও বাঞ্ছিত কার্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। স্বামীজির কাজ বলিতেছি এই জন্য যে চিকাগো-বিজয়ের পর ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্ম প্রচারের সঙ্কল্প তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হয়। তিনি ছিলেন গুরুভ্রাতাদিগের নেতা। সুতরাং কাজটা স্বামীজির বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এই ২৫শে আগষ্ট ১৮৯৭ সালেই স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই দিন হইতেই একজন নিতান্ত অপরিচিত সন্ন্যাসীকে আত্ম-চেষ্টায় নিউইয়র্কের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের সুধীজনের সহিত শুধু যে সুপরিচিত হইতে হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণের ভিতরও প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তিনি যে একজন সুদক্ষ ও পরম পণ্ডিত ধর্ম্মপ্রচারক, নানা ব্যক্তির বৈঠকখানায় কথোপকথনের মজলিসে তাঁহার সুললিত ও সারগর্ভ আলোচনা শুনিয়া এই বিশেষ ধারণাটাও নানা নরনারীর হৃদয়ে তখন বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রচারকার্য্যে তাঁহার লোকোত্তর সাফল্য সেদিন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছিল তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার কৃতিত্বের উপর। সেই অগ্নিপরীক্ষায় তিনি অসাধারণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আমেরিকায় প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজ অনায়াসে ইহাই প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, তিনি শুধু একজন সুযোগ্য ও সুদক্ষ ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন না। কিন্তু আমেরিকায় প্রচার ব্যাপারটাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে তিনি নানা প্রকারেই একমাত্র সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ সংগঠন-শক্তি, সর্ব্ববিষয়ে নির্ভুল বিচারণা এবং পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্বন্ধে সদ্বিবেচনা, সমিতির (নিউইয়র্কের) ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রয়োজনটুকুর প্রতিও বিশেষ মনোযোগ এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-কার্য্যপদ্ধতি ও অধ্যাপনার রীতি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ—এই সমস্তই বেদান্তকে সাফল্যের সহিত প্রচারিত করিবার সহায় হইয়াছিল।

—(The Swami proved himself not only an able and efficient teacher, *but furthered the success of the work in every other way, by his remarkable organising power, sound judgment and consideration, careful attention to the needs of the Society to the minutest details* and by his power of addaptability to Western methods of work and teaching.) (৩)

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিবৃত্তকারগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়াছেন যে বেদান্তের উপর আমেরিকানদের টান যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল, ইহার কারণ স্বামী অভেদানন্দেরই বিভিন্ন-মুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা। স্বামীজিদিগের প্রতি লোকজনের ভক্তি-প্রীতি পূর্ণ ব্যবহার, বক্তৃতা-সভায় শ্রোতৃবর্গের (ক্রমিক) সংখ্যাধিক্য, আর্থিক সাহায্যদান, বেদান্ত-সাহিত্যের ক্রমবর্দ্ধমান

(৩) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol iv, page 333।

বিক্রয়, নানা স্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজিদিগকে নিয়ত আহ্বান, সাময়িক পত্রিকায় বেদান্তাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ এবং বেদান্ত দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংবাদপত্রে-সম্ভ্রম মন্তব্য প্রচার প্রভৃতি নানা অবস্থা হইতেই বেদান্তের প্রতি মার্কিনিদের শ্রদ্ধা ও টান বুঝিতে পারা যায়।

[*All these activities* (ইহার পূর্ব্বে চরিতাখ্যায়কগণ স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতাদির বিবরণ দিয়াছেন Pages 330-352) *created an evergrowing interest in Vedanta,* which was evidenced in many ways.—in loving and reverent attitude to the Swamis, in attendance at the meetings, in financial support, in the sale of Vedanta literature, in applicatiou to the Swamis to lecture in various places and to write articles in the newspapers shewing respectful consideration of the Vedanta philosophy and religion—] (৪)

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একই আকাশে যুগপৎ সমুদিত দুইটী বিশাল জ্যোতিষ্ক। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল—তাঁহারা সেরূপ ছিলেন না। আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়েই ছিলেন নিজস্ব গৌরবে, গৌরবান্বিত, নিজের শক্তিতে নিজেই তেজীয়ান্, নিজের নিজেই সমুজ্জ্বল এবং অতুলনীয়। আপন আপন স্থানে তাঁহারা উভয়েই ছিলেন অনন্যসাধারণ। সাগরের সহিত হিমগিরির তুলনা করা যেমন আদৌ সম্ভব নহে—স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের মধ্যেও তুলনা করা সেইরূপ অসম্ভব। স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন—"এই দেখ, ঠাকুরের যারা শিষ্য—direct disciples—তাদের মধ্যে কত ভালবাসা। প্রত্যেকের যে মত এক, তা' নয়। স্বামী বিবেকানন্দের, আমার কি সারদানন্দের—সব আলাদা আলাদা ভাব। কিন্তু এক ভালবাসা সবার ভিতরে আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গাছ, পালা সব রয়েছে অথচ ভিতরে এক ব্রহ্ম—এই হচ্ছে unity in variety (বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব)।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ যেমন আপন আপন ভাবের পথে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছিলেন—কেহ কাহারও 'নকল' নহেন, তেমনি তাঁহারা আপন আপন ভাবে বিভোর হইয়া সেই ভাবরসে সিক্ত বাণী লোককল্যাণের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সেই প্রচার-ব্যাপারেও কেহ কাহারও 'নকল' নহেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন অনন্ত ভাবময়। তিনি যেমন আপন ভাবে বেদ-বেদান্ত, গীতা, উপনিষদাদি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুরোবর্ত্তী অবতার পুরুষদিগের 'নকল' ছিলেন না—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, বা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি নিজ নিজ ভাবে ধর্ম্মের একই সারতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—স্বামী বিবেকানন্দ এবং অভেদানন্দও তেমনি আপন আপন ভাবে ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। সত্য এক—প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন। কথা এক—সুর স্বতন্ত্র। স্থান, কাল, পাত্রভেদে উভয়ের প্রকাশভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র ও অনন্যসাধারণ এবং মৌলিক। এই দুই প্রভুই

(৪) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol iv page 333.

আপন আপন মনের ছাঁচে বেদান্তাদি ধর্মশাস্ত্রকে ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া প্রচার করিয়াছিলেন। উভয়ের-বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলেই একথা বুঝিতে পারা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিতাখ্যায়কগণ বলিয়াছেন—"স্বামী অভেদানন্দের বিচিত্র কর্ম কাহিনী এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই; এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বেদান্তের বাণী যে দূর-দূরান্তরে প্রসৃত হইয়া জানলাভেচ্ছু বহু আমেরিকাবাসীর হৃদয়ে দৃঢ়তর ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহার বিরামহীন ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠাই ইহার প্রধান কারণ। দেখা গিয়াছে, পর পর প্রত্যেক বক্তৃতাতেই তাঁহার শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সরল, সুস্পষ্টভাবে পথপ্রদর্শনক্ষম হৃদয়গ্রাহী বাক্পটুতা যে সকল ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গ সেই ভাব গ্রহণ করিবার জন্ত আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছে।" (Suffice it to say that it was *greatly due to his* [Swami Abhedananda] untiring perseverance and faithfulness that the message of Vedanta steadily spread into broader fields and *gained a firmer foot hold in the lives oj many American students.* Each succeeding lecture found him making a larger application and attracting greater numbers, who became earnest students of the philosophy he taught with such impressive eloquence, simplicity and directness." (৫)

ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন—স্বামী অভেদানন্দের সুদক্ষ পরিচালনায় ও সুনিপুণ ব্যবস্থায় (নিউইয়র্কে) সংগঠন কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে। (তথাকার) বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, এমন কি অনেক খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজক পর্য্যন্ত এখন সোসাইটীকে (নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটী) একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সকল দিক হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এখন এই চৈতন্তই জাগ্রত হইয়াছে যে, আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে বেদান্তকে একটী গণনীয় শক্তিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। (Under *his able control and management, the work of organisation was fully accomplished*, and the Society came to be accepted and recognised as an established fact by prominent persons and even by many ministers of the Christian Church. Everything seemed to point to an awakening on the part of the public to the fact that the Vedanta was a power to be reckoned with in the United States.) (৬)

ঐ পুস্তকের অন্তস্থানে (vol iv-Page—330)-দেখি In the period under review,

(৫) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915)—vol iv. pages 334-335.

(৬) ঐ

besides the work carried on by the Swami Vivekananda in the West and specially in California......*striking progress achieved through the untiring exertions of the Swami Abhedananda in the United States of America.*

ইহার পর কি এই প্রশ্ন মনে জাগে না—কে মার্কিন যুক্তরাজ্যে এই নব ভাব জাগ্রত করিয়াছিলেন? কে-ই বা তথাকার সমিতির সত্য প্রতিষ্ঠাতা?

১৮৯৭ সালের ৬ই আগষ্ট স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন। আসিবার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত ইহার-উহার বৈঠকখানাতেই মহারাজকে বেদান্ত প্রচার করিতে হইয়াছিল। এই ভাবে লোকের মুখে মুখে তাঁহার জয়-প্রশস্তি নিউইয়র্ক ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচারিত হয়। কার্য্যারম্ভের প্রথম অবস্থায় সে অঞ্চলের শিল্প, বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মজগতের অনেক নেতৃস্থানীয় মনীষিবর্গের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ঘটে। এ পরিচয় শুধু যে সেখানকার পারিবারিক পরিবেশের ভিতরেই ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; সেখানকার নানা সামাজিক সম্মেলনেও পরিচয় ঘটিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার চিরাচরিত অমায়িক ভদ্র ব্যবহার ও উৎসুক শ্রোতৃবর্গের প্রশ্নাদির উত্তর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রচারকার্য্যে ও ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যাপারে সকলেই বন্ধুর ন্যায় সহানুভূতি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিউইয়র্কের ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে খুব বেশী উদারমতাবলম্বী এবং বিদ্বান্ রেভারেণ্ড মিষ্টার হেবার নিউটন্ পর্য্যন্ত মহারাজের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন তাঁহার চার্চের নরনারিদিগের মধ্যে স্বয়ংই বিলাইতেন এবং সেই সকল বক্তৃতা শুনিবার জন্যও তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেন। (During this first period of his work, the Swami [Abhedananda] met many representative thinkers in the world of art, science and religion, both in private life and in social gatherings, and by his unfailing courtesy and readiness in answering questions he awakened their friendly interest in his mission and teachings. One of the most liberal and enlightened of New York clergymen even went so far as to distribute the Swami's lecture programmes among his congregation, advising them to go and listen to his teachings). (৭)।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীলেখকগণ এক স্থানে বলিয়াছেন যে **স্বামী অভেদানন্দের আগমনের পর হইতেই বেদান্ত ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা যেন নবশক্তি লাভ করিয়াছিল।** (Since the arrival of the Swami Abhedananda in New York on 6th. August, the interest in the Vedanta philosophy received

(৭) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915)—vol III. page 348.

new impetus,) (৮)। লোকোত্তর প্রতিভা, অমানুষিক মনীষা, বিস্ময়কর আত্মানুভূতি, অসামান্য কর্মনিষ্ঠা ও অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী যিনি নহেন তেমন একজন ধর্মাচার্য্যের আগমনের পর পরই কি খৃষ্টানের দেশে খৃষ্টান্-হৃদয়ে বেদান্ত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা এমন নবশক্তি লাভ করিতে পারে ? সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যে মহারাজের সুগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাহার উপর ছিল পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অপূর্ব্ব অধিকার। সেই কারণেই তিনি সপ্রমাণিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান কালের অগ্রগামী বৈজ্ঞানিক গবেষণার নানা সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভারতের বেদান্তের যথেষ্ট মিল আছে। এই কারণেই তিনি তাঁহার অধ্যাপনার প্রতি লোকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। বেদান্তের যে তত্ত্বের সহিত Huxley অথবা Tyndal—Spencer অথবা Kent-এর মনের মিল আছে, শুধু তাহাই যাঁহারা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন, স্বামী অভেদানন্দ সেই ঐক্য প্রদর্শন করিয়া এই শ্রেণীর লোকদিগকেও নিজের দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যখন ধ্যান ও যোগের ক্লাশ খুলিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন তখন "কিরূপে যোগী হইতে পারা যায়" তাঁহার এই বিষয়ের বক্তৃতা শুনিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্পন্ন জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিবর্গে দিনের পর দিন তাঁহার ক্লাশ পরিপূর্ণ থাকিত। শুধু ইহাই নহে, এই সকল লোকের মধ্যে অনেকে তখন ঐকান্তিকতা ও উৎসাহের সঙ্গে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে লাগিলেন (৯)—শ্রীগীতার ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিয়া, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য কেহ কেহবা তখন সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। (১০)

স্থানান্তরে বলিয়াছি ১৮৯৭ সালের ২৫শে আগষ্ট স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কবাসী কতকগুলি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত প্রথমে পরিচিত হইবার সুযোগ পান। সেই সুযোগের সূত্রে ক্রমেই তাঁহার পরিচয়ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর, সুযুক্তিপূর্ণ-বক্তৃতা, সার্ব্বভৌম ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত বাগ্মীতা প্রভৃতি ক্রমে নব-সংগঠিত লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ১৮৯৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বেদান্ত-সোসাইটীর সেক্রেটারী মিস্ ফিলিপ্‌স্ মহারাজের বক্তৃতার জন্য মট্ মেমোরিয়াল্ হল্ ভাড়া করেন। এই হলে মহারাজ প্রকাশ্যে প্রথম যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল—"বেদান্ত কি ?" (১১) সেদিন সভাগৃহে ৪০ জন মাত্র শ্রোতা ছিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ৪০ হইল ৮০, ৮০

(৮) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol III. page 347.

(৯) ঐ page 348.

(১০) ঐ page 348.

(১১) Leaves from my Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী, বৈশাখ—১৩৪৬

হইল ১১০, ১১০ পরে ১৪৫এ দাঁড়াইল। বোষ্টনের New England Cremation সোসাইটীতে যে দিন তাঁহার বক্তৃতা হয় সেদিন শ্রোতা ছিলেন ১০০০। এই সংখ্যাও একদিন সপ্ত সহস্রে পরিণত হইয়াছিল! (১২) নিউইয়র্কের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নরনারী আসিয়া তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিত এবং রাজযোগের ক্লাসে সোৎসাহে যোগদান করিত। (১৩)

স্বামী সারদানন্দের সহিত যখন মহারাজের নিউইয়র্কে সাক্ষাৎ হয় তখন সারদানন্দ মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে আমেরিকার লোকেরা স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' অবলম্বনে যোগ শিক্ষা করিতে আগ্রহশীল। স্বামী অভেদানন্দ এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার রাজযোগের ক্লাশে অধ্যয়নের জন্ম স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" নামক গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কিন্তু নিউইয়র্কে সে গ্রন্থ তখন পাওয়া গেল না! লণ্ডনের Longmans and Green নামক প্রকাশকগণ উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদেশী পুস্তকাবলীর উপর তখন আমেরিকায় শুল্ক শুল্কভার স্থাপিত ছিল বলিয়া লণ্ডন হইতে যখন 'রাজযোগ' আনা সম্ভব হইল না তখন মিস্ মেরি ফিলিপ্‌স্ এবং স্বামীজির কতিপয় আমেরিকার ছাত্র আমেরিকাতেই "রাজযোগ" পুনর্মুদ্রিত করিলেন। মহারাজ সেই গ্রন্থের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন এবং গ্রন্থে নিবদ্ধ সংস্কৃত শব্দাবলীর একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিলেন। এই ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" নব কলেবরে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হইয়া মহারাজের ক্লাশে অধীত হইতে লাগিল। (১৪)

অল্পদিনের মধ্যেই স্বামী অভেদানন্দের যশোভাতি মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের নানাদিকে এইরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে তাঁহার নিউইয়র্কে আগমনের কিছুদিন পর যখন একবার তিনি নিউইয়র্ক হইতে কালিফোর্ণিয়ায় যাইতেছিলেন্ তখন পথের সর্ব্বত্র বন্ধুগণ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শক্তিতে যতটুকু কুলায় মহারাজের সেবা করিতে পারিলেই যেন তাঁহারা কৃতার্থ হন, তাঁহাদের ব্যবহারে তখন এইরূপই বুঝা গিয়াছিল। পথে অপেক্ষা করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্ম তখন নানাস্থান হইতে আহ্বানও আসিয়াছিল। (On his way he met friends on all sides who considered it a privilege to render him every service in their power. Invitations to talk and lecture were every where pressed upon him.) (১৫)।

স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৭ সালের আগষ্ট মাসে নিউইয়র্কে আসেন এবং ১৯০১ সালের

(১২) The life of the Swami Vivekananda (Mayabati 1915), Vol IV, Page 333.

(১৩) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী—বৈশাখ, ১৩৪৬

(১৪) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী,—বৈশাখ, ১৩৪৬

(১৫) The life of the Swami Vivekananda (Mayboti 1915)—Vol IV. Page—334.

শেষ ভাগে কালিফোর্ণিয়ার পথে এইভাবে সম্বৰ্দ্ধিত হন। এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে যাঁহার ষোলো মাস কাটিয়াছিল ভিক্ষা বা মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট মিষ্টার ম্যাক্‌কিন্‌লে কর্ত্তৃক হোয়াইট হলে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীপূজিত বৈজ্ঞানিক এডিসন্, গণ্যমান্য পর্য্যটক ন্যান্‌সেন্, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-সমাজ, এমন কি খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়াছিলেন। কোন ধর্ম্মযাজক রবিবাসরীয় উপাসনার দিনে চার্চের বেদী হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেন। চার্চে উপস্থিত নর-নারী ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। অখৃষ্টান হইয়াও চার্চের বেদীতে দাঁড়াইয়া রবিবাসরীয় উপাসনাকালে বক্তৃতা দিবার গৌরব বোধ হয় মহারাজের পর শুধু রবীন্দ্রনাথই একবার পাইয়াছিলেন।

মহারাজ আমেরিকায় যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই ছিল আমেরিকান্‌দিগের নিকট নূতন অথচ গুরুত্বপূর্ণ (the importance and the newness of the subjects of teaching ইত্যাদি) (১৬)। সেই সকল বক্তৃতা এতই লোকপ্রিয় ছিল যে লোকের বিশেষ অনুরোধে সে সকল বক্তৃতা তাঁহাকে একাধিকবার করিতে হইয়াছিল। New York Tribune (6th May 1898) পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—(স্বামী অভেদানন্দ) সম্প্রতি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাদের কতকগুলির বিষয়বস্তু ছিল 'ধর্ম্মশাস্ত্র—উহারা কি শিখায় ?' 'প্রেমে আত্মাহুতি', 'অমরত্ব', 'মুক্তিই স্বাধীনতা' এবং 'কর্ম্মের গূঢ় রহস্য।' ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বক্তৃতা তাঁহাকে একাধিকবার করিতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই বক্তৃতাগুলির সর্ব্বজনপ্রিয়তা বুঝিতে পারা যায়। (Among the subjects of his recent lectures are 'the Scriptures—what do they teach', Renunciation through Love', 'Immortality', 'Salvation is Freedom' and 'The Secret of Work'. Their popurlarity is attested by the repitition of a number of them by request) (১৭)।

এই Tribune পত্র আরও লিখিয়াছিলেন—যাঁহারা মাঝে মাঝে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিতে আসেন তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ক্রমেই এই দিকে লোকে আকৃষ্ট হইতেছে, কারণ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাদের মধ্যে আবার অনেকেই গোঁড়া খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজক। সামাজিক জীবনে যাঁহারা এ দেশে বিশেষরূপে সুপরিচিত, শ্রোতার মধ্যে তেমন লোকের সংখ্যাও খুব কম নহে। (To an occasional attendant the growth of interest is unmistakable in steadily increasing audiences of intelligent persons, many of them members of orthodox churches with a representation of wellknown

(১৬) The Life of Swami Vivekananda (Mayaboti 1915) Vol VI Page—347.

(১৭) The New York Tribune—6th May 1898.

persons in public life) (১৮)। এই প্রসঙ্গে পাঠকদিগকে স্মরণ করিতে বলি যে স্বামী অভেদানন্দের নিউইয়র্কে আগমনের পর প্রথম বর্ষেই তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা এইভাবে আত্ম বিকাশ করিয়া তাঁহাকে মার্কিনদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য সুধীজনের হৃদয়ে স্বামী অভেদানন্দের স্থান কোথায় ছিল, সুধী পাঠকবর্গ বোধ হয় এই ক্ষুদ্রবিবরণ হইতেই তদ্বিষয়ে কিছু ধারণা করিতে পারিবেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লেখকগণ ঠিকই বলিয়াছেন যে অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের বহুবিস্তৃত ধর্মপ্রচারের কাহিনী বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! এইরূপ চেষ্টা ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হইবে, কারণ পাঠকগণ তাহা হইতে আদৌ ধারনা করিতে পারিবেন না যে, সেই ব্যাপার ছিল কতদূর সুবিস্তৃত এবং সেই প্রচারের ফলে মার্কিণের অসংখ্য নরনারী—যাঁহারা প্রাচ্যের নবীন ও মনোহর আলোকের জন্য তৃষিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহারা কিরূপে দিনের পর দিন গভীর হইতে গভীরতর ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। (It is wellnigh impossible to compress within a few pages a full and systematic description of the wide spread propaganda carried on by the Swamis......Abhedananda......in America. Any attempt to give a cursory view of it will fail to convey to the readers an idea of the extent of the work and the evergrowing influence it exerted over the minds of numerous men and women who thirsted for the new and satisfying light from the East.) (১৯)।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত যাহা ১৯১৫ সালে চারি খণ্ডে মায়াবতী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই গ্রন্থ হইতে স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই প্রবন্ধে (এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে) সঙ্কলিত হইয়াছে! ঐ গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি এইসকল বিষয়ের প্রায় সকল কথাই বাদ দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কেন বাদ দেওয়া হইল প্রকাশকগণ সে বিষয়ে কিছু বলিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। ধরিয়া লওয়া যাউক গ্রন্থের অবয়ব ছোট করিবার জন্য এরূপ করা হইয়া থাকিতে পারে।

---

(১৮) The New York Tribune—6th March 1898.

(১৯) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915), vol. III. page 344.

অদ্বৈতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—ঐতরেয়োপনিষৎ)

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

(খ) "যদেতদ্ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানম্ আজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টি-র্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি॥" ৫।২

"এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ু-রাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" ৫।৩

অর্থাৎ 'কে এই আত্মা আমরা যাহাকে উপাসনা করি' এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে "এই যে হৃদয় (বুদ্ধি), এই যে মনঃ, সংজ্ঞা (চেতনভাব), আজ্ঞান (কর্ত্তৃভাব), বিজ্ঞান (কলাবিদ্যা), প্রজ্ঞান (প্রজ্ঞতা), মেধা (গ্রন্থধারণশক্তি), দৃষ্টি (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান), ধৃতি (ধারণাশক্তি), মতি (মনন), মনীষা (চিন্তার স্বতন্ত্রতা), জূতি (রোগাদিজনিত মানস-দুঃখ), স্মৃতি (স্মরণ), সঙ্কল্প (বিতর্ক), ক্রতু (অধ্যবসায়), অসু (প্রাণাদি ব্যাপার), কাম (তৃষ্ণা), বশ (কামিনী সঙ্গে), ইহারা সকলে প্রজ্ঞানেরই নাম ।৫।২

এই ব্রহ্ম অর্থাৎ এই আত্মাই অপর-ব্রহ্ম। ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, এই সকল দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত, (যথা—) পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ এই সমুদায়, এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিশ্র অর্থাৎ উভয়চর প্রাণীর ন্যায় প্রাণী এবং নানাবিধ বীজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ প্রাণী ও উদ্ভিদ্ এবং অশ্ব, গো, মনুষ্য, হস্তী, জঙ্গম, খেচর ও স্থাবর যাবতীয় প্রাণী প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ প্রজ্ঞা-সত্তায় সত্তাবান্, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞানেত্র লোক, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রজ্ঞানে লয় পায়। এজন্য এই প্রজ্ঞান ব্রহ্ম ।৫।৩

এস্থলে জীবের আন্তর বিষয়, অথবা বহির্বিষয় সকলই প্রজ্ঞাতে উৎপন্ন, স্থিত ও লীন হয়, এবং সেই প্রজ্ঞাকে ব্রহ্ম বলায় এক অদ্বৈততত্ত্বেরই কথা বলা হইল। কারণ, এখানে প্রজ্ঞা ভিন্ন কিছুই নাই ইহাই বলা হইয়াছে।

যদি বলা হয়—ব্রহ্মরূপ প্রজ্ঞা ভিন্ন কিছুই নাই বলিলেও তাহাকেই তো এই সকলের রূপ বলা হইয়াছে। অতএব এই সকলও আছে—ব্রহ্মও আছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপে এই সকল অবস্থিত, ইহাই তো এস্থলে বলা হইল। যেমন হস্তপদাদি/দেহপদবাচ্য হইলেও

হস্তপদাদি ও দেহের মধ্যে স্বগতভেদও থাকে, এস্থলেও তদ্রূপ কেন হইবে না ? অর্থাৎ দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সঙ্গত হইতেছে ? অদ্বৈতবাদ তো এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় না ? কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে ; কারণ, ব্রহ্মই যদি এইসব হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপে থাকিয়া কি এইসব হইয়াছেন, কি ব্রহ্মরূপ ত্যাগ করিয়া এইসব হইয়াছেন ? ব্রহ্মরূপ ত্যাগ করিয়া এইসবই ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইল, আর ত্যাগ না করিয়া হইলে এইসব মিথ্যা হইল, অর্থাৎ 'দেখা যায়, কিন্তু নাই' এইরূপই হইল। বস্তুতঃ এই ব্রহ্মরূপের ত্যাগ স্বীকার—কাহারও ইষ্ট নহে, অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইবে।

তাহার পর এস্থলে "কোঽয়মাত্মা ইতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা" (৩।১) এই প্রশ্নের উত্তরে উপরিউক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা উপাসনাকালের কথা, ঠিক্ জ্ঞানের কথা নহে। ঠিক্ জ্ঞানের কথা হইলে অর্থাৎ ঠিক্ ব্রহ্মস্বরূপ পরিচয়ের প্রসঙ্গে উক্ত হইলে সেই দ্বৈতাদ্বৈতভাবের গন্ধমাত্রও থাকিত না। উপাসনাকালে উপাসকের সত্তা অনিবার্য্য বলিয়া ব্রহ্মকে এই ভাবে দেখিতে বাধ্য হইতে হয়। যাঁহার ব্রহ্মস্বরূপ অবগতির পর ধারণা দৃঢ় হয় না, তাঁহার জন্য উপাসনা, সুতরাং এই সকল শ্রুতির দ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতাদি মতবাদ সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে প্রথমেই "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" (১।১) এই বাক্যে বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই ঐতরেয় উপনিষৎ হইতে এক অদ্বৈত ব্রহ্মই সিদ্ধ হয়, দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকব্রহ্ম বা বিশিষ্টাদ্বৈত ব্রহ্ম—কিছুই সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়—এই ঐতরেয় উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে ৩য় খণ্ডে ১৩শ বাক্যে দেখা যায়—আত্মা জাত হইয়া অর্থাৎ জীবরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, ভূত সমূহকে পরিদর্শন করিলেন অর্থাৎ ব্যক্ত করিলেন। কারণ এই শরীরে তিনি অন্য কি আর বলিবেন অর্থাৎ কি জানিবেন ? তখন তিনি এই পুরুষকেই অর্থাৎ আপনাকেই ব্রহ্ম ও ব্যাপ্ততম অর্থাৎ আকাশবৎ পরিপূর্ণ রূপে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিয়া বলিলেন "আমি ইহাকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে দর্শন করিলাম।" ১৩। এই জন্য অর্থাৎ নিজেকে 'ইদং' বলিয়া দর্শন করায় পরমাত্মার নাম ইদন্দ্র বলা হয়, অর্থাৎ যিনি 'ইদং'কে দর্শন করেন তাঁহার নাম ইদন্দ্র বলা হয়।১৪। ইত্যাদি। যথা—

"স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি ? স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদ্ ইদমদর্শমিতি। (১।১৩) তস্মাদিদন্দ্রো নাম, ইদন্দ্রো হ বৈ নাম।" (১।১৪)

এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, ব্রহ্ম দর্শন হইলে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অন্য সব মিথ্যা, এরূপ জ্ঞান তো হয় না, পরন্তু "আমি ইহাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে দর্শন করিলাম" এইরূপ জ্ঞান হয়। সুতরাং ব্রহ্মদর্শন কালে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবই থাকে, জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবের অতীত অবস্থা হয় না ? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতই উপদিষ্ট হইল অদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট নহে বলিতে হয় ?

তাহা হইলে বলিব, না, তাহা নহে। কারণ, ইহা, আত্মার, সৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ জীবরূপে জাত হইয়া দর্শন, ইহাতে আত্মত্বের ভেদ জ্ঞান তিরোহিত না হইবারই কথা। তিনি যখন ইচ্ছা করিয়াই জাত হইয়াছেন এবং জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ নিজেকেই জগতে পরিণত করিয়াছেন, তখন এইরূপ দর্শন হওয়াই তো স্বাভাবিক। অতএব এস্থলে যে জগদ্দর্শন তাহা তো শুদ্ধ ব্রহ্মদর্শন নহে, সুতরাং "আমি সব" এইরূপ দর্শনজন্য বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ করা যায় না। প্রত্যুত এতদ্দ্বারা অদ্বৈতমতই সিদ্ধ হয়; কারণ, এখানে "আত্মাই সব" হওয়ায় আত্মভিন্ন বস্তু আত্মারই—মিথ্যা রূপান্তর মাত্র বলা হইল। আর এই দর্শনের মধ্যে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া দর্শনের কথা বলায় দৃশ্যবস্তু যে নিজ আত্মাতে কল্পিত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কারণ, তিনি নিজেকে সৃষ্টি করিয়া নিজের নিজত্ব ত্যাগ করেন নাই। নিজে অবিকৃত থাকিয়া জীব জগদ্রূপ ধারণ করিলে এই জীব ও জগৎকে কল্পিত বা মিথ্যা বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আত্মার অংশ-বিশেষের পরিণাম স্বীকার করেন, কিন্তু তা হইলে আত্মা সাবয়ব হন, আর তাহা হইলে আত্মা বিনশ্বরই হন। সাবয়ব বস্তু কখন নিত্য হয় না। আর এই জীবজগদ্রূপতা অচিন্ত্য শক্তি বলে স্বীকার করিলেও সেই শক্তিকে অনিত্য অর্থাৎ মিথ্যাই বলিতে হইবে। কারণ, শক্তি কার্য্য দ্বারাই অনুমেয়। সময়ে এই কার্য্য আদি অন্তে থাকে না বলিয়া এই কার্য্যজননী শক্তিও আদি অন্তে থাকে না বলিতে হইবে। এই শক্তি নিত্য হইলে কার্য্যই নিত্য হয়, আর এই শক্তির আবির্ভাবের জন্য অন্য শক্তি স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হয়। অতএব শক্তি নিত্য নহে। এইরূপে এস্থলে বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বা শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈত বা স্বাতন্ত্র্যবাদ কোন মতবাদই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু দৃশ্যমাত্রই আত্মাতে কল্পিত হইলে সেই 'এক অদ্বৈততত্ত্বই' সিদ্ধ হয়, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত কিছুই সিদ্ধ হয় না।

এইবার দেখা যাউক ইহার ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য নির্ণায়ক লিঙ্গগুলি কিরূপ?

উপক্রম—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (১।১)

উপসংহার—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (৫।৩)

অভ্যাস—"স ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (১।২)

"স ঈক্ষত ইমে নু লোকা লোকান্ নু সৃজা ইতি" (১।৩)

"তস্মাদিদন্দ্রো নাম" (৩।১৪)

অপূর্ব্বতা—"স জাতো ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ" (৩।১৩)

"সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম্" (৫।৩)

ফল—"স এতেন প্রজ্ঞেন আত্মনা অস্মাৎ লোকাৎ
উৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্
কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ইতি।" (৫।৪)

অর্থবাদ—"তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টাঃ" (২।১)

"গর্ভেনুসন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা"

উপপত্তি—"স ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (১।২)। স এতমেব

সীমানং বিদার্য্য এতয়াদ্বারা প্রাপদ্যত।" (৩।১২)

যাহা হউক এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই এই উপনিষদের তাৎপর্য্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, অন্য মতবাদ ইহার তাৎপর্য্য নহে।

(৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ

এইবার ছান্দোগ্যোপনিষদের তত্ত্বজ্ঞাপক বাক্যগুলি একত্র করিয়া দেখা যাউক, ইহাতে কোন্ মতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই উপনিষদের ২য় অধ্যায় ২৩শ খণ্ডে আমরা প্রথম তত্ত্বজ্ঞাপক বাক্য দেখিতে পাই, যথা—

(১) "প্রজাপতির্লোকান্ অভ্যতপৎ, তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যঃ
ত্রয়ী বিদ্যা সংপ্রাস্রবৎ তাম্ অভ্যতপৎ।
তস্যা অভিতপ্তায়াঃ এতানি অক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্তঃ
ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি" ।২।২৩।২

অর্থাৎ "প্রজাপতি লোকসমূহের ধ্যান করিলেন। সেই অভিধ্যাত এই লোকসমুদায় হইতে ত্রয়ী বিদ্যা নিঃসৃত হইল। তিনি এই ত্রয়ী বিদ্যার ধ্যান করিলেন। সেই অভিধ্যাত ত্রয়ী বিদ্যা হইতে ভূঃ ভুবঃ ও স্ব এই তিন অক্ষর নিঃসৃত হইল।"

এতদ্দ্বারা সকলের মূলে যে প্রজাপতিরূপ একটী অদ্বৈত বস্তু ছিল তাহা বুঝা যায়। তাহার পর তাঁহার ধ্যান হইতে এই সকল লোক ও অক্ষররাশি আবির্ভূত হইল বলায় তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না—ইহাও বুঝা যায়। এজন্য এতদ্দ্বারা সেই এক অদ্বৈতের ধারণাই আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইল বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—তিনি যখন ধ্যান করিয়া এই সব সৃষ্টি করিলেন, তখন ধ্যানের বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল, আর জ্ঞান থাকায় তাহার বিষয়ও ছিল, বলিতে হইবে। বিষয় ধ্যানকালে না থাকিলেও পূর্ব্বে ছিল বলিতেই হইবে। বিষয় ভিন্ন জ্ঞান তো থাকে না। আর নির্ব্বিষয় জ্ঞান স্বীকার করিলে সে জ্ঞান সবিষয়কই বা হইবে কেন? যদি না হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের সবিষয়-যোগ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, এবং যে কারণে সবিষয় হইবে, সেই কারণ, তাহা হইলে সেই জ্ঞানভিন্ন বলিতে হইবে, অতএব ধ্যান করিয়া প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করায় জগৎ পূর্ব্বে ছিল, বলিতে হইবে। আর পূর্ব্বে যাহা থাকে, তাহা অন্তকালেও যে রূপান্তরে থাকে, তাহা তো অস্বীকার করা যায় না। অতএব অদ্বৈত তো কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না।

এতদুত্তরে তাহা হইলে বলিব যে, না, তাহা নহে। কারণ, এই ধ্যানকালে যে জগৎ

ছিল, তাহা জ্ঞানের আকারে ছিল, এবং ধ্যানের পর যে জগৎ উৎপন্ন হইবে, তাহাও জ্ঞানের আকারে উৎপন্ন হইবে। জ্ঞানের আকারাতিরিক্তরূপে এই জগৎ কখনও থাকে না, ছিলও না এবং থাকিবেও না। বস্তুতঃ কোন বিষয়ই জ্ঞানের আকারাতিরিক্তরূপে থাকিতেই পারে না। যে সব বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা স্বীকার করা হয়; তাহারাও অজ্ঞানকে দ্বার করিয়া জ্ঞানের আকারে থাকে মাত্র বলা হয়। যাহা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত আকারভিন্ন আকারে থাকে তাহার সত্তাই সম্ভব হয় না, অতএব প্রজাপতির ধ্যানের বিষয় দ্বারা দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত ধরা করা উচিত নহে।

যদি বলা হয়—এই আকারের সত্তাও তো তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ করিতে দিবে না। জ্ঞানও তাহার আকার উভয়ই স্বীকার করায় অদ্বৈত সিদ্ধি কি করিয়া হইবে?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহাতে অদ্বৈতের ব্যাঘাত হয় না। কারণ, জ্ঞানের যে এই আকার, ইহা অনাদি ভ্রমসংস্কারজন্য বলিয়া স্বীকার করা হয়; আকারকে জ্ঞানাতিরিক্ত এবং জ্ঞানকে সদ্‌বস্তু বলিয়া ভ্রমবশতঃ স্বীকার করা হয় বলিয়া আকারবিশিষ্ট জ্ঞান প্রতিভাত হয়। আকার জ্ঞানাধীন সত্তাবান্ বলিয়া বুঝিলে এই আকারে সত্যতা বোধ চলিয়া যায়, তখন কেবল জ্ঞানই থাকে, সুতরাং অদ্বৈতই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা হয়—জ্ঞানাধীন সত্তাবান্ আকারকেও জ্ঞানবৎ সৎ বলিব না কেন? অধীনসত্তাক বলিয়া আকারকে ভ্রমের বিষয় মিথ্যা বলিব কেন?

তাহা হইলে বলিব—তাহা মিথ্যাই বলিতে হয়, কারণ, অধীনসত্তাককে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়। যেহেতু জ্ঞান একটী আকার ত্যাগ করিয়া অন্য আকার ধারণ করে, সুতরাং তাহা এক সময়ে নিরাকার থাকে অবশ্যই বলিতে হইবে। আর নিরাকার হইয়াও সাকার হয় বলিয়া আকারকে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হইবে। অনির্ব্বচনীয়ই মিথ্যা। মিথ্যা অর্থে—যাহা নাই অথবা দৃষ্ট হয়, মিথ্যা অর্থে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ নহে। অতএব এই শ্রুতিদ্বারা সেই এক অদ্বৈতই সিদ্ধ হয় বলা যায়।

এক্ষণে ছান্দোগ্যোপনিষদের তত্ত্বজ্ঞাপক অপর বাক্যগুলি একে একে আলোচনা করা যাউক। দেখা যাউক ইহাতে কোন্ মতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

(২) 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ৩।১৪।১

অর্থাৎ "এই সমুদায়ই ব্রহ্ম, তাহা হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে। এই ভাবে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। এস্থলে এই সমুদায়কে ব্রহ্ম বলায় এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। এটী শাণ্ডিল্য বিদ্যানামে অভিহিত। ওদিকে ৩১ সংখ্যক শাণ্ডিল্যোপনিষদে শাণ্ডিল্য বিদ্যায় দেখা যায়, নারদসনৎকুমার সংবাদের ন্যায় শাণ্ডিল্য বেদপাঠ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করিতে পারায় ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এস্থলে ব্রহ্মা যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদানুমত। যথা—

"মনসা মন আলোক্য শাণ্ডিল্য ত্বং সুখীভব ।১।১৮
মানসে বিলয়ং যাতে কৈবল্যসব শিষ্যতে ।১।২৩
সত্যং বিজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম যস্মিন্ ইদমোতং চ প্রোতং চ ।
যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ।
অপানি পাদমচক্ষুঃশ্রোত্রমজিহ্বমশরীরমগ্রাহ্য মনির্দ্দেশ্যম্ ।
যদেকমদ্বিতীয়ম্ আকাশবৎ সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
নিরঞ্জনং নিষ্ক্রিয়ং সন্মাত্রং চিদানন্দৈকরসং শিবং প্রশান্তম-মৃতং তৎপরং চ ব্রহ্ম ।"

ইত্যাদি। অতএব এস্থলে অন্য মতবাদের শঙ্কাই সম্ভবপর নহে।

যদি বলা হয়—এই সমুদায় ব্রহ্ম বলায় এই সমুদায়ের সহিত ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, এই সমুদায় দৃশ্য বস্তু, ব্রহ্ম কিন্তু দৃশ্য বস্তু নহে, অতএব "এই সমুদায়ের" সহিত ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বা অংশাংশি সম্বন্ধ স্বীকার করাই সঙ্গত। কারণ, মৃত্তিকারূপ কারণে অবস্থিত ঘটরূপকে মৃত্তিকাও বলা যায়। তদ্রূপ বৃক্ষের সহিত শাখার অংশাংশি সম্বন্ধ বলিয়া শাখাকে বৃক্ষ বলা হয়। অতএব "এই সমুদায়ের" সহিত ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বা অংশাংশি সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। সেই সম্বন্ধেই এই সবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অভেদ স্বীকার সঙ্গত নহে। অর্থাৎ ব্রহ্ম কারণ এবং এই সব তাঁহার কার্য্য বলিয়া অথবা ব্রহ্ম অংশী এবং এই সব অংশ বলিয়া এইসবকে ব্রহ্ম বলা হয়, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত এইসবের অভেদ স্বীকার সঙ্গত নহে। আর তাহা হইলে এই শ্রুতির দ্বারা অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া গেল না।

কিন্তু এ কথা সঙ্গত নহে। কারণ, এইসবের সহিত ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বিকার স্বীকার করিতে হয়, সেই বিকার সর্ব্বাবয়বের না হইলেও অংশেরই হইবে। আর তাহা হইলে ব্রহ্ম সাবয়ব হন, আর তজ্জন্য তিনি বিনাশীই হন। সাবয়ব কখনও নিত্য হয় না। আর তাহা হইলে এইসবকে সর্ব্ব সময়ই ব্রহ্ম বলা হইল না। কারণ, যে কালে এই সব কার্য্য উৎপন্ন হয় নাই, সেই কালে এইসবকে এই সব বলা তো সঙ্গত হয় না। এইসব না থাকিলে তাহাকে ব্রহ্ম বলা ব্যর্থ।

যদি বলা হয় "এই সব" কারণরূপে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তাঁহাকে তখন অব্যক্ত বলা হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই "এই সব" ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, অব্যক্তকে "এই সব" বলা যায় না। অতএব "এই সব" ব্রহ্ম এই বাক্যে এই-সবও ব্রহ্মের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে স্বীকার্ করা যায় না। তাহার পর ব্রহ্মের এক অংশের বিকার "এই সব"—ইহা ভাবিয়াও "এইসব ব্রহ্ম" বলিলে সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই অংশও অপর অংশে তাহা হইলে বিজাতীয় বস্তু হওয়ায় উভয়ের ব্রহ্মত্ব সঙ্গত হয় না। অতএব কার্য্য-কারণ সম্বন্ধদ্বারা "এইসব ব্রহ্ম" ইহা কোন কালবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই।

যদি বলা যায় অংশাংশি সম্বন্ধে "এই সব" ব্রহ্ম বলা হইয়াছে বলিব ?

তাহাও বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, তাহা হইলে "এই সব" ও "ব্রহ্ম ভিন্ন" তৃতীয় একটি বস্তু স্বীকার করা আবশ্যক হইবে। যেমন বৃক্ষ ও শাখা হইতে ভিন্ন আকাশ একটি স্বীকার না করিলে আর বৃক্ষ ও শাখার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু "এই সবের" ভিতর ব্রহ্ম সবই গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব অংশাংশিভাবে "এই সব ব্রহ্ম" এই বাক্যে ব্রহ্মের কোন অংশের কথাই বলা হয় নাই। অতএব ওরূপ অংশ কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে।

যদি বলা যায় "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ জগৎ তাহার এক অংশে এবং তিন পাদ তাহার অমৃত এই শ্রুতিবলে ব্রহ্মের এক অংশ জগৎ বলিয়া অংশাংশি সম্বন্ধ স্বীকার করিব?

তাহা হইলে বলিব অস্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে অখণ্ড নিষ্কল অনন্ত বলায় উক্ত ত্রিপাদ শ্রুতিকে বিরাটের মহিমা-না স্তুতিবোধক বাক্য বলিব? বস্তুতঃ উক্ত শ্রুতিতে পুরুষের মহিমারই কথা আছে, যথা—

"তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" ৩।১২।৬।

অর্থাৎ "ইহার অর্থাৎ এই গায়ত্রীনামক ব্রহ্মের মহিমা এইপ্রকার। ইহা অপেক্ষাও পুরুষশ্রেষ্ঠ। সমুদায় ভূতই ইহার একপাদ, অবশিষ্ট তিনপাদ স্বর্গে অমৃতরূপে অথবা নির্ব্বিকাররূপে অবস্থিত। অতএব এই শ্রুতি বিরাট্ পুরুষের বোধক হওয়ায় অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের বোধক না হওয়ায়, পক্ষান্তরে "অখণ্ড" প্রভৃতি শ্রুতি, শুদ্ধ ব্রহ্মবোধক হওয়ায় শুদ্ধ ব্রহ্মের এক অংশে জগৎ ইহা বলা হইল—ইহা বলা যায় না। অতএব অংশাংশিসম্বন্ধও স্বীকার করিয়া "এই সব ব্রহ্ম" এই বাক্য বলা হয় নাই।

যদি বলা যায়—তাহা হইলে কোন সম্বন্ধে "এই সব ব্রহ্ম" বলা হইল?

এতদুত্তরে বলিব—অভেদ দৃষ্টিতেই বলা হইল। আর তাহা হইলে "এই সব" মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সত্য—ইহাই বলা হইল। অর্থাৎ যাহাকে "এই সব" বলিয়া দেখা যাইতেছে, তাহা "এই সব" নয়, তাহা ব্রহ্মই। যেমন "এই সর্প টী. সর্প নহে" কিন্তু রজ্জু বলিলে, যেমন সর্পকে মিথ্যা বলা হয়, এস্থলেও "এই সবকে" তদ্রূপ মিথ্যাই বলা হইল। আর তজ্জন্য "এক অদ্বৈত ব্রহ্ম" ইহাই বলা হইল। এইরূপে এতদ্দ্বারাও সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা হয়—'তজ্জ' অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন, 'তল্ল' অর্থাৎ তাহাতে লীন হয় এবং 'তদন' অর্থাৎ তাহাতেই স্থিত বলায় এই সবকে মিথ্যা বলা যায় কি করিয়া?

তাহা হইলে বলিব—রজ্জু-সর্পও রজ্জু-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপর যেভাবে দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকেও 'তজ্জ', 'তল্ল' ও 'তদন' বলিতে তো কোন বাধা হয় না। অতএব "তজ্জলান্" এই বাক্যবশতঃ ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের অংশাংশিভাব স্বীকার অনাবশ্যক। পরিশেষে এই কথাটী উপাসনাকাণ্ডের কথা, অতএব ইহার তত্ত্বাংশে সার্থকতা নাই। সুতরাং

এই শ্রুতির সহিত "অখণ্ড" শ্রুতির বলাবল বিচার করিলে এই শ্রুতি দুর্ব্বল, অখণ্ড শ্রুতিই প্রবল। আর "অখণ্ড" পদের অর্থ "সখণ্ড" করিলে শ্রুতির অপলাপ করা হয়। কিন্তু 'ত্রিপাদ' শ্রুতিতে বিরাটের উদ্দেশ্যে ইহা কথিত বলিলে সে প্রকার লক্ষণার আকাঙ্ক্ষাই থাকিতে পারে না। অতএব এই শ্রুতির দ্বারা এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা যায়—এস্থলে 'পুরুষ' শব্দে যদি শুদ্ধ ব্রহ্ম ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার "এক" পাদে এই বিশ্ব ও ভূতসকল আর তিন পাদ অবিকারী বলিতে হইবে, আর তাহা হইলে অংশাংশি সম্বন্ধ সিদ্ধ হইয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মতই সিদ্ধ হইবে। আর এই পুরুষকে শুদ্ধ ব্রহ্ম ধরিতে বাধাও নাই। কারণ, এই তৃতীয় অধ্যায় ১২শ খণ্ডের প্রথমেই

"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" ৩।১২।১

অর্থাৎ "গায়ত্রীই এই সর্ব্বভূত, যাহা কিছু এই" এইরূপ বলা হইয়াছে, এবং উক্ত ষষ্ঠ বাক্যে এই গায়ত্রী নামক ব্রহ্ম হইতে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই পুরুষ শুদ্ধ ব্রহ্মই হইবে।

তাহা হইলে বলিব—না, ইহা শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মের পাদ কল্পনা অসঙ্গত। মায়াদ্বারা পাদ কল্পনা করিলেও ইহা শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে পারিবে না। কারণ, শুদ্ধ ব্রহ্ম মায়াশূন্য হন। সুতরাং ইহাকে সগুণ ব্রহ্মই বলিতে হইবে। আরও কারণ এই যে, ইহা গায়ত্রী, উপাসনা উপলক্ষে কথিত হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মের মহিমা বা পাদ কিছুই সম্ভবপর নহে, সুতরাং উপাসনাও সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ "তাবান্ অস্য মহিমা" বলায় "অস্য" পদে গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মকেই ধরিতে হয়। এখন এই গায়ত্রীরূপ ব্রহ্ম হইতে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" বলায় 'অস্য' পদে পুরুষ না ধরিয়া সেই গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মকে ধরা যায়। আর তাহা হইলে এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের পাদ বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং পুরুষ পদে নির্গুণ ব্রহ্মও ধরিতে বাধা হয় না।

যদি বলা যায় ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে এই মন্ত্রটাই আছে, তাহাতে ত পুরুষেরই চারিপাদ বলা হইয়াছে, যথা—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২
এতাবানস্য মহিমা অতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩

অর্থাৎ—পুরুষই এই সমস্ত যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে। তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ দেবত্বের নিয়ন্তা, যেহেতু অন্ন দ্বারা অর্থাৎ প্রাণিভোগ্যের নিমিত্তভূতদ্বারা তিনি নিজ কারণাবস্থা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২॥ এই সকল এই পুরুষের মহিমা, পুরুষ এই মহিমা হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার এক পাদ এই সকল

ভূত, এবং ত্রিপাদ ইহার দিবি অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপে অমৃত অর্থাৎ বিনাশ রহিত। অতএব সেই নির্গুণ ব্রহ্মেরই পাদবিভাগ হইতেছে, আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতমতই অভিপ্রেত ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, এই পুরুষকে সগুণ ঈশ্বর বা বিরাট্ পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার তিন পাদ অর্থাৎ অধিক অংশই নির্গুণ বলিলেও অদ্বৈত হানি হয় না। কারণ, তাহা হইলে এই পুরুষের এক অংশ সগুণ ও তিন অংশ নির্গুণ বলা হইল। আর তাহার ফলে সমগ্র পুরুষ সগুণই হইলেন। কিন্তু এক অংশ ইহার মহিমা অর্থাৎ অচিন্ত্য সামর্থ্য বলায়, তাহা যে পরিবর্ত্তনশীল তাহাই বলা হইল। আর নির্গুণ অংশ অপরিবর্ত্তনশীল বলা হইল। কিন্তু এক বস্তুর যদি সগুণ ও নির্গুণ, পরিবর্ত্তনশীল ও অপরিবর্ত্তনশীল অংশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই নির্গুণ অংশের অনুরোধে সগুণকে মিথ্যা বলিতে হইবে, নচেৎ নির্গুণত্ব সম্ভব হয় না। উভয় অংশ মিলাইয়া সমগ্র সগুণই হইয়া যাইবে। যেহেতু সগুণ নির্গুণ ও উভয় থাকিলে নির্গুণও সগুণের সম্বন্ধবশতঃ সগুণ হইয়া যাইবে। তাহার পর ইহা ঋগ্বেদের সংহিতাভাগের কথা বলিয়া ইহা উপাসনা বা কর্ম্মাঙ্গের কথা বলাই সঙ্গত। উপাসনার অঙ্গ হইলে এইরূপ ধ্যান কর্ত্তব্য, আর কর্ম্মাঙ্গ হইলে কর্ম্মকালে উহা পাঠ্য হইবে। সগুণ মিথ্যা বলিলে ইহা জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ ছান্দোগ্য মধ্যে গায়ত্রী উপাসনাপ্রকরণেই ইহা কিঞ্চিৎ অন্যথা করিয়া কথিত। অতএব ইহা পুরুষের তিন পাদকে নির্গুণ না বলিয়া সগুণ বলাই সঙ্গত। নির্গুণ ব্রহ্মের সিদ্ধির জন্য "সত্যং জ্ঞানং", "নির্গুণং নিষ্কলং" প্রভৃতি শ্রুতি অবলম্বিত হইবে। অতএব এই শ্রুতির দ্বারা দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি কোন মতবাদই সিদ্ধ হয় না, কিন্তু অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

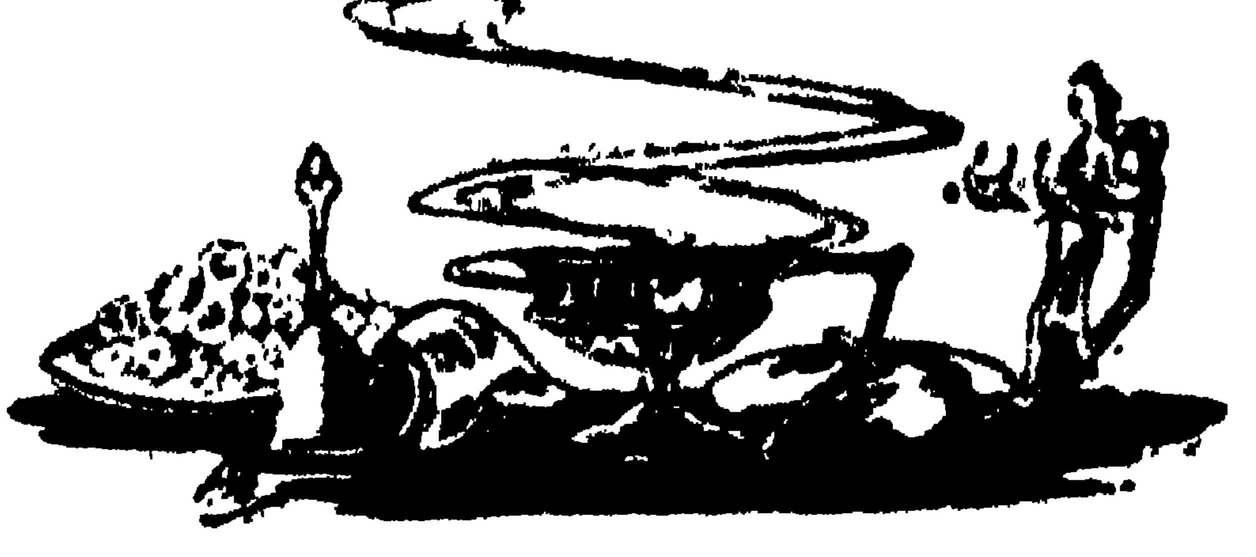

'হে মোর দেবতা'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গুহ

হে মোর দেবতা! কোথায় পেতেছ
তোমার শুভ্র আসনখানি?
মোর হৃদয়ের যত উপচার
আজিকে সেথায় লইব টানি।

খুঁজেছি তোমায় নিবিড় কাননে,
কত বেলাতটে, নিকুঞ্জ বনে,
কত ধূপছায়ে, কত দূর দেশে,
মৃদু সমীরণ যেথা হতে আসে,
যেথায় প্রথম রবির কিরণ
চুমিছে সাদরে ধরার চরণ,
আলো ও ছায়ার ঢেউয়ের খেলা
যেথায় তুলেছে রূপের মেখলা,
যেথা রূপ ও রসে মদির গন্ধে
মেতেছে সবার পরাণ জানি,
সেথা কিগো আজি পেতেছ দেবতা
তোমার শুভ্র আসনখানি?

ও গো দেবতা, আজি আশীষ তব
লভিতে হৃদয়ে বাসনা জাগে,
মাতিয়া যখন উঠেছে পৃথিবী
নবীন উষার প্রথম রাগে,
বহিছে যখন মলয় বাতাস,
ছড়ায়ে পড়িছে কুসুম সুবাস,
পাখীরা ভুলায়ে কল কাকলীতে
যখন তুলিছে নূতন তান,
আমি কবি তব বন্দনা লাগি
গাঁথিয়া এনেছি প্রভাতী গান।

ওগো দেবতা, উছলি উঠেছে
বুকভরা আশা কেন না জানি।
শুনিতে কামনা অন্তরে মোর
দুখহরা তব অভয়বাণী।

কুলুকুলু রবে যে বাণী বহিয়া
নদ নদী চলে আঁকিয়া বাঁকিয়া,
যে বাণী ধ্বনিছে মেঘ গরজনে,
জলধির মাঝে, ঘোর বরিষণে,
সে বাণী আজিকে লহরী তুলিয়া
ছড়ায়ে পড়েছে জগত মাঝে,
মোর কবিতার ছন্দে ও গানে,
ভাব ও ভাষায় সে বাণী রাজে॥

নিবেদন

দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ৺শ্যামাপূজা—

দার্জিলিঙএর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম বর্তমান বর্ষে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। ঠিক এই শ্যামাপূজার দিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদ ও সন্তান শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মানবের হিতার্থে বিশেষ করিয়া হিমালয়বাসীদের জন্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সমন্বয় বার্তা প্রচার কল্পে এই আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য অন্যান্য উৎসবের তুলনায় ৺শ্যামাপূজা অনেকটা ধুমধামের সহিত এই আশ্রমে সম্পন্ন হয়। প্রায় মাসখানেক পূর্ব্ব হইতেই আশ্রমবাসী ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের ভিতর এক আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠে। দরিদ্র নারায়ণ সেবা এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হওয়ায় তাঁরা দ্বারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থীরূপে বাহির হইয়া পড়েন। সামর্থ্যানুযায়ী কেহবা টাকা-পয়সা কেহবা জিনিষ-পত্র এই মহৎ উদ্দেশ্যে দান করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করেন। বাজারের মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের দান ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পূজার দিন সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতেই শ্যামাসঙ্গীত শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যথাবিহিত পূজা অর্চ্চনা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও হোম সম্পন্ন হইতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল।

পরদিন কার্য্যসূচীতে ছিল শোভাযাত্রা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা। ভোর হইতেই ছেলেমেয়েদের দল, দলে দলে আসিতেছিল,—কেহ বা শোভাবর্দ্ধনে কেহ বা শোভা দর্শনে। বেলা প্রায় নয়টার সময় বাদ্যযন্ত্র সহকারে আশ্রম স্কুলের ছেলেমেয়েরা এবং মাতৃভক্ত সন্তানেরা বিবিধরঙের পতাকা হাতে করিয়া মাতৃমূর্ত্তি সহ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং ছাদের উপর হইতে অনেকেই মায়ের উদ্দেশ্যে পুষ্প বর্ষণ করিতে ছিলেন। কোথাও কোথাও বা জগদম্বার সাক্ষাৎ চিন্ময়মূর্ত্তি মায়েরা শোভাযাত্রার গতি স্তব্ধ করিয়া পুষ্প-সিন্দুর দ্বারা তাঁহাদের পূজার্ঘ্য নিবেদন করেন। শোভাযাত্রায় বাঙ্গালা এবং নেপালীতে মাতৃসঙ্গীত গীত হওয়ায় দৃশ্যটি আরো চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হইয়াছিল। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় শোভাযাত্রা আশ্রমে ফিরিয়া আসে।

দরিদ্রনারায়ণ সেবার সংবাদ বাজারে ঢোল সহরত দ্বারা জানান হইয়াছিল। কাজেই জুটিয়া নারায়ণের সংখ্যা অন্যান্যবারের চেয়ে এবার হইয়াছিল অনেক বেশী। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রায় সহস্রাধিক লোক এই উৎসবে প্রসাদ পান। মিঃ পি এন চৌধুরী (স্যানিটরী অফিসার) এবং বি-ডি জৈন মহোদয়ের অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টায় এই উৎসব আরো পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। সমবেত বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি আর এস্; মিঃ এন্ সি বসু, বার এট্ ল; মিঃ এম সি প্রধান, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; মিঃ এন কে নাগ, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্যামাপূজা—

গত ২রা কার্ত্তিক রবিবার সারারাত্রি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যথারীতি শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে। পরদিবস মায়ের প্রসাদ পঞ্চশতাধিক ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণগণের মধ্যে বিতরিত হইলে পর সায়াহ্নে শোভাযাত্রা ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হয়।

* * * *

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গত কার্ত্তিক মাসের প্রথম তিন রবিবার তাঁহারই স্বরচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সংক্ষিপ্ত পুণ্য জীবনী" কথকতা পদ্ধতিতে আলোচনা করেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া এবং জাতীয় শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, সংসার, অহং, মায়া, ব্রহ্ম, জগৎ, জীবন, মৃত্যু, অনুভূতি, আত্মা, গুরু, প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনী ও শিক্ষা সহজবোধ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন অধিকন্তু ইহাতে আহরিত ও আলোচিত হয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তান শ্রীমৎ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতির বিস্তৃত বাণী। তাঁহার কথকতার ভাব-ভঙ্গী সঙ্গীতাদি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতীব মুগ্ধ ক'রেছে।

কার্ত্তিকমাসের শেষ রবিবার, তিনি "রাসলীলার আধ্যাত্মিক ভাব" কথকতা পদ্ধতিতে করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিমল আনন্দ দান করেন।

Swami Abhedananda

[In response to the appeal of the members of "Şiksha Tirtha" a literary society of tha College students of Calcutta, to the thought-leaders of the country for their impressions of Swami Abhedananda, some discourses have already been contributed. Below are published a few of them and the readers will be delighted to feel the deep spirit of reverence that these writings breathe. The Editors express Sincere thanks for the kindness of the above Soceity in publishing them in "Viswavani."—Ed.]

CHEENA-BHAVANA
Director
Prof. TAN YUN-SHAN.

Santinikatan,

SWAMI ABHEDANANDA.

I am very glad that in these critical days when most of the students are thinking of this "ism" and that "ism" and are interested in politics and economics, the students of "Shiksha Tirth"—a literary Association formed by the college students of Calcutta...have thought of publishing a book on the life of the late-lamented Swami Abhedananda, one of the greatest teachers and philosophers of modern India.

I met the late Swamiji for the first time at the Ramakrishna Mission at Darjeeling in 1934 when I was spending my summer vacation there. I do not no why at the very first sight of his I began to love and admire him very much. He was so gentle so kind, so charming and so noble. I put quite a number of questions to him. He answered them one by one so adequately and patiently just like a father explained things to his child. Later on I had the privilege of meeting him several times and discussed many things with him such as Buddhism, Hinduism, Indian Philosophy—specially about the Yoga philosophy and practice. He did enlighten me so much that I can hardly express them in words. Two years have already elapsed since he left this world yet the impression he gave me is still fresh and will always be fresh in my mind. O! I am ever grateful to him!

Students who respect and worship the Swamiji should study his philosophy and follow his teaching and example. He was, indeed, one of the best representatives of the Hindu Religion and Culture in modern times, of which every son and daughter of India should be proud and should never forget.

With these few words I join my young brothers of the Shiksha Tirth in paying homage to the late Yogi Swami Abhedananda.

Sd. Tan Yun-Shan

Visva-Bharati Cheena-Bhavana,
Santiniketan, India.
22nd Sept.—1941.

From

Dr. Radhakumud Mookerji,
M. A., P. R. S. Ph.D., M. L. C.
Professor and
Head of the Department of
History.

12941.
The University
Lucknow.

I whole-heartedly support the project of publishing a proper biography of Swami Abhedananda, one of Bengal's greatest spiritual characters. I had the good fortune of coming into close contact with him and of drinking in the honeyed words of wisdom that fell from his lips. To his biographer, may I tell a story he had himself narrated to me? It will show his masterly handling of the mass-mind. He told me of his interesting feat in weaning away thousands of American men and women from their practice of eating beef by addressing them at public meetings with his irrestible logic which held them spell-bound and was unanswerable. He naively asked them two questions :

(1) "next to mother's milk, on whose milk do you feed your babies?" The audience answered : "O, it is surely the cow's milk." Then the Swami answered back : "Therefore, the Hindu venerates the cow as his second mother."

(2) "Which is the living creature in the whole world whose very excreta are medicinal and wholesome to men?" The audience answered : "Surely, it is the cow whose urine and dung as disinfectants are not repellant to man." Then the Swami clenched his argument : "Therefore, the Hindu reveres the cow as the mother divine." His speech had its immediate effect in thousand of his audience coming forward to sign the creed of reverence for the cow and the sanctity of its life. Few could equal Swamiji in his power of popular oratory combined with that of the simplest exposition of the most abstruse philosophical positions and the subtlest of spirtitual truths. We must make Sri Abhedananda live with us and for us and ever teach us in his immortal writings and published works. He is immortal as a teacher.

Sd. Radhakumud Mookerje.

21, Ballygunge Circular Road,
Calcutta.

It is an encouraging sign of the times that Bengal's young men are hearkening in increasing numbers to the messages of Swami Vivekananda and Swami Abhedananda—the twin spirits of undying fire who lighted the torch of India's civilization in far off America. It is impossible historically to think of the one without thinking of the other. Vivekananda kindled the light of Hinduism in that most western part of the Occident, as we all know. But it is equally essential for us to remember and cherish the further fact that it was Abhedananda who kept that light burning, tended it and fed it with his life's devotion until it burst into a blaze of inextinguishable splendour in the very heart of America. The many branches of the Ramakrishna Mission which have since sprung to life in America are the outer embodiment of that spirit of self-consecration which ley behind Abhedananda's long and arduous work in that country. He was indeed Vivekananda's worthy comrade-in-arms, leonine in spirit, heroic in achievement, and inspired by an immortal faith in the reality of India's culture. He has left behind him a rich heritage which the elect of India's youth must carry on into greater and greater fulfilment. And one's heart is filled with hope and thankfulness at the sight of young Bengal responding to the call of Abhedananda in the manner it has been doing during the recent years.

Sd. B. C. Chatterjee,

25.1.41.

Benares Hindu University.
BENARES, 14 August, 1941

Vice-Chancellor

Dear Sir,

Thank you very much for your letter of the 31st instant. I am deeply absorbed in work now and it is not possible for me to do anything special.

I met Swami Abhedananda on one or two occasions and have had some correspondence with him. I was deeply impressed by his love for Indian Culture and loyalty to the great ideals of spiritual lite. His work in America was quite impressive.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd. Radhakrishnan,

Sri Haridas Mukerjee,
6/1B Iswar Mill Lane,
Calcutta.

Attitude of Vedanta Toward All Religions.

Swami Abhedananda

Hundreds of educated men and women of this country have found in Vedanta the true foundation of an absolutely unsectarian universal religion which has neither dogma nor creed of any kind, which embraces all the special religions, such as Christianity, Buddhism, Zoroastrianism, Mahometanism, Brahminism, and like a thread strings them together into a garland of flowers, variegated in their colour and size. Like an impartial judge, the religion of Vedanta gives the proper place to each of these sectarian religions in the grand evolution of the spritual thoughts and systems of the world. Having no particular founder, it stands upon the eternal, spiritual laws that have been discovered by various sages and seers of truth of all countries and of all ages and which have been described in the different Scriptures of the world. Those who have studied the religion of Vedanta in its various aspects have found the spiritual laws which are given in all the different Scriptures. For them it is not necessary to study the Vedas of the Hindus, the Tripitakas of the Buddhists, the Zend-Avesta of the Parsees, the Old Testament of the Jews, the Bible of the Christians and the Koran of the Mahometans in order to understand those spiritual laws, because they can find the essential points, the moral and spiritual laws that govern our lives, through the study of Vedanta. It is not necessary if they can only understand the central point, that truth is universal. If there be any spiritual law, that must be universal and must pervade all the Scriptures of the world. Then there is no difficulty—everything will appear to us as simple. Furthermore, the students of Vedanta find in this religion the ultimate conclusions of the greatest scientific thinkers of the world. It includes all the scientific truths. The religion of Vedanta therefore is extremely comforting for those who have outgrown the doctrines and dogmas of special religions, and I can assure you that it has brought the greatest comfort and consolation into the lives of those who are earnest and sincere seekers after truth.

The religion of Vedanta is like a huge structure, the foundation of which is laid, not upon the quicksand of the authority of any particular book or personality, but upon the solid rock of logical and scientific

reasoning ; and the walls of which are not made up of the clay of superstitious dogmas, but are built with the stones of spiritual experiences, placed one upon another by the artistic hands of the great seers of truth of ancient and modern times. The roof of this superb structure is not confined within the celestial domain of the anthropomorphic God of a personal religion, but it extends beyond all the heavens of different religions, and, rising above all the various planes of relativity, reaches that infinite and eternal abode of being, intelligence, love and everlasting bliss. The gates of this magnificent places are guarded, not by zealots and fanatics who carry destructive weapons in their hands to prevent the entrance of other sectarians, but by sincerity and earnestness standing like sentinels to welcome with open arms all those who are sincere and earnest seekers after truth, spiritual life and God-consciousness, irrespective of their creed, nationality or religious conviction. There are many stories in that palatial building, three of which are of great importance. The first floor is for the monotheists, or those who believe in the existence of one personal God whom they worship under a particular name and a particular form. Here is the place for all the monotheistic believers and worshippers in Judaism, Christianity. Mahometanism, Zoroastrianism, Lamaism, Brahminism and theistic Buddhism, with their various sects and denominations. Here are to be found all the doctrines, dogmas rituals, ceremonials and symbols that are described in these particular religions. The second story is for those who have outgrown all ritualism, ceremonialism, symbolism and the worship of a God with a particular name and a particular form. It is for those who have understood that God is not far from us, dwelling in a heaven somewhere above the clouds, but that God dwells in nature ; He is immanent and resident in nature He is not far away, but He is here, He is the Soul of our souls, He is the Life of our life ; "in Him we live and move and have our being". Those who feel this and those who realize that we are children of God, that our souls are parts of that one stupendous whole, the Infinite Being, worship on the second floor of this superb structure of the religions of Vedanta.

The God of Vedanta is personal, yet He is not confined to any particular personality. He is impersonal, also He is above personal and impersonal beyond both. You cannot confine God by giving Him any particular personality. If you think that He is sitting on a throne somewhere, with two hands,—that will limit Him. That is a phase, but there are other phases.

The God of Vedanta has many names and many aspects, and these

aspects and these names are recognized by the different religions of the world. He is the same Being, but has many names. He has no particular form, yet He assumes many forms in order to satisfy the desires of earnest and sincere devotees; and to fulfill the prayers of the devotee He menifests Himself in that particular form to which the heart and the soul of the devotee are devoted. His personal aspect is worshipped under different names by different religions. The Christians worship Him as the Father in Heaven, the Mahometans as Allah, the Zoroastrians call Him Ahura Mazda, the Brahmins give Him various names, the Buddhists call Him Buddha, the worshippers of Divine Mother call Him the Mother of the universe. God is sexless, and the moment we become sexless we have become divine. He has no sex. Why should you call Him Father and give Him masculine sex? Call Him mother, masculine or feminine, there is no distinction of sex; therefore, He may be called Mother, Father, neuter, it does not make any difference. When you understand this central truth, there in no difference in the expression. But the personal God of the dualistic religions of Semitic origin is masculine, is Jehovah; the same Jehovah again is Father in Heaven, is Allah, is Ahura Mazda.

Third story of this structure is for those who have gone beyond all relativity, who have transcended phenomenal existence, and who have reached that state of divine communion which manifests the eternal, absolute oneness of the Supreme Spirit. It is for those who realize the indivisible oneness of that Being. That Being cannot be divided into parts, but He is one stupendous whole, indivisible, finer than space; as space cannot be divided so God cannot be divided into parts. That is the Absolute Spirit, the Infinite Being; it is called by various names. In Vedanta It is called Brahman, Paramahamsa or Over-Soul; but It is the same as the Good of Plato, the *Substentia* of Spinoza, the transcendental thing-in-itself (Ding an Sich) of Kant, the Will of Schopenhauer, the Unknown and Unknowable of Herbert Spencer, the Substance of Ernst Haeckel, the Science of Matter of the Materialists, the Real Entity or Spirit of the Spiritualists; It is also the same as Christ. Christ is this Being, this Universal Spirit Who is called by other names, and He is also Buddha. Buddha means that Eternal Wisdom, that Truth.

These different names are given by different philosophers, as also by different worshippers. Three phases of Vedanta,—the dualistic, the qualified nondualistic and the non-dualistic or monistic,—include all the sectarian religions of the world and impart the highest ideals given in all the Sciptures. What is the highest ideal given in the Scripture of the

Christ, or of the Mahometans, or of the Parsees? The worship of one God; that is the highest ideal. God is personal; He may have some form. He may have a particular name, but still He is one. That is the highest ideal. This you find in the dualistic phase of Vedanta. Vedanta accepts that ideal, and therefore it embraces all the religions that I have just mentioned. As, on the one hand, the religion of Vedanta embraces the special religions of the world, and the highest ideals of all the Scriptures of the world, so on the other hand the philosophy of Vedanta embraces the highest ideals and ultimate conclusions of the greatest scientists, the deepest philosophers, the profoundest thinkers and the best metaphysicians of the world; therefore this religion is truly universal. Its scope is unlimited and there is no other religion in the world which can be compared to it in its universality and in its infinite scope.

The religion of Vedanta is inseparable from true science and from true philosophy. Why? Because all sciences and all philosophies are nothing but so many attempts of human minds to grasp some particular phase of the Eternal Truth, the Infinite Reality. As truth is the goal of all science and all philosopy, the same truth is the goal of Vedanta; and as Vedanta attempts to lead all human minds to the realization of that absolute truth of oneness, so it embraces all the philosophies of the world. In particular doctrines, in particular arguments and discussions and particular points there may be diversity, but the ideal is one, and hence Professor Max Muller said that "Vedanta is the most sublime of all philosophies and the most comforting of all religions." Why is this? Because it embraces the highest truths given in the philosophy of Plato, of Schopenhauer, of Hegel, Kant, Berkeley, Hume and others. For this reason we should call the religion and philosophy of Vedanta absolutely unsectarian and universal. The follower of the Vedanta religion is a true Christian. He is a true Christian, but in spirit he is broader than a Christian. He is a true Mahometan; also he is a true Buddhist, a true Brahmin, a true Hindu; he is a worshipper of truth. He honors and reveres all the great prophets and seers of truth of all countries, accepts their teaching and never fails to separate the essentials of religion from the non-essentials or the crystallized dogmas and doctrines of special religions. He does not belong to any sect or creed of any particular religion, yet in spirit he belongs to all sects and all creeds of all religions, because he knows the spirit of all creeds, he understands the meaning of all sectarian doctrines and dogmas. He does not belong to any particular church or any particular temple, but all churches, all places of worship,

all temples and mosques are equally sacred equally holy. To his all-embracing soul they are all equally great, and so he is able to worship his ideal in a Catholic church or in a Mahometan mosque. He is not limited. When he sits under a tree, he worships. He may not go to Church on Sunday, he may stay in the park under a tree and worship God in spirit. He feels that each individual soul is the temple wherein dwells the Eternal Being and He must be worshipped in spirit. That is a grand ideal.

Vedanta accepts the teachings of the great prophets, like Moses, like Zoroaster, Jesus the Christ, Buddha, Confucius, Laotze and other great prophets and seers of truth who have arisen in other parts of the world, as well as those of India,—such as Krishna, Rama and others ; it recognizes Jesus the Christ as the Son of God, as the Incarnation of divinity, but not as the only one. There have been many other incarnations and will be many in future. God is not limited to any particular tribe or particular nationality, or time, or place. Why should we limit Him ? He is the Infinite Being, the Father of all nations. Wherever His manifestation is necessary, He will appear ; He loves all mankind equally. He does not think that the Jews are his best friends, while others are heathens. No, they are all equal in His eyes. All nations are great before Him. We must not have any national prejudice on account of colour or particular mode of living. All are children of God.

The religion of Vedanta recognizes spiritual growth and evolution in the path of realization. As in our physical body, there are different stages of growth,—like childhood, youth and maturity,—so in the spiritual life there is spiritual childhood, spiritual youth, spiritual maturity. One leads to the other, one merges into the other and ultimately leads to God, to Realization. Spiritual childhood begins with the worship of ancesters or departed spirits and ends with the conception of one extra-cosmic personal God, Who dwells outside of nature ; that is the limit of spiritual childhood. All primitive religions began with ancestor-worship. In fact, ancestor-worship or spirit-worship was the foundation of all religions in primitive times. Modern spiritism or ancient ancestor-worship is only the beginning of spiritual childhood. In ancient times, when the people came to believe in departed spirits and felt that they had power over certain phenomena or control over certain conditions, they were frightened and they began to revere and honour those spirits. Gradually this gave rise to another conception,—that of still higher and more powerful spirits who had larger control over the phenomena of nature, and they called these tribal gods. They became nature gods, and such tribal gods you will find amongst the

different tribes of the ancient Jews, as amongst the tribes of ancient India, China, Japan and other countries. They are like chiefs who have control over certain manifestations of nature or certain powers ; and this may be called the second stage of spiritual childhood. Gradually this leads to another step, which is a little higher ; that is, that there is one governor over all these tribal gods or chiefs, and this conception is the monotheistic conception of a personal God ; that he is the ruler of all, of the sun-god, of the moon-god, of departed spirits, of ancestors and bright spirits,—that is, the ruler of all. This is the beginning of the dualistic conception and here is the end of spiritual childhood. All those dualistic religions which we call monotheistic religions do not go beyond this. They lead our minds and souls to the worship of one personal God who dwells outside of nature and they make us believe that this is the highest, that there can be nothing higher.

These dualistic religions therefore, like Zoroastrianism and Mahometanism, lead to the highest stage of spiritual childhood in the spiritual life. But the spiritual youth begins when we begin to realize that God is not outside of nature but He is in nature ; He is not outside of us. He is in us ; that He is not extracosmic but intra-cosmic ; He is immanent and resident in nature ; He is the soul of the universe ; just as the soul of our body is the internal ruler of our body, so the soul of the universe is the internal ruler of the universe. He governs, not from outside, but from inside. He is the Creator, not in the sense that He sits somewhere and commands and creates the world out of the material which dwells outside of His own being, but He creates by pouring His spiritual influx in nature and starting the evolution of that cosmic energy which is called *Prakriti*, or nature. In fact, the cosmic energy forms the body of the Spiritual Being. God then appears to be both the efficient and material cause of the universe, and therefore He is not only the Father but the Mother of the universe. Father and Mother, both in one. The individual souls come out of His own being like sparks coming out of huge bonfire. The huge bonfire is Divinity and our souls are like sparks which have sprung out of that bonfire of Divinity. We are immortal by our birthright, because we are parts of that one stupendous whole.

This state gradually leads to spiritual maturity, where we do not think of the world, we do not think of creation ; but, rising above all phenomena, we realize the indivisible oneness,—that we are not merely sparks, but we are something closer to divinity—we are one with God. Then we say, "I and my Father are one." Not one in the sense that an earthly child

is one with its father, but it is unity, because God is all in all, and all is God. There is nothing outside of God, everything has vanished, all phenomena have disappeared, all relative existences has disappeared and the whole universe, appears to be like a solid mass of infinite and indivisible reality. All phenomenal existences seem to be like dreams. I am talking, you are listening,—this is like a dream ; you cannot realize it unless you rise on a higher plane. We are all playing parts on the stage of the world. I have taken some part and you have taken some other part. There is no difference. You are playing the part of a listener ; I am playing the part of speaker, but we are all on the same stage. You may help me and I may help you. Your desires you are trying to fulfill by your thoughts and deeds, so everybody else is doing the same. You may have certain dreems in your life ; you may think that if you can accomplish these, you have fulfilled your purpose in life. Then, after fulfilling that, you think that there is another purpose. You must push on and reach that, and and so on and on we go until all purposes are fulfilled, all desires are satisfied and all aims are gratified. So in reaching the maturity in spiritual life, we reach the absolutely monistic perception of spiritual oneness. It is not Pantheism. Do not for a mement dream that it is Pantheism. No, it is absolute monism ; there is no other word for it. Pantheism does not express it. Pantheism means, This is God ; mother is God, the chair is God. No, in absolute monism the chair dees not exist ; the particular phenomenon does not exist, but we reach the background. God is like the eternal canvas upon which the beautiful picture of this phenomenal world is painted by the Divine Hand. Then we realize the canvas. At present we are fascinated and charmed by the colourings of the external ; we have forgotten the canvas, the background of the universe. Then we realize the background and we reach the highest.

The religion of Vedanta teaches that there is one God, but with many aspects. From spiritual childhood we must rise to spiritual youth, and from spiritual youth to maturity ; then we shall be one with the Infinite. The same God is worshipped under different names. The religion of Vedanta is truly catholic and tolerant ; it does not dispute, it has no particular form of worship, nor does it ask that you do this or that ; but its main theme is that any form of worship which appeals to the sincerity and earnestness of the soul of the devotee is right. If you think that by worshipping any particular ideal, in a particular way, it will help you, —go and do it. Do not hesitate. If you think that it would not help

you, do not do it. The worship of God depends upon the attitude of the worshipper, the attitude of the mind, the heart of the worshipper. If you wish to go and pray, go and pray ; if you do not believe in prayer, do not pray. What you wish, go and do, but be directed by your highest impulse, by your highest desire.

Try to understand the highest purpose of life and then worship the ideal under any form or any name which appeals to you ; do not hesitate for a moment. All rituals, all ceremonials, all forms of worship, are only the means to the highest end, to the realization of the divinity, and therefore the religion of Vedanta embraces all other special sectarian religions, all forms of worship, under the different names that I have given you. Some do not care to worship a personal God, but think of His impersonal nature ; they are just as good. They are not going astray. So long as there is sincerity and earnestness and devotion and love for the spiritual ideal, there is no going astray. We make our heaven and hell on this earth by our thoughts and deeds. There is no other external hell or eternal place of punishment. Our own minds dwell in hell when we have performed some wicked deeds, some wrong. Our souls rebel then. But when we are in the path of righteousness, our souls are happy, there is peace, there is the manifestation of divinity ; because God manifests when our minds are silent, and that silence comes through peace, and when there is peace, there is happiness and bliss.

সম্পাদক—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী সদ্রূপানন্দ কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাসপবলা প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA

		Rs.	As
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA	...	3	8
India and Her People (New Impression.)	...	3	0
Self-Knowledge ...	...	1	8
Path of Realisation ...	...	2	0
Divine Heritage of Man ...	...	2	0
Spiritual Unfoldment ...	...	1	8
Reincarnation ...	...	1	8
Philosophy of Work ...	...	1	12
Lectures and Addresses in India ...	...	2	4
How to be a Yogi ...	...	2	0
Great Saviours of the World ...	...	1	8
Human Affection and Divine Love (New Edition)	...	1	0
Religion of the 20th Century (New Edition)	...	0	8
Sri Ramakrishna (New Book) ...	...	0	4
Does the Soul exist after Death (New impression)	...	0	4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

19B, Raja Rajkrishna St,

Calcutta.

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৮ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীমা

স্বামী অভেদানন্দ

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীঠাকুর নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীমা তাহার পরদিন হাতের বালা খুলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া ও তাঁহার হাত দুইটী ধরিয়া বলিলেন: "আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এ ঘর থেকে ওঘর।" তখন আর শ্রীমা হাতের বালা খুলিতে পারিলেন না।

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে দ্বিতীয়বার হাতের বালা খুলিতে শ্রীমা চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেখানেও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন: "তুমি হাতের বালা খুলো না। শ্রীকৃষ্ণ যার পতি তার বিধবা হওয়া নাই। সে চির সধবা।"

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কামারপুকুরে থাকিবার সময় লোক সমাজের নিন্দার ভয়ে শ্রীমা বিধবা সাজিতে গিয়াছিলেন, তখনও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দিয়া পূর্ব্ববৎ হাতের বালা খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা—• • • ১২৯৩ সালের ১৫ই ভাদ্র বৃন্দাবন গমন করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীমা কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইলেন। সঙ্গে যোগীন, শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দিদি, গোলাপ মা ও শ্রীম-র স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবী ও আমি ছিলাম। আমরা প্রথমে সকলে দেওঘরে নামিয়া বৈদ্যনাথ দর্শনাদি করিয়া পরবর্ত্তী গাড়ীতে কাশী যাত্রা করিলাম। কাশীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীমা বিশ্বনাথের আরতি ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বিশ্বনাথের মন্দির হইতে হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন। তখন আমার ভাবাবস্থা হইয়াছিল।"

কাশী হইতে পরে সকলে অযোধ্যা যাত্রা করিলাম। সেইস্থানে একরাত্রি বাস করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। যোগীন মা শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। পথে ও শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন দিয়া

বলিয়াছিলেন—"ওগো, হাতে সোনার ইষ্টকবচ (শ্রীশ্রীঠাকুরের) অমন করে রেখেছ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে।" তখন শ্রীমার তন্দ্রাভঙ্গ হইল এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া কবচখানি হাত হইতে খুলিয়া টিনের বাক্সের মধ্যে রাখিলেন।

বৃন্দাবনে বাস। বৃন্দাবনে শ্রীমাকে লইয়া আমরা সকলে বংশীবটে কালাবাবুর কুঞ্জে উঠিলাম। তথায় অবস্থান কালে শ্রীমার শ্রীরাধার ন্যায় বিরহভাব হইয়াছিল। শ্রীরাধা যেমন তাঁহার প্রাণবধূর বিরহে ব্যাকুলা হইতেন, শ্রীমাও সেইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরহে ব্যাকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলাস্থলে ও নিধুবনের সন্নিকটে ৺রাধারমণের মন্দির, যমুনা-পুলিন প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন এবং ঘন ঘন ভাব সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে আদেশ দিয়াছিলেন: "যোগীনকে তুমি ইষ্টমন্ত্র দান করিবে।" ক্রমাগত তিন দিন এইরূপ আদেশ পাইয়া পূজা করিতে করিতে শ্রীমা ভাবাবেশে যোগীনকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমা বৃন্দাবনে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি যোগীন মহারাজ, লক্ষ্মীদিদি ও যোগীন মাকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বার গমন করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নখ ও কেশের কিয়দংশ (যাহা তাঁহার সঙ্গে ছিল) ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা জয়পুর ও পুষ্করতীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে অবশিষ্ট নখ ও কেশাদি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীমা ব্রজমণ্ডলের নানাস্থান পদব্রজে পরিক্রম করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা শ্রীরাধার ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

শ্রীমার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। বৃন্দাবনে একবৎসর বাস করিয়া শ্রীমা যোগীন মহারাজ, লাটু, গোলাপ মা ও যোগীন মার সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পরে বলরাম বসুর বাটীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া যোগীন মহারাজ ও গোলাপ মার সঙ্গে কামারপুকুরে যাত্রা করিলেন। অর্থাভাবে শ্রীমাকে অনেক পথ পদব্রজেই যাইতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট ভোগও করিতে হইয়াছিল।

গয়াধাম যাত্রা। শ্রীমা প্রায় ৭।৮ মাস দেশে থাকিয়া কলিকাতায় আসেন এবং বেলুড়ে গঙ্গাধারে রাজু গমতার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। তৎপরে কলিকাতায় শ্রীম-র বাড়ীতে আসিয়া ১২৯৪ সালের মধুমাসে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে তাঁহার গর্ভধারিণীর পিণ্ডদানার্থে বুড়োগোপালের সঙ্গে গয়াধামে যাত্রা করেন। শ্রীমা বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া বুড়োগোপালের সঙ্গে বুদ্ধগয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় বুদ্ধগয়া মঠের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীমা তাহার সন্ন্যাসী সন্তানগণের দুঃখ ও কষ্ট স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন তাহাদের জন্যও একটি সুন্দর মঠ তৈরী হয়। তাঁহার প্রার্থনার ফলেই এখন বেলুড় মঠ হইয়াছে। তিনি বলিতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই বেলুড় মঠটী হইয়াছে।"

গয়াধামে শ্রীমা তাঁহার জননীর পিণ্ডদান করিয়া কলিকাতায় ১২৯৫ সালের কার্ত্তিক মাসে ফিরিয়া আসেন এবং নীলাম্বর মুখার্জ্জীর বাগান বাড়ীতে গোলাপ মা ও যোগীন মার সঙ্গে ছয়মাস বাস করিয়াছিলেন। তখন যোগানন্দ স্বামী শ্রীমার সেবা শুশ্রূষা করিত এবং তখনই আমি শ্রীমার স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। সেই স্তোত্র শুনিয়া শ্রীমা আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।" সেই সময়ে শ্রীমা আমাকে স্বহস্তে রুদ্রাক্ষের জপের মালা দিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীমা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ ও যোগানন্দের সঙ্গে পুরীধামে গমন করেন। সেখানে সন ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বলরাম বাবুদের ক্ষেত্রবাসীর মঠে বাস করেন। পুরীতে একদিন শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া গিয়া জগন্নাথজীকে দেখাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন। পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমা বলরাম বাবুদের বাটীতে কয়েকদিন ছিলেন, পরে আঁটপুরে বাবুরাম মহারাজের বাড়ীতে গমন করেন। সঙ্গে নিরঞ্জন, যোগীন, তুলসী ও আমি ছিলাম। সেখানে এক সপ্তাহ বাস করিয়া আমরা গরুর গাড়ীতে তারকেশ্বর তীর্থ হইয়া কামারপুকুরে গমন করি। সেখানে ৫।৭ দিন থাকিয়া আমরা শ্রীমার সঙ্গে আবার বলরাম বাটী গমন করি। এখান হইতে শ্রীমার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া হরিদ্বার যাত্রার জন্য Grand Trunk Road দিয়া যাত্রা করি। তুলসী আমার সঙ্গে যাইতে ব্যগ্র হয়।

শ্রীমা এই সময়ে কামারপুকুরে প্রায় একবৎসর থাকেন এবং ১২৯৬ সালের শেষ ভাগে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে শ্রীমর বাটীতে উঠেন, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া বলরাম বসুর বাটীতে গমন করেন। বলরাম বসু তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। যাহা হউক ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ বলরাম বসু দেহ রক্ষা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিত্যধামে উপস্থিত হইলেন।

১২৯৭ সালে শ্রীমা যখন ঘুষুড়ির ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নরেন আসিয়া তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে গান শুনাইয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া পশ্চিম দেশের তীর্থ দর্শন মানসে ও তপস্যা করিতে গমন করিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতেই গিরিশ ঘোষ সর্বপ্রথম শ্রীমার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে সাধু নাগ মহাশয়ও শ্রীমার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। *

---

* শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে এই লেখাটী স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের স্বহস্তলিখিত বাংলা 'জীবনকথা' হইতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

অদ্বৈতবাদ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

যদি বলা হয়—এস্থলে পুরুষপদে নির্গুণ ব্রহ্ম ধরিয়া তাহার একপাদে এই বিশ্বভূত—এইরূপ অর্থই স্পষ্ট বলিয়া ইহাই ইহার অর্থ বলিব ? কিন্তু তাহা হইলে অন্য দোষ ঘটিবে। যেহেতু নির্গুণ পুরুষের যে পাদে বিশ্বভূত সে পাদে যখন বিশ্বের লয় হয়, তখন সেই পাদের সহিত অন্যপাদের ভেদ থাকে কি—না ? যদি না থাকে, তবে পাদকল্পনা ব্যর্থ। আর যদি থাকে তবে তাহাকে পুরুষ বা ব্রহ্ম বলিয়া লাভ নাই ; কারণ অনন্ত বস্তুর মধ্যে যাহাই উৎপন্ন হইবে, তাহাই তাহার এক চতুর্থাংশ বা কোন পরিমিত অংশ বলা যায় না। কারণ, অনন্তের অংশ-কল্পনা সম্ভব হয় না। ব্রহ্ম যে অনন্ত অখণ্ড অকল, তাহা তো অন্য শ্রুতিতে বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ এই বিশ্ব বলায় ইহা অনন্ত ব্রহ্ম নহে, কিন্তু পরিমিত ব্রহ্ম বলিতে হইবে। নচেৎ এই বিশ্ব তাঁহাতে নিশ্চয়ই কল্পিত বলিতে হইবে। আর 'দিবি' বলায় দিব্ বস্তুটী ইহার আধার হইতেছে এবং তাহার অমৃত তিনপাদ আধেয় হইতেছে। অতএব দিব পদবাচ্য অনন্ত ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ পুরুষ সগুণ ব্রহ্ম বা বিরাট্ ব্রহ্মই হইবে। আর তাহা হইলে এই শ্রুতি নির্গুণব্রহ্ম বিষয়কই নহে, আর তজ্জন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম যে এক অদ্বৈত, তাহা এতদ্দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে।

(৩) "আদিত্যো ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ, তস্য উপব্যাখ্যানম্।
অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সৎ আসীৎ, তৎ সমভবৎ,
তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত * *।" ৩।১৯।১

অর্থাৎ "আদিত্যই ব্রহ্ম ইহাই উপদেশ। তাহার ব্যাখ্যা এই। এই জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল, তাহা সৎ হইল, তাহা সম্যক্‌রূপে উৎপন্ন হইল। তাহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল * *।"

এস্থলে জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না—বলায় মূলে এক অদ্বৈতের কথাই বলা হইল। আর জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল বলায় অসদ্রূপ শূন্যই ছিল বলা যায় না। কারণ, আদিত্যই ব্রহ্ম - এই বাক্যে সদ্বস্তুরই জ্ঞান অগ্রে হইয়াছে। তাহার পর এই জগৎ সৎ হইল—বলায় এই জগৎ যে উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে ছিল, তাহাও বলা যায় না। কারণ, অসৎ পদের দ্বারা তাহা ছিল না, ইহাই বলা হইল। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত মতও সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ অসৎ জগৎ 'সৎ হইল বলায় রজ্জুতে সর্প ছিল না, সর্প হইল, এই বাক্যের ন্যায় বিবর্ত্তবাদই উপদিষ্ট হইল, বলিতে হইবে। মিথ্যা অর্থই এই যে, যাহা নাই তাহা যখন দৃষ্ট হয়, তখন তাহাকেই মিথ্যা বলা হয়। অতএব সৃষ্টির মূলে এক অদ্বৈতেরই কথা

এতদ্দ্বারা বলা হইল। শ্রুতি এ কথা না বলিলে জগৎ দেখিয়া তাহার মূলের যে একত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাতে জগতের সূক্ষ্মাবস্থা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শ্রুতি তাহা বলেন নাই। অতএব অদ্বৈতের জ্ঞান শ্রুতি হইতেই জানা গিয়াছে, শ্রুতিই অদ্বৈত উপদেশ করিয়াছেন।

তাহার পর "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই কথায় বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদই খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ, এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল বলায় জগদ্রূপে জগৎ ছিল না—বলা হইল। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জগৎ জগদ্রূপেই সূক্ষ্ম ভাবে ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজমান ছিল—ইহা বলা হয়। সুতরাং তন্মতে জগৎকে অগ্রে অসৎ ছিল বলা যায় না। কিন্তু অদ্বৈত মতে তাহা বলা যায়। যেহেতু অদ্বৈত মতে জগৎ মায়ার পরিণাম, সেই মায়া মিথ্যা অর্থাৎ নাই অথচ প্রতীত হয়। অতএব এই বাক্যটী অদ্বৈতবাদেরই অনুকূল এবং এতদ্দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত মত বারণ করাই হইল, এই ভাবের কথা তৈত্তিরীয় ২।৭।১ স্থলে কথিত হইয়াছে, এবং সুবালোপনিষদেও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। অতঃপর ৪র্থ এবং ৫ম অধ্যায়ে বিবিধ উপাসনার কথা বলিয়া ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আবার তত্ত্বকথা দেখা যায়। এজন্য এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য।

ইহার প্রথমেই "একবিজ্ঞান সর্ব্ববিজ্ঞানের" কথার অবতারণা করিয়া, যথা—

"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"

অর্থাৎ যাহার দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হইয়া যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হইয়া যায়, এবং অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া যায়—ইহা বলিয়া ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা হইল—

"যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ংমৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।"

অর্থাৎ যেমন এক মৃৎপিণ্ড জানিলে সমুদায় মৃন্ময় বিজ্ঞাত হয়, বিকারটী বাক্যের চেষ্টা মাত্র, উহা নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।

ইহা হইতে একব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং শুদ্ধ অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

অতঃপর জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

(৪) সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্
তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্
তস্মাৎ অসতঃ সজ্জায়ত।" ৬।২।১
কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ ইতি হোবাচ
কথম্ অসতঃ সজ্জায়েত ইতি,
সৎ তু এব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। ৬।২।২
তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি, তৎ তেজোঽসৃজত,
তত্তেজ ঐক্ষত, বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি, তদপোঽসৃজত।

তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষঃ তেজস·
এব তদ্ অধি আপো জায়ন্তে। ৬।২।৩
তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি ইতি।
তা অন্নম্ অসৃজন্ত, তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠম্
অন্নং ভবতি, অদ্‌ভ্য এব তৎ অধি অন্নাদ্যং জায়তে"। ৬।২।৪

অর্থাৎ "হে সোম্য ! ইহা অগ্রে একই অদ্বিতীয়—সৎই ছিল। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন ইহা অগ্রে একই অদ্বিতীয় অসৎই ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছে।৬।২।১

'কিন্তু হে সাম্য! ইহা কি করিয়া ইহা হয়—তিনি বলিলেন; কি করিয়া অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে? কিন্তু হে সোম্য! ইহা অগ্রে একই অদ্বিতীয় সৎই ছিল।৬।২।২

তিনি আলোচনা করিলেন—'আমি বহু হই, আমি উৎপন্ন হই'। তখন তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, সেই তেজ আলোচনা করিলেন—'আমি বহু হই, আমি উৎপন্ন হই।' তখন তিনি জল সৃষ্টি করিলেন। সেজন্ত পুরুষ যখন কোথায় শোক করে বা ঘর্মাক্ত হয়, সে স্থলে তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হয়।৬।২।৩

সেই জল আলোচনা করিলেন 'আমি বহু হই, আমি উৎপন্ন হই,' তখন সেই জল অন্ন সৃষ্টি করিলেন। এইহেতু যখন সেখানে বৃষ্টি হয় সেই স্থলে বহু অন্ন হয়।" ৬।২।৪

এস্থলে সৃষ্টির পূর্ব্বে একই অদ্বিতীয় সদ্ বস্তুই ছিল—ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল। একন্ত আমরা শ্রুতি হইতেই সেই এক অদ্বৈতের সন্ধান পাইয়াছি, নচেৎ অন্ত প্রমাণদ্বারা এই অদ্বৈতের জ্ঞান হওয়া আমাদের সম্ভবপর নহে। এই শ্রুতি হইতে পরমাণু, আকাশ, প্রকৃতি ও জীব প্রভৃতি বহু সৎ যে ছিল, তাহাও সিদ্ধ হয় না। কারণ, একই অদ্বৈত সৎই ছিল বলায় বহু সৎ থাকা সিদ্ধ হয় না। আর "সৎই ছিল" বলায় যে, সকল পদার্থ সদা সদাত্মক পদবাচ্য, অর্থাৎ যাহাদের একদেশ বিকৃত হয়, অথবা যাহাদের কালভেদে বিকার স্বীকার করা যায়, এমন কোন বস্তুই ছিল না—বলা হইল। সুতরাং মৃত্তিকা পিণ্ড যেমন ঘটশরাবাদি রূপে পরিণত হইলেও আবার কালে মৃৎপিণ্ডেই পরিণত হয়—এতাদৃশ কোন বস্তুই ছিল না, অথবা বৃক্ষাদি হইতে ফল ফুল হইলেও বৃক্ষকে যেমন সেই বৃক্ষই বলা হয়, পিতা মাতা হইতে সন্তান জন্ম হইলেও যেমন সেই পিতামাতা বলিয়া স্বীকার করা হয়—এরূপ কোন বস্তুই ছিল না বলা হইল। কিন্তু তথাপি ব্যবহার কালে জীব জগৎ স্বীকার করা হয় বলিয়া এই জীব-জগৎকে মিথ্যাই বলা হইল। জীব নিত্য বলিলে আর একই অদ্বৈত সৎই ছিল—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। পরমাণুও প্রকৃতি বিকৃত হইয়া জগতে পরিণত হইয়া আবার প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাঁও একই অদ্বৈত সৎ-ই হয় না। স্তায়মতে আকাশ, মন প্রভৃতি নিত্য বলিয়া তাহারাও"একই অদ্বৈত সৎ-ই"বাক্যের দ্বারা নিবারিত হইল। আর অসৎ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না বলিয়া শূন্তবাদীর শূন্তও সিদ্ধ হয় না। এইরূপে এই শ্রুতি হইতে সৌ

এক অদ্বৈতেরই সন্ধান লাভ হইল। অতঃপর তৃতীয় খণ্ডে অণ্ডজাদির উৎপত্তি ও ত্রিবৃৎকরণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেও অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—

(৫) সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রো দেবতা
অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি ।৬।৩।২
তাসাং ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবাণি ইতি সেয়ং
দেবতা ইমাঃ তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেন আত্মনা
অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ।৬।৩।৩

অর্থাৎ "সেই সংস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—"আচ্ছা আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতাতে অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্ন নামক দেবতাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি।" ৬।৩।২

"আমি এই তিন দেবতাকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করি। অনন্তর তিনি জীবাত্মরূপে এই সমুদায় দেবতার অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন।" ৬।৩।৩।

এতদ্দ্বারা বুঝা গেল, সেই সংস্বরূপ দেবতাই জীব হইয়াছেন, আর তজ্জন্য জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ মূলে একই অদ্বৈত তাহা জানা গেল।

যদি বলা যায়, তিনি জীব হন নাই, জীব ছিল, তাহাদের সহিত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়। কিন্তু একথা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে "অনেন জীবেন আত্মনা" এই 'আত্মনা' পদ না দিলেই হইত। এজন্য জীবাত্মরূপে অর্থাৎ জীবাত্মা হইয়া—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। আর এজন্য তৈত্তিরীয় ২।৬ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বৃহদারণ্যক ১।৪।৭ "স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" অর্থাৎ তিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট—এই শ্রুতি স্মরণ করা যাইতে পারে।

যদি বলা হয়, তাহা হইলে এই সদ্‌বস্তুতে এই জীবজগৎ বীজরূপেই ছিল বলিতে হয়, সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়? না, তাহাও নহে, কারণ, তাহা হইলে "তৎসৃষ্ট্বা" বাক্য-বিরুদ্ধ হয়, এই জন্য সেই বীজ এস্থলে শক্তিরূপ বলাই উচিত।

যদি বল তাহা হইলে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়? তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। কারণ, শক্তি স্বীকার করিলে সৃষ্টি নিয়তই হইতে থাকিবে। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব এই শক্তি উৎপাদবিনাশশীল অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যাই বলিতে হয়।

তাহার পর ৪র্থ খণ্ডে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্বরূপ বর্ণন, এবং বিকারের মিথ্যাত্ব উপদেশ করিয়া এবং ৫ম খণ্ডে ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে আদি দেবতাত্রয় হইতে শরীর মন, প্রাণ ও বাক্যের উৎপত্তি ও স্বরূপ বর্ণন করিয়া ৭ম খণ্ডে শ্বেতকেতুর উপবাস দ্বারা ১৬শ কল পুরুষের পরিচয় দান করিয়া ৮ম খণ্ডে সুষুপ্তির পরিচয় মুখে আবার অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

(৬) উদ্দালকো হ আরুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রম্ উবাচ—
স্বপ্নান্তং মে সোম্য ! বিজানীহি ইতি।
যত্র এতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,
স্বম্ অপীতো ভবতি, তস্মাৎ এনং স্বপিতি ইতি আচক্ষতে,
স্বং হি অপীতো ভবতি।" ৬।৮।১

অর্থাৎ উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য ! আমার নিকট সুষুপ্তিতত্ত্ব অবগত হও। যখন এই পুরুষ স্বপিতি অর্থাৎ সুষুপ্ত হয়, হে সোম্য ! তখন সে সত্তা অর্থাৎ সৎ স্বরূপের সহিত সম্পন্ন হয় অর্থাৎ মিলিত হয়, তদা অর্থাৎ সে সময় পুরুষ স্বম্ অর্থাৎ আপনাকে অপীত হয় অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য ইহাকে অর্থাৎ এই পুরুষকে স্বপিতি অর্থাৎ নিদ্রা যাইতেছে বলা হয়। এই কথাই আবার ৯ম খণ্ডে মধুকর ও বৃক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হইল।

"এবমেব খলু সোম্য ! ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি" ৬।৯।২

অর্থাৎ সমুদায় প্রাণী সুষুপ্তি সময়ে সৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে, আমরা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি।" কিন্তু সুষুপ্তির পর জাগ্রত হইলে নিজ নিজ ভাব প্রাপ্ত হয়। পূর্বে ৬।৮।২ বাক্যে পক্ষীর দৃষ্টান্ত মন প্রাণে আবদ্ধ বলা হইল এবং ৬।৮।৩ বাক্যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বিষয় বলিয়া শরীর কারণবিহীন নহে বলা হইল। এবং ৬।৮।৪ বাক্যে সৎস্বরূপই ভূতসমূহের মূল বলা হইল। যথা—

(৭) "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
সৎপ্রতিষ্ঠাঃ"। ৬।৮।৪ এবং ৬।

অর্থাৎ "হে সোম্য এই সমুদায় প্রজা সন্মূলক সদায়তন এবং সৎপ্রতিষ্ঠ।" এস্থলে সমুদায় প্রজা বলিতে যাবতীয় জন্মবান্ পদার্থ বলা হইল। ইহাদের মূল সৎ, ইহাদের আয়তন অর্থাৎ স্থিতি সৎ এবং ইহাদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ লয়ও সৎ—বলায় এই সমুদয় সেই সদ্বস্তুতে কল্পিতই বলিতে হয়। যেহেতু কারণবস্তুটী বিকৃত হইয়া কিছু উৎপন্ন হইলে সেই উৎপন্ন বস্তুর তাহাতে বিলয় হইলেও ঠিক কারণস্বরূপে তাহা আর স্থিত হয় না। আর তজ্জন্য এই সমুদায় মিথ্যাই বলা হয়, আর মিথ্যার অধিষ্ঠান সেই সদ্বস্তু যে এক অদ্বৈত—তাহাও সুতরাং বলা হইল।

যদি বলা হয়, সুষুপ্তিকালে পুরুষ যদি সত্তের সহিত সম্মিলিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই অবস্থার ভঙ্গ হয় কেন ? অতএব তখন পুরুষ অজ্ঞান থাকে বলিতে হইবে ; আর তজ্জন্য পুরুষ ও সৎপদবাচ্য ব্রহ্ম ঠিক্ অভিন্ন হয় না, কিন্তু তন্মধ্যে ভেদও থাকে আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত মতই সিদ্ধ হয় ? অদ্বৈতবাদ তো সিদ্ধ হয় না ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, এই অজ্ঞানের যদি ব্রহ্মের ন্যায় সত্তা থাকিত, তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতবাদ সিদ্ধ হইত। কিন্তু এই অজ্ঞান অধিষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নাশ হওয়ায় ইহাকে মিথ্যা বলিতে হইবে। এজন্য পরিণামে অদ্বৈতই থাকে বলিয়া অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। আর পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে যে আর ফিরে না, তাহাও "ন পুনরাবর্ত্ততে" শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। অতএব অজ্ঞান নষ্ট হয়, চিরকাল থাকে না। আর তজ্জন্য তাহা ব্রহ্মবৎ সত্য নহে, অর্থাৎ মিথ্যাই হয়। বস্তুতঃ অজ্ঞান যদি যথার্থই থাকিত, তাহা হইলে তাহার নাশ অসম্ভব হইত। সত্তার কখন নাশ হয় না। "নাভাবঃ বিদ্যতে সতঃ" এই গীতাবাক্যও ইহাতে প্রমাণ, অতএব এতদ্দ্বারা বিশুদ্ধ অদ্বৈতের কথাই বলা হইল। বস্তুতঃ এই সুষুপ্তির কথা বৃহদারণ্যকে আরও স্পষ্টভাবে ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হইয়াছে। তাহার পর এস্থলে দেখা যায় বলা হইতেছে—

(৮) "স য এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং
স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি"। ৬।৮।৭

অর্থাৎ সেই যে এই সূক্ষ্মতম সদ্বস্তু, এতদাত্মক—এই সব, অর্থাৎ তাহাই জগতের আত্মা, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তাহাই তুমি"।

এস্থলে পূর্ব্ববাক্যে যে সদ্বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, তৎস্বরূপই এই সব বলায় এবং তাহাকেই সত্য বলায় তদ্ভিন্ন রূপে প্রতীত এই সব যে মিথ্যা, তাহাই বলা হইল। আর বহুবের আশ্রয় এই সব বলায় সেই সদ্বস্তু যে এক অদ্বৈত, তাহাই বলা হইল। আর তাহাকে আত্মা বলায়, আর "সেই আত্মাই তুমি শ্বেতকেতু" বলায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদও বলা হইল। অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তই উক্ত হইল, অন্য কোন মতবাদের কথা বলা হয় নাই।

যাহারা বলেন অদ্বৈততত্ত্ব যখন উপদেশবিশেষ হইতেছে, তখন শিষ্যকে জীব বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর তাহাকে ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিতে হইবে, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—তাহাদের কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, সেই সদ্বস্তুকে আত্মা বলায়, আত্মাকে আর আত্মভিন্ন বলা যায় না। কারণ, "আমি আমাভিন্ন" একথা কেহই কখনও অনুভব করে না। পক্ষান্তরে স্বপ্নে যেমন আমিই দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আমা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করি এবং জাগ্রতে যেমন তাহার বিলয় আমাতেই হয় বলিয়া স্বপ্নদৃশ্য মিথ্যা বলা হয়, এস্থলেও তদ্রূপ যাবদ্ দৃশ্য মিথ্যাই হয়। আর সেই দৃশ্যের আশ্রয় আমিরূপ সৎ-আত্মাই বর্ত্তমান থাকে—ইহাই বলিতে হইবে। দ্বৈতাদিমতে সেই দৃশ্যকে সত্য বলা হয়। এজন্য এই শ্রুতি দ্বৈতাদির সমর্থক হয় না, কিন্তু অদ্বৈতেরই বোধক হয়। ঘট-শরাবাদি আকার যেমন মৃত্তিকার তুলনায় মিথ্যা, কারণ, তাহাদের সত্তা মৃত্তিকা সত্তার অধীন, এস্থলেও জীব ও জগতের তদ্রূপ ব্রহ্মের আকারবিশেষ বলিয়া ব্রহ্মাপেক্ষা ন্যূনসত্তাক অর্থাৎ মিথ্যা

বলা হয়। আর দৃশ্য মিথ্যা হওয়ায় তাহার অধিষ্ঠান সেই সৎ আত্মবস্তু এক ও অদ্বৈতই হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই শ্রুতিটী ৮ম খণ্ড হইতে ১৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নয়বার উক্ত হওয়ায় ইহাতে "অভ্যাস" থাকে, আর তজ্জন্য ইহাতেই উপনিষদের তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। সুতরাং উপনিষদের তাৎপর্য্য এক অদ্বৈতত্ত্বে—ইহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

যদি বলা হয়, উক্ত বাক্য মধ্যে "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এইরূপ অংশবিশেষ থাকায়, ইহাকে "স আত্মা অতত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এরূপ পাঠ করা যায়, আর তাহা হইলে সেই সদ্বস্তু ও আত্মা পৃথক্ বস্তু হইল, সুতরাং অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। মাধ্ব সম্প্রদায় এইরূপ কথা বলিয়াও থাকেন, ইত্যাদি।

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" বলায় শ্বেতকেতুর আত্মা আর পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করা যায় না। "সর্ব্ব" পদের মধ্যে এই আত্মাও গৃহীত হইবার কথা। তাহার পর "তৎ সত্যং" বলিয়া এই আত্মাকে সদ্বস্তুকেই বলা হইয়াছে, এখন আত্মাকে তদ্ভিন্ন বলিলে আত্মা আর সত্যবস্তু হয় না। আর আত্মা মিথ্যা হইলে সত্য কোন বস্তুকে স্বীকার করাও সম্ভবপর হয় না। আমি মিথ্যা, কিন্তু আমি ভিন্ন বস্তু সত্য—এরূপ বলিবার সামর্থ্য মিথ্যা আমির কখনই নাই। আমি সত্য না হইলে অন্য বস্তুর সত্যতা অপ্রসিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব "অতত্ত্বমসি" পাঠ করা একান্তই অসঙ্গত।

যদি বলা যায় "তত্ত্বমসি" এই পাঠই করিব, কিন্তু অংশাংশী সম্বন্ধ দ্বারা উপপত্তি করিব? অর্থাৎ জীবাত্মাগুলি সেই সদ্ ব্রহ্ম বস্তুর অংশ বা অঙ্গ বলিব? অংশকে যেমন অংশীর নামে নির্দ্দেশ করা হয়, যেমন বৃক্ষশাখাকে বৃক্ষ বলা যায়, এস্থলেও তদ্রূপ বলিব? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইবে, অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইবে না? কিন্তু একথাও অসঙ্গত। কারণ অঙ্গাঙ্গী বা অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে অংশ ও অংশীভিন্ন বস্তুসত্তার স্বীকার প্রয়োজন হয়। সেই অতিরিক্ত বস্তুটীকে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এই "সর্ব্ব" পদবাচ্য মধ্যে আর গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ "সর্ব্ব" পদের অর্থ সংকোচ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু অদ্বৈতমতে সেরূপ সংকোচ করা আবশ্যক হয় না। সুতরাং "তাহা তুমি" এইরূপ অর্থ করিয়াও অংশাংশী সম্বন্ধদ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধ করা যায় না।

তাহার পর যাহার অংশ থাকে তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বলিতে হয়, পরিচ্ছিন্ন বস্তু কখন নিত্য হয় না। আর একদেশ বিকৃত হওয়ায় সেই অংশীকেও বিকার্য্য বলিতে হয়। অধিক কি, দ্বিতীয় বস্তুজন্য জীবাত্মা অভয় হইতে পারে না, সুতরাং শোক মোহের হাত হইতে নিষ্কৃতিও সম্ভব হয় না। আর তাহা হইলে একত্বার্থক বহুশ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। অতএব এক অদ্বৈতবাদ ভিন্ন কোন মতবাদেই শ্রুতির সাবলীল অর্থ থাকে না। এইরূপে তত্ত্বমসি এই নয়বার কথিত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সেই "এক অদ্বৈতেরই" সন্ধান পাওয়া গেল।

কেহ কেহ আবার তত্ত্বমসি এই বাক্যের 'তত্ত্বং' পদটীকে একটী সমস্ত পদ বিবেচনা করিয়া "তেন ত্বম্ অসি", "তস্মৈত্বম্", "তস্য ত্বম্ অসি" "তস্মিন্ ত্বম্ অসি" এইরূপ ৩য়া তৎপুরুষ, ৪র্থী তৎপুরুষ, ৫মী তৎপুরুষ, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ এবং ৭মী তৎপুরুষ সমাস করেন। এই সকল পথেই অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়। কিন্তু এরূপ সমাস করা অসঙ্গত। কারণ, শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করিয়া তত্ত্বমসি বলা হইতেছে। এই তত্ত্বমসি বাক্যের "তৎ" পদার্থের কথা "তৎ সত্যম্ স আত্মা" এই অব্যবহিত পূর্ব্ব বাক্যে বলা হইয়াছে। এখন "সেই সত্য আত্মাকে তুমি" অথবা "সেই সত্য আত্মার তুমি" এইরূপ কিছু বলিবার জন্য "তত্ত্বং" এইরূপ সমাস করিবারও কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। সমাস করিলে আর তৎপদার্থের প্রাধান্য থাকিবে না, কিন্তু ত্বং পদার্থের প্রাধান্য হইয়া যাইবে। কিন্তু এখানে তৎপদার্থের প্রাধান্য প্রকরণ হইতেই জানা যায়।

তাহার পর তত্ত্বং পদের সমাস করিলে যখন কর্ম্মধারয়, ৩য়া তৎপুরুষ, ৫মী তৎপুরুষ, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ও ৭মী তৎপুরুষ—এতগুলি সমাস হইতে পারে, তখন কোন্ সমাসটী অভিপ্রেত, তাহা আবার নির্ণেয় হইয়া উঠিবে। এস্থলে এই অর্থান্তর সম্ভাবনা নিরাসের জন্য সমাস না করাই সহজ পথ ছিল। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিবার কারণ নাই।

তাহার পর "স এষ অণিমা" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" "তৎ সত্যম্" "স আত্মা" এই সব পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে উদ্দেশ্য বিধেয় ক্রমে বক্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখানে সহসা "তত্ত্বমসি" স্থলে "তত্ত্বং" পদের সমাস স্বীকার করিলে সেই ক্রমের ভঙ্গরূপ দোষ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ তাহার তুমি বা তাহাতে তুমি বা তাহা হইতে তুমি বা তাহার জন্য তুমি বা তাহার দ্বারা তুমি—এইরূপ কোন অর্থ বুঝাইবার জন্য "তস্য ত্বম্ অসি, তস্মিন্ ত্বম্ অসি, তস্মাৎ ত্বম্ অসি, তস্মৈ ত্বম্ অসি, তেন ত্বম্ অসি" না বলিয়া তত্ত্বমসি বলিতে গেলে অস্পষ্টতাদোষ অনিবার্য্যই হইবে। স্পষ্টার্থের জন্য এস্থলে "তস্য ত্বম্ অসি" এই জাতীয় অসমস্ত বাক্যরচনাই স্বাভাবিক পথ। সমাস করিলে এরূপস্থলে স্পষ্টার্থতার যে অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়া থাকে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অতএব এস্থলে তত্ত্বমসি বাক্যের 'তত্ত্বং' পদটী যে সমস্ত পদ নহে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং "তৎ ত্বম্ অসি" অর্থাৎ তাহা তুমি হও—এইরূপ সহজ অর্থই এস্থলে সঙ্গত, আর তজ্জন্য তৎ-পদার্থের সহিত ত্বং-পদার্থের যে অংশাংশী সম্বন্ধ নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তৎ-পদার্থের সহিত ত্বং পদার্থের অভেদই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

যদি বলা হয়, দুইটী পদার্থ মধ্যে তো অভেদ বলা যায় না। অভেদ হইলে দুইটী পদার্থই হয় না। অতএব অভেদ কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, অজ্ঞানবশতঃ একবস্তুকে পৃথক্ বলিয়া ভ্রম হইলে তাহার নিবারণার্থ এরূপ অভেদ কল্পনা অসঙ্গত হয় না। চক্ষুদোষে একচন্দ্রকে দুইটী বলিয়া ভ্রম হইলে তাহার একত্ব উপদেশ

কখনই অসঙ্গত হয় না। এইরূপ এস্থলে অনাদি অজ্ঞানবশে জীবের ব্রহ্মত্বে ভ্রম হইয়াছে, তাহার বারণার্থ 'তুমি ব্রহ্ম' বলা সঙ্গত হইবে না কেন?

যদি বলা হয়—তৎ-পদে বৃহৎ ব্রহ্মের কথা যদি বুঝিতে হয়, এবং ত্বং-পদে যদি এই ক্ষুদ্র দেহে আবদ্ধ জীবাত্মাকে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অংশ জীব এই অর্থই তো এস্থলে সহজ অর্থ হয়। অতএব অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকারই এস্থলে সঙ্গত। কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" বলায় জীবকে তো এতদাত্মক বলা হইয়াছে। জীব কেন বাদ যাইবে? "ঐতদাত্ম্য" অর্থে—ইহা যাহার স্বরূপ তাহার ভাব। অতএব "ইহা পদবাচ্য বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাই জীবের স্বরূপ—বলা হইল। অতএব জীব আর তাহার অংশবিশেষ হয় না। বস্তুতঃ জীব "আমি" বলিতে ঠিক্ একবস্তুকে বুঝে না। দেহ, প্রাণ, মন নানা বস্তুকেই নানা সময় বুঝিয়া থাকে, অতএব এই অজ্ঞাননাশের জন্য তত্ত্বমসি বলা হইয়াছে বলিলে তো কোন অসঙ্গতি হয় না। এজন্য এতদ্দ্বারা সম্পূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্বেরই কথা বলা হইল অন্য মতবাদের কথা বলা হয় নাই।

তাহার পর জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্তও পৃথক্ হয়, তাহা হইলে জীবের জ্ঞানের উপর সেই ব্রহ্মের সত্তা সিদ্ধ হইবে। আর তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম মিথ্যাই হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ এই অত্যন্ত ভেদ না স্বীকার করিলে আর অংশাংশিভাব সম্ভবপর হয় না। অতএব জীব ব্রহ্মকে অভিন্নই বলিতে হইবে।

প্রার্থনা

শ্রীনবশশী দেবী

হে রুদ্র!
চিরদিন অগ্নিবেশ করিয়া ধারণ
তাহারি তাপেতে সদা করেছ দহন,
আধ্যাত্মিক বলে তারে পশ্চাতে সরায়ে
শান্তচিত্ত হয়ে ছিনু গুরুনাম নিয়ে।
পারের প্রতীক্ষা নিয়ে আছি দাঁড়াইয়া,
এখনও ফিরাও মোরে ভূত নাচাইয়া।
হে রুদ্র! এ উগ্রবেশ করি পরিহার,
শিবরূপে লয়ে যাও ভবসিন্ধু পার।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

(শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য)

স্বামী বিবেকানন্দের চরিতাখ্যায়কগণ ঠিকই বলিয়াছেন যে, আয়াসসাধ্য কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার ইতিহাসে স্বামী অভেদানন্দের কার্য্যবিবরণী একটি অতিশয় গৌরবপূর্ণ অধ্যায়। (a splendid record of arduous work well done)। তাঁহার প্রভাবের মধ্যে যাহারাই আসিয়াছেন তাঁহাদিগের হৃদয়েই উহা চিরজাগরুক শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছে। মার্কিন-যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ষ্টেটগুলির বিশিষ্ট পত্রিকা যেমন—The Sun, The New York Tribune, The Critic, The Literary Digest, The Times, The Intelligence and Mind, পূর্ব্বাপর তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যার ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের অকাতর পরিশ্রমের পর পরই স্বামী অভেদানন্দের তদ্রূপ পরিশ্রম, নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সোসাইটীকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছিল। ইউনিটি চার্চের কর্তৃপক্ষদিগের নিমন্ত্রণে স্বামী অভেদানন্দ চার্চে রবিবাসরীয় ধর্ম্মব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং সমবেত জনমণ্ডলী তাঁহার 'সুনীতির সত্যকার পাদপীঠ' সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। শুধু ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় লইয়া যে সকল পত্রিকা আলোচনা করিয়া থাকেন সে সবেও মধ্যে মধ্যে যে সমুদায় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিলেই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, মার্কিন-ধর্ম্ম-যাজকদিগের মধ্যে বেদান্ত আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। উদার মতাবলম্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতেছেন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া আলোচনাকারী মনস্বীবর্গও যে বেদান্তকে সশ্রদ্ধ হৃদয়ে মানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। (১)

পাঠকদিগের বোধ হয় স্মরণ আছে যে স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৬ সালের ৬ই আগষ্ট একজন অপরিচিত ও সহায় সম্বলহীন সন্ন্যাসীরূপে নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে আসিয়া পাইয়াছিলেন একটি নাম-সর্ব্বস্ব ("Nominal") নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সোসাইটী। সে সোসাইটীর সদস্য সংখ্যা তখন ছিল সেক্রেটারী সহ ৫ জন ! পর বৎসর এপ্রিল মাসের মধ্যেই মহারাজ বেদান্তকে যে ভাবে সর্ব্বজনসমাদৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিত হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত মন্তব্যটি তাহারই পরিচয় দিতেছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে ইহাই মনে হয় যে মাত্র ৮।১০ মাসের মধ্যেই মহারাজ মার্কিনে·

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), Vol III, Page 349.

যে বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা যে-কোনো প্রচারকের পক্ষেই অত্যন্ত শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। মহারাজ ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের "আপন হাতে ও ছাঁচে গড়া" প্রিয় শিষ্য। সেই জন্যই তাঁহার অমোঘ শক্তি মহারাজের ভিতর দিয়া মার্কিনে ক্রীড়া করিতেছিল। মহারাজের জয়-যাত্রা ছিল যেন স্বয়ং ঠাকুরেরই জয়-যাত্রা।

আট্‌লান্টা সাইকলজিক্যাল সোসাইটীর সভানেত্রী Mrs. Rose M. Ashby এই সময়ে একবার আট্‌লান্টা গেজেটে লিখিয়াছিলেন—স্বামীজি (স্বামী অভেদানন্দ) ইউনিটেরিয়ান্ চার্চে 'Spiritual Unfoldment' বা "আত্মবিকাশ" সম্বন্ধে ৮টী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই ক্লাশ-লেক্‌চারগুলি শুনিবার জন্য অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভেচ্ছু বহু লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।…এই বক্তৃতাবলীর শেষ দুইটী ছিল ঈশ্বরানুভূতি বিষয়ক। আধ্যাত্মিকতার মান হতে উহাদের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে হয় যে সে দুইটী বক্তৃতা যেন দুইটী মাণিক! বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃবর্গের তখন এইরূপই মনে হইয়াছিল দেবতার নিশ্বাস যেন আসিয়া গায়ে লাগিতেছে! এই ভাব তাঁহাদিগের অন্তরে চিরদিন জাগরূক থাকিবে। (The two final lectures of this course on God-consciousness were gems of spiritual worth and the Divine afflatus by all will always linger.) (২)

হৃদয় জয় আর কাহাকে বলে? মহারাজ যে মার্কিণদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন কোন ব্যাক্তি এখনও সন্দিহান! তাঁহাদিগকে মিসেস্ রোজের উক্ত মন্তব্য পাঠ করিতে বলি। ইউনিটেরিয়ান্ এবং ইউনিভার্স্যালিষ্ট ধর্ম-যাজকগণ তাঁহাদিগের আপন আপন ধর্ম মন্দিরের বেদীর উপর স্বামী অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন এবং মহারাজ খৃষ্টান নরনারীগণকে বেদান্তের ভাবে সার্বভৌম ধর্মতত্ত্ব শুনাইতেন। ৯ই মার্চ্চ তারিখের প্রভাতে মহারাজ ইউনিটেরিয়ান্ চার্চে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার পশ্চাতে এমনি একটা ঐশ্বরিক শক্তি বিরাজ করিতেছিল যে শ্রোতৃবর্গ অনুভব করিয়াছিলেন যেন স্বয়ং ভগবানই সত্য সত্য তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়াছেন! যতক্ষণ ধরিয়া সেই বক্তৃতা হইয়াছিল তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাহা যেন তাঁহাদের জীবনে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও আত্মোন্নতির কাল স্বরূপ হইয়া রহিল। (on account of the Spiritual power behind it and the veritable Power of the Presence will go down in the lives of those who heard it as an hour of inspirations and uplift……) আমাদের এই স্থানে তাঁহার শুভাগমন ও এ স্থান হইতে পুনর্যাত্রা যেন (আমাদের মধ্যে) প্রেমকে বৃদ্ধি করিয়াছে, ঐক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং মিলন ও শান্তির ভাবকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল করিয়াছে। (His coming and

(২) বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

going has left a spirit of love, harmony and a greater feeling of unity and peace) (৩) ইহাই কি হৃদয় জয় করা নহে ?

দেখিতে পাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের Toronto Lady Guy's Column-এ লিখিত হইয়াছিল—গত সপ্তাহে স্বামী অভেদানন্দের আগমনে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে একটি পরম বিস্ময়ের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে এবং অন্তরে অন্তরে একটি আকর্ষণ ও আনন্দের ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামীজির পিতৃপুরুষদিগের ধর্ম্মমতের যে ব্যাখ্যা তিনি এখানে শুনাইয়াছেন, তাহাতে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি, যাঁহারা বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।..........স্বামী অভেদানন্দ একজন অসীম শক্তিশালী ধর্ম্মাচার্য্য। তিনি যে শিক্ষা দিতেছেন তাহার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বাপেক্ষা এখনই অনেক বেশী। তাঁহার উপদেশ ও ব্যক্তিগত চরিত্র শ্রোতাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। (......Swami Abhedananda whole visit to Toronto last week touched a note of wonder, of interest, of pleasure and inspiration, which vibrates in the hearts and souls of scors of thoughtful persons who heard him speak upon the religion of his fathers in India.........Swami Abhedananda is a great teacher, and the lessons he teaches are needed today as they have never been needed before......) (৪)।

সন্দিগ্ধচিত্ত প্রাজ্ঞগণ যদি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি-ভঙ্গী সহকারে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি হইতে আলোক সংগ্রহপূর্ব্বক সেই আলোকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন "প্রতীচ্যের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে" মহারাজের স্থান কোথায় ছিল ! স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের জীবন-কথায় ফুটিয়া উঠিতেছে কিনা—শুধু ইহাই ঐতিহাসিকের বিচার্য্য। ভক্তের অন্তর লইয়া ঐতিহাসিক সমালোচকের দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে গেলে শুধু ব্যর্থতাকেই বরণ করিতে হয়। ভক্তির আসন কেবল ভক্তেরই হৃদয়ে, কিন্তু ঐতিহাসিক যে আসন স্থাপন করেন অনন্তকালের হৃদয় তাহার ভিত্তি! ভক্ত এবং ভক্তিহীন একত্রে উভয়কেই সেই আসনের সম্মুখে নতশির হইতে হয়—ইহারই অপর নাম ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা !

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের New York Times-কে বলিতে শুনি—শ্রোতৃবর্গে বক্তৃতার হলটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বিশেষ মনোযোগ সহকারে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

(৩) বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

(৪) ঐ

অত্যাশ্চর্য্যরূপে লোকের হৃদয় জয় করে (*Remarkable winning personality* । (৫)। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও দুরূহ তত্ত্বগুলি মনোজ্ঞ করিয়া বলিবার ক্ষমতাও তাঁহার যথেষ্ট। ১৮৯৬ সালের নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন মহারাজের বক্তৃতা এবং প্রচার-কার্য্যের আলোচনা কালে বলিয়াছিলেন—বক্তা হিসাবে তিনি আত্ম-সংযমী এবং লোকচিত্তাকর্ষণকারী। তাঁহার ভাষণগুলি সুস্পষ্ট। দার্শনিক তত্ত্বগুলি কিরূপে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত একত্র গ্রথিত তদ্বিষয়ে স্বামীজির ব্যাখ্যা, মৌলিক ব্যাখ্যা। তাঁহার উচ্চারণও যেমন নির্দ্দোষ, ইংরাজি ভাষার উপর তাঁহার অধিকারও তেমনি সুসম্পূর্ণ। (৬)

মিঃ ওয়েণ্ডেল্ টমাস্ কর্ত্তৃক লিখিত ১৯৩০ সালে নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'Hinduism Invades America' নামক গ্রন্থের সহিত হয়ত অনেকের পরিচয় নাই। পুস্তকের মুখবন্ধের প্রথম পংক্তি এইরূপ:—"This work is not an attack on Hinduism"—হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থের শেষে যে "Book List" আছে তাহা সত্যই ভীষণ! সেই বিপুল গ্রন্থরাশি এবং "Notes"-এ লিখিত গ্রন্থাবলী অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের কোন বিদ্যা মন্দিরের আচার্য্য মিষ্টার ওয়েণ্ডেল্ তাঁহার বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের অবতরণিকাতে (Introduction) মিষ্টার হ্যারি এমার্সন্ ফস্ডিক্ বলিয়াছেন—ভারতের ধর্ম্ম যীশু খৃষ্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া উপায় নাই এবং ভারতের ধর্ম্ম-মত কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত না হইয়া আমেরিকার ধর্ম্মমতের টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে! (There is no possibility of Indian religion escaping the influence of Jesus Christ, and there is no possibility of American religion escaping the influence of the great Indian faiths) খুবই প্রশস্ত উক্তি বটে!

যাহা হউক এই বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিলে এইরূপ ধারণা হইবে—অন্ততঃ আমার হইয়াছে যে "There is no possibility of Indian religion escaping the influence of Jesus Christ"—ইহাই দেখাইবার জন্য Hinduism Invades America লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মতবাদ যেরূপভাবে মার্কিণে প্রচার করা হইতেছে তাহাই গ্রন্থকারের প্রধান আক্রমণের বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দ, ও স্বামী অভেদানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী প্রমানন্দ ও অখিলানন্দ পর্য্যন্ত সকলের বিষয়েই কিছু না কিছু মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে। এমন কি স্বয়ং ঠাকুরও গ্রন্থকারের দৃষ্টি এড়াইতে পারেন নাই! গ্রন্থকার বলেন ঠাকুরের "human affection was further

(৫) বিশ্ববাণী—পৌষ, ১৩৩৭

(৬) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) Voll. III, Page 349.

developed by his friendship with Keshab Chandra Sen, that Hindu lover of Jesus Christ....Not by his own Hindu-minded investigation of Christianity, but by his contact with Christian culture did Ramakrishna come to place a certain Christian stress on Hinduism (P. 62 63)* এইরূপ অসার উক্তির কোন কারণ দেখি না! মোট কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ conservative Hinduism—এর প্রচারক এবং যীশু খৃষ্টের প্রভাবেই তাঁহারা বিষয় বিশেষে উদার মতাবলম্বী—যথা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান অঙ্গ জন সেবা! "This zeal for social welfare seems to have come from Christianity, not from his (Swami Vivekananda) master Ramakrishna who always felt a disgust for service" (২৮১ পৃষ্ঠা)। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ব্বভৌম মতবাদ, যাহা ভারতের শত সহস্র বৎসরের সাধনলব্ধ সিদ্ধি তাহা যখন মার্কিণের মন হরণ করিয়াছে তখন বিরুদ্ধ বাদীকে এই ভাবেই (গ্রন্থকারের কথায়) "Ramakrishna Movement কে" খাটো করিবার চেষ্টা না করিয়া নাস্তি গতিরন্যথা!

গ্রন্থের ৬৪ হইতে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতে বার বার এই কথাই মনে হইয়াছে যে একটা বিদ্রূপের সুর (Bantering note) বরাবর যেন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বলিতে বলিতে গ্রন্থকার ৭৪ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করিয়াছেন—"Again he met a delightful lady, and all was well. American ladies and American reporters, each in their own way, made the handsome oriental famous!" (ii)—ইহাকেই বলে—গরজ বড় বালাই!

কলিকাতার Y. M. C. A-র সেক্রেটারী Dr. Wilbor W. White-এর দোহাই দিয়া বলিয়াছেন যে মিষ্টার হোয়াইট্ আমেরিকার নানা নরনারীকে পত্র লিখিয়া জানিয়াছেন যে "To the main body of Americans, Swami Vivekananda was at most *a passing fad*, leaving no permanent impression. Some of the writers had *only vaguely heard of him*......(২৮২ পৃঃ)।

গ্রন্থকারের আর একটি অদ্ভুত মন্তব্য এইরূপ :—

"He (স্বামী বিবেকানন্দ) realized that India needed Christ to quicken her civilization but on account of his national pride, he refused to surrender to Christ any fundamental Hindu doctrine. As might be supposed, the favourite book of the order was the Bhagavad Gita"—(৭১ পৃষ্ঠা)। ইহার পর শুধু এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়—হায় হিন্দু ভারত, এমন একখানি গ্রন্থ এ দেশে বিক্রীত হয়!*

গ্রন্থকার বলিতে চাহেন—যাহা ভারতের নহে, যাহা কোন দিন ভারতের ছিল না

এবং যাহা ভারতের কোন দিনও নাই—ভারতকে সেই সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বররূপে প্রচার করিয়া স্বামীজির 'National pride পরিস্ফুট হইয়াছে! ইহাকেই বলা হইয়াছে "*Exaggerated praise of India*" এবং তাহার ফলে ঘটিয়াছে—"anarchist movement in Bengal and the more recent drives for 'Civil Disobedience' which Manmohandas Karamchand Gandhi, the saintly politician, has been organizing on a nation-wide scale" (৯১ পৃষ্ঠা)। দেখা যাইতেছে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে সন্ত্রাসবাদ জন্ম লাভ করিবার বহু পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াও নিষ্কৃতি পান নাই! গ্রন্থকারের মতে স্বামীজি নাকি এইরূপ উপদেশও দিয়াছেন যে, শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ভারতে সমুন্নত সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মাংসাদি আমিষ ভোজনে ভীত হইবে না—এমন কি প্রয়োজন হইলে গোমাংসও ভোজন করিবে!! ("H must even give up his horror of meat and *become a beef eater if necessary* in order to grow strong enough to build up once more a flourishing civilization on the soil of India" —৯১ পৃষ্ঠা) এই সকল উক্তিকে বিরুদ্ধবাদীর 'revealation' ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

এসব ব্যক্তিও স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন নিম্নে তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ কৌশলে ইতিহাসকে এড়াইয়া (Naive freedom from historical detail) বক্তৃতা করিতেন (১১১ পৃষ্ঠা) এবং মুখে বলিতেন আমরা কাজ চাই, বক্তৃতা চাই না—কিন্তু এত বক্তৃতাই করিলেন যে তাহা সাত খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হইল (What we want is action, not speech, said Vivekananda, and spoke seven volumes full—৮৭ পৃষ্ঠা)। এইরূপ বিষোদ্গার করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—

ইতিহাসের দিকে এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা অধিক মন দেওয়ায় স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সহিত বেদান্তকে বেশী মানাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন। আলাময়ী বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতাদিগকে পরাজিত করিতে চেষ্টা না করিয়া, মনোজ্ঞ যুক্তিবলে এবং নূতন নূতন মনোহর উদাহরণাদির দ্বারা তিনি শ্রোতাদিগকে বক্তব্য বিষয়টী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে তাঁহার নিরামিষ আহার সম্বন্ধীয় অভিভাষণ। এই বিষয়টীর অন্তরালে যে সকল যুক্তি আছে সেগুলি নিজের প্রভাবেই চিত্ত আকর্ষণ করে। আবার যেমন মোটামুটি কারণ দর্শাইয়া তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যদি আমরা বলি খৃষ্টানের বাইবেল (ধর্ম্ম পুস্তক) ভগবানের মুখ-নিসৃত বাণী, তাহা হইলে যেখানে যে বাইবেল (ধর্ম্ম গ্রন্থ) আছে তাহাকেই ঈশ্বরের বাণীরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিবেকানন্দ প্রেততত্ত্বকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মত স্বামী অভেদানন্দ বলেন নাই যে আমেরিকার প্রেততত্ত্ব আমেরিকার একটা সস্তা মাল যাহা ভারতের অনন্ত অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহাকে পরাজিত করিতে চাহে! স্বামী অভেদানন্দ

সোজা-সুজি বলিতেন যে পাশ্চাত্য মিডিয়মের সাহায্যে প্রেতগণের সহিত কথোপকথন করিয়া শিখিবার মত নূতন কিছু তিনি পান নাই। তাই তাঁহার বিশ্বাস হয় যে সেখানে প্রেতগণ এখনও এই পৃথিবীর আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াই আছে এবং সেইজন্য প্রেতগণ (মানুষের মত) অজ্ঞ।

পাশ্চাত্য যাহা চায় তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এই দেহকে ঘৃণা করিতেন এবং মন্ত্রদ্বারা রোগারোগ্যের ব্যাপারকেও ঘৃণা করিতেন বটে (Scorned the body and works of healing) কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ খৃষ্ট-বিজ্ঞান-মতের (Christean Science) সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং যাহাতে ঐ প্রকারে রোগারোগ্যবিদ্যা লোকে শিক্ষা করে তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতেন (Encourages the study of healing power)। তবে তিনি বলিতেন যে এই বিষয়ের উন্নতিকল্পে আমেরিকা এখন যাহা করিতেছে, বেদান্ত বহুদিন পূর্ব্বেই তাহা করিয়াছে। পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার অভিমত একেবারে আধুনিক ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদের অভিমত। ঈশ্বর-মানব-পশু-উদ্ভিদ্ এইরূপ জীবন চক্রের আবর্ত্তন হইতে পরিত্রাণ লাভই বাঞ্ছনীয়। জন্মান্তরবাদপ্রসঙ্গে তিনি এই চক্রটী গ্রহণ করেন নাই। এই বিশ্বে আত্মার গমনাগমন যে বিশেষ একটা উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত এবং আত্মাও যে সৃজনী শক্তি সম্পন্ন ও ক্রমবিবর্ত্তন-সাপেক্ষ এই মতবাদের উপরই স্বামী অভেদানন্দ বেশী জোর দিতেন।

উপসংহারে বলি, তিনি যে ভাবে কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যজগতের আদর্শানুমত ব্যাখ্যা। গীতার কর্ম্মবাদ ফলাসক্তিশূন্য। প্রাচীন বৈদিক কর্ম্মবাদে বিশেষ ফলের জন্য বিশেষ কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। রামানুজের ন্যায় স্বামী অভেদানন্দও এই দুইটীকে মিলাইয়া লইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 'আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যগুলি কোন উচ্চ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার উপায় মাত্র। তিনি আরও বলেন যে স্বার্থশূন্য সকল সৎ কর্ম্ম পরিশেষে শান্তি, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুখ আনয়ন করে। শ্রীমদ্গীতায় ও বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগে বলা হইয়াছে যে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থলেশ শূন্য ও ফলাসক্তিহীন হইয়া কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ মার্গ, স্বামী অভেদানন্দের কর্ম্মযোগের সহিত ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

স্বামী পরমানন্দের সঙ্গে দেখিতে পাই সেই গোঁড়ামীরই পুনরাভিব্যক্তি (A return to conservatism)। স্বামী অভেদানন্দ যেমন ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য ধর্ম্মমতের আলোকে তাঁহার হিন্দু-বিশ্বাস ও মত গুলিকে আলোকিত করিয়া লন এবং উহাদিগকে সম্প্রসারিত করেন স্বামী পরমানন্দকে সেরূপ করিতে দেখি না। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শুধু গীতায় নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্বন্ধেই তিনি আলোচনা করিয়া থাকেন।

...এইরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমেরিকায় বেদান্তকে মার্কিন-সংস্কৃতির

সহিত মিশাইয়া প্রচার করার সুদূর পন্থাটী অবলম্বন করা হয় নাই। কেবল অভেদানন্দ ও জ্ঞানেশ্বরানন্দেই দেখিতে পাই যে এই মিলন প্রকৃত ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে (We notice considerable adoptation)……।

মার্কিনে 'রামকৃষ্ণ-মুভ্মেণ্ট' যে ক্রমেই প্রভাব-শূন্য হইয়াছে তাহার কারণ গোঁড়ামী পূর্ণ বাণীর গোঁড়ার ন্যায় প্রচার (conservatism of both message and method)। রামকৃষ্ণ-মুভ্মেণ্টের সদস্যদিগের বাহিরে এই মুভ্মেণ্টের প্রভাব আর বড় বেশী পরিলক্ষিত হয় না এবং সদস্য সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। ১৯০৬ সালে মাত্র মার্কিনে ৩৪০ জন সভ্য ছিলেন। ১৯১৬ সালে উহা ১৯০ হইয়াছে।……এই মুভ্মেণ্ট যে আর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অন্ততঃ দেখা যাইবে যে প্রথমতঃ এই মুভ্মেণ্ট তাহার নূতনত্ব (Novelty) হারাইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ স্বামী অভেদানন্দ প্রচারকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি তাঁহার বাণী ও প্রচার-পন্থা উভয়কেই মার্কিন-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত মিশাইয়া দিতেন (Who was willing to adjust himself to American institution in both message and method)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে তাঁহার "বেদান্ত বুলেটিন" নামক পত্রিকার গ্রাহক তিন সহস্রেরও অধিক ছিল। এই তিন সহস্র পত্রিকার ৩০০ শত বিনা মূল্যে বিভিন্ন পাঠাগারে ও ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। (Hinduism Invades America পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪, ১১০-১১২, ১২৫)।

এই সকল আলোচনা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার প্রতীচ্য মনোহরণকারী বেদান্ত-প্রচার কৌশলে মার্কিণের সর্ব্বশ্রেণীর এবং বিশেষতঃ "সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের" নিকট হইতে প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতেই মার্কিণে "রামকৃষ্ণ-মুভমেণ্ট" ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে! The failure to expand is probably due first to the wearing off of nevelty, and second to the *retirement of Swami Abhedananda* who was willing to adjust himself to American institutions in both message and method—Hinduism Invades America Page 115) তাঁহার মার্কিণ-প্রবাসের অতি সামান্য বিবরণই স্বামী বিবেকানন্দ-চরিতে এবং বেদান্তমঠের মুখপত্র 'বিশ্ববাণীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া গণ্যমান্য সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্ম্মযাজক, বৈজ্ঞানিক, পরিব্রাজক, গায়ক, শিল্পী, নানা ইউনিভার্সিটির বহুজনমান্য আচার্য্যগণ, বিদুষী নারী-সমাজ এবং কতকগুলি লব্ধ প্রতিষ্ঠ খৃষ্ট ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক মহারাজকে ঋষির প্রাপ্য ভক্তি ও পূজার অঞ্জলি প্রদান করিতেন। মার্কিণে "অনেক খ্যাতনামা বিদ্বান্ ও সমৃদ্ধিশালী অধিবাসী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ" করিয়াছিলেন। মহারাজ যে শুধু নিউইয়র্ক নগরে প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটী

লইয়াই মার্কিণে জীবন কাটাইয়াছেন, তাহা নহে। তিনি "নানা স্থানে বেদান্ত-প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বক কঠোর পরিশ্রম সহকারে হিন্দুর ধর্ম্মকথা প্রচার" করিয়াছিলেন এবং "ক্রমে সর্ব্বত্র পাশ্চাত্য দেশ সনাতন ধর্ম্মবন্যায় প্লাবিত" করিয়াছিলেন।

এই অভিনব ধর্ম্মভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের Brooklyn Standard Mission উহার নাম দিয়াছিলেন "Hindoo Cult" এবং বলিয়াছিলেন—তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ ওয়াশিংটনের Philosophical Society-র প্রচেষ্টায় কতকগুলি বক্তৃতা করেন। তদবধি ওয়াশিংটনে এই Hindoo Cult-এর জন্ম হয়। সে সময় যে সকল সুবিজ্ঞ পণ্ডিত স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতেন—তাঁহারা শুধু দার্শনিক তত্ত্বটুকু শুনিবার জন্যই সভায় যাইতেন। (This Hindoo Cult was established in Washington about 3 years ago, with a series of lectures given by Swami Vivekananda under the auspices of Philosophical Society...Their (যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সভায় আসিতেন) interest is *merely Philosophical* and does not conflict with their religious belief in the slightest degree) স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার প্রচার কৌশলে, এবং তাঁহার নিজ জীবনকে জীবন্ত উদাহরণ রূপে উপস্থিত করিয়া, স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে যে "Interest" ছিল "merely Philosophical" তাহাকেই আমেরিকার সুধীজনের জীবনযাত্রার অঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্ট তখন প্রায় উড়িয়া গিয়া "খৃষ্টত্ব" জন্ম লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টত্বই হইতে লাগিল তখন চিন্তাজগতের ধর্ম্মের রূপ। স্বামী অভেদানন্দ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে শুনাইতেন—The whole of animal life is moving towards *Christward*, for the word '*Christ*' is the name of the state of freedom and the highest spiritual enlightenment.

স্বামী অতুলানন্দ (Mr. Heyblom) স্বামী অভেদানন্দের একজন বিশেষ প্রিয় গুণগ্রাহ শিষ্য। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি হিমালয়ের নিভৃত গুহায় বাস করিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন। নিজের গুরুদেব সম্বন্ধে তিনি একবার এইরূপ বলিয়াছিলেন—কয়েকজন মাত্র আগ্রহশীল ছাত্র লইয়া স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় কার্য্যারম্ভ করেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ পচিশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রম আমেরিকায় বেদান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সে সময় যে বেদান্ত সোসাইটী ছিল শৈশবে, তিনি ধীরে ধীরে সেই সোসাইটীকে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখন সে সোসাইটী স্বামী অভেদানন্দের বিরাম-বিশ্রামহীন নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া আছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলীর দ্বারা বেদান্ত-সাহিত্য সম্পদশালী হইয়াছে। তাঁহার সুস্পষ্ট যুক্তিবাদ সেই সুদূর প্রতীচিকে তাঁহারই দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। যে সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাঁহার পরে তাঁহারই নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কি ভাবে স্বামী অভেদানন্দ

তাঁহাদিগের জন্ত পথ পরিষ্কার করিয়াছেন—নিউ ইয়র্ক সোসাইটীর বর্ত্তমান সমৃদ্ধ অবস্থা দেখিলেই লোকে এসকল বিষয় অনুমান করিয়া লইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। সেই জ্ঞান ও অজ্ঞানের পারে যাইতে হইবে, কারণ সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।" বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা ঠাকুরের অতুলনীয় বাণীতে বলিতেছি-"বিজ্ঞান কিনা তাঁকে (ব্রহ্মকে) বিশেষ ভাবে জানা। কাঠে অগ্নি আছে এই বিশ্বাস—এইটী বোধে বোধ। তার নাম জ্ঞান। কিন্তু সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়া,—তার নাম বিজ্ঞান।···তিনিই মায়ায় ঈশ্বর-জীব-জগৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, এইটী দর্শন করা; ইহারই নাম—ব্রহ্মবিজ্ঞান।···বিজ্ঞানী দেখলেন যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি···যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান্···যিনি গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। জীব-জগৎ, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-জ্ঞান, বৈরাগ্য এসব তাঁরই ঐশ্বর্য্য···।"

এই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মহামায়ার শরণাগত হইতে হয়। তিনি তুষ্ট না হইলে সকলই বৃথা—পরমব্রহ্ম ধাম লাভ করা যায় না। মহামায়ার দুইটী শক্তি—একটি বিদ্যা-মায়া, অপরটি—অবিদ্যামায়া। অবিদ্যা-মায়ার প্রভাবে জীব সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে, নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। বিদ্যামায়া জীবনের সকল বন্ধন-পাশ মুক্ত করিয়া দেন। সুতরাং ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা করাই উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজই সর্ব্বপ্রথমে এই মনোমুগ্ধকর মুক্তি-প্রচারক উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিয়া আমেরিকান্‌দিগের সম্মুখে স্বর্গের একটি নূতন দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন।

মহারাজের ডায়েরিতে এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—on Sunday, January 8th. (1899) at 3 P. M. I delivered a public lecture on "The Motherhood of God," *for the first time.* It was liked so much that it was printed in a pamphlet form and it ran through *Several editions* afterwards. •

• Leaves from my Diary—স্বামী অভেদানন্দ। বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী পি, এইচ্‌, ডি, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

রামায়ণ ও পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং পালি গ্রন্থসমূহে তক্ষশিলার নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। রামায়ণ হইতে জানা যায়, ভরত তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত নামে দুইটি নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধনরত্ন ও উদ্যানাদিতে এই দুই নগর সুসমৃদ্ধ ছিল। সেখানকার প্রজাবৃন্দ বেশ ধার্ম্মিক ছিল। উহাতে অনেক দোকান পাট, অট্টালিকা, সপ্ততল গৃহ ও দেব-মন্দির ছিল। তাল, তমাল, বকুল ও তিলক বৃক্ষের দ্বারা ঐসকল সুশোভিত ছিল। ভরত সেখানে পাঁচ বৎসর বাস করেন।[১] রামায়ণের বর্ণানুযায়ী রঘুবংশেও পাওয়া যায়, ভরত তাঁহার দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে দুইটি নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের নামানুসারে উহাদের নামকরণ করেন।[২] বায়ু পুরাণেও তক্ষের রাজধানীরূপে তক্ষশিলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৩] বৃহৎ-সংহিতাতে তক্ষশিলা উত্তর ভারতে একটি প্রধান নগররূপে তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে।[৪] ক্ষেমেন্দ্রকৃত বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা হইতে জানা যায় সম্রাট্ অশোক তাঁহার পুত্র কুণালকে তক্ষশিলা জয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তখন তক্ষশিলাতে কুঞ্জরকর্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। এইরূপ কথিত আছে, অশোকের মহিষী কুণালের বিমাতা তিষ্যরক্ষা তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তার নিকট এই মর্ম্মে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কুণালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন।[৫]

পালি সাহিত্যে বিশেষ করিয়া জাতকগ্রন্থে তক্ষশিলাকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা কেন্দ্ররূপে বারংবার উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন জাতক উপাখ্যান হইতে অবগত হওয়া যায়, তৎকালে তক্ষশিলা সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বারাণসী, রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, কোশল এবং উদীচ্যদেশের কুরু ও শিবিদের রাজ্য হইতেও বিদ্যার্থীরা উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তক্ষশিলায় আগমন করিত। কেবল তাহাই নহে। ৬০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে খ্রীষ্টোত্তর ৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত তক্ষশিলা সমগ্র প্রাচ্য খণ্ডেরই

১। রামায়ণ—উত্তর কাণ্ড, ১১৪ অধ্যায় ১১—১৬ শ্লোক (বঙ্গবাসী)

২। রঘুবংশ ১৫।৮৯

৩। বায়ুপুরাণ ৮৮ অধ্যায় ১৯০ শ্লোক (বঙ্গবাসী)

৪। বৃহৎ সংহিতা ১০।৮, ১৪।২৬, ১৬।২৬

৫। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা—৫৯,৭৫,৮৯, ৯০ অধ্যায়।

"শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, সিরিয়া, আরব, চীন, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশ হইতেও বিদ্যার্থিগণ তক্ষশিলায় আসিয়া অধ্যয়ন করিত।"

গৌতম বুদ্ধের বিদ্যমান কালে তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্র স্থান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে তক্ষশিলা বৌদ্ধদিগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ্ পাণিনি, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, কূশাগ্রধী রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ বিম্বিসারের সভাচিকিৎসক প্রখ্যাতনামা জীবক তক্ষশিলায় ভেষজ ও শল্যবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিথাগোরাস্ সম্প্রদায়ের দার্শনিক আপোলোনিয়াস্ জ্ঞানান্বেষণে তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার নৃপতি তাঁহাকে গ্রীক্ ভাষায় অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়, যেসকল গ্রীক পণ্ডিত তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন তাঁহারা তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণদিগের কঠোর তপশ্চর্য্যা ও অভিনব মতবাদে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ৪০০ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তক্ষশিলায় উপস্থিত হন, কিন্তু তিনি তক্ষশিলা সম্বন্ধে কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে অসভ্য শ্বেত-হূনগণ যখন গান্ধার হইতে কুষান রাজত্বের মূলোচ্ছেদ করে সেই সময়ে তাহারা তক্ষশিলায় বহু সৌধপরিশোভিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজেদের বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তৎপর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন হিউয়েন-সাঙ্ তক্ষশিলা পরিদর্শন করেন তখন তিনি তক্ষশিলাকে কাশ্মীর রাজ্যের অধীন, হৃতগৌরব এক ক্ষুদ্র জনপদরূপে পরিণত দেখিয়াছিলেন।

পালি জাতক গ্রন্থ হইতে আমরা তক্ষশিলার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। সেই যুগে দুই শ্রেণীর ছাত্র ছিল। যাহারা বিনা বেতনে আচার্য্যের গৃহে বাস করিত তাহাদিগকে দিনের বেলায় আচার্য্যের গৃহকর্ম্ম করিতে হইত এবং রাত্রিকালে পাঠ গ্রহণ করিতে হইত। আর যাহারা বেতন দিত তাহারা আচার্য্যের গৃহে "তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মত থাকিত।" তাহারা দিনের বেলায় পড়িতে পারিত। শারীরিক দণ্ড তখনও বেশ প্রচলিত ছিল। এক রাজপুত্রকে শারীরিক দণ্ডবিধান করা হইয়াছিল, একটি জাতকে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "চিত্রসম্ভূত" জাতক[৭] হইতে অবগত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালকদিগকেই তক্ষশিলাতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এক সময় দুইটি

---

6. "Taxila in her days was one of the focal points, one of the great resonators, as it were, of Asiatic Culture. Here between 600 B. C. to 500 A.D. met Babylonian, Syrian, Egyptian, Arab, Phoenician, Ephesian, Chinese aud Indian. The knowledge that was to go out of India must first be carried to Taxila, thence to radiate in all directions."

Sister Nivedita.

৭। জাতক সংখ্যা ৪৯৮। (ঈশানচন্দ্র ঘোষ-সংস্করণ)

চণ্ডাল যুবক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এক আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিল ; কিন্তু যখন যখন উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে তখন তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

তক্ষশিলায় যে সকল বিদ্যা শিখান হইত তাহাদের মধ্যে তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যার উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। পালি জাতকের কোথাও অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। অনেক স্থলে দেখা যায়, ছাত্রেরা কেবল শিল্প (সিপ্প) শিক্ষা করিতেছে। এখানে "শিল্প" বিদ্যা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

"কৌশেয়ী" জাতক[৮] হইতে জানা যায়, বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তক্ষশিলায় তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিচিত হন এবং ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের ও ব্রাহ্মণ বালকদের তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যা শিক্ষা দিতে থাকেন। "দুর্মেধো" জাতক[৯] হইতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত কুমার রূপে বারাণসী রাজের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করেন এবং তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যা আয়ত্ত করেন। "ভীমসেন" জাতক[১০] হইতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পরে একজন বিখ্যাত ধানুষ্ক হইয়া উঠেন। "অসদৃশ" জাতকে[১১] জানা যায়, বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া ধনুর্বিদ্যায় এতটা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে তিনি তীর উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়া ঐ তীরের নিম্ন-পাতন কালে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া ভূপতিত করিতে পারিতেন।

"শরভঙ্গ" জাতক[১২] হইতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব কোন এক পুরোহিত-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পরে তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে উত্তম খড়্গ, মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু, সন্ধিযুক্ত তূণীর, বর্ম্ম এবং উষ্ণীষ পারিতোষিক লাভ করেন। বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় পাঁচশত যুবককে শিক্ষা প্রদান করেন এবং তৎপর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসী রাজের আহ্বানে ধনুর্বিদ্যায় যে সকল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কৌশল প্রদর্শন করেন তাহা জাতকে বর্ণিত আছে। চারিকোণে চারিটি কলাগাছ রোপিত হইয়াছিল ; তিনি একবাণে সবগুলিকে বিদ্ধ করেন। এই কৌশলের

৮। জাতক সংখ্যা ১৩০

৯। জাতক সংখ্যা ৫০

১০। জাতক সংখ্যা ৮০

১১। জাতক সংখ্যা ১৮১

১২। জাতক সংখ্যা ৫২২

নাম চক্রবেধ। এতদ্ব্যতীত শরের লাঠি, শরের রজ্জু, শরের বেণি, শরের প্রাসাদ, শরের মণ্ডপ, শরের প্রাকার, শরের সোপান ও শরের পুষ্করিণী কি কৌশলে করিতে হয়, বোধিসত্ত্ব তাহা অদ্ভুত নৈপুণ্য সহকারে প্রদর্শন করিলেন। তিনি শরপদ্ম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা প্রস্ফুটিত করাইলেন, শরবর্ষ ঘটাইয়া বৃষ্টির আকারে শর পাতিত করিলেন। বোধিসত্ত্ব ৮ অঙ্গুলি পুরু একখানা কাঠের তক্তা, ১ অঙ্গুলি পুরু একখানা লোহার পাত, মাটি ও বালুকাপূর্ণ একটি গাড়ী তীর দ্বারা বিদ্ধ করেন। তিনি ১২০ হাত দূরে একগাছি চুল রাখিয়া দিয়া উহা যেমন বাতাসে কাঁপিতেছিল অমনি শর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন।

"সুসীম" জাতক[১৩] হইতে জানা যায়, বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় হস্তি-সূত্র বা গজশাস্ত্র শিক্ষা করেন। "চাম্পেয়" জাতকে[১৪] পাওয়া যায়, বারাণসীর এক যুবক তক্ষশিলাতে সর্প বশীভূত করিবার মন্ত্র শিক্ষা করেন। "বৃহচ্ছত্র" জাতক[১৫] হইতে অবগত হওয়া যায়, কোশল রাজকুমার তক্ষশিলাতে নিধিউদ্ধারণ মন্ত্র শিক্ষা করেন এবং সেই মন্ত্রের প্রভাবে মৃত পিতার লুক্কায়িত ধনরাশি আবিষ্কার করেন।

১৩। জাতক সংখ্যা ১৬৩

১৪। জাতক সংখ্যা ৫০৬

১৫। জাতক সংখ্যা ৩৩৬

জীবন-কথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

পরমহংসদেবের মহাসমাধি :

নরেন্দ্র, কালিপ্রসাদ প্রভৃতি সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় একদিন পরমহংসদেবের গলা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। এত রক্ত পড়িল যে তিনি তাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। একদিন রাত্রি ১টার সময় তাঁহার বালক ভক্তগণ পরমহংসদেবের নিকট বসিয়া আছে, সেদিন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার এবং পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত (Aug. 16th. 1886)। এমন সময় পরমহংসদেবের সমাধি হইল। তাঁহার দৃষ্টি নাসাগ্রের উপর স্থির হইয়া রহিল। নরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, অপর সকলেও তাঁহার সঙ্গে সমস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই আশা করিতেছিলেন যে অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে। তাঁহারা ঘন্টার পর ঘন্টা সমাধিভঙ্গের আশা করিয়া বসিয়া রহিলেন, ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। বেলা ৯টা হইল, তবুও তাঁহার সমাধি ভাঙ্গিল না। তখন তাঁহার বালক ভক্তগণ বিশেষ ভয় পাইয়া শ্রীশ্রীমাকে খবর দিলেন। তিনি আসিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং "মা তুই কোথায় গেলি গো" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেবকগণ এক

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামী-স্ত্রীর এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধের কথা ভাবিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন তাঁহার পত্নীকে মা কালীর রূপ বলিয়া জানিতেন, শ্রীশ্রীমাও তাঁহার স্বামীকে তেমনি মা কালী বলিয়া দেখিতেন এবং সেজন্যই তিনি ঐ নামে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক এ-অপূর্ব্ব সম্বন্ধ ও দৃশ্য পূর্ব্বে কোথাও কখন শোনা বা দেখা যায় না।

পরমহংসদেবের এই মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া নেপালের কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিলেন এবং বলিলেন মেরুদণ্ডে ঘৃত মালিশ করিলে হয়ত তাঁহার চৈতন্য ফিরিতে পারে। তখনই শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) গব্য ঘৃত মালিশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। অপরাপর ভক্তেরা সংবাদ পাইয়া একে একে আসিতে লাগিলেন। বেলা ১টার সময় ভক্তেরা মহেন্দ্রনাথ সরকারকে আনয়ন করিলেন। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'আর ঘি মালিশ করিলে কি হইবে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে প্রাণ বাহির হইয়াছে। এবার মহাসমাধি হইয়াছে, শরীর decompose হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন দেহের সৎকার করা হোক।' এই অবস্থার ফটো তুলিবার জন্য ১০৲ টাকা দিয়া ভক্তেরা সকলে চোখ মুছিতে মুছিতে শোকাকুল চিত্তে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেবকদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পতিত হইল। সকলেই মূহ্যমান হইয়া অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন!

পরমহংসদেবের জ্যোতির্ম্ময় শরীরটীকে তাহার পর সজ্জিত করা হইল, গলায় ফুলের মালা, পায়ে চন্দন, ফুল দিয়া একটী খাটিয়ার উপর শোয়ান হইল। তখন Bengal Photographer Co. দুইখানি ফটো তুলিয়া লইল। রামবাবু সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরেনকে কাছে দাঁড়াইতে বলিলেন। আর সকলে পশ্চাতে সিঁড়িতে দাঁড়াইলেন। বেলা ৫টার পর কাশীপুর হইতে ত্রিশূল, ওঙ্কার, খুন্তি, ক্রুশ, অর্দ্ধচন্দ্র প্রতীক (cross, crescent symbol) লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বরাহনগরের শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল, এবং শরীর দাহ করিবার জন্য ঘৃত, চন্দনকাঠ প্রভৃতি বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। তাঁহার বালক সেবকগণ সকলেই যোগদান করিলেন। তাঁহার পূত শরীর দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইয়া গেল। বালক শিষ্যগণ একটী তামার কলসে অস্থি সংগ্রহ করিয়া কাশীপুরের বাগানে লইয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি পরমহংসদেবের মধুর চরিত্র আলোচনায় কাটিল। তাঁহারা ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ প্রভৃতির সহায়ে তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে তাহারা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাহাদের ইচ্ছা হইতে লাগিল, যদি কাশীপুরের বাগানে তাঁহারা থাকিতে পান তাহা হইলে ভাল হয়। রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যাহারা বাগানের ভাড়া দিতেন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সেই মাসের শেষ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যেরা ঐ বাগানে থাকিতে পারিবেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পরে তাহারা কোথায় যাইবেন?

রামবাবু বলিলেন—তাঁহাদের আপন আপন বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে। তাহারপর পরমহংস-দেবের অস্থি কোথায় সমাধি দেওয়া হইবে তাহা তাহাদের চরম ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিল। রামবাবু বলিলেন—কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার যোগোদ্যান আছে, সেখানেই পরমহংসদেবের সমাধি দেওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরমহংসদেবের অস্থি গঙ্গাতীরে সমাধি না দিয়া রামবাবুর বাগানে দেওয়া হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পরে রাত্রিতে নিরঞ্জন বলিলেন—"আমরা ঠাকুরের অস্থি কিছুতেই দিব না"। তখন নরেন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরে সকলে যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, ঠাকুরের অস্থি কলস হইতে বাহির করিয়া একটী কৌটাতে রাখা হোক, এবং ঐ কৌটা বলরামবাবুর বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হইবে। রামবাবু যেন ইহা কিছুতেই টের না পান। শুধু কলসীটি রামবাবুকে দেওয়া হইবে। এই স্থির করিয়া সেই রাত্রে কলসী হইতে প্রায় সমস্ত অস্থিই বাহির করিয়া লওয়া হইল। যৎসামান্য অস্থির গুড়া, ভস্ম ও গঙ্গামৃত্তিকা মাত্র তাহাতে রাখা হইল। তখন নরেন বলিলেন,—"আমাদের দেহই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হোক। এস আমরা সকলেই তাঁহার দেহের ভস্ম একটু করিয়া খাইয়া ফেলি।" এই বলিয়া হামানদিস্তাতে অস্থি চূর্ণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ তাহা জিহ্বায় প্রদান করিলেন।*

এদিকে শ্রীমা যখন শোকাকুলা হইয়া সধবার চিহ্ন হস্তের বালা খুলিতে ও সিন্দুর মুছিতে গেলেন তখন ঠাকুর দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি বালা খুলিতেছ কেন? আমিতো মরি নাই। সুতরাং তুমিও বিধবা হও নাই।" তখন আর বালা খোলা এবং মাথার সিন্দুরও মুছা হইল না।

১২৯৩ সাল ৮ই ভাদ্র (ইং ২৪ আগষ্ট ১৮৮৬) বুধবার জন্মাষ্টমীর দিন তাহার ত্যাগী সন্তানগণ অস্থির কলসী লইয়া রামবাবুর বাটী হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যোগোদ্যানে লইয়া গেলেন। শশী কলসীটি মস্তকে ধারণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে কাঁকুড়গাছীতে মহাসমারোহে সমাধি দেওয়া হইল। তাঁহারা সেই রাত্রে কাশীপুরে চলিয়া আসিলেন।

শ্রীমা ইচ্ছা করিলেন কিছুকাল বৃন্দাবন গিয়া বাস করেন। তদনুযায়ী ১৮ই ভাদ্র সন্ধ্যার ট্রেণে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। যোগেন, কালীপ্রসাদ ও লাটু, গোলাপ মা ও মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীও চলিলেন। তাঁহারা যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কালাবাবুর কুঞ্জে উঠিলেন।

---

* স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁহার স্বহস্তলিখিত বাঙলা জীবনচরিতের পাণ্ডুলিপিতে এই ঘটনা যেভাবে ও যেভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এখানে ঠিক সেভাবেই দেওয়া হইল।

এদিকে গোপালদাদা, ছোট গোপাল প্রভৃতি কাশীপুরে ভাদ্র মাসের কয়েকদিন কাটাইতে লাগিলেন। নরেন, শশী, শরৎ, খোকা, রাখাল প্রভৃতি বালক ভক্তগণ আপন আপন বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। তারক (স্বামী শিবানন্দ) পূর্ব্বেই বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

গৃহস্থ ভক্তগণ প্রায়ই কাশীপুরে আসিতে লাগিলেন। সুরেশ বাবুর ইচ্ছা হইল যে, কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া দিলে অল্প ভাড়া দিয়া একটী ছোট বাড়ী লওয়া হইবে এবং সেখানে ঠাকুরের গদি, বাসন, পাদুকা, ইত্যাদি রাখা হইবে এবং গোপালদা, লাটু প্রভৃতি যাহাদের নিজ বাটী নাই তাঁহারা থাকিবেন। গৃহস্থ ভক্তগণও মাঝে মাঝে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশগুলির আলোচনা করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে বরানগর নিবাসী ভবনাথ (শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহস্থ ভক্ত) শুনিয়া বরাহনগরের বাজারের নিকট প্রামাণিক ঘাট রোড ভুবন দত্তের বাটী যাহা টাকীর মুন্সিদের ছিল সেখানে সংবাদ দিলেন। তাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর তলায় ছয়খানি ঘর দশটাকা ভাড়ায় ঠিক করিয়া সুরেশ বাবুকে তিনি খবর দিলেন।

সুরেশ বাবু মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া ভাড়া দিতে রাজী হইলেন। তখন কাশীপুর হইতে ঠাকুরের গদী, পাদুকা, গেলাস প্রভৃতি বাসন, ছোট গোপাল এবং গোপাল দা গাড়ী করিয়া লইয়া গেলেন। এইরূপে ১৮৮৬ সালের আশ্বিন মাসে বরানগর মঠের সূত্রপাত হইল। সেখানে নরেন প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানগণ, আপন আপন বাটী হইতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া সংকীর্ত্তনাদি করিয়া আনন্দ করিতেন ও রাত্রিও কাটাইতেন।

এদিকে কালিপ্রসাদ শ্রীমাকে লইয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। বৃন্দাবনে তাঁহারা কালীবাবুর কুঞ্জে উঠিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া কালীপ্রসাদের বৃন্দাবন পরিক্রমা করিবার ইচ্ছা হইল এবং বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিকট খবর লইয়া ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে বিদায় লইলেন। দুখানি কৌপীন, দুখানি বহির্বাস ও কমণ্ডলু লইয়া নিঃসম্বলে তিনি বৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে বাহির হইলেন। পথে বৈরাগী বৈষ্ণব বাবাজীদের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহারাও বনপরিক্রমা করিতে যাইতেছেন। কিন্তু কালিপ্রসাদের গৈরিক বস্ত্র দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদের প্রতি বৈষ্ণবদের অনেকের তখন তীব্র বিদ্বেষ ছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল, গৈরিকধারী সন্ন্যাসীরা সোঽহম্‌বাদী জ্ঞানী, সুতরাং তাহারা নাস্তিক ও পাষণ্ডের তুল্য। সেইজন্যই তাঁহারা কালিপ্রসাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু যেদিন কালিপ্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের গুণানু-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সুমধুর কণ্ঠে গোপীগীতা সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন সেইদিন বৈষ্ণব বাবাজীরা তাঁহাকে পরম কৃষ্ণভক্ত বলিয়া ধারণা করিলেন—এবং তাঁহাকে আর তখন হইতে মাধুকরী করিতে দিতেন না। এই পর্য্যন্ত কালিপ্রসাদ প্রত্যহ ৫।৭ বাড়ী ভিক্ষা করিয়া এক টুকরা ময়দার রুটী ও ডাল পাইতেন, তাহা লইয়া একান্তে বসিয়া আহার করিতেন। সেই সময় কালিপ্রসাদ একাহারী ও নিরামিষাশী ছিলেন। যেদিন হইতে

ব্রজবাসীরা তাঁহাকে পরম কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন, সেদিন হইতে তাঁহারা তাঁহাদের মাধুকরী হইতে তাঁহাকে রুটী, তরকারী প্রভৃতি ভিক্ষা দিতেন এবং কালিপ্রসাদ ভিক্ষায় বাহির হইতে উদ্যোগ করিলে তাঁহাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে দিতেন না। তাঁহারা বলিতেন—"আপনার ন্যায় পরম ভক্ত সাধু আমরা কোথায় পাইব? আমরা আপনার জন্য মাধুকরী আনিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন।"

সেইদিন হইতে কালিপ্রসাদ আনন্দে তাঁহাদের সহিত পরিক্রমা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নতা অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, এবং তিনি যে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিতেন তাহা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তিনি বৃক্ষের নীচে ব্রজের ধূলায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া থাকিতেন এবং প্রাতঃকালে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপে ৮৪ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া ২১ দিনের পরে বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া যোগেন ও লাটুর সঙ্গে আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তারককে তখন সেখানে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার খোঁজ নিতে গিয়া জানিলেন যে, সুরেশ বাবু বরাহনগরে মঠ করিয়াছেন শুনিয়া তারক মঠে বাস করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন। তাহা শুনিয়া কালীপ্রসাদের মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—'আমিও বরানগর মঠে যাইব।' তাহারপর তিনি যখন ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, তখন যোগেন বলিলেন যে মাষ্টার মহাশয়ের (শ্রীম-র) স্ত্রীকে লইয়া যাইতে হইবে, তিনি স্ত্রীকে সত্বর পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাও আদেশ করিলেন মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য। কালিপ্রসাদ মহাবিভ্রাটে পড়িলেন। অবশেষে ভাবিলেন, শ্রীমার আজ্ঞা আর অবহেলা করা উচিত নয়, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হোক। এই ভাবিয়া মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে (তখন মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীর পাগল অবস্থা) লইয়া কালিপ্রসাদ রওয়ানা হইলেন। মথুরায় আসিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন, এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি একজন সহৃদয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন এবং কালিপ্রসাদের বিপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে একটি খালি কামরাতে তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার হাতে একটী চাবি দিয়া বলিলেন—ট্রেণ বড় বড় ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে চাবী দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন এবং দরজায় দাঁড়াইয়া কাহাকেও উঠিতে দিবেন না। তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিয়া হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। [ক্রমশঃ]

বিবিধ

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর), বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী পরমারাধ্যা শ্রীসারদাদেবীর ঊননবতিতম শুভ জন্মতিথি-উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আরাত্রিক ও ভজনগান, পূর্ব্বাহ্ণে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, আরাত্রিক ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় আটশত ভক্তগণকে পরিতোষের সহিত প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বাহ্ণ এগার ঘটিকা হইতে সুললিত সঙ্গীত

সহযোগে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর লীলাকাহিনী কথকতা করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে বিমোহিত করেন। রাত্রেও বহু ভক্ত সমাগম ও তাঁহাদের প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিয়মিতরূপে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত" তথা "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত" সঙ্গীত সহযোগে কথকতা করিতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি খড়্গপুরে (মেদিনীপুর) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে কথকতা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে সুখ্যাতি-পত্র পাইয়াছেন তাহা প্রদত্ত হইল :

"শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ও শ্রীভগবদনুরাগীগণ কামনা ক'রে থাকেন ও তাঁদের জীবনের একমাত্র বা অন্যতম আকাঙ্ক্ষা এটা যে, হায়! শ্রীশ্রীঠাকুর যে সময় জীবিত থেকে তাঁর ভক্ত ও অন্তরঙ্গদের অমৃত পান করিয়ে অমর করেছিলেন যদি আমরাও সে সময় থাকতুম তা হ'লে যে আনন্দের জন্য আজ দ্বারে দ্বারে কাঙাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি নিশ্চয়ই সে অমৃতধারা পান ক'রে ভরপুর হ'য়ে যেতুম। ভক্তের এই যে নিরাশায়, ব্যাকুল বা হাহুতাশ ভাব শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝ্‌তে পেরেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকেন যদিও আমরা সকল সময়ে তা বুঝ্‌তে পারি না। অবশ্য তাঁর ভাব আমাদের মত সামান্য জীব কতটুকু বুঝ্‌তে পারি যদি তিনি কৃপা ক'রে বুঝিয়ে না দেন। মনে হয় এ ক্ষেত্রেও ভক্তদের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর স্কন্ধে চেপেছেন ভক্তপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যেও যাঁদের সৌভাগ্য হ'য়েছে তাঁর এই লীলামৃত কথকতা শ্রবণ করবার, তাঁরাও ভাবে বিভোর হ'য়ে ভাবেন—তাঁরা যেন ঠিক শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হতেই দিনের পর দিন তাঁর অমৃত বাণী শুনেছেন, আর আসল নকল বোঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী কিনা, তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তেরা এই অমৃত বাণী গুণী ও আদর্শ ভক্তের নিকট হতে শুনে তাঁদের নিজ নিজ ভাব নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক আনন্দে ভরপুর হ'য়ে বাড়ী যেতেন ও পুনরায় শোনবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পরদিন ফিরে আসিতেন—এটা আমি লক্ষ্য করেছি ও তাঁদের মুখ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বল্‌তে শুনেছি যখন তাঁরা আমাদের বাড়ীতে এই লীলামৃত শুন্‌তে এসেছেন। এ অমৃত বাণী কথকতার ভিতর দিয়া প্রচার করা শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা ছাড়া শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বাবুর দ্বারা কখনই সম্ভব মনে হয় না।

তাই আমাদের আন্তরিক কামনা যাহাতে ভক্তেরা এই লীলামৃত পান ক'রে আনন্দে বিভোর হ'য়ে যান। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বাবু দীর্ঘায়ু লাভ ক'রে সকল ভক্তদের মধ্যে নূতন ভাবে এই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিন।"

শ্রীঅমলচন্দ্র মিত্র, খড়্গপুর। ১।১২।৪১

গ্রন্থ-সমালোচনা

দর্শন (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৪৮ সাল। প্রকাশক—"বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্"। প্রাপ্তিস্থান—"দর্শন" কার্য্যালয়, ১২নং বিপিনপাল রোড, পোঃ কালিঘাট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য চারিটাকা, প্রতি সংখ্যা একটাকা।

"বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্"-এর উদ্যোগে 'দর্শন' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হওয়ায় বাঙালা ভাষার একটি দারুণ অভাব দূর হইল। ইতিপূর্ব্বে বাঙলায় কোন কোন মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় দর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে একথা সত্য—কিন্তু শুধু একমাত্র দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে কোন

কোন পত্রিকা এযাবৎ বাঙলা ভাষায় ছিল না। সুতরাং এই "দর্শন" পত্রিকার প্রকাশ বঙ্গভাষাভাষী দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগীদিগের পক্ষে যে আশা ও আনন্দের কারণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপকদিগের মধ্যে অন্যতম ডক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই নবপ্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও সে সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী রচনায় তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ। ইংরাজী ভাষায় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার গ্রন্থাবলীর ন্যায় বাঙলা ভাষাতেও দার্শনিক প্রবন্ধাদি রচনায় তিনি সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'দর্শন' পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় "দর্শনের স্বরূপ" নামক তাঁহার প্রবন্ধটি সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হওয়ায় তাহা সুযোগ্য স্থানই লাভ করিয়াছে। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, দর্শন পরাবিজ্ঞান (Super Science) অথবা বিজ্ঞান্ সমন্বয় (Synthesis of the Sciences) নহে। কারণ দর্শনকে যদি 'বিজ্ঞান সমন্বয়' বলাই হয় তাহা হইলে সেই "সমন্বয়" কেমন করিয়া সাধিত হইবে? এদিকে দেখা যায় বিজ্ঞানে কাল যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত ছিল আজ আর তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেছে না। বিজ্ঞান তাহার নিত্য নব তথ্য আবিষ্কারের ফলে পুরাতন সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার নূতন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ ভাবে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন "যুক্তি দ্বারা সমর্থিত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানই যথার্থ দর্শন"—আলোচ্য প্রবন্ধে ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। তাঁহার রচনা নৈপুণ্যে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বাঙলা প্রদেশে বহুমনীষী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের জন্য শুধু ভারতবর্ষেই নয় ভারতের বাহিরেও বহু দেশে সসম্মানে পরিচিত। কিন্তু এই সমস্ত সুধী ইঁহাদের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য বাঙলা দেশে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহবান অথচ ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহারা উক্ত পণ্ডিতবর্গের দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে পারেন না। শুধু তাহাই নয়, ইহার দ্বারা বাঙলা ভাষার দার্শনিক সাহিত্যও বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া তাহা বাঙালীজাতির গৌরব ও গর্ব্বের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য দর্শনের তো কথাই নাই ভারতীয় দর্শন সমূহের অনুবাদ-গ্রন্থের সংখ্যাও বাঙলায় অতি সামান্য। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকারের এক পত্র হইতে জানা যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর তৎকালীন সম্পাদককে Schwagler, Weber প্রমুখ দার্শনিক মনীষীদের গ্রন্থাবলম্বনে বাঙলা ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য তিনি একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু এ যাবৎ কাল সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার কোন সংবাদ জানা যায় নাই। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক সংস্কৃত ভাষা হইতে হিন্দীভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। এইদিক দিয়া হিন্দী ভাষা বাঙলা ভাষা অপেক্ষা বহুগুণে ঐশ্বর্য্যশালী। বাঙলা ভাষায় ভারতীয় দর্শন সকলের প্রামাণ্য ও প্রধান পুস্তকগুলি অনূদিত হইতে থাকিলে তাহাতে শুধু যে বাঙলা ভাষা ভাবে, গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ হইবে এমন নয় পরন্তু তাহাতে বাঙলা ভাষার গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইবে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় যে সকল দার্শনিক গ্রন্থ এখনও বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয় নাই—এই পত্রিকার শেষ অংশে যদি সেই গ্রন্থগুলির এক একটি করিয়া অনুবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে তাহা হইলে বিষয় গৌরবে ইহার প্রয়োজনীয়তা বর্দ্ধিত হইয়া ইহা দার্শনিক ও সুধী সমাজে আরও অধিকতর সমাদর লাভ করিবে।

The Scientific View of Death

Swami Abhedananda

THE GREATEST PROBLEM IN THE WORLD

In this age of commercialism and materialism few people think about death. They are rather afraid of it. They do not care to think what will happen after death either. They would rather live in this world, enjoy all the pleasures of life, make the best use of everything, and make a will, insure their life, or save a little money to pay the funeral expenses, and go on living. Out of the two thousand millions of people who inhabit this little planet, earth, forty millions of human bodies are disposed of every year, and a million tons of human flesh, bones and blood are thrown away as waste matter, as useless thing and are allowed to return to their elementary states. During the last war in Europe many millions of people were killed and were destroyed. Some of them were blown into atoms. But we do not think of that horrible scene. We have almost forgotten it, and we do not think for a moment that we shall die. We go on living and doing the same things as we did before. Our interest is not in solving the problem of death, although it is the greatest mystery in the world. It is as mysterious as the coming of life on this plane. But still we do not think much about it. Even the Christian Churches do not take such a lively interest in this problem of death today, as they did in the last century. They would rather busy themselves with questions—social, educational, and especially political problems of the day. The medicine-men of this age do not solve the problem of death, although hundreds are dying in their hands every year. They gather all the things that they can, and their ideal is to enjoy the pleasures of life, to make the best of their opportunity.

In the Mahabharata, the most ancient epic of the Hindus, we read a prize question that was asked to different great men of ancient times : "What is the most wonderful thing in the world ?" Various answers were given, but they were not satisfactory. The answer which Yudhishthira gave was accepted, and his answer was this : "Every day, and day after day, animals and human beings are passing out of life, but we do not think of death ; we think that we shall never die. What can be more wonderful than this ?" This answer was given nearly thirty-five

centuries ago, but the same truth prevails today. We do not think of death, although we see every day dead bodies carried to the grave right under our eyes.

MYTHOLOGY AND SCIENCE ON DEATH

The mystery of death is not solved by mythology or mythological beliefs of ancient peoples which have been handed down to us through generations. The scriptures of the Jews, the Christians, the Parsees, and the Mohammedans do not explain what death is. But in some of these scriptures, we find that God commanded the first man to do certain things, not to eat the fruit of the tree of knowledge ; but when the man did eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, the Lord cursed him and his curse brought death in this world. We read in Genesis, Chapter II, verse 17, the Lord commanded, "Of all the trees of the garden thou mayest freely eat ; but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it : for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." Of course, Adam did not die in the day when he was tempted and when he ate the fruit thereof, but he reaped the consequences afterwards and died later. This passage shows that at first God did not intend that man should die, but the death came to the world through the evil influence of Satan, the devil. It was Satan who brought death into this world. In fact, the curse was the cause, but the curse was brought about by the evil influence of the devil. Those who believe in this, that death was caused or brought about by Satan, do not care to think further about it. They leave this question as settled, and naturally they do other things and do not try to solve the problem. They think that, if it be the curse of God, it is an inevitable end of life, let us be satisfied with it.

Scientific researches, however, toward tracing the causes of death have brought out many truths and many laws which were unknown to the writers of Genesis and other scriptures of different nations. The orthodox science, or the materisalistic science, as it is known to us, which denies the existence of the soul as an entity, and also denies the existence of mind, or life, or intelligence, as distinct from the results of matter and material particles governed by physical forces and chemical actions, says that death is nothing but the cessation of life, an inevitable end which all beings come to. The scientists do not explain it elaborately because they do not know much about it. Still they try to explain that when the vital parts of the body wear out in this machine, then naturally the whole of the machine must stop. The vital parts are regarded as the heart, the lungs

and the brain. When any of these vital centres is worn out, or injured by disease or accident, then naturally the whole machinery or the body stops.

But here a question may arise, "Does the death of the conscious life imply the death of the life of the organs?" That is a very difficult question to answer. Or, in other words, when a person is dead, does it mean that the organs are dead also? On the contrary, science tells us, that the organs do not die immediately after the death of the body or the conscious life. For instance, if a chicken's head be cut off and its heart taken out and watched, it will continue to live for a long time after the death of the chicken. In fact, in the Rockefeller Institute, there is a heart of a chicken that has been kept for eight years, and it is still going, doing normal action. That shows that the organs have their independent life which may continue to live even after the conscious life of the individual is dead. In the same manner, it can be shown that the cells and tissues have their own life. They do not die, but they live for a long time after the death of the conscious life.

Modern science tells us that there are two kinds of death. One is the death of the conscious life; the other is the death of the organic and the cellular life, which is called somatic life. One does not depend upon the other. In fact, the life continues to exist, depending upon the natural process of the vital force which is known as the life force. But this materialistic science does not explain how it is that the organs, the cells, and the tissues continues to live; because it denies the existence of a vital energy or vital force as distinct from all other known forces of nature. On the other hand, it considers that this vital force is a result of the chemical actions of the atoms and molecules of the organism, and therefore, it cannot explain any further.

Professor Charles Minot, of Harvard Medical School, writes, in his book entitled *Old age, Growth and Death*:

"Differentiation leads, as its inevitable conclusion, to death. Death is the price we are compelled to pay for our organization, for the differentiation which exists in us. Death of the whole comes, as we now know, whenever some essential part of the body gives way. Sometimes one, sometimes another, perhaps the brain, perhaps the heart, perhaps one of the other internal organs, may be the first in which the change of cytomorphosis goes so far that it can no longer perform its share of work, and failing, brings about the failure of the whole.

This is the scientific view of death. It leaves death with all its mystery,

with all its sacredness. We are not in the least able, at the present time, to say what life is ; still less, perhaps, what death is."

CAUSES AND SIGNS OF DEATH

Thus by studying the materialistic science, we do not gain a very clear idea of what death really means. But science goes on trying to trace the causes of death, and describes the signs of death. Science tells us that the actual signs of death are very defficult to find. The so-called popular signs of death, like the stoppage of the heart-beat, stoppage of the pulse or respiration, are not the actual signs of death, because there have been hundreds of cases where the heart-beat stopped and the respiration stopped, and yet after some time they were revived. The heart-beat might stop for many hours, even for days and then it can be revived. Respiration might stop for a long time ; in fact, science has recorded many cases of suspended animation, where the respiratian and the heart-beat stopped for forty-eight hours in the least. But there have been other cases where men have been buried alive in a hermetically sealed box for forty days, and afterwards they were taken out and revived. They lived, they married, and enjoyed all the blessings of life afterwards. It is very difficult to say which would be the proper or the final sign of death. The science tells us that the decomposition and putrefaction are the only final signs of death, and nothing else. And that shows that people might be buried prematurely. There have been many cases of premature burial recorded in the medical journals of the world every year. And for that reason, some of the countries in Europe have passed a law that no one should be buried immediately after death, until decomposition sets in. Because it is a very serious thing to bury living beings. There have been cases of many prematurely killed by putting them into the coffin and burying it under the ground.

As premature burial is objectionable, so premature embalming is objectionable. Embalmers have killed many before they really died. They might have been revived and might have lived for a long time. Because it is a proven fact today, that when the person is considered as dead, he might be in a trance, in a state of catalepsy or in a state of ecstasy.

Trance, catalepsy and ecstasy are conditions which resemble death. The outward signs are similar. But what happens to the soul ? Science does not know, because it denies the existence of a soul. A person might go into a state of trance and remain in that state for hours. There are

persons who can stop the heart-beat by their will. I knew a Hindu Yogi* who came to America a few years ago, and who, in New York, went through all the medical tests to prove that he could stop his heart-beat at his will. The medical practitioners were all dumbfounded, and questioned how he could do it. It is possible, because it obeys the will of the individual. The individual will commands and directs the organic functions. But materialistic science cannot explain this, how it is possible, through the known laws that are accepted by these scientific thinkers.

The old Babylonian method of embalming the body and burying the dead, which has been handed down to us from pre-Christian era,—and which is practised today in all the civilized countries, is based upon the superstitious belief that the body will eventually rise and go to heaven. But after the decomposition sets in, and the body is gone, what will rise? Science shows that it is an absolute impossibility for the body to rise or go to heaven Still some people cling to that old belief, and think that their friend and relatives will eventually arise and go to heaven with their physical bodies But the best method of disposing of the dead body is the method of cremation, because it is sanitary. I mean, it is the best method from the standpoint of health as well as from the standpoint of safety for the living beings Why should we have so many dead bodies going through the process of decomposition around us? It is better to get rid of them and let them go to their elementary conditions. This cremation has been practised in India from very ancient times; in fact, in the Vedas we find that cremation was regarded as the best method. But among other nations, burial or mummification was regarded as the best method. As I have already said, their idea was to keep the body intact for a long time because the soul will eventually come back to the body. The Egyptians also had that kind of belief. They believed that if the physical body were kept intact and not mutilated, then the soul would eventually come back to dwell in that body; whereas if any part of the physical body was mutilated, that part of the double or soul. would also be mutilated. They believed in a "double,"—a "double" is exactly of the same shape and same form as the physical body. In India we find that the Hindus have a belief in the existence of a double, but it was not dependent upon the gross physical body. They have a philosophy altogether different from that of the Egyptians and other nations of ancient times. They believe that this "double" might leave the body and continue to live even when this gross physical body is destroyed through the process of cremation which they even now regard as the most sanitary method of disposing of the dead body.

MIND AS A FACTOR IN THE CASES OF DEATH

Then there is another class of scientific thinkers who are a little more advanced than the orthodox scientists. They hold that "mind" is a factor in the cases of disease and death. They do not deny the existence of mind or intelligence or consciousness, nor do they believe that the mind, intelligence and consciousness are the results of the chemical actions of the atoms and molecules of the organism. On the contrary, they hold the belief that the source of consciousness and mind are indestructible. So is also life. Life is indestructible. They regard that life-force (Prana) is not the result of chemical actions. It is not the same as electricity or any other force that is known to the orthodox science, but it is distinct and separate. They give the cases where mind can bring death through extreme emotions. Some of the functions of the mind, which we call passions, will create disease and death.

Dr. John Hunter, a noted psychologist, was a genius of extraordinary nature. He was a scientist, but he believed in the power of the mind, and yet he had very little control over his passions. He could not control anger. Once he had extreme anger as the result of a slight provocation, and through that extreme anger, he instantly fell dead. There is a historical record that anger kills the person instantly. The French physician, Tourtelle, witnessed two women who died of extreme anger. Extreme anger will produce the stoppage of the heart-action and poison the whole system. As extreme anger will kill persons, a slight expression of anger, anger of a milder form, will bring diseases of the worst kind. In fact, when a mother nurses the baby while she is in that state of anger, she feeds the baby with poison, and that poison works and creates all kinds of trouble in the baby's system. It is a scientific fact today.

As anger is dangerous and it is a destructive force which creates a havoc in the system, so is fear. Now, the ordinary expression that we are frightened to death has some meaning. Extreme fear will bring on death, will stop the heart-action, and the lungs also will stop; and simultaneously other organs too. Then there are other passions, hatred and grief. Grief will produce a havoc in the system. These are all recorded facts. When there have been cases of disease and death through extreme hatred and grief, how can we deny the power of the mind? If mind and mental states can produce such effects upon the physical body and bring premature death, how can we deny the existence of mind as the most powerful thing that we possess? Therefore these scientists, who are advanced

thinkers and not bigoted, like the orthodox materialists, regard mind as the most wonderful force that is working through this physical body.

There are cases of counterfeits of death, even in the lower animals. There are some of the insects which would feign death. The fox, when he is pursued by an enemy and when he does not know how to escape, lies flat on the ground and feigns dead, and remains in that state for some time. There are other animals which would even become stiff and the *rigor mortis* of death will be perceptible in the physical body of the animal. It can be produced by the mind. And this counterfeit of death may be caused by different things, such as intoxication, apoplexy, heart-trouble, and so on. Thus it shows that mind can produce these things under those conditions—the signs of death—and therefore these advanced thinkers and scientists consider that death can be brought about by the power of the mind. And they regard that this ordinary state which we call death is caused by that self-conscious, living force, which is working through the organs; when that self-conscious, living force is detached, then it produces death. In fact, the self-conscious, living soul has vital energy or life-force (Prana) and mind with it. Mind is inseparable from the life force or vital energy. But the mind cannot work unless it has an instrument. Therefore, it manufactures the instrument of the physical body. It draws from the surrounding environments atoms, molecules or particles of matter and charges them with the life-force or the vibrations of Prana; and when the vibration of life-force are weak, and are not up to the standard of the conditions of life, then the living soul, or the self-conscious mind tries to raise those vibrations of the cellular structure up to the standard by making all efforts, and if it fails to raise the standard of vibration of the cells and tissues, then there is the death of the whole. The whole machinery dies.

(To be continued)

সম্পাদক—স্বামী চিদ্ঘনানন্দ ও স্বামী সত্যেশানন্দ কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাণশ্রমা প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA

		Rs.	As
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA	...	3	8
India and Her People (New Impression.)	...	3	0
Self-Knowledge ...	...	1	8
Path of Realisation ...	...	2	0
Divine Heritage of Man ...	...	2	0
Spiritual Unfoldment ...	...	1	8
Reincarnation ...	...	1	8
Philosophy of Work ...	...	1	12
Lectures and Addresses in India ...	...	2	4
How to be a Yogi ...	...	2	0
Great Saviours of the World ...	...	1	8
Human Affection and Divine Love (New Edition)	...	1	0
Religion of the 20th Century (New Edition)	...	0	8
Sri Ramakrishna (New Book) ...	...	0	4
Does the Soul exist after Death (New Impression)	...	0	4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH,

19B, Raja Rajkrishna St,

Calcutta.

ফোন
বি, বি, ৫১৪৯

মাসপয়লা প্রেস

১১৪।১৪
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার রুচিসম্পন্ন বাংলা কাজের জন্য বাংলার শ্রেষ্ঠ মুদ্রাকর, প্রকাশক, সাহিত্যিক ও সমঝদার সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত।

বাংলায় এমন কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নাই, যাহার লেখা অথবা বই ছাপার গৌরবলাভ আমাদের ভাগ্যে না ঘটিয়াছে।

অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সব রকম ঝরঝরে বাংলা টাইপ এবং আসবাবে সুসজ্জিত

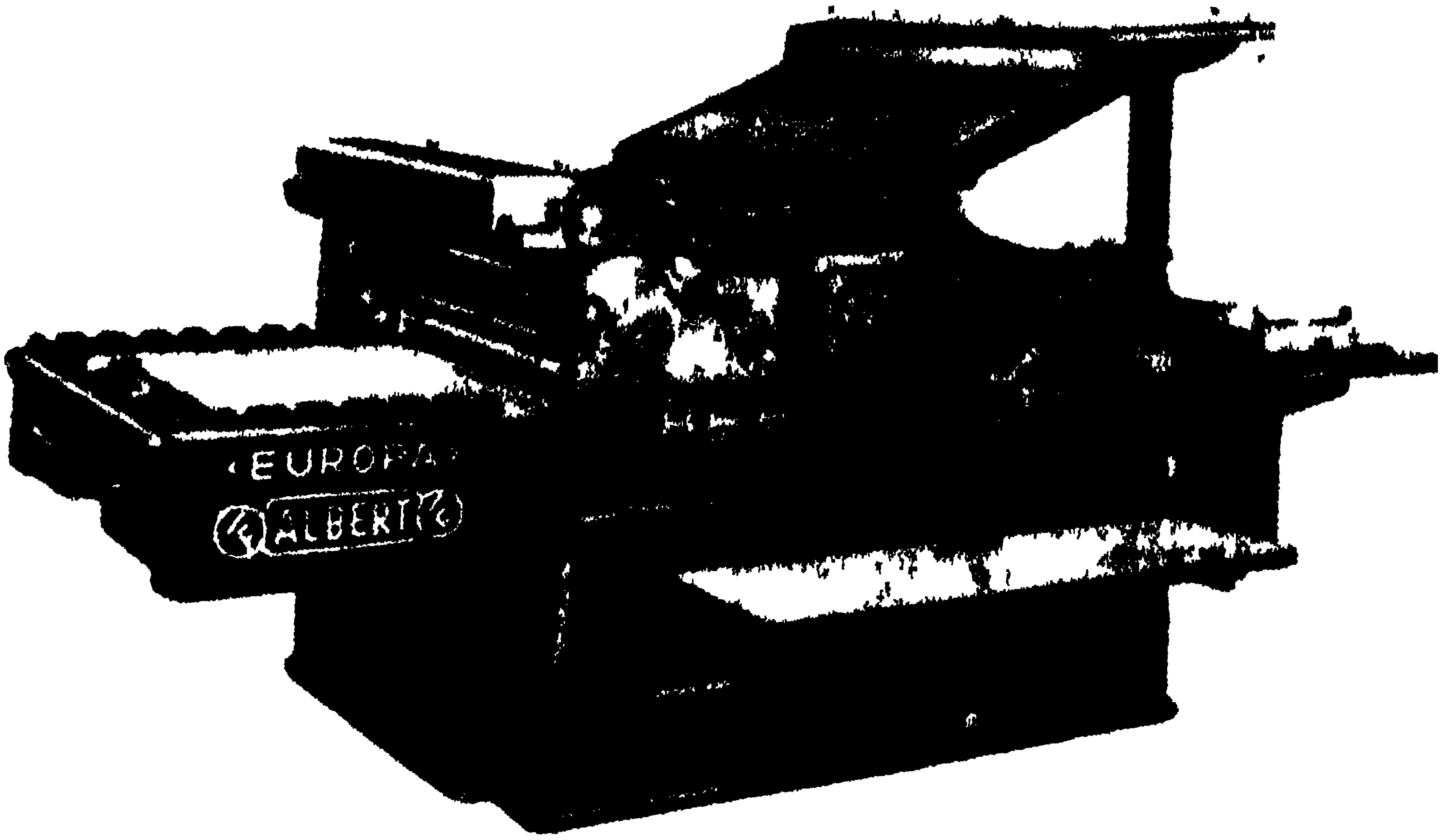

স্বত্বাধিকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শিশু-সাহিত্য মুদ্রণ আমাদের বৈশিষ্ট্য। বহু সুন্দর সুন্দর **সাপ্তাহিক, মাসিক** এবং **বার্ষিকী** আমাদের প্রেসে মুদ্রিত হয়। সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব নিয়া তৎপরতার সহিত অতি অল্প সময়ে যাবতীয় ছাপার কাজে আমরা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ।

আমরাই **বিশ্ববাণীর** মুদ্রাকর

বিশ্ববাণীর সম্পাদক এবং কার্য্যাধ্যক্ষগণ সকলেই আমাদের কাজের প্রশংসা করেন।

আমাদের কাজে আপনাদের সন্তুষ্টি অনিবার্য্য।

সাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা আমাদের মূলধন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—জেনারেল ম্যানেজার

শিশু-সাহিত্যের কখানি ভাল ভাল বই—

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

বীর রাজা	৵৹
রাণা প্রতাপ	৵৹
সুরথ রাজা	।৹
রাজা গিরিশচন্দ্র	।৹
শ্রীচৈতন্য	।৹
বাংলার কাণা ছেলে	।৹
মশার যুদ্ধ	।৹
পরাজয় (শিশু-নাটক)	।৵৹
অজানার উজানে (বারোয়ারী উপন্যাস)	১৲
যাদুঘর	১॥৹

মাসপয়লা

(ছোটদের সচিত্র মাসিক) বার্ষিক সডাক ১॥৹

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান	।৹

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির

চাঁদ সদাগর	।৹

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর

প্রতাপাদিত্য	।৹

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরীর

বিজয় সিংহ	।৹

শ্রী শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

সহজ ব্যায়াম ও খেলা	॥৹
দৈনিক দেহানুশীল	॥৵৹
মেয়েদের খেলা	১৲

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের

মহাচীনে মহাসমর	৸৹
ওয়ারস'র আকাশে	৸৹

শ্রীসুনির্ম্মল বসুর

(ছেলেদের প্রহসন)

কিপ্টে ঠাকুর্দ্দা	।৹
বীর শিকারী	।৹
সহুরে মামা	।৵৹

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরীর

শাহজলাল	।৹

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঠাকুর বাণী	।৹

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণের

রবীন্দ্রনাথ	১।৹

৺ক্ষীরোদচন্দ্র দেবের

নবমিকা (বড়দের গল্প সংগ্রহ)	১।৹
বিরিঞ্চি বাবা (বড়দের নাটক)	।/৹

ফোন বি, বি, ৩১৪১

কুলজা সাহিত্য-মন্দির

১১৪।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলা তথা ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র

সচিত্র শিশু-সাপ্তাহিক

প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যসেবী ও শিশু-সাহিত্য প্রযোজক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায়

বার্ষিক—৪৲
ষাণ্মাসিক—২।০
ত্রৈমাসিক—১।০

প্রতি সংখ্যা
সহর ও মফঃস্বল
সর্ব্বত্র /২ পয়সা

১৮ই মাঘ হইতে পুনরায় প্রতি রবিবারে বাহির হইতেছে

বাংলার প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী শিশু-সাহিত্যিকগণের লেখা পূর্ব্বের মতই উহাতে বাহির হইতেছে। কবিতা, গল্প, রূপকথা, ইতিহাস, পুরাণ, জীব-জন্তুর কথা, সংবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সব রকমের লেখাই এতে আছে। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **"হিমাচলের স্বপ্ন"** নামক ধারাবাহিক উপন্যাস, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধরের **"কংগ্রেসের গল্প"** এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী এম. এ., পি-আর-এস্ মহাশয়ের **"উপনিষদ-কথা"** ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

শিশু-সাহিত্যের সমালোচনা উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

ভারত বলেন:—'বাংলাদেশে শিশু ও কিশোরদের জন্য মাসিকপত্র আছে অনেকগুলি, কিন্তু সাপ্তাহিক পত্র এতদিন একটিও ছিল না। স্কুলের রুটিন-বাঁধা কাজের চাপে ছেলেদের মনের যে বাতায়ন বন্ধ থাকে, এই সকল পত্রিকা সেই বাতায়ন খুলিয়া দেয়। নীল আকাশ ও বাহিরের জগতের সহিত তাহাদের কৌতূহলী মন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মিতালী পাতাইতে পারে। কিন্তু সে আশায় দীর্ঘ একমাস অপেক্ষা করা ছোটদের পক্ষে কঠিন ছিল। **'রবিবার'** সেই অভাব সর্ব্বপ্রথম দূর করিয়াছে। 'রবিবার' সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া তাহাদের মনে ছুটির ঘণ্টা বাজাইবে। সাপ্তাহিক 'রবিবার' যাঁহাদের রচনায় সমৃদ্ধ, তাঁহাদের সকলেই ছেলেদের প্রিয় লেখক।'

শিশু-সাহিত্যের ক্রমোন্নতি যে বেশ দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে **'রবিবার'** নামক এই সচিত্র সাপ্তাহিকখানি তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কয়েক বৎসর যাবৎ শিশু-মাসিকগুলির বহুল প্রচার দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু শিশু-সাপ্তাহিকের প্রকাশ এই প্রথম। ছেলেমেয়েদের অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে মাসিকগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। এইরূপ একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক তাহাদের মানসিক ক্ষুধাকে বহুলাংশে পূরণ করিবে—**আনন্দবাজার**

মূল্যের স্বল্পতা, রচনার উৎকর্ষ এবং ছাপার পরিপাটিতা দেখিয়া মনে হইতেছে, পত্রিকাটি ছোটদের মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এবং ছাত্রছাত্রীর হাতে পত্রিকাটি দেখিলে আমরা সুখী হইব।—**যুগান্তর**

ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও আনন্দ পরিবেশনে 'রবিবার' অপরিহার্য্য

আজই গ্রাহক হউন।

ফোন
বি. বি. ৫৩৪৯

শিশু সাহিত্য মন্দির

১১।১এ
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(রবিবারের প্রকাশক)

WORKS BY SWAMI ABHEDANANDA

		Rs.	As
MEMOIRS OF RAMAKRISHNA	...	3	8
India and Her People (New Impression.)	...	3	0
Self-Knowledge ...	...	1	8
Path of Realisation ...	...	2	0
Divine Heritage of Man ...	...	2	0
Spiritual Unfoldment ...	...	1	8
Reincarnation ...	...	1	8
Philosophy of Work ...	...	1	12
Lectures and Addresses in India ...	...	2	4
How to be a Yogi ...	...	2	0
Great Saviours of the World ...	...	1	8
Human Affection and Divine Love (New Edition)	...	1	0
Religion of the 20th Century (New Edition)	...	0	8
Sri Ramakrishna (New Book) ...	...	0	4
Does the Soul exist after Death (New Impression)	...	0	4

Pamphlets at three annas each

Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity ; The Motherhood of God ; Divine Communion ; Why a Hindu is a Vegetarian ; Philosophy of Good and Evil ; Cosmic Evolution and its Purpose ; The Scientific Basis of Religion ; Woman's Place in Hindu Religion ; Religion of the Hindus ; Relation of Soul to God ; Way to the Blessed Life ; Simple Living ; What is Vedanta ; Unity and Harmony ; Who is the Saviour of Souls ; Swami Vivekananda and His Work ; Doctrine of Karma ; Word and Cross in Ancient India ; Spiritualism and Vedanta ; Sri Ramakrishna Centenary Presidential Address.

RAMAKRISHNA VEDANTAMATH,
19B, Raja Rajkrishna St,
Calcutta.

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৮ | ১২শ সংখ্যা

বিরহী

শ্রীসচ্চিদানন্দ স্যান্যাল এম্-এ, বি-এল্

কেন এ জীবন মোর রহে আজো ম্লান
হে মোহন? কই শুনি মধুভরা তান?
হৃদয় যমুনা কেন উঠে না উথলি'
প্রেমের জোয়ারে? বুঝি মধুর মুরলী
সংসারের কোলাহলে পশে না শ্রবণে।
ওই বেণুতানে একদিন, বৃন্দাবনে,
ছুটেছিল ব্রজাঙ্গনা, ভুলি' সর্ব্বকাজ,
অতিক্রমি সব বাধা; ত্যজি' ভয় লাজ
পাগলিনী তব পাশে। দুঃসহ বিরহে
আমারো অন্তর, নাথ, নিরন্তর দহে।
ডাকি' লও মোরে তব পাশে। দূরে যাক্
সব জ্বালা, মাখি' তব পরশ পরাগ্।
চিরমিলনের লাগি' রয়েছি পিয়াসী,
বাজাও অন্তরে তব কুলনাশা বাঁশী।

তিব্বতের বৌদ্ধ-সঙ্ঘ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীঅজিত ঘোষ

সোড্-নম্স মোঙ্গোলদের মধ্যে বেশ প্রভাব সঞ্চার করতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়; কারণ তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে সেগুলির মধ্যে একটী কাহিনীতে দেখা যায় যে, তিনি মোঙ্গোলদের সমক্ষে চতুর্ভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন; চতুর্ভুজের মধ্যে দুটী হাত বক্ষের উপর সংবদ্ধ ছিল এবং তাঁর অশ্বের ক্ষুরের যে ছাপ ভূমিতে মুদ্রিত হয় তাতে 'ওম্ মনি পদ্মে হুম্'-এর অক্ষরগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

যাহোক, সোড্-নম্সকে সংবর্ধনা করবার ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্য কোকোনর হ্রদের সন্নিধানে এক বিরাট জনসমাবেশ করা হয়। মোঙ্গোলরাজ অল্‌তন্ খগন্ তাঁর নেতৃত্বে লামাকে অভ্যর্থনা করেন। খগন্‌কে লামা বড় বড় উপাধি দিয়ে বিভূষিত করলেন এবং নিজে 'দলই' বা 'তলই' উপাধি লাভ করলেন। এই ব্যাপার হতেই দলই নামের উৎপত্তি হল। মোঙ্গোলভাষায় দলই সমুদ্রের নাম এবং এই উপাধি দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, লামার মর্যাদা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা। তদবধি তিব্বতের প্রধান লামারা দলই নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। সোড্-নম্সের প্রচেষ্টায় মোঙ্গোল-অভিজাতগণের সামাজিক ও ধর্ম-জীবনের রীতিমত সংস্কার সাধন করা হয়। অভিজাতদিগের চতুর্বিধ শ্রেণীর মর্যাদা-অনুযায়ী ধর্মতন্ত্রকে চারটী পর্যায়ে ভাগ করা হল। মাংস খাওয়া এবং অন্ত্যেষ্টিতে মানুষ ও ঘোড়া হত্যা করা নিষিদ্ধ হল। এছাড়াও বিধান দেওয়া হল যে, বৌদ্ধ উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলি পালন করতে হবে এবং স্থানীয় দেবমূর্তিগুলি পরিত্যাগ করে বৌদ্ধতন্ত্রের অনুমোদিত দেবতাদের পূজা করতে হবে। বিশেষতঃ ষড়্‌ভুজ 'নীল মহাকালে'র পূজা অনুমোদন করা হয়; এই মহাকাল শিবের একটী অভিব্যক্তি এবং ইনি গণেশের মূর্তির উপর দণ্ডায়মান।

তিব্বতে প্রত্যাগমনের সময় সোড্-নম্স আপনার প্রতিনিধিরূপে এক জন লামাকে রেখে আসেন। এই লামা মঞ্জুশ্রীর অবতাররূপে মোঙ্গোলরাজ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর জন্য কুকু-খোতো নামক স্থানে একটী মঠ নির্মাণ করা হয়েছিল। এদিকে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্‌তন্ খগনের মৃত্যু হয় এবং তার ফলে নূতন রাজার সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকার ব্যাপারে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার জন্য দলইকে আবার মোঙ্গোলরাজ্যে আসতে হল। এবার চীনসম্রাট

সন্-শির নিকট হতে দূত-মারফত তিনি সম্মানিত হলেন। খুবিলাই খাঁ লামা পগ্‌স্‌পকে যে সমস্ত উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন ঠিক সেগুলির অনুরূপ উপাধি তিনি চীন-সম্রাটের নিকট হতে লাভ করেছিলেন।

সোড্‌-নম্‌সের মৃত্যু হলে যোন্-তন্ দলই লামা হন। তাঁর সময় ১৫৮৭ হতে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। তিনি ছিলেন অল্‌তন্ খানের প্রপৌত্র। ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি মোঙ্গোলদেশেই ছিলেন। অতঃপর তাঁর স্থানে সমগ্র মোঙ্গোলিয়ার জন্য এক জন লামাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তিনি লাসায় আগমন করেন। এই প্রতিনিধি লামা মোঙ্গোলিয়ার কুরেন্ বা উর্গ্ নামক স্থানে থেকে সমগ্র মোঙ্গোলরাজ্যে ধর্মশাসন করতেন। এই লামার নাম সম্‌-প-গ্যা-ম্‌ৎসো। তাঁর পর্যায়ের লামাধ্যক্ষদের ঐতিহাসিক তারনাথের ক্রমাবির্ভাব বলা হয়। কিন্তু দেখা গেছে, তারনাথ তাঁর ইতিহাস শেষ করেন ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে, সুতরাং তাঁরা তারনাথের পর্যায়ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় এবং সম্‌-প-গ্যা-ম্‌ৎসোকে তাঁর অবতার বলা যায় না। গ্যা-ম্‌ৎসোর পর্যায়ের লামাধ্যক্ষরা 'মৈদরী খুতুক্‌তু' নামে ব্যবহার করেন—এ নাম মৈত্রেয়ের অবতারের অভিব্যঞ্জক। তাঁরা অবশ্য প্রধানতঃ জে-ত্সুন্ দম্‌-প নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

যোন্-তনের পরবর্তী পঞ্চম দলই লামা ঙগ্‌-বঙ-লো-ব্‌জঙ গ্যা ম্‌ৎসো। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দলইরূপে স্বীকৃত হন এবং ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দলইরূপে জীবিত ছিলেন। লো-ব্‌জঙ তিব্বতের দলই লামা বা লামাধ্যক্ষদের (Grand Lamas) মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও প্রতিভাসম্পন্ন। লামাধ্যক্ষরূপে তিনি তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি এই প্রতিষ্ঠা পরবর্তী লামাধ্যক্ষরা লাভ করে আসছেন। তিব্বতে প্রধান লামার রাজ্য এক রকম তাঁর সময় হতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এছাড়া মোঙ্গোলদের ও চীনসম্রাটের সঙ্গে তিনি যে সম্পর্ক রচনা করেছিলেন—চীন, মোঙ্গোলিয়া ও তিব্বত এমন কি সমগ্র এশিয়ার সাধারণ ইতিহাসে তার গুরুত্ব আছে।

লো-ব্‌জঙ জনৈক তিব্বতীয় অভিজাতপ্রধানের পুত্র। ডেপুঙ মঠে তশিলুন্‌পোর মঠাধ্যক্ষ চোস্-কী-গ্যাল্-সন্-এর তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তশিলুন্‌পোর এই মঠাধ্যক্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তখন সমগ্র তিব্বত পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম এই তিনটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং সেগুলির যথাক্রমে নাম ছিল—খম্‌দো, বু ও সঙ। প্রত্যেক প্রদেশেই ফগ্‌-মোড়ু-বংশের এক জন করে নৃপতি রাজত্ব করতেন। লাসা ছিল মধ্য-তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত। বোধ হয়, একজ্য মধ্য-তিব্বতে গেলুগ্‌-প বা পীত-সম্প্রদায় বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং স্থানীয় নৃপতিও তাদের ধর্মমত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য দুটী প্রদেশে তা সম্ভবপর হয়নি এবং সে দুটী স্থানে প্রাচীন-পন্থীদেরই প্রাবল্য ছিল। প্রায় ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-প্রদেশের অধিপতি সহসা মধ্য-প্রদেশ অধিকার করে লাসা করায়ত্ত করে ফেললেন। এই নৃপতি ছিলেন লালমতাবলম্বী এবং তাঁর শাসন পীত-সঙ্ঘের অস্তিত্বের

পক্ষে বিশেষ ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল। তাঁর শাসনাধীনে পীত-সঙ্ঘকে রীতিমত দুঃখ-কষ্টও ভোগ করতে হয়েছিল।

এদিকে লো-জ.ঙ তশিলুনপোয় বড় হচ্ছিলেন। তাঁর গুরু চোস্-কী-গ্যল্-সন্ দেখলেন, পীত-সঙ্ঘকে বাঁচাতে হলে বাহিরের শক্তির সাহায্য লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তরুণ লামাধ্যক্ষও নিজের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলেন। তখন কোকোনোর হ্রদের নিকটবর্তী তদানীন্তন ওএলট্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন গুশী-বা গুশ্রী (গুরুশ্রী ?) খাঁ এবং তিনি ছিলেন গ্যল্-সনেরই এক জন পূর্বতন শিষ্য। তিনি পীত-সঙ্ঘের খুবই অনুরাগী ছিলেন এবং ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে খম্‌দো বা পূর্ব-তিব্বত অধিকার করে বেশ শক্তিশালী হয়েছিলেন। লো-জ.ঙ ও গ্যল্-সনের পক্ষ হতে তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া হল। গুশী খাঁ তাতে স্বীকৃত হয়ে সসৈন্য তিব্বত আক্রমণ করলেন এবং সক্যপন্থী তিব্বতরাজকে পরাস্ত ও বন্দী করে সমগ্র তিব্বতের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন—এই রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তিনি প্রধান লামার হাতে সমর্পণ করলেন, মাত্র মোঙ্গোল-সৈন্যবাহিনীকে নিজের ক্ষমতাধীন রাখলেন। এই ঘটনার ফলে লামাধ্যক্ষই প্রকারান্তরে সমগ্র তিব্বতের, এমন কি মোঙ্গোলিয়ারও রাষ্ট্রিক ও ধর্মনৈতিক সর্ববিধ ক্ষমতার চরম অধিকারী হন।

. দেপুঙ মঠ লামাধ্যক্ষ বা দলই লামাদের বাসস্থান হয়। তবে লো-জ.ঙ মারপোরি পাহাড়ে গিয়ে বাস করতে থাকেন। এখানে পূর্বতন নৃপতির প্রাসাদ ছিল। লো-জ.ঙ এখানে প্রসিদ্ধ 'পোতল' প্রাসাদ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন, এই প্রাসাদটী এত সুদৃশ্য ও বিরাট হয়েছিল যে, জগতের সর্বপ্রধান প্রাসাদনিচয়ের মধ্যে এ প্রাসাদটীকে অন্যতম বলা যেতে পারে। প্রাসাদটীর নাম 'পোতল' রাখবার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভারতীয় বৌদ্ধদের মতে, পোতল অবলোকিতেশ্বরের বাসস্থান (য়ুয়ন্ চোয়াঙের বর্ণনায় দেখা যায়, এই পাহাড়ের অবস্থান দক্ষিণ ভারতে)। লামার লামাধ্যক্ষদের পর্যায়ানুসারে লো-জ.ঙ অবলোকিতের অবতার, সুতরাং অবলোকিতের বাসস্থান এই তাৎপর্য নিয়ে তাঁর নবনির্মিত প্রাসাদের নাম পোতল রাখা হয়েছিল। গ্যল্-সনকে তিনি 'পন্‌চেন্ রিন্‌পোচে' উপাধি দেন—তদবধি এই নামেই তশিলুনপোর মঠাধ্যক্ষরা পরিচিত হয়ে আসছেন। তশিলুনপোর মঠাধ্যক্ষগণ অমিতাভের অবতাররূপে অভিহিত হন।

তিব্বতরাজ্যের আধিপত্য লাভ করে লো-জ.ঙের সকল দিক্ দিয়েই সুবিধা হয়েছিল। এই অধিকারের বলেই ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনের মাঞ্চু-বংশীয় সম্রাটের সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে কয়েকটী ক্ষেত্রে উভয়ের মতৈক্য আনেন। অতঃপর ১৬৫২-৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনসম্রাটের আমন্ত্রণে পিকিঙে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করা হয় এবং এক জন স্বাধীন নৃপতির সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা ও সৌজন্য দেখান উচিত, সম্রাটের পক্ষ হতে তা যথোপযুক্ত করা

হয়েছিল। সম্রাট্ তাঁকে 'স্বতন্ত্রপ্রকাশ বুদ্ধ', 'বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সর্বক্ষমতাপন্ন শাসক' প্রভৃতি অনন্যসাধারণ সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন। প্রতিদানে মোঙ্গোলদের সঙ্গে যাতে শান্তি বজায় থাকে এবং মোঙ্গোলরা চীনসীমান্তে আক্রমণাত্মক কাজ না করে তার নিশ্চয়তা সম্রাট্ গ্রহণ করেন।

তিব্বতে ফিরে আসবার পর লো-জ্‌ঙের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পায়। এদিকে গুশ্রী খাঁ ও স্বাল্‌-সনের মৃত্যু হয়। ফলে সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে এসে পড়ল। তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন দেসী বা দে-স্রিদ্‌। কোন কোন ঐতিহাসিক এই দেসীকে লো-জ্‌ঙের পুত্র বলে অনুমান করেছেন। দেসী খুব চতুর ব্যক্তি ছিলেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে লো-জ্‌ঙের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু-সংবাদ গোপন করে রাখা হল এবং দেসীই তাঁর নাম গ্রহণ করে রাজ্য পরিচালন করতে লাগলেন। তখন লো-জ্‌ঙের বন্ধু চীনসম্রাটের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দ হতে তাঁর উত্তরাধিকারী ক'ঙ সি চীনসাম্রাজ্য শাসন করছেন। তাঁর কাছে তিব্বতের এই রাজকীয় গুপ্ত রহস্য অপ্রকাশিতই থেকে গেল।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

যে মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছি, তিনি জন্মগ্রহণ করেন বিহার প্রদেশের ছাপরা জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে অজ্ঞাত কুলশীল কৃষক পরিবারে। তিনি কোনো গুরুভ্রাতার নিকটে কখনো নিজের জন্মবৃত্তান্ত ও বাল্যজীবন কাহিনী বলিতে চাহিতেন না, সুতরাং এই কুলপাবনের কুলপরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। বাল্যকালে তাঁহার ডাক নাম ছিল 'রাখতুরাম'। রাখতুরামের বয়স্ যখন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করে নাই, তখন বালক মাতৃপিতৃহারা হইয়া পিতৃব্যের স্নেহের কোলে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কিছুকাল পরে পিতৃব্যের অবস্থা বিপর্যয় ঘটিলে অভাবের তাড়নায় তিনি চিরদিনের জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিশোর কালে পিতৃব্যের সঙ্গে তিনি বহুদিনের পথ-পর্যটনে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

কোন্ অলক্ষ্য শক্তি ছাপরা জেলার এই গরীব অনাথ বালককে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের চরণ সন্নিধানে টানিয়া আনিয়া ফেলিল—তাহার হেতু নির্দ্দেশ করা দুরূহ

নুকে। দেশে দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বিদেশে—কলিকাতায় আসিয়া সামান্য চাকরীর অন্বেষণে ছুটাছুটি করিয়াও বালক যখন অন্যত্র আশ্রয় লাভে সমর্থ হয় নাই, তখন সিমলা পল্লীতে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত ব্যতীত অপর কাহারো দ্বারা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত 'লাটুর' (রামবাবু প্রদত্ত নাম) যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ অভাবনীয় মিলন বিধাতার বিধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আশ্রিত-বৎসল রামচন্দ্র দত্তের গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকিত বহু ভক্তজনের সেবার জন্য—এই কারণে বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"রামভক্ত সেবক—রামের সংসার আমার সংসার"। মহাপ্রাণ রামচন্দ্রের নিকট লাটুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যাপারে নূতনত্ব না থাকিলেও কিছু বিশেষত্ব আছে—ইহার ফলে বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের দিক্‌ নির্ণয় হইয়াছিল—লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল, কারণ রামবাবুর গৃহে সামান্য চাকরীর সূত্রে লাটুর দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উদার নৈষ্ঠিক মনিব রামবাবুর গৃহে বাস করিবার সময় এই গ্রাম্য বালকটি আপন চরিত্র গঠনের উপযুক্ত আব্‌হাওয়া পাইয়াছিল ? কে কোন্‌ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইবে—তাহা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে লাটুকে সদ্‌গুরু লাভের উপযুক্ত আধার বলিয়া ভগবান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাধন-ভজনহীন বহির্মুখী জীবের কল্যাণের জন্য যিনি বারে বারে শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার মঙ্গল হস্ত সর্বদাই প্রসারিত। স্নেহময়ী জননীর মত অনিমেষ নয়নে তিনি আমাদের পানে সর্বদাই চাহিয়া আছেন, কিন্তু আমাদের সেদিকে দৃষ্টি কোথায় ? পরম দয়াল শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অজস্র করুণা ধারা ঢালিয়া দিবার জন্য প্রতিদিন দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় ভক্তগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন ; কিন্তু সেই আহ্বান ভোগসর্বস্ব যাহারা তাহাদের অসাড় হৃদয় স্পর্শ করে নাই—সে আহ্বানে কতিপয় ধর্মপিপাসু ছাড়া অপরের প্রাণে সাড়া জাগে নাই—ভগবানের দিকে মন টানে নাই—তাঁহারাই সেই বাঁশীর সুর প্রবাহের সন্ধান পাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটিয়াছিলেন। মহান্‌ শক্তিধর মহাপুরুষের এই যে আহ্বান—এই যে প্রাণের ডাক—ইহাই 'দৈবীমন্ত্রশক্তি' !

তৎকালে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের গৃহে থাকিতে থাকিতে লাটুর সজাগ হৃদয় সেই সুরতরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাই সংসার স্রোতের প্রতিকূলে উজান বহিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চলার পথে অন্য কোনদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর থাকে নাই। 'জগন্নাথের টান' তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই সংসারে ক্ষণিক ভোগসুখের মোহ কাটাইয়া দুর্গমপথের যাত্রী অনিত্য জীবন-যৌবন, তুচ্ছ করিয়া নিত্যবস্তু লাভের উন্মাদনায় ছুটিয়াছিলেন।

প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃত পরশ লাটুর হৃদয়তন্ত্রীকে নাড়া দিয়া এমনি

মোহন ঝঙ্কার তুলিয়াছিল যে, তাঁহার তরুণচিত্তে পরমহংসদেবের প্রতি একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আনিয়া দিয়াছিল—শ্রীশ্রীঠাকুরই গুরু, ধর্মপিতা এইরূপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বোধ প্রাণের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। অতঃপর মনিব রামবাবু প্রদত্ত ফলমূল মিষ্টান্ন লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে করিতে লাটু পরমহংসদেবের স্নেহের আকর্ষণ যতই অনুভব করিতে লাগিলেন, ঠাকুরের সেবাস্পৃহা ততই বলবতী হইতে লাগিল। এই ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটা গভীর বেদনা জাগাইয়া দিল। লাটুর তখন চাতক পাখীর মত অবস্থা—তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে।

এই প্রকার মানসিক অবস্থায় সিমলায় মনিবের গৃহকর্মে কিছুকাল গত হইলে পরে লাটুর দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। পরমহংসদেবের ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের সহিত কর্তৃপক্ষের কুমারী-পূজা লইয়া মনোমালিন্য হওয়াতে, হৃদয়কে কালীমন্দিরের পূজাকার্য হইতে অপসারিত করা হয়। অতএব পরমহংসদেবের সেবা করিবার জন্য শুদ্ধসাত্ত্বিক সেবকের অভাব ঘটে। তখন দৈবের শুভ সংযোগে লাটুর ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইল। একদিন ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ঠাকুর রামচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে লাটুকে চাহিয়া লন, বলেন, "দেখ রাম! এই ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে রেখে দাও। ছেলেটি বড় শুদ্ধসত্ত্ব আর এখানকে থাকতেও ভালবাসে"।

এইরূপে লাটু যৌবনের প্রারম্ভে পরমহংসদেবের কাছে পরম অনুগত ভৃত্যের মত অনুক্ষণ থাকিয়া তাঁর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎকাল হইতে ছাপরা জেলার রাখতুরামের এক নূতন জীবনের সূত্রপাত হইল। তাঁহার ভাবের ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল, রামবাবুর সেবক লাটু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন মানুষ হইয়া গেল। মন-প্রাণ ঢালিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমার সেবায় আত্মনিয়োগ করাতে ইনি তাঁহাদের কৃপা পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কলিকাতায় ভক্তগৃহে যাইলে এই বালকভৃত্যটি তাঁহার সঙ্গে প্রায় সকল জায়গাতেই যাইতেন, তাই তাঁহার বহু শিষ্য ও ভক্তকে দেখিবার, চিনিবার, তাঁহাদের সঙ্গে মিশিবার এবং তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে ও ঠাকুরের সঙ্গে তত্ত্ব প্রসঙ্গের আলোচনা শুনিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার হইত। পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গভক্তগণের মধ্যে যাহার যেরূপ আধার তিনি সেইভাবে তাঁহাকে গড়িতে পারিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও অধিকারী বিবেচনা করিয়া যাঁহার জীবন যেভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার ভিতরে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অলোকসামান্য ঠাকুরের হস্তে লাটু মহারাজ তাঁহার এক অলোকসামান্য সৃষ্টি!

ভারতীয় সনাতন শিক্ষাপ্রণালীতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার ভাব বর্তমান। যে

শিক্ষায় মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে, সেই পারমার্থিক শিক্ষায় সেবক লাটুকে শিক্ষিত করিবার জন্য পরমহংসদেব ছেলেটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। যৌবনকালে ব্রহ্মচারী লাটুর অন্তর্নিহিত ভগবদ্‌শক্তির বিকাশদ্বারা জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগৎকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন যে,সদ্‌গুরুর সেবানিষ্ঠ সাধকের আধার যখন নির্মল ও পবিত্র হয়, তখন পার্থিব বিদ্যাশিক্ষা না থাকিলেও নিরক্ষরতার আবরণের ভিতর থেকে ভগবদ্‌ আলোক ফুটিয়া বাহির হয়—যে আলোক মানব হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে, যাহার প্রভাবে সকল মূর্খতা নাশ হয়, এবং 'সত্যবস্তু' কি তাহাও উপলব্ধি হয়।

আমরা যাহাকে বলি বিদ্যাশিক্ষা, এমন কোনো বস্তুর সহিত যদিও লাটু মহারাজের আদৌ কোনো সংস্রব ছিল না, তথাপি তিনি মন-প্রাণঢালা গুরুসেবাদ্বারা তাঁহার কৃপায় এমন পরাবিদ্যার আলোক প্রাপ্ত হইলেন, যাহার কাছে বই পড়া জ্ঞান তুচ্ছ। নিরক্ষর হইলেও তিনি ছিলেন বিচারশীল। প্রতি কাযে, উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, তিনি বিচার করিতেন। ধ্যান ও বিচার দ্বারা তিনি নিজ মনোজগতের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাই সাধন জগতের সকল রহস্য তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল।

পরমহংসদেব তাঁহার এই বর্ণজ্ঞানহীন সেবকের জীবনটি কি ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিলেন তাহার কিছু আভাস লাটু মহারাজের নিজের ভাষায় এইবার আপনাদের সমক্ষে ধরিতেছি :—

"আরে! তিনি (ঠাকুর) হামায় কত্তো শিখাতেন, কত্তো বুঝাতেন, আবার সঙ্গে কোরে কত্তো জায়গায় নিয়ে যেতেন। তিনি হামায় বোলতেন, 'যা না নোরেনের কাছে।' সেখানকে বসে বসে হামি কত্তো কথা শুনেছি। গিরীশবাবুর সাথে নোরেনের কেমন ঝগড়া (তর্ক) লাগিয়ে দিতেন। বাকী (কিন্তু) নোরেন ভারী তেজী ছিল। সে কাউকে কেয়ার (care) কোরতো না। নোরেন সব বোল্‌তো আর হামি সব শুনে এসে ওনাকে বোল্‌তে হোতো। উনি (ঠাকুর) মাঝে মাঝে হামায় বিচে (পরীক্ষা ক'রে) নিতেন—বোল্‌তেন, 'নোরেন এই কথা বোল্‌লে আর তুই চুপ কোরে রইলি?' হামি তখন কী জানে? নোরেনের সাথে হামি পারবে কেনে? উনি বোল্‌তেন, 'ইথানকের এতো কথা শুনেও তুই কিছুই বোল্‌তে পারলি নি? তোর বলা উচিত ছিল—তিনি (ঈশ্বর) না করলে এ সব করলে কে?'

—"কেনো? নোরেন বলে 'স্বভাবে সব হোয়েছে।'

ঠাকুর—"স্বভাবে কি এ সব হয়? কার্য্য থাকলেই তার পিছনে কারণ আছে। শক্তি থাকলে তার পিছনে শক্তিমান আধার আছেই।"

"হামায় তিনি (ঠাকুর) এইভাবে সব বুঝাতেন, আউর কত্তো শিখাতেন।"

ভক্ত—"কি শিখাতেন, মহারাজ?"

লাটু মহারাজ—"আরে! সেবা করতে শিখাতেন! আউর কি শিখাবেন?"

এইরূপ কথায় ভক্তটির বিস্মিতভাব দেখিয়া লাটু মহারাজ বাক্ছলে বলিলেন—"আরে যে সে নেশা নয়, একদম রাজানেশা করতে শিখাচ্ছেন। তিনি আমাদের ভগবানের নেশা করিয়ে দিলেন। সংসারীলোক ছেলেদের কামিনী-কাঞ্চনের নেশা করতে শিখায়, মদ জুয়ার নেশা করতে শিখায়, আউর মান ইজ্জতের নেশা করতে শিখায়। বাকী (কিন্তু) তিনি শিখাচ্ছেন—"ব্রহ্ম নেশা"। এই নেশা ভারী জবর। এ নেশার কাছে আর সব নেশা ফিকা হোয়ে যায়। জানো! ভগবানের নেশা করতে গেলে কুছু পান করতে হয় না—যে ভগবানকে পেয়েছে তাঁর দর্শন স্পর্শনেই নেশা লাগে। তাঁর সঙ্গ করলেই মন ব্রহ্মনেশায় ভরপুর হোয়ে যায়।"

"দেখো! সংসার তোমাদের নেশা ধরিয়েছে—নাম, যশ, টাকা, মেয়ে মানুষ। আগে এই সব নেশা কাটিয়ে উঠো, তবে তো ব্রহ্মনেশা লাগে। এতে মশগুল হোলে মদ, তাড়ি, গাঁজা কুছু ভাল লাগবে না। ঐ নেশা করবে তো এসো। ইখানে বোসো—চুটি চুটি লাও, আর হরবখত তাঁর নাম লও। নামের নেশায় বুঁদ হোয়ে যাও। বাকী ফিরকুটি ধুকক কি চলবে না।" "আরে! নামই তো শক্তি, নামী তো দেবতা (দেবতা)। নাম নামী একই। শক্তির সাধন না করলে দেবতাকে পাওয়া যায় না। নামের কাছে শরণ নিতে হয়। জানো! উনি (ঠাকুর) বোলতেন, 'নামকে প্রণাম জানিয়ে তবে জপে বসতে হয়'। জপ করতে করতে তন্ময় হোয়ে গেলে ধ্যান পাকা হয়।"

—"জানো! আমার যা কুছু সব তাঁর (ঠাকুরের) দৌলতে। আমার মতো মুখ্যুর কি আর সাধন করবার দিশ্ থাকতো? আমরা সাধনার কী জানে? আমাকে তিনিই তো সব সাধন ভজন দেন। আমি তো কেবল তাঁর সেবক হোতে চেয়েছিলুম, বাকী (কিন্তু) তিনিই তো আমাকে সাধন-ভজন শিখালেন। আমি তো জানে না তখন, সাধন-ভজনে লাভ কি? উনিই তো আমাকে শুনালেন রামজীর ব্যাপার।"

ভক্ত—"রামজীর ব্যাপার কী শোনালেন মহারাজ?"

লাটু মহারাজ—"একদিন আমি তাঁর পায়ে হাত বুলোচ্ছিলুম। তিনি আমাকে জিগ্যেস্ করলেন—'বল্ দিকিনি তোর রামজী এখন কী করছেন?' শুনে আমি তো অবাক হোয়ে গেলুম—রামজীর ব্যাপার আমি কি বুঝতে পারে? আমাকে চুপ দেখে, তিনি কি বল্লেন জানো—"ওরে! এখন তোর রামজী সূচের ভিতর হাতী চালাচ্ছেন!"

ভক্ত—"কি বল্লেন? মহারাজ! সূচের ভিতর হাতী চালাচ্ছেন! এর মানে কি, মহারাজ!"

—"তা বুঝলে না—আমার এতোটুকু আধার, আমার মধ্যে তিনি সাধন ঢেলে (ঢেলে) দিচ্ছিলেন।"

ভক্ত—"সাধন কি ঢেলে দেওয়া যায় মহারাজ?

—"যায় বৈ কি, তবে যে-সে পারে না। যে ভগবানকে দেখেছে তাঁর আনন্দে

ডুবে যেতে পেরেছে—সে-ই পারে। বাকী (কিন্তু) যার তেমন সাধন নেই, সে তো পারবেক না।"

ভক্ত—"মহারাজ! আমাদের মধ্যে একটু সাধন ঢেলে দিন।"

—"আরে! তিনি (ঠাকুর) পারতেন বোলে তাবৃনি পারবে?"

ভক্তটি আর্তি দেখাইয়া বলিলেন—"পারবেন, মহারাজ! আমাদের উপর একটু কৃপা করুন।"

—"দেখো! তোমাদের ঐ এক কথা। ইখানে এলে মনে হয় সাধন-ভজন নিয়ে থাকবে, আর বাড়ী ফিরে গিয়ে মনে হয়, দুৎতোর সাধন-ভজন। সংসারে তোমাদের টাকাই সাধন—ওরই জন্তে তোমাদের দিনরাত খাটতে হয়। বাকী (কিন্তু) যার সাধনা করবে, তাতেই তো সিদ্ধিলাভ করবে। তোমাদের প্রাণ তো ভগবানের সাধনা চায় না—তাই ভগবানকে পাও না। যার টাকার জোর আছে, যার গায়ের জোর আছে, তার ভগবানকে কী দরকার?"

ভক্ত—"সংসারে থাকতে গেলে টাকা যে চাই-ই চাই। টাকা পয়সা ছাড়া সংসার চলে না। অর্থচিন্তা চমৎকার—এটা তো আপনিও জানেন।"

—"হাঁ! জানি বৈ কি। তোমাদের মূলমন্ত্র "টাকা ধর্ম, টাকা, কর্ম, টাকা হি পরমং তপঃ। যস্ত গৃহে টাকা নাস্তি, তস্ত গৃহে টক্ টক্ টক্?" তবে যেমন চাইবে, তেমন পাবে তো। সাধন ভজন চাইতে গেলে অন্ত কুছু চাইতে পারবে না। উনি (ঠাকুর) বোল্‌তেন, "ভগবানের কাছে যা' চাইবে, সব পাবে। তিনি যে কল্পতরু। বাকী (কিন্তু) তাঁকে চাইলে, তাঁর কৃপা পেলে, সব পাওয়ার শেষ হোয়ে যাবে।"

ভক্ত—"আমরা তো ভগবনকে ঠিক ডাকতে পারি না, মহারাজ! আমাদের মত অভাগার ডাক কি তাঁর কানে পৌঁছায়?"

—"পৌঁছায় বৈ কি। তোমাদের ডাকে আছে টাকা, টাকা, টাকা। টাকার কাঙাল তোমরা—তাই তো তিনি (ভগবান) তোমাদের টাকা পাঠাচ্ছেন—রসদ যোগাচ্ছেন। যে দিন এই ডাকের মধ্যে থাকবে—"টাকা যশ মান কুছু চাই না, বাকী (কিন্তু) তাঁকেই চাই" সেদিন তিনি আসবেন। উনি (ঠাকুর) বোল্‌তেন, "ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়, আর ভোগ থাকলেই জ্বালা বাড়ে।" এটা তো হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছো, তবু ভগবানে মনের যোগ কতটুকু রাখতে পারছো। উনি দিনরাত আমাদের এই কথা শিখাতেন, বোল্‌তেন "যাগে যোগে জেগে থাকবি, ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি, কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি, আর হরদম্ তাঁর সেবায় লাগবি।"

মনে হয়, সেবক লাটুর শিক্ষার মূলমন্ত্র এই চারিটি বাক্যে সন্নিবিষ্ট—'যাগে যোগে জেগে থাকবি' অর্থাৎ সদাসর্বদা ভগবানে মন লাগিয়ে রাখ্‌বি। 'ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি' —এর একটি অর্থ রাত্রে নির্জনে তাঁকে ডাকবি, অপরটি হোতে পারে—মনে তামস ভাবের

উদয় হোলেই তাঁকে ডাকবি। তৃতীয় কথা—'কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি—ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট, কোনো কাজেই নিজের অহঙ্কারকে বাড়তে দিবি নি। এবং হরদম তাঁর সেবা করবি'—অর্থাৎ বৃথা আলস্যে দিন কাটাবি নি—সর্বদা তাঁর কাজ নিয়ে মশ্‌গুল থাকবি।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রকার অভিনব শিক্ষা প্রণালীতে দিব্যস্পর্শের আভাষ রহিয়াছে এবং সত্য, পবিত্রতা ও সরলতার পথে হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবার গোপন কৌশল রহিয়াছে। এই সকল বিষয় বিশেষ চিন্তা করিবার বস্তু। শ্রীলাটু মহারাজের চরিত্রের গূঢ় মর্ম এইরূপ বহুপ্রসঙ্গ হইতে পাওয়া যায়। সবগুলি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি সেগুলির দ্বারা তাঁহার সেবকজীবন পুষ্ট হইয়াছিল তাহাই এইখানে বলা হইল।

সাধনা সদ্‌গুরুর উপদেশ সাপেক্ষ। গুরুপ্রদর্শিত পথে শিষ্যকে চলিতে হয়। শিশুকে যেমন মাতা হাত ধরিয়া প্রতি পদনিক্ষেপ শিক্ষা দেন, সেইরূপই পরমদয়াল পরমহংসদেব শিশুসাধক লাটুকে কৃপাপূর্বক অতি যত্নের সহিত তত্ত্বপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাই তাঁহারই স্নেহের ক্রোড়ে সেবক লাটু লালিত পালিত হইয়া সাধনক্ষেত্রে উত্তরোত্তর এই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। পরবর্তীকালে লাটু মহারাজ বলিতেন, সাধনপথ ক্ষুরের ধারের মত, গুরুকে ধ'রে খুব সাবধানে চলতে হয়, রিপুগুলো ভড়কী দেখায়, বাকী (কিন্তু) গুরুর কাছে অভয় পেলে 'কুছ্ পরোয়া নেই', অনেক কঠোর করতে হবে, তবে এগোতে পারবে। আরে! সাধনা কি এতো সোজা জিনিস যে দিনকতক জপ ধ্যান্ করলেই অনুভূতি হবে। তিনি বোল্‌তেন, সে ভাব লাগি পরমযোগী যোগ করে যুগযুগান্তর! ভগবানে একদিক হোয়ে লেগে থাকতে হবে, তবে সদ্‌গুরুর কৃপা পেলে বেশী কাজ হয়। তিনি মায়ার হাত থেকে বেরুবার পথ দেখিয়ে দেন, গুরুকে ধরে চললে চট্ কোরে বেরিয়ে যেতে পারবে আর তর্-তর্ কোরে এগিয়ে যাবে। আরে! সে যে অনন্তের পথ, সাধনার পথ কি ফুরোয়, না সাধনার 'ইতি' আছে। ভগবান যে অনন্ত, আত্মার উন্নতিও অনন্ত।"

সাধনভজনপরায়ণ লাটু দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে থাকিতে 'ভগবানগ্রস্ত' হইয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুমহান্ আদর্শের নব নব ভাব যে পরিমাণে তাঁহার হৃদয়ে অধিকার স্থাপন করিল, সেই পরিমাণে তাঁহার পূর্বসংস্কার—পুরাতন ভাব অন্তর্হিত হইয়া তাঁর চিন্তাধারাকে নবভাবাপন্ন করিয়া তুলিল। তণ্ডুল উত্তপ্ত জলের সঙ্গে মিশিয়া আগুনের উপর বহুক্ষণ থাকিলে আর তণ্ডুল থাকিতে পারে না, রন্ধিত অন্নে পরিণত হয়, তেমনি মহাপুরুষের শক্তি অগ্নির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। যৌবনকাল হইতে পরমহংসদেবের পুণ্যসংস্পর্শে—সেই দিব্য অগ্নিসংযোগে, তাপস লাটুর সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্যাদি প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিল।

ধ্যান যোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। এই জন্য ধ্যানে সাধক লাটুর প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ তিনি অহর্নিশি ধ্যানানন্দে বিভোর থাকিতেন, তাঁর চিত্ত সদাই অন্তর্মুখী। স্পর্শমণির স্পর্শে

লাটু মহারাজ ধ্যানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে থাকিবার সময় এক একদিন তিনি এমন ধ্যানে বাহ্যহারা হইয়া পড়িতেন যে, ঠাকুরকে তাঁহার বুকে হাত দিয়া চলিয়া বাহ্যজ্ঞান করাইতে হইত। একবার যদু মল্লিকের বাগানে লাটু কলাপাতা কাটিয়া আনিতে গিয়াছেন, সেখানে তিনি ভাববিভোর অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন। বিলম্ব দেখিয়া ঠাকুর তথায় যাইয়া তাঁর পায়ের উপর পা দিয়া চাপ দিলে, তবে জ্ঞান হইল। একদিন রাত্রে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে বসিয়া সাধক লাটু গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। পরমহংসদেব খোঁজ করিতে যাইয়া দেখেন দুইটা কুকুর লেজ কান খাড়া করিয়া লাটুকে পাহারা দিতেছে। রাত্রে তিনি মোটেই নিদ্রা যাইতেন না, তাঁহাকে ঐ সময়ে ধ্যানস্থ থাকিতে দেখা গিয়াছে। শেষ বয়সে কি কলিকাতায়, কি কাশীধামে, ধ্যান ও ভগবদ্ প্রসঙ্গ এই দুই ছাড়া দিন কাটাইবার অন্য উপায় লাটু মহারাজ জানিতেন না।

লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া লাটু মহারাজ কঠোর তপস্যা ও সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাই সাধারণ লোকে তাঁর নাম জানে না বলিলেই হয়। তাঁহার সমগ্র তাপস জীবনটি জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। আমাদের নিকট তিনি যেদিন ধরা দিলেন, সেদিন তিনি প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। এই সরল 'বেদাগ' সাধুর নিষ্কল চরিত্র, তাঁর কঠোর সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণ তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের প্রমুখাৎ শুনিবার সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা বলিয়াছেন এই মহাত্মাগণের অদ্ভুত জীবন দিব্য আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিপ্রাপ্ত এই বৈরাগ্যবান ও জিতনিদ্র সাধক কোনো শাস্ত্র পুঁথি, কোনো মতবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়া সাধনার উচ্চস্তরে আরুঢ় হন নাই। সুতীব্র তপস্যা অটুট সংযম ও অনাবিল পবিত্রতায় আপন অন্তরগুহায় তিনি পরমসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন ধ্যান-সমাধিমগ্ন অবস্থায়। তাপস লাটু মহারাজের জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক মনের স্তর বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। কারণ একজন অশিক্ষিত নিরক্ষর ভৃত্য স্বভাবজাত শুদ্ধতা এবং মহাপুরুষের সঙ্গে থাকিয়া কিরূপে জীবনস্রোত পরিবর্তন করিতে পারে এবং এইরূপ উচ্চ অবস্থায় উঠিতে পারে—ইহা একটি দেখিবার ও জানিবার বিষয়।

কোনো ভাবুক ভক্তের অন্তরে সময়ে সময়ে এইরূপ স্ফূর্ত উক্তি:—"অলৌকিক শক্তির খনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমায় উদ্ভাসিত কে ইনি?" "ইনি কি সেই নিরক্ষর হিন্দুস্থানী বালক রাখতুরামের অপূর্ব পরিণতি অদ্ভুতানন্দ স্বামী'!"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপার আঁচ লাগিয়া লাটু মহারাজের জীবনের ছাঁচ কেমন সুন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল, এতদ্ সম্বন্ধে শ্রীগিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুল বাবু প্রায়ই বলিতেন, "ঠাকুরের 'miracle' (বিভূতি, অলৌকিক শক্তির নিদর্শন) যদি দেখতে চাও, তবে লাটু মহারাজকে দ্যাখ। এর চেয়ে বড় 'miracle' আমি তো আর কিছু দেখি নি।"

আজকালকার মতো পুঁথি পড়া তোতাপাখী না হইয়া লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় পুঁথিগত বিদ্যার অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভগবদ্ উপলব্ধিতে পরাবিদ্যার অধিকারী হন।

এক সময়ে সমাধির পরে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে দৈববাণী—তাঁহার আশীর্ব্বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল :—"ওরে লেটো! তোর মুখ দিয়ে বেদবেদান্ত ফুটে বেরোবে"! যাঁহার কৃপায় বোবার বোল্ ফোটে, সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার নিরক্ষর সেবক লাটুর কণ্ঠে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন। সেই সরল শুদ্ধ সত্ত্ব আধারের ভিতর দিয়া অমৃতময়ী বাণী বিতরণ করিয়া তিনি তত্ত্বপিপাসু মানবের পিপাসা মিটাইতেন।

এক সময়ে পণ্ডিতবর [illegible] মহাশয় বলিয়াছিলেন—"নিরক্ষর লাটু মহারাজের মুখে ভগবদ্ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ হয়, এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য অবধারণ করিতে পারা যায়"।

কি কলিকাতায়, কি কাশীধামে ভক্তগণের সঙ্গে শাস্ত্রের কোনো জটিল প্রসঙ্গ উঠিলে লাটু মহারাজ তাহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম জলের মত পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহার উচ্ছ্বসিত ভাবের বন্যায় আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিত। তাঁহার চিন্তা ভাণ্ডারের মণিমুক্তা কখনো নিঃশেষিতপ্রায় হইত না। সেই সব আলোচনাতে তাঁর সরল প্রাণের সরস ভাষায় সারগর্ভভাব ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার উপদেশের ভিতর থাকিত শক্তির ছাপ, ভাবের ছাপ। তিনি সাধুসঙ্গ করিতে উপদেশ দিতেন, বলিতেন, "সাধুসঙ্গ না করলে ধর্ম্ম যে কি জিনিস, তা' বুঝা যায় না। হাজার বই পড়, কিছুই হবে না,—জীবনে ফলবে না। পবিত্র জীবনই আসল, তাই সাধুর পবিত্র জীবন দেখতে হয়। জানো! সাধুগুরুর হুকুম মেনে চলতে হয়, তবে চিত্তশুদ্ধি হবে, জীবনটা পবিত্রভাবে গড়ে উঠবে, আপনা আপনি ফুটবে।"

মনের মলিন ভাব দূর করিবার জন্য তিনি চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিতেন, "আরে বাপু! মনটা উল্টে পাল্টে দেখলে টের পাবে কত্তো পাঁকের গন্ধ। হরদম্ 'পবিত্রতা' মন্ত্রটি স্মরণ মনন করতে থাক, তবে তো দিল্‌টা সাফ থাকবে। নিজে 'সাচ্চা' হও দিকিন্, তবে বুঝতে পারবে ভগবান কি বস্তু—তাঁর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ"।

এক সময়ে জনৈক ভক্তকে মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"মঠে যাচ্ছো, সৎসঙ্গ করছো, তবুও হাড়্‌হাপনা প্রবৃত্তিটা ঘুচলো না, ভেতরে ভেতরে ফাঁকাফুঁকি দিচ্ছো! ঠিক্‌সে চলতে পার না কেনো? ভাবের ঘরে চুরি করলে নিজের কাছে নিজেই যে খাটো হোয়ে থাকবে। তোমরা যদি লুকিয়ে 'কুপথ্যি' কর, তাহোলে মনের রোগ কি সারবে? আরে! ডুবে ডুবে জল খেলে, শিবের বাবাও টের পায়। মানুষেরও চোখে ধুলো দিলেও, তাঁর চোখ এড়াবার জো নেই। যদি বাঁচতে চাও, ওসব ফিক্‌কুড়ি ছেড়ে দাও। সাধুগুরুর হুকুম মেনে চললে, তার 'মার' নেই। জানো...! "খুঁটি পাকড়ে যো রহে, উস্‌কো মারে কোই"।

অনেক ভোগলোলুপ ভক্তের মলিন আধার দেখিয়া লাটু মহারাজ এক সময়ে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখো! তোমরা বিগ্‌ড়ে থাকলে, তোমাদের আকেট্ বিকেট্ কর্মগুলো হামাকে বড় ধাক্‌কা দেয়, তাই তো দুঃখু হয়। সাধুকে যদি ঠিক ঠিক ভালবাসতে, তাকে কি দুঃখু দিতে পারতে? সাধুকে কেবল মুখেই ভক্তি দেখাও, বাকী (কিন্তু) তাঁর একটা কথাও মেনে চলতে পারলে কৈ? বিয়ে করলে না, তবু থিয়েটারে গিয়ে মেয়ে মানুষের নাচ দেখ্‌বার লোভটি ছাড়তে পারলে না। জানো…! মেয়ে মানুষের ছবির পানে, পুতুলের পানেও সাধুব্রহ্মচারীর তাকাতে নেই। মায়ার মোহিনীরূপের ফাঁদে পড়ে গেলে আর রক্ষে আছে—নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। তিনি বলতেন, "যে গাঁজা খায় না, তার সামনে গাঁজার কোল্‌কেটা থাকাও ভাল নয়, পাছে উদ্দীপন হয়। দেখো! ছাদে উঠ্‌বার সময় মুখ উঁচু কোরে—ভগবানের দিকে লক্ষ্য রেখে হুঁসীয়ার হোয়ে ধাপে ধাপে উঠে যেতে হয়। নীচের দিকে কামকাঞ্চনের দিকে নজর থাকলে পা পিছ্‌লে পড়ে যাবে। জেনো…! ব্রহ্মচর্য্যই সব সাধনার গোড়া। ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারীর মত সংযমের রাশ টেনে রাখলে পা পেছলাবে না, তবে 'পিওর' (pure, পবিত্র) জীবন গড়ে ওঠে।"

শ্রীলাটু মহারাজের শিক্ষাদানের কায়দাই ছিল হাসিখুসীর ভিতর দিয়া আবার মোলায়েম শাসনের ভিতর দিয়া। দোষগুণ বিচার না করিয়া নির্ব্বোধ পরানুকরণপ্রিয়তা (যাহাকে তিনি 'কাপি' Copy করা বলিতেন), কাজকর্ম না করিয়া অলসভাবে জীবনযাপন, পরপীড়ন —এই সকলের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। আমাদের চিত্তমল সংশোধনের জন্য তাঁহার অনুশাসন কত যে কল্যাণকর তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতাম। তিনি ছিলেন অদোষদর্শী। কাহারো একবিন্দু গুণ তাঁহার নিকট সিন্ধু প্রমাণ। তাঁহার নিকট কেহ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি কোনো ধর্ম্মমতের নিন্দা তাঁর নিকট কাহাকেও করিতে দিতেন না, বলিতেন, "ধর্ম্মের নিন্দা, গুরুর নিন্দা যে করে, তার আধার বড় অপবিত্র, সে ভগবান থেকে বহুদূরে পড়ে যায়। অপবিত্র হোলে লোকের দোষগুলো নজরে পড়ে। পবিত্র হোলে লোকের গুণগুলো নজরে পড়ে। গুণ দেখ্‌বার চোখ তোমাদের কুথায়, কেবল লোকের দোষ ধরতে শিখেছো। হিংসুটে স্বভাবের দরুণ তোমাদের উন্নতি হোচ্ছেনা। মনে হিংসাদ্বেষ পুষে রেখে বাইরে তিলকমালা পরলে কি ধর্ম্মী হয়? যারা পিঁপ্‌ড়ের গর্ত্তে ময়দা চিনি দ্যায়, আবার মানুষের গলায় ছুরী দ্যায়, তাদের ধর্ম্ম কুথায়? হিংসার জন্যেই তো এতো অনর্থ। আজকাল কেউ কারুর ভাল দেখতে পারে না, তাই সংসারে সুখশান্তির মুখ দেখতে পায় না।" একথা কি জান না যে অবিদ্যার প্যাঁচে পড়ে গেলে নানারকম দুঃখু এসে জোটে। সংসারে শান্তি কুথায় আনন্দ তো দূরের কথা। মনে রেখো—'ভোগই দুঃখের হেতু, ত্যাগই সুখের সেতু'। ত্যাগ মানে কি সব ছেড়ে ছুড়ে বনে চলে যাওয়া? ত্যাগ তো মনে। দুনিয়া জুড়ে মহামায়ার সংসার—সবাই সেই গণ্ডীর ভেতরে। দেখো! ভোগ থাকলে ভগবানে যোগ

হয় না—'যোগ' আর 'ভোগ' আস্মান জমিন্ ফারাক্। যতই ভোগ বাড়ে, ততই ঘুন নেমে পড়ে। ভোগের পাঁককোয়া থেকে মনকে তুলতে হোলে ত্যাগের দড়ি ধরে উঠতে হবে। ভোগে দুব্‌লতা (দুর্বলতা) আসে, ত্যাগে মনের জোর বাড়ে। জেনে রাখো— ত্যাগের ভেতর ভগবানের শক্তি থাকে,—মনকে তুলে দ্যায়। ত্যাগের জোরে মানুষ 'দেবতার' কোঠায় উঠে যায়। নিবৃত্তির পথে যে এসেছে, সেই জানে 'ত্যাগে' কত প্রাণের আরাম, কী শান্তি!"

এইরূপভাবে আমাদের উন্নত করাই লাটু মহারাজের ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই নিরক্ষর সাধুটির ভিতরে জাতির বা শিক্ষার গর্ব ছিল না। গরীবের দুঃখে এমন 'গলাপ্রাণ' দুনিয়ার হাটে বড় বেশী দেখা যায় না। তাঁহার ভিতরে বিশ্বপ্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হইত। পরমারাধ্য শ্রীব্রহ্মানন্দস্বামী মহারাজ আমাদের বলিয়াছিলেন— "লাটুর কাছে ঘেঁস্‌তে ভয় কিসের? অমন কঠোর ব্রতধারী সাধু ক'জন দেখতে পাওয়া যায়? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব—সেটা লোকসঙ্গ এড়াইবার জন্য, কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে ভরপুর। ওর ভেতরে সাধু ব'লে একটুও অভিমানের গন্ধ নেই"। খারাপ লোক বলিয়া যাহাদের সকলে ঘৃণার চোখে দেখিত, লাটু মহারাজ তাহাদের গলা ধরিয়া আদর করিতেন, কখনো বা কাঁধে হাত দিয়া পথে চলিতেন, সখার ন্যায় স্নিগ্ধ ভালবাসায় তাহাদের অভিষিক্ত করিতেন। সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াও, তাঁর প্রাণে কী গভীর প্রেম, অথচ মোহের লেশশূন্য! ভগবানের প্রেম স্বর্গ হোতে সরল মানব হৃদয়ে যখন নেমে আসে, তখন তাহার শুষ্কচিত্তকে নন্দনকাননে পরিণত করে। এই বালকস্বভাব সাধুপুরুষটির সেই স্বর্গীয় প্রেমপারিজাতের সৌরভে কে না আকৃষ্ট হইয়াছে?

শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন—"লাটুর ভিতরে ছিল সাধনালব্ধ শক্তি। সেই শক্তিবলেই নানাভাবে নানা উচ্চাঙ্গের তত্ত্বের কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইত—তাহা উপলব্ধির বাণী, অনেকে তাহা শুনিয়া বিমোহিত হইত। সেই অদ্ভুত শক্তির কাছে সবাই মাথা নোয়াইত। লাটুকে দেখিলাম—ধীরে ধীরে ভালবাসার মূর্তি হইয়া গেল। ইতর-বিশেষ আর সে প্রভেদ করিতে পারিত না। দুষ্ট লোককেও লাটু সমানভাবে ভালবাসিত, আদর যত্ন করিত। আমি লক্ষ্য করিতাম যে, সেই পুরাণো লাটু আছে, কেবলমাত্র মহাশান্তিময় পুরুষ হইয়াছে এবং ভালবাসার 'উৎস' হইয়া গিয়াছে।"

কামকাঞ্চনের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া প্রারব্ধবশে কাহারো পদস্খলন হইলে, পতিতের বন্ধু লাটু মহারাজের করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হইতে সে বঞ্চিত হইত না। তাহাকে সৎপথে—মানুষের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে মহারাজ স্নেহমাখাস্বরে কত বুঝাইতেন, বলিতেন, "ওরে! এমন মানুষজীবনটাকে পশুজীবনের মত নষ্ট করে ফেলতে নেই। দিল্লীকা লাড্ডু খেলে পেয়ে পস্তাতে হবে"। তাঁহার এই প্রকার করুণার স্নিগ্ধধারায় তাহার কুপ্রবৃত্তির আগুন নিভিয়া যাইত, সে পাপ পথ ভুলিয়া যাইত। যে সব ছোটখাট আড়ম্বরবিহীন কাজ লোকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সেই সব কাজের ভিতর দিয়াই এই মহাত্মার দরদভরা প্রাণের যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যাইত। মানবপ্রেম যাঁর বুকে একটানা ব'য়ে যায়, তিনিই মানুষকে এতখানি প্রাণ ঢেলে ভালবাসিতে পারেন। সেই প্রেমসূত্রই এই ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে অন্তর রাজ্য হইতে টানিয়া বাহিরে আনিত—এবং মানুষজনের ক্ষুদ্র প্রাণের সঙ্গে যোগ সংস্থাপন করিয়া দিত। যাঁহার চরিত্রে এইরূপ উদার প্রেমের ভাব, তাঁহার ত্যাগের অর্থ ভুলবার উন্মুক্ত করিয়া সর্ব্বজীবকে প্রেমে গ্রহণ; প্রেম বিতরণ; এমন প্রেমিক সন্ন্যাসী দেবতারও নমস্য! শ্রীলাটু মহারাজের অমর পুণ্যস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর চরণে বার বার প্রণাম করিতেছি। প্রণত হওয়া ব্যতীত আমাদের আর কি আছে।*

জীবন-কথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

১৮৮৬—১৮৯২

বরাহনগর মঠ—বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কালীপ্রসাদ দেখিলেন মুন্সীদের পুরাতন বাড়ীর উপর তলায় ছয়খানি ঘর ১১৲ টাকায় ভাড়া করিয়া সুরেশ মিত্র মঠ আরম্ভ করিয়াছেন। তখন মঠে তারক, হুটকো গোপাল এবং বুড়ো গোপাল থাকেন। কালীপ্রসাদও তাঁহাদের সঙ্গে রহিলেন। নরেন, শরৎ, শশী, রাখাল প্রভৃতি সকলে বাড়ীতে থাকেন ও মাঝে মাঝে মঠে আসেন। ঠাকুর পূজার কোনও বন্দোবস্ত নাই, তাঁহারা ঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেন। ভিক্ষা করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই আপনাদের মধ্যে পালা করিয়া রন্ধন করা হয়। আহারের খুবই কষ্ট ছিল। কোনও কোনও দিন তেলাকুচার পাতা সিদ্ধ করিয়া শুধু ভাত খাইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত। সুরেশ মিত্র, বলরাম বসু প্রভৃতি ভক্তগণ—মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের কথা আলোচনা করিতেন ও সংকীর্ত্তনাদি করিতেন। নরেন বালক ভক্তগণের সহিত মেলা মিশা করিয়া সংযোগ রক্ষা করিতেন। একদিন কালীপ্রসাদ, হুটকো গোপাল ও নরেন, শরতের বাড়ী গমন করিলেন। নরেন শরৎ ও শশীকে বরাহনগর মঠে আসিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বেড়াইতে বেড়াইতে বরাহনগর মঠে উপস্থিত হইলেন। শরৎ ও শশী সেই রাত্রে মঠে

---

* গত মাঘ মাসে পূর্ণিয়াভিভিতে বিবেকানন্দ সোসাইটির সভ্যগণের উদ্যোগে শ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিপূজা উপলক্ষে লেখক কর্তৃক পঠিত।

রহিলেন, নরেনও মঠে রাত্রি কাটাইলেন। শশী আর বাড়ী ফিরিয়া গেলেন না। ঠাকুরের গদিতে তাঁহার ফটো রাখিয়া, তাঁহাকে জীবদ্দশায় যে ভাবে সেবা করিতেন, শশী সেইরূপ করিতে লাগিলেন। যাহা আহার করা হইত তাহার অগ্রভাগ ঠাকুরকে নিবেদন করা হইত। সন্ধ্যার সময় জয়গুরু, জয়গুরু বলিয়া আরতি করা হইত। পরে গুরুগীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রণাম করিতেন।

এই সময়ে কালীপ্রসাদ বাহিরের একটি ঘরে শুইতেন এবং দিবসের অধিকাংশ সময় ধ্যানে কাটাইতেন। যখন ধ্যান করিতেন না তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তোত্র রচনা করিতেন এবং গীতা উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। শাস্ত্রের এক একটি শ্লোক লইয়া দিনের পর দিন ধ্যান করিতেন। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত যথার্থ অবগত হইতেন। রাত্রে শবাসনে শুইয়া ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। প্রথমে তিনি অনুষ্টুপ্ ছন্দে "লোকনাথশ্চিদাকারঃ" প্রভৃতি শ্লোক রচনা করেন। আরতির পর এই স্তোত্রের কতিপয় শ্লোক পাঠ করা হইত। সেই সময় তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাবে জীবন যাপন করিতেন। নিরামিষ আহার করিতেন বিছানায় শুইতেন না, নিমন্ত্রণে যাইতেন না, ভিক্ষা করিতেন, জুতা জামা পরিতেন না। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যান করিতেন কাহারও সহিত মিশিতেন না। এই সব কারণে তিনি যে ঘরে শুইতেন, সেই ঘরের নাম ক্রমশঃ হইল কালী তপস্বীর ঘর।

একদিন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন আমরা শাস্ত্র বিধানানুসারে সন্ন্যাস লইব। কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি বলিলেন "বিরজা হোম" করিলে বৈদিক মতে সন্ন্যাস লওয়া যায়। ১২৯৩ সালের মাঘ মাসের প্রথমে তাঁহারা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকা সম্মুখে রাখিয়া বিরজা হোম করিয়া যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের leader হইয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদ তন্ত্রধারক হইয়া অগ্নিস্থাপন করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মুখদিয়া সকলকে প্রেষমন্ত্র শুনাইলেন। নরেন, শশী, শরৎ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, সারদা ও কালীপ্রসাদ বিরজা হোমে যোগদান করিলেন। নরেন নিজের নাম 'বিবিদিষানন্দ' রাখিলেন, এবং সকলের নাম যার যার ভাবানুযায়ী প্রদান করিলেন। কালীপ্রসাদ অত্যন্ত কঠোরী ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য সোঽহং ভাবের সাধন করিতেন বলিয়া—তাঁহার নাম অভেদানন্দ রাখা হইল। এই হোমে তারক যোগদান করেন নাই। তিনি ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন, তিনি একখানা নেংটী পরিয়া শুইয়া থাকিতেন ও শবাসনে ধ্যান করিতেন। তিনি জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাস পছন্দ করিতেন না বলিয়া গুরুভাইদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বিরজা হোমে যোগ দিলেন না। তাঁহারা হোমের পর গঙ্গায় দণ্ড ভাসাইলেন। সেই দিন হইতে পূজা ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁহাদের আর অধিকার রহিল না। কিন্তু শশী মহারাজ পরমহংস হইয়াও ভক্তিমার্গ অনুকরণ করিয়া নিত্য গুরুপূজা, হোম, আরতি যথাপূর্ব্ব চালাইতে লাগিলেন। নরেন নিত্যপূজার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শশী

তাঁহার মত গ্রহণ করেন নাই। একদিন নরেন যখন শশীর নিত্যপূজার বিরুদ্ধে খুব বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চুলের মুঠা ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শশী নরেনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নরেন হাসিমুখে শশীকে ক্ষমা করিয়া, তাঁহার নিষ্ঠার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নরেন এই সময় ধ্রুপদ গান গাহিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন না। কালীপ্রসাদ তাঁহার সহিত সঙ্গত করিবার জন্য পাখোয়াজ বাজান অভ্যাস করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদের তালজ্ঞান ঠিক ছিল, নরেন তাঁহার তাল ও লয়ের সুখ্যাতি করিতেন। এমন কি নরেন যেদিন রামবাবুর বাড়ীতে গান করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী গোপাল মল্লিক সঙ্গত করিয়াছিলেন, সেদিন পাছে গোপাল মল্লিকের ওস্তাদী বাজনায় তাল কাটিয়া যায় সেই ভয়ে নরেন কালীপ্রসাদকে হাতে তাল রাখিতে বলিয়াছিলেন। গোপাল দাদা বাঁয়া তবলায় ঠেকা দিতে জানিতেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার নিকট হইতে বোলগুলি শিখিয়া লইয়া তবলা বাজান অভ্যাস করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি কীর্ত্তনের সঙ্গে খোলও বাজাইতে পারিতেন।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

(শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য)

(৬)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাকে আপন হাতে ও আপনার ছাঁচে গঠন করিয়া অলৌকিক শক্তির অধিকারী করিয়াছিলেন সেই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের এক চতুর্থাংশেরও অধিক কাল মার্কিণে অতিবাহিত হইয়াছিল। মানব-জীবনের এই অংশই শ্রেষ্ঠ অংশ। মার্কিণে তিনি কি করিয়াছিলেন সেই কথার আলোচনাই মহারাজের জীবনেতিহাসের প্রধান কথা এবং সেই কথা স্মরণ করিয়াই ইতিহাস চিরদিন তাঁহাকে জয়মাল্য অর্পণ করিবে।

এই কালের জীবনবৃত্তান্তরচনার উপাদানগুলি এখন পর্য্যন্ত সুদৃঢ় আধারে সুরক্ষিত হইয়াই রহিল—লোকলোচনের অন্তর্গত হইতে পারিল না! স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন পরমযোগী ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে, সেরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। ইঁহারা সকলেই ভারতের ধর্ম্ম-মহোৎসবের মহামূল্য ঐশ্বর্য্য। কিন্তু শুধু সেই কারণেই যে ইতিহাস স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে চিরদিন শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া মনে করিয়া রাখিবে, ইহা সম্ভব নহে। ঐশ্বর্য্য উৎসবের দিনে স্মরণীয় বস্তু—আর জাতিকে যিনি মর্য্যাদা দান করেন তিনি প্রতি দণ্ডের আরাধ্য দেবতা! এই মর্য্যাদাই জাতির প্রাণ।

ইতিহাস স্বামী অভেদানন্দকে কেন নিয়ত স্মরণ করিবে, বহু শাস্ত্রবিৎ বর্তমান ভারতের বৈয়াকরণ-চূড়ামণি ও হিন্দুস্থানের আচার্য-কুলপ্রদীপ পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'বিশ্ববাণীতে' (কার্তিক—১৩৪৮) তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"এই পদদলিত দীন ভারতের পুরাতন বাণী নূতন যুগের নূতন সমাজে প্রচার করিয়া যিনি বা যাঁহারা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার নূতন জগতের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জগতের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা কোন দেশ-বিশেষ বা জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নয়—তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি—তাহার উত্তরাধিকারী সকল দেশের সকল মানবসমাজ। যাহারা এই সম্পত্তিকে তাহার যথার্থ অধিকারী সেই বিশ্বমানব-সমাজে বণ্টন করিবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে অনেক উচ্চ স্তরে অবস্থিত। এইরূপ মহাপুরুষদের দ্বারা জগতের সকল মানব সমাজ উপকৃত হয়। এইরূপ মহনীয় ব্যক্তি যে দেশে যে ভাবে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি সকলেরই বরেণ্য—সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এই রকমেরই একজন মহাপুরুষ।"

ঐ প্রবন্ধেরই অন্যস্থানে অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন—"তাঁহাদের (স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ) ভিতরে সত্যমূলক ব্যাখ্যা করার অপূর্ব শক্তি ছিল। **যদি তাঁহারা পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ না করিতেন, তাহা হইলে, আজ আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়'কে যে অবস্থায় জগতে দেখিতে পাইতেছি, ইহার এইরূপ উন্নত অবস্থা কত দিনে কি ভাবে হইত, তাহা বলা যায় না।'**

'বিশ্ববাণীতে' (কার্তিক, ১৩৪৮) দেখিতে পাই, স্বদেশের এবং বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন বহুমানাস্পদ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"তাঁহার (স্বামী অভেদানন্দের) এই দেদীপ্যমান কীর্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।... এই সমস্ত মহাপুরুষেরাই যথার্থতঃ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও গৌরব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা করেন। স্বামী অভেদানন্দ এই কার্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার বিজয়-পতাকা চির উড্ডীন হইয়া জ্যোতিঃ-সঙ্কেতে ভারতবাসীদের চিরমঙ্গল ও চিরসত্যের দিকে আহ্বান করিবে।"

দেখিতে পাই কলিকাতার সুবিখ্যাত পত্রিকা "The Hindusthan Standard" ১৯৩৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন—যুক্তরাজ্যে রামকৃষ্ণ মিশন যে স্থান অধিকার করিয়াছে, স্বামী অভেদানন্দ অগ্রদূতরূপে যে ভাবে তথায় কার্য করিয়াছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠা লাভের পথে তাহা কম সাহায্য করে নাই। (১)

(১) And the position that the Ramkrishna Mission had attained in the States was not a little due to the pioneer work of Swami Abhedananda.

ঐ বৎসরের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকায়" দেখিতে পাই—**পাশ্চাত্য জগতে বেদান্ত যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে তাহার মূলে প্রধানতঃ স্বামী অভেদানন্দেরই অবিশ্রান্ত চেষ্টা বর্ত্তমান আছে।** (২)

স্বামী বিবেকানন্দের বৃহৎ জীবনচরিতের চতুর্থ খণ্ডের এক স্থানে আছে (৩)—**স্বামী অভেদানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মার্কিণ যুক্ত-রাজ্যে বেদান্তের প্রচার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য (striking) অগ্রগতি (progress) লাভ করিয়াছিল। (৪)**

এতকাল পরও অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় মহারাজের "এই দেদীপ্যমান কীর্ত্তি" স্বয়ং "প্রত্যক্ষ করিয়া" আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে বলিয়াছেন—স্বামী অভেদানন্দের "বিজয়-পতাকা চির উড্ডীন হইয়া জ্যোতিঃ সংকেতে ভারতবর্ষীয়দের চিরমঙ্গল ও চির সত্যের দিকে আহ্বান করিবে।"

যাহাহউক, এইরূপ অন্যান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া "বাঙ্গালার সাধক—দ্বিতীয়-খণ্ডে" আমি লিখিয়াছিলাম—"ভারতের যে গৌরব-পতাকা তিনি (স্বামী অভেদানন্দ) নিজের চরিত্র, জ্ঞান, প্রতিভা, বাগ্মীতা, সংগঠন-কৌশল ও প্রভূত শক্তির বলে মার্কিণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আজিও তাহা সেই পূর্ব্বগৌরবেই উড্ডীন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকগণ এখন মার্কিণে যাইয়া সেই পতাকাতলেই দণ্ডায়মান হইতেছেন। উহা ভিন্ন কোন বিশিষ্ট পরিচয় আর তাঁহাদিগের নাই।" উক্ত পুস্তকের অন্যস্থানে আমি লিখিয়াছি—"ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ২৫ বৎসর ধরিয়া এইরূপে মার্কিণের বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের জ্ঞান, ভারতের সভ্যতা, ভারতের সাধনা—ভারতের সংস্কৃতি ও ত্যাগময়ের যে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সন্ন্যাসি-প্রচারকগণ সেই পরিচয়ে আপনাদিগকে পরিচিত না করিলে স্বামী বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ কর্ত্তৃক বিজিত সেই মহাভূখণ্ডে অপরিচিতই থাকিয়া যাইবেন।

(২) It is mainly due to his (Swami Abhedananda) untiring efforts that the Vedanta Philosophy has secured a permanent foot-hold in the West.

(৩) Striking progress was achieved through the untiring exertions of the Swami Abhedananda in the United States of America.—The Life of the Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples (Mayaboti, 1918)—vol. IV, page 330.

(৪) The untiring labours of the Swami Abhedananda, following upon those of the Swami Vivekananda resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York.—The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915, vol III, page 349.

"সত্যে আঁট" না থাকিলে সমালোচক বা জীবনচরিতাখ্যায়করূপে আত্মপ্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা যেন স্বামীজির এই কথাটি কখনও না ভুলি,—"Truth stands on its own authority and truth can bear the light of day"—(জীবনচরিত, vol II, page—404)। এই কথাটি মনে রাখিয়া স্বামীজির বৃহৎ জীবন চরিতখানি পাঠ করিলেই দেখিতে পাইব যে সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ খণ্ড পর্য্যন্ত স্বামী অভেদানন্দের কার্য্যাবলী স্থানে স্থানে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহকারে বর্ণিত হইয়াছে। "আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে সে পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন সমস্ত দ্বন্দ্ব বিরহিত আদর্শ যোগী, আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ হিন্দুপ্রচারক—তিনি ছিলেন আদর্শ সংগঠনশক্তিশালী বীর্য্যবান্ মহাপুরুষ। মান, অপমান, স্তুতিনিন্দা তাঁহার নিকটে তুচ্ছ ছিল। স্বার্থ ভেদাভেদ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয় ছিল 'স্বামী অভেদানন্দ।' ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আদেশেই তিনি অভেদমন্ত্র গ্রহণ ও তাহার সাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
দুই সতীনে পীরিত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি।"

এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ক্রমে ক্রমে স্থিতপ্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত হইয়াছিলেন। মান-অপমান নিন্দা স্তুতি, বিষকুম্ভপয়োমুখের ছলনা, ভক্তের দীনতা, ভক্তিহীনের ছলনাময় প্রণাম ও স্তুতি-স্তবন প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার গোচরে আসিত! তিনি বুঝিতেন সব, জানিতেন সব, শুনিতেনও সব—কিন্তু যখন কিছু বলিতে হইত তখন শুধু একটু হাসিয়া উঠিতেন! সুতরাং—তখন অন্যের সাধ্য ছিল না যে, সেই কথা লইয়া পুনরায় আলোচনা করে! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এখন তাঁহার একখানি পক্ষপাতশূন্য জীবন-কথা রচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যিনি তাহা লিখিবেন, সেই ভাগ্যবান্ ঐতিহাসিককে সর্ব্বতোভাবে নির্ভীক ও স্বার্থশূন্য হইতে হইবে। লোকমত এবং ভ্রূকুটি যেন কোনরূপে তাঁহাকে কুণ্ঠিত না করে, ব্যাধের শরাঘাত আঘাত করিলেও যেন তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে এই জীবনকাহিনী তাঁহার যিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের "জ্ঞান-যজ্ঞের অধ্যক্ষ"—"স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র মনে করিয়া" যাহার "উপরেই প্রতীচীর জ্ঞান-যজ্ঞের অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন" যিনি "প্রতীচীতে অবস্থান করিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের বাণী সেই দেশের জ্ঞানপিপাসুগণের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে বিতরণ করিয়াছেন যে, তাহার ফলে সে দেশের বহু ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন" (৫)—যিনি

(৫) স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, অধ্যাপক। বিশ্ববাণী, কার্ত্তিক ১৩৪৮

রাখিতে হইবে যে এই জীবনকাহিনী তাঁহারই যাঁহার কীর্ত্তি আজিও আমেরিকায় "দেদীপ্যমান।" (৬)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্বামী বিবেকানন্দের মায়াবতী-সংস্করণের জীবনকাহিনী (১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪ এবং ১৯১৮ সালে পর পর প্রকাশিত) একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রামাণ্য বলিতেছি কারণ লেখকগণ প্রত্যেকটী বিবরণের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া বহু বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে স্বামী অভেদানন্দের কিছুদিনের কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায়। সে বিবরণও খুবই সংক্ষিপ্ত কারণ অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁহার সুপ্রসারিত প্রচার-ব্যাপারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা ইতিবৃত্তকারগণ অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছেন (Well nigh impossible to compress within a few pages a full and systematic description of the wide spread propaganda &) (৭)।

স্বামী বিবেকানন্দের লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ভারত-যাত্রা করিবার পর প্রায় দশ মাস অশেষ কৃতীত্বের সঙ্গে লণ্ডন, উইম্‌ব্লেডন্‌ এবং অন্যান্য স্থানে বেদান্তের বাণী শুনাইয়া যখন মহারাজ তথায় ক্রমেই বেশী জনপ্রিয় হইতেছিলেন (There was no doubt that he was becoming more and more popular) (৮) তখন (১৮৯৭ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে) বেদান্ত সমিতির পুনঃ পুনঃ জরুরী আহ্বানে তাঁহাকে মার্কিণে যাইতে হইল। ওই আগষ্ট নিউ ইয়র্কে আসিয়া তিনি দেখিলেন নামে মাত্র ("Nominal") একটি বেদান্ত সমিতি নিউইয়র্কে বর্ত্তমান আছে। (Swami Vivekananda nominally formed a Vedanta Society (in New York) with Miss Philips as its Secretary and Mr. Van Haagen, Miss Waldo and Mr. and Mrs. Goodyear as its members ইত্যাদি।) (৯)। মহারাজ দেখিলেন—"স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরিয়া ইতঃপূর্ব্বে যে শিষ্যমণ্ডলী দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তখন বেদান্ত ত্যাগ করিয়াছেন। সামান্য যে কয়েকজন তখনও অনুরাগী ছিলেন স্বামীজি মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) শুধু তাঁহাদিগকে লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলেন।" এই বর্ণনার পোষকতায় ঐ গ্রন্থের (বাঙ্গালার ২য় খণ্ড) পাদটীকায় নিম্নলিখিত গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। Farewell Address to His Holiness the Swami Abhedananda given by

(৬) স্বামী অভেদানন্দ—অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। বিশ্ববাণী, কার্ত্তিক ১৩৩৮

(৭) The Life of the Swami Vivekananda—(Mayaboti, 1915) vol. III, page 344.

(৮) ঐ।

(৯) Leaves from my Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী—চৈত্র ১৩৪৫। ডায়েরির এই অংশ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনকালেই প্রকাশিত হয়। তখন বা এখন পর্য্যন্ত কেহ ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

the Vedanta Society of New York on May 14th, 1916—The Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India, page IX.

উক্ত মানপত্রের যে ইংরাজি অংশের মর্মানুবাদ 'বর্ত্তিকা'য় দেওয়া হইয়াছে সেই অংশটি এই :—

"When you came to New York, of all those who had gathered so eagerly around Swami Vivekananda, you found scarcely a handful of earnest students. With these you began your labour."

এই গ্রন্থের প্রকাশকের মুদ্রিত মন্তব্য পাঠে জানিতে পারি যে বরোদার গায়কোয়াড় মহারাজের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—স্বামী অভেদানন্দ যে শুধু সাফল্যের সহিত বেদান্তের মহৎ বাণীই মার্কিণে প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, ভারতের প্রতি মার্কিণের প্রকৃত সহানুভূতি ও প্রীতি জাগ্রত করিতেও তিনি সমর্থ হইয়াছেন। ("Has not only succeeded in spreading the great teachings of Vedanta but has also *awakened* in the American a true sympathy and love for India)." (১১)। যে সভায় উক্ত মানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল গায়কোয়াড় সস্ত্রীক নিউইয়র্কের সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়াছেন যে (১৮৯৭) ৬ই আগষ্ট তারিখে স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে আসিবার পর হইতেই নিউইয়র্কে বেদান্তের প্রতি আকর্ষণ নবশক্তি লাভ করিয়াছিল। (The interest in the Vedanta philosophy received a new impetus) (১২)। মার্কিণে স্বামী অভেদানন্দের প্রথম চারি মাসের প্রচার কার্য্য যে কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এই মন্তব্য তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে এবং প্রকাশ করিতেছে তাঁহার অসাধারণত্ব। প্রচার কার্য্যে এই অসাধারণত্বই ছিল মহারাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার উপর মার্কিণে বেদান্ত প্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মার্কিণে স্বামীজি যে ব্রত কেবলমাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্‌যাপিত হইয়াছিল মহারাজের অতি তীব্র প্রাণান্তকর নিষ্ঠা ও সাধনায়। মহারাজের ডায়েরি (১৩) হইতে জানা যায় যে আগষ্ট মাসে তিনি নিউইর্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া, নিউপ্যাল্‌ৎস প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া নানা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সকল নবীন বন্ধুর মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং কেহ কেহ বা

(১১) Publisher's Note—Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India—(1929).

(১২) The Life of the Swami Vivekananda (Mayabati 1915) vol III, page—347.

(১৩) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী, চৈত্র—১৩৪৫।

ছিলেন তাঁহার বন্ধু। আগষ্ট মাসে মহারাজ যেখানেই গেলেন সেখানেই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধেয় অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার মুখে বেদান্তের বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। স্বামীজির "জ্ঞান সন্তান" "সুযোগ্য অধ্যক্ষরূপে" তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগের আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহার অনাড়ম্বর ব্যবহার, সুকণ্ঠ, ভগবানে নির্ভরশীলতা, শিশুসুলভ অকলঙ্ক হৃদয় এবং সত্যের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ প্রভৃতি সবারেই তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিল। (They admired my simple manners, good voice, faith in God, childlike purity of heart and love for truth.) মহারাজ তখন যে ভাবে রাজযোগ ও বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন তাহা সকলেরই মনে লাগিল। (১৪)

আগষ্ট মাসের শেষভাগে তিনি যখন ভার্জিনিয়ায় আসিয়া কাউন্ট দাদেমারের (Count Dademar) প্রাসাদে কয়েকদিন অতিথিরূপে বাস করিলেন তখন ভারতের সংস্কৃতি ও হিন্দুদর্শনাদি সম্বন্ধে কাউন্ট ও কাউন্টপত্নীর সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা হইতে লাগিল। সেই আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া কাউন্ট এবং কাউন্টেস্ বেদান্তের দিকে ক্রমে ক্রমে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং কহিলেন যে নিউইয়র্কে ও আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার ব্যাপারে তাঁহারা যথাশক্তি সাহায্য করিবেন। (The Count and the Countess became more and more interested in Vedanta and expressed their desire to help me in my new mission in New York and America.) (১৫)।

সে সময়ে নিউপাল্‌জে মিসেস্ আর্থার স্মিথ নাম্নী একজন বিদুষী নারী বাস করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে Mother Smith বলিয়া ডাকিতেন। মিসেস্ আর্থার স্মিথের ভারতবর্ষে জন্ম হয়। হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্রের উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। স্বামী অভেদানন্দ সেই Mother Smith-এর অতিথি হইলে পর তিনি ত্রিশজন সম্ভ্রান্ত নর-নারীকে নিজগৃহে আহ্বান করিয়া একটি পারিবারিক বৈঠক করিলেন। সেই বৈঠকে বেদান্ত দর্শন ও ভারতের নরনারী সম্বন্ধে মহারাজকে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় নিযুক্ত হইতে হয়। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নানা প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া এবং বেদান্তের মহতী বাণী ও রাজযোগ সম্বন্ধে সুললিত আলোচনা করিয়া মহারাজ সেখানে এমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন যে অখৃষ্টান হইলেও সে স্থানের চার্চে পর্যন্ত রবিবাসরীয় উপাসনাকালে উপস্থিত হইবার জন্য সাগ্রহে আমন্ত্রিত হইলেন। তাঁহার উদার মতবাদ শুনিয়া কি চার্চের ধর্মযাজক, কি সমুপস্থিত উপাসকমণ্ডলী সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইলেন। On Sunday I went to their Church and attended the Service. The minister and the parishioners were immensely pleased to see me in their Church and

(১৪) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী—চৈত্র ১৩৪৫।
(১৫) ঐ

to find me so broad and liberal (১৬)। সপ্তাহ পরেই নিউপাল্‌ৎজে একটি সাধারণ সভা আহূত হইল। সেই সভায় মহারাজ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিলেন এবং বহু লোকের বহু প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন। (১৭)।

সভা অন্তে (২৫শে সেপ্টেম্বর) স্বামী অভেদানন্দ ও মিস্ উয়াল্‌ডো (হরিদাসী) নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার একদিন পরই স্বামী সারদানন্দের সহিত বহুদিন পর মহারাজের মিলন ঘটিল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন বোষ্টনের পার্শ্ববর্তী পল্লী কেম্ব্রিজ-ম্যাসের (Cambridge-Mass) বিদুষী নারী মিসেস্ ওলিবুলের অনুরোধে তিনি স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে বেদান্ত-প্রচার করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রিয় গুরুভ্রাতার সহিত এই সাক্ষাতের যে বর্ণনা স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা চিত্তস্পর্শী। 'বিশ্ববাণীর' পাঠকবর্গ ইংরেজি ভাষায় লিখিত সেই বিবরণ পাঠ করিয়াছেন বলিয়াই উহার মর্মানুবাদ দিতে নিবৃত্ত হইলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিবৃত্তকারগণ যে ভাবে স্বামী অভেদানন্দের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মহারাজের ডায়েরি অবলম্বনে নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল।

২৯ সেপ্টেম্বর (১৮৯৭) হইতে স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে অবস্থিত হইয়া বেদান্ত সোসাইটীর গৃহে নিয়মিত ভাবে ধর্ম ব্যাখ্যার ক্লাশ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক রবিবারে তিনি সাধারণ সভায় ধর্ম প্রচার করিতেন। এই সকল সভায় শ্রোতার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নভেম্বর মাসে স্বামী অভেদানন্দ মণ্টক্লেয়ারবাসীদিগের আহ্বানে প্রতি সপ্তাহে একটী করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রুক্‌লিন্ এবং অন্যান্য স্থান হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য সাগ্রহ আহ্বান আসিতে লাগিল। সময়ের অভাবে মহারাজ সে সকল আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

মহারাজের ডায়েরিতে দেখিতে পাই যে, এই সময়ে (অক্টোবর, ১৮৯৭) তিনি চতুর্দিকে এতই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন যে, নিউইয়র্ক হইতে দূরে অবস্থিত অন্যান্য নগরীর নিকটবর্তী গ্রাম হইতেও নরনারী সভায় আসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা এতই লোকরঞ্জক হইয়াছিল যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একাধিকবার তাহা দিতে হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ডায়েরি হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—I returned to New York on October 16th···and lectured on "Concentration" in my class ···on October 27th. I lectured on "Concentration" before an audience of 128. (পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে মহারাজ একজন অপরিচিত সন্ন্যাসীরূপে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে, অর্থাৎ ৬ই আগষ্ট নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন এবং ২৯ সেপ্টেম্বর 'মট্ মেমোরিয়াল্ হলে' যখন তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হয় তখন শ্রোতা ছিলেন মাত্র ৫০ জন!)······After

(১৬) My-Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী—চৈত্র, ১৩৪৫।
(১৭) ঐ।

hearing my lecture, Mrs. Wheeler and her friends invited me to deliver the same lecture in Montclair. I accepted their invitation and went there on November 1st, 1897 and lectured on "Concentration" (which was afterwards published in my 'Spiritual Unfoldment') before an audience of about 601. ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর তারিখে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ঐ মণ্টক্লেয়ারেই মিসেস্ Wheeler-এর গৃহে কতিপয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সম্মুখে "Concentration" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু 'Those who heard Swami Saradanand's lecture on the same subject admired my method of handling that subject as well as my voice and delivery." (—My Diary—Swami Abhedananda, in the বিশ্ববাণী, ১৩৪৬)। সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্বামী অভেদানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—What is Vedanta, Concentration, Individuality versus Personality, Maya, Concentration, The Aim of Life, Self-control, Universality of Vedanta, Self-control, Renunciation—its real meaning, Pratyahar—the Preliminary to concentration, Are we born sinners, Pranayam, Reincarnation, The Attributes of God, Unity in Variety, Samadhi or Superconscious State, Is Vedanta practical ?' Non-attachment, Modifications of the mind-substance, Various Aspects and Names of one God, The secret of devotion, The Sankhya system, God in everything, Salvation in this life, Egoism its Nature, Vedanta Philosophy, Brahman and Maya, Scriptures—what do they teach !

বক্তৃতার বিষয়-বস্তুই বলিয়া দেয় বক্তার প্রতিভা, প্রজ্ঞা, মৌলিকতা ও প্রচারক হইবার যোগ্যতা। "স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র মনে করিয়া স্বামী অভেদানন্দের উপরেই প্রতীচীর জ্ঞান-সত্রের অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি যে কতদূর সত্য তাহা মহারাজের মাত্র প্রথম চারি মাসের মার্কিণ-বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু অনুধাবন করিলেই ঈর্ষা-কলঙ্কবিরহিত নির্ম্মলচিত্ত যে কোন পাঠকের নিকট প্রতিভাত হইবে।

প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি,—রক্তাম্বরা ঊষা যেমন পূর্ব্বাকাশে সহসা দেখা দিয়া দিগন্তবিস্তারী তেজোরাশির আবাহন করে, মহারাজের লণ্ডনে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতাও সেইরূপ তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজোরাশির আবাহন করিয়াছিল। সে বক্তৃতা যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বুঝিতে বাকি ছিল না যে, স্বামীজি যদিও তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সুদূর ভারতে গমন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া ফেলিয়া

যাইতেছেন না—তাঁহাদিগের জন্ত রাখিয়া যাইতেছেন তপঃসমুজ্জ্বল একটি নবীন ভাস্কর! তাঁহারা তাই একান্ত নির্ভরে মহারাজের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন এবং সার্দ্ধ এক মাসের মধ্যেই দেখিলেন, নানা মতাবলম্বীকর্ত্তৃক পরিপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ রাজধানী লণ্ডনে মহারাজের ভাগ্যবজনোচিত আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, (১৮)—তাঁহার বাণী লোকের অন্তর জয় করিতেছে তাঁহার আলোকস্পর্শে বহু দিনের নিবিড় ঘন অন্ধকার দূর হইয়া যাইতেছে! রাজ্য জয়ের গৌরব অপেক্ষা অল্পকালের মধ্যে এইরূপে বিদেশী ও বিধর্ম্মীর চিত্তজয়ের গৌরব কি কোনও অংশে কম? আমরা বাঙ্গালী তাই বাঙ্গালীর এই অপূর্ব্ব গৌরব আমাদিগকে তুর্জ্জয়ের সাধনক্ষেত্রে চিরদিন প্রবুদ্ধ করুক।

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিবৃত্তকারগণ বলিতেছেন—দ্বিতীয় বৎসরের (১৮৯৭) স্বামী অভেদানন্দ এক জানুয়ারি মাসেই বারশটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বক্তৃতার সময়েই বহু জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্ শ্রোতা উপস্থিত হইতেন ("Large and intelligent audience")। এই সময়ে শ্রোতাদিগের বিশেষ অনুরোধে (special request) অনেকগুলি বক্তৃতাই (Several of his lectures) তৃতীয়বার এমন কি চতুর্থবার পর্য্যন্তও করিতে হইয়াছে। যে সকল বিষয়ে বক্তৃতা হইত তাহা ছিল নূতন এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় (the importance and the newness of the subjects of teaching)। বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যাহাতে শ্রোতৃবর্গ ভালোরূপে গ্রহণ ও ধারণা করিতে পারেন সেই কারণেই বক্তৃতার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইত। (১৯)

উক্ত মন্তব্যের অন্তরালে প্রণিধানযোগ্য দুইটী ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করি। "Large and intelligent audience" বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। মহারাজের বাক্‌-নৈপুণ্য এবং জটিল ধর্ম্মতত্ত্বের চিত্তরঞ্জক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিবার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল বলিয়াই এরূপ সম্ভব হইয়াছিল। অনেকগুলি বক্তৃতার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইত শুনিলে ইহাই মনে হয় যে শ্রোতাগণ শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন—শুধু হুজুগে মাতিয়া নহে। মহারাজের বাক্‌-নৈপুণ্যে তাঁহারা বেদান্তের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেন বুলিয়াই পুনরাবৃত্তি করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ ("Special request") জানাইতেন। এইরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত স্বামী অভেদানন্দ ২৫ বৎসর যাবিৎ বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই সে দেশে বেদান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে

(১৮) The Swami Abhedananda was there (at the Royal Society of Painters in water colours in Piccadally). He had now made a place or himself in the huge metropolis, and it was to him that the gathering unconsciously turned for solace on this day of loss (Swamiji's departure from London).—The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915) vol III, page 60.

(১৯) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915), vol III, pages 347

পারিয়াছিল ! সে দেশের চিন্তাধারার সহিত বেদান্তকে মিলাইয়া দিবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার জয়ের পথটা বিঘ্নমুক্ত করিয়াছিল।

চরিতাখ্যায়কগণ বলিতেছেন—বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে এবং ব্রুক্লিনে গীতা অধ্যাপনার ক্লাশ খুলিয়াছিলেন। (সে অধ্যাপনার রীতি ছিল এইরূপ মনোমুগ্ধকর যে) যাহারা গীতা অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ("Not a few of his students") মূল গীতা এবং তখন পর্য্যন্ত অনন্দিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিবার মানসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। (২০) ইহা ছাড়া তিনি যোগ ও ধ্যান শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিত ক্লাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে সকল ক্লাশ একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন ছাত্রে ("Earnest students") পূর্ণ থাকিত। তাঁহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু সংস্কৃতির মহত্বের উপর বিশেষরূপে আস্থা সম্পন্ন না হইলে কখনই বিশেষ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সহিত ("with great zeal and devotion") প্রাণায়াম শিক্ষা করিতেন না ! তাঁহাদিগের হৃদয়ে কে এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিল ? উত্তরে বলিতেই হইবে পরম কুশলী আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ। ইহাই কি আরও সূচিত করে না যে ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি পর্য্যন্ত সামান্য এই কয়েক মাসেই স্বামী অভেদানন্দের লোকোত্তর শক্তি ধীরে ধীরে সে দেশের চিত্ত জয় করিয়া ভারতের সংস্কৃতি ও সর্ব্বমানবের মুক্তির হেতু ভারতের বেদান্তের মহিমার বিজয়-কেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ! এমন শক্তিধর ছিলেন যিনি, ভারতের ইতিহাস চিরদিন তাঁহার শ্রীপদে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, নিবেদন করিবে।

যখন দেখি নানা সভা সমিতিতে ("Clubs") বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহার নিকট অসংখ্য ("Numerous") আহ্বান আসিত, তখনই বুঝিতে পারি পাঁচ মাসের মধ্যেই তিনি মার্কিণের নানাস্থানে নিজেকে এমন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যে, জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য ব্যগ্র থাকিতেন। সে সময় আমেরিকার চিন্তা-জগৎ নানাবিধ কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন ছিল এবং যাহা-কিছু অসম্ভব, যাহা-কিছু ভূয়া লোকে তাহাই ধরিয়া থাকিত ! সেইরূপ "Curosity seekers" এবং "representatives of the Cranky and fraudulent elements" (২১) মহারাজের ক্লাশে বা বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত থাকিয়া হুজুগে মাতিয়া বাহবা দিবার জন্য উন্মুখ থাকিত না ! এই শ্রেণীর লোকের স্থান সেখানে ছিল না। সেখানে "audience of intelligent persons"ই শুধু থাকিতেন—যাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গোঁড়া খৃষ্টান এবং অনেক ছিলেন অন্যান্য কারণে সে দেশের নাগরিক

(২০) The life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915) vol III P. 348.

(২১) ঐ (Mayaboti 1915) vol 11, page 349.

জীবনক্ষেত্রে সুবিখ্যাত। এইরূপ শ্রোতার (বক্তৃতা সভায় ও ক্লাশে) সংখ্যাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যাইত ! (The growth of interest is unmistakable in steadily increasing audiences of intelligent persons, many of them members of orthodox Churches, with a representation of well-known persons in public life······(২২)

এপ্রিল মাসের (১৮৯৭) সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথমাদ্ধের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এই কালের মধ্যেই শুধু এক মট্‌-মেয়োরিয়াল্ হলে তিনি ৯৬টী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তখন যাঁহারা তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয় চিরদিনের মত তাঁহার নিকট শ্রদ্ধাবনত হইয়া রহিল ! "Secured the lasting esteem of all who had come within the sphere of his influence." (২৩) মার্কিণের বড় সুবিখ্যাত সংবাদপত্র, যেমন The Sun, The New York Tribune. The Critic ; The Literary Digest, The Times, The Intelligence and Minds তখন মহারাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে এবং নিউ ইয়র্কে বেদান্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ("The untiring labours of the Swami Abhedananda, following upon those of the Swami Vivekananda resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York.") (২৪)।

পাঠকগণকে এখন স্মরণ করিতে বলি যে স্বামী অভেদানন্দের মাত্র ছয় মাসের (১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে পর বৎসরের এপ্রিল পর্য্যন্ত)। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এইরূপ অঘটন ঘটিয়াছিল ! বেদান্তগৃহীত ভিন্ন অপরের পক্ষে এরূপ জয়লাভ কি কখনও সম্ভব ?

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবৃত্তান্ত লেখকদিগের এই সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া পক্ষপাত-শূন্য কোন্ পাঠক না বলিবেন যে, মার্কিণে বেদান্ত-প্রতিষ্ঠার মূলে স্বামী অভেদানন্দের কর্ম্মকুশলতাই বর্ত্তমান আছে ! কীর্ত্তিভূষিত যশোমণ্ডিত শক্তিসমন্বিত এমন কর্ম্ম-জীবনের সুবিস্তৃত কাহিনী প্রকাশিত হইয়া এখনও অন্ততঃ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রচারিত হইল না —ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ" সিরিজের প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিকভাবে একই সময়ে রচিত হয় নাই। এক এক সময়ে এক একটি লিখিত হইয়াছে। সেই জন্য স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া লেখক মার্জ্জনা-প্রার্থী হইয়াছেন।—বিঃ সঃ।

(২২) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1913) vol II page 363

(২৩) ঐ (Mayaboti 8915), vol III, page 349.

(২৪) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—vol. III pages 347—349.

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর পত্র

The Ramakrishna Vedanta Ashrama
Darjeeling July 8th 1934.

স্নেহের র—,

তোমার প্রেরিত ধূপকাঠিগুলি ভালভাবে পাইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে কিছু দিয়াছি এবং আমার ঘরেও জ্বালাইয়াছি। ইহার গন্ধ বেশ সুমিষ্ট ও প্রীতিদায়ক। মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধূপকাঠি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির জন্য ভেলা কর্পূর যদি পাঠাইতে পার তা হ'লে আশ্রমের মন্দিরে পূজায় লাগিবে।

তুমি নিত্য পূজা জপ ধ্যান দুইবেলা করিতেছ শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। বর্ত্তমানে এইভাবে চলিতে থাক, নিত্য প্রার্থনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্তোত্রপাঠ, তাঁহার কথামৃত পাঠ এবং মধ্যে মধ্যে ভগবদ্গীতা পাঠ করিবে। এইরূপ করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। আশ্রমের সমস্ত কুশল এবং কার্য্য বেশ চলিতেছে। কলিকাতায় সমিতির সকলে ভাল আছে এবং তথাকার কার্য্যও বেশ চলিতেছে।

তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।—ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

The Ramakrishna Vadanta Ashrama
Darjeeling June 12th 1934.

স্নেহের র—,

তোমার প্রেরিত ধূনার parcel সহ তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র……পাইয়া প্রীত হইয়াছি। ঐরূপ ধূনা এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ধূপ বলিতে আমরা ধূপকাঠি (Incense sticks) বুঝিয়া থাকি।

একণে তোমার পূজা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—প্রাতে নিত্যকর্ম স্নানাদি সমাপন করিয়া পবিত্রভাবে পূজা আরম্ভ করা বিধেয়। পূজার পর আহারাদি করিবে। পূজার পূর্ব্বে কিছু আহার না করাই ভাল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় সুবিধা না হইলে দুই এক ঘণ্টা পরে রাত্রিভোজনের পূর্ব্বে জপ ধ্যান করবে এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা করিয়া এবং তাঁহার পাদপদ্মে সমস্ত দিনের কার্য্যের ফল মনে মনে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিবে। অর্থাৎ সমস্ত দিন যে

সকল কার্য্য করিয়া থাক তাহার ফল সমর্পণ করিবে। সেই সকল কর্ম্মদ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতেছি এই ধারণা মনে সর্ব্বদা রাখিতে চেষ্টা করিবে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা করিবে। তুমি মনে শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছ এবং শারীরিক ভাল আছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

Darjeeling, 27th May 1934

স্নেহের ব—,

তোমার 5th March তারিখের পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তখন আমি কলিকাতায় নানাকার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম এবং শরীর অসুস্থ ছিল সেই কারণে সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। তজ্জন্য কিছু মনে করিও না।

তুমি এতদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন স্থাপিত করিয়া নিত্য পূজা করিতেছ। ইহাতে তুমি তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছ নিশ্চিত জানিবে। তুমি অপর কাহারও নিকট দীক্ষা লইবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞা যখন করিয়াছ তখন আমি তোমাকে মন্ত্র লিখিয়া দিতেছি যথা :—……এইমন্ত্র তিনবার ভক্তিপূর্ব্বক উচ্চারণ করিবে। এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে দশবার ঐ মন্ত্র জপ করিবে। এই মন্ত্রে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা ও জল ফুল, ইত্যাদি নিবেদন করিয়া দিবে। পূজান্তে ঐ মন্ত্র দশবার জপ করিবে। সন্ধ্যার সময় ঐ মন্ত্র দশবার জপ করিবে এবং হৃদয়াসনে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। তৎপর প্রার্থনা করিবে। স্তোত্ররত্নাকরে সর্ব্বশেষে লিখিয়া দিয়াছি যে ভক্তির পূজাতে কোশা কুশী প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বরের আবশ্যকতা নাই। এইরূপে তোমার দীক্ষা ও মন্ত্রগ্রহণ সংক্ষেপে হইয়া গেল জানিবে। পরে আমার সহিত যখন কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে পারিবে তখন দীক্ষার অন্যান্য নিয়ম বিস্তারিতভাবে বিধিপূর্ব্বক করাইয়া দিব। বর্ত্তমানে উপরোক্ত নিয়মে পূজা করিয়া স্তোত্রপাঠ করিতে থাক। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তোমার ভক্তিবিশ্বাস বর্দ্ধিত হউক এবং তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ কর।

আশ্রমের সমস্ত কুশল এবং আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

পুঃ—গুরুদক্ষিণাস্বরূপ কিছু ভাল ধূপ এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে।

সঙ্ঘবার্ত্তা

কালীকীর্ত্তন—৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে বাগবাজার বিশ্বনাথ স্মৃতি সম্মিলন কীর্ত্তনদল কর্ত্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীকালীমায়ের গুণকীর্ত্তন হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল দুই শতাধিক লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ মায়ের নাম শুনিয়াছিলেন। ঐ দিনের কীর্ত্তন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্ত দলপতি শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর কৃতিত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ফ্রীস্কুল
আবেদন

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর অনুপ্রেরণায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ফ্রী প্রাইমারী ও ফ্রী টিউটোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলিকাতা শহরে বেকার যুবকদের শিল্প ও দরিদ্র শিশুগণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্ত শ্রীমৎ স্বামী সদাত্মানন্দজীর নেতৃত্বে কতিপয় নিঃস্বার্থ ত্যাগব্রতী কর্ম্মী আপনাদের শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন। আজ ১৮ বৎসর ধরিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা দান বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকায় বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্ত দেশের আর্থিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া পাকা বাড়ী তৈয়ার করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া একটী টালির ঘর করিবার কথা স্থির হইয়াছে। ইহাতে প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হইবে। সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া নভেম্বর মাসে উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। সশ্রদ্ধ প্রদত্ত অর্থ অথবা গৃহ নির্ম্মাণের যে কোন দ্রব্য নিম্নের ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি, ১৯ বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাবনায় শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জন্মোৎসব

পাবনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে গত ২৫শে অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জন্মতিথি দিনে বিশেষ পূজানুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ ও কীর্ত্তনাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। তৎপরে গত ২৮শে অগ্রহায়ণ স্থানীয় ৺বিহারী সাহার ঠাকুর বাড়ীতে বহু ভক্ত নরনারীর সম্মিলনে একটী ধর্ম্ম সভার অনুষ্ঠান হয়। ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের বালিকাগণ কর্ত্তৃক স্বামী অভেদানন্দজী রচিত 'প্রকৃতিং পরমাং—' স্তোত্র ও শ্রীমদ্ ব্রহ্মচারী পরেশ চৈতন্যজি মহারাজ 'রচিত এস এস এস বিশ্বে কে আছ কোথায়' গানটী গীত হয়। এবং শ্রীযুক্ত বিজেশচন্দ্র পাকরাশী এম,এ বি-এল কর্ত্তৃক একটী সময়োচিত গান গীত।

হয়। ইহার পরে শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর পাল বি এল মহাশয় শ্রীমায়ের সম্বন্ধে স্বরচিত একটী কবিতা এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সরকার বি এল মহাশয় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ পঞ্চতীর্থ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনালোকে ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন মাতৃগণ আপনারা জাগরিত হউন। আপনারা সমাজের আদর্শ। শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে অনুকরণ করুন। ভারতের চিরন্তন আদর্শ উজ্জ্বল হউক। ভারত মাতা সুসন্তান লাভ করুক। এইভাবে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-পূজা সার্থক করিয়া তুলুন।

পুস্তক পরিচয়

Youman's Therapeutic Hints—by Dr. K. D. Goswami,—Published by Hahnemann Publishing Co. 185, Bowbazar St. Calcutta. Ph. 276. Price 2/8/-.

পুস্তকখানি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে—স্বনামধন্য ডবলিউ ইউনান সাহেবের প্রবন্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ের আলোচনা, দ্বিতীয়ভাগে—কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কেসের (case) ইতিহাস ও ঔষধের ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ভাগে—clinical hints প্রদত্ত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে যাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তিনি এই পুস্তক পাঠ করিলে লক্ষ্য করিবেন যে ডাঃ হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত ঔষধগুলিই প্রধানতঃ ডাঃ ইউনান সাহেব ব্যবহার করিতেন। পুস্তকের প্রথমাংশে প্রকাশিত বক্তৃতাগুলি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। ইহার দ্বিতীয় অংশে প্রকাশিত রোগ ও রোগীর বিবরণ হইতে পাঠকবর্গ বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও প্রথিতযশা ইউনান সাহেবের চিকিৎসা প্রণালীতে যে কি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা এইসকল বিবরণ হইতে জানা যায় না।

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের বৃহস্পতি Kent বলিয়াছেন—Morbid changes of the mind are the basis of the prescription. ডাঃ গোস্বামী যে সব কেস্ (case) উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে রোগীর Morbid change of the mind-এর বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। এইদিক দিয়া বিচার করিলে পুস্তকখানির মূল্য খর্ব করা হইয়াছে।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

The Scientific View of Death

Swami Abhedananda

(Continued from the last issue)

MIND AND PRANA

Thus we see that there are two principal factors in the body, the one is mind and the other is the vibration of Prana or the vibratory state of cells and tissues of the body ; but the vibratory state of the cells and tissues is governed by the mind. Mind is the creator. It is the manipulator. It is the organizer. It is the director of all the organic functions. The organs might go on vibrating in their own way, but that would not be the standard of life. There must be co-ordination. The heart-action must correspond in a certain way with the action of the lungs, and all this intricate mechanism must be all adjusted in such a way that one helps the other. Otherwise, there would be no life. If one screw is loose anywhere that screw must be tightened ; otherwise the machine would not work. And who tightens this screw ? It is the individual self-conscious life-force, which is called, in ordinary terms, the living soul. Living soul means the self-conscious individualized, life-force with the sense of "I" ; and that sense of "I" holds them together, I am this body. I am Mr. so-and-so. This sense of "I" holds all together, unifies them, and makes the separate parts vibrate and produce a perfect harmony, and that harmony is life. As in an orchestra there might be a hundred instruments, and if each instrument goes on playing in its own way without following the direction of its conductor it will produce no harmony but discord ; similarly, if the organs of the body go on beating in their own way, without producing any harmony, without having any co-ordination, without being directed by their conductor then it is useless. Who is the conductor of the organs ? Who is the director ? The orthodox science does not see that director, but this advanced science tells us that there is a director, and this director has the absolute control over the whole organism. He is the living soul. At the time of death he disconnects himself from the organs and leaves the body.

In cases of trance, catalepsy and ecstasy, this living soul leaves the body, but the connection is not entirely cut off. There still remains some kind of connection. It is like the umbilical cord of a new-born babe which holds this entity as connected with the physical body. Therefore the

physical body can be revived ; but when the connection is entirely cut off, the body cannot be revived. Then it is called death. That is the difference. This difference very few people understand. But this living soul which goes out of the body at the time of death can be photographed. And the most delicate, sensitive instruments have been used to weigh the body, just before death and immediately after death, and making all allowances for the gases that escape, it has been found that the substance which passes out of the body at the time of death has a definite weight of about half an ounce or three-quarters of an ounce.

This fine substance that emanates from the body at the time of death has a luminosity, and this luminous substance is photographed, and can be seen by the psychic, as passing out of the body. The whole body becomes enshrouded with a kind of luminous mist. I remember the case of a girl, whose brother died in Los Angeles, some years ago. I heard it from her mother. At the deathbed of her brother the young girl said : "Mamma, mamma, see, there is a mist around his body, what is it ?" But the mother could not see it. She said, it comes out of the body. Scientists have taken up that subject in Europe and are experimenting on this emanation. They call it "Ectoplasm." It is a vapour-like substance, but it has no particular form. It is like a cloud, but it can take a shape or a form, and can be photographed. What substance it is, they do not know ; but they cannot deny its existence.

Our human bodies are emanating that substance all the time. It can be seen especially at the time when there is a medium in a trance-like condition. The materializing mediums emanate that very strongly. I have seen it in *seances*, and in private *seances* when there was no professional medium at all. I have handled it, touched it. There is no particular feeling when we feel "Ectoplasm." It cannot be described. But when it takes a definite shape, then it becomes almost like solid, like flesh of our own body. It can take any form.

At the time of death, all these vital forces that are governing the different organs, become concentrated and centralized into one point, before it leaves the body, and then we find the dying person's sight becomes dim, and the sensations of the body become faint, and gradually the whole body is going through a transformation. And in this transformation there are cases where the psychic powers of the individual manifest. Some of the dying persons develop clairvoyance and clairaudience. They can appear just at the time of death, either before or immediately after, to distant friends, in the form of an apparition, and

they can give their messages. Such cases have been recorded by the scientists. The French Astronomer Camille Flammarion had written a book entitled *The Unknown* on that subject, by gathering all the authentic reports made under the test conditions in different families, which describe the experiences of different people immediately at the time of death or after death. Fifteen hundred such records were gathered, and afterwards he selected quite a few out of them which were absolutely authentic, and published them in this book. Now, these records show that there is something which is not the result of the physical body. This "Ectoplasm" is a substance which contains finer matter in vibration, and this finer matter forms the under-garment of the soul, and the gross physical body is the outer garment. So, we have two bodies, the gross physical body and this finer or ethereal body, which exists in each one of us. We may not feel it at present, because our sight and senses are looking for the gross, material, tangible objects. But it does not become tangible until it is brought down to the plane of our senses. The plane of our senses depends upon a certain degree of vibration. We can see light when the vibration of light is within the range of our vision. From red to violet our eyes can see, but if there be less vibrations than the red, we do not see it. In order to become visible it must vibrate in a certain way so that our organs might catch. Just like sound. There are sounds which we do not hear at all, because our organ of hearing is imperfect. Similarly the ethereal body cannot be seen until it is brought within the range of our vision by a process which is called materialization. It is a process which brings the finer matter, which is vibrating at a high rate, into a lower rate of vibration so that we can catch it, or get a glimpse of it.

VERDICT OF THE VEDANTA

The Vedanta Philosophy is in perfect harmony with the conclusions of this latter kind of advanced scientists who hold that mind and the living soul are distinct factors in creating disease, bringing on death, and manufacturing the physical body. These ideas we find in the Vedanta Philosophy, which is the oldest system of philosophy in this world. The truth never grows old. The truth that was discovered five thousand years ago is the same truth today, even if it be re-discovered by the modern scientists. For we must remember that truth is one. There is only one condition which can be absolutely true. The others are imitations of truth. That absolute truth might have been discovered ages before, but because

of the time, the truth does not change. It is the eternal truth. Therefore we find that this finer body which I have just described is called in Vedanta the "subtle body," which is the under-garment of the soul, and the gross physical body is the outer garment. When the soul has performed certain functions and has enjoyed certain pleasures, and has fulfilled certain desires it finds that this gross physical body is no longer of any use, and it does not work right. Then the living soul leaves the gross body and manufactures another. Just as you have run a motor-machine for two years, and after two years you find that the parts are worn-out and that it has done its service, then you leave it and get another. That is exactly what the living soul does. You cannot blame the soul for doing that. Because the body is the instrument through which the soul must manifest its powers, gain experiences, learn the lessons and gather knowledge. In this way, the living soul is progressing in the process of evolution, rising from a lower to a higher state, and fulfilling its mission at every step of manifestation.

This idea of life will explain the mystery of death. Death is no longer myterious when we know that there is an entity which has manufactured this instrument and which is dwelling in it, and which leaves it when the time comes. So death does not mean the annihilation of anything, or destruction, or reduction into nothingness of anything; but it means disintegration. It means that the instrument which has served its purpose must be thrown away, and another instrument must be rebuilt, out of the same material, perhaps. Who can tell that the atoms and molecules which made up the body of Cleopatra thousands of years ago are not used in the bodies of living beings today? The same atoms and molecules that are buried in the dead bodies, have been dissolved and taken up by the vegetable life, have reappeared in the forms of plants or cereals, and we might be eating them and taking them in again, and they are forming parts of our own body. So, it is a revolution. Nothing is destroyed. The atoms and molecules go into one body, get out, and enter into another body. And in this continuous process of life and its manifestations, of evolution and involution, the living soul is the master. That living soul has no death. Where will it go if it were destroyed? Do you think it could go into nothingness? No, it is impossible. Science tells us that which has existed once, will continue to exist forever. But the physical form of the body will go. It has no existence. It is constantly changing. The form that you had when you were a little baby is gone. The form that you had yesterday you have not got today.

The form that you have this minute, you will not have it next minute. It is a continuous influx and reflux of matter. It is just like a whirlpool. The particles of matter are revolving and keeping up the shape according to the type that you have manufactured, so that there would be an identity.

Now, in this vortex of the particles of matter which are constantly in motion, there is something that is constant and unchangeable within us. That is our consciousness. If you ever see your own hand or any part of the body through X-ray, you will find like a revelation that your body consists of finer particles of mist-like matter, which are hanging around the outline of the bones. The gross physical body which appears as solid is not at all solid. It is just like a cloud, and we think it is solid only under certain conditions. At the time of death, the soul leaves this plane and enters into another plane of consciousness, which may be called another dimension. We are now living in three dimensions. There is another dimension where the sense-objects do not exist at all. It is beyond the limitations of our physical body. Even the motion of the earth and of the planetary systems do not exist there. We cannot imagine such a state unless we get a glimpse of that other dimension. It is called the fourth dimension. Where does the human soul go? It does not go anywhere after death. It remains in the fourth dimension and cuts off all connections with the physical world of three dimensions. The third and fourth dimensions are related to each other just like a wheel within a wheel. We know, through the study of science, that the cells of the body are constantly moving. But do we feel that motion? Are we conscious of it? No! When we sit still, we are enjoying that quiet, but there is a constant motion going on within our system, which we are not conscious of. So, the departed soul is not conscious of the changes and conditions of the gross physical body.

So, our bodies are nothing but the instruments, the garments of the soul. Therefore Vedanta tells us that when a person dies, he is not really dead, but death means a change, change from one state of consciousness into another state of consciousness, and the soul throws away the gross physical body at the time of death just as we throw away our old worn-out garments. This idea is beautifully expressed in the Bhagavad Gita: "As we throw away our old worn-out garments and put on new ones, so the living soul, after using the body which is the gross physical garment, throws it away when it is worn-out, and manufactures a new one."

(Concluded)

সম্পাদক—স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ ও স্বামী সদ্‌বুদ্ধানন্দ কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট [illegible] প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র

বিশ্ববাণী

১৩৪৭—১৩৪৮

তৃতীয় বর্ষ

সম্পাদক

স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

স্বামী সদ্‌রূপানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রেস
কলিকাতা

বিশ্ববাণী

বর্ষসূচী

(ফাল্গুন ১৩৪৭—মাঘ ১৩৪৮)

বিষয়	লেখক ও লেখিকা		পৃষ্ঠা
(অ)			
অনন্তরামের ক্রিয়াযোগসার	অধ্যাপক সুবোধ রায় এম, এ,	...	৮
অদ্বৈতবাদ,	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ		৪৪, ৭২, ৯৯, ১৩১, ১৮৭, ৩১৩, ৩৪০
অভেদানন্দ প্রশস্তি	সঙ্গীতাচার্য্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৫৩
অভেদানন্দ বিংশতিকা	শ্রীগোপী	...	১৮৫
(আ)			
আর ডেকার্ট	শ্রীহেমেন্দ্র বিজয় সেন, এম, এ, বি, এল	...	২
আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ	রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য		১৯৬, ২২০, ২৫১, ৩০৩, ৩৪৯, ৩৯৪
(ক)			
কৃষি ও সভ্যতার মূলকথা	ধীরানন্দ ঠাকুর	...	৮৯
কয়েকখানি প্রাচীন দলিল	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	...	১১০
(গ)			
গ্রন্থ সমালোচনা			১৫২, ২১৭, ২৬৮, ২৯৪, ৩৬৭, ৪০৯
(জ)			
জীবন, (কবিতা)	সচ্চিদানন্দ সান্যাল	...	১১৫
জীবন কথা,	স্বামী শঙ্করানন্দ		১২৭, ১৫৭, ১৯৯, ৩৬২, ৩৯২
(ড)			
ডায়েলেকটিক্ তত্ত্বে শ্রেণীগত বৈষম্য	কুমুদবন্ধু সেন	...	৯৯

বিষয়	লেখক ও লেখিকা		পৃষ্ঠা
	(ত)		
তিব্বতে বৌদ্ধসঙ্ঘের গোড়ার কথা	অজিত ঘোষ		৩০, ৬৯, ১২২, ১৭৩
তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়	রাসমোহন চক্রবর্ত্তী, পি, এইচ. ডি,	..	৩৫৯
তন্ত্রকথা	বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	...	৮৪
তিব্বতের বৌদ্ধ সঙ্ঘ	অজিত ঘোষ	...	৩৭৮
	(দ)		
দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি	শ্রীমৎ শীলাচার ভিক্ষু	...	৩৮
	(ন)		
নিবেদন			১১৬, ২২৫, ৩২৩.
নিবেদন, (কবিতা)	নলিনীবালা বসু	.	২২৯
	(প)		
পুস্তক পরিচয়		...	৪০৯
প্রারম্ভে		...	১
পানিনি	৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ		১০২, ১৬৭, ২১০,২১৫
প্রেম,	রায়সাহেব নদীয়াবিহারী দাস		২৭৬
প্রার্থনা (কবিতা)	নবশশী দেবী	...	৩৪৮
	(ব)		
বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয়কুমার	ডাঃ মনোমোহন ঘোষ, এম, এ, পি, এইচ, ডি,		১২
বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী বেদানন্দ	...	৫১
বিবেকানন্দ স্মরণে	বিমলাকান্ত লাহিড়ী এম. এ	...	৬১
বাঙ্গলার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান	৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	৬৫
বুদ্ধ পূর্ণিমা (কবিতা)	স্বামী বেদানন্দ	...	৮৭
বাঙ্গালীআনা	ধীরানন্দ ঠাকুর, এম, এ	...	১৪৯
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	স্বামী বেদানন্দ	...	১৭৬
বেদান্তে জগৎ কারণ	পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ	...	১৫৪
বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর	ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য	...	২৫৯
বুদ্ধ ও পাতঞ্জলযোগ	অধরচন্দ্র দাস, এম, এ, পি, আর, এইচ, ডি		২৯৭
বিকৃত বিজ্ঞান	অধ্যাপক রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এম, এস-সি		৩০০
বিবিধ		...	৩৬৬
বিদ্রোহী	সচ্চিদানন্দ সান্যাল এম্-এ, বি-এল্	...	৩৭৭

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
	(ম)	
মৌর্য্যযুগ,	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পি, এইচ, ডি ...	১৩৫, ১৬৯
মহারাজ সকাশে,	কিশোরীমোহন মণ্ডল ...	২০৭
মহারাজের উপদেশ	" ...	২৮১
মৌর্য্য যুগের প্রাক্কাল,	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি,	৭৭
	(য)	
যুগমানব বিবেকানন্দ	স্বামী বেদানন্দ ...	১৪১
রবীন্দ্রনাথ, (কবিতা)	অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	২১৯
	(স)	
সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক অনুসন্ধান	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি	১১, ৬০, ১০৯
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ...	৯১
স্বামী অভেদানন্দের চিঠি	... ...	৮৬
স্বামী অভেদানন্দজীর পত্র	... ...	২৩৭
স্বামী অভেদানন্দজীর স্মৃতিসভা	... ...	
স্বামী অভেদানন্দ	পণ্ডিত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী এবং অধ্যক্ষ, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ...	১৭২
স্মরণে	নলিনীবালা বসু ...	২২১
সঙ্ঘবার্ত্তা	...	২৮, ৮৯, ১১৭, ২০৫, ৪০৮
	(শ)	
শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের চিঠি	...	২৭, ৪০৬
শ্রীরামকৃষ্ণ	অধ্যাপক, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ...	২৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)	চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ...	৩৮১
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে (কবিতা)	বিমলকান্ত লাহিড়ী ...	১২১
শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্মরণে	রামদাস ভৌমিক ...	২৩১
শক্তিপূজা	কুমুদবন্ধু সেন ...	২৩৫
শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র	... ...	১৭৫
শ্রীশ্রীমা	স্বামী অভেদানন্দ ...	২৩৭
	(হ)	
হে মোর দেবতা, (কবিতা)	হীরেন্দ্রনাথ গুহ ...	৩২২

English

বিষয়	লেখক ও লেখিকা		পৃষ্ঠা
A			
Attitude of Vedanta. towards all Religions.	Swami Abhedananda	...	328
E			
Ego & Egoism,	Swami Abhedananda	...	53
Evolution and Religion.	Swami Abhedananda	...	249
I			
Is Vedanta, Pantheistic	Swami Abhedananda	...	19
L			
Life af Mohammed,	Swami Abhedananda	...	1
Swami Abhedadanda		...	325
T			
The Spiritual Evolution of the Soul,	Swami Abhedananda	...	25
The Ideal of Education	Swami Abhedananda	...	33, 41
The Scientific View of death		...	369, 410
P			
Pre-Existence and Immortality	Swami Abhedananda	...	284
V			
Vedanta and the Teachings of Jesus	Swami Abhedananda	...	47

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৮ | ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগুণামৃতম্

স্বামী অভেদানন্দ

ন জানেহন্যদ্বিনা দেবং রামকৃষ্ণং কদাচন।
যথাহর্ভকো ন জানাতি কিঞ্চিদ্ধি মাতরং বিনা॥
কদা যোগী কদা ভোগী—কদা বা জ্ঞানবিত্তমঃ।
কদা ভক্তঃ কদা শাক্তো বৈষ্ণবশ্চাপি বা কদা॥
মহাভাবে কদা মত্তঃ প্রেমবিহ্বলমানসঃ।
সমাধৌ বা কদা তিষ্ঠন্নির্বিকল্পকসংজ্ঞকে॥
পূর্ণব্রহ্মস্বরূপেণ রাজতে যো মহেশ্বরঃ।
পরানন্দাত্মনস্তস্য চৈতন্যঘনরূপিণঃ॥
লীলারূপহরেরেবং ভক্তার্থং দেহধারিণঃ।
রামকৃষ্ণস্বরূপস্য নানাভাবসমান্বিতান্॥
তত্ত্বং দেব ন জানামি রামকৃষ্ণ তব প্রভো।
যাদৃশোহসি কৃপাসিন্ধো তাদৃশায় নমো নমঃ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর পত্র

(১)

Darjeeling
19-5-1935.

স্নেহের—

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীশ্রীমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ শুনিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে। তাঁহার কৃপা হইলে তিনি তোমাকে সব দেখাইয়া দিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি যখন দেখিবে তখন তাঁহার নিকট শুদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাস প্রার্থনা করিবে। তুমি রীতিমত মালা জপ করিতেছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি।

বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং এই আশ্রমের সমস্ত কুশল। কতদিন এখানে থাকিব তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন।

তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং শ্বশ্রূমাতাকে জানাইবে। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ

(২)

২৭শে জুন
Darjeeling

স্নেহের—

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি এবং তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বপ্নে দেখিয়াছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি।

নিজের মৃত্যু স্বপ্নে দেখিলে অপর কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে এইরূপ শুনিয়াছি। এখন এখানে বৃষ্টি কমিয়াছে। গতকল্য আদৌ বৃষ্টি হয় নাই। রৌদ্র উঠিয়াছিল এবং রাত্রে চাঁদের আলো সুন্দর হইয়াছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতের বরফের উপর সূর্য্যকিরণ প্রাতঃকালে অতি চমৎকার দেখায়। গতকল্য এবং অদ্য প্রাতে ৫।০টার সময় আমার ঘর হইতে দেখিয়াছি। এ দৃশ্য বোধ হয় তুমি কখনও দেখ নাই। এই হিমালয়কে শাস্ত্রে স্বর্গ কহে। পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ ঐ চিরতুষারাবৃত হিমালয়েই, হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে। তুমি মহাভারত রামায়ণ পাঠ করিবে। বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আশ্রমের সমস্ত কুশল। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ

মহারাজের উপদেশ

শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল

• রাজযোগ—৫।৮।২৫

জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই রাজযোগের সাধনা করতে পারে। স্ত্রী, শূদ্র, খ্রীষ্টান বা মুসলমান ব'লে রাজযোগ সাধন করতে কোনও বাধা নেই।

যম ও নিয়ম পালনই রাজযোগের foundation (ভিত্তি)। ঠিক ঠিক ভাবে যম ও নিয়ম পালন না করলে, ভগবানে চিত্ত স্থির করা যায় না। ঈশ্বরলাভই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে যম ও নিয়ম পালন ক'রে ভিতটা আগে পাকা ক'রে নিতে হবে। এ সমস্ত সাধন ছেলেবেলা থেকেই আরম্ভ ক'রে দিতে হয়। অনেকে বলে, সাধন ভজন এখন কেন? ও বুড়ো বয়সে করা যাবে। এখন সংসারটা ভোগ ক'রে নেওয়া যাক্। কিন্তু বুড়ো বয়সে সাধন করা যায় না, বাল্যকালই সাধন ভজনের প্রশস্ত সময়। বাঁশ পেকে গেলে, সে বাঁশ কি আর নোয়াতে পারা যায়? বাঁশ কচি থাকতে থাকতে নোয়াতে চেষ্টা কর্ত্তে হয়। পাখীর গলায় কাঁটী উঠ্‌লে, সে পাখী আর পড়ে না। পাখীর গলায় কাঁটী উঠ্‌বার আগে বুলি শিখাতে হয়। বুড়ো পাখী সখ্‌ ক'রে আর কে পোষে? ঠাকুর সেজন্যে ছোট ছোট ছেলেদেরই বেছে নিতেন। ছোট বেলায় যদি কোনও একটা ভাব মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারা যায়, বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত সে ভাবটা থেকে যায়; সহজে সে ভাবটা নষ্ট হয় না কিন্তু বুড়ো বয়সে সহজে কোনও নতুন ভাব মাথার ভিতর ঢুকতে চায় না। যদিও কোন রকমে ঢোকে, তা হ'লেও সাধন করার জন্য যেরূপ চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন, সেরূপ সামর্থ্য থাকে না। বাল্যে ও যৌবনে মানুষ যেরূপ চিন্তা ও কার্য্য করে, বৃদ্ধ বয়সে তার সেই সংস্কারই অত্যন্ত প্রবল থাকে। সে সংস্কারকে সহজে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঠাকুর বলতেন, মন হচ্ছে সরষের পুঁটুলী, পুঁটুলী একবার খুলে গিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেলে একত্র করা কঠিন। সেজন্যে বাল্যকালই সাধন ভজনের প্রশস্ত সময়। এই সময়ই আরম্ভ করে দিতে হয়।

যম হচ্ছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।

অহিংসা মানে হিংসা না করা। হিংসা তিন রকমের—(১) কায়িক; (২) মানসিক ও (৩) বাচনিক।

কায়িক—শরীর দ্বারা কোনও হিংসামূলক কাজ করা;

মানসিক—মনে মনে কাউকে হিংসা করা;

বাচনিক—হিংসাত্মক কোনও কথা মুখে বলা।

উক্ত তিন প্রকারের হিংসা আবার তিন প্রকারে সম্পন্ন হয় (১) কৃত, (২) কারিত ও অনুমোদিত।

কৃত—নিজে কাউকে হিংসা করা;

কারিত—কাহারও দ্বারা অন্যকে হিংসা করা;

অনুমোদিত—কাহারও হিংসামূলক কাজে অনুমোদন করা।

নিজেই কর, কাউকে দিয়ে করাও আর অনুমোদনই কর—এই তিন রকমের হিংসাই পাপ এবং সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করাও হিংসা। শত্রু ও মিত্রকে যিনি সমান চোখে দেখেন, তিনিই অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই যথার্থ যোগী। Jesus (যিশুখ্রীষ্ট) বল্‌তেন, 'ডান গালে চড় মারলে, বাম গাল ফিরিয়ে দেবে' এর মানে এই যে, প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না। ঠাকুরও বল্‌তেন, কেউ অন্যায় করলে তুমি যেন তার উপর তোমার বিষ ঢেলো না।

পরশ্রীকাতরতাও (jealousy) হিংসা।

অহিংসা অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম সোপান। হিংসা থাকতে ঈশ্বরলাভ হয় না। সেজন্যে অহিংসা প্রথমে অভ্যাস কর্ত্তে হবে।

যখন কেউ অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার আর কেউ শত্রু থাকে না। এমনকি বনের হিংস্র জন্তরাও তাকে হিংসা করে না। তখনকার দিনে মুনি ঋষিরা বনে জঙ্গলে থাক্‌তেন, কিন্তু বনের অতি হিংস্র সাপ বাঘেও তাঁদের কোনও অনিষ্ট করতো না।

মনে হিংসা থাক্‌লে ইতর প্রাণীরাও তাহা বুঝ্‌তে পারে। একে Power of telepathy বলে! যদি তুমি কাহারও উপর হিংসার ভাব পোষণ কর, এই শক্তির দ্বারা সে তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্ব্বে, মুখে বা কাজ কর্ম্মে তুমি প্রকাশ কর আর নাই কর। আমি যখন হৃষিকেশে থেকে সাধন কর্ত্তাম, তখন আমি সারা দিনরাত্রের মধ্যে বেলা ৩।৪ টার সময় আহার কর্ত্তাম। খাবার নিয়ে নদীর ধারে যেতাম। নদীতে একটা উঁচুমত পাথর পড়ে ছিল। তারই উপর গিয়ে বসে বসে খেতাম, সেই সময় আমার খুব কাছে অনেক মাছ এসে খেলা কর্ত্তো! আমিও খেতাম আর রুটী ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাদের একটু একটু ক'রে খেতে দিতাম। তারা আমায় দেখে পালাতো না। আমার হাতের কাছে এসে খেলা করতো। তারা আমাকে তাদেরই একজন মনে করতো। কতদিন বনে জঙ্গলে বেড়িয়েছি কিন্তু কখনও সাপ বাঘের মুখে পড়ি নি।

যার মনে হিংসার ভাব না থাকে, তার মুখের ভাব বদলে যায়। মুখ সৌম্যভাব ধারণ করে।

সত্য—যা শোনা যায় বা দেখা যায় তা যথাযথ বর্ণনা করার নাম সত্য। তবে সত্য কথা বললে যদি কা'রও জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে তা' হ'লে মিথ্যা বললে পাপ হয় না।

যে কখন স্বপ্নেও মিথ্যা বলে না তার বাকসিদ্ধ হয়। বার বৎসর যে সত্য কথা বল্‌তে পারে তার বাক্ সিদ্ধ হয়। যে ইহা পালন করতে পার্কে, সে-ই এর ফল পাবে। • সত্যই ভগবান। তাঁকে পেতে হ'লে সত্য কথা বলতে হয় এবং সত্যপথে থাকতে হয়। সকল শাস্ত্রে একই কথা। ঠাকুর যা বলতেন, তাহাই করতেন ; কিছু দরকার না থাক্‌লেও তা করতেন, যদি বলে ফেল্‌তেন বাহ্যে যাবো, তা হ'লে বাহ্যে যাবার প্রয়োজন না থাকলেও বাহ্যে যেতেন।

তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। Ideal (আদর্শ) খুব উঁচুতে রাখতে হবে। নিজেকে ideal (আদর্শ) করো না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *

স্বামী শঙ্করানন্দ

আমরা দেখি যাহারা সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী অনুভূতির দ্বারা বিচলিত হন না, তাঁহারাই অমৃতত্ব লাভ করেন। এই সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি-নিচয়ের বাস্তব সত্বাও নাই। যাহাদের বাস্তব সত্বা নাই তাহাদের অস্তিত্বও নাই, তাহারা অনিত্য, কিন্তু যাহাদের বাস্তব সত্বা আছে তাহাদের অস্তিত্বও আছে, তাহারা নিত্য। জ্ঞানিগণ নিত্যই বা কি আর অনিত্যই বা কি তাহা জানেন এবং জানেন উভয়ের পার্থক্য কোথায়। তাঁহারা জানেন—যাহার কোনও কালে পরিবর্ত্তন হয় না তাহাই নিত্য—তাহাই সত্য, আর জানেন—সুখ দুঃখ, রোগ স্বাস্থ্য, আনন্দ নিরানন্দ, জীবন ও মৃত্যু যাহা অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা অনিত্য—তাহা মিথ্যা।

আমরা দেখি সুখ-দুঃখাদি অনুভূতির আদি আছে—তাহারা কিছুকাল থাকে এবং পরে চলিয়া যায়। কতকগুলি অনুভূতি অধিক সময় থাকে বটে তবুও তাহারা আসে ও যায়—তাহাদের আদি ও অন্ত আছে। যাহাদের আদি ও অন্ত আছে তাহারা কখনও নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহাদের নিত্য সত্বা নাই—তাহারা অসৎ। নিত্য সত্বা বা নিত্য অস্তিত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে আমরা যে সকল পরিবর্ত্তনসমূহ দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকটির আদি আছে সুতরাং তাহারা সত্য নহে—অসৎ। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাহা কিছু আছে তাহা দেশ ও কালদ্বারা সীমাবদ্ধ। এই দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদিগকে সত্য বস্তুকে জানিতে দিতেছে না। ইহাকে ত্যাগ করিলেই আমরা সেই নিত্য বা সত্যের রাজ্যে উপস্থিত হইব। এই অবস্থা লাভও অবশ্য খুব সহজ নহে।

---

* স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ইংরাজী "Gita Lectures" অবলম্বনে।

এই অবস্থা লাভের জন্য—এই সত্যের রাজ্যে উপনীত হইবার জন্য আমাদিগকে বিচারশীল হইতে হইবে। অনিত্য হইতে নিত্যকে এবং নিত্য হইতে অনিত্যকে সর্ব্বদা আলাদা করিতে হইবে। প্রতিদিন আমরা যে সকল কাজ করি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং আমরা যে সকল অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা পদার্থের সংস্পর্শে আসি তাহাদের প্রত্যেকটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোনটী সৎ বা কোনটী অসৎ এবং ইহাদের পার্থক্যই বা কোথায়। যদি আমরা সৎ ও অসতের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া অসৎকে সৎ বলিয়া ভ্রম করি ও তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি তাহাহইলেই আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে। অবশ্য এই প্রকার ভ্রান্তিই অবশেষে আমাদিগকে ঠিক পথে লইয়া যাইবে, তবে ইহার জন্য আঘাতটাতো আমাদের সহ্য করিতেই হইবে? দুঃখ কষ্ট যাহা এই প্রকার ভ্রান্তির ফলে আসিবে তাহা এড়াইবার তো উপায় নাই?

বহির্জগতে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থেরই আদি ও অন্ত আছে। এই চেয়ার বা টেবিলখানির কথাই ধরিনা কেন। যাহাকে আমরা টেবিল বা চেয়ার বলি তাহা শুধু কাঠ নয়। কাঠ কোনও এক বিশেষরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং ইহা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতেছে, আর এই নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত কাঠের নামই আমরা দিয়াছি টেবিল বা চেয়ার। কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে চেয়ারের রূপের কোনও সাদৃশ্য নাই। টেবিলখানি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল—কি রহিল? রহিল কতকগুলি কাঠের টুকরা। টেবিলখানি গেল কোথায়? কাঠগুলিকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ ছিল তাহাই বা গেল কোথায়? নামই বা গেল কোথায়? আবার এই কাঠখণ্ডগুলি পোড়াইয়া ফেল, কাঠেরও আর কিছুই থাকিল না। সেই কাঠ গেল কোথায়? যে মৌলিক পদার্থের সংযোগে কাঠ উৎপন্ন হইয়াছিল ইহা তাহাতেই পর্য্যবসিত হইল মাত্র। কাঠ বলিতে আমাদের মনে যে নাম ও রূপের ছবির উদয় হইয়া থাকে তাহার অস্তিত্ব একেবারে লোপ হইয়া গেল। কাঠ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা টেবিল নহে। যতক্ষণ উহার ঐ নির্দ্দিষ্ট রূপ ছিল ততক্ষণই ইহাকে আমরা টেবিল বলিয়াছি। এই রূপ কোথায় ছিল? হয় তো ইহা শিল্পির মনে ছিল। তাহার মন হইতে বাহিরে প্রকাশিত হইয়া এই টেবিলের রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং টেবিলটীর ধ্বংসের সঙ্গে সেই রূপটীও অন্তর্হিত হইয়াছে। এই নাম ও রূপ অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং যাহা কিছুর নাম ও রূপ আছে তাহার পরিবর্ত্তন—তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। এই পৃথিবী, এই সূর্য্য ও এই গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলীর রূপ আছে সুতরাং ইহাদেরও ধ্বংস হইবে, ইহারা চিরস্থায়ী নহে। এখানে 'ধ্বংস' মানে নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন। যাহা তুমি মন ও ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিতে পার এবং যাহারই নাম ও রূপ আছে তাহা ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের আদিও আছে সুতরাং তাহাদের অন্তও আছে।

চেয়ার, টেবিল বা কাঠে এই নাম ও রূপ কি ভাবে আছে? চেয়ারের নাম ও আকার

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও থাকে যে, ইহা কাঠের বা লোহার বা বেতের। একটা কলসের কথাই ধরিনা কেন। কলস—এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মৃত্তিকা, পিতল, বা তামার জ্ঞানও উপস্থিত হয়। কলসের রূপটী ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ইহার উপাদান আরো অধিক কাল স্থায়ী। কাঠ, লোহা, বেত, পিতল বা তামাকে তাহাদের অণু পরমাণুতে পরিণত করিলে দেখা যায়, তাহাদের সেইরূপও চলিয়া গিয়াছে। তাহা অণু ও পরমাণুতে পরিণত হইয়াছে। যাহাহউক এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে আমরা নাম ও রূপের পরিবর্তনশীল প্রবাহ মাত্রই দেখিতে পাই। তাহা হইলে জগতে কি সত্য বলিয়া কিছুই নাই? এই আপাতপ্রতীয়মান অসীম পরিবর্তনরাশির ভিতরে কি এমন কিছু নাই যাহার কোনও পরিবর্তন হয় না—যাহা সর্বদা একরূপ? এই পরিবর্তন-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়াই শূন্যবাদী দার্শনিকগণ তাঁহাদের মতের দৃঢ়ভিত্তির সন্ধান পাইয়া বলেন—জগৎ নাই, ইহার অস্তিত্ব কোনও কালে ছিল না এবং এই জগতের পরিণতি অনন্ত 'শূন্যে'। বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায়ের এই মত ছিল। তাঁহারা বলিতেন—জগৎ শূন্য হইতে আসিয়াছে, শূন্যে মিলাইয়া যাইবে এবং যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক—তাহা শরতের মেঘের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

এই শূন্যবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার নয়। খ্রিস্টপূর্বের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতের বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এই ভাবেই বিচার করিতেন। কিন্তু বেদান্ত বলেন, এই জগৎ শূন্য হইতে আসে নাই এবং শূন্যে বিলীনও হইবে না। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের অভ্যন্তরে অপরিবর্তনশীল এক সত্তা রহিয়াছে—যে সত্তা বা অস্তিত্ব এই পরিবর্তন-রাশির ভিতরেও অনুভব করিতে পারা যায়।

এই অপরিবর্তনশীল সত্তাটী কি? পরিবর্তনশীল এই নাম রূপের অন্তরালে সত্য কোন পদার্থ আছে কিনা? আমরা জানি চেয়ারখানি আছে। যতক্ষণ চেয়ার বা চেয়ারের রূপের কথা আমরা জানি ততক্ষণই চেয়ারখানি আছে। রূপ ও নামের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার 'আছে' এই জ্ঞানটী আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হয়। এই চেয়ার যে 'আছে' বা তাহার যে "অস্তিত্ব" বোধ তাহা বাদ দিয়া চেয়ারের কথা চিন্তা করিতেই পারিনা। কিন্তু চেয়ারখানি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহাতে চেয়ারের যে "সত্তা" ছিল তাহা কি লোপ হইয়া গেল? না, তাহার সত্তা লুপ্ত হয় নাই। রূপ বা আকারটীর তাহার নাশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু চেয়ার—এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্বের জ্ঞানও ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। রূপের বা আকারের চিন্তা করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অস্তিত্বের কথাও আমাদের মনে উদয় হইবে। চেয়ার টেবিল বা ঘর আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাদের আকারগুলির পরিবর্তন করা খুবই সম্ভব, কিন্তু এই আকারগুলির সঙ্গে জড়িত যে 'অস্তিত্ব বোধ' তাহাকে কেন নাশ বা তাহার পরিবর্তন করিতে আমরা পারি না? হাজার চেষ্টা করিলেও আকার বা রূপ জ্ঞান হইতে এই অস্তিত্বের বোধকে পৃথক করা যায় না।

এখন এই অস্তিত্ব বোধটী কি ? কখনও কি এমন কোনও জিনিষ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অনুভব করিয়াছি যাহার অস্তিত্ব নাই ? না, যাহা কিছু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াছি, তাহাদের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই এই অনুভব সম্ভব হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে। যাহা আমরা দেখি—যাহা আমরা শুনি—যাহার আমরা ঘ্রাণ পাই তাহার অস্তিত্ব আছে। তাহার রূপের পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু এই অস্তিত্বের ভাব সর্ব্বত্রই এক। রূপের পরিবর্ত্তন বা রূপটী নাশ হইয়া গেল বটে, কিন্তু এই অস্তিত্ববোধ তখন নূতন রূপটীকে আশ্রয় করিয়া রহিল—তাহার কোনও পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হইল না। ইহা দ্রব্যের গুণ নহে। ইহা চেয়ার বা টেবিলের আকার-বর্ণাদির গুণ নহে। যদি গুণ হইত তবে চেয়ার বা টেবিল ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও নাশ হইত। তারপর টেবিল বা চেয়ারের অস্তিত্ব আর গুণের অস্তিত্ব কি ভিন্ন ? কিন্তু প্রকৃত ভিন্ন নয়। গুণের অস্তিত্ব আর টেবিল বা চেয়ারের অস্তিত্ব একই। গুণ হইতেও এই অস্তিত্বকে পৃথক্ করা যায় না। এই অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রকার রূপের—সকল গুণের ভিত্তি। জার্মান দার্শনিক Immanuel Kant বলেন—এই সত্ত্বাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না ? কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে পৃথকও করা যায় না। আমরা যখন কোনও পদার্থ অনুভব করি তখন তাহা 'আছে' বলিয়াই আমাদের অনুভব হয়। পদার্থ নাই অথচ তাহার অনুভব হইতেছে এমন কখনও হয় না। তাহা হইলে যদি বলি—এই সত্ত্বা বিভিন্ন পদার্থ হইতে আহরণ করা অনুভূতি বিশেষ ? যেমন মৌমাছি প্রতি ফুল হইতে মধু আহরণ করে তেমনি আমরা প্রত্যেক পদার্থ হইতে সঞ্চয় করিয়া এই সত্ত্বার ধারণা সৃষ্টি করি ? কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কারণ, যখনই তুমি কোনও পদার্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে যাও তখন প্রথমেই তোমার এই বোধ থাকে যে "আমি আছি" এবং এই অস্তিত্ব বোধ প্রথম হইতেই তোমার ভিতরে আছে। প্রথমেই তোমাকে জানিতে হইবে যে তুমি 'আছ'। তুমি যে এখানে বক্তৃতা শুনিতেছ—এই বক্তৃতা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই জ্ঞানও আছে যে তুমি আছ এবং তুমি তোমার সত্ত্বা সম্বন্ধে সচেতন। অস্তিত্ব হিসাবে তোমার ও এই চেয়ারখানির অস্তিত্ব একই—ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই। যখন তুমি ঘরে বসিয়া আছ তখনও তুমি জানিতেছ যে তুমি আছ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছ যে ঘরখানি আছে। এই যে তোমার নিজের ও ঘরের অস্তিত্ব জ্ঞান, ইহা এক। এই সত্ত্বাংশকে—এই অস্তিত্বকে পৃথক করিবার চেষ্টা কর, দেখিবে তুমি তাহা করিতে পারিবে না। এই সত্ত্বাংশ অবিরত পরিবর্ত্তনশীল নাম ও রূপের অংশ নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বে এক। তোমার হয়ত মানব রূপ আছে, কাহারও হাতী, কাহারও অশ্ব বা অন্য কোনও রূপ আছে, কিন্তু ইহাদের পিছনে যে "অস্তি" জ্ঞান রহিয়াছে তাহা সকল ক্ষেত্রেই এক। এই 'অস্তি' জ্ঞানের কোনও ইতর বিশেষ করা সম্ভব নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ ও মানসিক অনুভবরাশির ভিতর দিয়া এই অস্তিত্বের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

ইহা অত্যন্ত কঠিন দার্শনিক তথ্য সুতরাং ইহাকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি এই অস্তিত্ব গুণ নহে। যখনই কোনও গুণ আমরা দ্রব্য হইতে পৃথক করিতে যাই, তখন প্রথমেই এই গুণ আহরণের ক্ষমতাটী নির্ভর করে আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের উপর অর্থাৎ—"আমি আছি" এই জ্ঞানের উপর। যখনই আমরা কোনও পদার্থ হইতে তাহার গুণকে পৃথক করি তখন আমরা যাহা লাভ করি তাহা মানসিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু "আমি আছি" বা "চেয়ার আছে" এই যে উভয়ের অস্তিত্ব ইহা মানসিক ব্যাপার মাত্র নহে। কারণ প্রত্যেক পরিবর্তন—প্রত্যেক কার্য্যের এমন কি প্রত্যেক দ্রব্যের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে "আমি আছি" এই জ্ঞানের উপর। এই অস্তিত্ব বোধ ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, জ্ঞান ও বিভিন্ন মানসিক ভাবনিচয়ের ভিতর সামঞ্জস্যের সূত্র। সকলগুলিই চেতন আত্মার অস্তিত্বে অস্তিত্ববান্ এবং এই সকলগুলিই নির্ভর করিতেছে "আমি আছি" এই জ্ঞানের উপর। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—এই সকল কার্য্য চেতন আত্মার নহে, ইহা জড় শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু আমরা যে এই কথাগুলি বলিতেছি এবং আমরা যে এই ধারণা পোষণ করি—তাহা ও আমাদের চেতন আত্মার সাহায্যেই অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞানের সাহায্যেই, আমাদের যদি মোটে অস্তিত্বই না থাকিবে তাহা হইলে আমাদের এই সকল ধারণা কি করিয়া সম্ভবপর হইল? আমরা যখনই কোনও বিষয়ের ব্যাখ্যা করি, তখন প্রথমেই আমাদের নিজের অস্তিত্ব—"আমি আছি" এই বোধ হইতেই আরম্ভ করি এবং বাহিরের পদার্থ ও নিজেদের অস্তিত্ব—এই দুইটীর সাহায্যে আমরা যে ব্যাখ্যা করি তাহাই হইল আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা। এই অস্তিত্বকে আমরা আমাদের রূপ হইতে পৃথক করিতে পারি না। এই অস্তিত্বের এই সত্তার আদিও নাই অন্তও নাই। এই সত্তা কোথা হইতে আসিল—এই অস্তিত্বের ভাব কোথা হইতে আসিল, খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও কিন্তু ইহার—এই অস্তিত্বের আদি বা অন্তের খোঁজ পাইবে না। কেহ কেহ বলেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সত্তার নাশ হইবে। আচ্ছা মনে কর দেখি তুমি মরিয়া গিয়াছ। তুমি তাহা চিন্তা করিতে পারিবে না—কারণ "আমি আছি" এই জ্ঞান তোমার ভিতরে রহিয়া গিয়াছে—কখনই তুমি মনে করিতে পারি না যে "আমি নাই"। তুমি তোমার মৃত শরীর দেখিতে পার—কিন্তু সেই মৃত শরীরের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তোমার 'আমি আছি' এই জ্ঞানও ওতপ্রোতভাবে জড়িত এমন কি "আমি মরিয়া গিয়াছি" তোমার যে এই ধারণা তাহাও সম্ভব হইতেছে। তোমার এই সত্তার উপর—এই "আমি আছি" এই জ্ঞানের উপর। এই আমি জ্ঞান—এই বিরাট সত্তার সীমাবদ্ধ প্রকাশ মাত্র। যখন এই সত্তা কোনও বিশেষ সীমার বন্ধনে আবদ্ধ হন, যখন তিনি ভাবেন "আমি ইহা" "আমি ইহা নয়" তখনই ইহাকে জীবাত্মা বলা হয়। তখন এক

জীবাত্মা হইতে অন্ত জীবাত্মার প্রভেদ সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই সকল বিভিন্ন জীবাত্মা সেই এক সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ—পৃথক পৃথক প্রতিনিধি মাত্র। মূল সত্তা কিন্তু সর্ব্বত্র এক ও অবিভাজ্য। এই সত্তার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহার পরিবর্ত্তন জানা যায় না। চেয়ারের রূপ অণুপরমাণুর রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কিন্তু চেয়ার বা অণু পরমাণুর সত্তার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। বেদান্ত বলেন, দ্রষ্টা ও দৃশ্য একই—দ্রষ্টার সত্তা ও দৃশ্যের সত্তা পৃথক করা যায় না। ইহাই বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব। চেয়ারের সত্তা—যাহা চেয়ারের রূপের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, আর আমরা যে চেয়ার দেখিতেছি—আমাদের রূপের সঙ্গে—আমাদের চেতনার সঙ্গে জড়িত যে সত্তা এই উভয়কে পৃথক করা যায় না। এই সত্তা যদি এক না হইয়া বহু হইত তাহা হইলে ইহাদের আদি ও অন্ত আমরা জানিতে পারিতাম—কারণ তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সীমাবদ্ধ করিত। সমস্ত সসীমতা দেশ ও কালের ভিতরেই আবদ্ধ কিন্তু এই সত্তা দেশ ও কালের সীমার বাহিরে। এই সত্তাই আমাদের আত্মা। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই; ইহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। যখন শরীরের নাশ হয় তখন শুধু সেই রূপেরই নাশ হয় মাত্র, সেই শরীরে অণুপরমাণুকে আশ্রয় করিয়া সত্তা বা অস্তিত্ব বিরাজ করিতে থাকে। যখন অণুপরমাণু তাহাদের আদি কারণ অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত হয় তখনও এই অস্তিত্ব বা সত্তা সেই অব্যক্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সত্তাকে কেহ বাড়াইতেও পারে না বা কমাইতেও পারে না। যাহা যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের অতীত তাহাকে কি করিয়া বাড়াইবে—কি করিয়া কমাইবে?

(ক্রমশঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান

(শুঙ্গ ও কণ্ব যুগ)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ-এম্ (ব্রাউন), পি-এইচ্-ডি (হামবুর্গ)

আমরা মৌর্য্যযুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বিষয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। অর্থশাস্ত্রের একটা বড় কথা এই যে কৌটিল্য ভারতে গোলামী-প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্ত অপরোক্ষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শূদ্রদের স্বাধীন আর্য্যত্ব (যাহারা গোলাম নহে) আর্য্যত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কৌটিল্যের এই বিধানটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। পক্ষপাতদুষ্ট ইউরোপীয়ান মত এই দেশে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে,আর্য্য বলিতে নীলচক্ষু, কটাচুল, উজ্জ্বল-শ্বেত উত্তর ইউরোপীয় নরতত্ত্বিক জাতিকে বোঝায় এবং শূদ্র অর্থে ভারতের কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের বোঝায়। এই আর্য্যেরা বিদেশ হইতে আসিয়া অনার্য্য ভারতবাসীদের গোলামীতে আবদ্ধ

করিয়া শূদ্রবর্ণে পরিণত করে। এই মতবাদটী (Theory) শুনিতে বেশ লাগে এবং সহজেই 'শূদ্র' প্রশ্নের সমাধান হয় বলিয়া অনুমিত হয়। ইউরোপীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে যাইয়া এই প্রকারে জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই যে ভারতেও সেইরকম ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ কি? বর্ত্তমান ইউরোপীয়দের সহিত প্রাচীন বৈদিক আর্য্যদের শারীরিক নরতাত্ত্বিক ঐক্য আছে কিনা সে বিষয়ে প্রথম প্রমাণ করা চাই। তারপর এইমত ভারতে প্রয়োগ করিতে হইবে। বেদ হইতে মনু পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থেই শূদ্রকে ভারতীয় আর্য্যভাষী সমাজের বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। বরং অনেক স্মৃতিতে এবং পুরাণে চতুর্বর্ণকে একই বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। এইজন্যই কৌটিল্যের এই শ্লোকটী ('শূদ্র আর্য্যপ্রাণ') শূদ্র প্রশ্নের উপর আলোক সম্পাত করে। শূদ্র দ্বিজের সহিত ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে সকল সুবিধা ভোগ করেনা। ইহাই হইতেছে বিশিষ্ট-প্রভেদ। অন্যান্য প্রাচীন দেশের অবস্থার সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়া আমরা এই বুঝি যে প্রাচীন গ্রীসের প্লেব (Pleb), পেরিকই (Perokoi), হেলোট (Helot) প্রভৃতি শ্রেণীদের সহিত শাসকবর্গের যে কারণে প্রভেদ ছিল, সেই কারণেই শূদ্র ও দ্বিজের প্রভেদ ভারতে সমুদ্ভূত হয়। অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পূর্ণ নাগরিকত্বের সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া ধর্ম ও সমাজ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অবস্থা তাহাদের ছিল। কিম্বা ধর্মক্ষেত্রে পার্থক্যের জন্য সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রেও পার্থক্যের উদ্ভব হয়। ইহাকে শ্রেণীভেদপ্রসূত অবস্থা বলিয়াই আজকাল নির্দ্ধারিত করা হইতেছে। প্রাচীনকালে সর্ব্বত্রই উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত সাম্য স্বীকার করে নাই। কিন্তু এই শ্রেণীবিভেদপ্রসূত সংস্কারটীকে আজকালের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা জাতিগত (racial) ভেদ বলিয়া মনে করিতেছে। এই জন্য তাহারা বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসেরই বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিশেষতঃ প্যানজার্ম্মাণীষ্ট পণ্ডিতেরা সর্ব্বত্রই বিজেতৃ জর্ম্মান (victorious German) খুঁজিতেছেন।

কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতরা নির্দ্ধারণ করেন। পণ্ডিতরা বলেন ইঁহার অপর নাম ছিল যথা চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত বা বিষ্ণু শর্ম্মা। 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' অনুসারে কৌটিল্য অশোকেরও মন্ত্রিত্ব করেন। পরে তাঁহার পুত্র রাধাগুপ্ত মন্ত্রী হন। ইনিও অশোকের সময় মন্ত্রীত্ব করেন। আজকালকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে কৌটিল্যে বেশী কিছু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক নাই। কিন্তু ডাঃ কালিদাস নাগ বলেন ইহাতে অনেক প্রক্ষিপ্ত আছে (১)। কৌটিল্যের রাজনীতির সহিত ইতালীয় রাজনীতিবিশারদ ম্যাকিয়াভেলীর মতের সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়ের একই মত যে ছলে বলে কৌশলে কার্য্যে সফল হইতে হইবে। এই প্রকারের মতকে পরবর্ত্তী ভারতীয় লেখকেরা নীতিবিগর্হিত

(১) J. J. Meyer—Kautilya ; German. Trans.

বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। যাহাই হউক মৌর্য্যেরা এবং কৌটিল্য ভারতের বিভিন্ন জন-সমূহকে একত্রিত করিয়া প্রথম নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সংগঠন করেন এবং প্রথম ভারতীয় একজাতীয়ত্ব (nationality) সম্পাদন করেন।

মৌর্য্যদের মধ্যে অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এবং আজকাল কোন কোন ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক (১) তাঁহাকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করেন। অশোকের প্রস্তরে খোদিত অনুশাসন দ্বারা সেই সময়ের কিঞ্চিৎ সংবাদ আমরা পাই। সমগ্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানসমূহে এই শিলালিপিসমূহ পাওয়া যাইতেছে। এই শিলালিপিগুলি প্রত্যেক প্রদেশের স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাতে লিখিত। এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে তখনও ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার আর একটী শিলালিপিতে ব্যক্ত আছে যে তিনি বলিতেছেন, এতদিন যাঁহাদিগকে লোকে ভূ-দেবতা বলিয়া গণ্য করিত, এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহারা মিথ্যা। এতদ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আর একটী শিলালিপিতে বলিতেছেন— "তাঁহার বিচারকেরা যেন দণ্ডকালে, ব্যবহার-সমতা ও দণ্ড-সমতা অবলম্বন করেন"। এতদ্বারা সর্ব্ববর্ণের মধ্যে তিনি আইন ও বিচারের সমতা স্থাপন করেন। ইহা কৌটিল্য অপেক্ষা আরও অগ্রসর নীতি। কারণ আমরা অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার (আইন) ও দণ্ডের বর্ণগত পার্থক্য দেখিতে পাই। শেষে তিনি হুকুম দিয়া ধর্ম্ম-মহামাত্র অর্থাৎ নীতি পর্য্যবেক্ষণের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদের অধিকারের সুবিধাভোগের উপর হস্তক্ষেপ করেন। তারপর আর একটী অনুশাসনের দ্বারা তিনি যজ্ঞে জীবহিংসা নিষেধ করিয়া দেন। এইসব দ্বারা বোঝা যায় যে কৌটিল্যের ব্যবস্থার অনেক অসম্পূর্ণতা অশোকের সময়ে পূর্ণতা লাভ করে—অর্থাৎ অশোকের রাষ্ট্রশাসন আরও প্রগতিশীল হয়।

অশোকের প্রপৌত্র বৃহদ্রথের রাজত্বের সময় একটী ঘোর রাষ্ট্র বিপর্য্যয় হয়। ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন করায়ত্ত করেন। এই পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আজকালকার গবেষক পণ্ডিতদের মতানুযায়ী বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতা এই সময়ে (মৌর্য্যযুগের পরে) রচিত হইয়াছিল। জয়সোয়াল বলেন, পুষ্যমিত্রের সময়েই মনু-সংহিতা নূতন সংকলিত হইয়াছিল। এই সময়ের বিশিষ্ট ঘটনা এই যে ভারতে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ রাজা হন এবং শূদ্রশাসন পর্য্যন্ত করিয়া ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তি অনুযায়ী অনুশাসন প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমানের মনুসংহিতাই তাহার প্রমাণ। ইহাতে ঘোর শূদ্রবিদ্বেষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। পূর্ব্বের স্মৃতি সমূহে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম হইল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি। কিন্তু মনুতে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হইলে সেনাপত্য গ্রহণ করিতে পারে, ও এমনকি রাজা পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করার

(১) H. G. Wells—Outline of World History.

ব্যবস্থা আছে। জয়সোয়াল অনুমান করেন এই সব যুক্তিদ্বারা পুষ্যমিত্রের রাজহত্যা ও রাজ্যগ্রহণকে সমর্থন করা হইয়াছে (৩)।

বর্তমানের মনুস্মৃতি যে নূতন সংকলন তাহা Muir (মূইর) মহোদয় প্রথমে আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, নারদ স্মৃতিতে আছে যে মনু প্রথমে এক লক্ষ শ্লোক সম্বলিত সংহিতা রচনা করেন; পরে নারদ আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া দেন। শেষে সুমতি ভার্গব তাহা আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া বর্তমান আকারে পরিণত করেন। এই সংবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া জয়সোয়াল বলেন যে সুমতি ভার্গব পুষ্যমিত্রের সময়ের লোক। পুষ্যমিত্রের তরফদারী করিয়া তিনি আসল পুস্তককে পরিবর্তন করিয়াছেন এবং কৌটিল্যে শূদ্রের প্রতি যে সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা নূতন সংকলনে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এইজন্যই বর্তমান সংকলনের প্রথমেই আরম্ভ হইয়াছে, 'ভৃগু কহিতেছেন।' ইহা সুমতিরই বংশ পরিচায়ক। গবেষকদের মতে প্রাচীন পুস্তকসমূহে মনুস্মৃতি হইতে যে সব শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই সংকলনে পাওয়া যায় না। তাহার পরে এই পুস্তকে পরস্পর বিসম্বাদী শ্লোকসমূহ রহিয়াছে। যেমন এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞে পশু হনন করিবে না, অন্য জায়গায় তাহার বিপরীত কথা বলা হইয়াছে। আর এক জায়গায় বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণে বিবাহ করিতে পারিবে; অন্য স্থলে তাহা নাকচ করা হইয়াছে। আবার ইহাতে বলা হইয়াছে বিড়ালব্রতী বকধার্মিকদের সহিত আলাপ করিবে না, কিন্তু ভিক্ষা দিতে আপত্তি নাই; ইহাদ্বারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বোঝায় বলিয়াই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সর্বশেষে শূদ্রের রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হওয়া অথবা এমনকি আদালতের সাক্ষীরূপে গৃহীত হইবার অনুশাসন দেওয়া হয় নাই। এই সব দেখিয়াই মনে হয় যে প্রচলিত মনুসংহিতা ব্রাহ্মণ শ্রেণী স্বার্থদুষ্ট এবং ইহাতে শূদ্রের প্রতি জিঘাংসা চরমে উঠিয়াছে। তাহার পর দাসের পুত্রকে দাস বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা কৌটিল্যে নিষিদ্ধ গোলামী প্রথাকে পুনঃ প্রচলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে মনুসংহিতা বৌদ্ধ জৈনদেরও আইনের পুস্তক (৪)। বর্মার আইন এই পুস্তকের উপরই স্থাপিত। শ্যামে (বর্তমানে Thailand) আইন মানবধর্ম শাস্ত্রানুযায়ী। কেবল সিংহলের আইন ইউরোপীয় আইনসমূহ দ্বারা এত পরিবর্তিত হইয়াছে যে তাহার আসলরূপ কি ছিল তাহা বোঝা যায় না। কিন্তু প্রচলিত মনুসংহিতাতে শূদ্র ও

(৩) এবিষয়ের বাদানুবাদ সম্বন্ধে H. P. Shastry—The Journal of the Asiatic Society of Bengal—1910 p. 259. দ্রষ্টব্য; Jayswal, Age of Manu and Yajnavâlkya; H. C. Roy Chowdhury, Political History of Ancient India দ্রষ্টব্য।

(৪) Jolly Recht und Sitte.

বৌদ্ধবিদ্বেষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই ইহাকে একটা class-legislation (শ্রেণীগত আইন) এবং শ্রেণী-সংগ্রামের নিষ্ঠুর দৃষ্টান্তের পরিচায়ক বলা যাইতে পারে।

এই যে ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল তাহার কোন চিহ্নই ব্রাহ্মণের সাহিত্যে নাই। কোন্ কারণবশত এই প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব সংঘটিত হইল তাহার কোন নিদর্শনও সাহিত্যে পাওয়া যায় না। জয়সোয়াল ইহাকে Orthodox counter revolution (৫) বলিয়াছেন। কিন্তু লেখক ইহাকে Brahmanical counter revolution (৭) বলিয়াছেন। বেশীরভাগ বিদেশীয় ও দেশী পণ্ডিতদের মত যে মৌর্য্য শাসনকালে ব্রাহ্মণদের সুবিধা অপহরণ করাতে এবং শূদ্রের সহিত এক আইন ভুক্ত হওয়ায় তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাষ্ট্রবিপর্য্যয় করেন। এমনকি তাঁহাদের মৌর্য্য বিদ্বেষ এত প্রবল যে কোন কোন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপুস্তকে মৌর্য্যদিগকে দৈত্য বলিয়া গালাগাল দেওয়া হইয়াছে। তবে জয়সোয়াল মহোদয় গার্গী সংহিতা হইতে এক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে লেখা আছে তিনি বলেন যে রাজা বৃহদ্রথের সময়ে বক্ট্রিকের হেলেনিষ্টিক রাজা মিনান্দার (ইনি বৌদ্ধ পুস্তক মিলিন্দপ্রশ্নের রাজা বলিয়া অনুমিত হয়)। ভারত আক্রমণ করিয়া শাকেত (৮) (অযোধ্যা) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখনও রাজা বিদেশী শত্রুকে তাড়াইবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অশোক বলিয়া গিয়াছেন যে প্রেমদ্বারা শত্রু জয় করিবে। গার্গী সংহিতায় বলিতেছে কেবল 'মোহাত্মারাষ্ট্র' বলে প্রেম দ্বারা শত্রু জয় করিবে। জয়সোয়ালের অভিমত যে এতদ্বারা ব্রাহ্মণদের মৌর্য্যশাসনের (৯) প্রতি বিতৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একালীন ব্রাহ্মণদের এইপ্রকার ultra-nationalist (উৎকট-জাতীয়তা) মনোভাব রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ের কারণ নয়, যাহাই হউক এই ঘোর রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ে সাধারণের কি মনোভাব ছিল তাহা জানা যায় না। তবে বৌদ্ধ অবদানেতে বলা হইয়াছে, পুষ্যমিত্র নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মস্তক ছেদন করেন এবং সঙ্ঘরাজিকা ভাঙিয়া দেন। আর

(৫) Jayaswal—Age of Manu & Yajnavalkya.

(৬) জয়চন্দ্রনারঙের "ভারতবর্ষীয় ইতিহাসকা রূপরেখা, (হিন্দীপুস্তকে) এই বিষয়ে আক্ষেপ দ্রষ্টব্য।

(৭) B. N. Dutt—The Brahmaninical Counter-revolution in the Journal of Behar and Orissa Research Society, Part II, Vol. XXVII, 1941.

(৮) পতঞ্জলি মহাভাষ্যে নাকি আছে কুসুমপুরে (পাটলীপুত্রে) যবনের আগমন হইয়াছিল।

(৯) চণ্ডীনামক ধর্ম্মপুস্তকে (অষ্টম অধ্যায় রক্তবীজবধ ৬ শ্লোকে) শক্তির সহিত দৈত্যদের যুদ্ধকালে মৌর্য্যদের দৈত্যসেনায় মধ্যে নাম উল্লেখ করা হয়। যথা—

'কালকা দৌহৃর্দা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম॥'

নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধ পুস্তক। 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' বলা হইয়াছে যে পুষ্যমিত্র আশী হাজার 'বৌদ্ধ ধর্ম্মরাজিকা' ও বৌদ্ধ বিনষ্ট করেন। পরে সসৈন্যে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, এবং কাশ্মীরের পাদদেশে পাথরের চাপাতে মারা যান। এই পুস্তকে পুষ্যমিত্রকে গালাগালি দেওয়া আছে। পুষ্যমিত্রের বংশের বিষয় পরবর্ত্তিকালের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে উল্লিখিত আছে যে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং নিজেকে সেনাপতি বলিয়া পরিচয় দেন ও তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুষ্যমিত্র-পুত্রের প্রেমবিষয়ে লিখিত হয়। এই সময় হইতে ভারত ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন পুষ্যমিত্র বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পুনঃপ্রচলন করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞই তাহার প্রমাণ। পুষ্যমিত্রের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য সম্বলিত ধর্ম্মমত ও সমাজ সংগঠিত হয়। এই যুগ হইতে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের নানাভাবে উন্নতি হইতে দেখি। নাটক, কবিতা প্রভৃতি নানা বিষয় এই যুগ হইতে লিখিত হইতে থাকে। পুষ্যমিত্র যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করেন। কিন্তু পুরাতন ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে নীরব। এ সম্বন্ধে পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে পুষ্যমিত্র শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ ব্যাপারের পর মগধে কণ্বায়নবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারাও ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। এই কণ্বায়নদের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা নানাপ্রকারে বিদ্রূপের পাত্র ছিলেন। কারণ বেদে উল্লিখিত আছে যে কণ্বঋষির পায়ের রঙ কাল ছিল এবং তিনি সমাজে "দাসীপুত্র" বলিয়া অভিহিত ছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদিগের দাবীর প্রতিবাদে তাহাদের প্রতি প্রচলিত বদনামের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ইহারাই গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক রাজপদে উন্নীত হইলেন। কণ্বায়নদের পর অন্ধ্‌ রাজভৃত্য বংশের উত্থান হয়। ইহারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কণ্বায়নদের সময়েই কলিঙ্গদেশ হইতে খারবেল (Kharbela) উত্তর-ভারত আক্রমণ করেন এবং মগধ জয় করেন। ঐতিহাসিকদের অনুমান যে অশোকের দ্বারা কলিঙ্গ জয়ের পর কলিঙ্গ জাতি বিজিত জাতিরূপে ছিল। কিন্তু মৌর্য্যশাসন অপগত হইবার পর তাঁহারা তাঁহারা আবার স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এই খারবেলা জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকরা বলেন। তাঁহার সময় হইতেই উড়িষ্যার উদয়গিরি খণ্ডগিরি প্রভৃতি গুহাবাস (cover temple) সমূহ জৈনসাধুদের জন্য রচিত হয়। ইহার পর অন্ধ্‌ভৃত্যেরা দক্ষিণদেশে প্রবল হন। তাঁহারাও ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। ইতিমধ্যে উত্তরে শকদের (Scythians) আক্রমণ হয় এবং তাঁহারা এক সময়ে প্রায় সমগ্র উত্তরভারত এবং পশ্চিম ভারতের গুজরাট পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে অন্ধ্‌ভৃত্যেরা তাহাদের আধিপত্য প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই অন্ধ্‌ভৃত্যদের শতকর্ণী বংশ বলা হইত। অনেকের অনুমান যে ইহাদের নাম হইতেই শালিবাহন রাজা কর্ত্তৃক শকদের পরাস্ত করার গল্প সৃষ্ট হয়। এই যুগের

এই সব রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ের মধ্যে আমরা দুইটি বিশিষ্ট পুস্তক যাহা কিঞ্চিত তৎকালীন সমাজতত্ত্বিক সংবাদ পাই। প্রথমটি হইতেছে "যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি"। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে পাণিনিই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন শকটায়নই সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ লেখেন। (১০) তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। অবশ্য এই 'শকটায়ন' নামে আর একজন ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে উদিত হইয়াছিলেন। পাণিনির আবির্ভাবের সময় লইয়া বিতর্কের কারণ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে সময় খৃষ্টপূর্ব্ব সাতশত বৎসর বলেন। প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদের (Orientalists) মতে তাহা হইলে তাঁহার সময় বৈদিক যুগের অন্তর্গত হইতে হয়। কিন্তু তাঁহার ব্যাকরণে মহাভারতোক্ত পাণ্ডবদের নাম উল্লেখ আছে—যাহা বৈদিক সাহিত্যে নাই। তাহার পর 'রাজশংকোপজীবন সঙ্ঘ' ও অস্ত্র এবং ব্যবসায় সঙ্ঘজীবির প্রভৃতি অন্যান্য সঙ্ঘজীবির নাম উল্লেখ আছে। এই সবগুলি আমরা বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী কালেই দেখিতে পাই। পাণিনিতে পাণ্ডবদের নাম দেখিয়া অনুমিত হয় যে সেকালে তাঁহাদের বিষয়েও কাহিনী রচিত হইয়াছিল। "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প"-র-মতে পাণিনি মহাপদ্মনন্দের সমকালীন ছিলেন এবং তিব্বতীয় পুস্তক সমূহেও ইহার প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে। তাহা হইলে পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরিতে হইবে; যাহাই হউক পতঞ্জলিকৃত পাণিনির পুস্তকের (ভাষ্যের) টীকাতে কিছু ঐতিহাসিক সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাতে একটি সূত্রে পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে পণ্ডিতেরা এই অনুমান করেন যে পুষ্যমিত্রের সময়েই এই ভাষ্য রচিত হইয়াছিল। আর একটি সূত্রে উল্লিখিত আছে যে যবনেরা পাটলিপুত্র (পুরাতন নাম কুসুমপুর) আক্রমণ করিয়াছিল। গার্গী সংহিতাতেও এ বিষয়ের প্রতিধ্বনি আছে। এতদ্বারা মিনাণ্ডারের (Menander) অভিযানই ইঙ্গিত হয়। পতঞ্জলির আর একটি বিখ্যাত শ্লোকে অর্থাৎ "শুক্ল শুচ্যাচার: পিঙ্গল কপিল" সূত্রে (২।২।৬) ব্রাহ্মণদের স্বরূপ লক্ষণ ও আকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। আর একটি শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন "গৌরশুচ্যাচার: পিঙ্গল কপিল ৫।১।১১৫। ইহাতে তিনি গাত্রবর্ণকে শুক্ল বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে তপস্যা বেদাধ্যয়ন যাহার নাই সে কেবলমাত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ। যথা "গৌরশুচ্যাচার পিঙ্গল কপিলঃ" ব্রাহ্মণের আভ্যন্তরিক গুণ অথবা internal characteristics, এইগুলি সর্ব্ব ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যাহার এই সব লক্ষণ নাই সে অব্রাহ্মণ। এই শ্লোকদ্বারা এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে যে তৎকালে সমস্ত ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ কি শুক্ল অথবা গৌরবর্ণ ছিল? আর তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঋগ্বেদেই কণ্বঋষিকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে।

তাহার পর পাণিনির আর একটি বিখ্যাত সূত্র—"শূদ্রাণাং অনিরবসিতানাং (২।৪।১০) এমন শূদ্র যাহারা বহিষ্কৃত নয় এই সূত্রের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে

(১০) এ বিষয়ে Weber-এর History of Sanskrit Literature দ্রষ্টব্য।

তৎকালের সামাজিক ব্যবস্থার উপর নূতন আলোক সম্পাত করে (১১)। এই শ্লোকটির অর্থ যে সকল শূদ্র অবহিষ্কৃত। পতঞ্জলি বিচার করিয়া প্রথমে ধরিলেন তাহারা (শূদ্রেরা) কি যজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত? যজ্ঞস্থল হইতে তাহারা বহিষ্কৃত নয়। কারণ যজ্ঞে রথকার (সূত্রধর) প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। তৎপরে তিনি বিচার করিলেন "আর্য্যনিবাসাৎ অনিরবসিতানাম্"। আর্য্যনিবাস অর্থে গ্রাম, ঘোষ (গয়লাদের পাড়া), নগর, সংবাহ ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে। ম্লেচ্ছ, শক, যবন আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে থাকে ও বাস করে। ডোম্ব (ডোম), চণ্ডাল প্রভৃতি আর্য্যনিবাসের ভিতরে বাস করে। তৎপরে তিনি তর্ক তুলিলেন "পাত্রাৎ অনিরবসিতানাম্" অর্থাৎ শূদ্ররা ব্রাহ্মণের পাত্র হইতে অবহিষ্কৃত। ইহার অর্থ শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের থালায় খাইতে পারে এবং পরে সেই থালা ব্রাহ্মণদের গৃহে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এবং কোন্ কোন্ শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের থালায় খাইতে পারে তিনি তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই তালিকার মধ্যে তিনি রজকদেরও গণ্য করিয়াছেন। ইহার দ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে এই যুগেই মনুসংহিতার নূতন সঙ্কলন হইয়া থাকে তবে তাহাতে শূদ্রের প্রতি যে কঠোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে পতঞ্জলিতে আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখি এবং পতঞ্জলিও শক যবনদের অবহিষ্কৃত বলিয়াছেন। পতঞ্জলি তাহাদের ডোম হইতে উচ্চতর শ্রেণীর শূদ্র বলিয়াছেন। তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে তিনি তাহাদিগকে সৎশূদ্র বলিয়াছেন। (১২)

শক যবনদের ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। ইহার মতে শক যবনেরাও ব্রাহ্মণের থালায় খাইতে পারে তিনি বলিয়াছেন। প্রচলিত দেশাচারই পতঞ্জলিতে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এবং মনুতে কেবলই একটি শ্রেণী বিদ্বেষেরই (class-spirit) প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পরে গুপ্তীয় ব্রাহ্মণ আধিপত্যের কালে শূদ্রদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

মনুর পর আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি প্রাপ্ত হই। জয়শোয়ালের মতে তিনি মধ্যদেশের কোন একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বাস করিতেন। Kane বলেন যাজ্ঞবল্ক্য খৃষ্টীয় উপরোক্ত পুস্তকে (page 61) প্রথম দুই শতক অথবা তাহার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৩) কিন্তু জয়শোয়াল বলেন, ইনি নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৪) যাজ্ঞবল্ক্যে বৌদ্ধদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে। যেহেতু তিনি বলিতেছেন হরিদ্রা

(১১) এ বিষয়ে জয়শোয়ালের "Age of Manu and Yajnavalkya" দ্রষ্টব্য।

(১২) বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণের ভোজনপাত্রে সৎশূদ্র খাইতে পায় না এবং ব্রাহ্মণের বাড়ী "প্রসাদ" খাইয়া তাহাকে পাতা ফেলিতে হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গে রজক আজ পতিত এবং "যবন" (অর্থাৎ গ্রীক) অস্পৃশ্য।

(১৩) History of Dharma Shastra, page 187.

(১৪) জয়শোয়াল, উক্ত পুস্তক page 59.

দণ্ড পরিহিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি অশুভ। (যাজ্ঞবল্ক্য—১।২৭৩)। এতদ্বারা ইহা বোধগম্য হয় যে এই উভয় সম্প্রদায়ে বিশেষ দ্বন্দ্ব ছিল। অন্য পক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে অব্রাহ্মণদের প্রতি মনু অপেক্ষা তাঁহার সুর নরম ছিল। যথা—মনু যেমন অ-ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছ হইতে দান গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য সে বিষয়ে নীরব। আবার ম্লেচ্ছদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বৈরীভাবও এই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই জয়শোয়াল অনুমান করেন যে এই সময় ম্লেচ্ছরা রাজা ছিল। তৎপর মনুর শাস্তিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধানগুলি যাজ্ঞবল্ক্য নরম করিয়া সম্ভবপর ব্যবস্থাতে পরিণত করিয়াছেন। আর ইহাতে মনু অপেক্ষা তিনি শূদ্রদের অবস্থা উন্নততর করিয়াছেন। কারণ যে স্থলে মনু চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বিজাতির জন্য বলিয়াছেন যাজ্ঞবল্ক্য তাহা দ্বিজাতির বাহিরে অন্য জাতির জন্য তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিয়াছেন যে জ্ঞানী শূদ্র সম্মানের পাত্র এবং শূদ্রকে ব্যবসা করিবার অনুমতি তিনি দিয়াছেন। (১৫) কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—যদিও মনু তাহা নিষেধ করেন। তাহার পরে ব্রাহ্মণদের সকল অপরাধ হইতে ক্ষমা পাইবার দাবী যাজ্ঞবল্ক্য মানেন নাই। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি রাজকীয় আইনের অধীন করিয়াছেন। তাহাদের অস্ত্রব্যবসায় নিষেধ করা হইয়াছে তাহার পর তাহাদের রাজপদ গ্রহণের দাবী অস্বীকৃত হইয়াছে। (১৬)

এতদ্বারা দেখা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি মনু অপেক্ষা আরও প্রগতিশীল ছিল—যদিও ইহাতে সনাতনী গোঁড়ামী বজায় আছে। ইহাতে যে বৌদ্ধ ও শূদ্রদের বিপক্ষে ধর্ম্মান্ধতাপূর্ণ বিদ্বেষ প্রদর্শন করা হয় নাই, তাহা তৎকালীন বৌদ্ধ কুশানদের রাজ্য পরিচালনের ফলস্বরূপ ইহাই অনুমান করিতে হইবে। এইজন্য জয়শোয়াল অনুমান করেন যে যাজ্ঞবল্ক্য মনুর মত আর্য্যাবর্ত্তের একটি বিশেষ বর্ণনা দিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ কুশানেরা সেই সময় ভারতের সনাতনী কেন্দ্রসমূহে রাজত্ব করিতেছিলেন। সর্ব্বশেষে জয়শোয়াল অনুমান করেন, "ইহা সম্ভবপর যে যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি গুপ্ত সম্রাটদের দ্বারাই রাজকীয় আইন পুস্তক-রূপে গৃহীত হয় এবং সেই সময়ে পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত হয়।" তিনি ইহাও বলেন যে ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে যতদূর আর্য্য সভ্যতা (১৭) ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে ততদূর এই স্মৃতি মনুর আইনকে নাকচ করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। (১৮)

---

(১৫) যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৬২,২৬৮ এবং ৩।২২।

(১৬) (Jayaswal, page 61)।

(১৭) (Jayasawal, page 61.)

(১৮) হিন্দু ভারতের মধ্যে কেবল বাঙলায় যাজ্ঞবল্ক্যের আইন চলে না।

অদ্বৈতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

এইরূপ যতই আলোচনা করা যাইবে, এই শ্রুতির দ্বারা সেই অদ্বৈত তত্ত্বেরই সন্ধানলাভ হইবে। অতঃপর দেখা যায় বলা হইতেছে—

(৯) "যদা বৈ সুখং লভতে অথ করোতি, নাসুখং লব্ধ্বা করোতি, সুখমেব লব্ধ্বা করোতি,
সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। ৭।২২।১
"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং,
ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। ৭।২৩।১
"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি
স ভূমা, অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্
বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, অথ
যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং, স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত
ইতি, স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নি ইতি।" ৭।২৪।১

অর্থাৎ সনৎকুমার বলিলেন—"যখন মানুষ সুখলাভ করে, তখনই কর্ম্ম করে। সুখলাভ না করিলে কর্ম্ম করে না, সুখলাভ করিলেই কর্ম্ম করে। এই সুখকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।" নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি সেই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।" ৭।২২।১

সনৎকুমার বলিলেন—"যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। এই ভূমাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।" নারদ বলিলেন—"এই ভূমাকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।" ৭।২৩।১

সনৎকুমার বলিলেন—"যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয়, অন্য কিছু শ্রুত হয়, অন্য কিছু বিজ্ঞাত হয়, তাহাই অল্প। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প, তাহাই মর্ত্ত্য।" নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?" সনৎকুমার বলিলেন—"তিনি স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, অথবা স্বীয় মহিমাতেও নহেন।" ৭।২৪।১

একদ্বারা বলা হইল—লোকে সুখের জন্যই কর্ম্ম করে, সেই সুখই ভূমা, তাহা অল্প নহে। এই ভূমার মধ্যে অন্য কিছুই দেখা বা শুনা বা জানা যায় না। কিন্তু যেখানে অন্য কিছু

দেখা শুনা বা জানা যায় তাহা অল্প এবং তাহাই বিনাশশীল। এই ভূমার আর আশ্রয় নাই, ইনি স্বপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ভূমা একটী অদ্বৈত বস্তু।

যদি বলা যায়—যেখানে অন্য কিছু দেখে না শুনে না বা জানে না—বলায় অন্য কিছু যে নাই, তাহা কে বলিল? এখানে শ্রবণাদি ক্রিয়ারই নিষেধ হইল। তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, ভূমা যখন অল্প নহে, তখন তাহা অসীম বস্তু, আর অসীম হইলে অদ্বৈতই হয়। দ্বৈত না হইলে আর সীমা থাকে না। অতএব কেবল শ্রবণাদি ক্রিয়ার নিষেধ নহে, কিন্তু উভয়েরই নিষেধ বলিব।

যদি বলা যায়—সেখানে অন্যের জ্ঞান হয় না বলায়, ভূমারই জ্ঞান হয় বলিব? অর্থাৎ ভূমার মধ্যেই ভূমাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিদ্যমান, সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতই সিদ্ধ হয় বলিব? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে—কারণ, ভূমাই জ্ঞেয় হইলে জ্ঞেয় বিভিন্নই হয় বলিয়া ভূমাও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আর তাহা হইলে একটী জ্ঞেয়-ভূমা হইতে অপর জ্ঞেয়-ভূমা পৃথক্‌ই হয়। সুতরাং সেই সব জ্ঞেয়-ভূমা আবার অল্পই হইয়া যায়, অর্থাৎ বিনাশী হইয়া যায়। অতএব "অন্য কিছু জানে না" বলায় ভূমাই স্বস্বরূপে থাকে বা জ্ঞানস্বরূপে থাকে—ইহাই বলা হইল। এস্থলে অন্য কিছু জানে না, ইহার অর্থ কিছুই জানে না বুঝিতে হইবে। কারণ, বিষয় না থাকিলে জ্ঞানভেদ হয় না, এবং বিষয় না থাকিলে জ্ঞান যে থাকে না তাহাও নহে। অন্ধকার না থাকিলে যে সূর্য্যালোক থাকে না, তাহা বলা যায় না। অতএব এই ভূমা জ্ঞানস্বরূপ ও সুখস্বরূপ এক অদ্বিতীয় বস্তু বলিতে হইবে। এইরূপে এতদ্বারা সেই এক অদ্বৈতেরই জ্ঞান হইল।

এইবার এই ভূমাই যে সব, আমিই যে সব, আর আত্মাই যে সব ইহা বলিয়া, আত্মা, আমি ও ভূমা—এই তিনটী যে একবস্তু এবং এতদ্ভিন্ন যে আর কিছুই নাই, তাহাই বলা হইতেছে—

(১০) "স এব অধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ এব।

"অহমেব অধস্তাৎ, অহম্ উপরিষ্টাৎ, অহং পশ্চাৎ, অহং পুরস্তাৎ, অহং দক্ষিণতঃ, অহং উত্তরতঃ, অহমেব ইদং সর্ব্বম্ ইতি। ৭।২৫।১। অথাত আত্মাদেশ এব।

"আত্মৈব অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা উত্তরতঃ, আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি……।" ৭।২৫।২

অর্থাৎ সেই ভূমাই অধোদিকে, তাহাই ঊর্দ্ধদিকে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই সম্মুখে, তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে, তাহাই এইসব। এইবার অহং দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—আমিই অধোদিকে, আমিই ঊর্দ্ধদিকে, আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এইসব। ৭।২৫।১। অতঃপর আত্মার দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে—আত্মাই অধোদিকে, আত্মাই ঊর্দ্ধদিকে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে,

আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এইসব।..... ৭।২৫।২। অতএব যাহা সুখ-স্বরূপ, ভূমা তাহাই, আমি তাহাই, আত্মাও তাহাই, তাহাই এই সব। সুতরাং সেই ভূমা বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর সুতরাং হইলে "নান্যৎ শৃণোতি" ইত্যাদি বাক্যে অন্য কিছু শুনে না ইত্যাদি বলায় কেবল শ্রবণাদি ক্রিয়ার নিষেধ হইতেছে না, কিন্তু ভূমা ভিন্ন অন্য বস্তুরই নিষেধ হইতেছে—এইরূপ কল্পনা করিবার আর অবসর থাকিল না। অহং, আত্মা ও ইদং সবই এক হওয়ায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আর ভিন্ন হইল না, সুতরাং এক জ্ঞানস্বরূপ ও সুখস্বরূপ ও সংস্বরূপ বস্তুই রহিয়া গেল। আর তাহা এক ও অদ্বৈত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

যদি বলা যায় তাহা হইলে পরবর্ত্তী বাক্যে এইরূপ যে জানে, তাহাকে আত্মক্রীড় আত্মানন্দ প্রভৃতি যে বলা হইয়াছে, তাহাতে শ্রবণাদি ক্রিয়ার অভাব ত সূচিত হয় না, যথা—

(১১) "স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ, স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যে অন্যথা অতো বিদুঃ অন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, তেষাং সর্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি।" ৭।২৫।২

অর্থাৎ যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন, তিনিই স্বরাট্ হন। আর যিনি ইহা হইতে অন্যরূপ জানেন, তিনি অন্যের অধীন হন, এবং ক্ষয়শীল লোক লাভ করেন, সমুদায় লোকে তাঁহার পরাধীনতা হয়।

যদি বলা হয়—এতদ্দ্বারা যাঁহার "আমি ভূমা, আমি সব, আমি আত্মা" জ্ঞান হয় তাঁহার ভোগ থাকে, ইহা ত সিদ্ধ হয়। অতএব অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তই ত সিদ্ধ হয়? কিন্তু একথাও সত্য নহে। কারণ, যাঁহার ভূমা বিষয়ক জ্ঞান হয়, অর্থাৎ যিনি নিজকে সর্ব্বস্বরূপ, আত্মস্বরূপ ও সুখস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার আত্মরতি প্রভৃতি অবস্থা হয় বলায় জীবন্মুক্ত অবস্থারই কথা বলা হইল—বুঝিতে হইবে। দেহাদিরূপ উপাধি অপগত হইলে তাঁহার এই আত্মরতিভাব প্রভৃতি যে থাকে, তাহা ত বলা হইল না। আর দেহাদি যে অল্প, সুতরাং মর্ত্ত্য অর্থাৎ বিনাশশীল, তাহা ত এস্থলে প্রকারান্তরে বলাই হইয়াছে, সুতরাং ইহাদের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। আর তখন বিদেহমুক্তিতে জীবের ব্রহ্মস্বরূপেই পর্য্যবসান হইয়া যাইবে। অন্য শ্রুতিতে ইহা স্পষ্ট ভাবে কথিত হইলেও এস্থলেও ইহা প্রকারান্তরে বলা হইল। অর্থাৎ "নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি" বাক্যে ভূমা ভিন্ন কেবল অন্য বস্তুর নিষেধ নহে, পরন্তু শ্রবণ, দর্শন ও জ্ঞানেরও নিষেধ করা হইল বুঝিতে হইবে। ভূমা ভিন্ন অন্য বস্তু না থাকিলে দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান ক্রিয়াই সম্ভবপর নহে।

যদি বলা যায়—ভূমাই সব, আমিই সব, আত্মাই সব বলায় "সব"-পদবাচ্য কিছু থাকা আবশ্যক ? মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘট শরাব কলসাদিস্থলে যেমন "মৃত্তিকাই সব" বলা যায়, তদ্রূপ ভূমা বা আমি বা আত্মপদবাচ্য বস্তুই সেই "সব"-পদবাচ্য বস্তু হইবে ? অতএব সব ও ভূমামধ্যে ঘট ও মৃত্তিকার ন্যায় ভেদাভেদসম্বন্ধ স্বীকার্য্য ? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ, মৃত্তিকারই আকারভেদে ঘটশরাবাদি নাম হয়। আকার ও মৃত্তিকা ত অভিন্ন হয় না। মৃত্তিকাই ত ঘটাকার নহে। তাহা হইলে ঘট ও শরাব অভিন্ন হইত। এজন্য উহাদের মধ্যে ত ভেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এই আকার স্বর্ণাদিতেও থাকে। আর একই মৃত্তিকায় একই কালে নানা আকারও হয় না। অতএব ঘট ও মৃত্তিকায় ঠিক ভেদাভেদ হয় না। আর তজ্জন্য ভূমা ও "সব" বস্তুর মধ্যেও ভেদাভেদ হয় না।

যদি বলা হয়—ঘটাকারটী ঘটরূপ মৃত্তিকা ভিন্ন থাকে না, অতএব অভিন্ন বলিব না কেন ? তাহা হইলে বলিব—ঘটাকারটী স্বর্ণেও থাকিয়া প্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া তাহাকে ভিন্নই বলিব ?

যদি বলা হয়—ভিন্ন হইলে "ভূমা" ও "সেই সব" ত ভিন্নই হইল, ভেদাভেদ না হইলেও ভেদই হইল, আর তাহা হইলে অদ্বৈত ত সিদ্ধ হইল না ? তাহা হইলে বলিব—না, ইহাতে অদ্বৈতের ব্যাঘাত হইল না। কারণ, ভূমা বা আত্মাই সত্য বলা হইয়াছে বলিয়া উক্ত "সব"-পদবাচ্য বস্তুকে মিথ্যাই বলিব। যেমন ভিক্ষুক আমি, দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া যদি মনে মনে নিজকে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বলিয়া কল্পনা করি, তাহা হইলে যেমন আমার রাজার আকারটী মিথ্যা হয়, এস্থলেও মৃত্তিকার ঘট হওয়ায় এবং ভূমার সর্ব্বাকার ধারণ করা মিথ্যাই হইবে। ঘট ও মৃত্তিকার ভেদাভেদ অর্থ এই যে, তাহারা একদৃষ্টিতে ভেদযুক্ত এবং অন্য দৃষ্টিতে অভিন্ন। যেমন ঘট মৃত্তিকারূপে মৃত্তিকার সহিত অভিন্ন এবং আকাররূপে ভিন্ন। ঘট ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু মৃত্তিকা নষ্ট হয় না। এজন্য আকার কখনই আকারীর ন্যায় সত্তাবান্ হয় না, আর তজ্জন্য অল্পসত্তাক। এই আকারটাই মিথ্যা এবং মৃত্তিকাটাই অধিকসত্তাক বলিয়া সত্য বলা হয়। এই কথাই ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডে কথিত হইয়াছে যথা—

(১২) "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি,
কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতি ইতি। ৬।১।৩
"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ,
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। ৬।১।৪
"যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং
বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ।৬।১।৫
"যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং
বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়স-
মিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি।" ৬।১।৬

অর্থাৎ আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি সেই উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয় ?" শ্বেতকেতু বলিলেন—"ভগবন্ ! এই উপদেশ কিরূপ, তাহা আপনিই বলুন।" ৬।১।৩

আরুণি বলিলেন—"হে সৌম্য ! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমুদায় মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হয়, বিকারটী বাক্যের আরম্ভণ একটী নামধেয় মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।৬।১।৪

হে সৌম্য ! যেমন একটী লোহমণির দ্বারা সমুদায় লোহময় বিজ্ঞাত হয়, বিকারটী বাচারম্ভণ নামধেয় মাত্র, লোহ এইটীই সত্য। ৬।১।৫

হে সৌম্য ! যেমন একটী নরুণদ্বারা সমুদায় লৌহময় বস্তু জানা যায়, বিকারটী বাক্যের আরম্ভণ নামধেয় মাত্র, লৌহটীই সত্য, হে সৌম্য ! সেই উপদেশ এইরূপ।" ৬।১।৬

এস্থলে বলা হইল—মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহের কোন একটী আকার দেখিয়া যেমন তাহাদের অন্য আকারের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়, আর এই আকারগুলি মিথ্যা, এবং মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহই সত্য হয়, তদ্রূপ সেই এক সদ্বস্তুর জ্ঞানে যাবতীয় বস্তুরই জ্ঞান হয়, সেই সদ্বস্তুর আকার এই যাবতীয় বস্তুই মিথ্যা। এই সদ্বস্তুর কথা পরবর্ত্তী "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" বাক্যে বলা হইয়াছে। এইরূপে এতদ্বারা সেই এক অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা হয়—এস্থলে এক মৃৎপিণ্ডের, বা একটী লোহমণির বা একটী নরুণের দ্বারা মৃজ্জাত, স্বর্ণজাত ও লৌহজাত যাবতীয় বস্তুর জ্ঞানের কথা বলায়, আকারটী মৃত্তিকাদিকে ত্যাগ করে না বলা হইল। সুতরাং আকারও সত্য, অর্থাৎ আকার মৃত্তিকার ন্যায়ই সত্য বলা হইল ? তাহা হইলে বলিব—না, একথা সঙ্গত নহে। কারণ, পরে মৃত্তিকাই সত্য, সুবর্ণই সত্য ও লৌহই সত্য বলায় আকারনিরপেক্ষ মৃত্তিকাদিরই কথা বলা হইল বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে আকারশূন্য সদ্বস্তুরই জ্ঞানে সব জানা যায় এবং তাহাই সত্য বলা হইল।

যদি বলা যায়—মৃত্তিকাই সত্য বলায় মৃত্তিকার বিকার ঘটাদিকে মিথ্যা কেন বলিব ? তাহাও সত্যই বলিব ? মৃদ্বিকারকে বাক্যের আরম্ভণ ও নামধেয় বলায় তাহা মিথ্যা কেন হইবে ? তাহা অনিত্য এইমাত্র বলিব, মিথ্যা বলিব কেন ? ইহার উত্তর এই যে, "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বলায় "এব" পদদ্বারা মৃত্তিকাজ্ঞানের বিষয় মৃত্তিকামাত্র হইতে অন্য বস্তুকে, অর্থাৎ এস্থলে তাহার আকারকে মিথ্যাই বলা হয়। সত্যের বিপরীত ত অনিত্য নহে, পরন্তু মিথ্যাই হয়। এস্থলে নানা আকারে অনুস্যূত আকারনিরপেক্ষ মৃত্তিকাই সত্য, আর তাহার আকারাদি সব মিথ্যাই হইল। এস্থলে একটী মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সব জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া যদি "মৃৎপিণ্ডই" সত্য বলা হইত, তাহা হইলে আকারযুক্ত মৃত্তিকাকে সত্য বলা হইত; কিন্তু তাহা না বলিয়া মৃত্তিকাই সত্য বলা হইল। এজন্য

পিণ্ডাকারবর্জ্জিত মৃত্তিকাই গ্রহণ করিতে হইল। তদ্রূপ সেই সদ্বস্তুর আকার বাদ দিয়া সদ্বস্তুকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে বিকার পদদ্বারা রূপকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বাচারম্ভণ ও নামধেয় পদদ্বারা নামকে গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহা হইলে নামরূপ নষ্ট হইবে। এইরূপে সেই, নামরূপশূন্য সদ্বস্তুই লব্ধ হইবে। আর এই নামরূপ যে ত্যাজ্য, তাহা অন্য শ্রুতি মধ্যে কথিত হইয়াছে। অতএব সেই এক সদ্বস্তুই সত্য, তাহাতে নামরূপ যুক্ত হইয়া এই যে জীব ও জগৎ হইয়াছে, তাহা মিথ্যা—ইহাই এস্থলে বলা হইল। আর নামরূপ বাদ গেলে এক অদ্বৈতেই পর্য্যবসান হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এতদ্দ্বারা সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা হয়—মৃত্তিকাই সত্য, সুতরাং তাহার আকার ঘটশরাবাদি যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সেই সব ঘটশরাবাদি দ্বারা যখন ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তখন তাহাদিগকে "নাই" বলা যায় কি করিয়া? মৃত্তিকা যতদিন থাকে, ঘটশরাবাদি ততদিন থাকে না বটে, কিন্তু তথাপি ত তাহারা কিছুকালও থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে মিথ্যা বলা সঙ্গত হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাদ্বারাও ব্যবহার হয়, আর যে বস্তু স্বরূপতঃ নাই, অথচ দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম মিথ্যা। যাহা নাই অথচ দৃষ্ট হয় না, তাহাকে অসৎ বলা হয়—যেমন বন্ধ্যাপুত্র। অতএব ঘটশরাবাদি মিথ্যা বলায় ব্যবহারে কোন দোষ হয় না। রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিলে যেমন রজ্জুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তদ্রূপ মৃত্তিকাকে ঘটাদিতে পরিণত করিলে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। রজ্জুসর্প দংশন করিয়াছে জ্ঞান হইলে যেমন ভয়, কম্প ও মৃত্যুপর্য্যন্তও হয়, তদ্রূপ ঘটাদির দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। কেবল রজ্জুসর্প অল্পকাল স্থায়ী, আর ঘটাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী—এই মাত্র প্রভেদ। অথবা রজ্জুসর্পকে যেমন "সর্প নয়" বলিয়া শীঘ্র জ্ঞান হয়, ঘটাদিকে সেরূপ "ঘট নয়" বলিয়া শীঘ্র জ্ঞান হয় না—এইমাত্র প্রভেদ। অতএব এই শ্রুতির দ্বারা জগৎ মিথ্যা ইহাও বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায় "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এই বাক্যে আকারবর্জ্জিত মৃত্তিকা বুঝা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, মৃত্তিকা আকারবর্জ্জিত থাকে না—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বাক্যে মৃত্তিকাকে মৃৎপিণ্ডই বুঝিতে হইবে। কারণ, ঘটাদি ভাঙ্গিয়া গেলে মৃৎপিণ্ডেই তাহারা পরিণত হয়—ইহাই দেখা যায়। অতএব মৃত্তিকাকে আকারবর্জ্জিত বলিয়া গ্রহণ করা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। আর তাহা হইলে ঘটাকারাদি মৃত্তিকারই ন্যায় সত্য। আর তজ্জন্য ঘটাদির সহিত মৃত্তিকার কেবল ভেদই যে আছে, তাহা নহে কিন্তু অভেদও আছে বলিতে হইবে। যে আকার মৃত্তিকা ত্যাগ করিয়া থাকিতেই পারে না, সেই আকারকে মৃত্তিকার সহিত অভেদ বলিতে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না।

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, মৃত্তিকাকে যদি আকারশূন্যরূপে স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে যে মৃৎপিণ্ড নষ্ট হয় সেই মৃৎপিণ্ডই ঘটকালে থাকে না বলিয়া তাহাদের

অভেদ সিদ্ধ হয় না। ঘট ও মৃৎপিণ্ড একই কালে অভিন্ন হইলেই তাহাদিগের মধ্যে অভেদ সিদ্ধ হয় নচেৎ নহে। এইরূপ ঘট ও শরাবাদির মধ্যে একই মৃত্তিকা একই কালে থাকিতে পারে না বলিয়া মৃত্তিকারূপে ঘট ও শরাবাদি অভিন্ন—একথাও বলা যায় না। আকারশূন্য মৃত্তিকা স্বীকার না করিলে আর মৃত্তিকা ও পিণ্ডঘটশরাবাদির সহিত অভেদ স্বীকার করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আকারশূন্য মৃত্তিকা স্বীকার করিলে আকার আর মৃত্তিকার ন্যায় স্থায়ী অর্থাৎ সত্য হইতে পারে না।

তাহার পর—শ্রুতির সহিত প্রত্যক্ষের বাধা হইলে শ্রুতিই বলবতী হইবে, প্রত্যক্ষ নহে। অবশ্য লৌকিক বিষয়ে এই নিয়ম স্বীকার করা হয় না—ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলেও আর এস্থলে যুক্তির দ্বারাও আকারবর্জিত মৃত্তিকার জ্ঞান আমাদের হয়—ইহা প্রতিপন্ন করা যায়।

যদি বলা যায় ব্রহ্মও অলৌকিক বস্তু নহে কারণ ব্রহ্ম জগতের কারণ, সুতরাং শ্রুতি এস্থলে বলবতী হইবে না। এবিষয়ের বাধা যখন শ্রুতি অলৌকিক ব্রহ্মের তত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, তখন এবিষয়ে শ্রুতির প্রমাণই বলবৎ হইবে অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই সত্য হইবে। কারণ, বহু মৃন্ময়বস্তুর মধ্যে যখন ইহা মৃত্তিকা বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন আকারবর্জিত করিয়াই আমাদের মৃত্তিকার জ্ঞান হয় স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব শ্রুতিতে যে "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—পিণ্ডাকার মৃত্তিকা সত্য বা চূর্ণাকার মৃত্তিকা সত্য—এরূপ নহে। কিন্তু মৃত্তিকার জাতি-পুরস্কারেই "মৃত্তিকা সত্য" হইতে পারিবে। জাতি ও আকার এক বস্তু নহে। আর তাহা হইলে আকারশূন্য মৃত্তিকা স্বীকার্য্য, তাহাকে অবলম্বন করিয়া "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এই সিদ্ধান্ত উপদেশ করা হইয়াছে। আর দৃষ্টান্ত যে সর্বাংশে দার্ষ্টান্তিকের সহিত ঐক্য হয়, তাহাও নহে। সুতরাং আকারশূন্য মৃত্তিকা স্বীকার করিলেও তাহা অপ্রসিদ্ধ বা দেখা যায় না বলিয়া দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মে যে আকার কল্পনা করিতে হইবে না, এমন কোন কথাই নাই। এইজন্য শ্রুতি আকারশূন্য মৃত্তিকার মৃত্তিকার জাতির দৃষ্টান্ত দিয়া ব্রহ্মভিন্নের মিথ্যাত্ব অর্থাৎ অনিত্যত্বে ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব জীব জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবে না কেন? কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, দ্রব্যের যে জাতি, তাহা দ্রব্যের আকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। গুণ ও কর্মের যে জাতি, তাহা "আকার" নহে বটে, কিন্তু ঘটাদি দ্রব্যের যে জাতি, তাহা ঘটের আকারই হয়। এজন্য এই "ঘট ও মৃত্তিকার" দৃষ্টান্ত দ্বারা যে মৃত্তিকার সত্যতা বলা হইল, তাহা আকারশূন্য মৃত্তিকা অর্থাৎ কল্পিত মৃত্তিকা বলিতে হইবে। কারণ, মৃত্তিকা আকারশূন্য হয় না। আকারের তুলনায় মৃত্তিকা নিত্য বলিয়া মৃত্তিকাকে সত্য বলা হইয়াছে মাত্র। অতএব এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মিথ্যাত্বই বলা হইয়াছে। জীব জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে অভেদের কথিত হয় নাই। যদি বলা হয় কল্পিত মৃত্তিকার দ্বারা শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিবেন কেন? দৃষ্টান্ত

কল্পিত হইলে তদ্দ্বারা কিছুই বুঝা যাইতে পারে না। অতএব সত্য মৃত্তিকাই এস্থলে গ্রাহ্য অর্থাৎ আকারবিশিষ্ট মৃত্তিকা গ্রাহ্য, সুতরাং ভেদাভেদই স্বীকার্য্য? কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, ব্রহ্মকে লৌকিক বস্তু বলিলে ব্রহ্ম বিকারী, সুতরাং বিনাশী হইবেন। শ্রুতিই বলিয়াছেন ব্রহ্মের উপমা নাই, তিনি অসঙ্গ, অদ্বিতীয় ইত্যাদি। যথা "ন তস্য উপমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ", "অসঙ্গঃ হ্যয়ং পুরুষঃ" এবং "একমেব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি। আর এইরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু, তাহাই পরিচ্ছিন্ন, সদ্বিতীয় বস্তুই হইবে। সুতরাং কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ব্রহ্মকে বুঝাইতে হইলে কল্পিত বস্তুর সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। আর তজ্জন্য শ্রুতিকল্পিত মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মসত্তার এবং জগন্মিথ্যাত্বের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

আর যদি বলা হয় সাকার মৃত্তিকারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা হইলেও ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ হইবে না। কারণ, যে কালে যে মৃত্তিকার অংশটী ঘট হয়, সে কালে আর তাহা শরাবাদি হয় না। অতএব ঘট ও মৃত্তিকা অভিন্নই বলিতে হইবে, উহাতে যে ভেদ তাহাই কাল্পনিক হইবে। ঘটশরাবাদিতে মৃত্তিকাদৃষ্টিতে অভেদ, আর ঘটশরাবাদিদৃষ্টিতে ভেদ— এই মতবাদ সর্ব্বথা অযুক্ত।

এই শ্রুতির অর্থটী ৯৬ সংখ্যক পঞ্চব্রহ্মোপনিষদে আছে। তথায় জগতের মিথ্যাত্ব অতিস্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে, যথা—

"যথা শ্রবণমাত্রেণাশ্রুতমেব শ্রুতং ভবেৎ।
অমতং চ মতং জ্ঞাতমবিজ্ঞাতং চ শাকল ॥২৮
একেনৈব তু পিণ্ডেন মৃত্তিকায়াশ্চ গৌতম।
বিজ্ঞাতং মৃণ্ময়ং সর্ব্বং মৃদভিন্নং হি কার্য্যকম্ ॥২৯
একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং যথা।
বিজ্ঞাতং স্যাদথৈকেন নখানাং কৃন্তনেন চ ॥৩০
সর্ব্বং কার্য্যমিদং জ্ঞাতং তদভিন্নং স্বভাবতঃ।
কারণাভিন্নরূপেণ কার্য্যকারণমেব হি ॥৩১
তদ্রূপেণ সদা সত্যং ভেদেনোক্তির্মৃষা খলু।
তচ্চ কারণমেকং হি ন ভিন্নং নোভয়াত্মকম্ ॥৩২
ভেদঃ সর্ব্বত্র মিথ্যৈব ধর্ম্মাদেরনিরূপণাৎ।
অতশ্চ কারণং নিত্যমেকমেবাদ্বয়ং খলু ॥৩৩
অত্র কারণমদ্বৈতং শুদ্ধচৈতন্যমেব হি।
অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে বেশ্ম দহরং যদিদং মুনে ॥৩৪
পুণ্ডরীকং তু তন্মধ্যে আকাশো দহরোঽস্তি তৎ।
স শিবঃ সচ্চিদানন্দঃ সোঽন্বেষ্টব্যো মুমুক্ষুভিঃ ॥" ৩৫

এতদ্দ্বারা দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত উভয় মতবাদই নিরস্ত করিয়া অদ্বৈতবাদই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রুতির দ্বারা সমর্থিত হইলে তাহার সতরূপ।

(১৩) "তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্য এবং
বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ
স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত
আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্ন-
মাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মত-
শ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো
নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি।" ৭।২৬।১

অর্থাৎ সেই এই প্রকার দর্শনকর্ত্তার, এই প্রকার মননকারীর, এই প্রকার বিজ্ঞাতার নিকট—আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে আশা, আত্মা হইতে স্মৃতি, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, আত্মা হইতে জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব তিরোভাব, আত্মা হইতে অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতেই ধ্যান, আত্মা হইতেই চিত্ত, আত্মা হইতেই সঙ্কল্প, আত্মা হইতেই মনঃ, আত্মা হইতেই বাক্, আত্মা হইতেই নাম, আত্মা হইতে মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতে কর্ম্মসমূহ, আত্মা হইতেই এই সমুদায় উৎপন্ন হয়। এস্থলে আত্মা হইতেই সব বলায়, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই বলা হইল, সুতরাং এতদ্দ্বারা এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা যায়—আত্মা হইতেই সব বলায় এই "সব" কথঞ্চিৎ আত্মভিন্ন বলিতে হইবে, নচেৎ তাহাদের দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন কিরূপে হইবে? অতএব এতদ্দ্বারা দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধ হয়, অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। কিন্তু একথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, "আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ" এবং "আত্মত এবেদং সর্ব্বম্" বলায় উৎপন্ন এই সব বস্তুর ভেদটী মিথ্যা বা কাল্পনিকই বলিতে হইবে। অন্যথা হইলে আত্মার বিকার অবশ্যম্ভাবী হয়। যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতে স্থির হইয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, সেই বস্তু তাহাতে কল্পিত বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। কারণ, যে মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট হয়, সে মৃৎপিণ্ড আর সেই মৃৎপিণ্ড থাকে না। কিন্তু যদি বলা হয়—ঘট সেই পিণ্ডাকার মৃৎপিণ্ডেই থাকে ও তাহাতেই লয় হয়, তাহা হইলে সেই মৃৎপিণ্ডের সত্তার অনুরোধে এই ঘটের হওয়া, থাকা ও লয়কেই মিথ্যা বলা আবশ্যক হয়।

অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়, দ্বৈতাদি অপর কোন বাদই সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা হয় পরবর্ত্তী শ্রুতিতে তত্ত্বদর্শী সমুদায় দর্শন করেন, সমুদায় লাভ করেন, ইত্যাদি বলায়, জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সমুদায়-পদবাচ্য বস্তু থাকে, অতএব এক অদ্বৈত সিদ্ধ হয় কি করিয়া? যথা—

(১৩) "তদেষ শ্লোকঃ —

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।

সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশ ইতি।

স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা চৈব, পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ,

শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।" ৭।২৬।২

অর্থাৎ এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—তত্ত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না, এমন কি দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্বদর্শী সমুদায়ই দর্শন করেন, এবং সমুদায়ই লাভ করেন। তিনি সৃষ্টির পূর্বে এক, তৎপরে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নয় প্রকার হন। পুনশ্চ তাঁহাকে একাদশ, একশত দশ, এবং একসহস্র বিশ বলা হয়।

অতএব তিনিই এই সমস্ত হইয়াছেন বলিয়া এইসবকে মিথ্যা বলা যায় না। অতএব তত্ত্বদর্শী এইসব দেখেন বলিয়া অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না ইত্যাদি। এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, না, এই শ্রুতির দ্বারা অদ্বৈতহানি হয় নাই। কারণ, তিনি এইসব হওয়ায় তাঁহার রূপহানি যদি না হয় বলা হয়, তাহা হইলে এইসব মিথ্যা বলিতে হইবে। আর তত্ত্বদর্শী তাহাতে এইসব দেখায়, এইসব তাহাতে কল্পিত বলিয়াই দেখেন বলা হইল বুঝিতে হইবে। তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মে লীন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপেই সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম দেখিয়া থাকেন, আর তজ্জন্য তাঁহার আর জগৎ সত্য ভ্রম হয় না। অতএব এই শ্রুতি অদ্বৈতেরই সমর্থক, অন্য মতবাদের নহে।

যদি বলা হয়—তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মে সম্পূর্ণ বিলীন হন না, কারণ, এস্থলে ত সেরূপ কোন কথা বলা হয় নাই। অতএব তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিও জগদ্দর্শন করেন, ইহাই সিদ্ধ হয়, আর তজ্জন্য অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না? কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, "সদেবেদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ এসব পূর্বে সৎই ছিল, "আত্মা বা ইদমেবাগ্র আসীৎ" অর্থাৎ এইসব পূর্বে একই আত্মা ছিল। "তজ্জলান্" অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মেই জাত স্থিত ও লয় প্রাপ্ত হয়—ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে ব্রহ্মভিন্ন বস্তু কিছুই নাই—সিদ্ধ হইতেছে। তাহার পর "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) অর্থাৎ তাঁহার ততদিন বিলম্ব যতদিন না বিমুক্ত হন ও ব্রহ্মসম্পন্ন হন। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ইহৈব প্রবিলীয়ন্তে" অর্থাৎ তাঁহার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, তিনি এখানেই লয় পান, "নামরূপে বিহায় সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি" অর্থাৎ নদী সকল নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্ত যায় ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবত্ব বিলোপের কথা জানিতে পারা যায়। এস্থলে নামরূপ ত্যাগ করিয়া অস্ত যাওয়ায় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না—ইহাই বলা হইল। অতএব উক্ত তত্ত্বদর্শীর নিকট যে জগদ্দর্শন, তাহা যতদিন তাঁহার দেহোপাধি থাকে। ইহা ততদিনের কথা, অনন্তকালের কথা নহে—বলিতে হইবে।

এস্থলে মায়ার যেরূপ অবস্থা, এই অধ্যায়ের প্রথমেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞান

অবস্থা ব্রহ্মার নিকট শাণ্ডিল্যেরও হইয়াছিল। ইহা ৯১ সংখ্যক শাণ্ডিল্যোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ এই শাণ্ডিল্যোপনিষদের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। সেস্থলে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদেরই কথা আছে। যথা—ধ্যানবর্ণনায় বলা হইয়াছে—

"অথ ধ্যানম্। তদ্দ্বিবিধম্ সগুণং নির্গুণং চেতি। সগুণং মূর্ত্তিধ্যানম্। নির্গুণম্ আত্মযাথাত্ম্যম্॥ ১০॥ অথ সমাধিঃ জীবাত্মপরমাত্মৈক্যাবস্থা ত্রিপুটীরহিতা পরমানন্দস্বরূপা শুদ্ধচৈতন্যাত্মিকা ভবতি॥ ১১॥ (১ম অঃ)।

এস্থলে জীব ব্রহ্মের ঐক্য কথনদ্বারা অদ্বৈতবাদই কথিত হইল, অন্যমতবাদ সিদ্ধ হয় না।

অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়—"অথ হ শাণ্ডিল্যো হ বৈ ব্রহ্মর্ষিঃ চতুর্ষু বেদেষু ব্রহ্মবিদ্যাম্ অলভমানঃ কিং নাম ইতি অথর্ব্বাণং ভগবন্তম্ উপসন্নঃ পপ্রচ্ছ অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং যেন শ্রেয়োঽবাপ্স্যামি ইতি। স হোবাচ অথর্ব্বা শাণ্ডিল্য সত্যং বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যস্মিন্ ইদম্ ওতং চ প্রোতং চ যস্মিন্ ইদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বং যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি। তদ্ অপাণিপাদম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ অজিহ্বম্ অশরীরম্ অগ্রাহ্যম্ অনির্দ্দেশ্যম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। যৎ কেবলং জ্ঞানগম্যম্। প্রজ্ঞা চ যস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী। যদ্ একমদ্বিতীয়ম্। আকাশবৎ সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং নিরঞ্জনং নিষ্ক্রিয়ং সন্মাত্রং চিদানন্দৈকরসং শিবং প্রশান্তম্ অমৃতং তৎপরং চ ব্রহ্ম। তত্ত্বমসি। তজ্জ্ঞানেন হি বিজানীহি য একো দেব আত্মশক্তিপ্রধানঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সর্ব্বভূতনিগূঢ়ো ভূতযোনিঃ যোগৈকগম্যঃ। যশ্চ বিশ্বং সৃজতি বিশ্বং বিভর্ত্তি বিশ্বং ভুঙ্‌ক্তে স আত্মা। আত্মনি তং তং লোকং বিজানীহি। মা শোচীঃ আত্মবিজ্ঞানী শোকস্য অন্তং গমিষ্যতি। ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥"

ইহাতেও অদ্বৈতবাদই প্রকটিত হইয়াছে। ইহার পর তৃতীয়াধ্যায়েও যাহা আছে, তাহাও অদ্বৈতবাদই, অন্যমতবাদ নহে। এস্থলে ব্রহ্মের যে তিন রূপের কথা আছে যথা—সকল নিষ্কল ও সকল নিষ্কল ইত্যাদি সেই সকলও অদ্বৈতবাদেরই অনুকূল হয়। এস্থলে শাণ্ডিল্য বেদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা না পাইয়া অথর্ব্বার নিকট যাহা পাইলেন, তাহাও বেদ বলিয়া বেদের যে নিন্দা তাহা ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি মাত্র বুঝিতে হইবে। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদের কথাটী এই শাণ্ডিল্যোপনিষদের অনুরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, আর তজ্জন্য এস্থলেও অদ্বৈতবাদেরই কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গিরিশচন্দ্র

শ্রীসনৎকুমার মৌলিক

প্রথম প্রভাতে যাঁরা এসেছিল
নাট্যশালার মূলে,
তুমি যে তাঁদের একজন ওগো
যায় নাই কেহ ভুলে।

অতি অপরূপ অভিনয় গুণে
মানুষে করেছ মুগ্ধ,
প্রাণ ভরে দেখে মন ভ'রে উঠে
হয়ে যায় তারা স্তব্ধ।

"সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো"
তোমার সে অভিনয়,
ভুলে নাই যারা শুনেছে সে কথা
আজও তারা সবে কয়।

বাংলাভাষায় তোমার সে দান
'যাবে নাক' বুঝিয়া
'বিবাহ' নাটক হিন্দী হয়েছে
নাম তার 'চুহিয়া'।

'নল-দময়ন্তী' অভিনীত হয়ে
ফরাসী দেশ যে ধন্য
নটরাজ ওগো গিরিশচন্দ্র
সবাকার তুমি মান্য।

'বুদ্ধদেবের' অনুবাদ প'ড়ে
বিস্মিত নরনারী,
লণ্ডন-কোর্টে * নাটক দেখিতে
তারি লাগি' তাড়াতাড়ি।

পরমহংসের ছিলে আদরের
অতি প্রিয়তম শিষ্য,
বাংলা নাটক বিশ্বের মাঝে
নহে আজ ওগো নিঃস্ব।

তোমার প্রতিভা ছড়িয়ে পড়েছে
সাতসাগরের পার,
তোমারে জানাই প্রণাম আমি
আজি শতশত বার।

---

* লণ্ডনের একটি থিয়েটার হলের নাম। কোর্ট থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' ইংরাজীতে অভিনীত হইয়াছিল। দর্শকগণ এই নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের দেহত্যাগে বাঙলার দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্য হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অন্তর্হিত হইল। বিগত ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার ৺কাশীধামে ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে।

১২৮৩ বঙ্গাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশে তর্কবাগীশ মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতীক্ষ্ণ মেধা ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ছাত্রাবস্থাতে বিভিন্ন শাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষ করিয়া প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতায় সংস্কৃতশাস্ত্র অনুশীলনকারী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তিনি সর্বত্রই সুপরিচিত। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসরকাল পাবনা ও অন্যত্র বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত অধ্যাপনা করেন। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' কর্তৃক তিনি "সুবোধ বসুমল্লিক অধ্যাপক" পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির আগ্রহে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায় শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহা ব্যতীত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের কার্য্য করেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় পাঁচখণ্ডে সমগ্র বাৎস্যায়ন ভাষ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়া বাঙলা ভাষাকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন—সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করিয়া যেন তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে তাঁহার এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বাৎস্যায়ন ভাষ্যের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন অপর খণ্ডগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা তাঁহার জীবনকালে আর ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার প্রণীত "ন্যায়পরিচয়" নামক গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তর্কবাগীশ মহাশয়ের সুগভীর জ্ঞান ছিল। বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ' ও অন্যান্য বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী বহু আগ্রহশীল জিজ্ঞাসু পাঠককে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিত। ন্যায়দর্শন ও বৈষ্ণব শাস্ত্র ছাড়াও তর্কবাগীশ মহাশয়ের সকল শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। যদিও তিনি চতুষ্পাঠীর প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরিবেশের মধ্যে আপনার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তথাপি শাস্ত্রব্যাখ্যান ও অধ্যাপনা বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারা অতীতেই আবদ্ধ ছিল না। তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ও প্রত্যেক শাস্ত্রকে অপর সকল শাস্ত্রের সহিত বিশেষ তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যা করিতেন। এই বিশেষত্বের জন্যই তর্কবাগীশ মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত সমাজে চিরদিনই আগ্রহ ও শ্রদ্ধার বিষয় হইয়া থাকিবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বামী শঙ্করানন্দ

শিশ্নোপাসক ও লিঙ্গোপাসনা—

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত আছে। ইহা নানা আকারে আধুনিক ভারতে হিন্দুদের ভিতরে বর্ত্তমান। এই লিঙ্গোপাসনার বিশেষ একটী প্রতীককে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী ভারতীয় পণ্ডিতকুল শিশ্নোপাসনাসূচক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। 'লিঙ্গ' শব্দের মূল অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। প্রতীক সহায়ে উপাসনা বা প্রতীকোপাসনাই লিঙ্গোপাসনা। এই বিশেষ প্রতীককে শিশ্নোপাসনাদ্যোতক বলিয়া প্রচার করিবার প্রথম অগ্রদূত লিঙ্গপুরাণ এবং দ্বিতীয় হইতেছেন ডাঃ ফ্রেজার (১)। ডাঃ ফ্রেজার বলেন, পৃথিবীতে যত সূচাগ্রমুখ প্রতীক আছে তাহা সমস্তই শিশ্নোপাসনাদ্যোতক। কিন্তু সিসিয়া ও কেনা নগরীতে এই প্রকার একটী প্রতীক নিয়া ডাঃ ফ্রেজার ভারী বিপদে পড়িয়াছেন এবং তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক 'গোল্ডেন বাও'-এর 'এডোনিস' অধ্যায়ে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এই প্রতীকটার অর্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান ভারতে যে সকল ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিতদের অনুবাদের উপর নির্ভর করেন, ফলে তাঁহাদের কোনও প্রকার স্বাধীন মত প্রচার করিবার সামর্থ্য থাকে না। তাঁহাদের চিন্তাধারাতে স্পষ্ট বৈদেশিক ছাপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল পণ্ডিতকুলের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াই তাঁহারা নিজের মত স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। অধিক কি স্বাধীনভাবে, বৈদেশিক অনুবাদকদের মত নিরপেক্ষ বৈদিক সাহিত্যের সমালোচনা আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতদের ভিতর বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতীচির বৈদিক পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার শব্দসমূহের ভিতর যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে তাহা ধরিতে না পারিয়া শিবলিঙ্গোপাসনাকে শিশ্নোপাসনা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ভারতীয় অনুবর্ত্তীগণ কোনও প্রকার চিন্তা না করিয়াই এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, এবং তাঁহাদের মতানুসারে বলিতেছেন ভারতীয়রা শিশ্নোপাসক! এ বিষয়ে বৈদিক নিরুক্তের অনুবাদক ডাঃ লক্ষ্মণস্বরূপ সব চেয়ে অধিকতর অগ্রসর। তিনি সারজন মার্শেলের মত খণ্ডন করিতে গিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আর্য্যরা শিশ্নোপাসক ছিলেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রাদি হইতে শ্লোক-

(১) Dr. Frazer, Golden Bough, Part IV Adonais, Attis, Osiris, Vol I, pp. 35-36.

সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২)। স্যার জন মার্শেল বলেন, মহেনজোদাড়োর নির্মাতাগণ আর্য্য ছিলেন না, কারণ আর্য্যরা শিশ্নোপাসনা করিতেন না এবং মহেন্‌জোদাড়োতে শিশ্নোপাসনা-দ্যোতক প্রতীকসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। ডাঃ লক্ষ্মণ স্বরূপের উদ্দেশ্য অবশ্য শুভ। তিনি মহেনজোদাড়োকে আর্য্য-নগরী বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রমাণ প্রয়োগের কৌশল অতি নিন্দনীয়। আর্য্যদিগকে শিশ্নোপাসক বলিয়া চিহ্নিত করিয়া তাঁহাদিগকে সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন করায় মাঝে আমাদের কোনও গৌরব নাই বরং নিন্দার কথা আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। স্বাধীন চিন্তার অভাব ও সাংস্কৃতিক দাসত্বই এই প্রকার অবিচারিত পরমতানুকরণের মূলভিত্তি।

যাহা হউক একণে তাহা হইলে এই শিবলিঙ্গটী কি ?

পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির ভিতর শিব হইতেছেন প্রলয়ের দেবতা, আবার এই শিবই রুদ্র। বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র শব্দ সূর্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শিবলিঙ্গ এই শিবেরই বা সূর্য্যেরই প্রতীক মাত্র।

ঋগ্‌বেদে যূপের কথা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যূপ প্রত্যেক আর্য্যদের বাড়ীর আঙ্গিনাতে পোতা থাকিত এবং সকল যজ্ঞের পূর্ব্বে ইহার অর্চ্চনা হইত। বৃষোৎসর্গে এই যূপকে 'বৃষ' বলা হয়। বৃষ শব্দে "বর্ষণশীল" বলিয়া সায়ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহা যে গৌণ ভাবে সূর্য্যকেই বুঝায় তাহা বলিয়াছেন। বৃষোৎসর্গে যে অগ্নি চয়ন করা হয় তাহা বাচস্পতি মিশ্রের মতানুসারে সূর্য্য নামে "সূর্য্যানামাগ্নি" অভিহিত হইয়া থাকে। অবশ্য রঘুনন্দন এই মত মানেন না। তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্রের মতানুসারে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে যূপ সূর্য্যের প্রতীক মাত্র। এই যূপের মাথায় একটী গোলাকার মুকুট পরান হয় এবং কখন কখন তাহার মাথায় চূণ মাখানো হাঁড়ী বসাইয়া দেওয়া হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—এই বৈদিক যূপই হয়ত পরে স্তম্ভাকার ধারণ করিয়া শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে (৩)। হিমালয়ে গোপেশ্বর শিব অষ্টকোণ সমন্বিত যূপাকার শিব-

---

(২) Dr. Lakshmanswarup. The Rigveda and Mohenjadaro—Indian Culture, Vol IV, No. 2nd Oct. 1937.

(৩) "লিঙ্গায়েত শৈবসম্প্রদায়, লিঙ্গোপাসনা বেদবিরুদ্ধ নহে এবং অথর্ব্ববেদ-নিবদ্ধ যূপস্তম্ভের (স্কম্ভের) উপাসনাই লিঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, কারণ যদি ঐরূপই হইবে, তবে বেদের অন্য কোন স্থলেই স্ত্রী-পুং-চিহ্নের পূজা পরিচায়ক কোনও মন্ত্র বিধানাদি প্রমাণস্বরূপে পাওয়া যায় না কেন? শিবলিঙ্গের পূজা যে পুং-চিহ্নের উপাসনা নহে, তাহার অন্য প্রমাণ উহার পূজাকালে পূজকের "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত-গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানধারণা করা। এতদ্ভিন্ন বেদোক্ত বহুপ্রাচীন

লিঙ্গ আছেন দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। তাহা হইলে এই স্তূপাকার শিবলিঙ্গগুলি সূর্য্যেরই প্রতীক ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। এই শিবলিঙ্গের মাথায় একটী গোলাকার পদার্থ থাকে তাহাকে বজ্র বলা হয়।

এখন দেখিব শিবলিঙ্গটীকে কি প্রকারে সূর্য্যের প্রতীক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায়। শিবলিঙ্গের ভিতর তিনটী অংশ আছে। মাথায় বজ্র, লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট। মাথায় এই গোলাকার বজ্র ও যূপের মাথায় যে ছাড়ী বা মুকুট তাহা সূর্য্যের প্রতীক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং শিবলিঙ্গকে যদি সূর্য্য কিরণের প্রতীক কল্পনা করা যায় তাহা হইলে গৌরীপট্ট নিশ্চয়ই পৃথিবী। সূর্য্যকিরণ যখন পৃথিবীতে আসে তখন মনে হয় যেন একটী ত্রিকূট গঠিত হইয়াছে, এই ত্রিকূটের শীর্ষ কোণ সূর্য্য এবং ভূমি পৃথিবীরূপী গৌরীপট্ট। মনে হয় পরবর্ত্তী যুগে বৈদিক যজ্ঞ যখন তান্ত্রিক হোমে পরিণত হইল তখন বৈদিক যূপও শিবলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইলেন এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সুবিধার জন্য শিবলিঙ্গ পৃথিবীতে না পুঁতিয়া ভূমিটি তাহার সঙ্গেই সংলগ্ন থাকিত। পরে বৈদিক যজ্ঞাদির লোপের সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকে ইহার মূলতত্ত্ব ভুলিয়া গেল তখন ইহার হয়ত স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দেওয়া আরম্ভ হইল এবং জনসাধারণের ভিতর ইহাকে শিশ্নোপাসনাদ্যোতক বলিয়া প্রচারিত করা হইল। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা এই যে, শিবপূজা-পদ্ধতিতে এমন কোনও কথা পাওয়া যায় না, যাহা হইতে মনে হইতে পারে যে ইহা শিশ্নোপাসনাদ্যোতক বরং ইহা যে সূর্য্যোপাসনাদ্যোতক তাহারই প্রমাণ রহিয়াছে। বারান্তরে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

দেবপূজায় মুদ্রা কি ?

প্রত্যেক ধর্ম্মেই কতকগুলি কর্ম্মকাণ্ড থাকে। প্রথম প্রবর্ত্তনের সময় তাহারা বিশেষ ভাবপ্রকাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। দেবতার সম্মুখে নানা প্রকার হস্তসংস্থান প্রদর্শন, আলোক, ধূপ প্রভৃতি দেখান এই সকল কর্ম্মকাণ্ড। কালে লোক মূলতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, তখন ঐ কার্য্যগুলি অনর্থক ও অবোধ্য ক্রিয়া এবং অবজ্ঞসম্পাদ্য হেঁয়ালীমাত্র পর্য্যবসিত হয়। শোনা যায় কোনও তান্ত্রিক সাধকের একটী কালো বিড়াল ছিল, সে সুবিধা পাইলেই পূজার নৈবেদ্যে মুখ দিত। তাই তিনি উহাকে পূজার সময় বাঁধিয়া রাখিতেন। তাঁহার দেহাবসানের পর তাঁহার পুত্র যখন পূজা করিতেন তখন তিনি কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই পূজার সময় কালো বিড়াল বাঁধিতেন। বাড়ীতে কালো বিড়াল না থাকিলে গ্রাম হইতে খুঁজিয়া আনিতে হইত। বিচারবিহীন অনুকরণ এই প্রকার হাস্যজনকই হইয়া থাকে। আমাদেশে প্রচলিত হিন্দুদেবদেবীর পূজায় কতগুলি মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নানা প্রকার

শিবপূজার এবং বৌদ্ধযুগের স্তূপসমূহের সহিত সংযোগ করিয়াই যে কালে বর্ত্তমান লিঙ্গোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই স্বামিজী যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।"

—ভারতে শক্তিপূজা, স্বামী সারদানন্দ—১২ পৃঃ।

(৪) স্বামী প্রেমেশানন্দ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। আমি এখানে তাহাদের কয়েকটী মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই সম্বন্ধে পাঠকদের মতামত জানিতে পারিলে সুখী হইব, এবং সেবিষয়ে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ মত গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ রহিলাম।

অঙ্কুশমুদ্রা—

ইহারদ্বারা জল শোধন করা হয়। অঙ্কুশ দ্বারা হস্তী মাহুত হাতীকে চালাইয়া থাকে, ইহার জলশুদ্ধি করিবার ক্ষমতা কোথায়? অঙ্কুশ দ্বারা যদি জলশুদ্ধি সম্ভব তবে গরুর পাচনবাড়ি বা ঘোড়ার চাবুকের কি অপরাধ হইল? ইহাদের দ্বারাই বা জলশুদ্ধি না হইবে কেন? তাহা যদি না হয় তবে বুঝিতে হইবে এই মুদ্রাটীর নাম অঙ্কুশ হইলেও ইহা অন্য পদার্থকে বুঝাইতেছে। সুতরাং এখন প্রশ্ন হইবে সেই পদার্থটী কি? আমার মনে হয় এই পদার্থটী হইতেছে সোমলতা। ইহা সোমলতার একটী পাতা ও শীষ। যখন বৈদিক আচার লোপ হইয়া যায় তখন তাহার ক্রিয়া কাণ্ডগুলি ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে হিন্দুধর্ম্মে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে লাগিল। প্রথম প্রবর্ত্তকগণ ইহার মূলতত্ত্ব জানিতেন। পরে মূলতত্ত্ব ভুলিয়া গেলেও আর্য্যগণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষ প্রচারিত আচারগুলি যে কি তাহা না জানিয়াই রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলে সোমসূক্তসমূহে সোমরসকে জলের সহিত মিশাইবার কথা আছে। এইখানে অঙ্কুশ মুদ্রা দেখানোর উদ্দেশ্য হইল জলের সহিত সোমরসকে কল্পনা সাহায্যে মিশ্রিত করা।

ধেনুমুদ্রা—

ইহাদ্বারা অমৃতীকরণ করা হয় অর্থাৎ কোশাস্থ জলকে অমৃতে পরিণত করা হয়। সোমরসের সঙ্গে দুধ মিশ্রিত হইলেই তাহা অমৃত হয়। ধেনুমুদ্রা দেখানো দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে দুধের সহিত সোমরস মিশ্রিত হইল। দুধের সহিত সোমরস মিশ্রিত হইলেই তাহা পানযোগ্য হয় বা অমৃতে পরিণত হয়।

মৎস্যমুদ্রা—

মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। অর্থাৎ জলে প্রচুর মাছ আছে তাহাই কল্পনা করা হয়। আর্য্যরা যে মাছ খাইতেন ঋগ্‌বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৃৎসমদঋষি সরস্বতী নদীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'হে সরস্বতি, তুমি আমাদিগকে প্রজা দাও, আমাদিগকে মৎস্য দাও।"

যোনিমুদ্রা—

ইহাও জলশুদ্ধির সময় প্রদর্শন করিতে হয়। ইহা নারীর প্রতীক। বৈদিক কোনও কার্য্যই স্ত্রীবিহীন হইয়া করা যাইত না। প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্রের সময়। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। পরে স্বয়ং শ্রীমূর্ত্তির

ব্যবহারও অসম্ভব হইয়া পড়াতে শুধু স্ত্রীমুদ্রা অর্থাৎ স্ত্রী চিহ্ন দেখাইয়াই কার্য্যসম্পন্ন করা হইত।

এই চারি মুদ্রা বৈদিক যজ্ঞে ব্যবহৃত দ্রব্য ও ব্যক্তিবাচক ইহাই স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। গোময়ম, মাংস ও যজমানের স্ত্রী তাহার সহধর্মিণী হিসাবে যজ্ঞে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তাই এই প্রধান দ্রব্যত্রয়কে হিন্দুজাতি যুগযুগান্তর ধরিয়া নিজ পূজার অঙ্গের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া নিত্য তাহার স্মরণ করিতেছেন।

'বিশ্ববাণী'-র নববর্ষ

স্বামী সদাত্মানন্দ

বিশ্বজননীর শুভেচ্ছায় 'বিশ্ববাণী'র আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল—এই ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব দিবসে। তিন বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক দিনে 'বিশ্ববাণী' নব পর্য্যায়ে পুনরুদ্যমে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং স্থির হয়—জগতের কল্যাণের জন্য ইহাতে প্রধান আলোচনার বস্তু হইবে সেই মহান আদর্শ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্রতাময় জীবন ও উপদেশ, তাঁহার লীলাসহচরগণের লোকহিতকর মৌলিক উক্তি ও প্রবন্ধাদি এবং ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, কথাসাহিত্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বিষয়। পত্রিকা পরিচালকবৃন্দের এই মহান উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বিশ্ববাণীর সেই প্রথম প্রভাতে শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামিজী মহারাজ তাঁহাদিগকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন—"কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র "বিশ্ববাণী"-কে তোমরা পুনরায় নব কলেবরে প্রকাশ করিতেছ জানিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। তোমাদের এ পুণ্য প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া সতত্তই আমার আন্তরিক শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের কারণে 'বিশ্ববাণী' যে এ পর্য্যন্ত নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তাহার উচ্চ লক্ষ্যপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে ও নানা দিক দিয়া নানাভাবে সুধী সজ্জনগণের সাহায্য, সহানুভূতি, আগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে স্বামিজী মহারাজের তথা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও 'বিশ্ববাণী'র একনিষ্ঠ সাধনা। এবার সর্বশক্তিমান ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও করুণা সম্বল করিয়া চারিদিকের এই যুদ্ধবিগ্রহের উন্মাদনার মধ্যে 'বিশ্ববাণী' আজ নবোদ্যমে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহাদের প্রচেষ্টা ও সাহচর্য্যে পত্রিকাখানি সর্বসাধারণে বিশেষতঃ সত্যান্বেষীদের মাঝে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাঁহাদের সকলকেই আমরা যথাযোগ্য অভিনন্দনাদি জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি এই নব বৎসরেও বিশ্ববাণী জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া ন্যায় ও সত্যের পথে আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ হইয়া নিজ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। হরি ওঁ তৎ সৎ।

সম্পাদক—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৩।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাকপত্তলা প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ { ২য় সংখ্যা

অদ্বৈতবাদ

(পূর্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

"স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়ম্ আকাশ তাবান্ এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভে অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদ্ অস্মিন্ সমাহিতম্ ইতি" ।৮।১।৩

অর্থাৎ "আচার্য্য বলিবেন—এই বাহিরের আকাশ যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশ। দ্যৌ ও পৃথিবী এই উভয়ই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত। অগ্নি ও বায়ু এই উভয়ই—চন্দ্র ও সূর্য্য এই উভয়ই, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সকল, এবং এই দেহী আত্মার ইহলোকে যাহা আছে এবং যাহা নাই এ সমুদায়ই ইহাতে নিহিত" ।৮।১।৪

এস্থলে হৃদয়ের ভিতরের আকাশ ও বাহিরের আকাশ সমপরিমাণ বলায়, পৃথিবী আকাশাদি সবই, এমন কি, যাহা নাই তাহাও হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশে অবস্থিত বলায় স্বপ্নে আকাশাদি দর্শনের ন্যায় এই হৃদয়াকাশই একমাত্র আছে, আর তাহাতে এই সব কল্পিত—ইহাই বলা হইল, সুতরাং ইহাতেও অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া গেল। তাহার পর—

(১২) "এতৎ সত্যম্ ব্রহ্মপুরম্ অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা, এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ৮।১।৫

অর্থাৎ ইহাই সত্যস্বরূপ. ব্রহ্মপুর হইতে সমুদয় কামনা নিহিত। ইনিই আত্মা পাপরহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, ক্ষুধারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি বলায় এক আত্মাতেই সব আছে বলা হইল। সুতরাং এই বহির্জগৎ বলিয়া কিছুই নাই—ইহাও বলা হইল। আর আত্মাই সব—বলায় আত্মস্বরূপাতিরিক্ত কিছুই নাই বলা হইল। আর তিনিই সত্যসঙ্কল্প—বলায় এই সবই তাঁহার সঙ্কল্প অর্থাৎ কল্পিতরূপ ইহাও বলা হইল। অর্থাৎ আত্মভিন্ন যাহা কিছু সবই আত্মাতে কল্পিত। অর্থাৎ তাহারা মিথ্যা—ইহাই বলা হইল। বস্তুতঃ এই কথাই পরবর্ত্তী খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে"। ৮।২।১

অর্থাৎ "তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোক সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন"।

এতদ্দ্বারা সত্যদর্শী মুক্ত পুরুষের দৃশ্যবস্তু মাত্রই আত্মায় কল্পিত বলা হইল, আর তজ্জন্য একজীববাদই কথিত হইল। আর তাহা হইলে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি এ সকল আপত্তির আর কোন মূল্যই থাকিল না।

যদি বলা হয়—এই আত্মা নামক আকাশমধ্যে যখন এই বিশ্ব স্বীকার করা হইতেছে এবং এই আত্মার সঙ্কল্পমাত্রই সমুদয় লোক যদি সত্য সত্যই উদয় হয়, তাহা হইলে এই আত্মা যে জগদ্ভেদবিশিষ্ট তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ এই বিশ্ব অতি সূক্ষ্মাকারে আত্মমধ্যেই অবস্থিত বলিতে হইবে। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈত অথবা দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদ তো সিদ্ধ হয় না?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। এই আত্মা শুদ্ধ আত্মা নহে, ইহার মধ্যে অনাত্মাও আছে, আর তাহাকে আত্মা বলাই ভ্রম। কারণ, সেই অনাত্মা অংশই জগৎ রূপে প্রকাশ পায়, আর আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থিতি করে, তাহা জগদ্রূপে প্রকাশিত হয় না। অতএব আত্মমধ্যে এই বিশ্বের সত্তা সত্য নহে, কিন্তু মিথ্যা বলিতে হইবে, নচেৎ অদ্বৈতের ব্যাঘাত হয়।

যদি বলা হয়—এই বিশ্ব এই আকাশ রূপ আত্মমধ্যে সূক্ষ্মাকারে থাকে না, কিন্তু আত্মার শক্তিবশতঃ সঙ্কল্পমাত্রই তাহাদের উদ্ভব হয়, এবং তাহাতেই স্থিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। যেমন স্বপ্নে মনই দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই হয়, মনের শক্তি সেই উদ্ভবের স্থিতির ও লয়ের কারণ; অতএব শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়?

তাহা হইলে বলিব—এই শক্তি সেই আত্ম বস্তুতে যদি থাকে, তবে সর্ব্বদাই সঙ্কল্পজন্য বিশ্ব বিদ্যমান থাকিবে, আর যদি বিশ্ব সর্ব্বদা না থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি সর্ব্বদা থাকে না, সুতরাং সেই শক্তিরও উদ্ভব ও বিলয়ের জন্য অন্য শক্তি আবার স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সেই শক্তিরও কারণ আবার অন্য শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনবস্থা অবশ্যম্ভাবী হইবে। এ জন্য এই শক্তিকে "আছে কি নাই" কিছুই বলা যায় না। আর তজ্জন্য এই শক্তিকে অনির্ব্বচনীয় বলিতে হইবে। অনির্ব্বচনীয় কখনও সত্য হয় না, কারণ, সত্য বস্তু নির্ব্বচনীয়ই হয়। অনির্ব্বচনীয়কে সেভাবে সত্য বলা যায় না। একন্য তাহা সত্যভিন্ন অর্থাৎ মিথ্যা বলিতেই হয়।

যদি বলা যায়, তবে এই যে মিথ্যা শক্তি, তাহাকেই আছে বলিব? মিথ্যা কিছু না থাকিলে তাহাকে মিথ্যা বলা হয় কেন? অতএব এই মিথ্যা শক্তি থাকায় তাহার আত্মা ব্রহ্মকে পূর্ব্বের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতই বলিব?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে মিথ্যাত্বেরই ব্যাঘাত হইবে। যেহেতু যাহা "আছে" নয় "নাই" নয় তাহাকেই মিথ্যা বলা হইয়াছে।

"আছে নয়" যাহা, তাহাকে "আছে" বলাই তো ব্যাঘাত। অতএব এই মিথ্যা শক্তিকে "আছে" বলিয়া শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত বলা সঙ্গত হইবে না।

তাহার পর এই ব্রহ্মপুর আত্মা নামক আকাশস্বরূপ ব্রহ্মকেই সত্য বলা হইয়াছে, অতএব তাহার মধ্যে যে কোন প্রকার বিশেষ স্বীকার করা হইবে, তাহাকে অসত্য অর্থাৎ মিথ্যাই বলিতে হইবে, অর্থাৎ এতদ্দ্বারাও সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

যদি বলা যায়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরও আনন্দ ভোগ হয়—ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, এই অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের শেষে বলা হইয়াছে, "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি" (৮।১।৬) অর্থাৎ "সকল লোকে তাহার স্বাধীন আচরণ হইয়া থাকে" ইত্যাদি। ইহাই তো আনন্দভোগ? আর তাহা হইলে ভোগ্য-ভোক্তৃ সম্বন্ধবশতঃ আত্মমধ্যে স্বগতভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং এতদ্দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতই সিদ্ধ হইতেছে।

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, শ্রুতিবাক্যে যে মুক্ত আত্মার কথা বলা হইল, তাহার উপাধি এখনও বিলীন হয় নাই। উপাধি বিলীন হইলে আর এই ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব থাকিবে না। আর যদি ইহা নিরুপাধিক আত্মার কথা বলিতে ইচ্ছায় হয়, তাহা হইলে বলিব—ইহা মুক্ত পুরুষের স্তুতিবিশেষ, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের আনন্দস্বরূপতা প্রাপ্তি হয় বলিয়া যত জীবের যতপ্রকার আনন্দ সম্ভব, সবই তাহার হয়—ইহাই এস্থলে বলা হইল। বস্তুতঃ সত্য সত্য ভোগপ্রাপ্তি হয় না। এই কথা ভাষ্যকার ৩য় অধ্যায় ভাহার শেষে (৩।৪।৫৮) বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন। তাহার ভাব যথা—

(১৪) "অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতমভয়ম্, এতদ্ ব্রহ্মেতি, তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।" ৮।৩।৪

অর্থাৎ "আর এই যে সম্প্রসাদ, অর্থাৎ সুষুপ্ত আত্মা, ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন অর্থাৎ প্রকাশিত হন। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মের নাম সত্য।" ৮।৩।৪।

এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হয় যে, স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলে আর শরীর থাকে না। আর আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, সেই ব্রহ্মই সত্য, সুতরাং তদ্ভিন্ন সবই অসত্য। অতএব সত্যসঙ্কল্প আত্মা, যাহা সঙ্কল্প করিয়া উৎপাদন করেন, তাহা সঙ্কল্পের পূর্ব্বে থাকে না বলিয়া আত্মার ন্যায় সত্য নহে। অর্থাৎ তাহা অসত্য।

যদি বলা যায়—এস্থলে "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" এই কথায় জীব ব্রহ্ম অভিন্ন বলা হয় নাই, কিন্তু জীব ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। জীব অজ্ঞানবশতঃ এই শরীরকে আমি বলে, সেই অজ্ঞাননাশই "অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়" বাক্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অতএব এতদ্দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতবাদই উপদিষ্ট হইয়াছে। অংশকে স্বরূপ নামে অভিহিত

ধরিবার রীতি আছে। যেমন বৃক্ষশাখাকে বৃক্ষ বলাও হয়। অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই কথিত হইয়াছে বলা যায় না।

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে, কারণ, এস্থলে "স্বেন রূপেণ" বলায় জীবের নিজরূপে অবস্থিতি হয় বলা হইয়াছে। যদি "স্বেন রূপেণ" না বলিয়া "ব্রহ্মরূপেণ" বলা হইত, তাহা হইলে জীব ব্রহ্মের অঙ্গ বলিয়া জীব ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করে বলা সঙ্গত হইত। কিন্তু "স্বেন রূপেণ" বলায় সে উপায় রহিল না। তাহার পর সেই "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" বলিয়া সেই ভাবকে ব্রহ্ম ও সত্য বলায় জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম বলা হইল। অতএব এতদ্দ্বারা জীব ও ব্রহ্মে অঙ্গাঙ্গিভাবের সম্ভাবনা থাকিল না, আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ এস্থলে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু অদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট হইয়াছে।

যদি বলা যায়, এই খণ্ডের প্রথমেই পিতৃলোকাদি এই সকল সত্যকাম আত্মাতেই বিদ্যমান থাকে, কেবল অসত্যদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া দেখা যায় না ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, তাহাতে তো মুক্তপুরুষের নিকট দৃশ্যজগৎ মিথ্যা বলা সঙ্গত হয় না, যথা—

"ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ, তেষাং সত্যানাং
সতামনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্তেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে।" ৮।৩।১

অর্থাৎ "সেই সমুদায় সত্যকামনা অসত্য আবরণে আবৃত, সেই সকল সত্যকামনা আত্মাতে বিদ্যমান থাকিলেও অসত্যদ্বারা আচ্ছাদিত। এজন্য ইহার কোন আত্মীয় এস্থান হইতে চলিয়া গেলে তাহাকে আর এখানে দেখা যায় না।" কিন্তু সেই সকল আত্মীয়কে হৃদয়াকাশে গমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"অথ যে চাস্তেহ জীবা যে চ প্রেতা, যচ্চান্তদ্ ইচ্ছন্ ন লভতে, সর্ব্বং তৎ
অত্র গত্বা বিন্দতে, অত্র হি অস্য এতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ।
তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতং অক্ষেত্রজ্ঞা
উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এব মেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ
অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি, অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। ৮।৩।২

অর্থাৎ "আর ইহার যে সমুদায় আত্মীয় জীবিত রহিয়াছে ও যে সমুদায় মৃত হইয়াছে, এবং মানুষ ইচ্ছা করিয়াও যে সমুদায় বস্তু লাভ করিতে পারে না—সে সমুদায়ই সেই হৃদয়াকাশে গমন করিয়া লাভ করে। কারণ, মানুষের সমুদায় সত্য কামনা এই স্থলে বিদ্যমান, কেবল সে সমুদায় অসত্য আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যেমন ক্ষেত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষেত্রের উপর বিচরণ করিয়া স্বর্ণাদি ধন লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সমুদায় প্রাণী অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও সেই সকল লাভ করিতে পারেনা, কারণ সে সকল অনৃত দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে।"

অতএব আত্মাকাশে এই বিশ্ব সত্য সত্যই অবস্থিতি করে। আর তজ্জন্য এতদ্দ্বারা দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতই সত্য বলিতে হইবে।

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে, কারণ, এ সকল জীবাবস্থায় জ্ঞানলাভের কথা, বিদেহমুক্ত অবস্থার কথা নহে। এসময় সাধকের জীবভাব সম্পূর্ণ অপনীত হয় নাই, এজন্য ইহা আর এই সমুদায় বস্তুকে সত্য বলা হইলেও ইহারা ব্রহ্মের ন্যায় সত্য ইহা বলা হয় নাই। কারণ, এই সকল সঙ্কল্পসমুৎপন্ন বস্তু, অতএব ইহারা যে পরিচ্ছিন্ন, তাহাতে তো কোন সন্দেহ নাই। পরিচ্ছিন্ন বস্তু কখনই ব্রহ্মবৎ সত্য হয় না। তাহার পর এই যে আত্মীয় সকলের দর্শন বা অভিলষিত বস্তুর লাভ তাহা স্বর্গলোকে যাইয়াই লাভ, আত্মস্বরূপে অবস্থিতির ফল নহে। যেহেতু ইহার পর বাক্যেই আছে—

"স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি,
তস্মাদ্ হৃদয়ম্ অহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।" ৮।৩।৩

অর্থাৎ "এই আত্মা হৃদয়ে, তাহার নিরুক্ত এই হৃদি অয়ম্, অর্থাৎ হৃদয়ে ইনি, এজন্য ইহার নাম হৃদয়ম্ হইয়াছে। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করেন।" অর্থাৎ স্বর্গলোকেই এইরূপ সকল বস্তুর লাভ হয় এতদ্দ্বারা বলা হইল। কিন্তু "যিনি এই শরীর ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন, তিনিই সত্য, এই কথা পরবর্তী বাক্যে থাকায় এই সমুদায় দৃশ্যকে ব্রহ্মমধ্যে নিত্য বিদ্যমান, অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বগতভেদবিশিষ্ট এরূপ কল্পনা করিবার কোনও অবসর থাকে না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞের সমুদায় কামনা পূর্ণ হয় বলিয়া কাম্যবস্তু সকল যে ব্রহ্মসম নিত্য সত্য, তাহা নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল, আর তজ্জন্য অদ্বৈতই সত্য—ইহাই সিদ্ধ হইল।

যদি বলা যায়—পরবর্তী চতুর্থ খণ্ডে এই আত্মাকে সেতু ও বিধৃতি প্রভৃতি বলায় এই সকল বস্তুও আত্মার সঙ্গে সদাবর্তমান। অতএব অদ্বৈত কি করিয়া সিদ্ধ হয়? যথা—

"অথ য আত্মা স সেতুঃ বিধৃতিরেষাং লোকানাম্
অসম্ভেদায়। নৈতং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতো ন
জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্বে
পাপ্‌মানোহতো নিবর্ত্তন্তে অপহতপাপ্‌মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।" ৮।৪।১

অর্থাৎ "তাহার পর এই যে আত্মা, ইনি সেতু স্বরূপ, লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, এজন্য ইনি বিধৃতি অর্থাৎ ধারণকর্তা। অহোরাত্র এই সেতুকে অতিক্রম করিতে পারে না, (অর্থাৎ ইহা কালের অতীত) ইহাতে জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, সুকৃত নাই, দুষ্কৃত নাই, সমুদায় পাপ ইহা হইতে নিবৃত্ত হয়, যেহেতু ইহা ব্রহ্মলোক।"

এস্থলে আত্মাকে ব্রহ্মলোক এবং সেতু ও বিধৃতি ইত্যাদি বলায় এই আত্মা স্বগতভেদবিশিষ্টই হয়। এজন্য বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদই সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না—ইহাই এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়?

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, এস্থলেও জীবোপাধি তিরোহিত হয় নাই। সুতরাং ইহা সগুণ ব্রহ্মেরই কথা হইতেছে। সগুণ ব্রহ্ম সকলের আধার অর্থাৎ স্বগতভেদবিশিষ্ট

হন, আর ইহা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ, সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অন্য শ্রুতিতে জ্ঞানীর কাম সকল বিলীন হয়, এরূপ বহু কথাই আছে, আর দ্বৈতশ্রুতি ও অদ্বৈতশ্রুতির বিরোধে অদ্বৈতশ্রুতিই প্রবল হয়, কারণ, দ্বৈতশ্রুতি অনুবাদকই হয়। বস্তুতঃ এই শ্রুতিতে কামচার হইবার কথাই রহিয়াছে, যথা—

"তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধঃ ভবতি,
বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী
ভবতি। তস্মাদ্ বৈ এতং সেতুং তীর্ত্বা অপি নক্তং অহঃ
এব অভিনিষ্পদ্যতে, সকৃৎ বিভাতঃ হি এব এষ ব্রহ্মলোকঃ। ৮।৪।২
তদ্ য এব এতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যেণ অনুবিন্দন্তি তেষামেব
এষ ব্রহ্মলোকঃ, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" ৮।৪।৩

অর্থাৎ "সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ আত্মস্বরূপতা লাভ করিলে অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, বিদ্ধ ব্যক্তি অবিদ্ধ হইয়া যায়, সন্তাপযুক্ত ব্যক্তি সন্তাপশূন্য হয়। সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিও দিন হয়, কারণ এই ব্রহ্মলোক সকৃৎবিভাত, অর্থাৎ নিত্য প্রকাশ স্বরূপ (৮।৪।২)। সেইহেতু যাহারা এই ব্রহ্মলোক ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করেন, তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মলোক হইয়া থাকে—তাঁহাদের সমুদায় লোকে কামচার হয়।" ৮।৪।৩

এস্থলে ইহা ব্রহ্মলোক বা সগুণ ব্রহ্মের কথা, অর্থাৎ এই আত্মাই সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মলোক নামে অভিহিত হইয়া সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি হন, ইহা বলায় ইহা নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের কথা নহে। সুতরাং মিথ্যা মায়া জন্য এই সগুণ ভাব হয় বলিয়া এতদ্দ্বারা অদ্বৈততত্ত্বের কোন বাধা ঘটিল না। বস্তুতঃ ইহার পর ৫ম খণ্ডে এই ব্রহ্মলোকে অর্ণব, সরোবর, অশ্বত্থ, বৃক্ষ, পুরী প্রভৃতি আছে—তাহাও বলা হইয়াছে। অতএব এই সগুণ শ্রুতির দ্বারা নির্গুণ শ্রুতিসমূহের কোনরূপ বাধা ঘটিতে পারে না। তদ্রূপ ৬ষ্ঠ খণ্ডে এই ব্রহ্মলোকের পথ ও দ্বারের কথা আছে। অতএব পূর্ব্ব কথা এতদ্দ্বারা দৃঢ় হইয়াই থাকে এবং অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

এতদ্ব্যতীত ইহাতে ৮।৬।৪ বাক্যে কথিত সংপ্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্ত পুরুষের পরিচয়ে অদ্বৈতই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা—

"তদ্ যত্র এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি,
আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি, তং কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি,
তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি।" ৮।৬।৩

অর্থাৎ "সেই এই জীব যখন সুপ্ত হয়, তখন সে সমস্ত হয় অর্থাৎ একীভূত, ও সম্প্রসন্ন হয় অর্থাৎ সুষুপ্ত হয়, তখন সে স্বপ্নে বিষয় অনুভব করে না, তখন সে এই সকল নাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এবং সে তেজঃসম্পন্ন হয়।"

এতদ্দ্বারা সগুণ আত্মারই কথা যে এস্থলে কথিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ হয়

না। কারণ, যে জানে না, তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না, যে আত্মা মধ্যে প্রবেশ করে ইত্যাদি বাক্যে আত্মার সোপাধিক ভাবই বুঝা যায়।

অতঃপর এই অষ্টম অধ্যায়ের ৭ম খণ্ড হইতে শেষ পর্যন্ত প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচন সংবাদদ্বারা এই সগুণ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মলোকের কথাতেই এই ছান্দোগ্যোপনিষৎ সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে এই অষ্টম অধ্যায়ের ১১শ খণ্ডে উক্ত ৮।১১।১ বাক্যের অনুরূপ বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রকে প্রজাপতি স্বরূপ আত্মার পরিচয় দিয়াছেন, এতদ্দ্বারা স্বরূপ আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা

"তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং
ন বিজানাতি, এষ আত্মা ইতি হোবাচ, এতদ অমৃতম্
অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম ইতি।" ৮।১১।১

অর্থাৎ "প্রজাপতি বলিলেন—এই যে সুপ্ত একীভূত জীব, ইহা সম্প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে স্বপ্ন দেখে না, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।"

কিন্তু ইন্দ্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, পুনর্বার প্রজাপতির নিকট আসিয়া বলিলেন—আমি তো ইহাতে ভোগ্য দেখিতেছি না, ইহাতে "এই আমি, এই ভূত সকল" এরূপ জ্ঞান তো হয় না ইত্যাদি। তখন প্রজাপতি পুনরায় বলিলেন—

"মঘবন্! মর্ত্যং বা ইদং শরীরম্ আত্তং মৃত্যুনা, তদস্য
অমৃতস্য অশরীরস্য আত্মনঃ অধিষ্ঠানম্। আত্তঃ বৈ
সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং, ন বৈ সশরীরস্য সতঃ
প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ অপহতিঃ অস্তি, অশরীরং বাব সন্তং
ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" ৮।১২।১
অশরীরো বায়ুঃ অভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুঃ অশরীরাণি এতানি।
তদ্যথা এতানি অমুষ্মাদ্ আকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ
উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যন্তে।" ৮।১২।২
"এবমেব এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং
জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।
স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা
নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরং, স যথা প্রযোগ্য আচরণে
যুক্ত এবমেব অয়ম্ অস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ।" ৮।১২।১-৩

অর্থাৎ হে ইন্দ্র! এই শরীর মর্ত্য এবং মৃত্যুগ্রস্ত, কিন্তু ইহাই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরী আত্মার প্রিয়াপ্রিয়সংযোগ বিনষ্ট প্রাপ্ত হয় না। অশরীর আত্মাকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না। (৮।১২।১) বায়ু অভ্র বিদ্যুৎ ও স্তনয়িত্নু—অশরীর। এসমুদায় যেমন আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে প্রকাশ পায়। এই

আত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। তিনিই উত্তম পুরুষ, তিনি তথায় বিচরণ করেন, ভক্ষণ করিয়া, ক্রিয়া করিয়া, রমণ করিয়া, স্ত্রী, যান ও জ্ঞাতির সহিত এই শরীরকে উৎপত্তিস্থানরূপে স্মরণ না করিয়া যেমন অশ্বাদি প্রয়োগ্য রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি এই প্রাণও দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে (৮।১২।২)।"

এইসকল বাক্য হইতে এই ব্রহ্ম বা আত্মাকে সগুণ বলিয়া বুঝিতে হয়। এজন্য এখানে অনেকে সন্দেহ করেন যে এই উপনিষদের শেষে কেন সগুণ ব্রহ্মের কথাই বলা হইল? নির্গুণ ব্রহ্মই যদি চরম সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার কথা তো এস্থলে বলা উচিত ছিল? অতএব এই উপনিষৎ হইতে নির্গুণ ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায় না। আর তজ্জন্য অদ্বৈতবাদ এই উপনিষদের প্রতিপাদ্যই নহে, ইত্যাদি। কিন্তু একথা সঙ্গত নহে। কারণ, সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান ও উপাসনার দ্বারা সমুদায় কাম্য বস্তুর লাভ হয় এই কথাই বলা হইয়াছে, যথা—

"অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ
এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে। ৮।১২।৫
"তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে,
তস্মাৎ তেষাং সর্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্বে চ কামাঃ,
স সর্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্,
যস্তম্ আত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতি ইতি হ প্রজাপতিরুবাচ,
প্রজাপতিরুবাচ॥" ৮।১২।৬

অর্থাৎ "আর যিনি বুঝিয়াছেন "যে আমিই মনন করিতেছি তিনিই আত্মা, তাঁহার মনই দৈব চক্ষুঃ হয়, তিনি মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা সমুদায় কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করেন। ৮।১২।৫। সেই এই আত্মাকে দেবতাগণ উপাসনা করেন, সেই জন্য তাঁহারা সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন। যিনি এই প্রকারে সেই আত্মাকে লাভ করিয়া অবগত হন তিনি সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন, প্রজাপতি এই কথা বলিলেন" (৮।১২।৬)। ইহা হইতে ইহাই বুঝায় যে, কাম্যবস্তু প্রাপ্তির পর যাহা হয় তাহা অবশ্যই হইবে। এখন যদি চিন্তা করা যায় যে, সমুদায় কাম্যবস্তু পাইলে কি হয়?

তাহা হইলে দেখা যায়, যে মানুষ শান্ত হইয়া যায়, সে ব্যক্তি আত্মস্থ হয় অর্থাৎ সে নিষ্ক্রিয় হয়। সুতরাং ফলতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপই হইয়া যায়।

তাহার পর, সমস্ত কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি বলিতে কি বুঝায়, তাহা যদি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলেও প্রকারান্তরে এস্থলে নির্গুণ ব্রহ্মেরও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বলা যায়। সেই প্রাপ্তি বলিতে প্রাপ্যবস্তুর স্বরূপতা লাভ ভিন্ন আর কিছু হয়। কারণ, যাহা আমা হইতে ভিন্ন, তাহাকে আমার লাভ করা ঠিক্ হয় না। তাহার ও স্বরূপ না হইলে তাহার লাভ হয় না। অতএব আমি যখন সর্বস্বরূপ হই, তখনই আমার সর্ববস্তুর লাভ হয়। আর সর্বস্বরূপ হইলে অদ্বৈত ভিন্ন আর কিছুই হয় না। যেহেতু সেই সর্বের সহিত যদি ভেদ

কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমি ও সর্ব্ববস্তুভিন্ন আবার তৃতীয় বস্তুর আবশ্যকতা কী। একত্র সর্ব্ববস্তুর প্রাপ্তি ও সর্ব্বস্বরূপ লাভ একই কথা, আর সর্ব্বস্বরূপ হওয়া এবং অদ্বৈত-স্বরূপ হওয়া একই কথা হয়। অতএব এই উপনিষদের দ্বারাও সেই এক অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেল। এই সুষুপ্ত আত্মাই যে নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহা বৃহদারণ্যক মধ্যে অতিস্পষ্টভাবে ৪র্থ অধ্যায়ে জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে কথিত হইয়াছে।

এইবার দেখা যাউক এই উপনিষদের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গগুলি কিরূপ। এস্থলে মাত্র ৬।৭।৮ এই তিন অধ্যায়ের বিষয়ই আলোচ্য। কারণ, প্রথমাদি ৫টী অধ্যায়ে উপাসনার কথাই আছে।

(৬ষ্ঠাধ্যায়ের)

উপক্রম—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

উপসংহার—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"

অভ্যাস—"তত্ত্বমসি" নয় বার

অপূর্ব্বতা—"যদ্র বাব কিল তৎ সোম্য! ন নিভালয়সে অত্রৈব কিলেতি।

ফল—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"

অর্থবাদ—"উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"

উপপত্তি—"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"

(৭ম অধ্যায়ের)

উপক্রম—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ"

উপসংহার—"তস্য হ বা এতস্য এবং পশ্যত এবং মন্বানস্য এবং বিজানতঃ আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা"

অভ্যাস—"স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ"

"অথাতোঽহংকারাদেশ এব অহম্ অধস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ"

অথাত আত্মাদেশ এব আত্মা এব অধস্তাৎ আত্মোপরিষ্টাৎ

অপূর্ব্বতা—"স হোবাচ কস্মিন্ ভগবোঽধ্যেমি"

ফল—"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি"

অর্থবাদ—"সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি। সর্ব্বম্ আপ্নোতি সর্ব্বশঃ"

উপপত্তি—"আত্মতঃ প্রাণঃ আত্মত আশা"

(অষ্টম অধ্যায়ের)

উপক্রম—"য আত্মা অপহতপাপ্মা"

উপসংহার—"তং বা এতং দেবা আত্মানম্ উপাসতে"

অভ্যাস—"এষ আত্মা ইতি হোবাচ এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম ইতি"

অপূর্ব্বতা—"তদ্ য এব এতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতি তেষামেব এষ ব্রহ্মলোকঃ"

ফল—"ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে, ন স পুনরাবর্ত্ততে।"

অর্থবাদ—ইন্দ্রবিরোচনের আখ্যায়িকা।

উপপত্তি—"অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুঃ অশরীরাণি এতানি।"

এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই প্রসিদ্ধ হয়, অন্যমতবাদ নহে।

[ক্রমশঃ]

প্রার্থনা

শ্রীকল্যাণী দেবী

দিওনা ঠাকুর, আর বিষয় বাসনা,
ও অনলে দগ্ধ আর কোরনা কোরনা।
কৃপাসিন্ধু রামকৃষ্ণ, শুধু কৃপা চাই,
তুমি ছাড়া মোর আর অন্য গতি নাই।

ভুলিয়ে রেখনা মোরে অনিত্য ভোগেতে,
ভোগে শুধু বাড়ে তৃষ্ণা, নাই শান্তি এতে।
প্রেমসিন্ধু রামকৃষ্ণ, রক্ষা কর মোরে,
প্রেমবারি সিঞ্চি মোর, তৃষা কর দূরে।

নাহি জানি তন্ত্র-মন্ত্র, নাহি মোর ভক্তি,
নাহি জানি জপ তপ, নাহি জানি যুক্তি।
নিখিলশরণ্য তুমি, তুমি মোর গতি,
তোমাতেই থাকে যেন, মোর অনুরতি।

কৃপা কোরে এস প্রভু, মোর হৃদাসনে,
কেটে যাক্ দিন-রাত তোমারি ধেয়ানে।
বিবেক বৈরাগ্য দাও, মোর এই প্রাণে,
শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে যেন ও রাঙা চরণে।

সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এ-এম (ব্রাউন), পি-এইচ-ডি (হামবুর্গ)

(ক্ল্যাসিক্যাল যুগ)

এইবার আমরা এমন একটি যুগে প্রবেশ করিতেছি যাহা প্রাচীন ভারতের সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর বলিয়া গণ্য করা যায়। ঐতিহাসিকেরা খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ হইতে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই সময়টিকে হিন্দুসভ্যতার বিবর্তনের (evolution) কাল বলিয়া নির্দেশ করেন। এই সময় ভারতবর্ষ বহির্জগতের সহিত নানাবিধ উপায়ে পরিচিত হইয়াছে, এবং তখন দুইতে কৃষ্টির বিনিময় হইয়াছে। এই কালেতেই ভারতীয় বণিকেরা অর্ণবযান আরোহণ করিয়া উত্তর ইউরোপে উত্তর সমুদ্রে (North Sea) পাড়ি দিত (১)। আবার আলেকজান্দ্রিয়াতে অবস্থিত ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা রোমীয় সম্রাট অগাষ্টাসের কাছে তিনবার ব্যবসায়িক দৌত্য (Commercial mission) পাঠাইয়াছিলেন। আবার সুদূর প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলসমূহে ভারতীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার করিতেছিল। কাজেই ভারতীয় কৃষ্টির সহিত বিদেশীয় সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময়েই অনুমান হয় অনেক বিদেশীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় সমাজে এবং গ্রীক ও পারস্যভাষা হইতে অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করে (২)

কাজেই এহেন যুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শন আমরা লিখিত ইতিহাসের অভাবে সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিতে বাধ্য।

এই প্রগতিশীল যুগে সংস্কৃত সাহিত্য এক নূতন বিবর্তনের স্তরে প্রবেশ করে। এখন সাহিত্য আর ধর্মের কচকচানিতে নিবদ্ধ নহে। এখন সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, জনশ্রুতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থার পর্যবেক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারত তখন সভ্যতার সামন্ততান্ত্রিক যুগে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। এই সব বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে।

সাহিত্যের এই নূতন বিকাশের শীর্ষস্থানে অশ্বঘোষের নাম উল্লিখিত হয়। তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক এবং ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন (৩)। কথিত আছে যে কুশাণ সম্রাট কনিষ্ক ইহাকে মগধ হইতে তাঁহার রাজ্যে লইয়া যান এবং এই রাজার আহূত তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে তিনি যোগদান করেন। কথিত হয় যে ইহার প্রচেষ্টাতেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেকটা নিকটবর্তী হয়।

(১) Pliny-র বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) এবিষয়ে R. L, Mitra, 'The Indo Aryans' এবং ডাঃ গৌরাঙ্গ ব্যানার্জীর "Hellenism in Ancient India" দ্রষ্টব্য।

ইঁহার একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "বজ্রসূচী"—ইহাতে বর্ণাশ্রম অর্থাৎ জাতিভেদের বিপক্ষে লেখা হইয়াছে। এই পুস্তকে তিনি অনেক ঋষির নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা হয় দাসীপুত্র অথবা পশুপুত্র। এই স্থলে পুরাণসমূহে যে সকল লোকদের অলৌকিক বা পশু পিতা বা মাতার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সমাজতত্ত্বিক আইন অনুযায়ী সেইগুলির ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে "দাসী পুত্র" অর্থে গোলাম রমণীর পুত্র অথবা বর্ণসঙ্কর এবং "পশুপুত্র" অর্থে টটেমবাদে বিশ্বাসী (Totemistic) আদিম অধিবাসীদের পুত্র। অশ্বঘোষ নাকি আরও বলিয়াছেন যে মনুর আইন এখন আর চলে না, কারণ শূদ্রেরা এখন ব্রাহ্মণদের ন্যায় শিক্ষিত হইয়াছে। ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি হইতেছে, ইনিই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় নাটক লেখেন, এবং ইনি সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় নাট্যকার। ইঁহার একখানি পুস্তকের নাম "বুদ্ধচরিত।" এই নাটকখানিতে তিনি বুদ্ধকে রামকে নামাইয়াছেন। দুঃখের কথা যে ইঁহার পুস্তকাবলী এখনও ভাষান্তরিত হয় নাই। এই জন্য তাঁহার লেখনী হইতে আমরা সবিশেষ সংবাদ পাই না।

অশ্বঘোষের কিঞ্চিৎ পরে মাতৃচেতা ও আর্য্যশূরি আবির্ভূত হন। কিন্তু তাঁহাদের পুস্তক সাধারণের নিকট পরিচিত নয়। অশ্বঘোষের পরে আসেন ভাস। কালিদাসের পূর্ব্বে ভাস একজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন। কালিদাস প্রভৃতি পরবর্ত্তী লেখকেরাও তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান ভারত তাঁহাকে বিস্মৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাসের লিখিত তেরখানি পুস্তক দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়।

জার্ম্মাণীর এক সংস্কৃতজ্ঞ প্রফেসার লেখককে বলেন যে ভাস কালিদাসের অপেক্ষাও বড় কবি তাঁহাকে ভারত কি প্রকারে বিস্মৃত হইয়াছিল? ভাস যে কালিদাস অপেক্ষাও বড় কবি তাহা পণ্ডিতেরা এখনও নির্দ্ধারণ করেন নাই। কিন্তু হয়তো মুসলমান যুগের ভারতে ভাসকে লোকে ভুলিয়াছিল। এই যুগে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যার কচকচানিতেই নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষকালেও ভারতীয়রা যে ভাসের নাম জানিতেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জয়ানকের পৃথ্বীরাজ চরিতে। এই কাশ্মীরী পণ্ডিত পৃথ্বীরাজের সভাসদ ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জীবন চরিত লেখেন। ইহাতে মহাকবি ভাসের প্রতি বন্দনা আছে। এক্ষণে কথা এই, ভাসের আবির্ভাব কালের তারিখটি কি? কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলেন (৩)। কিন্তু ভিনটারনিটস্ বলেন, ইনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। (৪)

(৩) H. C. Chakladar, Studies in Vatsyana's Kama-Sutra, p. 59 and D. R. Bhanderkar, Lectures on the Ancient History of India, p. 69.

(৪) Winternitz, "Geschich der indischen Litterature" Vol. III, pp. 35-37.

ভাসের পুস্তকসমূহও বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়ের "কবিকথা"-র দ্বিতীয় খণ্ডে ভাসের নাটকগুলি বঙ্গভাষায় গদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। নিখিলবাবু বলিয়াছেন, ভাসের প্রাচীনত্ব তাঁহার লেখন ভঙ্গী হইতে পাওয়া যায় আর—"বর্তমান নাট্যসূত্রের নিয়ম তাঁহার গ্রন্থে দেখা যায় না। বর্তমান ব্যাকরণ সূত্রের অনেক ব্যতিক্রমও তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে…ভাস লক্ষ্মণকে রামের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, এবং গোপকুমারীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে"।(৫) এক্ষণে আমরা ভাসের বিভিন্ন নাটক হইতে তৎকালীন কি কি সামাজিক আচার ব্যবহার পাওয়া যায় তাহা অনুসন্ধান করিব। "স্বপ্ন বাসবদত্তা" নামক নাটকে আমরা দেখি যে মাননীয় লোকের আদেশ শুনিবার জন্য মানুষকে আসন ছাড়িয়া উঠিতে হয়, যথা—"শুনিয়া রাজা আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'মহাসেন কি আজ্ঞা করিতেছেন'? তাহাতে কঞ্চুকীও বলিয়া উঠিলেন,—আপনি আসনস্থ হইয়াই মহাসেনের সংবাদ শুনুন" (৬)। এই পুস্তকে আমরা যৌগন্ধরায়ণ নামক একজন বড় রাজনৈতিক মন্ত্রীর পরিচয় পাই, এবং ইহাও দেখি যে সম্মানীয় পুরুষ ও স্ত্রীদিগকে "আর্য" ও "আর্যা" বলিয়া সম্বোধন করা হইত। কাঠের হস্তীর মধ্যে সৈন্য প্রবিষ্ট করাইয়া রাজকুমার উদয়নকে বন্দী করার কথা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। উইন্টারনিটজ্ বলেন, গ্রীক সাহিত্যের মহাকবি হোমারের গল্প হইতে এই গল্পটি গৃহীত হইয়াছে। তথায় কাঠের ঘোড়ার ভিতর সিপাহী প্রবেশ করাইয়া ট্রয় (Troy) অধিকারের গল্প আছে। "অবিমারক" নাটকে আমরা উত্তর ভারতে cousin marriage-এর (মামাতো ভাইএর সহিত পিসতুতো ভগ্নীর বিবাহের) দৃষ্টান্ত পাই। আবার তৎকালীন ব্রাহ্মণের শাস্ত্র জ্ঞানের অজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ পাই। যথা—"তখন বিদূষক বলিয়া উঠিলেন, 'আমি কি তবে শ্রমণক?' পরিচারিকা কহিল, 'তোমাকে লোকে অবৈদিক বলিয়া থাকে।' তাহাতে বিদূষক বলিলেন, 'আমি অবৈদিক কিসে? শুন তবে আমি রামায়ণ নামে নাট্যশাস্ত্রের পাঁচটি শ্লোক এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে পড়িয়াছি……আর এক কথা যে অক্ষরজ্ঞ ও অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন (৭)। আবার এই যুগে বিবাহ কালে কুলের শুদ্ধতা খোঁজা হইত এসংবাদও পাই। যথা—"এক্ষণে কুলগত শঙ্কা ত্যাগ করিয়া শুভ মিলনের চেষ্টা কর (৮)।" এই নাটকে বর্ণিত আছে যে রাজকুমারী ধাত্রী পাঠাইয়া সহর হইতে নিজের প্রেমাস্পদকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া রাত্রে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করাইয়া নিজের অন্তঃপুরে

(৫) নিখিলনাথ রায়, কবিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা /০—৶০

(৬) কবিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৭।

(৭) ঐ, পৃঃ ১০৬-১০৭।

(৮) ঐ, পৃঃ ১১০-১১১।

তাহাকে এক বৎসর রাখিয়া নির্জনে তাহার সহিত বিহার করেন। পরে লোকের কাণাঘুসা হওয়াতে রাজার কাছে এই সংবাদ যায়। তখন তিনি অন্তঃপুরে পুনরায় পাহারা নিযুক্ত করেন। তাহাতে প্রেমাস্পদকে পলাইতে হয়। শেষে পরিচয় পাওয়া যায় যে এই প্রেমাস্পদটি রাজকুমারীর মামাতো ভাই এবং উভয়ের বিবাহ হয়। যথা, ধাত্রী উত্তর দিল—"আমাদের রাজভবনের নির্জন স্থানে যোগানুষ্ঠানটা সম্পন্ন করুন। সেখানেও কোন একজন আরও বেশী যোগের চিন্তা করিতেছে......কন্যান্তঃপুরের রক্ষক অমাত্য আখ্যকৃতি মহারাজের শিষ্ট আদেশে কাশীরাজের দূতের সহিত চলিয়া গিয়াছেন...তখন তিনি রজ্জু অবলম্বন করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিলেন...তারপর তিনি সেই রজ্জু ধরিয়াই নীচে নামিলেন...ধাত্রীর কথিত গবাক্ষ দেখিতে পাইয়া তিনি তাহা উদ্ঘাটন করিয়া চলিলেন, এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন.. এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবিমারক ও কুরঙ্গী কন্যান্তঃপুরে আমোদ প্রমোদে কাটাইলেন...সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল তখন আবার কন্যান্তঃপুর রক্ষার ব্যবস্থা হইল.. অবিমারক কোনরূপে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন" (১)।

এই নাটকে আমরা এই সংবাদ পাই যে রাজাদের অন্তঃপুর বলিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল অন্যত্র পুস্তকে এই স্থানকে "অবরোধ"ও বলা হইয়াছে, এই স্থানটি প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হইত এবং পরপুরুষেরা এই স্থলে প্রবেশ করিতে পারিত না। বৈদিক সাহিত্যে আমরা এমন প্রকার গৃহের বর্ণনা পাইনা। এই প্রথাটি পশ্চিম এশিয়ার "হারেম" প্রথাটিরই অনুরূপ। ভারত এইকালে সামন্ততান্ত্রিক (Feudal) সভ্যতার স্তরে বিবর্তিত হইয়াছে। কাজেই স্ত্রীলোকদের বিষয় কড়াকড়ি নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্কিমবাবুর "রাজসিংহ" উপন্যাসের মোগল বাদশাহদের রঙমহালের গল্প পড়িয়া সাম্প্রদায়িক ধারণা গঠন করেন তাঁহাদের এই নাটক পড়া কর্তব্য।

"চারুদত্তে" আমরা এই সংবাদ পাই যে তৎকালে সহরের রাস্তায় রাত্রিকালে প্রদীপ দেওয়া হইত এবং রাত্রিকালে প্রহরীরা রাস্তায় পাহারা দিত এবং বেশী রাত্রি হইলে প্রহরীরা ঘোষণা করিয়া লোকদের রাস্তায় আসা নিষেধ করিত। এবং প্রত্যূষে পটহ (drum) বাজাইয়া প্রদোষকালের সংবাদ জানাইত। আবার সেই পুস্তকে আমরা ব্রাহ্মণবংশীয় সার্থবহ বণিকের পুত্র বণিক চারুদত্তের ন্যায় "কত্তোবাবু"-র সংবাদও পাই। তিনি কপর্দকশূন্য অথচ বসন্তসেনা নামক একজন গণিকার সহিত প্রেম করিতে গিয়া বড় মেজাজের চাল দেখাইতেছেন। এই 'চারুদত্ত' নাটকই পরে নাম বদলাইয়া "মৃচ্ছকটিক" নাম হয়। আরও পরে ইহা অন্য এক নামেও প্রচারিত হয়। এতদ্দ্বারা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেই প্রাচীন কালেও গ্রন্থকারেরা লিপিতস্করতা (plagiarism) করিতেন।

---

(১) কবিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১১-১১৩।

"প্রতিমা"-তে আমরা দেখি যে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকে দণ্ড করিয়া একটি বস্তু ব্যবহার করিতেন (১০)। আবার স্ত্রীলোকদের পরপুরুষের সম্মুখে মস্তকে অবগুণ্ঠন দিবার প্রথা ছিল। এই স্থলে একটি নূতন প্রথার সংবাদ পাওয়া যায়, যথা—"রাজা দশরথ দেহত্যাগ করিয়াছেন, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিমার সহিত প্রতিমাগৃহে তাঁহারও প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে, মহাদেবী কৌশল্যার সঙ্গে অন্তঃপুরবাসিনীরা তাহা দর্শন করিতে আসিতেছেন, সেইজন্য গৃহ পরিষ্কৃত হইতেছিল (পৃঃ ২৫০)। রাণীরা তখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ভরতকে বলিয়া উঠিলেন,—"এই দেখ বৎস আমাদের অবস্থা।" (পৃঃ ২৫৯)। এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে তৎকালে একটি মিউজিয়াম গৃহে মৃত রাজাদের মূর্ত্তি স্থাপিত করা হইত। এবম্প্রকারের প্রথা পরবর্ত্তীকালের ভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব হোহেনজোলার্ন রাজবংশের মধ্যে এবম্প্রকারের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। বার্লিনে Siegesalle নামক স্থানে এই প্রকারের মৃতরাজাদের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। "প্রতিমা"-তে লক্ষ্মণকে ভরতের জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যথা, "ভরত লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন, লক্ষ্মণ বলিলেন "এস এস বৎস আয়ুষ্মান্ হও" (পৃঃ ২৬৭)। পুনরায় রামচন্দ্র শ্রাদ্ধের বিধান জিজ্ঞাসা করিলে রাবণ বলিলেন—"শুন তবে শাকের মধ্যে কলাই, মৎস্যের মধ্যে মহাশফর, পক্ষীর মধ্যে বাধ্রিনস (১১) পশুর মধ্যে গো গণ্ডার অথবা এই সকলই (শ্রাদ্ধের দিনে) মনুষ্যের পক্ষে বিহিত (পৃঃ ২৮০)।

তৈলাবিক কুহ ক্রৌঞঃ শেতুং বৃষমহাশফিং,
বাধ্রিনসন্তং প্রাক্ত: মুনয়ো যজ্ঞকর্ম্মণি।

এতদ্দ্বারা আমরা খাসী গরু গণ্ডার প্রভৃতির দ্বারা তৎকালে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করার প্রচলিত ছিল বলিয়া আমরা দেখি। পুরাণে গোমাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবার কথা আমরা দেখি—আর মনুতে গণ্ডার মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

"অভিষেক" নাটকে দেখি যে বীরেদের তীরে তাঁহাদের নাম লিখিত থাকিত এবং তাহার দ্বারা তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যাইত। "বালী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, কিয়ৎক্ষণপরে আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়া শরে 'রাম' নাম পাঠ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন"— (পৃঃ ২০৪-৩০৫)। আবার এই পুস্তকে বরুণ-দেবকে সাগর হইতে উত্থিত হইতে দেখিবার বিবরণ পাওয়া যায় (পৃঃ ৩২৮)। পুনরায় একটি সামরিক প্রথার বিবরণ পাওয়া যায় যাহা সংস্কৃত কোনও পুস্তকে নাই—সেতু বন্ধন করিবার সময় নীল রামচন্দ্রকে বলিতেছেন— "সৈন্যদিগকে ক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া, পুস্তক প্রমাণে তাহাদের সংখ্যা পরীক্ষা করিতে

(১০) কবিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৮

(১১) অনুমান হয় যে 'বাধ্রিনস' শব্দের ঠিক বাঙলা অনুবাদ হয় নাই। ইহার অর্থ "খাসী" হইতে পারে। মনুতে তৃতীয় অধ্যায় ২৭১ শ্লোকে বাধ্রিনস মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের কথা আছে। আবার বৃহৎকর্ম্ম পুরাণে আছে,—

ওকরিতে দুইটি অজ্ঞাত বানর মৃত হইয়াছে। আমরা তাহাদের কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। দেবই ইহার ব্যবস্থা করুন" (পৃঃ ৩৩০)। ইহার অর্থ এই যে পল্টনের প্রত্যেক সৈন্যের নাম ডাকিয়া গণনা (roll call) করা হইত। এই প্রথা কি বিদেশী প্রভাবের পরিচয় প্রদান করে না? বাল্মীকির রামায়ণে এই সময়কার বিবরণে বানরসেনাসমূহ কি প্রকারে নানাবিধ পদবিক্ষেপ দ্বারা কুচকাওয়াজ করিয়া লঙ্কা অবরোধ করিল, সেই বিবরণ এই বিবরণের সঙ্গে উপরোক্ত সংবাদটির সহিত একত্র পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে তৎকালীন ভারতীয় সৈন্যদল আর rabel ছিল না। তখনকার ভারতীয় সৈন্যদলে ইউরোপীয় পদ্ধতির ন্যায় সৈন্য শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা কি গ্রীক-প্রভাব প্রসূত?

সীতার অগ্নি পরীক্ষার পর আমরা এই সংবাদ পাই যে—রামচন্দ্রকে দেখিয়া 'এই যে ভগবান নারায়ণ' বলিয়া অগ্নি তাঁহার জয়োচ্চারণ করিলেন (পৃঃ ৩৪৩)। ইহা হইতে আমরা এই সংবাদ পাই যে তৎকালে রামের উপর দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছে। "পঞ্চরাত্র" নাটকে দ্রোণ শকুনিকে বলিতেছেন "গান্ধার দেশেই তোমার গর্ব শোভা পায়, নিজে অনার্য বলিয়া সকল লোককে তুমি 'অনার্য' মনে করিতেছ (পৃঃ ৪১৮)।" এতদ্দ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে "আর্য" ও "অনার্য" মূল জাতিবাচক (racial) নহে। অশিষ্ট বা অশিক্ষিত ব্যক্তিকেই 'অনার্য' বলা হইয়াছে। তাহার পর এই নাটকে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে উত্তর গোগৃহের যুদ্ধে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু কৌরবদের সহিত একযোগে বিরাট রাজার বিপক্ষে লড়াই করিতেছে। এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে কৌরবেরা দ্বারকা হইতে অভিমন্যুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন, যদিও সেই সময় পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতবাস হইয়া বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এতদ্দ্বারা এই আমরা বুঝিতে পারি যে তৎকালীন সামন্ততন্ত্রিক যুগে অভিজাতদের মধ্যে নানাপ্রকারের শিষ্টাচার (etiquette) সৃষ্ট হইয়াছে এবং যদ্দ্বারা এবম্প্রকারের ঘটনা সম্ভব হয়। তৎপরে এই পুস্তকে আর একটি সংবাদ পাই। বিরাট রাজকুমার উত্তরের বিষয় বলা হইতেছে—"তিনি শত্রুপক্ষের যে সকল যোদ্ধৃপুরুষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের কার্যাবলী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তাহার দ্বারা আমরা এই দেখি যে সেই যুগে শত্রু হইলেও বীরের গুণ কীর্তনে কোন বীর কুণ্ঠিত নহেন। আবার এই যুগে বংশমর্যাদা অপেক্ষা কর্মেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হইতেছে—" বৃহন্নলা রাজার জয়োচ্চারণ করিলে বিরাট বলিতে লাগিলেন "কুল বা মূল কোন কারণ নয় একমাত্র কর্মই মহত্ত্ব ও নীচত্বের সূচক (পৃঃ ৪৩২)। পুনরায় এই নাটকে আমরা তীরেতে যোদ্ধার নামাঙ্কিত হইতে দেখি। যথা, শুনিয়া অভিমন্যু বলিয়া উঠিলেন—"নিজের গৌরব করিতে হয় না,...তবুও বলিতেছি যে হত ব্যক্তিগণের অঙ্গবিদ্ধ শরে এই নামই দেখিতে পাইবেন, আর কাহারও (নাম) নাই (পৃঃ ৪৪৩)।" পুনরায় সেই কথা, "সারথি উত্তর দিল 'এই দেখুন সেই বাণ, ইহার পুঙ্খে কাহার নাম লিখিত আছে (পৃঃ ৪৪২-৪৪৩)।"

"বৃত্তবাক্য" নাটকে অভিজাতদের মর্য্যাদা অনুযায়ী আসন দেওয়ার প্রথা ছিল, (৫৫৩পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাঁর ব্রাহ্মণ্যবাদীর সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার, তাঁহার লেখার মধ্যে এই সকল সামাজিক সংবাদ পাই যাহা আজকাল অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর পত্র

দার্জ্জিলিং
১১ই নবেম্বর ১৯২৩ইং

(১)

স্নেহের—

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি ধ্যান জপ নিত্য করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মূলমন্ত্র মনে মনে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিতে করিতে নিঃশ্বাস টানিতে থাকিবে। পরে মূলমন্ত্র আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ (কুম্ভক) করিবে, এবং মূলমন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে প্রশ্বাস ছাড়িবে। যে রূপ আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিলে বিশেষ কষ্ট না হয় সেইরূপই করিবে। যে মূর্ত্তি দর্শন করিবার তীব্র ইচ্ছা হইবে সেই মূর্ত্তিই দেখিতে পাইবে। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকিলে মনে শান্তি পাওয়া যায় না এবং ধ্যানেও মন একাগ্র হয় না। এরূপ সকলেরই হইয়া থাকে। যোগ সাধন নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া করিতে হয়। অফিসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং যোগসাধন দুইটা একসঙ্গে ভালরূপে হয় না। প্রায় তিন সপ্তাহ হইল আমি এখানে আসিয়াছি, এখানকার হাওয়ায় শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। কলিকাতার গরমে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলাম। আর ১২।১৪ দিনের মধ্যে কলিকাতায় নামিয়া যাইব। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

(২)

স্নেহের—

তোমার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।* আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন তাহার আত্মা শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা তাহার

উপরই খুবই ছিল, নতুবা সজ্ঞানে তাঁহার নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ হওয়া অসম্ভব। সে যা হউক একণে তুমি ভগবানের দিকে ষোলআনা মন দিয়া তাঁহার জপ ধ্যান কর। সংসারের সুখ দুঃখতো যথেষ্ট পাইলে, একণে পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারে যেন জড়াইয়া না পড় এই আমার উপদেশ। ব্রহ্মচর্য্য কর। ব্রহ্মচর্য্য না হইলে শান্তি লাভ করা মুস্কিল। সংসারটি একটি স্কুলের মত, তোমার স্ত্রীভোগ-ক্লাস উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবার ব্রহ্মচারী হইয়া থাক এবং ভগবানের নাম কর। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং সকলের ভালবাসা গ্রহণ করিবে।

ইতি—শুভানুধ্যায়ী
অভেদানন্দ

(৩)

The Ramakrishna Vedanta Society
Calcutta, 12-1-1938

স্নেহের—

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। জানিবে আত্মোৎসর্গ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে করিবার কোন কৌশল বা policy নাই, তবে সরল প্রাণে তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইতে হয়। তিনি দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে তবে নিজকে উৎসর্গ করা যায়। কারণ তাঁহার হাতের যন্ত্র হওয়া কি মুখের কথা? সমস্ত হৃদয়ের আত্মাভিমান রহিয়াছে, অথচ আমি কিছু নয়—কথাটা কি এত সহজ? ইহা কেহ মন্ত্রৌষধির মত দিয়া বা করিয়া দিতে পারেনা। মনকে প্রতিদিন শিখাইতে হয়—বালকের মত সরল হইবার জন্য, সকলকে আপনার বলিয়া ভালবাসিবার জন্য। তাহার পর অভ্যাস করিতে হয় নিজেকে ভগবানের যন্ত্ররূপে জ্ঞান করিতে; "সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি; তোমার কার্য্য তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি" জানিয়া এই জ্ঞান হৃদয়ে দৃঢ় হইলে তবে 'আত্মোৎসর্গ' সম্ভব হয়—গিরিশঘোষ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে বকল্মা দিয়াছিলেন।

অধিক কি? আমার স্বাস্থ্য ভাল। আশাকরি সমস্ত ভাল। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

(৪)

The Ramakrishna Vedanta Society
19B, Raja Rajkrishna Street
Calcutta. 2-1-1937.

স্নেহের—

তোমার ৫।১০।৪৩ তারিখের সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তোমার অনেক প্রকারের ইচ্ছা মনে উদিত হইতেছে এবং হইবে। তাহার কোন কুল-কিনারা পাইতেছ না। যখন এরূপ অবস্থা তখন তুমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করনা কেন? "Man proposes but God disposes" তোমার নিজের ইচ্ছানুযায়ী যখন এজীবনে কিছু করিতে সমর্থ নও তখন তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করা কি ভাল নহে? তিনি যেমন চালাইবেন তেমনি তুমি চলিতে থাক। 'আমি, আমার' এই বুদ্ধি ত্যাগ করিলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

(৫)

The Ramakrishna Vedanta Society
Darjeeling, 16-6-1937.

স্নেহের—

তোমার 14th. তারিখের সুদীর্ঘ প্রশ্নময় পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রশ্নসকলের উত্তর দিবার আমার সামর্থ্য নাই জানিবে। তুমি আমার "India and Her People," "Religion of the Hindus" etc. পুস্তক সকল পাঠ করিবে। জাতি সম্বন্ধে এবং দেশের সেবা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট লিখিয়াছি ও বক্তৃতা করিয়াছি। সেই সকল পাঠ করিলে তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

বিজয়া দশমী সম্বন্ধে তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছ তাহার উত্তর এই যে, শ্রীরামচন্দ্র দেবীকে উদ্বোধন করিয়া নবমী পূজার দিনে রাবণ বধ করিয়াছিলেন এবং দশমীর দিনে তাঁহার অনুচর বানর সেনা ও রাবণের রাক্ষস সেনার সম্মিলন ও কোলাকুলি করা হইয়াছিল। সেই historic ঘটনা আমরা এখনও বিজয়া দশমীর দিন comemorate করিয়া থাকি। কৈলাস যাত্রা ইত্যাদি পৌরাণিক বিবৃতি অনেকপ্রকার আছে।

তোমার মনে অনেকপ্রকার চেষ্টা উঠিতেছে। তাহাতে আমার আদেশ বা অনুমতি দিবার অধিকার নাই জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিলে তিনি

তোমাকে ঠিক্‌পথ দেখাইয়া দিবেন। বিশ্বাস চাই। যাহার ভক্তি ও বিশ্বাস নাই তাহার দ্বারা কোন মহৎকার্য্য করা সম্ভবপর নহে। তুমি তপস্যা দ্বারা নিজ মনের মলিনতা দূর করিয়া চিত্তশুদ্ধ হইলে "আমি কিছু করিতে পারি" এই বুদ্ধি থাকিবে না তখন শ্রীভগবানের আদেশ পাইলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। নতুবা "অহং" বুদ্ধি লইয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিবে তাহাতে failure নিশ্চয়ই হইবে এবং শান্তি পাইবেনা।

বর্ত্তমানে আশ্রমের সমস্ত কুশল এবং আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

(৬)

The Ramakrishna Vedanta Ashrama
Darjeeling, June 23rd 1936.

স্নেহের—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। চালাকী দ্বারা ধর্ম্ম হয় না। বালকের মত সরল না হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। তোমার ধৃষ্টতা ও অপরাধ হইয়াছিল। এরূপ ভবিষ্যতে কখনও করিও না। অনুতাপই উহার প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।

মানুষ আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। শ্রীশ্রীঠাকুর কি করিবেন? তুমি বিশ্বাসের সহিত ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে থাক। সময় হইলে তোমার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবে, বিশ্বাস চাই।

ধ্যানের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি ধরিয়া থাকিবে। গভীর সমুদ্রাদি, সূর্য্যালোক, প্রভৃতি এসব মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। ওসব দৃশ্য তাড়াইয়া দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। ন্যায়, বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলে ভক্তি বিশ্বাস উড়িয়া যায়। শুষ্ক জ্ঞান চর্চ্চাতে কিছুই লাভ হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সব বই পড়া নিষেধ করিতেন। তাঁহার নাম জপ করিলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে।

কতদিনে কলিকাতায় যাওয়া ঘটিবে শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন। বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আশ্রমের সমস্ত কুশল। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

(৭)

প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি যে ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী অভেদানন্দ তখনকার মত বেদান্ত প্রচার শেষ করিয়া কিছুদিন বিশ্রামলাভের জন্য নিউইয়র্ক ছাড়িয়া ওয়াশিংটনে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য লোকে তখন এমনই ব্যগ্র হইয়াছে যে তাহারা তাঁহাকে আদৌ বিশ্রাম করিতে দিল না। তাহাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য বৈঠকখানায়, স্টুডিওতে এবং সাধারণ সভায় মহারাজকে অনেকগুলি বক্তৃতা করিতে হইল। পরে দেখিয়াছি কর্মবীর অনন্ত কর্মকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্রামসুখ লাভ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কর্ম না করিয়া আলস্যে এক দণ্ড কাটিলে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। যখন তিনি আমাদের চক্ষে গুরুতর রূপে পীড়িত, তখনও দেখিয়াছি তিনি কিছু না কিছু করিতেছেন। চিকিৎসকগণ নিষেধ করিলেও তাঁহাকে নিরস্ত হইতে দেখি নাই। এরূপ একজন কর্মযোগীর কদাচিৎ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা সেই সঙ্গে ধর্মনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং তাহার সহিত ভারতের সম্বন্ধ ও সামাজিক সমস্যার জ্ঞানগভীর আলোচনা, এই সকল লইয়াই তাঁহার দিন কাটিতে দেখিয়াছি।

এইরূপ কর্মযোগী মুখে বলিতে পারেন যে, বিশ্রাম চাই—বিশ্রাম করিব—আর এখন কাজ নয়—যেমন স্বামী বিবেকানন্দকেও বলিতে শুনা গিয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাকে বা স্বামী অভেদানন্দকে বিশ্রাম করিতে কেহ দেখে নাই। আমরা যে অবস্থাকে বিশ্রাম করা বলি তাঁহারা উহাকে বলিতেন "কুড়েমি!"

স্বামী অভেদানন্দ বিশ্রাম করিবেন বলিয়া ওয়াশিংটনে আসিলেন। হয়ত ভাবিয়া থাকিবেন সেখানে তাঁহার কথা বড় বেশী কেহ জানে না কাজেই বক্তৃতা বা ধর্মব্যাখ্যা করিবার জন্য কেহ ধরিয়া বসিবে না। ফুল ফুটিলে তাহার সৌরভ দূর দূরান্তরেও ভাসিয়া যায়—ফুল নিজে সে খোঁজ রাখে না বটে, কিন্তু যাহারা সৌরভে মাতোয়ারা হইয়া উঠে তাঁহারা সেই কানন-কুসুমটিকে খুঁজিয়া বাহির করে। লোকে মহারাজকেও খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তিনিও প্রহৃষ্ট চিত্তে নানা বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজের ডায়েরি হইতে জানিতে পাওয়া যায় যে এই সময়ে (১৫ই মে) পিপ্‌ল্‌স্ চার্চ নামক গির্জা-ঘরে বহুলোকের সমক্ষে "হিন্দুদের ধর্ম" এই বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন গির্জায় উপস্থিত উপাসকমণ্ডলীর সকলেই তাহা শুনিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া-

ছিলেন। "Institute of Practical Christianity"-তে যে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় তাহাও সমাদৃত হইয়াছিল।

বেদান্তকে মার্কিণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত মহারাজ যে শুধু বক্তৃতা ও শ্রীগীতাদির অধ্যাপনার উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা নহে। মার্কিণের চিন্তা-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া যাঁহারা বহুজন-সমাদৃত ছিলেন, তাঁহাদিগের অন্তরঙ্গ হইয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার জন্য তিনি সে সময়ে বিশেষরূপে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সে চেষ্টায় তিনি যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার এই কালের ডায়েরিতে প্রকাশিত আছে। 'বিশ্ববাণীর' পাঠকগণ ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি মাসের ডায়েরি পাঠ করিলে সে পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন।

মহারাজ জানিতেন যে, নিউইয়র্কের সুশিক্ষিত ও সুসম্মানিত নাগরিকদিগের উপর কতকগুলি উদারহৃদয় খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের বিশেষ প্রভাব বর্ত্তমান আছে। ইঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে নিউইয়র্কে বেদান্তের প্রতিষ্ঠার আশা যে দুরাশা তাহা বুঝিতে পারিয়া মহারাজ এই সকল ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সকল উন্নতমনা বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে তোষামোদের দ্বারা জয় করিবার যে সম্ভাবনা ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। তর্কযুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করাই ছিল একমাত্র উপায়। মহারাজ সেই উপায় অবলম্বন করিয়া, যে পথে অগ্রসর হইলে অপেক্ষাকৃত কম বাধা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, সাধারণ জনগণের উপরও ধর্ম্মযাজকদিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাঁহারা ছিলেন সকলেই গোঁড়া খৃষ্টান্ এবং তাঁহাদিগের ইঙ্গিত মাত্রেই যে জন-সাধারণ তাঁহার বক্তৃতা-সভার ছায়াও স্পর্শ করিবেন না ইহাও মহারাজের অবিদিত ছিল না। মহারাজ তাঁহার ডায়েরির একস্থানে বলিয়াছেন—'এইসকল কারণে, যাহাতে সুবুদ্ধি নাগরিকগণ বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হ'ন সে জন্য আমাকে অশেষ পরিশ্রম করিতে হইত। খৃষ্টানের দেশে বেদান্ত সোসাইটীকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য আমি বহুপ্রযত্নে তাঁহাদিগকে বেদান্তমতাবলম্বী করিয়াছিলাম। (১) স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্ত-প্রচার-ব্রত আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, আমি পণ করিলাম যে সেই ব্রতকে কৃতীত্বের সহিত উদ্‌যাপিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় পথের সন্ধান করিব।' (I was determined to find ways and means for making a success of the Vedanta work in New York which was started by Swami Vivekananda, 'কিন্তু এই

(১) "Therefore I had to work hard to arouse the interest of the good people of the City (New York) and to persuade them to help me in making the Vedanta Society a powerful religious organisation in a Christian country." My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী of জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬।

বাধা করিবার জন্ত না ছিল কোন সঞ্চিত অর্থ, অথবা না ছিল নাগরিকগণ প্রদত্ত কোন এক‌ বাঁধা চাঁদা। আমার থাকিবার ঘর-ভাড়া, আহারাদির ব্যয়, বক্তৃতা করিবার জন্ত গৃহীত হলের ভাড়া, বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে বক্তৃতাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় প্রভৃতি সমস্তই আমাকে অর্জন করিতে হইত। আমার আয়ের একটি বই দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। আমার বক্তৃতার অন্তে একটি পেটিকা (Basket) লইয়া কেহ কেহ উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লোকে স্বেচ্ছায় সেই পাত্রে যাহা অর্পণ করিত তাহাই কুড়াইয়া আমাকে সর্বপ্রকার ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত। যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইত তাহাতে ব্যয় সংকুলান হইত না বলিয়া আমি আমার ব্যক্তিগত খরচ-পত্র যথা সম্ভব কমাইয়াছিলাম এবং আহারাদির জন্ত আমার ক্লাসের ছাত্রগণের নিমন্ত্রণের উপরই নির্ভর করিতাম। ইহা যেন ছিল ভারতে হিন্দুসন্ন্যাসীর ভিক্ষাবৃত্তি।' (২)

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, স্বামীজি নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে গমন করিবার পূর্বে নিজের চেষ্টায় ও তাঁহার শিষ্যদিগের চেষ্টায় নিউইয়র্কে যে বেদান্ত-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন তাহা একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিতই হইয়াছিল এবং স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় যাইয়া সেই প্রতিষ্ঠাকে আরও সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামী অভেদানন্দ যখন নিউইয়র্কে আসিলেন তখন তিনি তথায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত একটি বেদান্ত ক্ষেত্র পাইয়া তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন মাত্র। এই সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দের ডায়েরি হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম তাহা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, স্বামী অভেদানন্দকেই নিউইয়র্কে বেদান্ত-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইয়াছিল। তৎপূর্বে কতক লোকে স্বামী বিবেকানন্দের মুখ হইতে অপূর্বচ্ছন্দে বেদান্তের বাণী শুনিয়াছিল এবং কেহ কেহ বা তাহা শুনিয়া বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতেই একপ অনুমান করিতে পারা যায় না যে, তখনই মার্কিণে যথারীতি বেদান্ত-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন আমরা যাহাই বলি না কেন কিন্তু স্বামীজি স্বয়ং জানিতেন যে বেদান্তের প্রতি নিউইয়র্কের লোকদের আন্তরিক টান বা শ্রদ্ধা তাঁহার সময়ে আসে নাই! [He felt that the interest he had awakened was not what he wanted; to his mind it *was too superficial*. He desired earnest-minded followers whom he could teach freely while living independently in a place of his own (in N.Y.)—The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915)—Vol. II, page 356] যাহা হউক মহারাজের এই দুরূহ এবং মহৎ প্রচেষ্টা যে অল্প দিনেই কি পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দের মুখের কথাতেই তাহার পরিচয় বর্তমান। তিনি দ্বিতীয়বার নিউইয়র্কে,

(২) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী of চৈত্র, ১৩৩৬।

স্বামিজী (১৮৯৯) পুলকিত চিত্তে মহারাজকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) After closing his (Vivekananda's) public lectures in New York in the latter part of February 1896, the Swami consolidated his American work by organising the Vedanta movement into a definite Society and by issuing his teaching in book form. Thus came into existence the Vedanta Society of New York of which he was the founder. (৩)

(খ) Before leaving New York he made Mr. Francis H. Leggett, one of the wealthy and influential residents of the City, the President of the Vedanta Society. The other offices were occupied by the Swami's initiated disciples. (৪)

(গ) The untiring labours of the Swami Abhedananda following upon those of the Swami Vivekananda resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York. (৫)

(ঘ) The Swami (Abhedananda) proved himself not only an able and efficient teacher, but furthered the success of the work in every other way, by his remarkable organising powers etc ... (৬)

(ঙ) Under his able control and management, the work of organisation was fully accomplished and the Society came to be accepted and recognised as an established fact by prominent persons and even by many ministers of the Christian Church. Every thing seemed to point to an awakening on the part of the public to the fact that the Vedanta was a power to be reckoned with in the United States. (৭)

এখন দেখা যাউক "১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার নিউইয়র্ক সহরে গিয়া বেদান্ত-সোসাইটী-ভবনে স্বামী অভেদানন্দের সহিত কয়েক মাস বাস" করিবার কালে কি বলিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের সুবৃহৎ জীবন-চরিত "কালী তপস্বী" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই স্বামী বিবেকানন্দ পুলকিত চিত্তে বলিয়াছিলেন—Thrice I knocked at the door of New York but it did not respond. I am

(৩) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1913) Vol. II, page 425.

(৪) ঐ vol. II. page 430.

(৫) ঐ vol. III. page 349.

(৬) ঐ vol. IV (1918)—page 333.

(৭) ঐ vol. IV (1918)—page 335.

glad that you have established a permanent headquarters. This is the first time I have found our home in New York. (৮)

এই উক্তির সহজ অর্থ এইরূপই মনে করি যে স্বামীজি তাঁহার প্রিয় গুরু-ভ্রাতার অপূর্ব কৃতিত্ব দর্শনে পুলকিত হইয়া স্বভাব-সুলভ ঔদার্যের সহিত বলিয়াছিলেন—'ভাই, তিন বছরের চেষ্টায় আমি যাহা করিতে পারি নাই, তুমি তাহাই পারিয়াছ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।' এইরূপ উক্তি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতেই শুনিবার আশা করা যায় অন্যের নিকটে নহে!

এই স্থানে "কালী তপস্বী" গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ কেহ কেহ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐ পুস্তক "জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক লিখিত একখানি অপ্রামাণিক" পুস্তক! গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেই যে উহা অপ্রামাণিক হইয়া যায় না তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।" (কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, প্রথম খণ্ড)।

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র আছে "প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারত সংহিতা"—ইহাতেও সন্দেহ আছে।*

আবার অন্যত্র—"অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না।"

রোম সম্রাট জাস্টিনিয়নের আদেশে সঙ্কলিত রোমীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র যে কাহারা সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহা এখনও অজ্ঞাতই আছে।

যে গ্রন্থ এক সময়ে বাঙ্গালার নীলকুঠির পাদপীঠ নড়াইয়া দিয়াছিল এবং শুধু এদেশে নহে বিলাতের পার্লামেন্ট গৃহেও বিশেষ চঞ্চলতা সৃষ্টি করিয়াছিল সেই 'নীলদর্পণ' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।

ঐতিহাসিক গ্ল্যাডউইন, ষ্টুয়ার্ট, গোলাম হোসেন প্রভৃতি যে গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা অংশ রচনা করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থের নাম—তারিখ্‌ বাঙ্গালা। ইহার লেখক কে তাহা জানা যায় না।

নবাব আলিবর্দ্দী হইতে নবাব নজমুদ্দোলার কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক বিবরণ যে পারসী গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের পুস্তক!

(৮) কালী-তপস্বী (১৩২৬)—ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাহাতে লেখকের নাম ছিল না।

শরৎচন্দ্রের কতকগুলি প্রাথমিক রচনায় তাঁহার নাম নাই। তাঁহার "নারীর মূল্য" নামক যে সন্দর্ভ সমগ্র বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল তাহা "অনিলা দেবীর" রচনা বলিয়া প্রথমে প্রকাশিত হয়!

১৮৯৬ সালের 'হিতবাদী' পত্রিকায় কয়েকটী কবিতা প্রকাশিত হয়। নাম ছিল "রুচিবিকার"। কবিতাগুলির লেখকের নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়ায় হিতবাদী-সম্পাদক স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়কে কারাবরণ করিতে হয়। লেখকের নাম ছিল না বলিয়া যে "রুচিবিকারে" ঝাঁঝ কিছু কম ছিল তাহা নহে।

অজ্ঞাতনামা লেখক কর্ত্তৃক লিখিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির আর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় জে এন্ সেন গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত ভূমিকাসহ কংগ্রেসের যে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কুত্রাপিও লেখকের নাম নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে British Empire Publicity Company কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'Talking Points on India' নামক সন্দর্ভ British Minisitry of Information কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। লেখকের নাম ছিল না বলিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় (৪ঠা জুলাই ১৯৪১) লিখিত হইয়াছিল—"The question may now be asked about the authorship of this delectable document. Is it the product of one learned auother or of a hand of experts on Indian affairs? Have the Simla authorities any knowledge in this regard?"

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেই তাহা অপ্রামাণিক হয় না। "কালীতপস্বী" গ্রন্থ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে রচিত হয় এবং পুস্তক মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে মহারাজ স্বয়ং পাণ্ডুলিপি দেখিয়া থাকিবেন—এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

"কালীতপস্বী" যদিও একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কিন্তু উহাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রথম প্রামাণিক জীবন চরিত। তাঁহারই মঠ হইতে তাঁহারই জীবনকালে (১৯২৬) উহা প্রকাশিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদিগের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিলেন। তখন হইতে এযাবৎ পর্য্যন্ত এই পুস্তকের কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখা যায় নাই। সুতরাং "কালীতপস্বীতে" যে সকল বিবরণ আছে সেগুলি সমস্তই প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য। কাহারও মুখের কথায় ঐ গ্রন্থ "অপ্রামাণিক" হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বামী অভেদানন্দের ১৮৯৭ সালের ১৩ই মার্চ্চ তারিখের ডায়েরিতে দেখিতে পাই—"বিটার লেনেটের রুমে আমি একটি ঘরোয়া বৈঠক করিলাম। বেদান্ত সমিতির ভিত্তি যাহাতে সুদৃঢ় ও অটল হয় সেই উদ্দেশ্যে বেদান্ত সমিতিকে সংগঠিত করিবার

("organising"—"reorganising" নহে !) উহার সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। মিঃ গুড্‌ইয়ার, মিঃ টম্‌সন্, ব্রুক্‌লিনের মিঃ হিগিন্‌স্ এবং মিসেস্ হুগ্‌টন্ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমার ক্লাসের ছাত্র এবং সাধারণ সভায় প্রদত্ত আমার বক্তৃতাগুলি নিয়মিত ভাবে শুনিতেন। তাঁহারা আমার অধ্যাপনার ক্লাসের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং বেদান্তসমিতি গঠন ("to build up") করিতে আমার সহায় হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম মিঃ লেগেট আমার প্রতি বিশেষ কিছু সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা যখন বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি যখন আমার কতকগুলি বক্তৃতা শুনিলেন তখন ক্রমেই আমার দিকে বেশী আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।…বেদান্ত সমিতি "organised" হইলে পর তাঁহাকেই প্রথম সভাপতি করিতে হইবে, আমার মনে মনে এই ইচ্ছা থাকায়, যে পথে গেলে তাহা করিতে পারি আমি সেই পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম।' (১)

ডায়েরিতে দেখি যে ৪ঠা এপ্রিল তারিখে অপরাহ্ন ৪টার সময় বেদান্ত সমিতির সদস্যগণ মিঃ লেগেটের লাইব্রেরীতে সমবেত হইয়া সমিতি সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ইহার একমাস পরে মহারাজ নিউইয়র্কের কাজ বন্ধ করিয়া বিশ্রামলাভের জন্য ওয়াশিংটনে যাত্রা করেন। ওয়াশিংটন নগর যুক্তরাজ্যের রাজধানী। রাজধানীতে আসিয়া যে, তিনি আদৌ বিশ্রামলাভ করিতে পারেন নাই সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

নিউইয়র্ক ত্যাগ করিয়া ওয়াশিংটনে আসিবার প্রাক্কালে মহারাজ তাঁহার ডায়েরিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিভাবে নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত ইহাতেও পাওয়া যাইবে। মহারাজ লিখিয়াছেন—"এখানে আমায় বলিতে হয় যে অক্টোবর ১৮৯৭ হইতে মে ১৮৯৮ পর্য্যন্ত আমার বক্তৃতা দিবার "Season" সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার সমুদয় আয়োজন এই সময়ে করা হইয়াছে। (I conducted the various pioneering works of the Vedanta Society of New York)। এই সময়ে আমি নানাস্থানে ধারাবাহিক বক্তৃতাদি করিয়াছি এবং রাজযোগ ও বেদান্ত দর্শনের ক্লাসে অধ্যাপনাও এই সময়েই করিতে হইয়াছে। এই সময়ে আমি অনেক সম্ভ্রান্ত মার্কিণবাসীদিগের সহিত পরিচিত হইয়া নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটীকে আত্মনির্ভরযোগ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলাম "and laid the foundation of the Vedanta Society in New York on solid self-supporting basis.") (২)

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সদস্যগণ বরোদার গায়কোয়াড়ের উপস্থিতিতে মহারাজকে

(১) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।
(২) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী, আষাঢ় ১৩৩৬।

যে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহার কথা নানা স্থানে প্রসঙ্গতঃ বলিতে হইয়াছে। তাহাতেও দেখিয়াছি সমিতির সদস্যগণ বলিয়াছেন যে কাহারও সাহায্য না লইয়া আপন কর্মনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, সাহস ও একাগ্রতা প্রভৃতির বলে তিনিই একে একে শিলাবিন্যাস করিয়া বেদান্ত সমিতির সুমহান্ মন্দিরটী রচনা করিয়াছিলেন। সদস্যদিগের উক্তিটী ছিল এইরূপ :—"True to your Sannyasin spirit···asking aid of no one ···You began to build, stone by stone the solid structure of the Vedanta Society as it stands to-day"। (১০) মার্কিণে বেদান্ত-প্রচারের প্রথম কয়েক বৎসর মহারাজকে যে ঘরের এবং পরের নিকট হইতে প্রাপ্ত নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা প্রবন্ধান্তরে বলা হইয়াছে ; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দের কৃতিত্ব ও শক্তির মহিমা প্রথম হইতেই স্বামী অভেদানন্দের পথে আলোকধারা বর্ষণ করিয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। কীর্তিমান্ পুরুষদিগের কীর্তির মাহাত্ম্য এইরূপেই চিরদিন পরবর্ত্তীদিগের সহায় হয়। কিন্তু শুধু সেই আলোকে পথ দেখিয়া চলিলে খৃষ্টানের দেশে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বেদান্তের বাণীকে অমরত্ব দান করা স্বামী অভেদানন্দের পক্ষে বা যে-কোনও হিন্দুপ্রচারকের পক্ষেই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টা যে এই দিকে ফলবতী হয় নাই এবং একটি "Superficial interest" মাত্রই জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, স্বামীজির জীবন চরিত হইতে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। স্বামী অভেদানন্দেরও নিজের চিত্তাকর্ষক বাক্‌পটুতা ছিল, অশেষ শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্য বেদান্তের সম্মিলন ঘটাইবার সামর্থ্য তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শুধু পূজ্যপাদ স্বামীর কীর্তিমাহাত্ম্য ও নিজের বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি মাত্রকেই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেও স্বামী অভেদানন্দ সর্ব্বাংশে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ! সেই জন্যই তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল, মার্কিণীদের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিবার। নিজেকে প্রচারকের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে মহারাজ কখনই অন্তরঙ্গের স্বাভাবিক অধিকার ও সুবিধা লাভ করিতে পারিতেন না। তাহা না পারিলেই তাঁহার প্রচার-ব্রত সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইতে পারিত না।

মহারাজ প্রথমেই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মার্কিণীদের অন্তরঙ্গ হইবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার প্রাথমিক কর্ম্মকৌশল। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর দেশে বক্তারূপে উপস্থিত হইয়া হিন্দু সংস্কৃতি, ধর্ম্ম এবং বেদান্তের উপর সুযুক্তিমূলক এবং মনোহর একটি অভিভাষণ প্রদান করিলে শ্রোতার হৃদয়ে বক্তার উপর শ্রদ্ধা জাগ্রত হইতে পারে এবং বক্তার প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে তাহাদের হৃদয়ে বিস্ময়ও উৎপন্ন হইতে পারে

(১০) Swami Abhedanand's Lectures and Addresses in India—(1929).

কিন্তু ভারতের মূলতত্ত্বগুলিকে তাহারা যে জীবন-বেদের মত গ্রহণ করিবে, তাহা সম্ভব হয় না। পরের মুখে খুব ভালো কিছু শুনিলে আমরা স্বতঃই বলিয়া উঠি "বাঃ বেশ"—কিন্তু নিজের লোকের মুখে অনুরূপ কিছু শুনিলে শুধু "বাঃ বেশ" বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না—তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হইবার জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তখন হইতেই বক্তার সাফল্য লাভের মাহেন্দ্রক্ষণ উদিত হইয়া থাকে!

পাশ্চাত্য জগতে ক্লাব্-জীবনের মূল্য ও শক্তি বিশাল। সে দেশের ক্লাবই দেশের চিন্তা ও কার্য্য জীবন গঠন এবং নিয়মিত করে। খেলা ধূলা, আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়া এই মহাব্যাপার সংঘটিত হয়। পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আত্মীয়তায় দাঁড়ায়। চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্র সে দেশের ক্লাব্। সে দেশের অনুকরণে গঠিত আমাদের দেশের ক্লাবগুলি প্রায়ই এক-একটি "আড্ডা" মাত্র, যেখানে কাল অনায়াসে নিহত হয় এবং মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব হারাইতে বেশী দিন লাগে না! সে দেশের ক্লাব্ সাধারণতঃ লোকের ভিতর দিয়াই দেশের আশা-বিশ্বাসগুলিকে সৃজন করে, জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। সে দেশের জয় পরাজয়, বিপ্লব ও শান্তির বীজ ক্লাবের সীমা মধ্যেই উপ্ত হইতে দেখা যায়। মহারাজকেও তাই এক ক্লাবের বৈঠক হইতে অন্য ক্লাবের বৈঠকে—এক ড্রয়িংএর বৈঠক হইতে অন্য ড্রয়িংএর বৈঠকে সানন্দে বেদান্তের কথা, ভারতের কথা, ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা শুনাইতে হইয়াছে এবং ক্লাবের সদস্যদিগেরই সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া মিশিবার জন্য তাঁহাদিগের সুখ দুঃখের ভাগী হইতে হইয়াছে। সে দেশ জড়-ভরতের দেশ নহে—কর্ম্মী পুরুষের দেশ। তাহাদিগের খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সকলের ভিতরেই তাই প্রাণশক্তির উন্মাদনা আছে। মহারাজকেও সেই সকল ক্রীড়া-কৌতুকে উৎসাহ দিতে হইত। ধর্ম্মপ্রচারক নির্জীব সন্ন্যাসী মাত্র হইয়া শুধু বাক্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বসিয়া থাকিলে সে দেশের জনগণের মনের মধ্যে স্থান পাইবার সম্ভাবনা ছিল না এ সত্য তিনি বুঝিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী শঙ্করানন্দ

আমরা যাহাকে দেশ বলিয়া জানি তাহা এবং তাহার সত্তা ঠিক এক নহে। এই অনন্ত সত্তাকে আমরা বর্ণনা করিতে পারি না। তাহা হইলে এই বিশেষ সত্তার নির্দেশক লক্ষণ কি? এই সম্বন্ধে শুধু ইহাই বলা যায় যে, এই সত্তা আছে বা 'অস্তি'-স্বরূপ। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ এবং মানস-অনুভূতির অন্তরালে এমনই একটি অনুভব ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত যে, যাহাতে এক সত্তার অস্তিত্ব অনুমিত হয় এবং সে-সত্তা বাহিরের দৃশ্য পদার্থের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। "আমি আছি" এই যে আমাদের অস্তিত্ববোধ তাহা হইতে সে-সত্তাকে পৃথক করিতেও পারা যায় না। আর এই অস্তিত্ববোধ সর্বত্র এক ও অবিচ্ছেদ্য। বিশ্বের এই অদ্বিতীয় সত্তাকে বেদান্ত 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন। 'ব্রহ্ম'-শব্দে মহান্ বা সর্বব্যাপী সত্তা বুঝাইয়া থাকে।

যাহারা জ্ঞানবান্ তাঁহারা এই শাশ্বত সত্তা—যাহা সর্বত্র অনুস্যূত হইয়া আছে ও যাহার কোনও পরিবর্তন হয় না এবং পরিবর্তনশীল সত্তা—যাহার অবিরত পরিবর্তন ঘটিতেছে ও নাম রূপ বা গুণ আছে এই উভয়কে এক করিয়া ফেলেন না। এই উভয়ের যে পার্থক্য আছে তাহা তাঁহারা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, এই সকল নাম-রূপাদি নিয়ত গতিশীল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। জ্ঞানীরা এই পরিবর্তনশীল সত্তা হইতে অপরিবর্তনশীল বা সর্বদা একরূপ সত্তার পার্থক্য ভালভাবেই জানেন। কিন্তু সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তি এই ভেদ বুঝিতে না পারিয়া নিত্যকে অনিত্য ও অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে না এবং সেই সত্তার অবিনশ্বরত্বও তাহাদের চিত্তে প্রতিভাত হয় না। ক্রমবিকাশের নিয়মে যাহা পরিচালিত ও পরিবর্তনশীল এবং সেই নিয়মের বহির্ভূত যাহা অপরিবর্তনশীল এই উভয়ের পার্থক্য যাহারা (অজ্ঞানী) অনুভব করিতে পারে না। তাহাদের মন ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের ভূমিতেই বিচরণ করে এবং সেজন্য ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি হইতে জাত অনুভূতির বাহিরেও তাহারা গমন করিতে পারে না।

অবিবেকীদের মন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যেই বিচরণ করে। জগতের বাস্তব সত্তা যে কি তাহা তাহারা জানিতে পারে না, কেন-না তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে অবস্থিত। কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, এই জাগতিক সত্তা হইতে আর একটি পৃথক সত্তা আছে—যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই, সুতরাং

---

* শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর ইংরাজী "Gita Lectures" অনুসরণে।

ক্রমবিকাশের সমস্ত নিয়মের অতীত এবং যাহা তাহাদের প্রকৃত (আত্ম-) স্বরূপ তখন তাহারা বুঝিবে যে, এই সুখ, দুঃখ, রোগ, স্বাস্থ্য, জন্ম, মৃত্যু কিছুই আত্মাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। তাহারা কেবল পরিবর্তনশীল জগতের অন্তর্গত। তাহার পর শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি হইতে যে সুখ বা দুঃখ আমরা পাই তাহা শরীর ও মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে বটে কিন্তু আত্মাকে যথার্থ স্পর্শ করিতে পারে না। ইহারা আমাদের শরীরকে স্পর্শ করিয়া তাহাতে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র। আমরা হয় তো নিজেকে সুখী বা দুঃখী, শীতার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত মনে করিতে পারি কিন্তু আমাদের যে আসল সত্বা, তাহাকে ইহারা স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, আনন্দ-নিরানন্দ আত্মস্বরূপে কোনও প্রকার বিকার বা পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না। এই কথা প্রকৃষ্টরূপে আমাদের জানিয়া তাহাদের অনুভূতি ও ঘাত-প্রতিঘাতকে নির্বিকারে সহ্য করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

শরীরটাকে আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা দেখি কি? দেখি—এই শরীরে অন্যূন ৬০,০০০,০০০,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-কোষ (cells) আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জীবন বা প্রাণ আছে। প্রতি শ্বাসের সঙ্গে পনর হইতে ষোল হাজার ঐরূপ সূক্ষ্ম জীবাণু আমরা শরীরের ভিতর গ্রহণ করি। তাহার পর শরীর আমাদের অন্ন, জল, বাতাস, তাপ এবং অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এখন যখন আমরা বলি 'আমাদের শরীর' তখন দেখিতে হইবে পূর্ব্বোক্ত ঐ সকলের কোনটাকে আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি? এই ছয় লক্ষ কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুর মধ্যে কোনটি আমি? "আমার শরীর" এই কথার অর্থই বা কি? ইহা কিরূপে 'আমার' হইল? সুতরাং দেখা যায়, যতক্ষণ এই শরীরকে আমরা 'আমি' বলিতেছি, ততক্ষণ নিজেদের একটা শরীরে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। এই শরীর—যাহা অণুপরমাণুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহার সহিত যখন নিজেদের আমরা একীভূত করিয়া ফেলি তখনই মনে হয় যে, শরীরই "আমরা" বা 'আমি'। শরীরের ক্রিয়াগুলিকে আমরা নিজের ক্রিয়া বলিয়া তখন ভ্রম করি এবং মনে করি যে, আমি খাইতেছি, আমি পান করিতেছি, আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি বা দেখিতেছি। শরীরে যদি সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয় বা কোনও প্রকার অসঙ্গতি ইন্দ্রিয়ের ভিতর ঘটে তাহা হইলে আমরা ঐ সকল অনুভূতি বা অসঙ্গতিকে নিজেদের উপরই আরোপ করিয়া সুখ বা দুঃখ অনুভব করি। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও ভুলেন না যে, তিনি চৈতন্যময় আত্মা। আর সেজন্য সংসারের কোন দুঃখে বা কষ্টে তাঁহারা অভিভূত হন না। জগতের অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টময় অবস্থার মধ্যে পড়িলেও তাঁহারা সর্ব্বদাই সচেতন যে, এ-সকল অবস্থা শুধু শরীরকে মাত্র অভিভূত করে এবং তাহাদের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। এই সকল অনুভূতি ও সংস্কার আত্মার বা আমাদের স্বরূপসত্তায় থাকে না বা কখনও থাকিতে পারে না।

আমরা যদি বহিঃপ্রকৃতি বা বাহিরের পদার্থনিচয়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিব, যে সকল পদার্থের রূপ আছে তাহারা দেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু দেশের কোনও রূপ নাই সুতরাং পদার্থের রূপটীরও বাস্তব সত্তা নাই। তাহা হইলে ইহা কোথা হইতে আসিল—ইহাও কেহ বলিতে পারে না। এই সকল রূপের কারণই বা কি—ইহার উত্তরও আমরা জানি না। পুস্তকের আকারটী আমরা দেখিতে পাই কিন্তু এই আকারের কারণ কি—তাহা কি কেহ বলিতে পারে? না, পারে না। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে এবং তাহা এক প্রকার বস্তুও বটে। কিন্তু এই গুলিকে পরস্পর পৃথক করিয়া দেখিলে দেখা যায়—রূপটী থাকে না। এই সকল গুণ বিভিন্ন দ্রব্যে বর্ত্তমান থাকে সত্য, কিন্তু পুস্তকের যে রূপ তাহা পুস্তক ভিন্ন আর অন্য কিছুতেই নাই বা থাকে না। যখন তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে তখন অবিকল ইহার মত দ্বিতীয় রূপটী আর হইবে না। তাহাতে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবে তাহা যত সামান্যই হউক।

প্রত্যেক বস্তুকেই দেখিলে দেখা যায়, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী রূপ আছে। মনে হয় যেন তাহাদের সবগুলিই এক রকমের—একটী অপরটীর মতন, কিন্তু আসলে তাহা সত্য নয়। একটী আর একটী হইতে বা প্রত্যেকটী হইতেই বিভিন্ন। এই পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে, তাহা অনুধাবন করাও অত্যন্ত কঠিন। একটী পিনের (pin) কথাই যদি আমরা ধরি তবে দেখিব, প্রত্যেক পিনই অপর পিনের সমান বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু আসলে তাহা সমান নয়। একটী পিনের অগ্রভাগে আশীলক্ষ কোটি পরমাণু, দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু আছে। আবার এই সকল দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণুর মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা একটী পরমাণুর আয়তনের সমান। আমরা যদি সেকেণ্ডে এক হাজার করিয়া গণনা করি তবে ২৫৩,০০ বৎসরে ঐ একটী পিনের উপরিস্থিত পরমাণুগুলিকে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি। সেখানে আবার কোটী কোটী পরমাণু লইয়া কথা সেখানে এরূপ দুই একটী পরমাণুর কম বেশী ধরা না পড়িলেও পার্থক্য কিন্তু ঠিক থাকিয়া যাইবে। অপরদিকে এই পিনের অগ্রভাগে পরমাণুগুলি আমাদিগের মনে অনন্তের ধারণা আনয়ন করিতেছে। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায়—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে কত বড় এবং তাহা ধারণা করিতে পারা যায় না। সকল দিক দিয়াই তাহা অসীম। সসীম শব্দে ক্ষণস্থায়ী। এই সকল (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের) রূপও ক্ষণস্থায়ী। তাহাদের অস্তিত্ব স্বপ্নের ন্যায় অলীক। তাহারা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তাহাদের অস্তিত্ব। তাহারা সেই অসীম সত্তা হইতে অস্তিত্ব আহরণ করিয়াই জীবিত থাকে মাত্র। সেই অনন্ত সত্তা এই সকল রূপ, পরমাণু, দ্ব্যণুক, ও ত্রসরেণু প্রভৃতির ভিত্তি বা আশ্রয়স্থল। শ্রীকৃষ্ণ এজন্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র অনুস্যূত সত্তাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনকে হনন করিতে হইবে ভাবিয়া শোকে মুহ্যমান ও যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া যখন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং শোক ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য

নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া বিমূঢ় চিত্তে ভগবানকে যখন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখনই তিনি ঐ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে অর্জ্জুন, কেন তুমি শোকে আত্মহারা হইয়াছ? কেন তুমি দুঃখ ও অনুশোচনা করিতেছ? এই সমুপস্থিত ব্যক্তি সকলেই তোমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের যে প্রকৃত আত্মা, তাহা তো কখন বিনষ্ট হইবার নহে? যাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না—অপরিবর্ত্তনশীল, তাহার বিনাশ কি করিয়া সম্ভব? যাহার রূপ বা আকার নাই তাহাকে তুমি কি করিয়া বিনাশ করিবে? তুমি কি অসীম আকাশকে বিনাশ করিতে পার?—কখনই না। কিন্তু তা বলিয়া সত্য বা প্রকৃত অনন্ত সত্তা এই আকাশ নয়। অনন্ত সত্তাকে বাহিরের বা মানস আকাশ কিছুই বলিতে পার না। কিন্তু এই বাহ্যিক আকাশের সত্তা সেই অনন্ত সত্তার সহিত এক। আকাশের যিনি কারণ এবং আকাশেরও আবার অতীত যিনি তিনিই সেই অনন্ত সত্তা। সেই অনন্ত সত্তা সান্ত পরিসীম রূপের ভিতর দিয়াই বিভিন্ন শরীরে নিজেকে প্রকাশ করেন। সে সত্তা সমস্ত শক্তি বা নিখিল গতির জনয়িতা। সত্তা হইতে আলাদা করিয়া এই রূপসমূহের চিন্তা করা অসম্ভব, সুতরাং এমন একটী গতির কথা যদি আমরা চিন্তা করি যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা আমরা পারি না। কিম্বা এমন একটী পদার্থেরও কথা যদি আমরা চিন্তা করিতে পারি যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাও পারি না। প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অনুভূতি যাহা আমাদের মনে উঠে তাহাদের প্রত্যেকটীরই দ্রষ্টা আছে এবং আমরাই সেই সত্তা যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই এবং যাহার দ্বিতীয় নাই, সর্ব্বদা এক ও অদ্বিতীয়। হে অর্জ্জুন, তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছ যে, তুমি বদ্ধ, তুমি সসীম, জন্ম-মৃত্যু, হ্রাস-বৃদ্ধি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের অধীন। আমাদের স্থূল রূপ হইতেছে এই শরীর, সূক্ষ্ম রূপ হইতেছে মানস শরীর এবং কারণ রূপ হইতেছে সেই শক্তি যাহা চিন্তাশক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার শক্তির উৎস। এই শক্তি সেই অনন্ত সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে। হে অর্জ্জুন, তুমিই সেই অদ্বিতীয় অনন্ত সত্তা। এই সকল ক্রমবিকাশের স্তরের ভিতর দিয়া এবং জগতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তুমি নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছ মাত্র। এই সকল বিভিন্ন সত্তার সমষ্টি তিনি এক এবং সেই সত্তা হইতে এই নিখিল শক্তি ও গতি এবং বিশ্বের সকল রূপ আবির্ভূত হইয়াছে। এই সত্তা সমস্ত প্রাণীর ভিতর দিয়া—সমস্ত বৃক্ষ-লতাদি ও আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশের সকল স্তরে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

বাস্তবিক এই একই সত্তা আমাদের বিভিন্ন শরীরের ভিতর নিজেকে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যেন সেই অনন্ত সত্তারূপ সমুদ্রের তরঙ্গমালা। আমরা যদি এই কথা একবার জানিতে পারি তাহা হইলে আর শোকার্ত্ত হইবার

কোনও কারণ থাকিতে পারে কি? কখনই না। দশ, বিশ বা পঁচিশ হাজার টাকা নষ্ট বা ক্ষতি হইয়া গেলেও তখন তাহাতে আমাদের কোন দুঃখ হইবে না। এ-সমস্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মাত্র। আমরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিতেছি—আমাদের ইহা আছে, উহা আছে এবং এই স্বামীত্ব বোধ হইতেই—এই সকল পদার্থ হারাইবার ভয়েই আমরা সর্ব্বদা বিব্রত হইয়া রহিয়াছি। বাস্তবিক কিন্তু আমরা কি হারাইতে পারি? আমরা সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বতো প্রস্ফুটিত সত্তাস্বরূপ। লাভ-লোকসান বা হারাইবার ভয় আমাদের কি করিয়া হইতে পারে? যেখানে এক ব্যতীত দুই নাই সেখানে কি হারাইবে? কে কাহাকে হারাইবে? হারাইবার ভয় কখন আসে? যখনই দুই বা বহুর কথা উঠে তখনই হারাইবার ভয় উপস্থিত হয়। আমরা যে একাই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া আছি। ভ্রান্তিবশতঃ নিজেকে কখনও সুখী, কখনও দুঃখী বলিয়া ভাবিতেছি মাত্র। বিশ্বে এমন কি পদার্থ আছে যাহা আমাদিগকে সুখী বা দুঃখী করিতে পারে? শরীরের ব্যথাতেই আমরা নিজেকে ব্যথিত মনে করিতেছি। প্রকৃত আবার ব্যথা কোথায়? সুতরাং কেন আমরা সামান্য সুখে বা আনন্দে নিজেদের সুখী বা আনন্দিত মনে করিতেছি? লাভ বা ক্ষতি প্রকৃত আত্মাতে নাই। আত্মাতে তাহারা কোনও বিকার বা কোনও পরিবর্ত্তন আনিতে পারে না। আত্মা হইতে আবার কিছু বিয়োগ বা তাহাতে কিছু আমরা যোগও করিতে পারি না। সুতরাং এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ় পোষণ করিয়া যদি সংসারে আমরা প্রবেশ করিতে পারি তাহা হইলে দেখিব—আমরা চির শান্তির অধিকারী হইয়াছি। আমাদের সম্মুখে যে কাজই উপস্থিত হউক না কেন সে কাজই আমরা করিতে পারিব,—কেবল সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে সেই কাজের ফলে আমাদের আত্মার কোন লাভ বা লোকসান হইবে না। আমাদের যদি কিছু করিবার থাকে কোনও ফলের আশা না রাখিয়া প্রাণপণে তাহা করা উচিত। সফলতার বা বিফলতার কথা চিন্তা করিতে নাই। আর ইহাই কর্ম্মযোগ। জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নত ও পবিত্র কার্য্যসমূহই এই প্রকার স্বার্থলেশহীন কর্ম্মের দ্বারাই মহীয়ান্ হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে কোনও প্রকার ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করিয়া তাহা সম্পাদন করা উচিত। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাতে আমাদের আত্মার কোনও লাভ বা লোকসান একেবারেই নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জ্জুনকে তাই বলিতেছেন—"তুমি প্রকৃত সত্তাকে নাশ করিতে বা পরিবর্ত্তন করিতে কখনই পার না। ইহাতে কিছু যোগ বা বিয়োগ করিতেও তুমি পার না। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। একটী বিরাট বাহিনীর তুমি সেনানায়ক। আর এসময় তোমার মনে উদয় হইল যে, তুমি এখানে লোক বধ করিতে আসিয়াছ। জানিবে, ইহা তোমার সম্মুখে কর্ত্তব্য মাত্র। ফললাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া শুধু কর্ত্তব্য করিতেছ ভাবিয়া তুমি প্রস্তুত হও এবং যুদ্ধ কর। ক্লীবের মত কাজ করিও না বা কাপুরুষের

দুষ্টার প্রদর্শন করিও না। হে অর্জুন, সমরাঙ্গনরূপ কর্মক্ষেত্রে তোমার কর্ম সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি কর্ম করিয়া যাও। কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তুমি কিছুই নাশ বা লাভ করিতে পার না।

বাস্তবিক এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা দেখি, অর্জুন যদি যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিতেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ এরূপ উপদেশ কখনও তাঁহাকে দিতেন না। বিপক্ষকে যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারিবেন মনে করিয়াই অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বিপক্ষ দলের সৈন্য বা শক্তির উৎকর্ষতা দর্শনে ভয় পাইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়নের পথ দেখিতেছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে পূর্ব্বে উত্তেজিত করেন নাই। অর্জুন নিজেই সাজিয়া গুজিয়া যুদ্ধে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শুধু পলায়ন ক্রিয়া হইতে অর্জুনকে বিরত ও স্বধর্মে নিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। অর্জুনের ঐ যে উদ্দেশ্য—যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িবার ইচ্ছা, মোহ বা দুর্বলতা, ইহা তাঁহার ন্যায় বীরেরও প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির উপযুক্ত হইতেছিল না। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই কর্মই করেন যাহা তিনি কর্ত্তব্যবোধে পরিচালিত হইয়া করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই জ্ঞানও থাকে যে, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনশীল—সকল কর্ম ও কর্ত্তব্যের তিনি অতীত। কিছু লাভ করিবার বা হারাইবার তাঁহার কোন সম্ভাবনা নাই। দুঃখে কাতর বা শোকে তিনি মুহ্যমান হন না। সুখ ও দুঃখ তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না। তবে যতদিন তিনি পৃথিবীতে থাকিবেন, ততদিন তো পৃথিবীর নিয়ম পালন করিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে? আত্মা ও মন তাঁহার তখন সতত উন্নত ভূমিতে অবস্থান করিয়া নিজস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও যখন যে অবস্থায় বা ভাবে পড়েন তখন সেই অবস্থানুযায়ী শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অনাসক্তভাবে তিনি কার্য্য করিয়া যান। তিনি জানেন—তাঁহার শরীর কেবল যন্ত্র মাত্র এবং এই যন্ত্রের ভিতর দিয়াই সেই অনন্ত সত্তা নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং আপনার নিখিল শক্তি ও শক্তিসমূহের বিকাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। এই দেহরূপী যন্ত্রগুলি পরিবর্ত্তিত হইবেই। এই পরিবর্ত্তন রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

এই যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত সংসার-সমরাঙ্গনের তুলনা হইতে পারে। আমরা এখানে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি। দেশ ও কালের—শীত ও উষ্ণাদি প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইতেছে। দেশ ও কাল—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা আমাদিগকে নিষ্পেষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং অবিরত তাহাদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে। এই সংঘর্ষ এড়াইবার উপায় নাই। যাঁহারা এই সংগ্রামে বীরের ন্যায় সম্মুখীন হন তাঁহারাই জয়ী হইতে সক্ষম। অন্যথা যাহারা ভীরুর ন্যায় সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে তাহারাই প্রকৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত ও অভিভূত হইয়া পড়ে। এই সংসার-সংগ্রামে অবস্থা পরিবর্ত্তনের—জয়-পরাজয়ের উপরই

সমস্ত জীবজগতের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। যাহারা জগতের এই নিখিল বাধা-বিপত্তিরূপ শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদির তালে তালে চলিতে অক্ষম তাহারাই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং ধরণীগর্ভে প্রোথিত কঙ্কালরাশি শুধু তাহাদের অতীত অস্তিত্বের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং বাঁচিতে হইলে বা জগতে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে অবিরত সংগ্রামশীল হইতে হইবে। সংগ্রামবিমুখ হইলে চলিবে না। এই সংগ্রাম কেহ এড়াইতেও পারে না। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যখন আমরা অর্থোপার্জ্জন করি তখন শত সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত আমাদের সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে বিচলিত হইলে আমাদের চলিবে না। সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করা সমীচীন নয়, কেননা জাগতিক শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা হইতে আমাদের বাঁচিতে হইবে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করিতে হইবে, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন ও নিজেদের ভরণ পোষণ করিতে হইবে, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভয় পাইয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমারা ন্যায় অন্যায় বিবর্জ্জিত হইয়া কাষ্য করিব? না, তা কেন? এই সকল কাজের ভিতর আমাদের সর্ব্বদা জানিতে হইবে আমরা সেই অনন্ত সত্তা। সংসারের ক্ষুদ্র লাভ লোকসান আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না। সততাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। জুয়াচুরি ও প্রবঞ্চনা হইতে আমাদের বিরত হওয়া উচিত। সর্ব্বদা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা স্বপ্নযুদ্ধ। আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী যুদ্ধ করিয়া যাওয়া উচিত।

সর্ব্বদা সত্যবাক্ হওয়া কর্ত্তব্য। মিথ্যা কথা বলিয়া লাভ কি? আমাদের কেবল যুদ্ধ করিতে হইতেছে এবং যখন আমরা জানিতে পারিব যে, লাভ-লোকসানের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই তখন কেন আমরা মিথ্যা কথা বলিব? আমাদের কোনও ক্ষতিই হইতে পারে না। আমরা শুধু আত্মা, সুতরাং লাভই বা কি আর লোকসানই বা কি? বাস্তবিক সকলে যদি এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিত তাহা হইলে এই পৃথিবীটাই স্বর্গ হইয়া যাইত।. কিন্তু সকলে এ-তত্ত্ব অবগত নয়। জীবনে তাহারা ইহার অনুবর্ত্তন করিতে পারে না এবং সেজন্য সর্ব্বদা দুঃখ পায় ও এই সৌন্দর্য্যময় পৃথিবীকে বিরাট একটি নরককুণ্ডে পরিণত করিয়া তুলে। অজ্ঞানই প্রকৃত নরক। দুঃখ, কষ্ট, শোক মোহ এগুলি নরক। যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকি তখনই আমরা নরক ভোগ করিয়া থাকি। আমরা জানি না যে—আমরা কি? এই অজ্ঞান বা প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এই অজ্ঞতাই আমাদের সকল দুঃখের, সকল অশান্তির মূল কারণ। বস্তুতঃ আমরা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, জন্ম-মৃত্যু, শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বারা কোনও প্রকারে বিকারগ্রস্ত হই না। আমরা যে সর্ব্বদা একরূপও নিত্য সত্তাস্বরূপ ইহা না জানিয়াই বাস্তবিক এই অবস্থায় উপনীত হই।

জ্ঞানকে সূর্য্যের কিরণের সহিত ও অজ্ঞানকে অমানিশার অন্ধকারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সূর্য্যের আলোক যেরূপ রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া

স্বমহিমায় সমগ্র ধরণীকে আলোকিত করে, জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হইলেও সেরূপ ইহা দিব্য জ্যোতিঃ প্রভাবে অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূর করিয়া হৃদয়কে আমাদের চির জ্যোতিষ্মান করিয়া তুলে। সাধারণ সংসারী ব্যক্তি ও জ্ঞানীতে এই খানেই হয় প্রভেদ। জ্ঞানীর হৃদয়ে যে বিমল জ্যোতির উদয় হইয়া থাকে তাহার ফলে তিনি জগৎকে দেখেন সংসারী অপেক্ষা অন্যভাবে। চক্ষু হইতে তাঁহার মোহের আবরণ অপসারিত হইয়া যায় বলিয়া জগৎ তাঁহার সম্মুখে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। তিনি (জ্ঞানী) তখন সাধারণ লোকের ন্যায় বাস করিলেও দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্তর তাঁহার অন্যরূপ হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় জ্ঞানীদের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, পুরপিঠাগুলির আকার এক হইলেও যেমন ভিতরের পোরের বিভিন্নতায় তাহাদের পার্থক্য হইয়া থাকে অর্থাৎ কাহারও হয় তো ক্ষীরের পোর, কাহারও মাংসের থাকার কাহারও বা নারিকেলের পোর, বাহিরে সর্ব্বসাধারণের সহিত জ্ঞানীর পার্থক্য না থাকিলেও অন্তরে তাঁহাদের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তাঁহারা তখন তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে বা মহাশত্রুকেও নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। প্রত্যেকের ভিতর আত্মাকে দর্শন করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকেই সমানভাবে তাঁহারা ভালবাসেন। জ্ঞানী জানেন প্রকৃত পক্ষে তাহার শত্রুও নাই, মিত্রও নাই। তিনি তাহাদের ভিতর বাস করেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রতি কখনও আসক্ত হন না। স্বাধীন মুক্তস্বরূপ তিনি জগতে বিচরণ করেন। তিনি আপনাকে আত্মাস্বরূপে জানেন। তখন আত্মীয়স্বজনের সহিত কলহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে মনপ্রাণে মারিয়া ফেলিবার জন্য গলাধাক্কা দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেন না। তাঁহার তখন সর্ব্বদা এই কথা মনে থাকে যে, তাঁহার হৃদয়ে বিষম পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে যাহা আগে তাঁহার ছিলনা, এখন তাহা সাধিত হইয়াছে।

বাস্তবিক বলিতে গেলে, সাধারণতঃ আমরা জগৎকে মলিন চশমার ভিতর দিয়াই দেখিতেছি। চশমাটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেই হইল এবং তাহা হইলেই স্বচ্ছ চশমার ভিতর দিয়া প্রকৃত তত্ত্ব আমরা দেখিতে পাইব। আমাদিগকে আর সেই সত্য বস্তুর সন্ধানে পাহাড়ে পর্ব্বতে বা অরণ্যে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে না। অথবা তাঁহাকে খুঁজিতে পর্ব্বত গুহায় বা মন্দিরের মধ্যে যাইতে হইবে না। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। অনুসন্ধান করিলেই তাঁহাকে আমরা পাইব। কিন্তু আমরা আপন হস্ত দ্বারা চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাবিতেছি যে, কিছুই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভাবিতেছি—শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা আমাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছে। বাস্তবিক চক্ষের আবরণ খুলিয়া ফেলিলে দেখিব এসকল কিছুই নাই—মিথ্যা, আমরা ইহাদের সম্পূর্ণই বাহিরে।

(ক্রমশঃ)

সঙ্ঘবার্ত্তা

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—

বিগত ৫ই ফাল্গুন ১৩৪৮ মঙ্গলবার (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২) শুক্লা দ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১০৭-তম জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সমাগত হইয়া ভক্তিপূর্ণ সুললিত স্বরে সমবেত কণ্ঠে স্তব পাঠ ও ভজন গান করেন ও মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠান হয়। তাহার পর বিধিবিহিতভাবে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হওয়ার পর সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক শতাধিক ভক্তবৃন্দের সম্মুখে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত" কথকতাগান সুমধুর কণ্ঠে গীত হয়। মধ্যাহ্নকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হইতে থাকে। প্রায় এক হাজার ভক্ত এই উৎসবে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে পরিস্থিতির জন্য রাত্রে কোনও সভা অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠান হয় নাই।

দার্জ্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম—

(শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা ও উৎসব)

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১০৭-তম জন্মোৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গল আরতি ও মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা ও হোমের পর আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী দরিদ্র, জাতিধর্মনির্বিশেষে পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে। জনসমাগম এত অধিক হইয়াছিল যে শৈলদেশের দারুণ শীতেও রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত ভক্তদের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদে আপ্যায়িত করিতে হইয়াছিল।

মাঘমাসের হিমসিক্ত রক্ত, শ্বেত রডোডেনড্রন গুচ্ছ ও তুষার ধবল পার্ব্বত্য চম্পক কলি শোভিত ও অগুরু সুরভিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও সিংহাসন এবং আশ্রমস্থ অবৈতনিক বিদ্যালয়ের বালক ছাত্রবৃন্দের সমস্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার মহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি সমবেত সকলকে মুগ্ধ ও অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিতরণ করিয়াছিল।

পাবনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বেদান্ত সমিতি—

১০ই ফাল্গুন রবিবার পাবনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বেদান্ত-সমিতি প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব মহাসমারোহে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বেলা ১০ ঘটিকায় তিনহাজারাধিক লোক নামকীর্ত্তন সহকারে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্তজনগণ খিচুড়ী তরকারী প্রভৃতি প্রসাদ পরিতোষ সহকারে গ্রহণ করে।

এতদ্ব্যতীত ২৩শে ফাল্গুন পাবনা বনমালী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ মাননীয় শ্রীযুক্ত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সভাতে পণ্ডিত শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মৈত্র প্রবন্ধ, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা পাঠ ও বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক বন্দনাগীত গীত হয়। পরে সভাপতি

মহোদয় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রচারিত মানব কল্যাণকর উদার বিশ্বধর্ম্মের মূলতত্ত্ব আলোচনা করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

গত ২৫শে ফাল্গুন প্রাতঃ ৮৷০ ঘটিকায় মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ বাহাদুরের সভাপতিত্বে আশ্রমের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন ও ১৯৪১-৪২ সালের কার্য্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব পঠিত ও গৃহীত হয়। পরে ২০ জন সভ্য লইয়া নূতন বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থীভবন, বগুড়া—

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সপ্তাধিকশততম জন্মতিথি পূজা বগুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী ভবনে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

মঙ্গলারাত্রিক এবং ছেলেদের উপাসনার পর ভজন সঙ্গীতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় ভজন সঙ্গীতের ব্যবস্থা হয়। গায়কদের মধ্যে শ্রীমান দুলাল (ষষ্ঠ শ্রেণী) এবং শ্রীমান চিত্ত (পঞ্চম শ্রেণী) শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধীয় গান কয়টি বেশ ভালই গাইয়াছিল।

বগুড়া সহরের বিশিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের আরো উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

খড়্গপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব—

খড়্গপুরবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে এবারে সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের আহ্বানে স্বামী দুর্গানন্দ, স্বামী সিদ্ধানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ খড়্গপুরে গমন করেন। শ্রীযুক্ত অমল চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। স্বামী দুর্গানন্দ মহারাজ যথাবিধানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, আরাত্রিক হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন। পূজার সময়ে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠও করা হইয়াছিল। প্রায় একশত ভক্ত উৎসবে সমবেত হন। বিকাল তিনটার সময় সকল ভক্তদিগকে ও দরিদ্রনারায়ণগণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আরতি ও শ্রীশ্রীরামনাম কীর্ত্তনের পর স্বামী বেদানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাত্রি দশটার সময় প্রসাদ বিতরণের সহিত উৎসব শেষ হইয়া যায়।

প্রসাদপুরে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—

গত ৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পুণ্য জন্মোৎসব প্রসাদপুর পল্লীতে নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের উদ্যোগে স্থানীয় দুই তিন জন যুবকের আন্তরিকতায় একদিনেরই চেষ্টায় উৎসব কার্য্য যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহাতে যুবকত্রয় সত্যই প্রশংসার্হ। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, মধ্যাহ্নে শ্রীপ্রভুর পূজা-ভজন ও অপরাহ্নে প্রসাদ বিতরণ যথানিয়মে সংসাধিত হয়। বহুসংখ্যক দরিদ্র নরনারীও ভূরি ভোজনে বেশ তৃপ্তিলাভ করে।

গ্রন্থসমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ এম-এ, এম-এ (কমার্স), বি-এল প্রণীত। তুলসী সাহিত্য মন্দির ১১৩।১-এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে ও সেই সঙ্গে তাঁহার কোন কোন কাব্যগ্রন্থ, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতিরও স্থানে স্থানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা, কর্ম্ম-জীবন, স্বদেশপ্রেম ও মানব-প্রীতি সম্বন্ধেও বর্ণনা করিয়াছেন। অল্পপরিসরের মধ্যে কবির এই জীবনচরিতটি সুন্দর হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাঁহারা এই সুন্দর পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দিত হইবেন। পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে কবির গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক বিবরণ (chronology) দেওয়ায় বইখানির উপযোগিতা বাড়িয়াছে। আর্টপেপারে ছাপা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলি ছবি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বইখানি পাঠকদের নিকট চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে।

আজকের আমেরিকা—লেখক ভূপর্য্যটক শ্রীরমানাথ বিশ্বাস। পর্য্যটক প্রকাশনী ভবন হইতে এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত প্রবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০১ এবং কয়েকখানি ছবি সম্বলিত।

লেখক মহাশয়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি পৃথিবীর বহু স্থানে নানা বাধা বিপত্তি ও কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অনেক স্থলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সেই সকল বিভিন্ন দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, জাতীয় রীতি নীতি প্রথা, আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার ও জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, তুরস্ক প্রভৃতি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশ সকলের এবং ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক মহানগরী ও প্রসিদ্ধ স্থান সকলই তিনি শুধু পরিভ্রমণ করেন নাই। পরন্তু সেই সকল দেশের অনেক গ্রাম ও পল্লীঅঞ্চল সকলও ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি তাহাদের জাতীয় জীবনের বহুদিক দেখিয়া সে সম্বন্ধে নানা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। পৃথিবীর স্বাধীন শক্তিশালী ও প্রভুত্বগর্ব্বী জাতি সকল ভারতবর্ষকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে জানিয়াছেন। কঠোর অভিজ্ঞতাপূর্ণ তাঁহার এই দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে তিনি "দেশ" প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে তাঁহার আমেরিকায় ভ্রমণ ও অবস্থানের চিত্তাকর্ষক ও দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনীর কথা বেশ মনোজ্ঞভাবে লিখিত। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন জাতির সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় শাসন প্রণালী, শিক্ষা বিস্তার এবং অপর জাতি বিশেষতঃ ভারতবাসীদের প্রতি সভ্যতাগর্ব্বী আমেরিকা বাসীদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থখানি সকলেরই বিশেষতঃ আমাদের দেশের ছাত্রবৃন্দের অতি অবশ্যই পাঠ করা উচিত।

সম্পাদক—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী সদ্রূপানন্দ—কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী শঙ্করানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৩।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাসন্তী প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৯ { ১ম সংখ্যা

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবের সর্ববিধ কল্যাণ সাধনের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীব মাতৃগর্ভে শিশুরূপে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তাহার জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ মাতৃবক্ষে স্নেহসুধা সঞ্চার করেন। নবজাত শিশুর দৈহিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে তিনি প্রকৃতির অতুল ঐশ্বর্য নিয়োজিত করিয়াছেন। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত জীবের দেহের পুষ্টি সাধন ও মনের উৎকর্ষ বিধানের জন্য নিয়ত কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যের মন ও বুদ্ধি এইরূপে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ তাহার সুখসম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে মনুষ্যের দেহমনের সুখশান্তি বিধানেই ভগবানের করুণার দান সীমাবদ্ধ নহে। তিনি আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভেরই উপায় করিয়াছেন। মানুষ শুধু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমষ্টিমাত্র নহে। মানুষের যথার্থ স্বরূপ তাহার আত্মা। এই জন্যই মনুষ্যকে জীবাত্মা বলে। মানুষ ইন্দ্রিয়ের সুখে তৃপ্ত নহে, এবং মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষে সে চরম সুখ লাভ করিতে পারে না। সে তাহার আত্মার স্বরূপ জানিতে চায়, আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস করে এবং ভগবানের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা হইতেই নানা ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিবিধ সাধনমার্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সাধারণ মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধি পর্য্যাপ্ত নহে। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীভগবান সদ্গুরুরূপে আমাদের নিকটে অবতীর্ণ হন। এরূপ সদ্গুরুর কৃপায় মনুষ্য মোহমুক্ত হইয়া স্বধর্মে নিরত হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া চরমে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভগবানই আমাদের মুখ্য বা পরমগুরু। তিনিই মহামানব, মহাপুরুষ, অবতার প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন, আমাদিগকে ধর্মপথে চালিত করেন এবং মোক্ষফল দান করেন। এই সকল অবতার-পুরুষই জগতের ধর্মের প্রবর্তক, স্থাপক ও সংরক্ষক। মানবের ইতিহাস এ-বিষয়ে সাক্ষ্য

দিয়েছে। পৃথিবীতে যে সকল প্রধান ধর্মমত বা সাধনপথ প্রচলিত আছে সেগুলির প্রবর্তকগণকে মনুষ্য সমাজ ঈশ্বরের অবতার বা অলোকসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

জগতের হিতার্থে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে সকল অবতারপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অন্যতম। বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর চির গৌরবস্বরূপ এরূপ দুইটি দেবমানব আমরা দেখিতে পাই। প্রথম শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপনগরে তিনি অবতীর্ণ হন। তৎপরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব খৃষ্টীয় ঊনবিংশতি শতাব্দীতে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে আবির্ভূত হন। এক কথায় বলিতে গেলে, শ্রীচৈতন্য 'প্রেমের অবতার', আর শ্রীরামকৃষ্ণ 'সমন্বয়ের অবতার' ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দেবদুর্লভ চরিত্রে আমরা অনন্ত ভাব দেখিতে পাই। সে সকলের সম্যক্ ব্যাখ্যান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। এখানে আমরা কেবল তাঁহার মূল ভাব সমন্বয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ধর্মজগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই ধর্মের গ্লানি হইয়াছে, মানুষের আধ্যাত্ম জীবন বিপন্ন হইয়াছে বা কালের অভাবনীয় প্রভাবে কোন ধর্মের সংস্করণের একান্ত আবশ্যকতা উপনত হইয়াছে, তখনই শ্রীভগবান ধর্মাচার্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মজগতে আমরা একটা বিপ্লব দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অদ্ভুতপূর্ব এবং সর্বতোমুখী উন্নতি দৃষ্টে লোকের ঈশ্বর বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী হইয়া পড়েন এবং ধর্মের সজীবতা নষ্ট হইয়া যায়। ধর্মের মূলভাব নষ্ট হইলে পর যাহা ঘটে তাহাই ঘটিল। প্রকৃত ধর্ম যেমন মনুষ্যজাতির মধ্যে ঐক্য, মমতা, করুণা ও মৈত্রী স্থাপন করে, প্রাণহীন ও অন্তঃসারশূন্য ধর্মমতসকল তেমনই আমাদের মধ্যে অনৈক্য, ভেদবুদ্ধি, কপটতা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। মানুষ ধর্মের সারবস্তু পরিত্যাগ করিয়া তাহার বহিরঙ্গ মতামত ও অসার আবরণ সকল লইয়া কাজ করিতে লাগিল। এই অবস্থা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই গত দুই শতাব্দী যাবৎ দৃষ্ট হইতেছে। এমত সময়ে পুনরায় ধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের বিবাদ অবসান করে শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্গুরুরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ভাবের বহুপ্রকার নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ তাঁহার স্বরূপে, তাঁহার সাধনায়, তাঁহার ধর্মমতে এবং তৎপ্রচারিত ধর্মের বিশ্ব বিস্তারে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'যিনি ত্রেতাযুগে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া আচণ্ডালে অপ্রতিহতপ্রবাহে প্রেম দান করিয়াছিলেন, লোকাতীত হইয়াও লোককল্যাণ পথ পরিত্যাগ করেন নাই, অতুলনীয় মহিমান্বিত হইয়াও জানকীর প্রাণবল্লভ ছিলেন এবং যিনি দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে প্রলয়হুঙ্কারকে তুচ্ছ করিয়া সিংহনাদে শান্ত ও মধুর গীতা ধ্বনিত করিয়াছিলেন,

অধুনা সেই পরমপুরুষই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের লোকাতীত পূত চরিত্রে পূর্ব পূর্ব অবতারগণের ভাবধারার অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ জ্ঞানের, শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্কাম কর্মের এবং শ্রীচৈতন্যের অহৈতুকী বিশ্বপ্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গম বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। স্থূল দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইলেও সূক্ষ্মদ্রষ্টা ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার বাণী ভাষার মধ্যে বেদ, বেদান্তের দুর্বোধ্য সত্যগুলি অতি সরল ও সুখবোধ্যভাবে নিহিত আছে। যে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতভূমিতে প্রচার করিয়াছিলেন এবং অধুনা যাহা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কার্য্যাবলীর প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণেরই অমূল্য দান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে যে ভগবদ্ভক্তির মহান্ উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণে তাহাই জগন্মাতার জগজ্জন মনোমোহিনী, কালভয়নিবারিণী, বরাভয়করা, নৃমুণ্ডমালিনী রূপের সাধনায় প্রকট হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা তাঁহার সমন্বয়ভাবের মূল ভিত্তি। তিনি প্রথমে হিন্দুমতে ভগবানের মাতৃরূপের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই সাধনায় তিনি মৃন্ময় বিগ্রহে চিন্ময়ী দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সিদ্ধ হন। তাঁহার সাকার সাধনা কোন একটি বিশেষ রূপে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি মাতৃরূপের সাধনায় যেমন সিদ্ধি লাভ করেন, তেমনি ভগবানের বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপের সাধনাতেও সিদ্ধ হন। সাধারণ জীবের উপযোগী সাকার সাধনার পর তিনি নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনায় প্রবৃত্ত পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। হিন্দুধর্মের অনুমোদিত জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মসাধনা, যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা, প্রভৃতি সকল সাধনাতেই তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। সমন্বয় মন্ত্রের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিবার জন্য তিনি অবশেষে এক অপূর্ব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। হিন্দু পরিবারে জাত, হিন্দু সম্প্রদায়ে শিক্ষিত, হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়াও হিন্দুব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ অহিন্দু খৃষ্টান ও ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং ঈশ্বরাবতার যীশুখৃষ্টের ও মহম্মদের উপাসে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ধর্মজীবনের পরীক্ষা হইয়া গেল। সমন্বয়ের অবতার নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিলেন যে হিন্দুধর্ম, খৃষ্টানধর্ম ও ইসলামধর্ম আকারে বিভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ একই, এবং যে কোন ধর্ম আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ ও অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বর লাভ করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত, তাঁহার সাধনা জীবনে প্রত্যক্ষীকৃত সত্যের বিকাশ। তাঁহার মূল ধর্মমত তিনি অতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'যত মত তত পথ'। ভগবানের অনন্তরূপ ও অনন্তভাব। অতএব তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যে অশেষবিধ সাধন-পথ ও ধর্মমত থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই; বরং ইহাই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত কথা। মানুষের রুচিভেদে, শিক্ষাদীক্ষাভেদে ও স্বভাব চরিত্রভেদে তাহার কর্মপন্থা, চিন্তাধারা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ অবশ্য ভিন্ন হইবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও শিক্ষার্থীদের জন্মগত ও শিক্ষাপ্রসূত বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করিয়া

তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন নির্ণয় করিবার উপদেশ দেন। অতএব (দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও দেশকাল পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক বিভিন্ন সাধনমার্গের নির্দ্দেশ থাকা উচিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'মা যে ছেলের পেটে যেমন সহ্য হয় তাহাকে সেইরূপ খেতে দেন'। এজন্য তিনি এক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই সার্ব্বভৌম ও বিশ্বজনীনতাই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব ও শক্তির কেন্দ্র। এ-ধর্ম্মে কোন মত বা পথ পরিত্যক্ত হয় নাই। ইহার বিশাল ক্রোড়ে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাধক সমভাবে ও সচ্ছন্দে বাস করিয়া নিজ নিজ ইষ্ট দেবদেবীর সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মমতেও পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপথ পরিত্যক্ত বা অনাদৃত হয় নাই। তিনি তাঁহার সাধনায় ও উপদেশে সকল ধর্ম্ম এবং সকল সাধনাকেই সমাদর করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বলেন নাই। তাঁহার মতে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, শৈব, শাক্ত বা ব্রাহ্ম সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম যথাযথভাবে এবং আন্তরিকতার সহিত অনুষ্ঠান করিলে স্বকীয় পরমার্থ লাভ করিতে পারিবেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। যাহারা তাঁহার নিকটে যাইতেন, তাঁহার জ্ঞানমূর্ত্তি দর্শন করিতেন এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতেন, যোগদৃষ্টিতে তিনি তাঁহাদের মনোভাব ও যোগ্যাযোগ্যতা বুঝিয়া কাহাকেও নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের, কাহাকেও সাকার উপাসনার উপদেশ দিতেন, কাহাকেও বাল্যকালেই সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দিতেন আবার কাহাকেও পরিণত বয়সে সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বরের ভজনা করিতে বলিতেন। কলিতে অন্নগতপ্রাণ, দুর্ব্বলচিত্ত ও জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত জীবের ঈশ্বরোপাসনায়, জপতপে ও ধ্যানধারণায় অবসরের অভাব দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে অনুরাগের সহিত হরিনাম করিলেই জীব মুক্ত হইতে পারে। এইরূপে সমন্বয়ের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্ম্মের সত্যতা ও সকলপ্রকার সাধন-ভজনের সার্থকতা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয় ধর্ম্মের আর একটি নিদর্শন তাঁহার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে পাওয়া যায়। যাহারা তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য বা শিষ্যের শিষ্যও নহেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুধী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায়। পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে রোমাঁ রোলাঁ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মমত ও সাধনপথের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যায়। অধিকন্তু ইহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মমার্গাবলম্বীর দৃষ্টান্ত বিরল নহে। "ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ" গ্রন্থের ভূমিকায় পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, 'একদিকে স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) নিরাকার অনুভূতি, আর একদিকে রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) দেব-দেবীর দর্শন, এই দুইয়ের কথা দিয়াই ঈশ্বরের সম্যকরূপ উপলব্ধি করা যায় এইরূপ আমার মনে হয়।' এই উদ্ধৃত বাক্যটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ধর্ম্ম তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদের জীবনে সাকার-

নিরাকারের দ্বন্দ্ব চিরতরে অবসান করিয়াছে। বোধহয় এই মহাসমন্বয়ের অন্তর্নিহিত প্রভাবেই পৃথিবীর অপরপ্রান্ত হইতে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিরাট মন্দিরের নির্মাণকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া আজ পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ধর্মের বহুল প্রচার এবং যথার্থ অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর আজ মহাদুর্দিন উপস্থিত। মানবজাতির জীবনধারার সর্ব্বক্ষেত্রেই একটা মহাবিপর্য্যয়ের বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন হিংসাদ্বেষের ও ধ্বংসের লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত বিরোধ, সামাজিক বিদ্বেষ এবং জাতিগত বিরোধের ফলে পৃথিবীতে আজ সুখ ও শান্তির একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সখ্য স্থাপনের সর্বপ্রচেষ্টা বিফল হইয়া পড়িয়াছে। এইসব দুর্দ্দশার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ স্থলেই এগুলি মানুষের পরমতাসহিষ্ণুতা, ধর্মবিদ্বেষ ও অসমদৃষ্টি হইতে সম্ভূত। আমেরিকার খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর ডব্লু, নরমান ব্রাউন সম্প্রতি এক সারগর্ভ প্রবন্ধে (প্রবুদ্ধ ভারতের অক্টোবর সংখ্যা দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন যে পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মসমন্বয় ও সমদৃষ্টি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সকলের নিজস্ব সম্পদ, (শ্রীরামকৃষ্ণ)। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে এগুলির সমধিক প্রয়োজন; ভারতবাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং সাক্ষাৎভাবে উপদেশ পাইয়াছেন। তাই বলি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মৃতসঞ্জীবনী বাণী ও অমূল্য উপদেশ জগতে প্রচারিত হইলে মানবজাতির অনেক বিবাদের স্থায়ী মীমাংসা হইতে পারে এবং পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভক্তকবি শ্রীরামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া যথার্থই গাহিয়াছিলেন :—

"নাশে গর্ব্বান্ধ মনের সন্দ রামকৃষ্ণরূপ রবি'।
তেব জগৎজন কল্মষ পূরায় উঠ সবারি॥"

মন্দিরশিল্পের কয়েকটী মূল পদ্ধতি

শ্রীঅজিত ঘোষ

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রকারগণ ভারতের মন্দিরশিল্প-পদ্ধতিকে প্রধানতঃ তিনটী প্রকারভেদে ভাগ করেছেন—নাগর, বেসর ও দ্রাবিড়। এ তিনটীই ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পদ্ধতি। দ্রাবিড়-শিল্পকে অনেক স্থলে অন্ধ্র নামেও সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্ধ্র-পদ্ধতি ঠিক দ্রাবিড়-শিল্পের নামান্তর নয়—একে দ্রাবিড়-শিল্পের একটী প্রধান পর্যায় বলা যেতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ফার্গুসন সাহেব উত্তর-ভারতের মন্দিরগুলির আলোচনায় সেগুলিকে 'আর্য্যাবর্ত্ত'-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি যাকে আর্য্যাবর্ত-পদ্ধতি বলতে চেয়েছেন সেই পদ্ধতিই নাগরশিল্প-পদ্ধতি। কিন্তু উত্তর-ভারতে নাগর ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিরও কোথাও কোথাও প্রভাব এসে পড়েছে। অবশ্য এজন্য ফার্গুসন সাহেবকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি নাগরকে নিয়ে মাথা ঘামান-নি।

নাগরস্থাপত্য উত্তর-ভারতেরই পদ্ধতি। পূর্ব দিকে বিহারের বুদ্ধগয়া ও গয়ার কোচ হতে আরম্ভ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ পর্যন্ত এবং কাংড়া-উপত্যকা হতে দক্ষিণে বোম্বাই-এর ধারবাড় জেলা পর্যন্ত এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। নাগরপদ্ধতির মন্দিরগুলি প্রায়ই চতুষ্কোণ এবং সেগুলির মাথার উপর একটী করে চূড়া থাকে। চূড়া ঠিক বিমানের মাথার উপর মধ্যস্থান হতে ওঠে। বাঙলার গৌড়ীয় মন্দিরশিল্প নাগরশিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত, তবে এ তো ফার্গুসন-বর্ণিত আর্য্যাবর্ত-পদ্ধতির অনুরূপ নয়। গৌড়ীয় পদ্ধতির মন্দিরের বিমান অনেকটা বাঙলার চালার মত। বাঙলার পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই পদ্ধতি ও নাগর হতে এই শৈলীর স্বাতন্ত্র্য রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। বাঙলার মন্দিরগুলির বহিরাবরণ প্রায়ই আটচালার বা কুটিরের চালার মত—উপর হতে চার দিকে বক্রাকারে ঢালু হয়ে পড়েছে। বাঙলার ওই শৈলী অতিরিক্ত বর্ষাপাতের জন্যই প্রচলিত হয়েছিল। এই পদ্ধতি বিশেষ করে বাঙদেশেরই বিশেষত্ব। বাঙলার সকল অঞ্চলেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। পশ্চিম-বাঙলায় অর্থাৎ বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের পদ্ধতি প্রায়ই বিভিন্ন ছাঁচে তৈরী হতে দেখা যায়। তাতে আর্য্যাবর্ত নাগর-পদ্ধতির প্রভাব অনেকখানিই এসে পড়েছে; অনেক স্থলে মসজিদের গম্বুজের অনুরূপ বিমানও দেখা যায়—বিষ্ণুপুরের লালজীর মন্দির এর একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গৌড়ীয় শিল্পের শৈলী বর্ষার জন্যই উদ্ভব হয়েছে এ অনুমান অনেকেই করেছেন। অত্যধিক বর্ষার জন্য হিমালয়প্রদেশের মন্দিরগুলিতে এরকম ঢালু ছাদ দেখা যায়। কেদার-বদরিকা অঞ্চলের মন্দিরগুলিতে দেখা যায়, ঠিক নাগর-পদ্ধতিতে মন্দিরগুলি নির্মিত হলেও

একেবারে মাথার উপর ছোট আকারের ঢালু ছাদ নির্মিত হয়েছে, তার ঠিক মধ্যস্থান হতে অবশ্য একটি চূড়াও উঠেছে। শুধু বলা নয়, কুমারগাছের হাত হতে রক্ষা করবার জন্য এ মন্দিরগুলিকে কিছু প্রকারে অনেকটা সরল ভাবে খাড়া করা হয়েছে। এ অঞ্চলের এই রীতির মন্দিরগুলির সামনে একটা করে মণ্ডপ থাকে। এ মণ্ডপগুলির ছাদ আটচালার ঈষৎ নামিল। বাংলার শৈলীকে মুঘল যুগে রাজপুতেরাও গ্রহণ করেছিল। এমনকি রাজপুতানায়ও

বদ্রীনারায়ণের মন্দির – নাগরপদ্ধতি

গৌড়ীয় শৈলীর প্রচলন দেখা যায়, রাজপুতেরা এরূপ চালা বা বিমানকে 'বাঙালী ছত্রী' বলে থাকে। উড়িষ্যার কাছাকাছি অঞ্চলের মন্দিরগুলিকে কিন্তু কোনো বাংলা অঞ্চলের ঠিক অনুরূপ বলা চলে না, সেগুলি প্রধানতঃ আদর্শস্থানীয় নাগরপদ্ধতির। তবে ভুবনেশ্বরের প্রভাব বা সাদৃশ্য সেখানে বিশেষভাবেই বর্তমান—এমন কি, অনেক সময় কলিঙ্গ পদ্ধতির একটি পর্যায় বলেই মনে হয়।

বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির পশ্চিম বঙ্গের গৌড়ীয় শিল্পের একটি নিদর্শন

বাংলাদেশের যে সমস্ত মন্দিরের বিমানের ছাদ চালার মত এ প্রকারে ঢালু, সেরূপ বিমানের উপর ঠিক অনুরূপ আর একটি ছোট আকারের বিমান থাকে, আবার দুই হতে ততোধিক একাধিক বিমানও দেখা যায়। শেষ বিমানের মাথায় একটি চূড়া নির্মিত হয়; শিবের বা শক্তির মন্দির হলে চূড়ার বদলে ত্রিশূলই সাধারণতঃ থাকে। মূল বিমান ব্যতীত চার দিকে ছোট ছোট আরও বিমান থাকতে পারে—প্রত্যেক শিখরই চূড়াবিশিষ্ট।

বাঙলার অনেক মন্দিরে দেখা যায়, একটী মন্দিরের মূল বিমানের উপর অনেকগুলি শিখর চার দিক্ দিয়ে উঠেছে, কিন্তু মূল শিখর সর্বোচ্চে মাঝখানে থাকে। এরূপ অধিকাংশ মন্দিরের শিখরগুলি আটচালার আকারে না হয়ে গোল হয়ে উঠতে দেখা যায়—কোথাও মাথার দিক্ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে উঠেছে, কোথাও অর্দ্ধবৃত্ত বা গম্বুজাকার, অবশ্য চূড়া থাকবেই। এরূপ পদ্ধতি রত্নবেষ্টন-পদ্ধতি নামে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্যে আর্য্যাবর্ত্ত বা নাগর-পদ্ধতির প্রসার হয়নি—সেখানে স্বতন্ত্র পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণভারতের প্রধান পদ্ধতি দ্রাবিড়-পদ্ধতি। দ্রাবিড়-শিল্পই প্রকারান্তরে তান্ত্রিকপদ্ধতি। দ্রাবিড়-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শ্রেণীর মন্দিরের বিমানের শিখর

কেদারনাথের মন্দির—নাগরপদ্ধতি

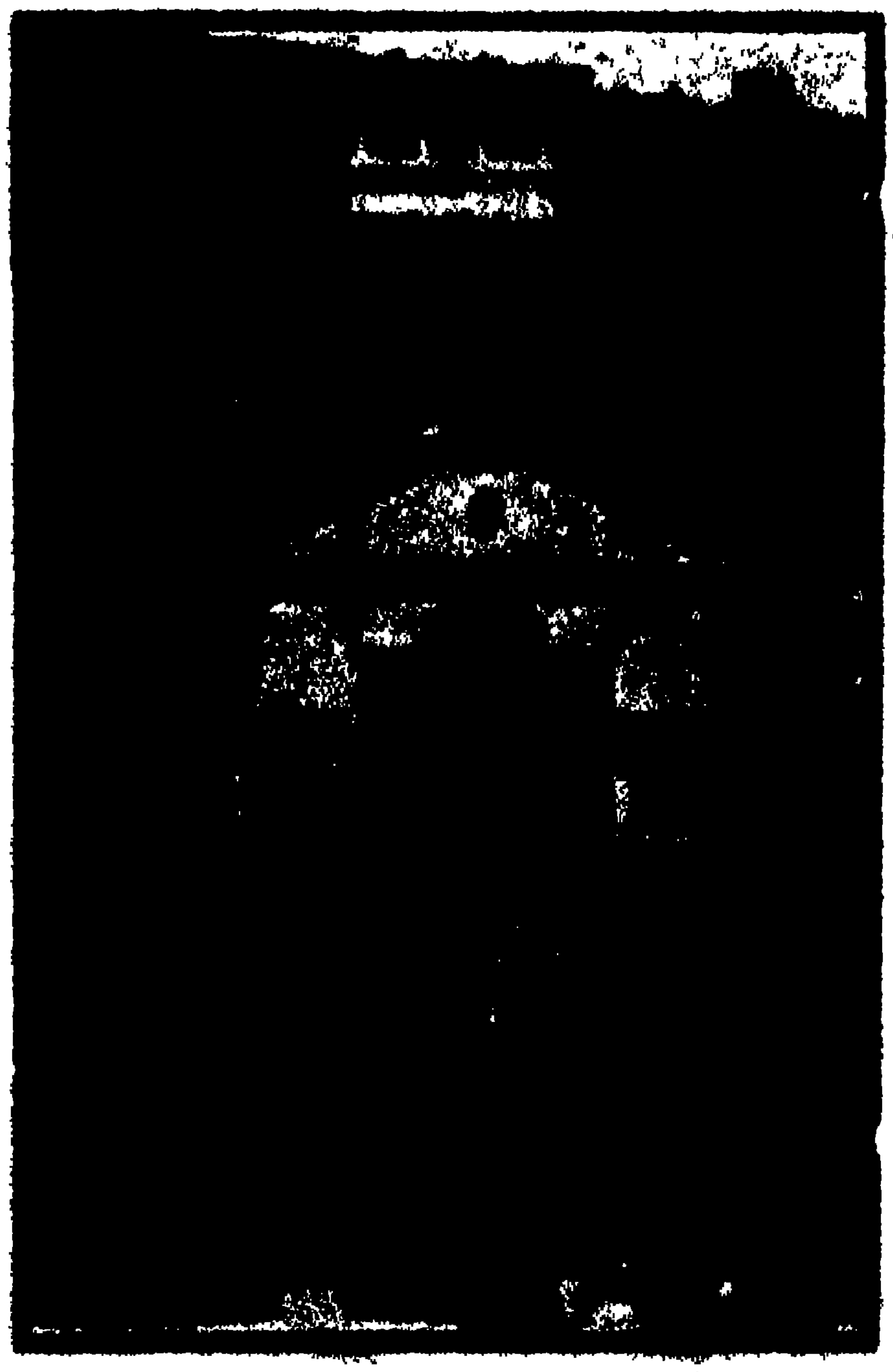

গুপ্তকাশীর মন্দির (কেদারনাথ)
—নাগরপদ্ধতি

প্রস্থের দিকে লম্বা—চূড়াকার নয়। মন্দিরের শিখর বেশ উঁচু হলেও মাথার উপর প্রস্থের দিকে বিস্তৃত। কোন কোন নীচু মন্দিরের বিমান লম্বা চালাঘরের মত; এরকম গুহাতে মামল্লপুরমে পাওয়া যায়। তাঞ্জোর, মদুরা, তিরুবান্নামালাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি খাঁটি দ্রাবিড়-পদ্ধতির নিদর্শন। গোয়ালিয়রের তেলি-কা-মন্দির অনেকটা নাগর-পদ্ধতির ছাঁদে উঠলেও তার শীর্ষদেশ নৌকার উল্টো দিকের মত; এতেও দ্রাবিড়-পদ্ধতির ছাপ এসেছে। দ্রাবিড়-পদ্ধতির মন্দিরে সাধারণতঃ দেবতার গর্ভগৃহটী ঠিক মাঝখানে থাকে এবং তাকে ঘিরে একটী চতুষ্কোণ আয়তনের মধ্যে অন্যান্য অংশগুলি গৌণ নির্মিত হয়। গর্ভগৃহের মন্দিরই

আসল মন্দির—তার বিমানের উপর শিখরই সর্বোচ্চ শিখর। গর্ভগৃহের সামনেই মণ্ডপ; এই মণ্ডপ বেশ বড় এবং স্তম্ভশ্রেণীর উপর তার ছাদ রক্ষিত হয়। এই মণ্ডপেই ভক্তেরা সমবেত হয়। প্রবেশদ্বারে একটা সুউচ্চ মঠ থাকে—এই মঠটীও মন্দিরের আকারের, এর নাম গোপুরম্। গোপুরম্ প্রধানতঃ পূর্ব দিকে স্থাপিত হতে দেখা যায়। সমগ্র মন্দির-প্রাঙ্গণটী প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত থাকে। এই প্রাচীরে সংলগ্ন করে ভিতরের দিকে প্রদক্ষিণের রাস্তা নির্মিত হয়। তীর্থ বা জলাধার আর একটি বৈশিষ্ট্য, এই জলাধারের জলকে সুপবিত্র বলে মনে করা হয়ে থাকে এবং তা পুণ্যতীর্থের স্নানের জন্যই নির্দিষ্ট হয়। এরকম স্নানের জন্য নির্মিত সংলগ্ন মন্দির জলাধার ভারতের অনেক স্থানেই অবশ্য দেখা যায়, তবে প্রাচীর ও প্রদক্ষিণ-বেষ্টিত মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে জলাধারের ব্যবস্থা দ্রাবিড়দেশ ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না।

ঊখীমঠ (কেদারনাথ)—নাগরপদ্ধতি

এর বেসর-পদ্ধতির মন্দির কোথায় কিভাবে গড়ে উঠেছে তাই দেখতে হবে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ও বিশেষতঃ বঙ্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠ স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চালুক্য-স্থাপত্যপদ্ধতিকে বেসরপদ্ধতি বলে স্থির করেছেন। চালুক্যপদ্ধতিও দাক্ষিণাত্যের পদ্ধতি, কিন্তু দ্রাবিড়শিল্পপদ্ধতি হতে তার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে। সৌষ্ঠব ও আভিজাত্যের দিক্ দিয়ে দ্রাবিড় পদ্ধতির চেয়ে চালুক্য-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অনেক উন্নত।

বেসর-পদ্ধতিতে ভদ্র-দেউলের রীতিই বেশী দেখা যায়। ভদ্র ও রেখ মন্দিরের বহির্গাত্র-রচনার দুটী বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত মন্দিরের বহির্গাত্র ধাপে ধাপে খাঁজ-কাটা, সেই রীতির ব্যবহারই ভদ্র-দেউলের রীতি। ভদ্র-দেউলকে পীঢ়-দেউলও বলা হয়, কারণ এতে ক্রমহ্রাসমান পীঢ় বা পীঠশ্রেণী ধাপে ধাপে সোপানশ্রেণীর মত শীর্ষদেশে গিয়ে পৌঁছায়। রেখ-দেউলের রীতি এই যে, মন্দিরের বহির্গাত্র নিম্ন হতে উপরের দিকে লম্বা খাঁজ-কাটা অর্থাৎ উহার অঙ্গ রেখাকৃতি পঞ্জরময় এবং সেই পঞ্জরগুলি অধিষ্ঠান বা base হতে শিখরশীর্ষের আমলক পর্যন্ত পৌঁছে। আমলক বিমানের শীর্ষে নির্মিত ছোট গোলাকার বা গোল চ্যাপ্টা পাথর।

নাগরের মত বেসর-পদ্ধতির মন্দিরের আকারও চতুষ্কোণ, কিন্তু বিমানের শিখর ধাপে ধাপে পিরামিডের আকারে উঠে আমলকে শেষ হয়। আমলকগুলি প্রায়ই গোল চ্যাপ্টা ধরণের, কোথাও টুপির মত। এই আমলকের উপর কোন চূড়া থাকে না। চালুক্য-রাজধানী বাদামীর গিরিদুর্গে এবং আইহোলে, পত্তদকল, কাঞ্চী ও মহাবলিপুরম্ বা মামল্লপুরমে এই পদ্ধতির মন্দিরই দেখা যায়। বাদামী ও আইহোল থেকে এই পদ্ধতির সূচনা হয়েছে বলে মনে হয়। কোনারকের সূর্যমন্দিরও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত; এই মন্দিরের মাথার আমলক চ্যাপ্টা ধরণের, ঠিক ভুবনেশ্বর-পদ্ধতির শিখরশীর্ষের আমলকের মত—তবে তাতে নাগরের ছাপে চূড়া নেই, ভুবনেশ্বর-পদ্ধতিতে আমলকের উপর চূড়া আছে।* ভুবনেশ্বর ও পুরীর গণ্ডীর মধ্যেই নির্মিত হয়েছিল বলে এই মন্দিরটী উড়িষ্যা শিল্পের এই প্রভাবটুকু পেয়েছে। [আগামী বারে সমাপ্য]

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

*(৮)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসীমাত্র হইয়া শুধু বাক্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বসিয়া থাকিলে ভোগ-প্রধান মার্কিনের জনগণের মনের মধ্যে স্থান পাইবার সম্ভাবনা যে মহারাজের ছিল না, ইহা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই মার্কিনের হৃদয় স্পর্শ করিবার নিমিত্ত তিনি নানাভাবে মার্কিনদিগের অন্তরঙ্গ হইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মহারাজের নিজের কথায় ইহা ছিল একটি "*Hard struggle*"। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি [illegible] একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"This Society

(নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি) was in its infancy when I arrived at New York in 1897. It had only a handful of members at first, but after a *hard struggle* I succeeded in making it a well-established Society. When I landed at New York I was pennyless, and during my twenty-five years stay in the United States, I never drew a pice from India. I was entertained by the American people, who gave me food, clothes and a house and took care of me. They also *gave me an Ashram measuring about 320 acres of land in a farm, and a home in the city of New York worth nearly two lakhs of rupees.*" (১)

কিরূপে স্বামীজি এইরূপ অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া মার্কিনের জনহিতৈষী বীররূপে সে দেশে সংপূজিত হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধেও দিবার তাহা চেষ্টা করিব।

আজ মহারাজকে একজন মার্কিনের সঙ্গে লাইব্রেরি বা আর্ট-গ্যালারি বা Metropolitan Musuem of Arts দর্শন করিতে যাইতে হইল, দিনান্তরেই আবার অন্য দলের নিমন্ত্রণে সে দেশের নাট্যশালায় গমন বা এমন্ পর্টিবের ন্যায় সুবিখ্যাত বাদকের Concert শুনিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইল অন্য দিন বা কোন সহকর্মীর সহিত সে দেশের বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থাকিয়া ভারতীয় কবির যোগ্য আশীর্বচন পাঠ কিংবা কোন সুবিখ্যাত মার্কিনের দেহান্তের পর সেই মৃত্যুবাসরে গমন করিয়া মার্কিন-বন্ধুদের ন্যায় মহারাজকেও মৃতব্যক্তির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে হইল! শুধু ইহাই নহে। সে দেশের প্রসিদ্ধ বক্তাদিগের নানা বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ, রবিবাসরীয় উপাসনাকালে ধর্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টান্-জগতের ধর্মালোচনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন—আবার মার্কিনের সহিত স্পেইনের যুদ্ধ বাধিলে মার্কিনদের জয়গৌরবে আনন্দপ্রকাশ এবং তাহাদিগের সহিত মার্কিন-রণতরী ও কুচ্-কাওয়াজ এবং স্প্যানিশ্ বন্দিনিবাস প্রভৃতি সন্দর্শন—এসবও করিতে হইল, আবার সুযোগ হইবামাত্র চিন্তাশীল দার্শনিকদিগের সহিত বিচার ও আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে যাইয়া নব নব আবিষ্কার সম্বন্ধে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় প্রভৃতি যখন যাহা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে মহারাজকে তাহাই করিতে হইয়াছে। এক বর্ষের মধ্যেও তিনি সে দেশের মনীষিবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে, বৈজ্ঞানিক এডিসন্, সুমেরু পরিব্রাজক ন্যান্‌সেন, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যসমাজ, আশাতার প্রতিভাশালী গার্সির, সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিৎ এল্‌মার গেট্‌স্, সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য জেম্‌স্ এবং রইস্, ব্রুক্‌লিন্ এথিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্ প্রভৃতি অসংখ্য

(১) বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

গণ্যমান্য সমাজ ব্যক্তিগণ কর্তৃক যখন তিনি বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইলেন তখন সে বার্ত্তা সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে পৌঁছিতে নিশ্চয়ই বিলম্ব হয় নাই। উচ্চ কৌলীন্যে সমাসীন যিনি, নিম্নস্তরের ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধা তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে মহারাজের পক্ষেও এ নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে নাই।

আর তিনি মিসেস্ অ্যাপ্‌লের বন্ধুবর্গের সমক্ষে তাঁহার বৈঠকখানায় 'বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সম্পর্ক' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন, দু'ই দিন পরেই Peoples' Church-এ বহুলোকের সম্মুখে দীর্ঘকাল ব্যাপী একটি অভিভাষণ দিতে হইল। তাহার বিষয়বস্তু ছিল—'হিন্দুদের ধর্ম'। সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ ধন্য ধন্য করিলেন ("My lecture was highly appreciated by all persons in the congregation")। একদিন "বেদান্ত কি?" এবং অন্যদিন 'ব্যক্তিগত জীবনে বেদান্তের প্রভাব', মিসেস্ জনসনের ড্রইংরুমে এই দুই বিষয়ের বক্তৃতা হইয়া গেল। সেই মনোমুগ্ধকর ভাষণের বার্ত্তা নানা স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আবার মিসেস্ অ্যাপ্‌লের গৃহে বক্তৃতা দিতে হইল 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে,—সেদিন শুধু অ্যাপ্‌লের দুই চারিটী বন্ধু মাত্র নহেন—বহু বন্ধুই উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষরূপে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। পরদিনই প্রকাশ্য সভায় বহু শ্রোতার সম্মুখে যে বক্তৃতা হইল তাহার বিষয় ছিল—'বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব'। শ্রোতাগণ খুব মনোযোগের সহিত এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহার মাত্র পাঁচ দিন পরেই মহারাজ বিশেষ আমন্ত্রণে বোষ্টন্ নগরের Free Religious Association-এর সমক্ষে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এপ্রিল, মে, জুন—বক্তৃতার স্রোত এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন চলিতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রিয় সাধারণ নরনারী এইসকল সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব—কিন্তু মার্কিনের চিন্তাজগতে, কর্ম্মজগতে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং বিদ্বজ্জনসমাজে যাঁহাদের পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁহাদিগেরও অনেকেই এই সকল বক্তৃতা শুনিতেন এবং বক্তা ও বক্তৃতার অশেষ প্রশংসা করিতেন। সুবিখ্যাত সংবাদপত্রগুলিতেও মহারাজের জয়গান থাকিত!

মহারাজ যে শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত পরিচিতই হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের অনেকের গৃহেই সর্ব্বদা সম্মানিত অতিথিরূপে সমাদৃত হইতেন। এই ভাবে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তিনি যে শুধু গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীদিগকেই বেদান্তের কথা শুনাইয়া আকৃষ্ট করিতেন তাহা নহে—তাঁহাদিগের আমন্ত্রণে পারিবারিক বৈঠকগুলিতে যে সকল বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইতেন, মহারাজের বক্তৃতা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা তাঁহাদিগকেও মোহিত করিত। গোঁড়া খৃষ্টানদিগের মুখপত্র সুবিখ্যাত "The Out Look"-এর প্রসিদ্ধনামা সম্পাদক ও সত্বাধিকারী মিঃ ক্রাফোর্ড মহারাজের "পাপ ও পাপী" এই বিষয়ের অভিভাষণের মর্ম্ম সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন নিউইয়র্কের "The Vegetarian Society-র" নিমন্ত্রণে মহারাজকে যে বক্তৃতা করিতে হইল তাহার বিষয়-

বস্তু ছিল—"হিন্দুরা নিরামিষাশী কেন ?" সর্ব বিষয়ে প্রগাঢ় ছিল তাঁহার জ্ঞান ও অদ্ভুত ছিল তাঁহার বাগ্মীতা, তাই যখন-তখন যে-কোনো বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিতে তাঁহার একটুকু বাধিত না। ভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইত—ভাষা ভাবের অনুগামী হইত। মার্কিনের New York Tribune নামক পত্রিকা ১৮৯৮ সালের ৬ই মার্চ তারিখে লিখিয়াছিলেন—"As a speaker he is self-contained and attractive and his lectures are clear, original explanations of philosophic subjects related to practical living. His command of English is as perfect as is his pronunciation." (১)

১৮৯৮ সালের ২৮শে মে মহারাজ ডক্টর জেম্‌সের সহিত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে গমন করেন। সুবিখ্যাত আচার্য রইস এবং আচার্য উইলিয়ম্‌ জেম্‌সের সহিত সেই দিন তাঁহার পরিচয় ঘটে। উক্ত আচার্যের বক্তৃতা শ্রবণের পর অধ্যাপক জেম্‌স কহিলেন—"আপনি "একত্ব" (Unity) সম্বন্ধে কিছু বলুন। অধ্যাপক জেম্‌সের বক্তৃতা ছিল "Unity-র" বিরুদ্ধে। মহারাজ কহিলেন—"আমি ঘোষণা করিয়াছি আগামী কল্য বিদেশী ছাত্রদের পারিবারিক সভায় আমি "দর্শনের উদ্ভব কি প্রকার" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিব। আপনি যদি সেই সভায় উপস্থিত হন, আপনার অনুরোধে বক্তৃতার বিষয় পরিবর্তন করিয়া আমি "একত্ব" বা Unity সম্বন্ধেই বলিব।" এত অল্প সময়ের মধ্যেই মহারাজ বক্তৃতার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করিতে পারিতেন! অনন্ত ভাবরাশি যেন সর্বদা তাঁহার অন্তরে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত এবং ইচ্ছা মাত্রেই তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া সেগুলিকে নাড়া চাড়া করিতে পারিতেন! পরদিন সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর জেম্‌সের সভানেতৃত্বে মহারাজ বক্তৃতা করিলেন—"বহুত্বের মধ্যে একত্ব", (Unity in Variety)। সেই সভায় আচার্য উইলিয়াম জেম্‌স্ এবং আচার্য শ্যানম্যানের মত পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার অন্তে আচার্য জেম্‌স্ মহারাজের সহিত আনন্দে করমর্দন করিয়া কহিলেন "বক্তৃতা যেমন সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে তেমনি উহা হইয়াছে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিপূর্ণ।" এই ভাবে মহারাজকে প্রশংসা করিয়া আচার্য সে দিন তাঁহাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলেন!

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস স্বামী অভেদানন্দ এই ভাবে মার্কিনে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ভারতের বেদান্ত মার্কিনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। নিউ ইংলাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নানা রাজ্যে মহারাজের বক্তৃতা শুনিয়া বিমুগ্ধ নরনারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং পরিশেষে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি একটি মাননীয় ও স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করিবার সহায় হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই—The untiring labours of the Swami Abhedananda

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915)—Vol III, page 349.

following upon those of the Swami Vivekananda resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York",……

এই প্রবন্ধে ও অন্যান্য প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামী অভেদানন্দের "untiring labours"-ই মার্কিনে বেদান্ত প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। স্বামীজির প্রচেষ্টা যে নানা কারণে তাঁহার আশানুরূপ ফলবতী হইতে পারে নাই তাহাও দেখানো হইয়াছে সেকথার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। "চাপরাশহীন" মার্কিনী সন্ন্যাসীদিগের বেদান্তপ্রচার ছিল একরূপ আর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় সন্তানের প্রচার ব্যাপার ছিল অন্যরূপ! আমরা ইহা বিস্মৃত হইয়া যাই বলিয়াই যখনই কাহাকেও বলিতে শুনি যে স্বামী অভেদানন্দের "untiring labours"—এর জন্যই বেদান্ত নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল, তখনই রুষ্ট হইয়া বলি—'উহা সত্য নহে।' শুধু ইহাই নহে, যে সকল কথা এখন ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম প্রচারিত জীবনচরিতেও স্থান পাইয়াছে, সে সকল কথা মনে আসিতে না দিয়া ধরিয়াই লই যে মার্কিনে স্বামী অভেদানন্দই প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা একথা যে বলে, সে স্বামী বিবেকানন্দকে "খাটো" করিবার জন্যই তাহা বলে! এইরূপ মনোবৃত্তি ঐতিহাসিক আলোচনার একান্ত পরিপন্থী। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ কোন সংঘবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহেন। মানবের মুক্তিদাতা ও জ্ঞানদাতারূপে তাঁহারা মানবসমাজের ভূষণ- তাঁহারা বিশ্বের প্রণম্য। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের পর্য্যায়ভুক্ত। ইতিহাসের মাপকাঠি লইয়াই তাঁহাদিগকে জানিবার, বুঝিবার ও প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত, অন্য উপায়ে নহে!

এই প্রসঙ্গে মহারাজের ১৮৯৮ সালের ৭ই মার্চ তারিখের ডায়েরি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার কর্মপদ্ধতি উহাতেই পরিস্ফুট হইয়া আছে। তিনি লিখিয়াছেন—It was necessary for me to become acquainted with the broadminded Ministers of Churches for they had tremendous influence upon the minds of the respectable and educated inhabitants of New York City. Without their help and recognition, my work had no chance to prosper and to make a headway. My policy was to march along the line of least resistance and not to antagonise the sectarian leaders of Christian churches who had full control over the minds of the people in all secular and religious matters. If they were not friendly to me and if they advised their parishioners not to attend my classes and public lectures on Vedanta then I could not get influential people in my audience. Therefore I had to work hard to arouse the interest of the good people of the City and to persuade

them to help me in making the Vedanta Society a powerful religious organisation in a Christian country." (৩)

উদ্ধৃত ইংরাজি অংশের বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই প্রবন্ধের অন্যস্থানে উহা অবলম্বনে মহারাজের কর্মপন্থা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মহারাজের নিজের মুখের কথা পাঠকদিগের বেশী আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী বিবেচনায় এইখানে তাহা প্রদত্ত হইল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতে মহারাজের কর্মধারার একটু ইঙ্গিত মাত্র আছে। বলা হইয়াছে—'During this first period of his work, the Swami met many representative thinkers in the world of Art, Science and Religion, both in private life and in social gatherings and *he awakened their friendly interest in his mission and teachings*' (৪) এই বর্ণনা এতই সংক্ষিপ্ত যে উহা হইতে বুঝিতে পারা যায় না যে বেদান্ত বিস্তারের পথটাকে প্রস্তুত করিতে মহারাজের কত শ্রম ও কর্মনৈপুণ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই তাঁহার ডায়েরির সাহায্যে বিষয়টী কথঞ্চিৎ বিবৃত করিতে হইল।

মহারাজের ডায়েরিতে দেখিতে পাই ইউরোপের পোলাণ্ড দেশ নিবাসী একজন সুপণ্ডিত জু-র (Jew) নাম ছিল মিঃ লিও ল্যান্ডসবার্গ। ইনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত তাঁহার একজন সন্ন্যাসী শিষ্য। স্বামীজি এই সন্ন্যাসীর নাম রাখিয়াছিলেন স্বামী কৃপানন্দ। স্বামী কৃপানন্দ মাদ্রাজের "ব্রহ্মবাদিন্" পত্রিকায় কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউন' পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। অনেকে সকলেই জানিত যে স্বামী কৃপানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত শিষ্য এবং আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টিত হইয়াছেন। মিষ্টার লেগেটের গৃহে স্বামী কৃপানন্দের সহিত মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় (১৮৯৮ সালের ১৯ মার্চ)। এই সাক্ষাতের এক সপ্তাহ পরেই মহারাজ একদিন দেখিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দকে লোকলোচনে হেয় করিবার মানসে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

প্রবন্ধের লেখকস্বরূপ স্বামী কৃপানন্দের নাম দেখিয়া মহারাজ ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মিষ্টার লেগেটের গৃহে গিয়া তাঁহাকে সেই প্রবন্ধ দেখাইলেন। মহারাজ যখন লেগেটের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে স্বয়ং কৃপানন্দ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পোলিশ জু-র মূর্তি দেখিয়াই লেগেট প্রজ্বলিত

(৩) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী—চৈত্র ১৩৪৮। এই প্রসঙ্গে পাঠকগণ বিশ্ববাণীর পৌষ, ১৩৪৮ সংখ্যার প্রকাশিত প্রবন্ধটি দেখিবেন।

(৪) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati—1915) Vol—III, page 348.

হইয়া উঠিলেন এবং দ্রুতবেগে সেই লাইব্রেরি কক্ষের দ্বারের নিকটে যাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—'নিউইয়র্ক সানে হেরাল্ডে'র এই প্রবন্ধ কি তোমার রচনা?"

কৃপানন্দ কহিলেন—"হাঁ আমি উহা লিখিয়াছি।"

লেগেট জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই প্রবন্ধ রচনার জন্য কি পারিশ্রমিক পাইয়াছ?"

কৃপানন্দ উত্তর করিলেন—"বেশী কিছু নয়—পঞ্চাশ ডলার মাত্র।" লেগেট তিরস্কার করিয়া কহিলেন—"মাত্র পঞ্চাশ ডলারের জন্য তুমি তোমার গুরুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই ভাবে লিখিয়াছ? তোমার মত নীচমনা স্বার্থপর ব্যক্তি দেখা যায় না! দূর হও এখান থেকে—আমি তোমার মুখ দেখিতে চাহি না!"

কৃপানন্দ যেমন দ্রুত প্রবেশ করিয়াছিলেন, ততোধিক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এই ঘৃণিত 'জু' সেই ব্যক্তির জুডাসেরই স্বরূপ! সামান্য কয়েকটি মুদ্রার লোভে জুডাস্ একদিন তাঁহারই গুরু ও ইষ্টদেব যীশুকে ধরাইয়া দিয়াছিল আর আজ কৃপানন্দও তেমনি কয়েকটি ডলারের লোভে তাঁহার গুরু বিবেকানন্দকে কালিমাভূষিত করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে প্রকাশ করিল! এই ঘৃণিত 'জু' কৃপানন্দের দৃষ্টান্ত হইতেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, স্বামীজি নিউইয়র্ক ত্যাগকালে যে সকল মার্কিনী শিষ্যদিগকে দীক্ষা দিয়া বেদান্ত-প্রচারের ভার অর্পণ পূর্বক সযত্নে দিয়াছিলেন, কেন তাঁহারা বেদান্ত সম্বন্ধে মার্কিনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই প্রভুর পরম প্রিয় সত্যিকার সন্ন্যাসী সন্তানের জীবনের সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় ব্যয় করিতে হইয়াছিল এবং সেই অমূল্য দানের মূল্যে মার্কিনে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। একথা অবশ্য বলা উদ্দেশ্য নহে যে স্বামীজির মার্কিনী শিষ্যগণ সকলেই ছিলেন এক একটী কৃপানন্দ। বলিবার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহারা সকলেই ছিলেন "চাপরাশ হীন!" (৫)

স্বামী অভেদানন্দ বিশ্রামসুখ লাভ করিবার জন্য নিউইয়র্ক ছাড়িয়া ওয়াশিংটনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্রাম করিবার অবসর তাঁহার যে আদৌ আসিল না পূর্বোল্লিখিত ব্যাপার হইতে তাহা অনুমান করিয়া লওয়া দুরূহ নহে। ওয়াশিংটন, বোষ্টন, মেডফোর্ড, নিউটন হাইল্যাণ্ডস্, সালেম্ প্রভৃতি স্থানের নরনারী তাঁহার মুখে বেদান্তের বাণী শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত দেখিয়া মহারাজ নানা স্থানে দিনের পর দিন বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা এতই দৃঢ় হইয়া উঠিল যে তিনি অনেকের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। (The Swami received during his stay many friendly attentions from professors in Harvard and was the guest of several in their houses.(৬)

(৫) My Diary—Swami Abhedananda in the বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।

(৬) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915) Vol III, page 550.

নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহারাজকে মণ্টক্লেয়ারে যাইতে হইল। তথাকার Unity Church-এর কর্তৃপক্ষদিগের আহ্বানে রবিবাসরীয় উপাসনাকালে তিনি যে বক্তৃতা করিলেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল—সুনীতির সত্য ভিত্তি, (The True Basis of Morality)। একজন অ-খৃষ্টানের পক্ষে, খৃষ্টানের দেশে ইহা যে কত বড় গৌরবের বিষয়—কি পরিমাণ যোগ্যতা থাকিলে, কত বড় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে ও খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের চিত্ত কতটা জয় করিতে পারিলে তবে এই গৌরবের অধিকারী হইতে পারা যায় একটু স্থির চিত্তে ভাবিলেই—তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে মহারাজের ডায়েরি হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"On June 26th (1898) I conducted the *Sunday Service from the pulpit* of the Unity Church of Montclair and addressed the congregation of the Church numbering over 200 on the "True Basis of Morality." The Unitarian Minister of the Church introduced me to the audience. I opened *the Service with a prayer by reading a text from* the Bible, selected the hymn from the Hymn Book which the audience sang standing, then delivered a Vedantic sermon on "The True Basis of Morality," selected another hymn and afterwards gave benidiction." (১)। ইহার পর সকলেই মুখ হইতে বাহির হয়—'চমৎকার! চমৎকার!'

ইহার পরই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সুবিখ্যাত Harschel C. Parker কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মহারাজ বোষ্টনের Appalachian Mountain Club-এ গমন করিলেন। তাহার সদস্যদিগের সহিত পরিচিত হইবার পর তাঁহারা মহারাজকে সেই ক্লাবের অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, এইভাবে তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল। তাঁহার কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা এই সময়ে প্রদত্ত হইয়াছিল। নানাশ্রেণীর নর নারী এই অল্পকাল মধ্যেই (১৮৯৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৮৯৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত) বুঝিতে পারিয়াছিল যে স্বামী অভেদানন্দ একজন অদ্ভুত কর্মশক্তিশালী আদর্শচরিত্র ধর্মবেত্তা ও প্রচারক।

তাঁহার বাণী তখন মন দিয়া শুনিয়া প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য লোকে ক্রমে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল।

মহারাজ এলিয়টে গমন করিলেন, তথা হইতে মেইনে আসিলেন। সে সকল স্থানের নরনারী তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইল। মেইনে তখন Monsalvat School for the Comparative Study of Religions-এর বৈঠক বসিয়াছিল। ইহা বলাই বাহুল্য যে সুধী-জনের সেই বৃহৎ সম্মেলনে মহারাজ বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটী মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করিলেন।

এইভাবে আরও কতিপয় স্থানে বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়া নভেম্বর মাসে নূতন উদ্যমে কার্য্যারম্ভের জন্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন।

(১) Swami Abhedananda, My Diary, Visvavani, Sravan, 1346, p. 34.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী শঙ্করানন্দ

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কি করেন? তাঁহাদের সম্মুখে যখন যে কাজ উপস্থিত হয় তাহাই তখন কর্ত্তব্য বোধে তাঁহারা করিয়া যান। তাহাতে কি ফল হইবে—লাভ কি লোকসান হইবে, তাহার কিছু চিন্তা তাঁহারা করেন না। তাঁহারা জানেন যে, সেই সকল লোক কিছুই জানে না যাহারা মনে করে আমি তাঁহাকে হত্যা করিলাম, তিনি আমাকে হত্যা করিলেন। এখানে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন মাত্র, তিনি যুদ্ধের প্ররোচনা দিতেছেন না। আত্মা যে অবিনাশী—দেহ নাশে তাঁহার নাশ হয় না, দেহের পরিবর্ত্তন তাঁহার কোনও প্রকার বিকারসাধন করিতে পারে না—এই কথা বলিয়া তিনি অর্জ্জুনের মন হইতে ভয় ও মোহ দূর করিয়া দিতেছেন মাত্র। কিন্তু আত্মার যে জন্ম বা মৃত্যু নাই তাহা কি অর্জ্জুন জানিতেন না? নিশ্চয়ই জানিতেন। তবে স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বিনাশ ও নিজের পরাভূত হইবার আশঙ্কা তাঁহার মনকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সাময়িক মোহ দূর করিয়া তাঁহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

আমেরিকায় আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আজকাল বেশ আলোচনা হয়। যথা, এই অমরত্ব কবে আরম্ভ হইবে? মৃত্যুর পরেই, না—যীশুখৃষ্টের নির্দ্দেশে ও করুণায় শেষ বিচারের দিন—ইত্যাদি? ভারতে কিন্তু এসব লইয়া কোনও আলোচনাই বিশেষ দেখা যায় না, কেননা আত্মার অমরত্ব এখানে চিরদিনই প্রমাণিত সত্য। যদি সত্যই আত্মার অস্তিত্ব থাকে তবে তাহা অবশ্যই অমর হইবে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও তাঁহাকে নাশ করিতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা বা ভগবান কি নিজেকে নাশ অর্থাৎ আত্মহত্যা করিতে পারেন? কখনই না। যাহা চিরদিন আছে সে সত্তার কি করিয়া নাশ হয়? ভগবান আমাদের সকলের সত্তার সত্তা। সেইজন্য পূর্ব্বে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি সত্তার আমাদের নাশ নাই সেরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বা ভগবানেরও বিনাশ নাই। তিনি যদি ইচ্ছা করেন সকল আত্মাকে নাশ করিবেন তাহা হইলেও তিনি পারিবেন না। বাইবেলে (Bible) যে আছে: "পাপকারী আত্মার অবশ্যই বিনাশ আছে" বুঝিতে হইবে সেখানে শুদ্ধ আত্মার কথা বলা হয় নাই। সেখানে দেহে অহংবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার কথা মাত্রই বলা হইয়াছে। তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যে পাপ করিবে সে

* শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর "Gita Lectures" অবলম্বনে।

অজ্ঞানান্ধকারে থাকিবে এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করিবে। এখানে 'মৃত্যু' অর্থে পরিবর্তন—বিনাশ নহে। আর যীশুখৃষ্ট যাহা বলিয়াছেন তাহার আক্ষরিক অর্থই যদি গ্রহণ করা যায় তবে ইহা সত্য যে, তিনি এমন কিছুর কথা বলিয়াছেন যাহা পৃথিবীতে সম্ভবপর নয়। বাস্তবিক যে কোন বস্তুই সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। আমরা রূপের পরিবর্তনটুকুই শুধু দেখিতে পাই। এই পরিবর্তন-প্রবাহকে আমরা আরও সূক্ষ্মতর অণু, পরমাণু, শক্তি ও শক্তিতে পরিণত করিতে পারি মাত্র, কিন্তু প্রকৃত বস্তু বা সত্তাকে নাশ করিতে কখনও পারি না। শক্তি পরিবর্তিত হইয়া অনন্ত সত্তায় মিশিয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহা তো প্রকৃত নাশ নয়। সত্তা ও তাহার পরিমিতি (weight) সমানই থাকিবে, কিছুরই বিনাশ হয় না। 'বিনাশ হওয়া' কথাটী জনসাধারণের উক্তি মাত্র—অজ্ঞতা প্রসূত। অতএব পূর্বোক্ত বাইবেলের বাণীর যথার্থ অর্থ হইল—যাহারা পাপাচরণ করে তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকে।

উপনিষদেও অজ্ঞানীর গতি সম্বন্ধে "অন্ধং তমঃ" বলা হইয়াছে। এই "অন্ধং তমঃ" রূপ অজ্ঞানান্ধকারই মৃত্যু। ইহাই বাইবেলের বা ভগবান যীশুর বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। অজ্ঞানান্ধকারে থাকে বলিয়াই দুষ্কৃতকারিগণ মৃত্যুরূপ যন্ত্রণা, দুঃখ, অসুখ প্রভৃতি ভোগ করিয়া চির অশান্তিতে বাস করে। তাহারা শরীরে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া থাকে বলিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও শরীর দ্বারা কৃত কর্মের ফল ভোগ করিবে সত্য, কিন্তু তাহাদের আত্মা এই সকল কোনও কর্মের দ্বারাই লিপ্ত হন না। তাহার পর এইরূপ অজ্ঞান আবরণ বর্তমান থাকিলে জীবাত্মারও অমরত্বের কোন হানি হয় না। পাপী বা দুরাচারী হইলেও তাহাদের আত্মা ভগবানের বিশুদ্ধ আত্মার ন্যায়ই চির পবিত্র ও শাশ্বতরূপে বিরাজ করে।

দুঃখ বা কষ্ট যাহা আমরা জীবনে ভোগ করি তাহা আমাদের কৃত কর্মের ফল স্বরূপেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম যেরূপ সান্ত—কর্মের যেমন শেষ আছে তাহার ফলেরও তেমনি পরিসমাপ্তি আছে। সান্ত কর্মের ফল কখনও অনন্ত হয় না। এই যে দুঃখ কষ্ট ইহারাও শাশ্বত নহে। পূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ যাহারা ক্ষণিকের জন্যও আমাদিগকে সুখী বা অসুখী করিতেছে তাহারা চিরস্থায়ী নহে। তাহারা আসে ও যায় এবং আত্মাতে কোনও প্রকার বিকার-উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং সুখ, দুঃখ, শীত ও গ্রীষ্মের এই বাহ্য অভিঘাতকে ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়াই আমাদিগের সে সকল সহ্য করা উচিত।

আত্মা শাশ্বত ও চিরন্তন। তাঁহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা কোনও পরিবর্তন নাই। আনন্দ, নিরানন্দ, সুখ, দুঃখ কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সকল পরিবর্তনের অতীত এবং দেশ-কালের সম্পূর্ণ সীমার বাহিরে। জ্ঞানী ব্যক্তি এই পার্থক্য ভালভাবেই জানেন। তিনি জানেন আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদ কোথায়। আর এই সমস্ত জানিয়া সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বকে তিনি নীরবে ও নির্বিকারে সহ্য করিয়া যান। অসংখ্য বিপদে বা

অসীম দুঃখেও তাঁহার মানসিক বিকার কোনরূপ উপস্থিত হয় না। সুতরাং জগতে যথার্থ সুখ ও শান্তি অনুভব করিবার যদি আমাদের বাসনা থাকে তবে ঐ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির পদাঙ্কসরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু যে পথ ধরিয়া আজ আমরা চলিয়াছি এবং যে ঐন্দ্রিয়িক সুখভোগের রাজত্বে আমরা বাস করিতেছি তাহা কখনই শাশ্বত শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম নয়। সুতরাং এইভাবে জীবন যাপন করিয়া কখনই মনে করিতে পারি না যে, আমরা জন্ম-মৃত্যুর অতীত অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ আত্মা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগে মত্ত থাকিয়া হয়তো আমরা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণ করে শত বৎসরও বাঁচিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা ঐ 'পশুবৎই'—বাঁচিয়া থাকা মাত্রই হইবে। এইরূপ শত শত বর্ষ জীবনযাপনেও যথার্থ আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না বা হইবে না। কেবল দীর্ঘজীবন লাভ করিলেই যদি আত্মজ্ঞানের উদয় হইত তবে বটবৃক্ষ ও তিমি মৎস্য অবশ্যই শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী রূপে জগতে পরিচিত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং বাঁচিতে হইলে বাঁচার মতই আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। শতাব্দীব্যাপী জীবনের মাঝখানে যাহাতে শাশ্বত জীবন লাভ আমরা করিতে পারি তাহার জন্যই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকিও তাহা হইলে আমাদের সার্থক হইবে। মনুষ্য জন্ম অতীব দুর্লভ। এই (বর্ত্তমান) শরীর বা জীবন একবার চলিয়া গেলে আবার নূতন জীবন লাভ করিতে যে কত বিলম্ব হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয়তো যুগ যুগান্ত অপেক্ষা করিয়া আমাদের প্রকৃত সুযোগের জন্যই বসিয়া থাকিতে হইবে।

মনুষ্যত্ব ও মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগে মাত্র জীবন অতিবাহিত করে তাহারা হতভাগ্যই বলিতে হইবে। তাহারা জানে না যে, এই সুযোগ লাভ করা অতীব কঠিন, কেননা এই মানব শরীরেই একমাত্র ভগবদ্দর্শন লাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব—অন্য শরীরে নয়। সুতরাং বর্ত্তমান সুযোগের কোনরূপ অপচয় না করিয়া ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানই জানিতে হইবে আমাদের পরম মুহূর্ত। অতীত বা ভবিষ্যতের উপর আমাদের হাত নাই। বর্ত্তমান জীবনেই যাহা কিছু আমরা করিতে পারি তাহাই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। কাল করিব বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহা করিবার এই জীবনে—আজই এবং এমন কি এখনই তাহা করিতে হইবে, কারণ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের উপরই আমাদের হাত আছে। পর মুহূর্ত্তে কি হইবে আমরা জানি না, আর অতীতের তো কথাই নাই, তাহা আমাদের হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানীগণ এইজন্যই বর্ত্তমান সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া এই জীবনেই পূর্ণ শান্তি লাভের অধিকারী হইতে সক্ষম হন। সুখ, দুঃখ, আনন্দ বা নিরানন্দ তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। এই শরীর, এই ইন্দ্রিয়সমূহ, এই জাগতিক বিষয়ভোগ কিছুই তাঁহাদিগকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। বিমল আনন্দের রাজ্যে তাঁহারা বাস করেন এবং জগতের দুঃখরাশি আর কখনও তাঁহাদিগকে

স্পর্শ করিতে পারে না। কেননা ইহারা (দুঃখ প্রভৃতি) তো আর তাঁহাদের মনের সীমানাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না? সুতরাং আমরাও যদি পবিত্র পথে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলি তবে নিরবচ্ছিন্ন সেই বিমল আনন্দের অধিকারী হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য আত্মা কি? সাকার কি নিরাকার? মৃত্যুগামী না অমর? মৃত্যুর পর ইহা যায় কোথায়? জন্মের সময় ইহা কোথা হইতে আসে? প্রভৃতি প্রশ্ন ভারতীয় মনীষিগণের মনে উদিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ভারতে আত্মার স্বরূপ, অস্তিত্ব ও শক্তি সম্বন্ধে অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থাও তৎকালীন ভারতের ন্যায়। এই সম্বন্ধে সেদেশের নরনারীর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে এবং তাহা খৃষ্টীয় মিশনারীদের প্রচারিত প্রাচীন বাইবেলীয় কাহিনীর দ্বারা শান্ত করা সম্ভব হইতেছে না। আত্মার স্বরূপ, অস্তিত্ব, শক্তি সম্বন্ধে সেদেশের নর নারীর ভিতর মতের অন্ত নাই।

ভারতে একদল জড়বাদী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন শরীরভিন্ন আত্মা নাই। তাঁহাদের মতে শরীরই আত্মা, শরীরের জন্মের সঙ্গে চৈতন্যের আবির্ভাব হয় এবং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিনষ্ট হয়। ইঁহারা ভারতে চার্বাক নামে বিদিত। ইঁহারা কখনই বিশ্বাস করিতেন না যে, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে। ইঁহারা জড়বাদী দার্শনিক। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, যাহা প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য নয় তাহা তাঁহাদের মতে অলীক। একদল বৌদ্ধ দার্শনিক ছিলেন যাঁহারা ঐ প্রকার মতে বিশ্বাস করিতেন। ভারতে তাঁহারা খ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহুপূর্বে প্রচার করিতেন এবং এই প্রকার আত্মা সম্বন্ধীয় ধারণা ঐরূপ একদল লোকের ভিতর তখন হইতেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

আর এক দল দার্শনিক ছিলেন যাঁহারা শরীরকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিনাশধর্মশীল বলিয়া জানিতেন। আত্মা শরীর হইতে পৃথক ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে, শরীরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার জন্ম হয় এবং মৃত্যুর সময় ইহা বিলীন হইয়া যায়।

আর এক দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করিতেন সৃষ্টির প্রাক্কালে আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা প্রলয়কাল পর্যন্ত থাকিবে। ইতিমধ্যে সে বিভিন্ন শরীরের ভিতর দিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মের কর্মফল ভোগ করিবে। জগতের প্রলয় হইলে—এক কল্প অন্ত হইলে এই আত্মা নাশ হইয়া যাইবে।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের ভিতর আবার এক সম্প্রদায় ছিলেন যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, আত্মা প্রতি সেকেণ্ডে—এমনকি প্রতি সেকেণ্ডের লক্ষভাগের এক ভাগ সময়ের ভিতর জন্মায় ও মরে। অবিরত পরিবর্তনশীল আলোক প্রবাহের ন্যায় ইহাও অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে। প্রদীপের আলোক যাহা এই মুহূর্তে দেখিলাম আবার পরিবর্তিত হইয়া গেল, নদীর জল যেরূপ সেকেণ্ডের লক্ষভাগের এক ভাগ সময়ও দাঁড়ায় না, শুধু অবিরাম গতিশীল সেরূপ এই আত্মাও অবিরাম গতিশীল প্রবাহ বিশেষ এবং এই প্রবাহ প্রতি মুহূর্তে জন্মিতেছে

এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু দ্বারা কবলিত হইতেছে। এই অবিরাম জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকেই আমরা 'জীবন' নামে আখ্যা দিয়া থাকি।

তাঁহাদের মতেও আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞান অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে এবং ইহার জন্ম ও মৃত্যু আছে। এই প্রকার অসংখ্য মতবাদ আত্মা সম্বন্ধে আছে, কিন্তু তাহাদের সকলগুলিই বেদান্ত নিরাস করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন এই সকল মতবাদের একটীও গ্রহণ করেন নাই।

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ওদেশের (পাশ্চাত্য) মনীষীরা আত্মা ও মনের প্রভেদ ধরিতে পারেন না। সেজন্য যখনই কোনও দার্শনিক আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গিয়াছেন, তিনি মনের বিভিন্ন কার্য্য, মানস ব্যাপার, অন্তরের সংকল্প-বিকল্পাত্মক অবস্থা এবং অহঙ্কার সম্বন্ধেই বলিয়া শেষ করিয়াছেন। দেখা যায়, আত্মা সম্বন্ধীয় তাঁহাদের ধারণা মনের ঊর্দ্ধে আর উঠিতে পারে নাই। সেই জন্য 'soul'-শব্দ দ্বারা 'মন'ছাড়া আর কিছুই তাঁহাদের বোঝায় না। ভারতের ধারা কিন্তু অন্যরূপ। এদেশে আমরা মনে করি না যে, মানসিক ব্যাপার মাত্রই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারকে আমরা মনেরই কার্য্য বলি। এই মনের অতীত কোনও সত্তার কথা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জানেন না। কাণ্ট (Kant) ইহা জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ব্যর্থকাম হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"ইহা মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত—মনেরও অতীত এবং ইহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। ইহা সত্যই আছে কিন্তু লৌকিক জ্ঞান ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না।" সুতরাং দার্শনিকগণের মুকুটমণি কাণ্ট যখন এই আত্মার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই তখন কাণ্টের পরবর্ত্তী অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের নিকট হইতেও কিছু আশা করা যায় না।

বেদান্তদর্শন কিন্তু এই পার্থক্য ধরিতে পারিয়াছেন এবং নিঃসংশয়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আত্মার স্বরূপ মানসিক ব্যাপার মাত্র নয়। ইহা 'মন' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের শরীর হইতেছে স্থূল বাহ্য দেহ। যখন আমরা এই শরীরের সহিত একাত্ম বোধ করি তখন মনে হয় এই শরীরটাই 'আমি'। ইহাই লৌকিক আমি। মনে রাখিতে হইবে যখন আমি মনে করিতেছি বা আমি বক্তৃতা দিতেছি তখন আমি আমার জড় বা স্থূল শরীরকেই 'আমি' বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।

তাহার পর ইন্দ্রিয়সমূহ রহিয়াছে। ভারতীয় দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, মুখ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এইসব জ্ঞানেন্দ্রিয়। যখন হস্ত দ্বারা কিছু ধরি তখন ঐ ধারণ ক্রিয়ার সহিত নিজেদের আমরা একীভূত করিয়া ফেলি। যখন চলি বা নড়াচড়া করি তখন ঐ চলা ক্রিয়ার সহিত। আমরা নিজেদের মিশাইয়া ফেলি। সর্ব্বত্রই এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের সহিত আমরা জড়িত হইয়া পড়ি। অপর ইন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির

কার্য্য কিন্তু স্থূল শরীর দ্বারা কৃত কর্ম্মের ন্যায় নহে, এখানে ইহাদের ভিতর দিয়া আধিবিক* শক্তিসকল খেলা করিয়া থাকে।

সকলের বাহিরে প্রথম আছে স্থূল বা জড় শরীর। তারপর মানস কার্য্যসমূহ। ইহার পরে যখন আমরা কিছু দেখি, ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি, অথবা আঘ্রাণ বা আস্বাদগ্রহণ করি তখন যে ব্যাপার হয় তাহা মানস ব্যাপার হইতে ভিন্ন। তাহা বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ। তাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলি। শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন প্রভৃতি অনুভূতি যে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা হয় তাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে পৃথক। আত্মা নিজেকে এই সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের কার্য্যের সঙ্গে যখন একীভূত করিয়া ফেলেন তখনই তাঁহার এই সকল অনুভূতির উদয় হয়। তাহার পর যখন আমরা কোন কিছু দেখি তখন আমরা আত্মাকে ঐ দর্শন ক্রিয়ার সহিত এক করিয়া ফেলি। পুনরায় যখন আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়ই কাজ করে না চক্ষু দেখে না নাসিকা আঘ্রাণ লয় না—জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে না—কর্ণ শব্দ শুনে না বা ত্বক স্পর্শ অনুভব করেনা, তখন আমরা মনে মনে চিন্তা বা বিতর্ক করিতে থাকি অথবা কোনও পুরাতন কথা আলোচনা করিতে থাকি। এই কার্য্যকে মানস কর্ম্ম বলে।

যখন আমরা কোনও বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করি বা তুলনামূলক আলোচনা করি তখন আর এক প্রকার ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং তাহাকে বুদ্ধির ক্রিয়া বলে। ইহা মনের কার্য্য হইতে পৃথক। ইহার অতীত বা এই বুদ্ধির পারে যিনি বিরাজিত তিনিই আমাদের 'আত্মা'। এইভাবে আর্য্য ঋষিগণ সত্যান্বেষণ করিতে করিতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরকে বিশ্লেষণ করিয়া অবশেষে জড় জগতের বাহিরে অবস্থিত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জড় ও আত্মা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একটী ছাড়া অপরটী থাকিতে পারেনা—দৃশ্য না থাকিলে দ্রষ্টা থাকিতে পারেনা এবং দ্রষ্টা না থাকিলে দৃশ্যের অস্তিত্বও থাকে না। যদি দ্রষ্টা না থাকিল তবে দৃশ্য যে আছে তাহা কে বলিবে? এইখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের পার্থক্য। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মনে করেন—দ্রষ্টা না থাকিলেও দৃশ্য থাকিতে পারে। এই বহির্জগৎকে শুধু বহির্জগৎ হিসাবে আমরা জানিতে পারি না, আমাদিগের আত্মার সহিত ইহার যে সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের দ্বারাই জানিতে পারি। বহির্জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আমরা এমন কোনও কিছুর প্রতিফলিত দৃশ্য বা মূর্ত্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করি যাহাকে আমরা কখনই জানিতে পারি না। বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা মানসিক ব্যাপার মাত্র। আমরা প্রকৃত বস্তুকে ইন্দ্রিয় বা মন দ্বারা জানিতে পারি না, শুধু সেই প্রকৃত বস্তুর একটী অসম্পূর্ণ ছবি মাত্র আমাদের মনে উদয় হয়। বহির্জগতের পদার্থনিচয়ের প্রকৃত সত্তা কি বা তাহাদের স্বরূপ কি তাহা জানিতে হইলে আত্মাকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং তখনই এই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মানসিক প্রত্যক্ষ, সমস্ত ভাবচরিত্র ও সকল ধারণা আমাদের নিজ আত্মার দর্পণে মাত্র

ধরা পড়ে। আমাদের আত্মাই সেই দর্পণ যাহাতে এই সকল প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আনেষ্ট হেকেলের ন্যায় বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আত্মার স্বরূপ হইতেছে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়। তাহাতে এই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, ভাবধারা ও সংস্কার নিচয় প্রতিফলিত হইতেছে এবং তাহা হইতে আমরা আমাদের স্বরূপ জানিতে পারি। এই সকল প্রতিফলিত ছবি আসে ও যায় কিন্তু দর্পণের কোনও পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। সেই দর্পণরূপ আত্মা সর্বদা একরূপ ও অসঙ্গ।

সকল উপাধি, এই কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য যাহাদের সহিত আত্মা নিজেকে একীভূত করেন তাহাদিগকে কোষ বা আবরণ বলা হয়। আত্মাকে আবৃত করিয়া একটীর পর একটী এইরূপ পাঁচটী কোষ আছে। একটীর পর একটী করিয়া এই পাঁচটী আবরণ মুক্ত করিলে যাহাকে পাওয়া যাইবে তিনিই আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উপাধিবিহীন ও শুদ্ধ।

বেদান্তদর্শন আরও বলেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মা তিনি এবং আমাদের অন্তরস্থ যে আত্মা উভয়ে স্বরূপতঃ এক। উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। যদি বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার আমাদের ইচ্ছা থাকে তবে তাহার সন্ধান লইতে বাহিরে কোথাও যাইতে হইবে না, আমাদের অন্তরে অন্বেষণ করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। যদি ইহা না হইত ···যদি আমাদের আত্মা ও বিশ্বাত্মা এক না হইত তাহা হইলে আমরা বিশ্বাত্মাকে জানিতে পারিতাম না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই রহস্য ঠিক ধরিতে পারেন না, তাই তাঁহারা জ্ঞানরহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হন নাই। আত্মা ও বিশ্বাত্মাতে যে কোনও ভেদ নাই ইহা বেদান্তদর্শনই একমাত্র প্রমাণ করিয়াছেন।

পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি? সেই সর্বদা একরূপ অপরিবর্তনশীল, হ্রাস বৃদ্ধিহীন পদার্থ যাহাকে আমরা ব্রহ্ম বলি, জড়বাদী যাহাকে ম্যাটার (matter) বলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে পদার্থ (substance) বলেন এবং অপরে যাহাকে শূন্যতত্ত্ব, ঈশ্বর বা অজ্ঞকিছু নামে অভিহিত করেন, সেই সত্তই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল ভিত্তি।

এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা নাম ও রূপ। ইহারা সর্বপ্রকার চিন্তা ও ভাবরাশির সহিত দৃঢ়ভাবে সবদ্ধ। কোনও প্রকার অর্থপূর্ণ ভাষা বা শব্দ ব্যবহার না করিয়া আমরা কোনও কিছুর চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং এই নামগুলি তাহা হইলে আসলে কি? ইহারা চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহারা আমাদেরই ভাবরাশিরই বাহক মাত্র।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির কথাই ধরা যাক। যখন ইন্দ্রিয় সকল বাহিরের কোনও বিষয়ের সংস্পর্শে আসে তখন আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে একপ্রকার কম্পন সৃষ্টি করে। স্নায়ুগুলি

মস্তিষ্কের কোষসমূহে তাহা বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তাহাতে মস্তিষ্কের কোষসমূহের মধ্যে বিশেষ এক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের আণবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। মস্তিষ্ক কোষসমূহের সেই আণবিক পরিবর্তনকে আত্মা অনুভূতির আকারে রূপান্তরিত করে। সেই অনুভূতি হইতে বিষয়-জ্ঞানের উদয় হয় এবং তখন আমরা অবশ্য জানিতে পারি যে, ইহা কাল, লাল, নীল কিম্বা গরম। তখন উহাদিগকে আমাদের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের কোনও একটীর পর্যায়ে ফেলি এবং উহাদের নামকরণ করি। এক্ষণে ইহা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? আমরা জানিতে পারি যে, একটী নামের সহিত একটী চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ। নাম হইল বাহিরের পদার্থ এবং জ্ঞান হইল আন্তর বা মানস বিকাশ। যদি নাম ও রূপকে সরাইয়া নিতে পারা যায় তাহা হইলে সমস্ত বিশ্বই লোপ হইয়া যাইবে। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইলেও অণু পরমাণুরও রূপ আছে। যদি সমস্ত নাম ও রূপ অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা হইলে যাহা থাকিবে তাহাকে বিজ্ঞান ম্যাটার বা শক্তি বলেন। অপরপক্ষে যদি বিশ্বের অপরিবর্তনশীল সত্তাকে জানিবার ইচ্ছা থাকে তবে আমাদিগকে তাঁহার অনুসন্ধান অন্তরে—নিজ আত্মায় করিতে হইবে। ইহা আমাদের আত্মার আত্মা। ইহা প্রাণহীন কিছু নহে—প্রাণবন্ত সৎস্বরূপ এবং কোনও জ্ঞান ও আনন্দের উৎস। এই সৎ, জ্ঞান (চিৎ) ও আনন্দই আত্মার স্বরূপ। ইহা স্বয়ংপ্রকাশ। ইহার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। এই আলোকের জন্য বাহিরের কোনও জ্যোতিষ্কের আবশ্যক হয় না। এই আলোকধারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ করে এবং আমাদের চৈতন্যের সহিত একীভূত হয়। সূর্যের আলোক যেরূপ যাহার উপর পড়ে তাহাকে আলোকিত করে, এই বিশ্বাত্মার আলোকও সেরূপ যাহার উপর পড়ে তাহাকে প্রকাশিত করে। সূর্যের আলোক এই আত্মার জ্যোতিকে প্রকাশিত করিতে পারে না। আত্মা হইতে যে জ্যোতি বাহির হইতেছে তাহাকেও সূর্য-কিরণ প্রকাশ করিতে পারে না বরং আত্মার আলোকেই সূর্য জ্যোতিষ্মান। যাহার জ্যোতিতে সূর্যের আলোক জানিতে পারা যায় তিনিই আত্মা। ইহা অতি গভীর তত্ত্ব। আর বিশ্বের তত্ত্ব গভীর তো বটেই। ভগবানের তত্ত্ব হইতেছে গভীরতম। ভগবানের তত্ত্ব গভীরতম হইলেও তিনিই আমাদের সকলের নিকটে। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জীবন, আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই অধীন। শুধু তাহা নহে তাঁহাতেই অবস্থিত। তাহা হইতে বিযুক্ত হইলে আমরা মুহূর্তমাত্রও বাঁচিতে পারি না। এই বিশ্বের মূলতত্ত্ব যেমন অবিনাশী, সেইরূপ আত্মাও অবিনাশী কারণ, বিশ্বের মূলতত্ত্ব বা মূল সত্তা ও আত্মা অভেদ।

[ক্রমশঃ]

অদ্বৈতবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—

বৃহদারণ্যকোপনিষদের অদ্বৈতজ্ঞাপক বাক্যগুলি যদি একত্র করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রথমেই আছে :—

১। "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াশনায়া।"

অর্থাৎ "অগ্রে এখানে কিছুই ছিল না। অশনায়া রূপ মৃত্যু দ্বারা ইহা আবৃত ছিল।" এখানে "অগ্রে কিছুই ছিল না" বলায় অদ্বৈতেরই ধারণা স্বতঃই উদিত হয়। যদি বলা হয় মৃত্যুদ্বারা "এই সব" আবৃত ছিল তাহা হইলে "এই সব" ও মৃত্যু উভয়ই ছিল বুঝা যায়। অতএব দ্বৈতভাবই বুঝিতে হয়। কিন্তু তাহাও নহে। কারণ প্রথম বাক্যেই "কিছুই ছিল না" এই নিষেধ দ্বারা "আবৃত এই সবও ছিলনা" কিন্তু কেবল মৃত্যুই ছিল—ইহাই বলা হইল।

যদি বলা হয় তবে "এই সব মৃত্যুদ্বারা আবৃত ছিল" না বলিয়া "মৃত্যুই ছিল" বলা হইল না কেন? তাহা হইলে বলিব, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়েছে তাহার নিকট "এই সব" রহিয়াছে বলিয়া তাহাকে "এই সবের" প্রতি আকৃষ্ট করিয়া উপদেশ দেওয়া হইল মাত্র। বস্তুতঃ 'এই সব পূর্ব্বেও ছিল' ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে। যেহেতু পূর্ব্ববাক্যে এই সবের সত্তা নিষেধ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যে বস্তুর বাস্তব মৃত্যু হয় সে বস্তু আর থাকে না। অতএব মৃত্যুর দ্বারা আবৃত বলায় সে বস্তু আর আবৃত অবস্থায় থাকে না কিন্তু মৃত্যুই থাকে ইহাই বলা হইল। অতএব এই শ্রুতির দ্বারা মৃত্যুরূপ এক অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল। বিচার দ্বারা কার্য্য অপেক্ষা কারণের সত্যতা সিদ্ধ হইলেও বহুত্ব নিবারিত হয় না। তাহার একত্ব শ্রুতিমাত্রগম্য বলিতে হইবে, আর তাহাই এখানে শ্রুতি বলিয়াছেন। তাহার-পর প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রথমেই দেখা যায়—

২। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মী-ত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহংনামাভবৎ।" ১।৪।১

অর্থাৎ "এই জগৎ অগ্রে আত্মাই ছিল। তাহা বিরাট পুরুষরূপী। তিনি বিশেষরূপে ঈক্ষণ করিয়া আত্মভিন্ন কিছুই দেখিলেন না, তিনি সর্ব্বাগ্রে বলিলেন "আমি আছি"। তাহাতেই আমি এই নাম হইল।" একথাতেও সেই অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া যায়, কারণ, আমি ভিন্ন কিছু ছিল না বলা হইল। ইহার পর যাহা বলা হইল তাহাতেও অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া গেল, যথা—

"সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাঞ্চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।" ১।৪।২

অর্থাৎ তিনি ভীত হইলেন, সেই জন্য লোকে একাকী থাকিলে ভয় পায়। তিনি আলোচনা করিলেন যখন অন্য নাই, কেন আমি ভয় করিব? ইহাতে তাঁহার ভয় চলিয়া গেল। কারণ, তিনি কেন ভয় করিবেন? যেহেতু দ্বিতীয় হইতেই ভয়।"

এস্থলে যে অগ্রে দ্বিতীয় কিছু ছিল না, বলায় অদ্বৈতের ধারণা হয়। অবশ্য ইহা বিরাটরূপ প্রজাপতির কথা। ইহাতে পুরুষরূপে জগৎ থাকে বলা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও "দ্বিতীয় হইতে ভয় হয়" ইহা বলায় অদ্বৈতের সন্ধান লাভ হয়। কারণ, ব্রহ্মের নাম অভয় ইহা বহুস্থলে কথিত হইয়াছে।

যদি বলা যায়, তাহে এই আত্মাকে অণ্ডোৎপন্ন প্রথম শরীরী প্রজাপতি বলা হইয়াছে। অতএব ইনি আত্মা ও অনাত্মা উভয় মিলিত বস্তু, আর তজ্জন্য শরীরিভাবাপন্ন বিশিষ্টাদ্বৈত মতের অদ্বৈত বরংই সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতত্ত্ব সিদ্ধ হয় না? কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, তিনি নিজেকেই এই সৃষ্টি স্বরূপ জ্ঞান করেন। যথা—

৩। "সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি, ততঃ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ।" ১।৪।৫

অর্থাৎ "তিনি মনে করিলেন। আমিই সৃষ্টি করিতেছি, যেহেতু এই সকল আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। সেই জন্য এই সৃষ্টি হইয়াছে যিনি এরূপ জানেন তিনি এই সৃষ্টিতে প্রজাপতিবৎ স্রষ্টা হন।"

এস্থলে প্রজাপতি এই সৃষ্টিকে নিজস্বরূপ জ্ঞান করায় আত্মস্বরূপ প্রজাপতি ভিন্ন আর পরমাণু প্রভৃতি জগদুপাদান কিছুই ছিল না ইহাই বলা হইল বলিয়া অদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট হইল।

যদি বলা যায়, আমরা অনাত্মা দেহকেও তো আমি বলি, অতএব আত্মস্বরূপ প্রজাপতি ভিন্ন জগদুপাদানও ছিল? অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত মতের শরীর-শরীরিভাব অনাত্মা ও আত্মা মিলিত এক বস্তু ছিল বলিব না কেন? না, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, আমরা শরীরকে যে আমি বলি তাহা ভ্রম, ইহা আমরা বুঝি। প্রজাপতির এই ভ্রম স্বীকার করা সঙ্গত নহে। অতএব প্রজাপতি স্বশক্তিবশতঃ জগদ্রূপ হইয়াছেন বলিতে হইবে, অন্য পরমাণু প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। তাহার পর এই রহস্য যে কেহ জানিবে, সেই ব্যক্তিই সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি হইবে বলায় সৃষ্টি স্বপ্নে মনের কল্পনার ন্যায় যে আত্মার কল্পনা তাহা বুঝা যায়। কারণ জানিবামাত্র যে সামর্থ্য হয় তাহা কল্পনার পক্ষেই সম্ভব বলিতে হইবে। এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সমস্ত জীব ও জগদাত্মক ঈশ্বর কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা হউক এই শ্রুতিও অদ্বৈতের সন্ধান প্রদান করিল বলিতে পারা যায়। এতদ্দ্বারা জীবের সৃষ্টি কর্তৃত্ব সম্ভব বলা হইল। অতএব "জগদ্ব্যাপারবর্জম্"

সূত্রের অর্থ অন্যথা হইবে। যেহেতু বৃহদারণ্যকভাষ্যেও আচার্য্য "স প্রজাপতিরেব ব্রহ্মা ভবতি" বলিয়াছেন। ব্যাসদেব যে জগদ্ব্যাপার শূন্যতা বলিয়াছেন তাহা মুক্তের বৈরাগ্য হেতু বুঝিতে হইবে।

৪। তাহারপর ১।৪।৭ এই বাক্যে দেখা যায় "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি। তদিদমপি এতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে, অসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি। স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যন্ চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব স যোঽত একৈকম্ উপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হি এষঃ। অত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হি এতে সর্ব একং ভবন্তি। তদ্ এতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মানেন হি এতৎ সর্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ।" ১।৪।৭

অর্থাৎ "এই সমুদয় তখন অব্যাকৃত ছিল। তাহা নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত হইল। ঐ নাম যুক্ত ইহা, এই রূপ যুক্ত ইহা। সেই জন্য এই সমুদায়ই নাম রূপের দ্বারা ব্যক্ত হইল। যথা, ইহা এই নামক, ইহার এই রূপবিশিষ্ট। সেই তিনি এই দেহে নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইলেন। যেমন ক্ষুরের খাপে ক্ষুর থাকে, অগ্নি স্থানে অগ্নি থাকে, তাহাকে লোকে দেখে না। তিনি (দেহমধ্যে) অপূর্ণ নিশ্বাস প্রশ্বাস করায় প্রাণ হন, কথা বলায় বাক্ হন, দর্শন করায় চক্ষু হন, শ্রবণ করায় শ্রোত্র হন, চিন্তা করায় মন হন। তাঁহার এই সব নাম কর্ম্মজন্য নাম। এই হেতু যিনি আত্মাকে এক এক রূপে উপাসনা করেন তিনি ইহাকে জানিতে পারেন না। যেহেতু এই তিনি সম্পূর্ণ। এই হেতু তিনি এক একটীই হন। একজন্য ইহাকে আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে। যেহেতু এস্থলে এই সব এক হইয়া থাকে। সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিবে। যেহেতু তিনি এই সবের আত্মা। এই আত্মা দ্বারা সব জানা যায়। যেমন পদচিহ্ন দ্বারা পাওয়া যায়। এইরূপ যিনি জানেন তিনি কীর্ত্তি ও যশঃ লাভ করেন।"

এস্থলে নাম-রূপের পূর্ণ বস্তুটিকে এক ও অদ্বৈতই বলা হইল। কারণ, নাম-রূপের দ্বারাই ভেদ হয়। আর প্রাণ, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মাই হন বলায়, আত্মা ভিন্ন বস্তু নাই বলা হইল। আত্মাতেই সব এক হইয়া যায় বলায় আত্মাতে ভেদ থাকে না বলা হইল। আর আত্মাকে এই সবের আত্মা বলায় এই সব যে মিথ্যা যেহেতু আত্মা শব্দের স্বরূপ বুঝায়; তাহাও বলা হইল। আত্মার জ্ঞানে সকলের জ্ঞান হয়, এতদ্দ্বারা আত্মাই এই সবের আকার ধারণ করিয়াছেন বলা হইল। এইরূপে এস্থলে সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। তাহার পর আত্মা এই সব হইয়াছে, কিন্তু আত্মা তাহাতো জানেন না, একজন্য আত্মার যে এই সব হওয়া তাহা অজ্ঞান জন্য হওয়া বলিতে হইবে। আমার আত্মা এই

সব হইয়াছে বলিয়া আত্মার বিকৃতির কথা বলা যায় না। কারণ, আত্মা তখনও নিজ স্বরূপ বা অন্যথা ভাব বুঝিতে পারেন না। অতএব এই সব আত্মাতে অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র বলিতে হইবে। এইরূপে এই শ্রুতির দ্বারা অদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট হইল বুঝা যায়।

এস্থলে "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির বাক্যটী (২।৬।১) একার্থক রূপে স্মরণ করা যাইতে পারে। আর ছান্দোগ্য ৬।৩।২ "অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য" অর্থাৎ এই জীবাত্মরূপে সেই সৎ স্বরূপ দেবতা অনুপ্রবেশ করিয়া—এই বাক্যটীও স্মরণ করা যাইতে পারে। এইরূপে উক্ত ১।৪।৭ বাক্যে ও এই দুইটী বাক্য এক করিলে সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

যদি বলা যায়, জীব ও জগৎ পৃথক্‌রূপে না থাকিলে তিনি তাহা সৃষ্টি করেন কোথা হইতে? তিনি নিজ শরীর বিকৃত করিয়াছেন নতুবা অন্য উপাদান তাঁহাতে নিশ্চয়ই ছিল। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়? কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। কারণ, সৎ ব্রহ্মে শক্তিরূপে থাকিলেও সৃষ্টি হইতে পারে।

যদি বলা যায়, তাহা হইলে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হইবে? তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও নহে। কারণ, শক্তি থাকিলে সৃষ্টি নিয়তই হইতে থাকিবে? অতএব এই সৃষ্টিকে অনির্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যাই বলা হইল। এই শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন বলাও হয়। এজন্য শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদও সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়—তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন বলায় তাঁহাকে সগুণ সক্রিয় বলিতেই হয়, শুদ্ধ অদ্বৈত হইলে এই সৃষ্টি ও প্রবেশ ত সম্ভবপর হয় না? অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতই এস্থলে তাৎপর্য্য, অদ্বৈত নহে। কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, সৃষ্টি সত্য হইলে এই সব কথা উঠিতে পারিত? শ্রুতি যুক্তি প্রভৃতি অন্য কারণে যখন সৃষ্টি মিথ্যা সিদ্ধ হয় তখন এই প্রবেশ ক্রিয়ার জন্য আত্মার সগুণত্ব বা সক্রিয়ত্ব সব মিথ্যাই হইবে। অতএব এতদ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতবাদ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইতেছে।

তাহার পর—

(৫) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি।
তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ, তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব
তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্
ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি
তদিদমপি এতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং
ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হি এষাং
স ভবতি, অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মি
ইতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।" ১।৪।১০

অর্থাৎ "ব্রহ্মই এই সব অগ্রে ছিল, তিনি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আপনাকে জানিয়াছিলেন—

"আমি ব্রহ্ম"। সেই হেতু তিনি এই সব হইয়াছেন। দেবগণের মধ্যে যিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিও এই সমুদায় হইয়াছিলেন। এই প্রকার ঋষিগণের মধ্যে এবং মানবগণের মধ্যেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বামদেব ঋষি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যথা আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম। এইজন্য এখনও যিনি জানেন—আমি ব্রহ্ম, তিনি এই সমুদায় হন। দেবগণও তাঁহার সর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা দিতে পারেন না। কারণ, তিনি সমুদায়ের আত্মা হন। আর আমার উপাস্য দেবতা অন্য এবং আমি অন্য এই ভাবিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে সে কিছুই জানে না। মানবগণের নিকট যেমন পশু, দেবগণের নিকট সে তদ্রূপই। এস্থলে এই সব পূর্ব্বে ব্রহ্মই ছিল, আর আমিই সেই ব্রহ্ম বলায় মূলে যে এক অদ্বৈত বস্তু তাহাই বুঝা গেল। আর "এই সব" ও "ব্রহ্ম" যে অভিন্ন তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, এখন "এই সব" যে ব্রহ্ম নয়, তাহা আমরা দেখিতেছি, আর "এই সব"কে পূর্ব্বে ব্রহ্ম বলায় এই সব যে ব্রহ্ম ভিন্ন রূপে পূর্ব্বে ছিল তাহা আর বলা যায় না। থাকিলে ব্রহ্ম আর থাকে না। অতএব এতদ্দ্বারাও সেই এক অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া যায়।

যদি বলা যায়, ইহার পরই আছে "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ", অর্থাৎ সেই হেতু তিনি সমুদায় হইয়াছেন। এবং ইহার পূর্ব্বেই আছে:

"তদাহুর্যদ্ ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা
মন্যন্তে কিমু তদ্ ব্রহ্মাবেদ্যস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবদিতি।", ১।৪।৯

অর্থাৎ লোক ইহা বলিয়া থাকে যে, মনুষ্য মনে করে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আমরা এই সমুদায় হইব। এখানে প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্ম কি জানিয়াছিলেন যে, সেই বিদ্যার ফলে তিনি (ব্রহ্ম) এই সমুদায় হইয়াছেন? ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা মনে হয় ব্রহ্ম "এই সব আমি" ইহা জানিবার পূর্ব্বেও "এই সব" ও ব্রহ্ম থাকেন, আর তাহা হইলে "এই সব ব্রহ্ম নহে" কিন্তু 'এই সব ব্রহ্ম' ইহা মনে করা হয় মাত্র। অতএব দ্বৈতবাদই এখানে উপদিষ্ট হইল? কিন্তু তাহা নহে। কারণ, "সেই বিদ্যার ফলে তিনি এই সব হইয়াছেন" এই কথার অর্থ এরূপ নহে। অর্থাৎ "এই সব" ছিল না, তিনি কল্পনামাত্র এই সব হইয়াছেন। কারণ, ৪র্থ সংখ্যক পূর্ব্ব বাক্যে তিনি সৃষ্টি করেন, ইহা বলা হইয়াছে। এই কথা এই ১০ বাক্যাবলীর মধ্যে অন্য ভাবেও বলা হইয়াছে, যথা—

"তদ্ যদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদ, অহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি,
তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইত্যাদি।

অর্থাৎ এইজন্য যিনি এখনও এই প্রকার জানেন "আমিই ব্রহ্ম" তিনি এই সমুদায় হন। দেবগণও তাঁহার সর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা দিতে পারে না, কারণ, তিনি সমুদায়ের আত্মা হন।" ইত্যাদি।

এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, ব্রহ্ম এই সব, এজন্য যে ব্যক্তি 'আমি ব্রহ্ম' জানেন তিনি

এই সব হন। আর তজ্জন্য ব্রহ্মও ভাবনা দ্বারা এই সব হইয়াছেন, অর্থাৎ আমরাই যেমন আমাদের মনঃকল্পিত বিষয় হই, ব্রহ্মও কল্পনা দ্বারা এই সব হন। জীবও ব্রহ্ম হওয়ায় এই সৃষ্টি তাহার মনঃকল্পিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা এই সৃষ্টি কল্পনামাত্রই বলা হইল। তাহার পর ১১শ বাক্যে দেখা যায়—

(৬) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব,
তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্।" ১।৪।১১

অর্থাৎ অগ্রে এই জগৎ একই ব্রহ্মরূপে ছিল। তিনি একাকী ছিলেন বলিয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। সেই জন্য তিনি শ্রেয়োরূপী ক্ষত্র জাতি সৃষ্টি করিলেন।"

এখানে ব্রহ্ম পদে শুদ্ধ ব্রহ্ম না বুঝাইলেও সৃষ্টির মূলে যে এক অদ্বিতীয় বস্তু থাকে এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। অতএব এতদ্দ্বারাও সেই এক অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া গেল। অতঃপর ১৭শ বাক্যে দেখা যায়—

(৭) "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোহকাময়ত জায়া
মে স্যাদথ প্রজায়েয়।" ১।৪।১৭

অর্থাৎ এই জগৎ অগ্রে এক আত্মরূপেই ছিল। তিনি কামনা করিলেন—আমার জায়া হউক, তদনন্তর আমি সন্তান উৎপাদন করি।"

এস্থলে অগ্রে যে মূলে এক বস্তু থাকে তাহা এতদ্দ্বারা বলা হইল। ইহাই হইল প্রথম অধ্যায়ের তত্ত্বজ্ঞাপক বাক্যাবলী। এতদ্দ্বারা সেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

যদি বলা যায় এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণে ৩য় মন্ত্রে—

"তদেতৎ ত্রয়ং সদেকমযমাত্মাত্মো একঃ
সন্নেতৎ ত্রয়ম্। তদেতদমৃতং সত্যেন ছন্নং প্রাণো
বা অমৃতং। নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।" ১।৬।৩

অর্থাৎ "সেই এই (নাম, রূপ ও কর্ম) তিনটী হইয়া এক এই আত্মা। আত্মা আবার এক হইয়া এই তিনটী। ইহাই সেই অমৃত—সত্যের দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাণই অমৃত। নাম ও রূপ সত্য। তাহাদের দ্বারা এই প্রাণ আচ্ছাদিত।

যদি বলা যায়, আত্মভিন্ন প্রকৃতিরূপ কোন এক মূল বস্তু হইতে এই জগৎ হয় বলিব? তাহা হইলে শ্রুতির কথা অযথাই বলা হইল? যেহেতু শ্রুতি তো আত্মা হইতেই সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। অতএব আত্মভিন্ন প্রকৃতি প্রভৃতি হইতেও সৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে না। আর তজ্জন্য আত্মা হইতে অজ্ঞানবশতঃই এই সৃষ্টি অবস্তুই বলিতে হইবে। এইরূপ এই শ্রুতি হইতে এক অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া গেল।

ইহার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩য় ব্রাহ্মণে দেখা যায়—

(১০) "অথাত আদেশো নেতি নেতি। *

* অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি।

প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" । ২।৩।৬

অর্থাৎ "অনন্তর এই হেতু অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্মের সত্যস্য সত্যং রূপটী নিরূপিত হয় নাই সেই হেতু উপদেশ এই "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে। ইহা অপেক্ষা নাই, অন্য শ্রেষ্ঠ নাই। আর তাঁহার নাম—সত্যস্য সত্যম্। প্রাণই সত্য, ইহা তাহার সত্য।"

ইহা হইতে সেই এক অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ, প্রাণাদি সত্য বলায় প্রাণাদিকে মিথ্যাই বলা হইল। কারণ, প্রাণাদির সত্যতা সেই বস্তুর সত্যতা হইতে অল্প। আর যাহা অল্প সত্যতা সেই বস্তুর সত্যতা হইতে অল্প। আর যাহা অল্প সত্য তাহাই মিথ্যা। যদি বলা হয় ইহা নহে বলায় কতকগুলিকে সত্যভিন্ন বলা হইল, আর তাহা হইলে অন্য কতকগুলি সত্য থাকিতে পারে? কিন্তু একথা বলা যায় না। কারণ, "ইহা" পদের দ্বিরুক্তি বশতঃ ইহা পদবাচ্য আর কিছুই বাদ যাইতে পারে না। অর্থাৎ যাহাকে "ইহা" বলা হইবে তাহাই সেই "সত্যের সত্য" নয় বলা হইল। তাহা সত্য পদবাচ্য অপেক্ষাকৃত অল্প সত্য হইবে অর্থাৎ তাহা মিথ্যাই হইবে। বস্তুতঃ ২।১।১৫ বাক্যে অজাতশত্রু গার্গ্যকে বলিয়াছেন "ব্রহ্ম জ্ঞাপয়িষ্যামি" অর্থাৎ আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত করিব। সেই প্রসঙ্গে "নেতি নেতি" বলায় ব্রহ্ম যে সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্মরহিত তাহাই বলা হইল। বিশেষ ধর্মের জ্ঞান না হইলে আর ইহা বলা যায় না। আর বিশেষ ধর্ম রহিত বলায় সেই এক নির্বিশেষ অদ্বৈতেরই কথা বলা হইল।

যদি বলা হয়—এই তৃতীয় ব্রাহ্মণেই প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে—

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং

চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।" ২।৩।১

অর্থাৎ "ব্রহ্মের দুইটী রূপ যথা—মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত, স্থিত ও যৎ অর্থাৎ গতিশীল, সৎ অর্থাৎ ব্যক্ত, এবং ত্যৎ এবং অব্যক্ত।" আবার এই মূর্ত ও অমূর্ত পদের অর্থ বলা হইয়াছে—

"তদেতৎ মূর্তং যদ্ অন্যদ্ বায়োশ্চ অন্তরিক্ষাৎ চ,

তৎ মর্ত্যম্ এতৎ স্থিতম্ এতৎ সৎ। ২।৩।২

অর্থাৎ "বায়ু ও অন্তরীক্ষ হইতে যাহা ভিন্ন তাহা মূর্ত, তাহাই মর্ত্য তাহাই স্থিত, তাহাই সৎ : আর অমূর্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"অথামূর্তং বায়ুশ্চান্তরীক্ষং……। ২।৩।৩

অর্থাৎ "আর অমূর্ত বলিতে বায়ু ও অন্তরীক্ষ বুঝিতে হইবে।" অতএব ব্রহ্ম এই দুই প্রকার। এতদ্ ভিন্ন নির্বিশেষ ব্রহ্ম আর নাই। আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সঙ্গত হয়—ইত্যাদি। কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, উপসংহারে "নেতি নেতি" বলিয়া সেই নির্বিশেষ

তাঁহারই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "নেতি নেতি" পদে ইহা নয়, ইহা নয় বলায় 'ইহা' পদবাচ্য অন্তরীক্ষ বায়ুকেও নিষেধ করা হইল। আর তাহা হইলে যে বস্তু অবশিষ্ট রহিল তাহাই সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইলেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত এই দুইটী রূপ বলিলে সমগ্র ব্রহ্ম মূর্তই হইলেন। আর অমূর্তের দৃষ্টান্ত বায়ু ও অন্তরীক্ষ বলায় এই অমূর্তেরও এক প্রকার মূর্তত্ব বলা হইল। কারণ, যাহার আকার বা সীমা আছে তাহাই মূর্ত। অতএব এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম কাহারও ঊর্ধ্ব বা অপর ব্রহ্ম, পর ব্রহ্ম হইতে পারেন না।

যদি বলা হয়, তাহা হইলে উপক্রমে যে দুইটী ব্রহ্মের কথা বলা হইল, উপসংহারে তদপেক্ষা অন্য কথা বলায় উপক্রমের পরাক্রমবশে সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মই অস্বীকার করিব? অর্থাৎ "নেতি নেতি" বাক্যে এই দুই রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর ব্রহ্ম নাই ইহাই বলিব?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও অসঙ্গত। কারণ উপক্রম বাক্য এই ২য় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রথম বাক্য নহে। তাহা প্রথম গার্গ্যবালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিতে ব্রহ্মের পরিচয় দান আরম্ভ করিলেন, অতএব ইহাই উপক্রম বাক্য। কিন্তু ১ম বাক্যের পূর্ণ ব্রহ্ম পরিচয় দানে অসমর্থ হইলে ২০শ বাক্য হইতে অজাতশত্রুই তাঁহাকে ব্রহ্মের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এই ব্রাহ্মণের শেষ বাক্যে ২০শ বাক্যে অমৃত পুরুষের দ্বারা সেই ব্রহ্মের উপদেশ দিলেন। এই উপদেশে নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ২য় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রিয়, দেবতা ও ঋষি প্রভৃতির পরিচয় দিয়া ৩য় ব্রাহ্মণে দ্বিবিধ ব্রহ্মের কথা বলিলেন এবং উপসংহারে "নেতি নেতি" বাক্য বলিলেন। এখন প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ বাক্য ও ৩য় ব্রাহ্মণের শেষ বাক্যে ঐক্য থাকায় এখানে উপক্রম উপসংহারের বিরোধ হইল না। ১ম ব্রাহ্মণের শেষ বাক্যে অমৃত পুরুষরূপ ব্রহ্মকেই সত্যস্বরূপ বলা হইয়াছে। অতএব ৩য় ব্রাহ্মণোক্ত এই মূর্ত অমূর্তের মূল সেই অমৃত পুরুষরূপ ব্রহ্ম তাহাও বলা হইয়াছে। আর সকল মূল হওয়ায় উৎপত্তির পূর্বে তিনি নির্বিশেষই হইবেন বলা হইল। কারণ সবিশেষ দ্বৈতভাব থাকায় তাহার উৎপত্তি অসম্ভব হয়, কিন্তু একের পক্ষে তাহা অসম্ভবই হয়। অতএব এস্থলে ব্রহ্মের যে দুইটী রূপ তাহা শুদ্ধ ব্রহ্মের বিষয়ে বলা হয় নাই। আর বস্তুতঃ এই 'নেতি নেতি' বাক্যদ্বারা সেই এক অদ্বৈত নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই কথা বলা হইল। এস্থলে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত কোন মতই একেবারে কল্পনা করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান

(কালিদাসের যুগ)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাসের পর আসেন কালিদাস। লোকে কালিদাসকে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করেন এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশসমূহে তাঁহাকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান করা হয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর গম্বুজে হোমার প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি সকলের নামের সহিত কালিদাসের নাম অঙ্কিত করা আছে। কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পাঠ করিয়া জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ কবি গোটে (Goethe) মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই কাব্যগ্রন্থের প্রশংসাসূচক এক কবিতাও লিখিয়াছিলেন।

এক্ষণে কালিদাসের গ্রন্থসকলের মধ্যে আমরা কি সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান পাই তাহা দেখা যাউক,—রাজা দুষ্মন্ত কণ্বঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শকুন্তলাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "এই কন্যা কি কুলপতি ঋষির অসবর্ণক্ষেত্র সম্ভবা? অথবা তাহা সন্দেহ করা বৃথা", এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে ব্রাহ্মণেরা তখন অসবর্ণ বিবাহ করিতেন। আবার ব্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বাঁচাইবার জন্য রাজার মুখ দিয়া এই প্রশ্ন বাহির করা হইয়াছে যেহেতু ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি ক্ষত্রিয়ের আসক্তি প্রদর্শন করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পদ্ধতি ভঙ্গ করা হইবে। তৎপর শরাসন হস্তে বনপুষ্পমালা বিভূষিতা যবনীগণে পরিবৃত হইয়া রাজা আগমন করিতেছিলেন। রাজা স্ত্রীসৈন্য পরিবৃত হয়ে বাহির হবার প্রথার সংবাদ মেগাস্থিনিসে আমরা পাই। চন্দ্রগুপ্ত এই প্রকারে বেষ্টিত হয়ে শিকারে যেতেন। এই সঙ্গে আমরা দেখি যে মধ্যএশিয়ার শ্বেতবর্ণের স্ত্রীলোকদের রাজ-শরীর রক্ষণে নিযুক্ত করা হত। এই প্রকারের তাতার প্রহরী মোগল বাদশাহদের অন্তঃপুরেও থাকিত।

প্রিয়ম্বদা বলিতেছেন, "সখি শীঘ্রই তোমার বিবাহের ফুল ফুটিবে।" (প্রথম অঙ্ক)। এই প্রকারের কথা আজও আমাদের বাংলা দেশে আছে। এই প্রকারে দেখি, এবম্প্রকারের সংস্কার অতিশয় প্রাচীন।

আবার রাজা বলিতেছেন—"আমি পৌরব ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত হইয়া··· এই ধর্ম্মারণ্যে আসিয়াছি।" এতদ্বারা রাজার নাগরিক কর্ত্তব্য সূচিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক ক্রোধবশতঃ বলিতেছেন, "কতকগুলো শূলামাংস তাও সিদ্ধ হইতে পারে না তাই খাই।" এতদ্বারা আমরা তৎকালে শিক-কাবাব খাওয়ার প্রচলন দেখিতে পাই। আবার বিদূষক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "যাইয়া বলুন নীবারের ষষ্ঠাংশ আমাকে রাজস্ব দাও।" এতদ্বারা বিধিপদ্ধতি অনুযায়ী প্রজার উৎপন্ন শস্যের ছয়ভাগের একভাগ রাজস্ব গ্রহণ করা তখন হইতে তাহার পরিচয় পাই। তাহার পর

কঞ্চুকী আসিয়া রাজাকে বলিতেছেন "মহারাজ দেবীরা আজ্ঞা করিয়াছেন—"আগামী চতুর্থ দিনে পুত্রপিণ্ডপালনার্থে উপবাস আছে। সেদিন তোমাকে আমাদিগের নিকট থাকিতে হইবে।" এদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে, রাজার বহু রাজ্ঞী ছিলেন এবং এই সঙ্গে তৎকালের একটি ব্রত পালন করার কথা প্রাপ্ত হই। এই ব্রত পালন প্রথা আজ প্রচলিত নাই। পুনরায় রাজা বলিতেছেন "যদিও আমার বটে বহু পরিগ্রহ।" এই উক্তিদ্বারা তৎকালীন রাজাদের বহুবিবাহের সংবাদ পাই।

চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাকে অলঙ্কার পরাইয়া পট্টবস্ত্রের জোড় পরাইবার কথা আছে। একখানি কাপড় পরা এবং একখানি চাদর গায়ে দেওয়ার প্রথা এখনও পশ্চিমের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

পঞ্চম অঙ্কে বিদূষক বলিতেছেন, "গরুকে দেবতা বলিলে কি ষাঁড়ের পরিশ্রম নিবারণ হয়।" এদ্বারা ইহাই সূচিত হয় নাকি যে গাভী তখনও হিন্দুদের নিকট সর্ব্ববাদী সম্মত দেবতা হইয়া উঠে নাই? তৎপরে কণ্বের প্রতিনিধিরা শকুন্তলাকে লইয়া রাজা দুষ্মন্তের সভায় আসিলে রাজা সভাগৃহে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তাঁহাদের অগ্নিগৃহে যাইতে বলিতেছেন এবং নির্দ্দেশ ভৃত্যকে বলিতেছেন "বেত্রবতী আমাকে অগ্নিগৃহের পথ দেখাইয়া লইয়া চল।" এখানে আমরা বৈদিক অগ্নিবেশ্মনী অর্থাৎ সাগ্নিক গৃহস্থের গৃহে অগ্নিরক্ষা করার ব্যবস্থার সংবাদ পাই। শ্রুতিতে আছে "জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশ অগ্নিনাদধীত"—অর্থাৎ যাহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং মাথার কেশ কৃষ্ণবর্ণ সেই অগ্নিরক্ষা করিবে (১)। এবং এই অগ্নিরক্ষা কেবল ব্রাহ্মণই করিত না অন্যান্য দ্বিজবর্ণের লোকেরাও করিত। ইহা একটি প্রাচীন বৈদিক ও স্মার্ত্তদের ধর্মানুষ্ঠান ছিল। পুনরায় এই শ্লোক দ্বারা কবি কালিদাস এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আগমন করিলে রাজা তাঁহার সিংহাসন ত্যাগ করিতেন না কারণ রাজা সকলের উচ্চ, অথচ ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখাইতে হইবে, সেই জন্য কবি দেখাইলেন যে অগ্নিগৃহে রাজা যাইয়া ব্রাহ্মণদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এদ্বারা ব্রাহ্মণ ও রাজসিংহাসন উভয়েরই মর্য্যাদা রক্ষা হইল। পরেই পুরোহিত বলিতেছেন, "তপস্বিগণ! ঐ দেখ চারিবর্ণের আশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা মহারাজ অগ্রেই আসন পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন"। এখানে রাজশক্তিকে 'চারিবর্ণের রক্ষা কর্ত্তা' বলা হইয়াছে। এদ্বারা হিন্দুরাজনীতির (২) মূলকথা রাজশক্তি সকল শক্তির শ্রেষ্ঠ তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

তাহার পর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা হইতেছে ধীবরদ্বারা মাছের পেট হইতে রাজার হারানো আংটি পাওয়ার সংবাদ। এই স্থলে আমরা দেখি যে নগররক্ষক পাহারাওয়ালা ও তাহাদের অধ্যক্ষ (Police Inspector) নগররক্ষা ও চোর,

(১) এই শ্লোকটি বৌধায়ন শ্রুতি, শব্দকল্প, অগ্নিকাণ্ডে উদ্ধৃত আছে।

(২) এবিষয়ে শুক্রনীতির বিচার দ্রষ্টব্য।

ধরিবার জন্ম নিযুক্ত থাকিত। আবার উৎকোচ গ্রহণের সংবাদও এই সঙ্গে পাওয়া যায়। কারণ, তাহার বন্ধদিগের অন্যতম নগররক্ষককে মদ খাইবার জন্ম দান করিলে উভয়ে শৌণ্ডিকালয়ের দিকে ধাবিত হইল।

তৎপরে শার্ঙ্গরব বলিতেছেন, 'সিদ্ধপুরুষদিগের কুশল সর্ব্বদাই আছে। তিনি মহারাজের "অনাময়" জিজ্ঞাসা করিয়া ইহা বলিয়া দিয়াছেন'। এইস্থলে মনূক্ত বিধান যে কোন বর্ণের লোককে কি ভাবে অভিবাদন করিতে হইবে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। তৎপরে প্রতিহারী স্বগতঃ বলিতেছে, "আমাদের মহারাজের মত ধর্ম্মজ্ঞ কা'র আছে, এমন স্ত্রীরত্ন হাতে পেয়ে কে বিচার করে?" এস্থলে সমাজের দুশ্চরিত্র লোকদের দুর্নীতির কথারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহার পর শকুন্তলা সখীদের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলে শার্ঙ্গরব বলিতেছেন, "হা হতভাগিনী! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছিস?" এই কথাতে সামন্ততান্ত্রিক যুগের স্ত্রীলোকদের অবস্থা চিত্রিত হয়। অভিভাবক ছাড়া তাহাদের কোন প্রকার স্বতন্ত্র স্বাধীনতা ছিল না।

ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রিত আলেখ্যের কথা উল্লিখিত আছে, তুলি এবং বর্ণপাত্রের ও রঙ তৈলের কথার উল্লেখ আছে। তখন তৈলচিত্র অঙ্কিত করা হইত। এবং এই অঙ্কেতে বিদূষক, বল্কলধারী [illegible] কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীয় তপস্বীদেরই পরিচয়। পুনরায় বিদূষক বলিতেছেন, "হা হা আমি ব্রাহ্মণ, অবধ্য।" ব্রাহ্মণ্যবাদীর কাছে ব্রাহ্মণ বর্ণ যে অবধ্যতার দাবী করিত সেই দাবীই এইস্থলে প্রকট করা হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে মাতলি দেখাইতেছেন অদিতির সহিত একাসনে মারীচ উপবিষ্ট। এই সঙ্গে ইহাও দর্শিত হইতেছে যে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও ধর্ম্ম করা যায়, সেইজন্য সস্ত্রীক ঋষির তপস্যা করার দৃশ্য অঙ্কিত করা হয়েছে এই দৃশ্যে তপোবনের বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ রাজশক্তির পতনের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আদর্শ প্রচারই এই পুস্তকে করা হইয়াছে।

ইহার পর আসে কালিদাসের রঘুবংশ নামক কাব্য। এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে রাজার দ্বারা জমিতে উৎপন্ন একষষ্ঠাংশ শস্যের দ্বারা কর গ্রহণের কথা উল্লিখিত আছে। চতুর্থ সর্গে পারসীকদের জয় করিবার জন্ম স্থলপথে যাত্রা করিবার বিবরণ পাওয়া যায়। এইসঙ্গে হূণদের সহিত যুদ্ধের বর্ণনা আছে। রঘুর এই দিগ্বিজয় বর্ণনা বিষয়ে এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেহ বলেন, সমুদ্রগুপ্তের ভারতের মধ্যে দিগ্বিজয়টি কালিদাসের বর্ণনার আদর্শ হইয়াছিল। আবার স্বর্গীয় জয়সোয়াল মহোদয় বলেন, ইহা সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দ্বারা আফগানিস্থান ও বাহ্লীক জয়ের বিবরণই এই আদর্শ যোগাইয়াছিল। মেহরৌলিতে (Mehrauli)* প্রাপ্ত শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে, রাজা চন্দ্র সিন্ধুনদের শাখাগুলির উৎপত্তিস্থল অতিক্রম করিয়া যুদ্ধজয় করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা স্বর্গীয় জয়সোয়াল কর্ত্তৃক উপরোক্ত অর্থ করা হয়। তিনি উপরি উক্ত এই চন্দ্রকে

* জয়চন্দ্র নারং—"ইতিহাস প্রবেশ" (হিন্দী) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত সমান করেন। অপর পণ্ডিতদের মতে এই, চন্দ্র পরবর্তীকালের অন্য একজন রাজা; ইনি বঙ্গদেশও বিজয় করিয়াছিলেন।

চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়কালে বঙ্গদেশের রাজাদের সহিত নৌযুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে। এস্থলে আমরা এই সংবাদ পাই যে প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গলাদেশ নৌসেনার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বাঙলায় পালরাজাদের যুগে বাঙ্গলার নৌসেনা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।(৩) তথায় নৌসমূহের "হী হী" রবে যুদ্ধধ্বনি করিবার উল্লেখ আছে। তাহার পরে কবি বলিতেছেন, রঘু কপিশা নদী পার হইলেন, উৎকলবাসীরা পথ দেখাইয়া দিলে তিনি কলিঙ্গাভিমুখে গমন করিলেন। ("উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ")। কলিঙ্গদেশের সীমা লইয়া একটি গণ্ডগোল আছে। কিন্তু এস্থলে একটি স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেল—উৎকলের পর কলিঙ্গ।

রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে উল্লিখিত রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সীতার নিকট যে সমুদ্রের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দাক্ষিণাত্যের সেতুবন্ধ রামেশ্বরের কাছে দৃশ্যের সহিত মেলে না। ইহা কবির ব্যক্তিগত কল্পনা, বরং ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী কাকদ্বীপের কাছে সমুদ্রের দৃশ্যের সহিত এই বর্ণনার সাদৃশ্য আছে।

পঞ্চদশ সর্গে দশরথ পুত্র ভরতের দুই পুত্রের নাম তক্ষ ও পুষ্কল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁহাদের নামাঙ্কিত তক্ষশীলা ও পুষ্কলাবতী রাজধানীদ্বয় স্থাপিত হয়। হিন্দুর জনশ্রুতি বলে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লবের দ্বারা লাহোর স্থাপিত হয় এবং পাঞ্জাবের রাজধানী তক্ষশিলা এবং পেশোয়ারের নিকটবর্তী কোনস্থলে পুষ্কলাবতী ভরতপুত্রদের দ্বারা স্থাপিত হয়। এই জনশ্রুতির কিয়দংশ এইস্থলে প্রতিধ্বনিত হয়। তৎপরে "শৃঙ্গারতিলকম্" পুস্তকে কালিদাস বঙ্গ বারাঙ্গনাদের মদন সুষমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য অনেকে অনুমান করেন যে কালিদাস বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে কোনও অধ্যাপক লেখককে বলিয়াছেন, এই শ্লোকটি অন্য কবির দ্বারা লিখিত—কালিদাসের নহে, ইহা প্রক্ষিপ্ত। কালিদাসের এই কাব্যগ্রন্থের কলিকাতা সংস্করণে ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার পরে 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' পুস্তকে বররুচ্যুপাখ্যান অধ্যায়ে বেতাল কর্তৃক "[illegible]" বলিয়া টিকা গ্রহণ করার কথা উল্লিখিত আছে। এতদ্বারা সম্মান প্রদর্শনের জন্য কপালের টিপ প্রদান করার প্রথা তখন হইতে প্রচলিত ছিল ইহাই প্রাপ্ত হই। এবং ইহাতে বেতালের কুশদ্বীপ পর্যটন করার কথা আছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই 'কুশদ্বীপ কোথায়? ইহা কি Kui-shang বা Kuishan জাতির রাজত্বকে নির্দেশ করিতেছে? সম্রাট কনিষ্কের কুশান জাতির রাজত্বকে নির্দেশ করিতেছে? সম্রাট কনিষ্ক কুশান জাতির লোক ছিলেন এবং গুপ্তযুগে তিনি পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা যেমন শকদের

(৩) গৌড়রাজমালা দ্রষ্টব্য।

দেশকে শকদ্বীপ বলিত তেমনি কি কুশানদের দেশকে কুশদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিত ? এই পুস্তকের এক নম্বরাজার গল্প আছে। ইনি রাজসিংহাসনে বসিলে তাঁহার বামভাগে ভানুমতীর বিরাজ করার কথা উল্লেখ করা আছে। চিত্রকর দ্বারা চিত্র উল্লেখ করার বিবরণ আছে। ইহার দ্বারা আমরা তৎকালে রাজা রাণীর একত্রে উপবেশন করার প্রথার বিষয়ে অবগত হই। পুনরায় চিত্রকর দ্বারা চিত্রাঙ্কন করিবার সংবাদও পাই।

ষষ্ঠোপাখ্যানে এক ব্রহ্মচারীর দ্বারা জগদম্বা চণ্ডিকার কথা উল্লেখ আছে। সপ্তম উপাখ্যানে ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজার কথা আছে, এবং দশম উপাখ্যানে হোমকুণ্ড হইতে হঠাৎ এক পুরুষের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে। এইভাবে আমরা তান্ত্রিকদলের অলৌকিকতা ও বৈষ্ণবদলের শ্রীকৃষ্ণ-পূজার কথার উল্লেখ পাই এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে দ্বাদশ উপাখ্যানে পুরন্দর নামক এক বণিক সন্তানের দ্বারা ক্ষত্রিয় সন্তানের ন্যায় ধনব্যয় করার কথা উল্লেখ আছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, এই কার্য্য বণিক বংশের উপযুক্ত নয়। এতদ্বারা আমরা বুঝি যে ব্যবসায়ী লোকেরা তৎকালে সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয় রাজারা পরের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিতেন ও "উড়নচণ্ডী" হইতেন। ত্রয়োদশ উপাখ্যানে দেবালয়ে দেবতা প্রণাম এবং নদীতীরে পুরাণ শ্রবণের কথার উল্লেখ আছে। ইহা উক্ত হয় যে প্রাচীন কালে হিন্দুরা দেবতাদের মূর্ত্তি পূজা করিত না। কৌটিল্যে আমরা দেবালয়ের উল্লেখ পাইয়াছি কিন্তু দেবমূর্ত্তির উল্লেখ পাই না কিন্তু এইস্থলে আমরা দেবতাকে প্রণাম করিবার প্রমাণ পাই, আবার আজকালকার ন্যায় কথকতার প্রচলন তখন যে ছিল ইহাও দেখা যায়। চতুর্দ্দশ উপাখ্যানে মাধবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের কথাই উল্লেখ আছে। এই সময় হইতেই কর্ম্মফলবাদের বিশ্বাস প্রচলিত হইয়াছে দেখিতে পাই। পঞ্চদশ উপাখ্যানে কণ্ঠদেশে বরমালা প্রদান করিয়া বিবাহ করিবার উল্লেখ আছে। এতদ্বারা গান্ধর্ব বিবাহ আইন-সঙ্গত বিবাহ বলিয়া বিবেচিত হইত। ষোড়শ অধ্যায়ে সভামণ্ডপে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ আছে। এইস্থলে আমরা মূর্ত্তি পূজার স্পষ্ট পরিচয় পাই। রাজা তাম্বূল প্রদান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন এই বিবরণ দেখা যায়। ইহা সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন। সপ্তদশ উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে "যোগী বলিলেন, 'কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিন বজ্রযোগিনী চক্রের পূজা করুন……তোমাকে পূর্ণাহুতির জন্য নিজদেহ হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন……রাজা প্রত্যহ অগ্নিতে আপনার দেহ আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" ঊনবিংশতম উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে "বলিরাজা বিক্রমাদিত্যকে……রস ও রসায়ন এই দুইটি দ্রব্য প্রদান করিলেন……রাজা কহিলেন "বিপ্র, এই রসের সংযোগে সপ্তধাতু স্বর্ণে পরিণত হয়। আর এই রসায়ন যে ব্যক্তি সেবন করে সে জরামৃত্যু রহিত হইয়া থাকে।" একবিংশ উপাখ্যানে বর্ণিত আছে—"রাজা কহিলেন, তবে আমাকে অষ্টমহাসিদ্ধির উপদেশ প্রদান করুন।" তখন স্ত্রীলোকগণ (ডাকিনীগণ) রাজাকে অষ্টগুণযুক্ত রত্ন প্রদান করিলেন।

এই সব বর্ণনার দ্বারা আমরা ডাকিনী ও সিদ্ধ তান্ত্রিকদের অলৌকিক ক্রিয়া ও কিমিয়া বিদ্যা (alchemy) প্রভৃতির পরিচয় সে যুগে পাওয়া যায়। বৌদ্ধপণ্ডিতদের মতে এবিষয়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা বেশী পারদর্শী ছিলেন (৪)।

আবার অষ্টাবিংশ উপাখ্যানে বিদেশীকে দেবতার পশুবলিরূপে অর্পণ করার কথা আছে। একবিংশ উপাখ্যানে বিক্রমাদিত্যের নিকট এক দিগম্বর সন্ন্যাসীর আগমনের কথা উল্লেখ আছে। বিংশতম উপাখ্যানে সহমরণ প্রথা এবং এক ঐন্দ্রজালিকের কথাও উল্লিখিত আছে। পুনরায় ত্রিংশ তম উপাখ্যানে ভোজরাজা কর্তৃক শিবদুর্গার যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুস্তকে আমরা যেমন বৈষ্ণবধর্মের প্রচলনের সংবাদ পাই তেমনি তান্ত্রিকধর্মের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ পাই। লামা তারানাথের পুস্তকে বৌদ্ধ মহাযানী মহাসিদ্ধদের বর্ণনাকালে মহেশ্বর, পার্বতী, চণ্ডিকা প্রভৃতির পূজা, মহাসিদ্ধদের alchemy-র পারদর্শিতাকে 'সিদ্ধিলাভ' বলা, ডাকিনীদের শ্মশানে থাকার কথা এবং কোন কোন ডাকিনীর সিদ্ধপুরুষদের শক্তিরূপে বাস করার কথার উল্লেখ আছে। নাগার্জুন, কাহ্নপাদ, ত্রিপুরার জ্ঞানমিত্র, তৎশিষ্য শান্তিদেব (ইনি তারানাথের গুরুর গুরু ছিলেন।) প্রভৃতি নানাপ্রকারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া জানিতেন এবং তাঁহাদের দ্বারা নানাপ্রকার অলৌকিক ক্রিয়া করার কথা উল্লিখিত আছে। আর বৌদ্ধরা বলিতেন, যে অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা বৌদ্ধতান্ত্রিকরাই বেশী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং শক্তিশালী ছিলেন। অনুমান খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই তান্ত্রিকধর্ম বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কারণ তারানাথ বলিতেছেন গৌড় বঙ্গের সম্রাট ধর্মপালের সময়ে সিদ্ধপুরুষদের আবির্ভাবের প্রাচুর্য হইয়াছিল। আবার ভোজরাজার কথা বলিত হইয়াছে। তিনি যদি ঐতিহাসিক গুর্জর প্রতিহার বংশীয় ভোজরাজা হন, তাহা হইলে তিনিও পালযুগের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু গুপ্তযুগের কালিদাস লিখিত এই পুস্তকে আমরা উপরোক্ত সংবাদসমূহ পাই। এইজন্য মনে এই সন্দেহ জাগিতে পারে, ইহা কি কালিদাসের নিজের দ্বারা লিখিত?

বিক্রমোর্বশীতে পূর্বের ন্যায় আমরা তীরে তাহার স্বামীর নাম খোদিত থাকিতে দেখি (৫)। বিক্রমোর্বশীনাটক সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, ইহা একটি বৈদিক আখ্যান অবলম্বনে লিখিত হয়। বৈদিক যুগে একটি গল্প রচিত হইয়াছিল, হয়তো ইহা রূপক ছিল। এই গল্প অবলম্বনে এই নাটক লেখা হয়। উর্বশীকে তথায় পাহাড় দেশের কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সঙ্গে পাহাড় দেশের (বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি হইতে আফগান সীমা পর্যন্ত স্থান) রীতি নীতির সংবাদ পাওয়া যায়। বিবাহিতা পাহাড়ী কন্যারা শয়নের ঘরে একটি ভেড়ী (Ewe) রক্ষা করিত। কথিত হয় যে পাহাড়ী কন্যারা সুন্দরী ছিল ও পাহাড়ে

(৪) Gruenwedel দ্বারা জার্মান ভাষায় ভাষান্তরিত লামা তারানাথের Edelstein-mine (মানিকের খনি) পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(৫) নিখিলনাথ রায়, কবিকথা পৃষ্ঠা ১৩১

সকলকে গান গাহিয়া বেড়াইত। ইহাও কথিত হয় যে এই গানরতা গান্ধারীদের নাম হইতেই গন্ধর্ব কথার সৃষ্টি হয়। 'গন্ধর্ব' শব্দের অর্থ গায়ক। এক্ষণে ইহার অর্থ হইয়াছে "অশরীরি গায়ক।"

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে অসবর্ণ বিবাহের কথার উল্লেখ পাই। তাহার রাণীর বর্ণ নিকৃষ্ট আহার উল্লেখ আছে। (৬) আবার ঘূর্ণায়মান জলযন্ত্রের (ফোয়ারা) কথাও উল্লিখিত আছে। (৭)

এই সময়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটি প্রথা ছিল, তাহার নাম "দোহদ।" দোহদ অর্থে সাধভক্ষণ বুঝায়। স্বর্ণ অশোক বৃক্ষের ফুল ফুটিতে দেরী হইলে রূপবতী নারী পদাঘাত করিলে ঐ গাছের দোহদ বা সাধভক্ষণ করা হইত। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, প্রথম অঙ্ক। (৮) শোনা যায় বর্দ্ধমান অঞ্চলে সাধভক্ষণকে 'দোহাদ' বলা হইয়া থাকে।

এই নাটকে রাজঅন্তঃপুরের ভিতরকার কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। রাণী মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পাতালপুরে কয়েদ করেন। আবার "বিষবৈদ্য" নামে একপ্রকার বৈদ্যের কথা শোনা যায়। (৯) এই বিষবৈদ্যের মুখ হইতে আমরা এই সংবাদ পাই যে তৎকালে উদকুম্ভবিধান (একপ্রকার বিষ চিকিৎসা) প্রচলিত ছিল এবং তাহাতে সর্পবিনাশক মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী আবশ্যক হইত। আবার এই নাটকে আমরা দেখি যে সম্মানাই লোকের নিকট হইতে পত্র আসিলে রাজাকে আসন হইতে উঠিয়া নমস্কার করিতে হইত।*

ক্রমশঃ

(৬) ঐ কবিকথা—১৪২
(৭) ঐ কবিকথা—১৫৬
(৮) ঐ কবিকথা—১৭৩
(৯) ঐ কবিকথা—১৭৫
* কালিদাস—রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, চতুর্থ খণ্ড।

সম্পাদক—স্বামী চিৎঘনানন্দ ও স্বামী সদ্রূপানন্দ—কলিকাতা ১৩বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী অভয়ানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট বাণীশ্রী প্রেস হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ { ৪র্থ সংখ্যা

অদ্বৈতবাদ

(পূর্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ :

অতঃপর ২য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে দেখ, যথা—

(১১) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি !

আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্" (২।৪।৫)

অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—"অরে, মৈত্রেয়ি ! আত্মাই দ্রষ্টব্য, তাহাই শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য। অরে, আত্মার দর্শনে শ্রবণ মননে এবং বিজ্ঞানে এই সব বিদিত হয়।"

এস্থলে মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন—

"যেন অহং ন অমৃতা স্যাম্ কিম্ অহং তেন কুর্যাম্ ?

যদেব ভগবান বেদ তদেব মে ব্রূহি" (বৃ ২।৪।৩)

অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমি কি করিব ? আপনি যাহা জানেন তাহাই আমায় বলুন। আর তাহারই উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত কথা বলিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, আত্মার জ্ঞান লাভ হইলেই লোক অমৃত হয়, এবং আত্মার জ্ঞান হইলেই এই সকল বিদিত হয়। আর তাহা হইলে বলা যায়—এই সকলই আত্মারই আকারভেদ বা কল্পিত রূপবিশেষ। এ সকল আত্মার আকারভেদ না হইলে আর আত্মার জ্ঞানে সকলের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। আর তজ্জন্য এই আত্মাই সেই এক অদ্বৈত বস্তু—ইহাই বলা হইল। আত্মার সঙ্গে এই সব গুলির যদি ভেদ থাকিত, তাহা হইলে আত্মার জ্ঞানে ইহাদের জ্ঞান হইত না। এতদ্বারা দ্বৈতবাদ প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না। কিন্তু অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ এই কথাই ঐ বাক্য শেষে উক্ত হইয়াছে, যথা—

(১২) "সর্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্বং বেদ।

ইদং ব্রহ্ম, ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি,

ইদং সর্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা"। (বৃ ২।৪।৬)

অর্থাৎ "সকলই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করিবে, এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি এই লোক সমূহ এই ভূত সমূহ এই সমুদায় বস্তু যাহা এই আত্মা"। অতএব বুঝা গেল আত্মাই সব। আর আত্মাই সব হওয়ায় সেই সব আত্মার কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, যেমন স্বপ্নের দৃষ্ট দৃশ্য সবই স্বপ্ন দ্রষ্টা পুরুষেরই কল্পনা।

যদি বলা যায়—আত্মার কল্পনা এই সব বলিব কেন? এই সব আত্মারই এক অংশের পরিণতি বা বিকৃতি বলিব? অর্থাৎ এই সব সত্যই হইবে, কল্পনা হইলে কল্পিত বস্তুকে মিথ্যা বলিতে হয়। আর এই সব তো আমরা সত্য বলিয়া বুঝি, অতএব এই সব কল্পনা বলিব না? অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইবে? কিন্তু তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, আত্মা যদি 'এই সব' সত্য সত্যই হন, তাহা হইলে সমগ্র আত্মার পূর্ণরূপতাই আর থাকে না। বস্তুতঃ আত্মার পূর্ণরূপতার নাশ আমরা কখনই অনুভব করি না। কল্পনার কালেও আত্মা পূর্ণরূপই থাকেন, অথচ কল্পিতকে সত্য বলিয়াও বোধ হয়। এজন্য এস্থলেও সেই কল্পিত রূপই হওয়া সঙ্গত। আর তজ্জন্য দৃষ্ট দৃশ্য মিথ্যা, এক আত্মাই যথার্থ সত্য, অর্থাৎ অদ্বৈতই এজন্য শ্রুতি মধ্যে উপদিষ্ট হইবে। অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা যায় ৭ম, ৮ম ও ৯ম বাক্যে দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণাধ্বনির দৃষ্টান্তদ্বারা বলা হইল—ইহাদের শব্দ গ্রহণের জন্য যেমন ইহাদিগকেই গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ আত্মার গ্রহণে এই সমুদায় গৃহীত অর্থাৎ জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ আত্মাও যেমন সত্য, আত্মভিন্ন বস্তু ও তদ্রূপ সত্য। যথা—

(১৩) "স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায়,
দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। (বৃ ২।৪।৭)
স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায়,
শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। (বৃ ২।৪।৮)
স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায়,
বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।" (বৃ ২।৪।৯)

অর্থাৎ "যেমন তাড্যমান দুন্দুভির শব্দ হইতে অন্য বাহ্য শব্দ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি বা দুন্দুভির আঘাতের গ্রহণে সেই শব্দ গৃহীত হয় (২।৪।৭), যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে শঙ্খশব্দ ভিন্ন অন্য বাহ্য শব্দ গৃহীত হয় না, কিন্তু শঙ্খের বা শঙ্খ-শব্দের গ্রহণে সেই অন্য বাহ্য শব্দ গৃহীত হয় (২।৪।৮), যেমন বীণা বাদ্যমান হইলে অন্য বাহ্য শব্দ গৃহীত হয় না, কিন্তু বীণা শব্দের গ্রহণে অন্য বাহ্য শব্দ গৃহীত হয়, (তদ্রূপ এক আত্মাকে জানিলে সব জানা যে)।" অতএব আত্মভিন্ন বস্তুও সত্য ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—না, এই দৃষ্টান্তদ্বারা আত্মভিন্ন বস্তু যে সত্য তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঢাকের শব্দের সহিত অন্য শব্দ মিলিত হইলে তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে জানা যায়

না। যতক্ষণ মিলিত না হয় ততক্ষণ পৃথক্ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু মিলিত হইলে আর বুঝা যায় না। মিলিত শব্দ উভয় ভিন্ন হইলে, তাহাকেও আর নির্দেশ করা যায় না। সুতরাং স্থলে আপ্লুত বস্তুর আত্মার সহিত অভিন্ন প্রতীত হইলে আপত্তির পৃথক্ সত্তা সিদ্ধ হয় না। শব্দ দুন্দুভিরূপে লাভ পায়, সুতরাং যে শব্দের শব্দ মিলিত হয়, সে শব্দকে আর পৃথক্ করিবার সম্ভাবনাও থাকে না। অতএব এই দৃষ্টান্তদ্বারা অদ্বৈতবিরোধী কিছুই সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতে ভেদাভেদ হইলে তাহাকে ভেদাভেদ বলা সঙ্গত হয় না। একত্বে ভেদাভেদ হইলে তাহা ভেদও নহে অভেদও নহে পরন্তু তাহা অনির্বচনীয়ই হয়।

তাহার পর ইহার পর—

"স যথা আর্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্তি,
এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্
ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং
বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি
ব্যাখ্যানানি অস্য এব এতানি নিঃশ্বসিতানি"। (বৃ ২।৪।১০)

অর্থাৎ "যেমন আর্দ্র কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক্ ভাবে ধূম নির্গত হয়, তদ্রূপ অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্‌সমূহ, শ্লোকসকল, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যান সকল, এবং ব্যাখ্যান সমূহ ইহারা সেই আত্মবস্তুর নিশ্বাসরূপ"।

এই বাক্যে আর্দ্রকাষ্ঠযুক্ত অগ্নি হইতে পৃথক্ ভূত ধূম যেমন নির্গত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে বেদাদি নির্গত হইয়াছে, ইহাই বলিয়া—

"স যথা সর্বাসাম্ অপাং সমুদ্র একায়নম্· এবং সর্বেষাং বেদানাং বাক্ একায়নম্"— এই বাক্যে আত্মাই সকলের আশ্রয় বলিয়া পরবর্তী বাক্যে যে সৈন্ধব ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিজ্ঞানঘন আত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি ও তাহাতে তাহার লয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়, অদ্বৈত তো সিদ্ধ হয় না? সেই সৈন্ধব ও জলের দৃষ্টান্ত যথা—

(১৩) "স যথা সৈন্ধবখিল্যঃ উদকে প্রাস্ত উদকমেব অনুবিলীয়েত,
ন হ অস্য উদ্‌গ্রহণায় ইব স্যাৎ, যতঃ যতঃ তু আদদীত লবণমেব,
এবং বৈ অরে ইদম্ মহদ্‌ভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞানঘনঃ এব।
এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি, ইতি
অরে ব্রবীমি ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।" (বৃ ২।৪।১২)

অর্থাৎ যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না, যে কোন স্থল হইতে জল গ্রহণ করা যায়, তাহা লবণই হয়, তেমনি অয়ি মৈত্রেয়ি! এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘনই; এই ভূতসমূহ হইতে

উত্থিত হইয়া সেই ভূতসমূহের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বিনাশের পর আর তাহাদের সংজ্ঞা অর্থাৎ নামরূপাদি থাকে না—ইহাই আমি বলিতেছি—ইহাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন।"

এতদ্দ্বারা 'জলে লবণের ন্যায় জীবাত্মা থাকে' বলায় জল ও লবণে যেমন ভেদাভেদ সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদই সিদ্ধ হইবে? অভেদ তো সিদ্ধ হয় না, অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না। কারণ, এস্থলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের ভাষাটীর প্রতি মনোযোগ করিলে অভেদ উপদেশই এতদ্দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে বুঝা যাইবে, যেহেতু দৃষ্টান্তের মধ্যে যে সৈন্ধবখণ্ডের কথা আছে, তাহার স্থানীয় কোন কিছু দার্ষ্টান্তিকমধ্যে উক্ত হয় নাই, যে জলে সৈন্ধবখণ্ডকে নিক্ষেপ করা হয়, সেই জলের স্থানীয় কোন কিছুও দার্ষ্টান্তিকমধ্যে উক্ত হয় নাই। তদ্রূপ দার্ষ্টান্তিকমধ্যে যে মহাভূত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনের কথা আছে, তাহার স্থানীয় কিছুই দৃষ্টান্তমধ্যে নাই, এবং দার্ষ্টান্তিকমধ্যস্থ ভূতসমূহ হইতে সমুত্থিতের কথা যে আছে, তাহাও দৃষ্টান্তমধ্যে উক্ত হয় নাই। কিন্তু দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে যে বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা মিলিত বস্তুদ্বয়ের অপৃথগ্‌ভাব মাত্র। এখন তাহা হইলে এই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে স্পষ্টভাবে কথিত বিষয়-গুলিকে লইয়া এবং অনুক্ত বিষয়গুলিকে ধরিয়া লইয়া তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—

দৃষ্টান্তে কথিত সৈন্ধবখণ্ডের সহিত দার্ষ্টান্তিকে অকথিত জীবরূপের তুলনা। দৃষ্টান্তে কথিত মিশ্রিত উদকের সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত মিশ্রিত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন মহা-ভূতের তুলনা। দৃষ্টান্তে কথিত অণু-বিলয়ের সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত অণু-বিনাশের তুলনা। দৃষ্টান্তে অকথিত সৈন্ধবখণ্ডের নিমিত্তকারণে উত্তাপের সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত নিমিত্ত-কারণ ভূতসমূহের তুলনা। দৃষ্টান্তে কথিত অপৃথক্করণীয়তার সহিত দার্ষ্টান্তিকে কথিত সংজ্ঞাভাবের তুলনা। এখন তাহা হইলে বলা যায়, অনন্ত অপার সমুদ্রজল উত্তাপের তারতম্য নিমিত্ত লবণখণ্ডে পরিণত হইলে এবং সেই লবণখণ্ড অনন্ত অপার সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন মিলিয়া লবণই হইয়া যায়, তাহাকে আর পূর্ববৎ পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ এই মহদ্ভূত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন আত্মা ভূতসমূহরূপ উপাধিনিমিত্ত জীবরূপে পরিণত হইলে এবং সেই জীব সেই অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন আত্মাতে সেই ভূতগণ সহ বিনষ্ট হইলে তাহাকে আর পৃথক্ করা যায় না। তাহা মহদ্ভূত অনন্ত অপার বিজ্ঞান-ঘনই হয়। অতএব এতদ্দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদই কথিত হইল বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়, সৈন্ধবখণ্ডকে জলে নিক্ষেপের কথা আছে, সুতরাং জল ও সৈন্ধব যেমন পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্ থাকে, তদ্রূপ জীব ব্রহ্মমধ্যে পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্ থাকে বলিব? সমুদ্রকে বিশেষণ দিয়া সমুদ্রজল হইতে সৈন্ধবের উৎপত্তি ও তাহাতেই লয় বলিয়া অভেদ কল্পনা কেন করিব?

তাহা হইলে বলিব "সৈন্ধব"-শব্দ দ্বারা এবং দার্ষ্টান্তিকের "এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" ইত্যাদি শব্দদ্বারা ঐ রূপ কল্পনা করিব। যেহেতু "সৈন্ধব" পদ না দিয়া "লবণ" পদ দিলেই হইত। সিন্ধু অর্থ সমুদ্র, সৈন্ধব বলায় সমুদ্রজলোৎপন্ন লবণ অর্থই পাই। আর 'উদক' পদে সাধারণ জল অর্থ হইলেও সৈন্ধব-পদের সঙ্গে থাকায় তাহাকে সমুদ্র-জল বলিয়া গ্রহণ করা সহজই হয়। আর "এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" বাক্যমধ্যে প্রথম পদদ্বয়ে নিমিত্ত অর্থে চতুর্থী বিভক্তি ধরিয়া ভূতপদকে নিমিত্তকারণ ধরিলে মহদ্ভূত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন ব্রহ্মই, ভূতরূপ উপাধিনিমিত্ত জীবরূপ হন—এই অর্থই সঙ্গত হয়। আর দৃষ্টান্তে এই নিমিত্তকারণের উল্লেখ না থাকায় উত্তাপ-তাপাদিকে সৈন্ধবের নিমিত্তকারণরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত হয়। সুতরাং দৃষ্টান্ত কল্পিত অংশের সহিত দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্যবিধান অংশে করিলেই এই উপমার উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝা যায়।

যদি বলা হয়, দৃষ্টান্তে "উদকমেব অনুবিলীয়েত" আছে, আর দার্ষ্টান্তিকে "তান্যেব" অর্থাৎ "ভূতান্যেব অনুবিনশ্যতি" থাকায়, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য থাকে না। কারণ, উদকপদদ্বারা দৃষ্টান্তের সমুদ্রজলে জলে মাত্র বিলীন হয় না, কিন্তু "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ"-পদদ্বারা ভূতোৎপত্তির বিলয় বা বিনাশ হয় বলা হইয়াছে। তাহার পর "উদকম্" ও "তান্যেব" বলায় সৈন্ধব জলে বিলীন হয়, কিন্তু জীব ও ভূতসমূহ "বিনষ্ট" হয় বলিতে হইবে। উদকম্ এই পদ দ্বিতীয়া বিভক্তি অনুপদযোগে হইয়া উদকে এইরূপ সপ্তমী অর্থ হইয়াছে, তদ্রূপ "তানি" অর্থাৎ "ভূতানি" ও অনুশব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া ভূতসমূহে এইরূপ সপ্তমীর অর্থ বুঝিবে। আর তাহা হইলে জীব ও ভূতসমূহ থাকায় অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না।?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হইতে পারে না। কারণ "ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" পদ থাকায় ভূতপদকে জীবভাবের জন্য নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে, আর দৃষ্টান্তে সেই নিমিত্তকারণের উল্লেখ না থাকায় তজ্জন্য উত্তাপ-তাপাদিকে সৈন্ধবের নিমিত্তকারণ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এজন্য দার্ষ্টান্তিকে দৃষ্টান্ত সৈন্ধবের পক্ষে উদকের ন্যায় লয়স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায় জীবের লয়স্থানের জন্য মহদ্ভূত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনকে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, দৃষ্টান্তে সৈন্ধবের উৎপত্তিস্থান সৈন্ধব পদ দেখিয়া উদক অর্থে সাগর ধরা হইয়াছে, তদ্রূপ দার্ষ্টান্তিকে জীবের উৎপত্তি স্থান মহদ্ভূত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনকেই বলা হইয়াছে। কারণ, "মহদ্ভূতম্ অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘন এব "এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" এইরূপ বলা হইয়াছে। যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই লয় এই কথাটি দৃষ্টান্তে সমান রাখিতে হইলে বিজ্ঞানঘনই জীবের লয়স্থান বলিতে হইবে। "উদকম্ অনু" পদে যেমন উদকে অর্থ করা হইয়াছে তদ্রূপ "তান্যেব অনু" পদে তাহাতে অর্থাৎ ভূতগণমধ্যে অর্থ করিয়া ভূতগণকে জীবের লয়স্থান বলা যায় না। বস্তুতঃ সৈন্ধবখিল্য উদকে পতিত হইয়া লবণই হয় বলায়, সৈন্ধব হয়—এরূপ না বলায়, অর্থাৎ সৈন্ধবের উপাধি-অংশ বর্জন করায় এবং বিজ্ঞানঘন বস্তুটি "এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" অর্থাৎ এই সকল ভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া

"তান্যেবানুবিনশ্যতি" বলায় উক্ত বিজ্ঞানঘনই জীবের লয়স্থান বলা হইল। অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানঘনই জীব হইয়া ভূতসহ নষ্ট হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানঘনটী উপাধিশূন্য হয় বলা হইল। অন্য কথায় জীব নিজ উৎপত্তিস্থান বিজ্ঞানঘনমধ্যে বিনষ্ট বা লয় প্রাপ্ত হইল বলা হইল। "তান্যেবানুবিনশ্যতি" অর্থাৎ তাহাতেই বিনষ্ট হয়—ইহা দেখিয়া ভূতগণকে জীবের লয়স্থান বলা যায় না। এস্থলে সৈন্ধবের পক্ষে বিলীন এবং জীবপক্ষে বিনাশ বলায় অভেদই আরও উত্তমরূপে কথিত হইল। কারণ, বিলীন বস্তুর কদাচিৎ পুনরাবির্ভাব হয়, কিন্তু বিনষ্টের তাহা হয় না। এইরূপে এই শ্রুতির যথাসম্ভব সঙ্গত অর্থ করিতে গেলে সেই এক অদ্বৈতই সিদ্ধ হইবে, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধ হইবে না।

যদি বলা হয় "সৈন্ধবখণ্ড উদকে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে পৃথক্ করা যায় না, যেখানেই জল গ্রহণ করা হইবে, সে স্থলেই লবণই প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বলায় উদক পদে সমুদ্রজল গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না, সাধারণ মিষ্ট জলই গ্রাহ্য হওয়া উচিত? আর তাহা হইলে জল ও লবণের মিলনে যেমন ভেদাভেদ বা ভেদ সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ জীব ব্রহ্মেও হওয়া উচিত, আর তাহা হইলে অদ্বৈত এস্থলে উপদিষ্ট হয় নাই বলিতে হইবে?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে প্রথমেই "সৈন্ধবখিল্যঃ" না বলিয়া "লবণম্" পদের গ্রহণ করাই উচিত হইত। অর্থাৎ ঐরূপ করিলে সৈন্ধবপদের সার্থকতা নষ্ট হইয়া যায়।

তাহার পর যে অংশে উপমা সেই অংশ ভিন্ন অন্য অংশ হইতে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হয় না। এখানে "ন হাস্য উদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ" এই অংশের সঙ্গে "প্রেত্য ন সংজ্ঞাস্তি" এই অংশের মুখ্য উপমা, অন্য অংশে মুখ্য উপমা নহে। অন্য অংশ উপমার উপকারক মাত্র। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের অভেদই এই উপমার মুখ্য তাৎপর্য্য। এজন্য এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ বা ভেদাভেদ কল্পনা অসঙ্গত।

তাহার পর দৃষ্টান্তে যেমন "লবণমেব" বলা হইয়াছে দার্ষ্টান্তিকের তদ্রূপ "বিজ্ঞানঘন এব" বলা হইয়াছে। সুতরাং জলে লবণসত্ত্বেও যেমন জলকে ত্যাগ করিয়া "লবণমেব" বলা হইল, অন্য সব কিছুরই নিষেধ করা হইল, এখানেও তদ্রূপ বিজ্ঞানঘন ভিন্ন অপর সবই নিষেধ করা হইল। "এব" শব্দ দ্বারা লবণ বা বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যুত বলা হইল সৈন্ধব যেমন জলে মিশিয়া অপৃথক্‌কল্পীভাবে লবণই হয়, তদ্রূপ জীব উপাধিসহ বিনষ্ট হইয়া অর্থাৎ সংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানই হয়। দৃষ্টান্তে জল ও লবণের ভেদ বোধগম্য হয় বলিয়া জল বিনষ্ট হয় না বলিয়া অপৃথক্‌কল্পীয় এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, আর দার্ষ্টান্তিকে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না বলিয়া তাদৃশ বিশেষণ দেওয়া হয় নাই। দৃষ্টান্তে 'বিলয়' ও দার্ষ্টান্তিকে 'বিনাশ' পদার্থের ইহাই সার্থকতা। এইরূপে দেখা যাইবে, এই শ্রুতি হইতে ভেদাভেদ বা ভেদবাদের কোনই সম্ভাবনা নাই। এস্থলে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট

অতঃপর ১৩শ বাক্যে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—"মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবে না, ইহা বলিয়া ভগবান্ আপনি আমায় মোহ মধ্যে নিপতিত করিলেন।" তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"অরে আমি মোহোৎপাদক কথা বলিতেছি না। বিজ্ঞানলাভের জন্য ইহাই যথেষ্ট।" যথা—

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ি! অত্রৈব মা ভগবান্ অমূমুহৎ—ন
প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি ইতি। স হোবাচ—ন বা অরে অহং
মোহং ব্রবীমি, অলং বা অরে ইদং বিজ্ঞানায়" (বৃ ২।৪।১৩)

এস্থলে জীবের সর্বোপাধিবিনির্মুক্তরূপ মৃত্যু হইলে কোন সংজ্ঞা থাকে না—ইহাই আত্মবিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট বলায়, আত্মবিজ্ঞানের শেষ যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদভাব, তাহাই বলা হইল। কারণ, ভেদ সংজ্ঞাজন্যই হয়, অর্থাৎ নাম ও রূপের জন্যই হয়। নামরূপ ভিন্ন ভেদ সিদ্ধ হয় না। অতঃপর পরবর্তী বাক্যে এই অভেদের কথা অতি স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে,

১৪ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তৎ ইতরঃ ইতরং জিঘ্রতি,
তৎ ইতরঃ ইতরং পশ্যতি, তৎ ইতরঃ ইতরং শৃণোতি,
তৎ ইতরঃ ইতরং অভিবদতি তৎ ইতরঃ ইতরং মনুতে,
তৎ ইতরঃ ইতরং বিজানাতি।
যত্র বা অস্য সর্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং
জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ,
তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন
কং বিজানীয়াৎ। যেন ইদং সর্বং বিজানাতি তং
কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ।" (বৃ ২।৪।১৪)

অর্থাৎ "যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়, সেই অবস্থায় একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দেখে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে জানে। যে অবস্থায় ইহার সব আত্মাই হয়, তখন সে কাহার দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে শুনিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে চিন্তা করিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে? যাহার দ্বারা এই সব বিজ্ঞাত হয়, তাহাকে কাহার দ্বারা জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কাহার দ্বারা জানা যাইবে?" এস্থলে "ইহার সমস্ত আত্মাই হয়" ইত্যাদি বলায় সেই এক অদ্বৈতের কথাই বলা হইল।

যদি বলা যায়—"ইহার সব আত্মাই হয়" বলায় আত্মার অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ জগৎ ও জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর জগৎকে অঙ্গীর

নামেও নির্দেশ করা হয়, যেমন বৃক্ষশাখাকে বৃক্ষও বলা হয়। সুতরাং আত্মভিন্ন কিছুই থাকে না, কেবলই অদ্বৈতই হয়—এরূপ সিদ্ধান্ত এই বাক্য হইতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু একথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, 'জীবের সব আত্মাই হয়' বলায় আত্মভিন্ন কিছুই থাকিতে পারে না। জীব জগৎকে 'আমার দৃশ্য' বলে, এবং নিজেকে 'আমার আমি' বলে, এখন জীবের 'সব আত্মাই' হইলে জীবের দৃশ্য ও আমিত্ব কিছুই আর থাকে না বলিতে হইবে। আর জীবের আমি ও দৃশ্য ভিন্ন অন্য কিছুই থাকা সম্ভবপর হয় না। অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ স্থলে অঙ্গ অঙ্গী হয় না—অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধস্থলে জীবের 'সব আত্মা' হয় না—বলিতেই হইবে। সুতরাং এস্থলে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ কল্পনা অসঙ্গত। আর অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধস্থলে ব্যবহার থাকে, এস্থলে দ্বৈতবোধ স্থলে 'ইতরঃ ইতরং বিজানাতি' এবং অদ্বৈত-বোধ স্থলে 'কেন কং বিজানীয়াৎ' বলায় ক্রিয়াকারক সকলেরই নিষেধ করা হইল। সুতরাং কারকব্যবহারহেতুভূত অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ স্বীকার করিলে শ্রুত্যর্থ বিরুদ্ধ কল্পনা করা হইবে। অতএব একথারা অদ্বৈতই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা যায়—"যত্র দ্বৈতমিব ভবতি" অর্থাৎ যখন দ্বৈতের ন্যায় হয় - বলায় দ্বৈত তো স্বীকারই হইবে? নচেৎ উপমা সিদ্ধ হইবে কেন? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, মিথ্যা দ্বৈতের দ্বারাও উপমা সিদ্ধ হয়। যেমন "কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া তাহার মুখচন্দ্রমা" বলিলে কোটি চন্দ্র সত্য হয় না। অতএব মিথ্যা দ্বৈতের দ্বারা এই উপদেশ বলা যায়।

যদি বলা যায়—দ্বৈতবৎ জ্ঞান হইলে ব্যবহার হয় না, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞানেই ব্যবহার হয়। অতএব এস্থলে "দ্বৈতমিব" অর্থ "দ্বৈতই" এইরূপ করিতে হইবে। "ইব" শব্দটী এস্থলে নিরর্থক। যেমন পূর্ববর্তী ১২শ বাক্যে "উৎক্রমণাৎ ইব স্যাৎ" বাক্যে "ইব" শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যাই বলিয়াছেন "ইব-শব্দঃ অনর্থকঃ"। অতএব দ্বৈত মিথ্যা নহে, উহা সত্যই। যাহাকে কেহ দ্বৈতের ন্যায় বলিয়া জানে, সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়া জানে সে কখনই তাহাকে লইয়া ব্যবহার করে না। শুক্তিকাকে রজত বলিয়া জ্ঞান হইলে রজতের জন্য লোকে ধাবিত হয় বটে, কিন্তু সেই রজতকে রজতবৎ অর্থাৎ রজতের ন্যায় বা মিথ্যা রজত বলিয়া বুঝিলে সেই লোক কি ধাবিত হয়? অতএব এস্থলে ইব-শব্দ নিরর্থক?

কিন্তু একথাও অসঙ্গত। কারণ, এস্থলে ইব-পদের দ্বারা দ্বৈতের ন্যায় বলায় বলা হইল যে, ব্রহ্ম বা আত্মা স্বভাবতঃই অদ্বৈত, অজ্ঞানবশতঃ দ্বৈত বলিয়া বোধ হয় এবং তখনই ব্যবহার হয়। দ্বৈতবোধের সময় আর 'দ্বৈতের ন্যায় বোধ' হয় একথা বলা উদ্দেশ্য নহে। দ্বৈত-বোধের সময় সত্যই দ্বৈত—এই রূপই বোধ হয়। জ্ঞান হইলে দ্বৈত মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং ব্যবহারও রহিত হয়। যদি এস্থলে ইব-পদের দ্বারা 'দ্বৈতের ন্যায় হয়' এরূপ না বলা হইত, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম বা আত্মা সত্য সত্যই দ্বৈত হয়'—ইহাই বলা হইত। কিন্তু তাহা হইলে সেই দ্বৈতে মিথ্যা বোধ উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে না। যাহা সত্য সত্য দ্বৈত, তাহাকে মিথ্যা দ্বৈত মনে করা যায় না, তাহাকে মিথ্যা দ্বৈত মনে করাই ভ্রম। এজন্য

উক্ত-পদ দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্বই কথিত হইল। সুতরাং আত্মা দ্বৈত নহে, তাহা দ্বৈতের ন্যায় হইলেই ব্যবহার হয়—ইহাই বলা হইল। এই জন্য যাহাকে "এই সমস্ত পূর্বে আত্মাই ছিল" বলা হয়, তাহাকে অদ্বৈত উপদেশ করিতে হইলে 'যখন সেই আত্মা দ্বৈতের ন্যায় হয় তখনই ব্যবহার হয়'—এইরূপ করিয়া বলাই আবশ্যক হয়। 'আত্মা দ্বৈত হয়' বলিলে পূর্ব উপদেশের সহিত বিরোধ হইত। অতএব "দ্বৈতমিব" বলায় অদ্বৈতই উপদিষ্ট হইয়াছে, দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ এই বাক্যে শেষ হইয়াছে, অতঃপর পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যা আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে আত্মা হইতেই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইতেছে অথবা "আত্মাই এই সব" এই বিষয়টি উপপাদিত হইয়াছে। আর প্রত্যেক এই মধুব্রাহ্মণের সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

(২৭) "ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু,
যশ্চ অয়ং অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ
যশ্চ অয়ম্ অধ্যাত্মং শারীরঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ,
অয়মেব সঃ, যোঽয়ম্ আত্মা, ইদম্ অমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্বম্।" (বৃ ২।৫।১)

অর্থাৎ "এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু অর্থাৎ কার্যস্বরূপ, এই পৃথিবীর নিকট আবার সর্বভূত মধু অর্থাৎ কার্যস্বরূপ, আর এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর এই যে দেহসম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম শারীর তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এই উভয় পুরুষ যিনি—তিনি এই আত্মা, যিনি এই অমৃত, এই ব্রহ্ম এবং এই সব।"

এস্থলে "যে এই আত্মা তাহাকেই ব্রহ্ম, তাহাকেই অমৃত এবং তাহাকেই এই সব" বলায় এই আত্মা আর ব্রহ্মের অংশ এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কোন সম্ভাবনাই নাই। 'যাহা ব্রহ্ম তাহা এই আত্মা, তাহা এই সব' বলিলে একদিন সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু তাহা না বলিয়া 'যাহা এই আত্মা তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই এই সব' বলায় এই আত্মারই অংশ ব্রহ্ম এইরূপ কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর অভীষ্ট নহে, অতএব এস্থলেও অদ্বৈতবাদই বলা হইল, অন্য কোন মতবাদ বলা হইল না।

যাহা হউক এতক্ষণ বলা হইল, যাহা কিছু আমরা দৃশ্য বলিয়া মনে করি তাহা সেই আত্মা বা ব্রহ্মই। সুতরাং দৃশ্যটি ব্রহ্ম হইলে বা আত্মা হইলে তাহাদের—দৃশ্যের বা ব্রহ্মভিন্ন বা আত্মভিন্ন তাহা মিথ্যাই বলিতে হয়। কারণ, ব্রহ্ম কখন দৃশ্য হয় না। দৃশ্যের ধর্ম ও ব্রহ্মের ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত, একত্র একটিকে মিথ্যাই বলিতেই হইবে। আর ব্রহ্মকে মিথ্যা হইতে পারে না, যেহেতু ইহাই এস্থলে বিবক্ষিত হইতেছে।

যদি বলা হয়—দৃশ্য যখন প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন তাহাকে মিথ্যা বলা যায় কি করিয়া? তাহার উত্তর এই যে, প্রত্যক্ষমাত্রই সত্য হয় না, সুতরাং ইহাকে মিথ্যা প্রত্যক্ষ বলিব?

যদি বলা হয় মিথ্যা প্রত্যক্ষ পরপরে অন্যথা হইয়া যায়, ইহা তো সেরূপ হয় না? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। ইহাও প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে। তথাপি যে "সেই" বলিয়া ব্যবহার—তাহা ভ্রমমূলক ব্যবহার।

যদি বলা হয়, তবে ব্রহ্ম ও দৃশ্যমধ্যে অংশাংশিসম্বন্ধ স্বীকার করিব? কিন্তু তাহাও অসঙ্গত, কারণ, ইহাতে যে দোষ তাহা একবার প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ দৃশ্যকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে দৃশ্য ও ব্রহ্মভিন্ন বস্তু আবশ্যক হয়, আর তাহা সর্বপদবাচ্য হইতে অতিরিক্ত বলিতে হয়। কিন্তু সর্বপদার্থকে সংকোচ করা সঙ্গত হয় না। এইরূপে একপ্রকারেও সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল।

ভ্রম সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যায় (চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৪৩) "অদ্বৈতবাদ" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি অশুদ্ধ রূপ করিয়া লইতে হইবে।

পৃষ্ঠা	লাইন	সংশোধিত বাক্যাবলী
১০২	১	তাহা হইলে দেখা যাইবে ইহার সর্বত্রই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা প্রথম অধ্যায়ে….
ঐ	৭	অতএব জগৎ কারণের……
ঐ	৭	"কিছুই ছিল না" এইমাত্র বলা হইয়াছে।
ঐ	৯	বলা হইল না কেন? ইহাতে যে৷ "মৃত্যু" ও "এইসব" এই উভয়ের সত্তা স্বীকৃত হয়, আর তজ্জন্য অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না?
ঐ	১৬	কারণের অসংখ্যকতা সিদ্ধ হইলেও কারণের বহুত্ব নিবারিত হয় না।
১০৩	১	এই ব্রহ্মদ্বয়ের……
ঐ	৩	বুঝিতে হইবে অথবা জীব ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ বুঝাইবার জন্য। জীব ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইয়াও যদি ভিন্নভাবে থাকিতে পারে তবেই তাহার কর্তৃকত্বের সম্ভাবনা হয়, তবেই ঐরূপ প্রশ্নেরও সম্ভাবনা হয়।
১০৪	১১	তিনি (দেহমধ্যে) অপূর্ণভাবে থাকেন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ কার্য্য করায়…
ঐ	২৫	এস্থলে নামরূপ যোগের……
ঐ	২৮	এইসব যে মিথ্যা, যেহেতু আত্ম শব্দের দ্বারা……
ঐ	৩০	সকলের জ্ঞান হয় বলায় একেবারে……
ঐ	৩১	আত্মার যে এইসব "হওয়া" তাহা অজ্ঞানবশত "হওয়া" বলিতে হইবে…

পৃষ্ঠা	লাইন	সংযোজিত বাক্যাবলী
১০৫	২	অতএব "এইসব"……
ঐ	১১	সৎ ব্রহ্মের আশ্রিত মিথ্যা শক্তির দ্বারা এই মিথ্যা সৃষ্টি হইতে পারে। সৃষ্টি সত্য সত্য হইলে ঐরূপ প্রশ্নের সম্ভাবনা হয়, নচেৎ নহে। সৃষ্টি সত্য হইলে তাহার পরিবর্তন হইত না। সত্যের কখনও পরিবর্তন হয় না। সত্য বস্তু চির অপরিবর্তিতই থাকে। আর ধর্মের পরিবর্তন হয় কিন্তু ধর্মীর পরিবর্তন হয় না — এই কথা স্বীকার করিলেও সত্য বস্তুর পরিবর্তন এবং অপরিবর্তন উভয়ই স্বীকার করা যায় না। কারণ, ধর্ম কখনও ধর্মীকে ত্যাগ করিতে পারে না। করিলে তাহা তাহার ধর্মই নহে। তাহা তখন অপর ধর্মীর ধর্ম বলিতে হইবে। অতএব এই আপত্তি চলিতে পারে না।
১০৫	১২	শক্তি থাকিলে সৃষ্টিকার্য নিরন্তর হইতে থাকিবে, যেহেতু বাধাবাধা কারণ শক্তি অস্তমিত হয়। বস্তুতঃ এইরূপ নানা কারণে সৃষ্টিকে …
ঐ	১৪	অনিত্য বলাও হয়। যেহেতু কারণের স্বরূপই শক্তি। শক্তি কার্য্য-দৃষ্টিতে মিথ্যা আর কারণদৃষ্টিতে নিত্য।
ঐ	১৮	এই সৃষ্টি ও প্রলয় কাহারও তো অনুভবগত হয় না।
ঐ	২১	বর্ণিত হইবে। সৃষ্টিকে সত্য বলিয়া যাহারা ভ্রম করে তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য উক্ত প্রদেশের কথা বলা হইয়াছে। অতএব…
১০৬	৩	এক অদ্বৈতব্রহ্ম এবং আসলে তাহাই বুঝা গেল। আর "আমি", "এইসব" …
ঐ	১১	থাকিলে এইসব পূর্বে ব্রহ্মই ছিল, একথা আর বলা চলে না।
ঐ	১৪	"…সর্বমভবৎ" (১।৪।১০)
ঐ	২৫	তিনি কল্পনাদ্বারা এইসব হইয়াছেন।
১০৭	৬	মনঃকল্পিত বলিয়া সিদ্ধ হয়।
ঐ	১৫	সন্তান উৎপাদন করি।"
ঐ	১৬	এস্থলে অংশ বা মূল যে ব্রহ্ম থাকে তাহা একথায় বলা হইল। এস্থলে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, "অগ্রে ব্রহ্মই ছিলেন" এবং "অগ্রে আত্মাই ছিল" এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মাকে আর ব্রহ্মের অংশ বলিয়া কল্পনা করিবার অবকাশ নাই।
১০৭	২৪	• • আহারের দ্বারা এই প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত।

একথায় আত্মাকে ভিন্নতর বিদিত অথবা অনাদ বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদই সিদ্ধ হয়?

অদ্বৈতবাদ ত সিদ্ধ হয় না? তাহার পর, নাম ও রূপকে সত্যই বলা হইল? অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতই সঙ্গত? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, এইস্থলে মূল আত্ম-বস্তুর কথা বলা হইতেছে না। ইহা জগতে কার্য্যাবস্থার কথা। কার্য্যাবস্থায় নাম ও রূপ কার্য্যবস্তু অপেক্ষা সত্যই হয়। যেমন ঘটের যে নাম ও রূপ, তাহা ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও থাকা সম্ভব। আমাদের মনোমধ্যে তাহাদের নাম ও রূপ ঘটভঙ্গের পরও থাকে। এজন্য ঘট অপেক্ষা ঘটের নাম ও রূপকে সত্য বলা হইল। ইহা সমগ্র জগতের বিষয়ে কথিত হয় নাই। সে কথা ছান্দোগ্যে "বাচারম্ভণং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বাক্যে কথিত হইয়াছে। তাহার পর নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া অস্তগমনের কথা প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদে আছে। অতএব এই নামরূপের সত্যতা কখনও কখনও দেখিয়া জগৎকে সত্য বলা সঙ্গত নহে।

অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণে দেখা যায়—

৮। অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, যদা ন কস্যচন বেদ, হিতানাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে, স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বা অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য গত্বা শয়ীত এবমেব এষ এতচ্ছেতে।" (বৃ ২।১।১৯)।

অর্থাৎ "যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয়, এবং কোন বিষয়ই জানিতে পারেনা, তখন হিতানামক যে ৭২০০০ হাজার নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া পুরীতত অর্থাৎ হৃদয়বেষ্টন অভিমুখে প্রস্থিত হয়। তাহাদের দ্বারা বিসৃপ্ত হইয়া, হৃদয় বেষ্টনে শয়ন করে। সে যেন কুমার বা মহারাজা, বা মহাব্রাহ্মণ, আনন্দের উৎকর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, এইরূপে শয়ন করিয়া থাকে।"

এইবার সুষুপ্তপুরুষোপলক্ষিত আত্মার পরিচয় বলা হইতেছে—

স যথা ঊর্ণনাভিঃ তন্তুনা উচ্চরেৎ যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি, তস্য উপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্ ইতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্"। (বৃ ২।১।২০)

অর্থাৎ "যেমন ঊর্ণনাভি তন্তুদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করে, যেমন অগ্নির ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ নানাদিকে নির্গত হয়, এইরূপই এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ, সমুদায় লোক, সমুদায় দেবগণ, সমুদায় ভূতগণ নির্গত হয়। সেই আত্মার উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্য এই সত্যের সত্য। প্রাণই সত্য, আর তাহার সত্য এই আত্মা"। অর্থাৎ সকল সত্যের সত্য এই আত্মা।

এতদ্দ্বারা জানা যায় এক আত্মা হইতে সমুদায় পদার্থের উৎপত্তি, এবং এই আত্মাই যথার্থ একমাত্র সত্য। অন্য সকল পদার্থ আত্মার ন্যায় সত্য নহে, সুতরাং ব্যাবহারিক সত্য অর্থাৎ মিথ্যা। এখানে ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্তদ্বারা এই জগৎ আত্মকর্ত্তৃক ও আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং আত্মাতেই লয় হয় বলা হইল। কিন্তু ঊর্ণনাভি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা

কেবল একই তত্ত্ব, একক অগ্নির দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই আত্মা হইতে যে নানাবস্তু উৎপন্ন হয় তাহাই বলা হইল। সুতরাং মূলে যে এক অদ্বৈত তাহা বুঝা গেল।

তাহার পর আত্মা চেতন ও জ্ঞানস্বরূপ বস্তু, তাহা হইতে ত জড়বস্তু উৎপন্ন হইতে পারেনা, এজন্য এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তু হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা ভ্রমরূপ অজ্ঞানমূলক বস্তুই হয়। আর এই অজ্ঞান আত্মারূপ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অজ্ঞান কখনই অজ্ঞান বা জড়কে আশ্রয় করে না, এজন্য এই উৎপন্ন জগৎ আত্মাতে কল্পিত—ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—আত্মাশ্রিত অজ্ঞান হইতে যদি এই সব উৎপন্ন বা কল্পিত হয়, তবে অজ্ঞানেরও ত সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, এই সবের ত সত্তা রহিয়াছে? অতএব অদ্বৈত সিদ্ধ হয় কি করিয়া? অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতই ত সিদ্ধ হয়?

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, অজ্ঞান সর্বদাই জ্ঞাননাশ্য। অন্য কোন উপায়ে অজ্ঞান নাশ পায় না। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানরূপ রজ্জুবিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা রজ্জুজ্ঞানে নাশ প্রাপ্ত হয়। এখন আত্মাশ্রিত অজ্ঞানবশে আত্মা হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি এই সমস্ত উৎপন্ন হইলে আত্মার জ্ঞানেই এই অজ্ঞান নাশ পাইবে। এজন্য অজ্ঞানের সত্তা আর তখন আত্মাতে থাকিতে পারিবে না। এখন যে বস্তুর সত্তা এক কালে আত্মাতে থাকে এবং এক কালে আত্মাতে থাকে না, তাহাকে আত্মাতে থাকে কি করিয়া বলা যায়? ইহার মত কোন দৃষ্টান্ত নাই বলিয়া ইহাকে অনির্বচনীয়ই বলিতে হয়। আর জগতে যে সত্তাবোধ তাহা আত্মার সত্তারই বোধ, অনাত্মার সত্তার বোধ নহে। অতএব ইহার সত্তা স্বীকার করা সঙ্গত হয়না।

আর যদি বলা যায়—অজ্ঞানবশতঃ আত্মা হইতে এই সবের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু আত্মার শক্তিবশতঃ ইহারা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে বলিব—আত্মার সর্বাংশে বিকার বা একদেশ বিকৃতি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, শক্তি ত আত্মা হইতে পৃথক্ থাকিতে পারেনা, এজন্য শক্তির বিকার স্বীকার করিয়া আত্মাকে অবিকৃত বলা চলে না। অতএব অজ্ঞানবশতঃই আত্মা হইতে এই সবের উৎপত্তি হয়—ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

পৃষ্ঠা	লাইন	সংশোধিত বাক্যাবলী
১০৭	২৫	…এই জগৎ হয় বলিব? না, তাহাও নহে। কারণ, তাহা হইলে শ্রুতির কথাই অযথার্থ করা হইল?
ঐ	২৭	এই সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।
১০৮	১	(১০) "অথাতঃ আদেশো নেতি নেতি, ন হি এতস্মাৎ ইতি, নেতি অন্যৎ পরং অস্তি……। (বৃ ২।৩।৬)
ঐ	৭	কারণ, প্রাণাদির সত্তা,……

পৃষ্ঠা	লাইন	সংশোধিত বাক্যাবলী
১০৭	৯	আর যাহা অন্য সত্তাতে তাহা সেই বস্তুর…
ঐ	১০	যদি বলা হয় "ইহা নহে"…
ঐ	১১	…সত্তা থাকিতে পারে ? অতএব দ্বৈতবাদাদিই সিদ্ধ হয় ?
ঐ	১৪	অজাতশত্রু
১০৮	১৭	…না হইলে আর "ইহা" বলা যায় না।
ঐ	১৮	আর তৃতীয় বাক্যে অপূর্ব পরিচয়ে বলিয়াছেন —
১০৯,	৯	…ব্রহ্ম হইতে পারেন না। সুতরাং ইহাতে অদ্বৈতের ব্যাঘাত হইতে পারে না।
ঐ	১১	…প্রথম বাক্য নহে, তাহা যে বাক্যে আরম্ভ করিলেন সেই বাক্য। অতএব…
ঐ	১২	তৃতীয় ব্রাহ্মণের শেষ বাক্য……

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য

(২)

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতাবলী পাঠ করিয়া সাধারণভাবে মনে হইয়াছে যে একজনের বক্তৃতা যেন তুলসীর মালা, আর একজনের পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ—একজনের তূর্যনিনাদ আর একজনের শঙ্খধ্বনি—একজনের উচ্ছ্বসিত সাগর তরঙ্গ, আর একজনের নিস্তরঙ্গ গঙ্গা, একজন প্রাণ, আর একজন প্রাণায়াম, একজন সঞ্জীবন-মন্ত্র, আর একজন উদ্বোধিত জ্ঞান চৈতন্য। একজনের বক্তৃতা বিস্ময় ও কৌতূহল জাগ্রত করে, আর একজনের বক্তৃতা পাঠকালে পদে পদে জিজ্ঞাসাকে বরণ করিতে হয়। একজন প্রাণের পথে বিচারক মনকে জয় করেন, আর একজন অগ্রে মনকে জয় করিয়া তাহার পর প্রাণ স্পর্শ করেন। বক্তৃতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উভয়েরই এক—ধর্ম-প্রতিষ্ঠা সার্বভৌম মানবধর্মের প্রচার, ব্যাখ্যা, ও তত্ত্ব এবং প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে সেই ধর্মকে কাজে লাগাইবার কৌশল নির্দেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর উভয়েরই আদর্শ এবং তাঁহার অনন্ত ভাবরাশি, যিনি তাঁহার ছন্দে যাহারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রকাশের ভঙ্গী দুইজনের দুই রকম। আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহা বলিলাম। অপরের ধারণা হয়ত অন্যরূপ হইতে পারে।

স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতাবলী পাঠকালে মনে হয়, দর্শন ও বিজ্ঞান তাহাদের স্বাভাবিক জটিলতা ত্যাগ করিয়া লঘু হইয়াছে বটে কিন্তু গাম্ভীর্য লঘু হয় নাই এবং ঐতিহ্য তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া বক্তৃতাটিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং কখন কখন বক্তৃতাটী একবার মাত্র শুনিয়াই শ্রোতার পক্ষে সকল ভাব গ্রহণ করা সম্ভবপর হইত না বলিয়াই আমেরিকান শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে অনেকগুলি বক্তৃতা দ্বিতীয় বারেও বটেই, কোন কোন সময়ে মহারাজের তৃতীয় ও চতুর্থ বারও দিতে হইয়াছে। তিন চারিবার একটি বক্তৃতা শুনিয়া তবে শ্রোতার সংশয় দূর হইয়াছে, তাহারা বক্তার বাণী এমনি ভাবেই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে যে তাহাদের হৃদয়ের সেই ভাব পাথরের রেখার মত হইয়া গিয়াছে। (১)

Their (Subjects of his recent lectures) *popularity* is attested by the repetition of a number of them by request.—New York Tribune, March 6th, 1898.

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আমেরিকায় প্রথম হইতে বাসের প্রবাসের ধারাবাহিক কাহিনী রচনা করিবার মত উপাদানই এখনও সংগৃহীত প্রকাশিত হয় নাই, আমেরিকায় তাঁহার পঁচিশ বৎসর প্রবাসের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ কাহিনী রচনা করিবার উপাদান ত' দূরের কথা। উপরে যাহা লেখা হইল অনেক কিছু আছে। কিন্তু 'বিশ্ববাণীর' স্থান সঙ্কুলান করিবার পক্ষে সেগুলি প্রকাশ করিতে যে বহু বৎসর প্রয়োজন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বর্তমান কর্তৃপক্ষগণ মহারাজের অমুদ্রিত বক্তৃতাগুলি যথাসাধ্য প্রকাশ করিবার চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, জীবনকাহিনী রচনার দিকে এখনও মনোযোগ দিতে পারেন নাই।* আমার মনে হয় জীবনকাহিনীর প্রয়োজনীয়তাই সর্বাগ্রে, বক্তৃতাবলীর প্রয়োজন তাহার পর। অবশ্য যুগপৎ দুইদিকে মনোযোগ দিতে পারিলেই যে ভাল হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। "আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ" ইতি শীর্ষক বর্তমান প্রবন্ধে

(১) Considering the importance and newness of the subjects of teaching to the majority of them, several of his (Swami Abhedananda's) lectures were by special request repeated even a third and fourth time, in *order to enable* them to have a clear comprehension of the principles involved—The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati—1915) Vol. III, Page 348.

* মঠের লেখকের উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে চাই যে বেলুড় মঠ পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের জীবন কাহিনী রচনার জন্য অমনোযোগী নহে, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (সম্পাদক—বিশ্ববাণী)।

মহারাজের অলৌকিক কীর্তিকাহিনীর সামান্য একটু আভাস মাত্রই দিতে পারিয়াছি। যে ভাগ্যবান ঐতিহাসিক ভবিষ্যতে তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা লিখিবেন, এই কয়েকটী প্রবন্ধ হয়ত তাঁহার কিছু কাজে আসিতে পারে।

একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহারাজের বক্তৃতায় বেশীর ভাগ "intelligent persons"ই (বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গই) আকৃষ্ট হইতেন। ইঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। (To an occasional *attendent*, *the growth* of interest is unmistakable in steadily increasing audiences of intelligent persons, many of them members of orthodox churches with a representation of well-known persons in public life) (২) মহারাজের নিউইয়র্কে আগমনের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা এইরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপই লোকাচার যে, শ্রেষ্ঠে যাহা করেন, নিকৃষ্ট তাহারই অনুবর্ত্তন করে মাত্র। মার্কিনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যখন মহারাজের প্রতিপত্তি এইরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন তুলনায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ যে তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রেষ্ঠের মন যখন তিনি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তখন অন্যের মনেও যে তাঁহার বাণী অক্ষয় হইয়া মুদ্রিত হইতেছিল, তাহা বলিতে বাধা থাকেনা। সুতরাং পঁচিশ বৎসর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বেদান্তের বাণী নানা ভাবে শুনাইয়া তিনিই যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমেরিকায় বেদান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর তাই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' লিখিত হইয়াছিল—"*It is mainly due to his untiring efforts that the Vedanta Philosophy has secured a permanent foot-hold in the West.*" (৩) (স্বামী অভেদানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই পাশ্চাত্যে বেদান্ত-দর্শনের চিরপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।) 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' লিখিয়াছিলেন—And the position that the Ramkrishna Mission had attained in the States was not a little due to the Pioneer work of Swami Abhedananda. (৪) (যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ষ্টেটে রামকৃষ্ণ মিশন যে গৌরবোজ্জ্বল আসন পাইয়াছেন, স্বামী অভেদানন্দের প্রাথমিক প্রচার-কার্য্য সে গৌরব লাভে কম সহায় ছিল না।)

স্বামীজির জীবন-চরিতে দেখিতে পাই—গ্রীষ্মকালে বহু স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা করিবার ফলে বেদান্তের শিক্ষা এক স্থান হইতে অন্য দূর স্থানে এবং তথা হইতে দূরান্তরে সম্প্রসারিত হইবার সুবিধা স্বামী অভেদানন্দই করিয়াছিলেন। (These summer

(২) The New York Tribune, March 6th, 1898.

(৩) The Amrita Bazar Patrika (Town)—10.9.39.

(৪) The Hindusthan Standard (Town)—9.9.39.

terms...played an important part in disseminating the Vedanta teachigns in widely separated sections of the Country) (৫) ১৮৯৮-৯৯ সালের শীতকালে স্বামী অভেদানন্দ দুই হাজার মাইলেরও অধিক ভ্রমণ করিয়া নানা স্থানে শত শত ব্যক্তির নিকট (spoke to several thousands of people) বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খুব উচ্চশিক্ষিত এবং নানা বিষয়-কর্মে স্বপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া সুপরিচিত। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষা বিস্তারকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং কেহ বা ধর্মপ্রচারে ব্রতী ছিলেন। (During these travels of 2000 miles or more, the Swami met and spoke to several thousands of people, many of whom were *highly educated, prominent in the professions, or engaged in higher education and in religious work*) (৬)।

নিউইয়র্কে আসিবার পর মাসের মধ্যেই স্বামী অভেদানন্দের সুখ্যাতি এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে, বহু স্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি সর্বদা আহূত হইতেন। কলম্বিয়া কলেজের সংস্কৃত ক্লাসে, নিউইয়র্কের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক ও সাহিত্যিক ক্লাব আর্টস্ ক্লাবে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উইমেন্সের প্রফেশনাল লীগে দুই দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন না—একাদিক্রমে আরও কতকগুলি বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। স্বভাবতঃই স্বামীজী সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। উহার পরই ব্রুকলীন নারী-সমাজের সুবিখ্যাত ক্লাব নর্থ সোসাইটিতে তাঁহার বক্তৃতা হয়। পরদিনই আবার প্রকাশ্যে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইল। এই ভাবে প্রতিদিনের পর প্রতিদিন তাঁহাকে অনবরত বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

বেদান্ত সোসাইটিতে যে দিন তিনি বক্তৃতা করেন সে দিন প্রায় সকল বেদান্তের প্রসিদ্ধ বহু অধ্যাপক ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এবং নানা চার্চের পাদ্রীগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। এই সময়েই জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন, প্রসিদ্ধবক্তা রবার্ট ইঙ্গারসল, প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী উইলিয়ম ডিন্ হাউএল্স্, কার্নেল ফাইজুন্যা, ইয়েল এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণ্ডলীর সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়।

On Easter Sunday, the Swami Abhedananda initiated four Bramhacharinis. During the summer he left New York to visit Worcester, Boston, Cambridge and other New England points and met many able and

(৫) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati, 1915), Vol III, page 352.

(৬) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915)—Vol IV, page 331.

influential persons. Among others were, Mr, Edison, the great inventor, Joseph Jefferson, the famous actor ; William Dean Howells, the novelist, and professors in Cornell Iowa, Yale and other Universities. Before leaving New York the Swami had addressed the Sanskrit classes in Columbia College of the City, and also one of the best social and literary clubs—Barnard—giving each an account of the religious ideas of the Hindus. The citizens of Worcester after hearing him twice, urged him to give a course of lectures. This was not possible owing to engagements elsewhere. On April 25th, he lectured on the Vedanta Philosophy before North Shore Club at Lyner, a club composed of cultured women···The next day he spoke in Waltham at the Psychomath,···On 27th he lectured in Cambridge before the Episcopal Theological School, the audience being students who were preparing to become ministers in churches. On April, 30th, before the Cambridge Conference he spoke on the Religious Ideas in Ancient India. Professor William James and other eminent scholars of Cambridge as well as ministers of churches were among the audience. He gave many other lectures in the vicinity of Boston throughout May. These summer tours of the Swami played an important part in disseminating the Vedanta teachings in widely separated section of the country (৭)।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে একটা শীতাবকাশেই স্বামী অভেদানন্দ মার্কিনের অংশবিশেষের জনসমাজে ভারতের ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাত্র দশ মাস ইংলণ্ডের লণ্ডন সহরে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পর সর্বপ্রথম তথায় নিজের গৌরব মণ্ডিত আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (৮), মাত্র একটি শীতাবকাশেই তিনি ভারতের ভাবধারাকে বিদ্যোৎসাহীদিগের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন—অতীত পঁচিশ বৎসরে তিনি যে আরও কত কি করিয়াছিলেন সে কাহিনী বর্ণনা করিয়া যশস্বী হইবার সৌভাগ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেখিলেন

(৭) The Life of the Swami Vivekananda (Mayavati 1915)—Vol. III pp. 551-552.

(৮) ঐ, Vol. III p. 60

সোসাইটির কাজ দ্রুতবেগে চলিতেছে এবং সোসাইটির নিজস্ব একটি গৃহ হইয়াছে তখন অত্যন্ত প্রীত হইয়া স্বামী অভেদানন্দকে বলিয়াছিলেন—আমি তিনবার নিউইয়র্কের দ্বারে করাঘাত করিয়াছি, কিন্তু নিউইয়র্ক সাড়া দেয় নাই। তুমি যে সোসাইটির একটি স্থায়ী বাড়ী করিতে পারিয়াছ তাহা দেখিয়া আমি খুবই খুসি হইলাম। নিউইয়র্কে আমি এই প্রথমবার আমাদের একটি স্থায়ী কেন্দ্র দেখিলাম।

(Thrice I knocked at the door of New York but it did not respond, I am glad that you have established its permanent headquarters. This is the first time I have found ou own house at New York. (৯)

গুরু ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের এই রূপ স্বীকৃতি তাঁহার প্রায় সমস্তকেরই উপযুক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের Miss Waldo ছিলেন, সেভিয়র দম্পতি ছিলেন, মিসেস্ ওলিবুল্ ছিলেন, মিস মুলার ছিলেন—এমনি আরও অনেক ছিলেন, স্বামীজির একটিমাত্র ইঙ্গিত পাইলেই যাঁহারা নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটীর জন্য একখানি বাড়ী কিনিবার জন্য টাকা দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—বরং আনন্দিতই হইতেন। স্বামী অভেদানন্দ যে সোসাইটীর নিজস্ব একটি আবাসগৃহ স্থাপন করিয়াছিলেন—স্বামীজির এই স্বীকৃতিই—এই কারণেই অধিক শ্রেষ্ঠ। তিনি বলিতেও দেখিলেন—সহাস্যে বলিলেন—আমি তিনবার চেষ্টা করিয়া নিউইয়র্কে সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই। তুমি যে তাহাই পারিয়াছ ইহাতেই আমি খুব খুসি। শিষ্যের এই পরাজয় স্বীকারই স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহের নিদর্শন। পিতা যেমন পুত্রের নিকট পরাজিত হইলে আনন্দলাভ করে—গুরু যেমন শিষ্যের নিকটে পরাজিত হইলে মনে করে এই পরাজয়ই আমার জয়—স্বামী বিবেকানন্দের এই পরাজয়ের আনন্দ ও গৌরবও ছিল তদ্রূপ। তাই তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন—তোমাকে আরও দশ বছর এইখানেই থাকিয়া কাজ করিতে হইবে, ভারতে প্রত্যাবর্তন করা হইবে না। আর কর্মপন্থায় সে তো তোমার উপরই ছাড়িয়া দিয়াছি। তোমাকে আর উপদেশ দিব কি? তোমার যেমন অভিরুচি তেমনি, করিয়া কাজ চালাও। (১০)

স্বামী অভেদানন্দই যে প্রকৃত প্রস্তাবে নিউ ইয়র্ক-বেদান্ত সোসাইটীর এবং আমেরিকার বেদান্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা—ইহার পরও যদি কাহারও তাহাতে সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাকে নিম্নে প্রদত্ত মানপত্রখানি আমরা বার বার পাঠ করিতে বলি। অক্লান্তকর্মী স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় সুদীর্ঘ দশবৎসর কাল বেদান্ত ধর্ম প্রচার করিয়া ১৯০৬ সালের ১৬ই মে কিছুদিনের জন্য ভারতে আগমন করেন। সে সময়ে বেদান্ত সোসাইটির সমস্ত

(৯) কালী তপস্বী—ব্রহ্মচারী শাশ্বতচৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত।

(১০) Swami Abhedananda, Lectures and Addresses in India, Vol. I.

সংখ্যা ছিল ১৬০০। ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে পদস্থ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

স্বামী অভেদানন্দের ভারতাগমন উপলক্ষে ইঁহারা বস্তোনার গারফোবাডের ও মহারাণীর উপস্থিতিতে একটি সভায় মিলিত হইয়া মহারাজকে যে মানপত্র দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন—"…নয় বৎসর ধরিয়া আপনি আমাদের মধ্যে অবিশ্রান্ত কর্ম করিয়াছেন এবং তজ্জন্যকে নানা কষ্ট, বাধা এমনকি শত্রুতারও সম্মুখীন হইয়াছেন! কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আপনি নির্ভীকভাবে আপনার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। **আপনি যখন নিউইয়র্কে আগমন করেন তখন মাত্র কয়েকজন আগ্রহশীল ছাত্র পাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের চতুর্দ্দিকে যে সকল ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে আগ্রহের সঙ্গে সমবেত হইয়াছিলেন, এই ছাত্র কয়েকটী তাঁহাদিগেরই দলের কয়েকজন মাত্র। ইঁহাদিগকে লইয়াই আপনি কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন।**

"কাহারও নিকট সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া আপনি আপনার সন্ন্যাসীজনোচিত হৃদয়ের বলে এবং আপনার অলৌকিক বিদ্যা, ধৈর্য্য, স্বেচ্ছাবিধিতা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া (যাহা প্রতিপদে আপনার কর্মকুশলতা প্রকাশ করিয়াছে) এই বাণিজ্যনগরীতে বেদান্ত সোসাইটীর সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করিয়াছেন এবং আজিকার এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকখানি প্রস্তর আপন হস্তে বিন্যাস করিয়াছেন। যাহারা নিউইয়র্কের ভাব জানেন শুধু তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কত বৃহৎ বাধাই না ছিল আপনার পথে এবং কতই না বৃহৎ হইয়াছে আপনার সাফল্য।……"

"পূর্ব্বাপর আপনি ছিলেন আমাদের চিরপ্রিয় গুরু এবং আচার্য্য। আমাদিগের মধ্যে অনেকে—যাহারা দুর্ব্বল দেহ ও কলুষিত মন (ill in body and mind) লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছিল, আজ তাহারা দেহে সবল হইয়াছে এবং তাহাদের হৃদয় নবজীবনের আশায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুঃখে ও হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাহারা একদিন ভগ্ন দেহে আপনার নিকট সঙ্কুচিত ভাবে আসিয়াছিল, আজ তাহাদের নয়ন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়াছে। আজ তাহারা উন্নতশিরে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছে। আপনার কাছে কাহারও আগমনই বৃথা হয় নাই। আপনি প্রত্যেকের অন্তরই আশায় পূর্ণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ হৃদয়ে শক্তি ও আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিয়াছে।" (১১)

(১১) Swami Abhedananda, Lectures and Addresses in India—Vol. I.

শ্রীশ্রীমা

শ্রীনীলকণ্ঠ চক্রবর্তী

ভারতের মৃত্তিকা যুগে যুগে অলৌকিক দিব্যশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ এবং মহীয়সী নারীগণের পদরজঃ বুকে ধারণ করিয়া মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ইহাদেরই জন্ম স্পর্শ করিয়া ভারতের বায়ু নিঃশ্বাসের জন্য পবিত্র হইয়াছে—তাই ভারতের ইতিহাস ইহাদেরই ইতিহাস, এবং আমরাও এই ভারতের কোলে জন্মিয়া ধন্য হইয়াছি। সীতা, সাবিত্রীর দেশ এই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া ইহারা যুগে যুগে মহাপুরুষগণের জীবনে প্রবল প্রেরণার সৃজন করিয়াছেন,—ইহাদের সমগ্র শক্তি, অসীম ধৈর্য, অপার স্নেহ করুণা, এবং অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন অবতারপুরুষগণের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে,—তাঁহারা মহামায়ার অংশসম্ভূতা জীবন্ত মাতৃ-শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। হিন্দুর পরম আদর্শ শিব দুর্গা দাম্পত্য প্রেমের কী অপূর্ব পরিকল্পনা। তৎপরবর্তী যুগের বশিষ্ঠ অরুন্ধতী, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী, রাম-সীতা, শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়া সকলই একই ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ।

আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার বুক আলো করিয়া যে দিব্যশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার অসাধারণ তপস্যালব্ধ গভীর সত্যানুভূতি সমগ্র জগতের চিন্তাধারায় এক বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার শক্তিবলে ভারতের যুগে যুগে সাধন প্রসূত সনাতন ধর্মের জয় ঘোষণা সুদূর পাশ্চাত্য ভূমিতেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—তাঁহার জীবনেও সেই একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

বর্তমান প্রবন্ধে যে মহামহিমময়ী নারীর দেবজীবনের সামান্য একটু আভাস আমরা প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি সেই মহীয়সী নারী যেভাবে সকল চক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে থাকিয়া নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আকাঙ্ক্ষা বাসনা এমনকি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত নিঃশেষে লোপ করিয়া অন্তর্নিহিত অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া বাহ্য দৃষ্টিতে অতি সাধারণ মূর্তিতে প্রকাশিতা থাকিয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের পূর্ণ সহধর্মিণীরূপে লীলা করিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক অপূর্ব ঘটনা।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী নামক এক অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে সারদামণি দেবীর জন্ম হয়। তিনি যে কুল উজ্জ্বল করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন তাহা আদৌ সম্পন্ন ছিল না। ছায়ানিবিড় এই ক্ষুদ্র গ্রামে সারদামণি দেবীর শৈশব, যৌবন, এবং বার্ধক্যের অনেকটা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই মহাদেবীর সহিত একদিন কত খেলাই না খেলিয়াছে, কত

অন্তর আশ্রয়ের পাদপ পাইয়াছে, আবার তাঁহার অহেতুক মাতৃ স্নেহ-যত্ন, অভয় আশ্বাস পাইয়া ধন্য হইয়াছে। কত সুকৃতি, কত শুভ প্রাক্তনের ফলে এ পরম সৌভাগ্য যে তাঁহাদের হইয়াছিল তাহা তাহারা কখন ধারণাই করিতে পারে নাই। মায়ার আবরণে সকলকে ভুলাইয়া অতি সংগোপনেই সেই দেবী লীলাসংবরণ করিতে প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু অগ্নির দাহিকা শক্তি অধিকক্ষণ লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। তাই দেখিতে পাই নিতান্ত গুপ্তভাবে জীবন কাটাইয়া গেলেও সারদামণি দেবীর দিব্য-জীবনের কথা আজ শতসহস্র নর নারীর ধ্যানের বস্তু হইয়াছে। তাঁহার পুণ্য জীবনের সামান্য একটা ঘটনারও অনুধ্যান করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

অতি শৈশবেই সারদামণি দেবীর কামারপুকুর গ্রামের গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। যুবক গদাধর তখনও শ্রীরামকৃষ্ণরূপে পরিচিত হন নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে দীনহীন নগণ্য পূজারীর বেশে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে সাধনার প্রবল স্রোতে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার ব্যাকুল অন্তরের সেই তীব্র গগনভেদী "মা, মা", ঐ ভাগীরথীর কূলে কূলে প্রতিধ্বনি তুলিতেছে। আবার বিষয়নিবদ্ধদৃষ্টি সংসারী মানব সেই তীব্র ব্যাকুল সাধনা স্রোতের গতি-প্রগতি কিছুমাত্র নির্দ্ধারিত করিতে না পারিয়া, "ছোট ভট্টচায্ পাগল হইয়াছে", বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ক্রমে সেই জনশ্রুতি সুদূর কামারপুকুরে ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রা দেবীর নিকটেও পৌছিল। তিনি মনে ভাবিলেন বিবাহ দিয়া পুত্রের মন সংসারের দিকে ফিরাইতে পারিলে তাহার ঐ বিজাতীয় ভাবান্তর উপশমিত হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় বালক স্বভাব গদাধর কিন্তু বিবাহ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, বরং উপযাচক হইয়া বলিলেন, "জয়রাম বাটিতে পাত্রী কুটা-বাঁধা রহিয়াছে, অন্যত্র অন্বেষণ নিরর্থক।" এইরূপে বর্ত্তমান যুগ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে এবং ভোগলিপ্ত লক্ষ আধুনিক নরনারীর সম্মুখে দাম্পত্য জীবনের অত্যুচ্চ পবিত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে নরবিগ্রহ-ধারী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা অতি শৈশবেই ঠাকুরের সহিত মিলিতা হইলেন।

বিবাহের পরেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আবার কঠোর সাধনায় নিয়োজিত হইলেন। সাধনার উত্তাল প্রবাহ পুনর্ব্বার তাঁহাকে একবারে জগৎ, সংসার—এমনকি দেহজ্ঞান পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিল এবং তিনি ধীরে ধীরে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিলেন। ওদিকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থা হইবার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সকাশে থাকিয়া তাঁহাকে সেবা ও পরিচর্য্যা করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ায় বহু কষ্টে বহু শ্রম স্বীকার করিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌছিলেন। এই সময় হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের হস্তে মায়ের জীবনের সর্ব্ববিধ শিক্ষার সূত্রপাত হইল, এবং দ্বাদশ বৎসর কালের শেষে সেই শিক্ষা সব দিক দিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিল। একদিকে সাংসারিক জীবনের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া ঠাকুর

তাঁহাকে যেমন আদর্শ গৃহিণীস্থানীয়া করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—অন্যদিকে আবার দৈবী সাধনার গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য সমূহেরও সহিত পরিচিত করাইয়া গভীর আধ্যাত্মিকতার অধিকারিণী করিয়া তাঁহাকে মাতৃত্বের সুউচ্চ পদবীতে আরূঢ় করাইয়াছিলেন।

বিবাহের পর মায়ের চতুর্দশ বৎসর বয়সে যখন কামারপুকুরে প্রথম স্বামি সন্দর্শন হয় তখন পবিত্রা বালিকা দেবমূর্তিবিনিন্দিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদর যত্ন লাভে—অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। ঐ সময়ের কথা প্রসঙ্গে মা উত্তরকালে বলিয়াছিলেন, "হৃদয় মধ্যে একটী পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, সর্বদা অনুভব করিতাম। আনন্দে অন্তর নিরন্তর পূর্ণ থাকিত।"

লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে অতি পবিত্র নহবৎ ঘরে অবস্থান করিয়া যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা এবং ভক্তগণের আহার্য্য প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করতঃ ধ্যান ধারণায় কাটাইয়াছেন—তাহা এক অপূর্ব্ব কাহিনী। রাত্রি তিনটায় উঠিয়া সারাদিন জপ ও সাধনার স্রোতে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। ও জ্যোৎস্নাময়ী চন্দ্রের পানে চাহিয়া ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইতেন, "ঠাকুর, চাঁদের মধ্যেও কলঙ্ক আছে, আমার অন্তরে যেন কোন কলঙ্ক রেখ না।" মায়ের এই প্রার্থনা যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল তাঁহার সমগ্র জীবনখানিই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেই—শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে মা একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আচ্ছা তোমার কি মনে হয় বল দেখি?" ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে বরাভয়করা মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন, যিনি জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে জীব ও জড়জগতের অন্তরে বাহিরে নিত্য অধিষ্ঠিতা আছেন, যিনি গর্ভধারিণী-রূপে সম্প্রতি নহবৎখানায় অবস্থান করিতেছেন—তাঁহারই প্রকাশ তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

তখন হইতে মায়ের চলন, বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর একটী পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল। মা যেন তখন হইতেই চপলা না হইয়া শান্তস্বভাবা, প্রগল্ভা না হইয়া চিন্তাশীলা, স্বার্থ-দৃষ্টিনিবদ্ধা না হইয়া নিঃস্বার্থপ্রেমিকা মানব সাধারণের দুঃখ কষ্টের সহিত অনন্ত সহবেদনাসম্পন্না এবং করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত হইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৭৮ সালে অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতীর বয়সে দেবতুল্য স্বামী সম্বন্ধে নানা জল্পনা কর্ণে পৌঁছানয় তিনি নিজ পিতার সহিত পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর আগমন করেন এবং দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের নিকট সাধনরতা ও সেবাপরায়ণারূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময় এমন একটি অপার্থিব ঘটনার সংঘটন হইল,—যাহা জগৎ কোনদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছে কিনা জানিনা। ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শী পূজা।

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালিকা পূজার পুণ্য দিবসে ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং সমাধিস্থ পূজক ও

ষোড়শী দেবী আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন। অনন্তর অর্দ্ধ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, "হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনী, শিবগেহিনী গৌরি, হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম।" পূজা শেষ হইল, মূর্ত্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনা পূর্ব্বক শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বসাধনার পরিসমাপ্তি করিলেন এবং তাঁহার দেবমানবত্ব সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর গলরোগে পীড়িত হইয়া যখন শ্যামপুকুর এবং কাশীপুরে তাঁহার শেষ জীবন কাটাইতে লাগিলেন, তখন অপূর্ব্ব লজ্জাশীলা মাতাঠাকুরাণী অপরিচিত পুরুষ সকলের মধ্যে, সকল প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়াও সেবাবিগ্রহরূপে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তারপর ঠাকুরের দেহত্যাগ হইলে, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী জীবনের অবশিষ্ট কাল একপ্রকার 'এয়ো' ভাবেই যাপন করিয়াছেন।

দুঃখতাপ প্রপীড়িত বসুধার সন্তাপ হরণ করিবার জন্যই তিনি অশেষ করুণায় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, অন্তরের সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিয়া জীবের সহিত নিতান্ত দীনভাবে অতিবাহিত করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে পরমানন্দের সুনিশ্চিত পথ প্রদর্শন করিতেই নরবিগ্রহে যাঁহার পৃথিবীতে আগমন তাঁহার জীবনের পক্ষে দুঃখ বেদনার করুণ ইতিহাস নূতন নহে, আশ্চর্য্যও নহে।

শ্রীশ্রীমায়ের একমাত্র অবলম্বন ঠাকুর স্থূল দেহে লীলা সম্বরণ করায় ঠাকুরের ইচ্ছাতেই তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্যের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য মাতাঠাকুরাণী শরীরের উপর মন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে মা বলিয়াছেন, "ঠাকুরের কাজ এখনও অনেক বাকি আছে, উহা আমাকে দিয়েই করাবেন। ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখ্‌তেন, সেই মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।"

জগৎ কারণকে 'মা' বলিয়া ডাকা এবং সর্ব্বভূতে সেই মাতৃরূপিণীকে দেখা এই যুগের বিশিষ্ট আদর্শ ঠাকুর নিজে স্বীয় দিব্য জীবনে দেখাইয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের জন্য মাতৃভাব চিন্তা করিতে হইলে এমন একটি মাতৃমূর্ত্তির প্রয়োজন, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সংসারী মানব পাপতাপপূর্ণ সংসারের সকল জ্বালা নিঃশেষে ভুলিতে পারে। তাই বোধহয় ঠাকুর এবার শ্রীমাকে সেই আদর্শ মাতৃমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাকে সংসারে রাখিয়া অপ্রকট হইলেন।

নিরাশার বাণী কোন দিনও মায়ের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া কেহ শুনিতে পায় নাই। স্বামীবিয়োগবিধুরা বিধবা, পুত্র শোকাকুলা জননী, দুঃখভারপীড়িত গৃহী, বৈরাগ্য-যুক্ত সন্ন্যাসী আরও কত শত শত ব্যথিত নরনারী করুণার ঘনীভূতা প্রতিমা শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সমভাবে প্রাণভরা আনন্দ, বুকভরা সান্ত্বনা ও অহেতুকী আশীর্বাদ

বাণী বহন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আত্মশক্তির আধারস্বরূপা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা শ্রীশ্রীমা নিজের পূণ্য প্রকৃতির সহিত মহিমা আবরণ কেমন করিয়া যে অসীম শক্তির কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া নিতান্ত সাধারণভাবে গৃহস্থঘরের লজ্জাশীলা বধূটির মত দিনের পর দিন কাটাইয়া গেলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন, "রাজরাজেশ্বরী সাজ ছেড়ে কাঙালিনী সেজে সব নিয়েছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমনকি ভক্তদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন! সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কাহিনী পুঁথিতে পড়েছি, কিন্তু মা যে তাঁদের চাইতে কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন। ঠাকুরের শুধু ত্যাগের ও সমাধির ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু মায়ের সব গেছেন, ঐশ্বর্যের চিহ্ন মাত্র নেই। মা ভাবসমাধিতে থেকে এই সব কাজ করছেন—স্ত্রীলোকের আদর্শ দেখাবার জন্য। অসীম দয়া, অনির্বচনীয় করুণা, অসাধারণ সম্পূর্ণ অভিমানরহিতা।"

শ্রীশ্রীমায়ের অপার করুণা, এবং অযাচিত আশীর্বাদের অপূর্ব মাহাত্ম্য কত মহিলা যে মায়ের নাম ও স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া তাঁহার জীবনে অমৃত আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইয়া রহিয়াছে, তাহার বিবরণ লেখা সম্ভব নহে, হয়তো ভবিষ্যতের কোন দিন কেহ তাহা অবগত হইবে না।

'উদ্বোধনে'র বর্তমান সুদৃশ্য বাড়ীটি স্বামী সারদানন্দ মহারাজের প্রচেষ্টায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। সেই জন্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর নিকট ঐ বাড়ী "মায়ের বাড়ী" বলিয়া খ্যাত।

জীবনের শেষভাগে অধিকাংশ সময়ে তিনি 'উদ্বোধনের' এই বাড়ীতেই অবস্থান করিতেন। কলিকাতা ও দূর দূরান্তরের বহু ভক্ত স্ত্রী ও পুরুষ সমভাবে তখন মায়ের চরণপ্রান্তে আসিয়া তাঁহার আশীর্বাদ, করুণা এবং অভয় আশ্রয় লাভে কৃতার্থ হইয়াছে। এই বাড়ীতে থাকাকালীনই মায়ের মাতৃভাবের পূর্ণতম বিকাশ সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সমাধির উচ্চতম স্তর হইতে সাধন জগতের প্রাথমিক অবস্থাটি পর্যন্ত সমুদয় আধ্যাত্মিক স্তরসমূহের ইতিবৃত্ত যেন শ্রীশ্রীমায়ের নখদর্পণে ছিল। তেমনি আবার সাধারণ জীব দুঃখীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মায়ের অন্তরে অপরিসীম বেদনা ও গভীর সহানুভূতির ভাব জাগ্রত করাইয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তাঁহাকে নিযুক্ত করিত। যে কেহ মায়ের চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে, মায়ের অভয়বাণী ও আশীর্বাদ এবং সর্বোপরি অপার মাতৃস্নেহ পাইয়া পরিপূর্ণ অন্তরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিতেন বোধহয় তাঁহাকেই মা সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ও স্নেহ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে আমরা তিনটি স্তর দেখিতে পাই। শৈশবে প্রকৃতির বালিকা, কৈশোরে সাধনরতা ও সেবাপরায়ণার মধুর মূর্তি, প্রৌঢ়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননী শ্রীশ্রীমা—মাতৃত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় উদ্দাম ভগবৎ অনুরাগ এবং বিভিন্ন স্তরের ও ভাবের সাধনার ন্যায় মায়ের কোন সাধনার ইতিহাস জানা নাই বটে। তবে তিনি পঞ্চতপা প্রভৃতি কঠোর তপশ্চর্য্যা যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাণীতে প্রকাশিত আছে।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সাধুগণ শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার উপদেশ ও আশীর্ব্বাণী আশ্রয় করিয়া এই বিরাট রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সূক্ষ্ম ধীশক্তির পরিচায়ক বহু ঘটনা সম্প্রতি 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। বাল্য-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক জটিল রহস্য সকলের সমাধানও তাঁহার বাণীতে দেখিতে পাই। ঠাকুরের ন্যায় শ্রীশ্রীমার বাণীতে অতি স্বল্প কথায় সাধন-রহস্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের অপূর্ব্ব মীমাংসা দেখিয়া বহু সাধকভক্ত মুগ্ধ হইয়াছেন।

অতঃপরে দীর্ঘদিন এইভাবে ঠাকুরের নির্দ্দেশে তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পুনঃ পুনঃ দারুণ জ্বর ও বাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শেষে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ৪ঠা শ্রাবণ উদ্বোধনের বাটীতেই মা সমাধি শয্যা রচনা করেন।

স্থূল শরীরে মায়ের অপূর্ব্ব লীলা বিকাশ বর্ত্তমান যুগের মত শেষ হইয়া যাইয়া ভবিষ্য যুগের জন্য সঞ্চিত রহিল শুধু তাঁহার অনন্ত আশীর্ব্বাদ ও অমর জীবন। যদিও সে অপার্থিব দেবমূর্ত্তি মানব আর দেখিতে পাইবে না, শ্রীমুখের অভয়বাণী আর রক্ত মাংসের কর্ণে শুনিতে পাইবে না তথাপি মানসনয়নে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি নিত্যকাল সাধক ভক্তগণ সাধনসহায়ে দেখিতে পাইবেন সুনিশ্চয়।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের ঋষিবৃন্দ ঘোষণা করিয়াছেন যে, জগতের প্রত্যেক নারীমূর্ত্তিতে জগন্মাতার আবির্ভাব নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবার যে পুণ্যপথ—তাহাই মানবের শ্রেষ্ঠ সাধন পথ। সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে যে দেবী নিত্য অধিষ্ঠিতা তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার সাধনাই ভারতের শাশ্বত ও সনাতন সাধনা। কালচক্রে এবং অদৃষ্ট বিপাকে ভারত-ভারতী বর্ত্তমান যুগে সেই সনাতন শিক্ষা ও সভ্যতার ধারা হইতে বহুদূরে নীত হইয়াছিল এবং মাতৃশক্তির অপমান করিয়া ধ্বংসপথ সুপ্রশস্ত করিতেছিল, তাই মহামায়া অশেষ করুণায় দেহ ধারণ করিয়া শ্রেয়ের পথে তাহাদিগকে পুনরায় আহ্বান করিলেন। আজ হউক কাল হউক অধঃপতিত জাতি দৈব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজের স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবে ও আত্মবিস্মৃতির দীর্ঘনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া শান্তি, প্রীতি ও প্রেমের উজ্জ্বল পথে চলিতে আরম্ভ করিবে। মায়ের আশীর্ব্বাদ সেইদিনই সফলতা অর্জ্জন করিবে এবং তাঁহার দেহ ধারণ সার্থক হইবে।

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীসারদাদেবী ভারতীয় নারী আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি মহীয়সী নারীগণ জগতের সম্মুখে যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে তাহাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কৃত্রিম শিক্ষা বিবর্জ্জিত ঋষি হৃদয়ে যে প্রকার সত্য প্রতিভাত হইত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মত,

বৈদিক যুগের ঋষি-কন্যার মত প্রকৃতির ক্রোড়ে শিক্ষিতা সারদা দেবীর মধ্যেও সেই প্রকার সত্যের পূর্ণত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সতীর ন্যায় সেবিকা, সীতার ন্যায় তপস্বিনী, গঙ্গার ন্যায় চিরপবিত্রা, সাবিত্রীর ন্যায় সীমন্তিনী এই সারদা দেবী ভারতীয় নারীর—বিশ্বনারীর আদর্শে প্রতিষ্ঠিতা হউন।

শ্রীশ্রীমায়ের এই শুভ জন্মতিথি-উপলক্ষে আমরাও তাঁহার বরাভয়করা মাতৃমূর্তির সম্মুখে প্রার্থনা জানাই, "মা, আমাদের প্রাকৃত সংস্কারজাত দৌর্বল্য দূর করিয়া আমাদিগকে মানুষ কর।" জয় মা আনন্দময়ী!

মন্দিরশিল্পের কয়েকটী মূল পদ্ধতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅজিত ঘোষ

উড়িষ্যায় একটী স্বতন্ত্র শিল্পপদ্ধতি গড়ে উঠেছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি এই শিল্পপদ্ধতির সম্যক ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উড়িষ্যার এই শিল্পকে কলিঙ্গপদ্ধতি বলা হয়। কলিঙ্গপদ্ধতিকে নাগরও বলা যায় না, বেসরও বলা যায় না—নাগর ও বেসরের সম্মিশ্রণে এর উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। ভুবনেশ্বরের কোন কোন মন্দিরে দেখা যায়, পিরামিডের আকারে ধাপে ধাপে উঠে মাথায় চ্যাপ্টা ধরণের আমলকে শেষ হয়েছে—আমলকের উপর একটী চূড়া। কোন কোন মন্দির লম্বা হয়ে উঠেছে, কিন্তু মাথায় সেই চ্যাপ্টা ধরণের আমলক ও তার উপর চূড়া আছেই। পুরীর মন্দিরেও ঠিক এই রীতি দেখা যায়। কলিঙ্গপদ্ধতিতে বেদ-বেষ্টনের বৈশিষ্ট্য বেশী ব্যবহৃত হয়েছে, তবে দ্রাবিড়ের স্তম্ভ-বেষ্টনের বৈশিষ্ট্যও বাদ যায়নি। যদিও নীচু নীচু বেসরপদ্ধতির প্রভাবসম্পন্ন মন্দিরগুলি খাড়া হয়েছিল, কিন্তু বেদ ও স্তম্ভের উঁচু ও চূড়ার ব্যবহার উড়িষ্যার মত আর কোথাও দেখা যায় না।

বেদ-বেষ্টনের বিভাগ মোটামুটী চারটী—বাড়, গণ্ডী, বিসম ও মস্তক। প্রথমে বাড় খাড়াভাবে তৈরী হয়, তার পর গণ্ডী প্রথমে খানিকটা খাড়াভাবে উঠে ক্রমে ভিতরের দিকে বাঁকতে আরম্ভ করে। গণ্ডীর পরে বিসম। গণ্ডী শেষ হলে এই বিসম সামান্য অংশ নিয়ে তৈরী হয় এবং বিসমের উপর মস্তক স্থাপিত হয়ে থাকে—এই মস্তকই মন্দিরের আমলক। উড়িষ্যার পদ্ধতিতে এই বিভাগগুলি ভালভাবেই লক্ষ্য করা যেতে পারে। উড়িষ্যাশিল্পের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্দির তৈরী করবার সময় যখন পাথরের উপর পাথর চাপান

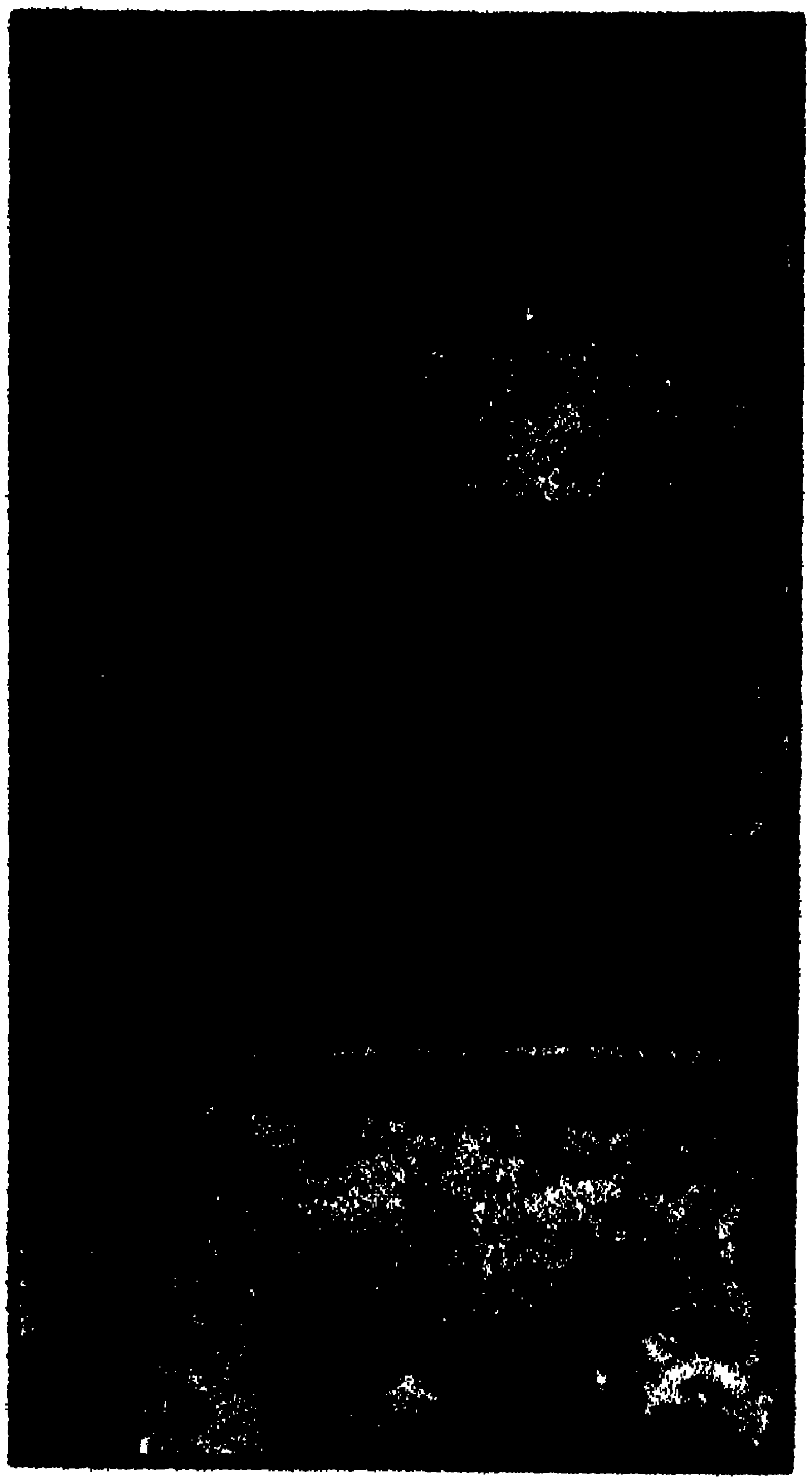

পুরীর মন্দির
কলিঙ্গ শিল্প-নিদর্শন

হয়েছে বা পাশাপাশি পাথরে পাথরে সংযোগ করা হয়েছে তখন গাঁথনির জন্য মোটেই মশলার ব্যবহার করা হয়নি, প্রতি পাথরের মাঝখানে গর্ত করে তার ভিতর দিয়ে লৌহবন্ধনীর (cramp) সাহায্যে একটির সঙ্গে আর একটির সংযোগসাধন করা হয়েছে। তার পরে চলেছে ছেনীর কাজ—রেখা রচনার অপরিসীম ধৈর্য,

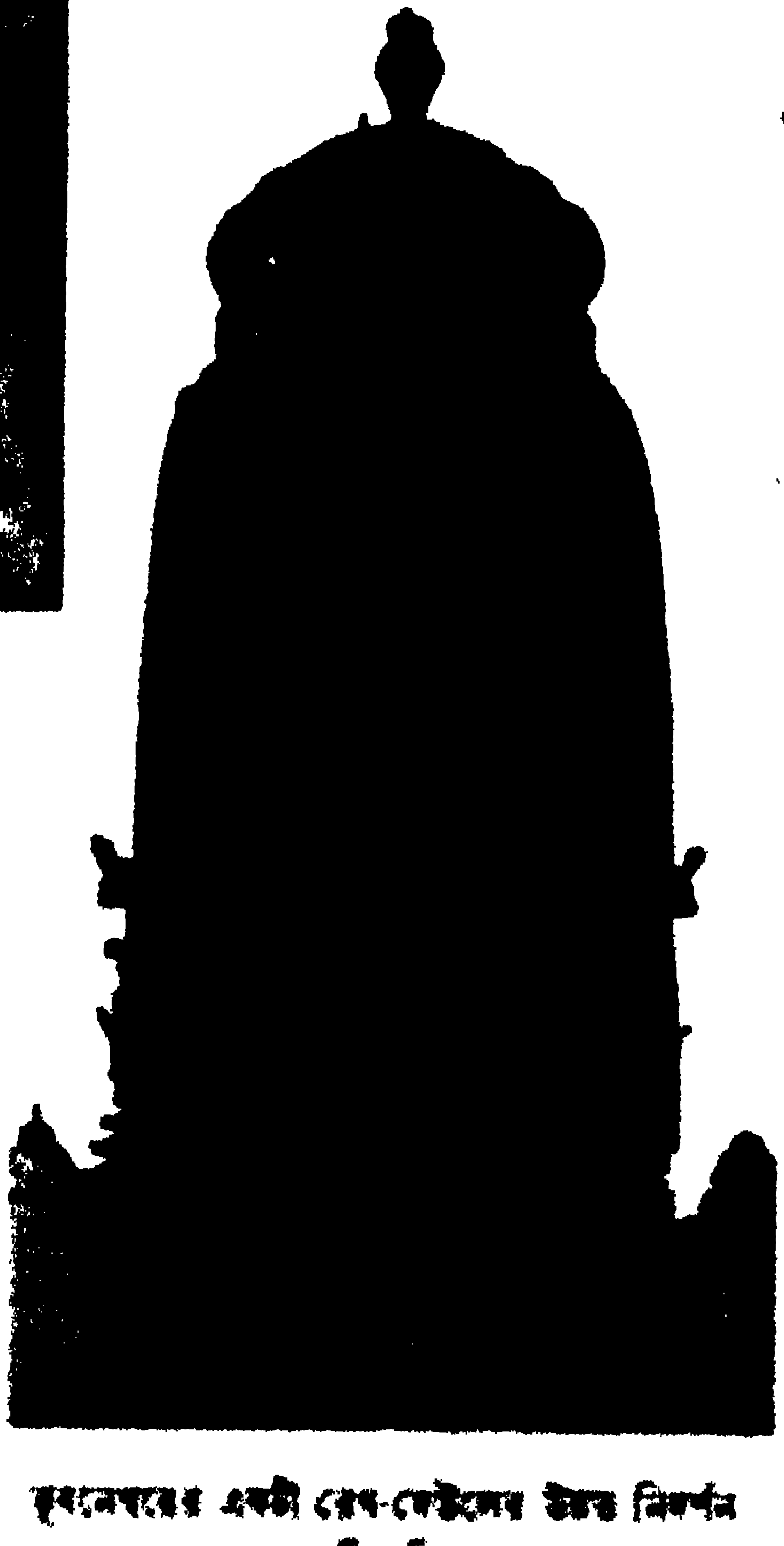

ভুবনেশ্বরের একটী রেখ-দেউলের উচ্চ নিদর্শন
—কলিঙ্গশিল্প

অন্যত্র ও স্থাপত্যের আড়ালে লৌহখণ্ডের মত বন্ধনীর ব্যবহার বুদ্ধগয়ের খাজুরাহোর মন্দিরেও দেখা যায়, তবে খাজুরাহোয় লোহার বন্ধনী না দিয়ে তামার বন্ধনীর ব্যবহার হয়েছিল এবং সে বন্ধনী লাগাবার পর গর্তের মধ্যে গলিত সীসা ঢেলে দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে বন্ধনীকে পাকা করা হত।

হিমালয় অঞ্চলে কাংড়ার ও তার পারিপার্শ্বিক মন্দিরগুলি খাঁটি নাগর-পদ্ধতির। তবে সেগুলিতে উড়িষ্যার রেখ-রীতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে এসেছে। আবার

আয়তন-রচনায় বেশ চমৎকার সাদৃশ্য পাওয়া যায়, এমন কি, কোনারকের অনুরূপ আয়তনও পাওয়া গেছে। বজৌরার শিবমন্দিরের আয়তন ঠিক কোনারকের আয়তনের অনুরূপ। বাঁকুড়ার বৈদ্যনাথ-মন্দিরটি দেখলে ঠিক উড়িষ্যার মন্দির বলে ভ্রম হয়। এমন কি, ভুবনেশ্বরের বৈতাল-দেউলের সামনে যেমন মণ্ডপের চার কোণে চারটি রেখ দেউল আছে, ঠিক তেমন চারটি রেখ দেউল এই মন্দিরের মণ্ডপের সামনেও বর্তমান।

দক্ষিণভারতের রামেশ্বর-মন্দিরের গোপুরম্
—ছবি [illegible]

মানভূমির সিয়ারসোল-অঞ্চলের দামোদর নদের ধারে বিস্তীর্ণ চর অঞ্চলে মন্দির পাওয়া যায়। সেখানে কয়েকটি রেখ-দেউল আছে। এই রেখ-দেউলগুলির ঠিক অনুরূপ মন্দির মানভূম জেলায় তেলকুপি গ্রামে পাওয়া গেছে। দুঃখের বিষয় এ সমস্ত মন্দিরের সামনে কোন মণ্ডপ নেই। এগুলির আকার উড়িষ্যার মন্দিরের অপেক্ষা ছোট। বাঁকুড়া ও বর্ধমানে উড়িষ্যার প্রভাব অপরিসর বর্তমান। তথাপি উত্তর-পূর্ব দিক থেকে নেপালী প্রভাব কিছু কিছু এসেছে। বজৌরার পূর্বে শিবমন্দিরের ঠিক নেপালী ছাঁদে একটি মন্দির পাওয়া গেছে। মন্দিরটি রেখ দেউল, তার গর্ভের উপরে মাথার উপর নেপালী পদ্ধতিতে ছাদ দেখা যায়। ছাদগুলি কাঠের তৈরী। পঞ্চায়তনীয় মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমস্ত মন্দিরে এরূপ ছাদের সন্নিবেশ করা হয়েছে। কোচবিহার-অঞ্চলের মন্দিরগুলিতে মাথার উপর ছত্ররচনা বিশেষভাবেই দেখা যায়।

কোচবিহার-অঞ্চলের চারদিক সমান চতুষ্কোণ—আটচালার অনুরূপ। বাংলার আটচালা শৈলী থেকেই যে এ প্রভাব এসেছে তা পূর্বেই বলেছি। তবে তা নেপাল হয়ে আসাই সম্ভব। নেপালের মন্দিরগুলিতে এরূপ আটচালার শৈলীকে গৃহীত হতে প্রচুরভাবেই

পাওয়া যায়। অবশ্য অতিরিক্ত বর্ষা বা তুষারপাতের জন্য এরূপ পদ্ধতির আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশ হওয়া স্বাভাবিক সেকথাও পূর্বে বলেছি।

মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড, গোয়ালিয়র, ওড়ছা প্রভৃতি রাজ্যে, ইন্দোরের দক্ষিণে নর্মদাতীরে ওঙ্কারেশ্বর-তীর্থ প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত মন্দির আছে তাদের মধ্যে অনেকগুলিই

মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির ও স্বর্ণকমল-বাপী (তীর্থ) —দ্রাবিড়পদ্ধতি

কোন কোনটি রাজপুত শৈলীতে, আবার কোনটি বা উড়িষ্যার পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। যুক্তপ্রদেশে সারনাথ, মির্জাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায়ই রেখ-দেউলের 'মডেল' পাওয়া যায়। এরূপ করবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয়। রেখ-দেউল নির্মাণে যথেষ্ট অর্থব্যয় করা ছাড়া উপায় নেই, বোধ হয়, অর্থের প্রতিকূলতাহেতু এরূপ করা হত। সুতরাং, এ সমস্ত অঞ্চলের শিল্পীরা মনোরম ও সুদৃঢ় রেখ-দেউলের সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেজন্য উড়িষ্যার প্রভাব আংশিকভাবে গ্রহণও করেছিলেন এরূপ ধারণা করা সহজ। আবার, খাজুরাহোর মন্দির সম্পূর্ণ রেখ-দেউলের ছাঁচে নির্মিত, এমন কি, রেখ ও ভদ্রের মধ্যে সংমিশ্রণও আছে—অনুরূপভাবে ভদ্র-দেউলও আছে। তবে উড়িষ্যার ভদ্র-দেউলের সঙ্গে খাজুরাহোর ভদ্র-দেউলের কিছু প্রভেদ বর্তমান। উড়িষ্যার ভদ্র-দেউলের মাথায় ঘাণ্টি বা হাণ্টি নামে একটি অংশ আছে, সেটি ঠিক মাথার ঘণ্টাকৃতি অংশের নীচে থাকে, কিন্তু খাজুরাহোর ভদ্র-মন্দিরে সেরূপ নেই। দেবমন্দিরের আকারের গঠনের বৈচিত্র্য থাকা

যায়। উড়িষ্যার একটিমাত্র আমলক ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার উপর কলস বা চূড়া বসান হয়েছে। খাজুরাহোর একাধিক আমলক দেখা যায়—একটী আমলকের উপর আর একটী আমলক বসান, তবে সেগুলি ক্রমেই ছোট হয়ে গিয়েছে। রাজপুতানার কোন কোন মন্দিরে, যেমন ধর, উদয়পুরী প্রভৃতি খাজুরাহোর অনুরূপ আমলকের পদ্ধতি দেখা যায়।

আগামী বারে সমাপ্য।

বুদ্ধ-আবাহন

(গান)

শ্রীদীব্যানন্দ ঠাকুর

হিংসাদ্বেষে ভরেছে ভুবন,
বিষাদে ঘিরিয়াছে আঁখি,
অহমোহকামনার তাড়নে
মনে মনে বাড়িয়াছে গ্লানি।
দেখিয়া ক্লেশক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ আশা,
প্রেমকরুণা লভিয়াছে ঘৃণা, মুক্ত সত্যভাষা;
অমৃত বাণী বিস্মৃত হত,
প্লাবিত শুধু ভ্রান্তি।
নিখিল ধরা করে আবাহন
সবেদন অবনীরে—
হে জ্ঞানী যোগী, হে চিরন্তন,
অচিরাৎ এস ফিরে!
ঘুচুক দীনতা, চঞ্চলতা দূরে যাক, ঘৃণা ভয়,
এ শুভদিনে আপনারে চিনে হোক সব পরিচয়,
দুঃখ-বন্ধন নির্বাণ হোক—
বিতর স্নিগ্ধ শান্তি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী শঙ্করানন্দ

'আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না বা কেহ আত্মাকে হনন করিতে সক্ষম' একথা যে মনে করে সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। Ralph Waldo Emerson এই শ্লোকের "Brahma" নাম দিয়া এই ভাবে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :

"If the red slayer think he slay's,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again."

কেহ যদি মনে করে যে কাহাকেও হত্যা করিতে যাইতেছে, আবার অপরে যদি মনে করে যে হত হইতেছে, তাহা হইলে তাহারা দুইজনেই ভ্রান্ত—আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ (১)। তাহারা জানে না যে, আত্মাকে কেহ হত্যা করিতে পারে না এবং আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না। যে এই তত্ত্ব ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, শরীরের বিনাশজনিত শোক বা দুঃখ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, কারণ সে জানে স্ব-স্বরূপ (আত্মা) হইতে প্রকৃতপক্ষে কেহই তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে আত্মা সম্বন্ধে বেদান্তের অভিপ্রায় পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। তিনি ইহার আবিষ্কারকর্তা নহেন। আত্মা সম্বন্ধে বেদান্তের এই ধারণা তাঁহার শত শত বর্ষ পূর্বে ভারতে প্রচলিত ছিল। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার সময় বলিতেছেন: "ইহার (আত্মার) জন্ম নাই, ইনি অজ।" আত্মা কখনই জন্মগ্রহণ করেন না। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই অর্থাৎ ইহার মৃত্যু নাই। মৃত্যু অর্থে বিনাশ বা সত্তার বিলুপ্তি। যাহার আদি (জন্ম) অন্ত বা বিনাশ আছে তাহা ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে বাধ্য। যাহার জন্ম আছে তাহার হ্রাস, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আত্মার যদি জন্ম না হয়—ইনি যদি জন্মরূপ পরিবর্তনের অধীন না হন তাহা হইলে ইহার বৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? মৃত্যুরূপ পরিবর্তনই বা ইহার আসে কিরূপে? এই সকল পরিবর্তন অর্থাৎ জন্ম, জরা, হ্রাস, বৃদ্ধি আত্মাতে নাই। আত্মার পরিবর্তন কখনও হয় না। আত্মাতে কোনও অংশ নাই বা ইনি অংশবিশেষের সমষ্টি নহেন। আত্মা বাহির হইতে কিছু গ্রহণও করেন না বা ইহার অংশবিশেষের হানিও হয় না। ইনি বিনাশরহিত অবিনাশী। ইনি চেতনার ঘনীভূত রূপ। ইহার ভিতরে অবকাশ বা শূন্য স্থান নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও

* স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের অপ্রকাশিত ইংরাজী "Gita Lectures" অবলম্বনে।

(১) গীতা ২।১৯

আত্মার মাঝখানে কোনও শূন্য স্থান বা অবকাশও থাকিতে পারে না। শূন্য স্থানের ধারণা একাধিক বস্তুর জ্ঞান হইতেই আসে। যখন দুইটি বস্তুকে আমরা একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করি তখন এই দুই বস্তুর জ্ঞান হইতেই তাহাদের মাঝখানে ও তাহাদিগকে পৃথক করিয়া শূন্য স্থান আছে বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। আত্মা এক অবিভাজ্য ও সর্বব্যাপী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও আত্মা বলিয়া দুইটী পদার্থ নাই। জগতের বাহিরে ও জগৎ হইতে পৃথক কোনও আত্মার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আত্মা ও জগতের মাঝখানে শূন্য স্থান কল্পনা করা ভ্রান্তি মাত্র। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আলাদা ও আত্মা আলাদা ইহা চিন্তা করাও অমূলক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আত্মাই। আমরা ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া অনুভব করিতেছি বলিয়া জগদ্ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। আমাদের যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহারা যদি না থাকে তবে এই জগতের অস্তিত্বও আমাদের নিকট থাকিতে পারে না।

এই জগতের অতি ক্ষুদ্রতম পরমাণুদের মাঝখানে যেরূপ অবকাশ বা আকাশ উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বর্তমান, আত্মাতে সেরূপ অন্তরাল, আকাশ বা অবকাশের অস্তিত্ব নাই। এই আত্মা কতকগুলি অণু, পরমাণু বা কণাদের সমষ্টিমাত্রও নহেন। ইহার যে গুণরাশি আছে তাহার কখনই নাশ হয় না। তাহা অনাদিকাল হইতেই আত্মাতে বর্তমান এবং অনন্তকাল বিরাজিত থাকিবে। এই আত্মা কিছু গ্রহণও করেন না বা কিছু ত্যাগও করেন না। ইনি আদি ও শাশ্বত। ইহার আদি বা কারণ কেহই নাই। এই আত্মা পুরাতন প্রাচীনতম হইতেও প্রাচীন। স্বয়ং ঈশ্বরও ইহাকে নাশ করিতে পারেন না। তবে পাশ্চাত্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা প্রকার অদ্ভুত মতবাদও প্রচলিত আছে। যেমন, ঈশ্বর আত্মাকে সৃষ্টি করেন এবং স্বর্গের কোনও প্রকোষ্ঠে চাবি দিয়া তাহাকে রাখিয়া দেন। যখন কোনও মানবশরীর জন্মগ্রহণ করিতে যায় তখনই তিনি (ঈশ্বর) একটী আত্মাকে তাহার অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেন। ঈশ্বরের কারখানায় শুধু মানবাত্মারই সৃষ্টি হয়—পশু-পক্ষীর নহে! খ্রীষ্টানরা সেজন্য বলিয়া থাকেন পশু-পক্ষীর আত্মা নাই! ইহা যে অদ্ভুত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতে এ প্রকার মত কিন্তু কখনই প্রচলিত ছিল না।

আমরা দেখিয়াছি যত প্রকার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিতে পারি তাহাদের কোনটিই আত্মার স্বরূপকে বিপর্যস্ত করিতে সক্ষম হয় না। অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত, অনন্ত এবং সকলের আদি এই আত্মার শরীরের নাশ হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না। আমরা শরীরের রূপান্তর করিতে পারি কিন্তু আত্মার করিতে পারি না, কারণ নাশ বলিতে যে পরিবর্তন বুঝায় আত্মাতে তাহা সম্ভব নহে। আত্মা নিত্যই সাক্ষী থাকেন। তিনি এক ও অবিভাজ্য। তাই ভগবান গীতায় বলিলেন: "যিনি আত্মাকে অবিনাশী, অনাদি, অজর, বলিয়া জানেন তিনি কি করিয়া মনে করিতে পারেন 'আমি হত হইলাম' বা 'আমি হত্যা করিলাম'? বাস্তবিক যিনি এই তত্ত্ব জানেন, হত্যা করা বা অপরকে হত্যা করানো তাহার দ্বারা সম্ভব নয়। ভগবান এখানে নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন থাকিতে উপদিষ্ট—কথা নহেন। তিনি এখানে নিষ্কর্ম

ও ভক্ত। অর্জুন পাছে মনে করেন ভগবান তাঁহাকে জোর করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতেছেন তাই তিনি এই কথা বলিতে বাধ্য হইলেন। ভগবান জানেন আত্মাকে হত্যা করা অসম্ভব, সুতরাং হত্যার প্রযোজক বলিয়া তাঁহাকে কখনই গণ্য করিতে পারা যায় না।

আত্মা কর্তা বা অভিনেতাও নহেন। মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সকল কার্যের সঙ্গে যখন আমরা তাঁহাকে জড়িত করিয়া ফেলি তখনই তিনি কর্তা বা অভিনেতারূপে প্রতিভাত হন। অথবা অপর কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, যদি আত্মা মন বা চিন্তাশক্তির সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করেন তাহা হইলে তিনি বলিবেন "আমি চিন্তা করিতেছি"। যদি তিনি শরীরের সহিত নিজেকে এক মনে করেন তবে বলিবেন "আমি বসিয়া আছি"। চিন্তা করা বা বসিয়া থাকা কিন্তু আত্মার স্বরূপগত ধর্ম নহে। যখন মন চিন্তা করে তখন আমরা মনে করি 'আত্মা চিন্তা করিতেছেন' এবং যখন শরীরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করি তখন আমরা ভাবি 'আত্মা বসিয়া আছেন'। আসলে কিন্তু আত্মা বসেনও না বা চিন্তাও করেন না। তাঁহাতে কোন রূপই নাই, মনও নাই। শরীরের গতির সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আত্মাও গতিশীল। যেমন আমরা যদি ফ্রান্সে যাই তাহা হইলে শরীরের সহিত আত্মাকেও আমরা তথায় লইয়া যাই। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তাহা ঠিক নয়। আত্মাকে কেহ দেখেও নাই, ইন্দ্রিয় দ্বারা কেহই আত্মাকে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতেও পারে নাই।

এখন মনে করা যাক্ আমরা ফ্রান্সে যাইতেছি। আমাদের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ফুস্ফুসটিও নিশ্চয়ই যাইতেছে এবং তাহাতে যে বাতাস আসা যাওয়া করিতেছে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস আমরা গ্রহণ করিতেছি তাহা বস্তুত কি আমাদের? আবার সেই বাতাস কি আমরা এই দেশ হইতে তথায় লইয়া যাইতে পারি? আমাদের ফুস্ফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে কার্যক্ষম করিতেছে বলিয়া বাতাস কি আমাদের হইল? কখনই না। অনন্ত আকাশেই বাতাস আছে। আমাদের ফুস্ফুস্ সঙ্গে যাইতেছে এবং যেখানে যাইতেছে সেই স্থান হইতেই অর্থাৎ সেই অসীম বায়ু-সমুদ্র হইতেই বাতাস গ্রহণ করিতেছে ও ত্যাগ করিতেছে, তাহাতে অপরিসীম বায়ু-সমুদ্রের কোনও ইতর-বিশেষ হয় না। আমরা যখন ফ্রান্সে যাইতেছি তখন কি আমরা আমাদের আত্মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি? কখনই নয়। আমরা যেমন বাতাসকে আমাদের বলিতে পারি না এবং একস্থান হইতে অপরস্থানে লইয়া যাইতে পারি না তেমনি আত্মাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি না। আমাদের শরীরটা যায় আসে কিন্তু আমরা ভাবি আত্মাও যাইতেছেন। ইহা প্রহেলিকা মাত্রই। পূর্ণিমা-রজনীতে শারদ মেঘমালা যখন চন্দ্রের নিম্ন দিয়া গমন করে তখন মনে হয় যেন স্থির আছে, চন্দ্রই বুঝি ছুটিতেছে। গতিশীল শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের গতি দেখিয়া আমরাও সেইরূপ ভ্রম করিয়া বলি যেন আত্মাই গতিশীল। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যাইবেন কোথায়? এ-জগতে এমন শূন্য স্থান কোথায় আছে যেখানে তিনি

নাই এবং যেখানে তিনি ব্যাপ্ত করিয়া নাই? আকাশ বা অবকাশের জ্ঞান হইতেই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান আসে, কিন্তু যাহাতে অবকাশ নাই, যিনি নিরবচ্ছিন্ন এক ও অদ্বিতীয় তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন কি করিয়া সম্ভব? সুতরাং যিনি প্রকৃত অদ্বিতীয় তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন এবং যে সমস্ত বস্তু পরিচ্ছিন্ন তাহাদিগকে অদ্বিতীয় মনে করিয়া আমরা মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়ি।

আমাদের আত্মা যে আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন তাহা কি পরিচ্ছিন্ন?—না। সুতরাং আমরা কি করিয়া আকাশকে পরিচ্ছিন্ন করিব? তাহাকে কোথায় সরাইব? পরিচ্ছিন্ন করিতে তাহাকে আমরা কখনই পারি না। সেইরূপ আত্মাও অদ্বিতীয়। তাঁহাকে যদি পরিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইত তবে তিনি সীমাবদ্ধ হইয়া যাইতেন ও তাঁহার ক্ষয় থাকিত। অতি সম্বন্ধীয় কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনই তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তো বহু সুন্দর সুন্দর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনা গেল, এখন আত্মা বলিয়া যে কিছু আছে তাহার কেহ কি প্রমাণ দিতে পারে? ইহা সত্য যে, আত্মা আছেন কিন্তু তাঁহার ঐন্দ্রিয়িক প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। কেননা ইন্দ্রিয় দ্বারা সে আত্মাকে জানা যায় না; বরং ইন্দ্রিয়সমূহই আত্মচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। যাহাদের নিজেদের প্রকাশশক্তি নাই—যাহারা আত্মার চৈতন্যে চৈতন্যময় ও প্রকাশবান তাহারা কি করিয়া আত্মাকে প্রকাশ করিবে? তারপর আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ আমরা যে আছি ইহার কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা আমরা মনে করি কি? অথবা আমরা একস্থানে বসিয়া আছি এবং ইহা সত্য কিনা তাহা কি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া তবে বিশ্বাস করিব? আর এসম্বন্ধে কি আমরা তাহাকে প্রমাণ করিতে বলিব?—কখনই না। আমরা যে আছি—আমাদের যে অস্তিত্ব ইহার সম্বন্ধে আমাদের কখনও সন্দেহ আসে না।

আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে "আমরা আছি কি—নাই" এই সন্দেহ কখনই উঠে না। ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া যে সকল প্রমাণ আমরা পাই তাহারা দুই প্রকারের—ইন্দ্রিয়োপলব্ধি হইতে জাত ও অনুমান দ্বারা প্রাপ্ত। অনুমানও ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। ধূম যদি দূরে দেখিলেও আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি যে সেখানে আগুন আছে। এই যে বহুদূরে অবস্থিত আগুন সম্বন্ধে জ্ঞান তাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা ধূমকে প্রত্যক্ষ করার জন্য উপস্থিত হয়। সকল প্রমাণই এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। আমরা যে এস্থানে বসিয়া আছি বা আমাদের যে অস্তিত্ববোধ তাহার জন্য এই দুই প্রকার প্রমাণের সাহায্য ছাড়া কি আমরা জানিতে পারি "আমরাও আছি"? ইহা (আত্মার জ্ঞান) স্বতঃসিদ্ধ এবং ইহার সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই উঠে না। সূর্য্যের সত্যতা (প্রকাশ) নির্দ্দিষ্ট জন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যক করে না। সূর্য্য আলোক দেয়। কিন্তু কেহ যদি প্রশ্ন করিয়া বসে—তাহার প্রমাণ কি তাহা হইলে তাহা হাস্যজনক হইবে নাকি? অন্ধ যদি বলে সূর্য্য নাই, সূর্য্য উঠে নাই, সূর্য্য কোনও কালে ছিল না, তবে তাহাকে কেহ বোঝাইতে পারে কি যে—সূর্য্য উঠিয়াছে? সে বড় জোর উত্তাপ অনুভব করিবে। অন্ধের কথা শুনিয়া চক্ষুষ্মান

কেহ কি বিশ্বাস করিবে সূর্য্য নাই? যে সূর্য্যকে দেখিয়াছে তাহাকে কি প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস করানো যাইতে পারে যে সূর্য্য উদিত হয় নাই? আর অন্ধের কথায় কি সূর্য্যের উদয় বন্ধ হইয়া যাইবে? কেহ যদি অস্বীকার করে সে এখানে বসিয়া আছে তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে জানিতে হইবে সে বাস্তবিকই বসিয়া আছে। যখন এই জ্ঞান স্বতঃ থাকিয়া যাইতেছে তখন তাহার অস্বীকারের মূল্য কি? তাহা কেহই প্রমাণযোগ্য বলিয়া মনে করিবে না।

জাগরণ-অবস্থায় সকল চেতন কার্য্যই আমাদিগের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে। আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহই থাকে না। ইহা হইতে আমরা এই বুঝিতে পারি আত্মা আছেন। আমি যে আছি তাহার কোনও প্রকার ঐন্দ্রিয়িক প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কোন প্রকার অনুমানেরও দরকার হয় না। সুতরাং যদি এই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার আমাদের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে মনকে অন্তর্মুখী করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহির হইতে ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার জন্য একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের প্রয়োজন আছে। বেদান্ত বলেন: "যে মন হইতে বিষয়বাসনা বিদূরীত হইয়া পবিত্র হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও একাগ্রতাকারী ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহারের সহায়ে সমস্ত সাংসারিকতা উন্মূলিত হইয়াছে সেই পবিত্র মনে এই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব।" পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহ দ্বারা (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি দ্বারা) চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং সাংসারিক বিষয়ের প্রতি মন উদাসীন ও জাগতিক সমস্ত সুখভোগ হইতে তাহার আসক্তি দূরীভূত হইয়া যায়।

এখন যে-মন সাংসারিক ভোগে আসক্ত সে-মনকে সমস্ত ভোগ্য পদার্থ হইতে সরাইয়া লইয়া অন্তরাভিমুখী করিতে হইবে। মন বাহিরের দিকে অবিরত ছুটিতেছে, ঐন্দ্রিয়িক বাহিক আনন্দের পিছনে ঘুরিতেছে এবং বাহিরের সুখভোগ ও ঐশ্বর্য্যে মগ্ন হইয়া আছে। ইহাই সাংসারিক লোকের জীবন। বাহিরের বস্তুর প্রতি তাহাদের অবিরাম আসক্তি প্রবাহ। ঐন্দ্রিয়িক সুখভোগে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষেই আনন্দ। আমরা এই সব লইয়াই মত্ত হইয়া আছি এবং ভাবিতেছি আমরা কি সুখী, এ-জগৎটা যেন আমাদেরই এবং এখানে আমরা চিরকাল থাকিব। আর এ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও অত্যন্ত দৃঢ়। জ্ঞানীগণ কিন্তু তাহা করেন না। তাঁহারা মনকে বাহিরের এই সকল ভোগ্য পদার্থ হইতে সরাইয়া মন এবং মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া আত্মার দিকে পরিচালিত করেন। ইহার ফলে তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন এবং আত্মার স্বরূপ জানিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট আত্মাও আপনি স্বরূপ প্রকাশ করেন—"বিবৃণুতে তনূং স্বাম্"। ইহা এক সত্য যে, যিনি এইভাবে শুদ্ধ চিত্ত লাভ করিয়াছেন তিনিই আত্মানুভূতি বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, অন্যে নহে। যাঁহারা সত্যকে জানিতে চান, যাঁহারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চান, অন্তরের অপরিবর্ত্তনীয় সত্যকে জানিবার জন্য তাঁহাদের

আকুল কামনা, পরিবার ও সংসারে অনাসক্তিই তাঁহাদের প্রথম সাধনীয়। সকল ধর্মই এই দুইটীর উপর বেশী জোর দেয়। বেদান্ত সকল দেশের সাধনপ্রণালী সমূহকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কোনও ধর্মকে, কোনও সাধনপ্রণালীকে কোনরূপ বাদ দেন না। সকলের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য যথাস্থানে আসন দিয়া থাকেন। বেদান্তের এই বিচারপ্রণালীর পথ হইতেছে ভগবানের নিকট পৌঁছিবার সর্বাপেক্ষা নিকটতম এবং কঠিনতম পথ। আর এই পথে বিচরণকারীদের ভিতর অতি অল্পসংখ্যক মাত্রই সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে সক্ষম।

আমাদের শরীর কোটি কোটি জীবকোষ দ্বারা গঠিত। ইহারা আবার একটী মাত্র জীবকোষ হইতেই উদ্ভূত। অস্থি মজ্জা, স্নায়ু, রক্তবহা নাড়ী, মাংসপেশী সকল এই শরীর সেই একটী জীবকোষ হইতে জন্মিয়াছে; কিন্তু তাহাতে এই সকলের একটীরও অস্তিত্ব নাই। সে জীবকোষটী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। ইহা যদি সম্ভব হয়, অণুবীক্ষণিক এই জীবকোষ হইতে যদি পরস্পর বিরোধী ধর্মী অবয়বযুক্ত মানব শরীর রূপ যন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হয় তাহা হইলে যে সূক্ষ্ম জীবকোষটীতে বিকশিত স্থূলশরীর সূক্ষ্ম ভাবে বিরাজিত আছে তাহাতে আবার সূক্ষ্মতর কিছুর প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর নয় কেন? ইহা সূক্ষ্ম কিন্তু পরিবর্তনশীল। ইহা হ্রাস, বৃদ্ধি, ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচের নিয়মাধীন এবং ইহাই আমাদের প্রাণবান জীবকোষ। ইহাই একটী শরীর ছাড়িয়া অন্য শরীর পরিগ্রহ করিতে পারে, এক জগৎ হইতে অন্য জগতে গমন করে, স্থূল শরীরের মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া থাকে এবং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ যেখানে সেখানেও থাকে। সেজন্য গীতা বলেন: "ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা যায় না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে না এবং বাতাস ইহাকে শোষণ করিতে পারে না।" (২) ইনি শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত। এই জীবাত্মা যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। কোনও জড় পদার্থই ইহাকে বাধা দিতে পারে না বা পৃথিবীর কোন পদার্থও ইহার গতিরোধ করিতে সক্ষম নয়। এই জীবাত্মা প্রাচীরের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে, কেননা তাহার নিকট ইহা কঠিন পদার্থ নয়। প্রাচীরের ইটের মধ্যে যে সকল অণু-পরমাণু আছে তাহাদের মাঝে মাঝে যে ফাঁক থাকে সেই ফাঁক দিয়াও ইহা গমনাগমন করিতে পারে। এই আকাশ-শরীরধারী (বায়বীয়) প্রাণবস্তু কেহ যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি তাহা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া বিরাজ করে। ইহার নির্দিষ্ট কোনও আকার নাই বটে কিন্তু ইচ্ছামত যে কোনও রূপ ধারণ করিতে পারে (৩)। কিন্তু আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপরিবর্তনীয় ও অনন্তকালস্থায়ী। ইনি

২। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥" ২।২৩

(৩) পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁহার [illegible] বলিয়াছেন: "মৃত্যুর পর এ জগৎ থাকিবে না, সেখানে অন্য জগৎ—অন্য দৃশ্য' কথাটী একটু বিশদভাবে

মনোরাজ্যের অতীত, সর্বপ্রকার বিকাররহিত এবং সকল পরিবর্তনের অতীত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন: "এইরূপ জানিয়া শোক পরিহার কর, ক্রন্দন করিও না। আত্মার এই স্বরূপ জানিয়া মৃত্যুভয়ে ভীত হইও না। নিজে হত হইতেছ বা অপরকে হত্যা করিতে যাইতেছ ভাবিয়া শোক করিও না।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বেদান্তবর্ণিত আত্মার স্বরূপের কথা বলিতেছেন। তিনি বলিলেন: "যদি তুমি ইহা বিশ্বাস করিতে না চাও এবং বল আত্মা শরীরের সঙ্গে জন্মান ও তাহার নাশের সঙ্গে বিনষ্ট হন তাহা হইলেও মৃত্যুর জন্য হে অর্জুন, তোমার শোক করা উচিত নয়। যখন তুমি ভাব আত্মা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জন্মান ও মরেন তখন তুমি একথা স্বীকার কর যখন শরীর চিরজীবি নয় তখন আত্মাও চিরজীবি হইতে পারেন না। শরীর হয়তো একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু তারপর তো মরিবে? তাহা হইলে আত্মাও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই মরিবে? তবে শোক করিতেছ কেন? কিসের জন্যই বা শোক? যদি শোক করিতে হয় তো প্রত্যহই তোমার শোক করা উচিত। আমরা তো প্রত্যহই মরিতেছি। একদিন যাইতেছে আর আমাদের আয়ু হইতে একটি দিন কমিয়া যাইতেছে। দিনে দিনে, প্রহরে প্রহরে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে আমরা মরিতেছি। তাহা হইলে দিবারাত্র সকল কর্ম ছাড়িয়া শোকে মগ্ন থাকাই আমাদের উচিত? ভাবিতেছ একশত বৎসর তো বাঁচিয়া থাকা সম্ভব ছিল? কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় সেই একশত বৎসরই বা কতটুকু? বিদ্যুৎচমকের সময়ের মতও নহে। * এই ক্ষণিক জীবন পাইলেই বা প্রয়োজন কি? বাঁচিয়া থাকিবই বা কেন? যদি চিরকালের জন্য মরিতে হয়, যদি আমাদের অস্তিত্বের কোনও অবশেষ মৃত্যুর পর না থাকে, তবে কেন সংসারের দুঃখ জ্বালা সহিয়া বাঁচিয়া থাকি? কেন আমরা আত্মহত্যা করি না? আত্মহত্যা করিলেই তো সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় বা এই সকল দৈনন্দিন সাংঘাতিক ব্যাপারের হাত এড়ানো সম্ভব? মৃত্যুর পর যদি অনন্ত শূন্যই থাকে, ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকার এবং অতীতে যদি কিছু না থাকে তবে বর্তমানও তো নিরর্থক? এ জগতে সুখ ও শান্তি কোথায়? সুখ ও শান্তি হইতে দুঃখ ও

আলোচনা করা প্রয়োজন। বেদান্তমতে মনুষ্য-শরীর পঞ্চকোষের সমষ্টি ও তিন অবস্থার অধীন। যেমন, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা স্থূল বিষয় ভোগ করি। এই সময় অন্নময় ও প্রাণময় কোষদ্বয় ক্রিয়াশীল। স্বপ্নে সমস্ত ইন্দ্রিয় বাহ্য বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। তখন শুধু মনই জাগিয়া থাকে এবং নিজ বাসনাজাল দ্বারা জীবাত্মাকে নানা দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া আনন্দ দান করে। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষদ্বয়ই তখন ক্রিয়াশীল থাকে। তাহারপর সুষুপ্তি। এই অবস্থায় মনও নিদ্রিত হইয়া পড়ে, শুধু অজ্ঞানাবরণে থাকিয়া আত্মা আনন্দ অনুভব করেন। এই সুখ-দুঃখাতীত কারণের আবরণই আনন্দময় কোষ।

অপাপিষ্ঠই তো অধিক ? জীবনের হিসাবে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগই তো বেশী ? তাহা হইলে এই দুঃখ শোক কেন আমরা বোধ করি ? মৃত্যু জন্মকে অনুবর্তন করে এবং জন্ম মৃত্যুকে অনুসরণ করিয়া থাকে—এই কথা যদি তুমি বিশ্বাস কর এবং মৃত্যুর পর আত্মা থাকে এবং অন্য জন্ম গ্রহণ করিবে ইহাও যদি বিশ্বাস কর তাহা হইলেই বা শোকের কারণ কি ? যে মরিয়াছে বা মরিতে যাইতেছে তাহাকে মরিতে দাও। সে যদি পারে তবে জোরের শরীর ধারণ করুক।"

শ্রীভগবান এইরূপে প্রমাণ করিলেন যে, অজ্ঞানের শোকের কোনই কারণ নাই।

(ক্রমশঃ)

মৃত্যু হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রসাদিপূর্ণ এই জগৎও বিনষ্ট হয়। দেহবিযুক্ত সেই জীবাত্মা তখন ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিযুক্ত হইয়া এই স্থূল জগৎ অনুভব করিতে পারে না। সে তখন নূতন এক জগতে গমন করে। এখন সে লোক কাহা হইলে কি রকম ? তাহা কি বাস্তব ? এই জগৎ যেমন আমাদের নিকট বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয় সেই জগৎও তেমনি পরলোকগত জীবাত্মার নিকট কি বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয় ? বাস্তবিকই তাই। পরলোকের অবস্থা বিশেষ, কারণ উহা মানস-রাজ্যের অন্তর্গত। স্থূল ইন্দ্রিয়াদি তখন না থাকায় মনই সমস্ত কাজ চালাইয়া লয়। স্বপ্নে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বন্ধ থাকিলেও যেমন নিজ শক্তিবলে মন ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রিয়াশীল বলিয়া প্রতিভাত করায় তেমনি মৃত্যুর পরে স্থূল ইন্দ্রিয়াদির অভাব হইলেও মনই জীবাত্মাকে স্বর্গসুখ বা নরক-যন্ত্রণা অনুভব করাইয়া থাকে। তখন মানসই প্রবল। তাহাবশে মৃত্যুর পরে যে দৃশ্য সকল আমরা দেখিব তাহা মনই পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং মৃত্যুর পর সেই সব দৃশ্যকে নূতন আনুষঙ্গিক সহায়ে দর্শন করাইয়া থাকে। স্বপ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিলেও যেমন দর্শন-শ্রবণাদি কোনও কার্যই বন্ধ থাকে না, সবই মনের দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনি মৃত্যুর পর কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও মনই তাহার নিজ শক্তির সাহায্যে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইজন্য পরলোক সম্বন্ধে যাহার যেরূপ কল্পনা তাহার সেরূপই দর্শন হয়।

তাহাবশে এই স্থূল জগতের বাস্তব সত্তা যেমন পরলোকবাসীর কাছে থাকে না তেমনি সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রত ও স্বপ্ন-জগতের অস্তিত্বও থাকে না। কারণরূপ অজ্ঞানাবরণে থাকিয়া জীবাত্মা তখন অপার সুখ অনুভব করে। সেই সুখ অনির্বচনীয় ও অব্যক্ত। তখন সুখের শুধু অনুভূতি থাকিয়া যায়, কিন্তু সুখ তাহা কেহই বর্ণনা করিতে পারে না। তবে বেদান্ত মতে ইহাও মায়ার রাজ্য। ইহারও অতীত হইতে হইবে। কেননা ইহাও প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্গত। প্রকৃতির এলাকা সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইলেই অদ্বিতীয় নিজস্বরূপদর্শন সম্ভব। দর্শন অর্থে এখানে সাক্ষাৎ। প্রকৃতি বা অজ্ঞানের সীমানা পার হইলেই জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। বেদান্তমতে ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ ও চরম পরিণতি। সাংখ্যকার কপিল কিন্তু প্রকৃতিলীন পুরুষের অবস্থাকেই মুক্তি আখ্যা দিয়া থাকেন।

বেদান্ত তাহা স্বীকার করেন না। কপিলের মতের এই অপূর্ণতা দেখিয়াই পূজ্যপাদ আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন বেদান্ত সাংখ্যের পরিপূরক।

মানবের মৃত্যুর পর জীবাত্মা অন্ত জগতে যাহা যাহা দর্শন করেন যাহা স্বামিজী মহারাজ বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ হইল মৃত্যুর পর জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর লইয়া মানস জগতে অবস্থান করেন। মানস প্রত্যক্ষই তখন তাহার প্রমাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। দর্শন, স্পর্শন, ক্রিয়া, আনন্দ সব কিছু তখন মনোরাজ্যেই সম্পন্ন হয় তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মনোরাজ্য সূক্ষ্ম এবং এ বাস্তব জগত স্থূল। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গিয়া জীবাত্মা উপস্থিত হয়, একারণই ইহা তাহার পক্ষে নূতন অভিনব। স্থূল রূপ, রস, গন্ধ যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারা জীব এ বাস্তব জগতে ভোগ করিতেছিল সূক্ষ্ম স্বপ্ন-জগতে তখন মনদ্বারাই তাহা সম্পন্ন হয়। তবে এই সূক্ষ্মেরও অতীত কারণ অবস্থা আছে যেখানে অজ্ঞানেরই মাত্র অবস্থিতি। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাম বা সূক্ষ্মভোগও তখন থাকে না, অর্দ্ধনারীশ্বরের মত চৈতন্য অজ্ঞানের সংমিলনে অবস্থান করেন। এই কারণভূমিও স্বপ্নজগৎ হইতে এক নূতন জগৎ এবং অনুভূতি। কিন্তু ইহাকেও উত্তীর্ণ হইতে হইবে। বেদান্তে ইহা তৃতীয় ভূমি নামে কথিত। তৃতীয় ভূমির পর তুরীয় বা চতুর্থই হইল জীবের আসল অবস্থান ভূমি বা স্বরূপ। এখানে জীবের আর অজ্ঞানও থাকে না, শুদ্ধ স্বরূপেই মাত্র বিরাজিত থাকে এবং ইহাই বেদান্তের আসল মুক্তি। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাবস্থা ও তাহাদের অনুভূতি সমস্তই পরিবর্তনশীল সুতরাং অনিত্য। জীবের যাহা প্রকৃত স্বরূপ—সর্ব্বাবস্থার অতীত বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্তা তাহাই একমাত্র শাশ্বত, কাম্য ও লক্ষ্য। (লেখক)

গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন

বিশ্ববাণী চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইল। যে সমস্ত গ্রাহকের নিকট বিশ্ববাণীর চাঁদা এখনও বাকী আছে—তাঁহাদিগের প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—তাঁহারা যেন তাঁহাদের দেয় চাঁদা অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিয়া অনুগৃহীত করেন।

বিনীত
কর্ম্মাধ্যক্ষ—বিশ্ববাণী

সম্পাদক—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ—কলিকাতা ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১১৩।১অ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট মানসী প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩৯ { ৫ম সংখ্যা

জন্মাষ্টমী

শ্রীপান্নালাল ঘোষ

উৎপীড়িত জর্জ্জরিত মানব সমাজ, কংসের নৃশংস ক্রূর শাসন কবলে,
ধরণী যে কম্পমান সন্ত্রস্ত বিহ্বল, কে করিবে পরিত্রাণ নাশি' পশুবলে ?

বাহিরে প্রলয় ঝঞ্ঝা অবগুন্ঠ পিশাচের দল—
সঘন উল্লাসে নাচে, অনর্থক করে কোলাহল,
দুর্ব্বলেরে পদতলে দলি' যায় নির্ম্মম নিষ্ঠুর—
মত্ততরে চলি' যায় দৃপ্ত দুষ্ট মত্ত খল ক্রূর।
এ দানব সভ্যতার লৌহদৃঢ় শাসনের গ্লানি—
কে আজ করিবে ধ্বংস রুদ্রতেজে দীপ্ত বজ্র হানি' ?
অন্তরে তমিস্রা ঘোর—পাষাণবেষ্টিত কারাবাসে,
পাষাণ বহিয়া বক্ষে নিপীড়িতা দেবকী নিবাসে ;
একে একে গর্ভজাত সদ্যোস্ফুট সাতটি সন্তানে,
কংস যে করেছে ধ্বংস আছাড়িয়া কঠিন পাষাণে ;
বার বার প্রতি চেষ্টা নবজন্ম,—নবযুগ লাগি,'
করেছে বিফল কংস, কাঁদে তাই দেবকী অভাগী।
নিরন্তর নিপীড়ন সহে না যে—আর সহে না যে,
দেবকীর প্রাণধন কতকাল রবে গর্ভমাঝে ?
অষ্টমীর শুভক্ষণে ভগ্ন এই পাষাণ কারায়
আবির্ভূত ভগবান্ নররূপে আজি পুনরায়।
পুণ্য প্রেম শান্তি ক্ষেম—অনৃত যে হইবে নির্জ্জিত,
ধর্ম্মের কনকস্তূপে স্বর্গ পুনঃ হবে প্রতিষ্ঠিত।

অদ্বৈতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

যদি বলা যায়—আমরা যেমন আমাদের শরীরকে "আমি" বলি এবং "আমারও" বলি, তদ্রূপ অন্তর্যামীর সহিত তাঁহার পৃথিব্যাদি শরীরের ভেদও আছে এবং অভেদও আছে—বলিব? সুতরাং অংশাংশিসম্বন্ধও সম্ভব হইবে? অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইবে?

কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, আমরা যে আমাদের শরীরকে "আমি" বলি তাহা যে ভ্রম, তাহা আমরা জানি। আমরা জানি—আমরা আমাদের শরীর হইতে ভিন্ন। যে হস্তকে একদিন "আমি" বলিয়াছি, তাহাকে কাটিয়া ফেলিলে "আমি" কিন্তু অক্ষুণ্ণই থাকে। অতএব জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের শরীরশরীরিসম্বন্ধ স্বীকার করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতের স্থাপন করা কোনরূপেই পারা যায় না। তদ্রূপ জীবের সহিত অন্তর্যামীর ভেদাভেদসম্বন্ধ যে স্বীকার করা যাইবে, তাহাও সম্ভবপর হয় না। কারণ, এই স্থলেই আছে "এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" এই তোমার আত্মাই অমৃত অন্তর্যামী। এস্থলে জীবের আত্মা অন্তর্যামী অমৃত হইলে জীব আর অন্তর্যামীর শরীর হয় কি করিয়া? আত্মার সহিত আত্মার ভেদ কি করিয়া হয়? নিজের সঙ্গে নিজের ভেদ হয় না। সুতরাং ভেদাভেদও সিদ্ধ হয় না।

তাহার পর আছে—"নান্যঃ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতা" অর্থাৎ এই অন্তর্যামী হইতে বিজ্ঞাতা আর কেহ নাই। সুতরাং জীবও বিজ্ঞাতা নহে। আর তাহা হইলে জীবকে যে বিজ্ঞাতা বলা হয়, তাহা অন্তর্যামীর বিজ্ঞাতৃত্ব জীবে অধ্যস্ত হইয়াই হয়। বিজ্ঞাতা-অন্তর্যামী ভিন্ন আর একজন বিজ্ঞাতা জীব থাকিলে এই নিষেধ সঙ্গত হইত না। মিথ্যারই নিষেধ হয়, সত্যের নিষেধ হয় না। সুতরাং "নান্যঃ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতা" বলায়, একই অন্তর্যামী বিজ্ঞাতা বলা হইল। পৃথক্ জীব বিজ্ঞাতা নহে, অর্থাৎ জীব ও অন্তর্যামীকে এস্থলে অত্যন্ত অর্থাৎ অভিন্নই বলা হইল বুঝিতে হইবে।

তাহার পর—এই অন্তর্যামীই তোমার আত্মা বলায় জীব ও অন্তর্যামী সম্পূর্ণই অভিন্ন হইয়া গেল। আমার আত্মাই যথার্থ আমি, আমার শরীরাদি তো যথার্থ আমি নহি—ইহা বুদ্ধিমান্ মাত্রই বুঝিয়া থাকেন। এজন্য যিনি আমার আত্মা, তিনিই আমি, আমি আর সেই আত্মা হইতে কোন অংশেই ভিন্ন হইতে পারি না। সুতরাং সেই অন্তর্যামীই, তোমার আত্মা জানায় জীব ও অন্তর্যামী আত্মার মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধও সিদ্ধ হয় না। পরন্তু অদ্বৈতই সিদ্ধ হয়। আমার আত্মার সহিত আমার ভেদাভেদ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। ইহা বোধ হয় উল্লেখও করে না।

যদি বলা হয়—আমি যখন অন্তর্যামীকে "আমার আত্মা" বলি, তখন তাহা "আমার আমি" "আমার শরীর" ইত্যাদি বলার ন্যায় হউক। আর "আমার আমি" "আমার শরীর" ইত্যাদি বলিলে "আমি"-শব্দবাচ্য শরীর এবং আমার মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ যেমন থাকে, এস্থলেও তদ্রূপ ভেদাভেদসম্বন্ধই থাকুক। বস্তুতঃ যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইল "তোমার আত্মাই অন্তর্যামী" সে ব্যক্তি অন্তর্যামী আত্মাকে ভেদ বুঝিল, অর্থাৎ সে অন্তর্যামীকে ভেদ তাহার জ্ঞানের বিষয়ই করিল। বিষয় করায় অন্তর্যামীকে কিঞ্চিৎ ভিন্নই বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে অন্তর্যামিরূপ আত্মার মধ্যে জ্ঞাতৃভাব বা জ্ঞেয়ত্বের ভাব, উভয়ই স্বীকার্য হইতেছে, আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদই সিদ্ধ হইতেছে ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না। কারণ "আমার আমি" বলিবামাত্রই আত্মা ভেদ একটী অখণ্ড জ্ঞান বস্তু হইয়া যায়, তৎকালের জন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভাব আর থাকে না। ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা। তদ্রূপ "আমার আত্মা অন্তর্যামী" বলিলে "আমি" তৎকালের জন্য অন্তর্যামীই হইয়া যায়। পরক্ষণে একটী কল্পিত "অন্তর্যামীর" বা "আমির" জ্ঞাতা আমি হই। এই "ভেদ আমির" বা ভেদ "অন্তর্যামী" যথার্থ আমি বা যথার্থ অন্তর্যামী নহে ; এজন্য উহাকে বুদ্ধিরূপ বা কল্পিত বস্তু বলা হয়। এজন্য এস্থলের ভেদাভেদের মধ্যে ভেদই কল্পিত হয়। বস্তুতঃ এই স্থলেই বলা হইয়াছে—

> "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ,
> যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্ যো বিজ্ঞানম্ অন্তরো যময়তি,
> এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ"। (৩।৭।২২)

অর্থাৎ "যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, যাহাকে বিজ্ঞান জানে না, বিজ্ঞান যাহার শরীর, যিনি বিজ্ঞানের ভিতরে থাকিয়া বিজ্ঞানকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃত।"

এস্থলে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ অন্তঃকরণাত্মক বিশেষ জ্ঞান বা বুদ্ধিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান একটু মিথ্যা বস্তুই হয়। আর উহার সঙ্গে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাঁহারও স্বরূপতঃ মিথ্যাই হয়। ভেদাভেদের একটী মিথ্যা হইলেই সমষ্টিই মিথ্যাই হয়।

তাহার পর এই স্থলেই আছে—

> "অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" (৩।৭।২৩)।

অর্থাৎ "অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা, ইহা হইতে অন্য বিজ্ঞাতা নাই।" অতএব আমি আমাকে জানি না, অর্থাৎ আমি আমাকে স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানের বিষয় করি না, কিন্তু আমিই জ্ঞানের বিষয় হয়, তদ্রূপ অন্তর্যামীকেও স্বতন্ত্রভাবে জানি না বা জ্ঞানের বিষয় করি না, কিন্তু অন্তর্যামীকেই জ্ঞানের বিষয় করি। ইহা এই শ্রুতিবাক্য দ্বারাই সিদ্ধ হইল। এস্থলে "যং বিজ্ঞানং ন বেদ" অর্থাৎ বিজ্ঞান যাহাকে জানে না এবং "অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা" অর্থাৎ "অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা" এই বাক্যের অপেক্ষা স্পষ্ট বাক্য আর কি হইতে পারে ? অতএব

কল্পিতবলেই সিদ্ধ হয় যে, আমরা যে অন্তর্যামীকে জানি, তিনি কল্পিত। অতএব শুদ্ধ আত্মার কর্তৃকর্মভাব বা জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাব নেই। উহা অন্তঃকরণোপাধি বিশিষ্ট আত্মাতেই হইয়া থাকে। যেমন—"তপ্ত লৌহপিণ্ড পিণ্ড দাহ করে" এই বাক্যে বুঝাইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।

বস্তুতঃ প্রত্যক্ষস্থলেও ইহা অনুভূত হয়। যেমন, যখন আমরা ঘট দেখি, তখন প্রথম-ক্ষণে আমরা ও ঘট অভিন্নই হই, পরে ভিন্ন হইয়া মনের ঘটকে আমরা দেখি। মন ঘটাকার ধারণ না করিলে আমরা ঘটকে দেখি না। এজন্য এই মনের ঘটই কল্পিত ঘটপদবাচ্য হয়। আর এইরূপে মনের ঘট আমরা দেখি বলিয়া আমাদের ঘটজ্ঞান কখন যথার্থ ও কখন বিকৃত বা অযথার্থ হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধ আত্মার মধ্যে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব নাই। শিষ্য যে উপদেশ শুনিয়া অন্তর্যামীর জ্ঞান করে, সেই জ্ঞানের বিষয় যে অন্তর্যামী, তাহা আমাদের কল্পিত অন্তর্যামী। অন্তর্যামীর জ্ঞানে যখন যথার্থ হয়, তখন আমি ও অন্তর্যামী অভিন্নই হইয়া যায়। এজন্য আমাদের অন্তর্যামীর সহিত আমাদের আত্মার ভেদাভেদ বা শরীর শরীরিসম্বন্ধ নাই। আমার আত্মার সহিত আমার অভেদই সত্য, ভেদাভেদ মিথ্যা। আর তজ্জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি মতবাদ কখনই সিদ্ধ হয় না। এই সব মতে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে সুখ ভোগ করে বলা হয়। কিন্তু "তোমার এই আত্মা অন্তর্যামী" বলায় আমার আত্মার সহিত অন্তর্যামীর কোনরূপ ভেদ কল্পনাই অসঙ্গত। অতএব ভেদাভেদ কখনই হয় না। এজন্য ঐ সব মতবাদ সঙ্গত নহে।

যদি বলা হয়—দ্রষ্টা-আমি যখন দৃশ্য-আমি হয়, তখনই আমি আমাকে দেখি, অর্থাৎ দ্রষ্টা-আমি দৃশ্য-আমি হইলে দ্রষ্টা-আমি নষ্ট হয় না, দ্রষ্টা-আমির এক অংশ দ্রষ্টাই থাকে, আর অপর এক অংশ দৃশ্য আমি হয়, এজন্য "দ্রষ্টা-আমি" "দৃশ্য-আমি" হইয়াও "দৃশ্য-আমিকে" সেই দ্রষ্টা আমি দেখে এবং পরক্ষণে সেই দৃশ্য-আমি বিলুপ্ত হয়, আবার দ্রষ্টা-আমি দৃশ্য-আমি হয় ও দৃশ্য-আমিকে দ্রষ্টা-আমি দেখে, এইরূপ বিস্ফুরিত অগ্নিকণাসমূহের ন্যায় অনবরত ভাব চলিয়াছে। সুতরাং আমির মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত ভাবই সিদ্ধ হইতেছে?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও নহে। কারণ, দ্রষ্টা-আমির, এক অংশ দৃশ্য হইতেছে, ইহা তো আমাদের অনুভব হয় না, দৃশ্য-আমিটী "আমি নই" হইয়া যায়, এইরূপেই অনুভব হয়। দৃশ্য-আমিতে "আমি" বুদ্ধি নষ্ট হইয়া "এই" বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তাহা আর দ্রষ্টা-আমিও হয় না। আর দ্রষ্টা-আমি সমগ্র দৃশ্য-আমি হইলে দৃশ্য-আমিকে দেখিবে কে? আর এই দৃশ্য-আমি পরে ফিরিয়া আসিয়া দ্রষ্টা-আমি হয়—ইহাও অনুভব হয় না। দৃশ্য-আমি চিরতরে বিনষ্টই হয়। কিন্তু দ্রষ্টা-আমির বিনাশ হয় না। অথচ দ্রষ্টা-আমি আমিকে দৃশ্য করে বা দেখে—ইহা সকলেই অনুভব করে এবং স্বীকারও করে। ইহা দৃশ্য হয় অথচ থাকে না। এইরূপই সকলের অনুভব হয়। দৃশ্য-আমিকে সত্যবান্ বলিয়া বোধ হয়, অথচ পরক্ষণেই অসৎ হইয়া যায়। এইজন্য বলিতে হয়—দৃশ্য-আমি একটা অনির্বচনীয়

নয়; ইহা একটা, দ্রষ্টা-খ্যাতির কল্পনা। যেমন স্বপ্নকালে দ্রষ্টা দৃশ্য উভয়ই কল্পিত হয়, তদ্রূপ দ্রষ্টা-খ্যাতি যতই দৃশ্য-খ্যাতি হইবে, ততই সে দ্রষ্টা-খ্যাতিই থাকিবে। তাহার বিলোপ হয় না। তাহার অংশেরও পরিণতি ঘটে না। ইহা এই উপনিষদেই ৪।৩।২৩ বাক্যে বলা হইয়াছে—

"নহি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে 'অবিনাশিত্বাৎ' ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।"

অর্থাৎ দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ নাই, যেহেতু তাহা অবিনাশী। তাহার দ্বিতীয়ও নাই যে, তাহা হইতে অন্যকে বিভক্ত করিয়া দেখিবে"। এইজন্যই দ্রষ্টা খ্যাতি নিত্য, আর দৃশ্য-খ্যাতি তাহার কল্পনা, মিথ্যা। সুতরাং অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয় বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়—দ্রষ্টা-খ্যাতিও নষ্ট হয়, দৃশ্য-খ্যাতি যেমন উৎপত্তির পর দৃশ্য হইয়াই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ দ্রষ্টা খ্যাতিও উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। দ্রষ্টা-খ্যাতি ও দৃশ্য-খ্যাতি—উভয়ই কোন এক অপর হইতে আবির্ভূত হইয়াছে।

তাহা হইলে বলিব—না, এরূপ কল্পনাও অসঙ্গত। কারণ, দ্রষ্টা-খ্যাতি নষ্ট হইয়া গেলে সেই পূর্বের দ্রষ্টা-খ্যাতি—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞান হয় কেন? শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, দ্রষ্টার দৃষ্টির লোপ হয় না। অতএব দ্রষ্টা-খ্যাতির যে স্বরূপ, তাহা নষ্ট হয় না ইহাই বলিতে হইবে।

এস্থলে শ্রুতিবাক্যে দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হয় না—বলায়, দৃষ্টিশব্দবাচ্য যে জ্ঞান, তাহার লোপ হয় না-বলা হইল। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই পরস্পরসাপেক্ষ বস্তু, দ্রষ্টা থাকিলেই দৃশ্য থাকে, এবং দৃশ্য থাকিলেই দ্রষ্টা থাকে, কিন্তু দৃষ্টিশব্দবাচ্য জ্ঞানটী সেরূপ নহে। তাহা স্বপ্রকাশ। দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব তাহাতে উপাধি বা আগন্তুকধর্মবিশেষ। অতএব দ্রষ্টা-খ্যাতি ও দৃশ্য-খ্যাতি কল্পিত বস্তু। দৃষ্টিরূপ জ্ঞানধারাই 'খ্যাতি'র স্বরূপ; তাহা নিত্য, তাহা নষ্ট হয় না, উৎপন্নও হয় না। ইহাই এস্থলে বলা হইল।

আর দ্রষ্টা-খ্যাতি ও দৃশ্য-খ্যাতি এক অপর হইতে আগত হইয়াছে—বলিলে সেই আগন্তুকের হেতু নির্দেশ করিতে হইবে? কিন্তু তাহার নির্দেশ করা অসম্ভব। কারণ, দ্রষ্টা-খ্যাতি যখন নাই বা থাকে না তখন কে নির্দেশ করিবে? আর সেই আগন্তুক স্বীকার করিলে দ্রষ্টা-খ্যাতির থাকাও স্বীকার করিতে হইবে, অতএব এই আগন্তুক স্বীকার করাই অনাবশ্যক, অধিক কি অসঙ্গত।

যদি বলা যায়—পরবর্তীকালের দ্রষ্টা-খ্যাতি পূর্ববর্তীকালের দ্রষ্টা-খ্যাতির সদৃশ বলিয়া "সেই দ্রষ্টা খ্যাতি" এইরূপ জ্ঞান হয়? কিন্তু তাহাও অসঙ্গত, কারণ, সাদৃশ্য স্বীকার করিবার জন্য একটা নিত্য-দ্রষ্টা খ্যাতি থাকার আবশ্যক হইবে। অতএব দৃষ্টিরূপ দ্রষ্টা খ্যাতি বা জ্ঞানরূপ খ্যাতি নিত্য স্বীকার করাই সঙ্গত।

তাহার পর অনুভব ভাঙার কল্পনা কি করিয়া করা যায়? ভাঙার অনুভব হইলে তাহা হইতে উৎপত্তিকে মিথ্যা বলা ভিন্ন তো আর গতি হয় না। উৎপত্তি সত্য অথচ ভাঙার অনুভব ইহা বিরুদ্ধ কল্পনা। এই জন্য দ্রষ্টা-আমির দৃশ্য-আমি হওয়া ইহা কল্পিত ব্যাপার অর্থাৎ অনির্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা। দৃষ্টিরূপ জ্ঞানস্বরূপ আমিই দ্রষ্টা ও দৃশ্য-আমিতে প্রতীয়মান হয়।

যদি বলা যায়—দ্রষ্টা-আমি, দৃশ্য-আমি না থাকিলে, সম্ভব হয় কি করিয়া? দ্রষ্টা ও দৃশ্য তো পরস্পরসাপেক্ষ পদ? অতএব দ্রষ্টা-আমির সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য-আমি থাকে, যেমন আমার সম্মুখ ও আমার পশ্চাদ্ভাগ। সম্মুখ ভাগ আমরা দেখি, পশ্চাৎ ভাগ দেখি না, তবুও উভয়ই আছে বলি। অতএব দৃশ্য-আমির অজ্ঞাত সত্তা স্বীকার্য্য? সুতরাং তোমাদের অসঙ্গত কেন হইবে?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, এক দৃষ্টিরূপ জ্ঞান বস্তুই দ্রষ্টা ও দৃশ্য হয়, এই দৃষ্টি বা জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। স্বতঃপ্রকাশ মধ্যে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাব থাকে না, সম্মুখ পশ্চাৎ বিভাগও থাকে না। ইহা জ্ঞান বস্তুর স্বভাব। দৃশ্যশূন্য দ্রষ্টাকে দৃষ্টিস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়। সেই জ্ঞানস্বরূপ দ্রষ্টাই দৃশ্য উপস্থিত হইলে সাপেক্ষ দ্রষ্টা হয়। অর্থাৎ দৃশ্যসাপেক্ষ দ্রষ্টা হয়, নচেৎ দ্রষ্টৃত্ব যোগ্যতা সম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপতা অর্থাৎ নিরপেক্ষ দ্রষ্টৃত্ব সর্ব্বদাই তাহার থাকে। দৃশ্যকালে তিনি সাপেক্ষ দ্রষ্টা, দৃশ্যাভাবকালে তিনি নিরপেক্ষ দ্রষ্টা বা দৃষ্টি একমাত্র বিশেষ। আর আমার সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় আমার আমি নয়; কারণ, তখন আমার দেহ আমার দৃশ্য হয়, দৃশ্য না হইলে সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ কল্পনা সম্ভব হয় না। দৃষ্টিরূপ দ্রষ্টা-আমি, যখন দৃশ্য-আমি হয়, অর্থাৎ আমি যখন আমিকে অনুভব করে, তখন দ্রষ্টা-আমির এরূপ সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ বলিয়া কোন কিছু তো বোধ হয় না। দৃশ্য-আমির ভাগ কল্পনা সম্ভব, কিন্তু দ্রষ্টা-আমির সম্ভব নয়। বস্তুতঃ দ্রষ্টা-আমি যখন আমিকে বা নিজেকে দৃশ্য করে, তখন নিজেকে একটা উপাধিযুক্ত করিয়াই দৃশ্য করে, সেই জন্যই দ্রষ্টাকে সাপেক্ষ বলা হয়। উপাধিশূন্যরূপে আমিকে দৃশ্য করিতে গেলে তাহার সে ভাব থাকে না, জ্ঞানস্বরূপে পর্য্যবসান হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানবস্তুর পৃষ্ঠদেশাদির কল্পনা, ঘটাদি বিষয়ক জ্ঞানের সংস্কারের অধীনতা স্বীকার করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জ্ঞানস্বরূপে স্থিতি করিতে যাহাদের বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়, তাহারাই ঐ দৃশ্য দর্শনের অনুকরণ করিয়া তাহাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। দ্রষ্টাকে দৃশ্য করা যায় না। দৃশ্যরূপ দ্রষ্টা কল্পনাজাত, দ্রষ্টৃরূপ দ্রষ্টা কল্পনাজাত নহে। এই জন্যই দ্রষ্টা-আমিকে দৃশ্য-আমি করা একটা অনির্বচনীয় ব্যাপার বা মিথ্যা বা কল্পিত ব্যাপার মাত্র বলা হয়। আর তজ্জন্য আমার কথা তোমাদের নাই, পরীক্ষাপরীক্ষিতত্ব নাই, সুতরাং বৈজ্ঞানিক কোন বক্তব্যই সিদ্ধ হয়না, যাহা সিদ্ধ হয় তাহা অবৈজ্ঞানিকই।

ঐ যে জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের যে পরীক্ষাপরীক্ষিতত্বের কথা বলা হইল, ইহাই

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের মূলমন্ত্র। এইজন্য শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে—"যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরম্"। এজন্য ইহাকে এই মতবাদের বীজমন্ত্র বলা হয়। কিন্তু 'শরীর' শব্দটী দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা একটী "স্বরূপ" অর্থে, আর একটী "উপাধি" অর্থে। "আমাদের শরীর" আমাদের উপাধি, কিন্তু "মণি বা জলের শরীর" বলিলে তাহাদের স্বরূপ অর্থই হয়। "শরীর" শব্দের ধাত্বর্থ—যাহা শীর্ণ হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে শরীর শব্দে উপাধিই বুঝায়। কারণ, ব্রহ্মের শরীর ব্রহ্মই হইলে তাহার শীর্ণত্ব কল্পনা করা সম্ভব হয়না। আর যদি পৃথিবী প্রভৃতি শীর্ণ হয় বলিয়া ইহারা ব্রহ্মের শরীর বলা হয়, তাহা হইলে অবিকৃত ব্রহ্মের শরীর এই পৃথিবী কি করিয়া হইবে? অবিকৃতের এক দেশ বিকৃত হয়, এরূপ কল্পনা করিলেও সমগ্রের বিকার স্বীকারই হয়। নচেৎ সেই বিকারীদেরও অবিকারীদের—উভয়ই পৃথক্‌ই হয়। এজন্য এই শরীরশরীরি ভাবের দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করিবার প্রয়াস ব্যর্থ।

(ক্রমশঃ)

যাত্রা শেষে

শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল, এম-এ, বি-এল

চলি' অফুরন্ত পথে, হে জীবন-নাথ,
শ্রান্ত, অবসন্ন আমি। শিরে গুরুভার
বহিয়াছে দিনে দিনে,—নিতান্ত অপার
তবুও বহিতে হ'বে। নির্দয় আঘাত
দিল পথ শতবার, দুটি অশ্রুপাত
কত সহে' গেল, হায়, তথাপি তোমার
নির্ভর-আশ্রয় মিলিল না। নিরাশার
তীক্ষ্ণঘাতে পড়িল না স্নেহ-জ্যোৎস্নাপাত।

মরুমাঝে পথহারা কুরঙ্গের প্রায়
নানাদিকে ছুটে যাই—শ্রান্তি বেড়ে যায়।

দেখো তব পুণ্যকীর্ণ আলোকিত বীথি,
উদার আকাশে মুক্ত বিহগের গীতি,
সে পথে চালাও মোরে বাধা বন্ধহীন,
মিলুক এ যাত্রার শেষ কোন দিন।

গিরিশচন্দ্রের "জগমণি"

শ্রীরমাই মতিলাল

চরিত্রাঙ্কনতা জীবের চরম, দুর্বলতা। যে চরিত্রে যাহার উপকার হয় সেই চরিত্র তাহার নিকট সুচরিত্র। বিরোধী কুচরিত্র। জীবের সব অংশে এক আকৃতি হয় না সেইরূপ দুইটী জীবের সর্বাংশে এক চরিত্র হয় না—স্বল্পেও পার্থক্য থাকে। এই চরিত্র বিশ্লেষণে মানুষের একটা ঝোঁক আছে। চরিত্র লইয়া কত কথাসাহিত্য কত নাটক ইত্যাদি। কত চরিত্র আমরা পুস্তকাদি হইতে জানিতে পারি। স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্র এই ভাবেই অনাদিকাল হইতে এখনও পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে সাহিত্য ও নাটকাদিতে জোড়া-তাড়া দিয়া চরিত্র অঙ্কিত হয়। অনুসন্ধান করিলে গল্প নাটকের অনেক চরিত্র বাস্তব জীবনে মিলিয়া যায়। জগতে স্ত্রী চরিত্রের দিকেই ঝোঁক বেশী, স্ত্রীলোক জগতের কর্ণধার বোধ হয়। তাঁহার অভাবে সংসার চলে না। সুস্ত্রীলোক অর্থাৎ স্ত্রীলোকগণকে আখ্যা দেওয়া হয় সাধ্বী, সরল সতী ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায় যে জগতে ইহার বিরুদ্ধ স্ত্রীলোক ও বর্তমান ছিলেন ও আছেন। এই বিদ্রোহিনী স্ত্রীলোকগণকে কেহ সাধন পক্ষে দেখিতে পারেন না। কিন্তু উপায় কি? বাল্মিকী, তাড়কা শূর্পনখা ত্রিজটাকে বাদ দিতে পারেন নাই। সীতাও স্থানে স্থানে বিদ্রোহিনী। দ্রৌপদী মুক্ত বেণী,—ঠিক সাধ্বী সরল বলা চলে না। তাঁহার বেণী বন্ধনের কথা ভাবিলে মন ঠিক রাখা দুরূহ হইয়া পড়ে। আলেকজান্ডার যে পার্সিপোলিস দগ্ধ করিয়াছিলেন, আর ঐ নগরীর লক্ষ নর-নারী হত্যা করিয়া অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, প্লুটার্ক বলেন তাহা এক নারীর দানবীয় পরামর্শে। ১৯৩০ সালে যখন ডাক্তার হার্জফিল্ড খনন করিয়া পার্সিপোলিস পুনরুদ্ধার করেন তখন এমন সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে প্লুটার্কের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। নিরো তাঁহার দানবীয় কার্যসমূহে একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা প্ররোচিত হইতেন। এন্টনির পতন প্রেমিকা ক্লিওপ্যাট্রার নিমিত্ত কে না জানে। বহু স্ত্রী হন criminal celibrity. এই সব বাস্তব রমণীরা জগতে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও ভূরি ভূরি করিতেছেন—তাঁহাদের ফেলিয়া দিলে চলে কই। অতএব আখ্যায়িকাকার তাঁহাদিগকে নিত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাঁহারা কখন কুলটা কখন বেশ্যা। কত বিমাতার কাহিনী পুস্তকের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। কত পত্নী বীর পতি ও অপরজাত সন্তানের প্রাণ নাশ করিয়াছেন। কত নারী দুরাকাঙ্ক্ষা বশে কত বীভৎস কার্যে রত রহিয়াছে। সেক্সপিয়ার ধরিয়া দিয়াছেন লেডী ম্যাকবেথকে। স্ত্রীলোকটী সিংহাসনের লোভে পরোপকারী পুরুষেও আঘাত হানিতে পশ্চাৎপদ নহেন। এই এই রকম ঘরে, পেটে, পিসার কেহই এই জাতীয় চরিত্র বাদ দেন নাই। ইহার ব্যাখ্যা কোথায়? গিরিশচন্দ্র ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমাদের জন্য—আমাদের জনবধি বা জনকমোহিনী। তার ধারণা জোড়া কাকুরা তাহাকে দেখলেই পছন্দ করে। যে বাঙালী ছেলের কাছে হাতে খড়ি হয়েছেন সে জনবধির নাম দিয়েছে বিভাবরি। ভুলেন বাবুন, বিভাবরি কি পোষাকে ইতের মতন মানুষে যায় তা দেখতে। বিভাবরি কি কথা, চরিত্র একই। ছুটিতেই আছনী। তবে কথা চাপরাশীদের বিল নাগে, খানসামাদের আদাব দেয়। সেই তার ধারণা। বিভাবরীরা বোধ হয় ঐ সব দেখে তোমরা পালটাই করে কেবল এক রকম দেখে যায়। যাহা হউক ভুলেনের দাদা রমেশবাবু প্রথম দর্শনেই তাহার নাম করণ করেছিলেন জননী। চাপরা শিবনাথ বিভাবরীটা বজায় রেখে এক রকম উপরে দিয়েছিল—দিয়েছিলেন উনার অবলা শক্তি রিজনী। প্রথমত দিয়েছিল—দিয়েছে অধিনী (চাপরাশী) দেখে কাদিনী। কিন্তু দেখের কাদিনীরা যখন চটে, শিবনাথকে ভুলের "হাঁ দিয়ে, ওকি দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছে" তখন শিবনাথ বেমক্কিম, মুখ ফিরিয়ে পুনঃ নামকরণ করে "কালীকেশ ছিবড়ে আর"। পাহারাওয়ালা সেলাম দিয়ে তাকে "বাবু সাব"। মহলদার নাম দেয় "বধূমাকে" বা "বাহুনী"। যোগেশের সম্বোধন "রমেশ বাবুর ইস্তিরী"। জননী ও প্রভৃতি একভাবে নাম দেন "রাক্ষসী"। কেবল উমাসুন্দরী চিনিলেন মানুষ বলিয়া। পরজন্মের বড় আর বাকি রহিল না। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে 'জানিনা কি বলে ডাকি তোঁরে'।

• •

এই ভুল ও জনবধি বাঙালী ছেলের মুখধেদি, প্রিয়া, প্রাণেশ্বরী। কোন স্থলে এমন কি মহলদার কথাকে "কনে" বলিলে বাঙালীদের বড় অপমান হয়, মধ্যে নিরা দিয়ে। কিন্তু প্রশংসিত জনবধি বাঙালীর মুখের উপযুক্ত বলিয়া দেয় "আর কতক ঘুষিয়া রমেশ"। জনবধি বাঙালীদের কর্তাবধি রমেশ বাবুর পার্শ্ববধি। জনবধি বিভাবরীর উপরেও যায়, কারণ বিধাতা তাহাকে অবাচিত দুইটী কর দিয়া ফেলিয়াছেন। জনবধি একজন সোসিয়েল subject, বাঙালী ছুটিয়া তাকে পরিচিত নামায়। ইহার খাটা বাড়ুরি আর গাড়ুদের রকম সব উপার্জনের নিমিত্ত। সে বৈষয়িকী বজমান আমার রমেশ প্রকৃতিতে পরমার্থ ছুটিদিন ব্যাঙ্কে, ৬৲ টাকা ধার দিয়া ৪০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লয়,—কাজেন ধোঁকাদের বড় আদ্ধা রাখে, একান্নবর্তী পরিবারদের পরামর্শ দেয় আমরা করিবার জন্য। হাজার কথা ৯৯৯ জনের সহিত এমন কাজে তাহার কোন পার্থক্যই নাই। যোগেশ-পরিবারের সম্পর্কে আসিয়া আর যে রকম দেখছি বটে সেটাও ঐ ৯৯৯ জনের মধ্যে আমার জনকমোহিনী হইতেন কিনা বলা যায় না। গোল ছুটেছিলেন রমেশবাবু। তিনি জনবধির কাছ থেকে ভুলেনের হ্যাণ্ডনোটগুলি বাহির করিতে এসে জনবধির বাবাই ভুলেনের বড় লিখাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন;—আর চাহিয়াছিলেন খোদ বাঙালীদিগকে চার্জকণ্ঠে। বাছাই করে দিলে, জনবধি রমেশকে চিনিল। এখন যে রমেশ, সে তো একেবারেই আর। জনাদি জনবধি নিজের এমন না ছাড়িয়া সকল পথেই চলিতে চাহিয়াছিল। মহলের সেই

রমেশ বাবুর সঙ্গে মা বুড়িরা হুরেশকে লইয়া মামলা বাধাইতে চাহিয়াছিল। দ্বিতীয় পোপ খাবার কাবাবী 'In the দায়রা?' সে ব্যক্তি কমার প্রেমে 'পাপের খনিতে খাবিতে টাকিয়ে টাকিয়ে ১৫০৲ টাকা করে খাটা, জিংপুর থেকে একজোড়া ঘোড়া আর ফাঁড়িতে ডায়মণ্ডকাটের বড় একখানা বাগিচার জমিখণ্ডকে স্থাপিত করিতে চায়। এটর্ণির চার্জ, কথাটা বড় সোজা নয়। কাকালীর বিরুদ্ধে কেরানীর মামলায় কমার কাছে খাপ খুলিবার ও যোগ্য নয়। কমা ঠিক জানিত যে তক্তদিনে রমেশবাবু স্বয়ং এক দুষ্টি কেরানীর চার্জে পড়িবেন। কিন্তু বোধ হয় অবলা কমলমণির হৃদয়ে ঐ বাড়ী বুড়ীর জন্য অন্তঃসলিলা বহিয়াছিল। সে অন্তঃপুর রূপ দেয় রমেশবাবুকে গৌরবে।

কমাকে রমেশবাবু পালাজিয়ার ঠাকুরমা বলে যতই তুচ্ছি করুন কমা কিন্তু এটর্ণির উপর এটর্ণি। রমেশ একবারেই বেমালুম। কমা প্রতি ক্ষেপেই within the Law। মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে একতরফা ডিক্রী করে যোগেশকে ওয়ারিন ধরানো রমেশের বুদ্ধিতে আসিত না। বুদ্ধিতে এলেও রমেশের সাহসে কুলাইত না। যোগেশ false personification-এর চার্জ আনলে সর্বনাশ হইত কিন্তু কমা এক চালে যোগেশের মনকে কাত করে। পয়সা খরচ করে মদ দিয়ে সে অত চাল বানচাল করে দিয়েছিল। আনমা যে সিঁধি কাটিতে বাড়ি ঢেকে যোগেশকে ওয়ারিন থেকে বাঁচাবে তাও কমা জানিত। সে পরিত্রাণের ফিকির ছিল। মনমোহনকে দিয়ে বাড়ির দলিলগুলো আনিয়ে যোগেশের অমন বাজার দর একখানি বাড়ি ১০০০৲ টাকায় বাগিয়ে নিয়েছিল।

কমার ভাব কমা জানিত। কমা যখন জানতে পারলে যে মহাপুরুষের লোক টাকার লোভে ইচ্ছা করে মার খেয়ে অবস্থা এমন হয় যে তাকে হাসপাতালে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় পথেই মারা যায় তখন সে দুঃখকণ্ঠে বলে যে 'আমারই দুখী—আমারই দুখী'। কমা কাহাকেও বিশ্বাস করে কোন কাজ করেনা। ডাক্তার বেটার মুখ দেখলেই সে জানতে পারে যে সুরেশ বেঁচে আছে—সে অবস্থায় কমার পরামর্শ যে আনমাকে ও মাধবকে এনে রমেশের বাড়িতে পোরা। রমেশ বাবুকে সে চালটা বুঝতে চায়। কেউ যদি আনমাকে হাত করে মকদ্দমা চালায়, সে এক কাণ্ড হবে। "এতি কথা কমলী" বলে রমেশ যতই চমৎকৃত ভাব করুক না কেন কমার চালটি যে কি তা রমেশকে ক্রমে ক্রমে বুঝতে হয় কি অন্ততঃ পক্ষে পরিষ্কারই বুঝেছিল যে তাকে বাড়ীতে এনে পোষার উদ্দেশ্য মাধবকে হত্যা করা।

উমাসুন্দরীকেও হুরেশের বাড়িতে পোরা কমার আর এক চাল। সেই কার্যে যখন সে 'কি গো বাছেরা কি হচ্ছে গো' বলে সে আনমার বাড়ির উঠানে প্রবেশ করে তখন কে বলিবে যে কমা একজন চোখা পাত্রী টাবৃটি নয়।

কমা একজন প্রকৃত অভিনেত্রী। যেখানে যা সাজে তাই দিয়া সিঁধি কমাকে সাজাইয়া দিয়েছেন। কলকাতার থেকেটারে থেকেভেদার জন্য আমরা নির্দিষ্ট পালোয়ানকে

সাহেব কথা ভাবে এমন রকম সে বাজে কথা যা বলবে সকল লোককে তাই শুনতে হবে। জবা জননদায়কে আরো নিরুৎসাহ দুঃখিয়ে বাপকে চায় কারণ উকিলের যদি একটা উল্টো পাল্টা করতে হয় কথা বলতে পারবে ঐ পাগলাটা উল্টো পাল্টা বুঝেছে। বাবের মার্জিনে জবামণি অদ্বিতীয়। যখন বাপের সমস্ত পৈতৃকটা জলে জলে উঠেছিল তখন জবামণি বাবের সেই অবস্থার কোন কূলটা ধরতে পেরে পেরে ঠিক পায়নি। রমেশের প্রস্তাবিত টাটার এদিকটা তার পছন্দ হয়নি, কারণ উকিলটাই উঠে বাবে আর ডাক্তার বসিয়ে যেতে চাও। পরক্ষণেই জবা যে রূপ পছন্দ করে সেই বাজে বাবের আগা আরো প্রজ্বল হয়ে উঠে। ডাক্তার বাবু যখন বাবের কাছ্রানিতে একটু জল দিতে বলেন তখন জবা একেবারে কাতর হয়ে আবদারে বলে উঠে, "ও আমার পোড়ার দশা, জল কি জলায়" পরক্ষণেই জবা ডাক্তার বাবুকে বলে, 'একটা উপায় কর, বাবার জলটুকু জলাচ্ছে না।'

জবা অত্যন্ত সরল। বাবাকে সে ভয়ই করতে যায়। একবারো বেনেরাখা তার উপর চাপিয়ে এক জোড়া বালিশের শুধু খাওয়াইতা সে কর্ম করে করতে চায়। রমেশ বাবুও একটু জল দিতে চায় জবার আপত্তি 'রমুও ও মিনিট দুবরে'।

জবা একজন অতি সাহসিকা। রমেশ বা কাঙালীর মত বাঘাল নড়লে ভয় পায় না। বড়ি রমেশের ভয় হয় জবা গাড়ী করে বাবাকে জবার বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। ঘটনাস্থলে প্রফুল্লর আশ্রয়ে সে রমেশকে বলে 'ওগো ঠেলে ফেলে দে' মেয়েটাকে নিয়ে যেতে।

জবা পতিসোহাগিনী। কাঙালীচরণ জবার রূপে জবার গুণে জবার কোন কাঁচে বাধা দেয় না। জবা পতিসেবিকা। জবার কাঙালীর কথার উপর টান থাকুক আর না থাকুক হাবে হাব। কাঙালীর জন্য সে চিঠি লেখে রাখে, চিঠি লেখবার কথা মনে করিয়া দেয়। জবাদির জবাকে 'জবানি' বলে গান দিলে কি হয় জবার সব থেকে বাহাদুরি যে সে জবাহারকে চোখ রাঙিয়ে বলিতে পারিয়াছিল যে সে ওয়ালাদের নামে 'কেস' (case) আনবে কারণ জবাদার ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত দেয়েছে। এইটি তার অভিমান নয়। জবার বাস্তবিক জ্ঞান যে সে ভদ্রলোকের মেয়ে।

জবামণি ব্রাহ্মণকন্যা। কাঙালীচরণ টাকা রোজগারের জন্য ফিকিরের জন্যে সন্ধ্যা আহ্নিক সারিতে নয়। রমেশের জবানিতে সন্ধ্যার মন্ত্র 'কন্তা পদ্মা পাতিকং' হলেও জবামণি স্বামীর সন্ধ্যা পূজার আবশ্যকতা মনে করে। এই রকম অবস্থাপন্ন জবামণি, কর্তব্য হিসাবে টাকা রোজগার করবার যে বাসেরই আবশ্যকতাই মনে করুক না কেন, গিরিশচন্দ্র তাহাকে ভাবে ভাবেই রেখেছেন! জবার মধ্যে বড় কোন কাজই গিরিশচন্দ্র জবাকে করিতে দেন নাই। জবা পিতামাতাকে উপায়ের বিরোধী। জবা রমেশের মধ্যে জোচ্চোর বিরোধী। যখন স্বামীর ব্যবহারে তাকে রমেশের মধ্যে দুষ্টামী হয় তখন সে একেবারে জীর্ণ হয়ে পুড়েছিল সে আমাকে কোন কিছুই দেখে নি। কোন কিছু প্রত্যক্ষ করোই আসে নি। উকিল এমিনিটের জন্যে সে একটা কিছু দিতে চাহিয়াছিল আর কিন্তু সে যে মোটা সন্ধ্যা দিয়েছিল

এমন কথা গিরিশচন্দ্র বলেন নাই। তখনই ডাক্তার এসে পড়েছিল। যাদব যখন পিসামার কাছে তখন রমেশেরও কথা ঠেলে যাদবকে জল দেয় তাহার কারণ আরো কিছুক্ষণ তাহলে ধুঁকবে। যাদব-হত্যাই যখন মূল উদ্দেশ্য তখন জগা যাদবকে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি দিতে চায়। একবার কথা উঠিয়াছিল যে মাদিনের ওষুধ মদনদাদার দ্বারা খাইয়ে যাদবকে হত্যা করা হোক। মদন ঘোষ আপত্তি হয়। মাদিনের ওষুধ যে খাওয়ান হয় এ কথাও গিরিশচন্দ্র বলেন নাই। ঠিক সেই সময় জগমণি, কাঙালী, রমেশ অন্য পক্ষের আগমন সন্দেহ করে তার তদবির করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সেই সময়ের মধ্যেই মদন দাদার সঙ্গে প্রফুল্ল সেই ঘরে আসিয়া পড়ে। না খাইয়ে যাদবকে মারবার মতলবও সিদ্ধ হতে পারে নি। মদন ঘোষ প্রতি রাত্রে যাদবকে দুধ খাওয়াইত তা না হলে যাদব চিঁ চিঁ করিতে করিতে অত শুকিয়ে কাঁদুনে গাইতে পারত না। একটা বেলেস্তারা যাদবের পেটে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা ডাক্তারের বিদ্যা না জগার অত্যাচার তাও গিরিশচন্দ্র বলেননি।

জগার মতন পাজির চিত্তকাহিনী নাটকের মধ্যে আর কেহই নাই। জগার মতলবের বিরুদ্ধে কাঙালীচরণ কোন কাজ করলে জগার মুখে যা আসে তাই বলে কাঙালীকে গালি দিলেও প্রকৃতপক্ষে জগমণি স্বামীর কার্য্যেই কায়মনোবাক্যেই প্রশ্রয় দেয়। কাঙালীচরণ দুর্ব্বল ও মূর্খ বলেই জগার বড় রাগ। যখন কাঙালী শিবনাথকে ফাঁসাবেই স্থির করে তখন জগা মদনঘোষকে অনুকূল সাক্ষী করিবার জন্য সচেষ্টিত। পাগলার কথায় ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যাইত। উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা ও যাদবকে রমেশের বাড়ি ফিরাইয়া আনিবার অনবরত চেষ্টার উদ্দেশ্য কাঙালীচরণের মাথায় ঢুকে নাই। মদন ঘোষের দ্বারা সমস্ত বাড়ীর দলিল চুরি করানোর উদ্দেশ্য কাঙালীচরণ কি রমেশের মাথায়ও আসে নাই। জগার এই সব করিবার দরকার ছিল যাতে স্বামী সকলকার হয়, রমেশের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি বখরাবাঁধার টাকাগুলো পেয়ে যায়। স্বামীর দুর্ব্বলতার জন্যই জগা অসুখী। তার স্বামী যদি বিশেষ করে দায় পেতে (তা অপরের কাছেই হউক আর জগার কাছেই হউক) মরণাপন্ন অবস্থায় ঝোলায় ঝুলতে ঝুলতে যেতে পারত তা হলে জগার সুখের সীমা থাকিত না।

জগার যে একটু দুর্ব্বলতা নেই তা নয়। প্রৌঢ়াবস্থাতেও তাহারও জ্ঞান যে সেও সুন্দরী। মদন ঘোষ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে যে কাঙালীচরণ কি তার দিদি, তাদের দেশে মেয়ে-পুরুষের কি মোক বেরোয় তখন এত বুদ্ধি থাকা জগা বুঝতে পারে নাই যে সে মদন ঘোষের ঘাড়াও খুঁচিয়া। শিবনাথের বাক্য, ম্যাজিষ্ট্রেটকেলীবের উপহাস সে কানেই আনেনি। জগা কোন কালে পরপুরুষাপেক্ষী হওয়া দূরে থাক সে অতিশয় ধার্ম্মিক, কেননা। সে রমেশকেও গ্রাহ্য করেনি, পুলিসকেও গ্রাহ্য করেনি। জগা কাজ আদায় করিবার দরকার হইলে মিষ্টভাষী ছিল না। উমাসুন্দরীর কাছে থেকে জ্ঞানদা ও প্রফুল্লকে তাড়াবার দরকার হইলে জগা লোকজন দ্বারাই বলিয়াছিল যে ঝোঁপাঝোড় কুলায় থেকে খেতে হয়। জগা একরোখা।

অর্থ উপার্জন যখন তাহার কাছে এক জন্য কাঙালীচরণের ব্যক্তিনিয়ে যদি তাহা তাকে পড়ে তাহা হইলে সে বোধ করেই বলেছিল যে সে বাপকাঙালীর সাথী হবে সকলকেই বাঁচিয়ে দেবে—এমন কি নিজেকেও। সকলে মিলে বেশ বাঁচবে কথার ভাবেও তা নেই। রমেশের মত চোর যদি কথার মত সরল মনের লোকের সঙ্গে জুয়াচুরী করে সে কথার কোন দুর্বলতার জন্য নয় কাঙালীচরণের শাস্তি নাই। তথা তখন কাঙালীর মহলের জন্য কাঙালীকেই শাস্তি দিতে পারে।

দার্শনিকের মতে মানব চরিত্র যতই সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হউক না কেন, প্রকৃতিতে এমন গুপ্তভাবে চরিত্র-সিন্ধু লুক্কায়িত থাকে যে তাহার বিকাশে মানব সমাজ চমৎকৃত হয়। কবি শতমুখে তাহার ব্যাখ্যা করেন। প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য কে জানিত যে ধাত্রী পান্না নিজ পুত্রকে বলি দিবে—আর চিতোরে কে জানিত শত শত নারী নিজ নিজ পুত্রের শরীর ভক্ষণ করিবে। সে স্ত্রীজাতি সমাজ ও সংসারে কেবলও ঝিঝি আবার পৃথিবীর যাবতীয় অকল্যাণের আকর। ভ্রাতৃবিরোধ, মাতৃপিতৃহত্যা, বন্ধুবিচ্ছেদ, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, যুদ্ধ, দাঙ্গা প্রভৃতির মূলেও নারী। অথবা অত্যাচারে মহাপাপের বীজ নারী। আবার আবার সেই নারীই জগৎপ্রসূতি। 'নিজ দেহ দ্বারা সন্তানপালনেও কাতর নয় আবার সন্তানের রক্ষণেও কাতর নয়।' এই নারী বিধাতার অপূর্ব কল্পনা এবং এই কল্পনা করিয়াই বিধাতা পূর্ণমনস্কাম হইয়াছেন। তিনি এই হেতুই লক্ষ্মীরূপা। কিন্তু কে তার লক্ষ্মী? গিরিশচন্দ্র প্রথমেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি প্রথমে সরল স্বদেশের মুখে এলো কথায় বলিয়েছেন। ঐশ্বর্যকিরণময় দৃশ্যে প্রথম দৃশ্যেই সেই গানটি গাহিয়া গেলেন—

"বৃথাও বনবাস লক্ষ্মীরূপা নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ জনী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি তব চিন্তা নিবারণ?"

রুক্মিণীরাই কি আর কমলিনীরাই কি, লক্ষ্মীলাভের অন্ত পাওয়া যায় না। রুক্মিণী সামাজিক লক্ষ্মী আর কমলিনী অসামাজিক। বাঙলার কথা-সাহিত্যে এই অসামাজিক কমলমণির বাঁচিয়ে রেখে বেশ বাহবা পেয়েছেন। কিন্তু এই কমলিনীরা লোভী নয়। ওদেরই তো ভাবের নিকুচে বাস দিবিয়ে ভাবের কি করে। কিন্তু এইখানেই কমলিনী পর্ব শেষ নয়। তাহার ভাবে ললিত বর্ধিত কমলিনী অবার সাহিত্যে উঠে না। মেয়ারপ, বড়, উপর, বর্তির ভাব শত শতাব্দে এই কমলিনীদের দীর্ঘ কাহিনীও দেখা যায় কমলিনীরা সেই ভাবেরই পরাজয়। এই কমলিনীদের সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"দেখবো উঠে কমল কোথা যায়,
মরবো মজা যেমন তেমন
ফুলের ধড় ফুল পরাণন
একি দায় কমল পালায়
দেখে হাসি পায়।"

'পালায়' অর্থে অবশ্য ভাগে। পুনশ্চ বলিতেছেন—

"কমলে যতন কোরো না
কেটে তীর কেন নীরে
বহুক পর না।"

অবশ্য এ কমল পিয়াসী যারা তাহাদের রাগ হইতে পারে। খনিতে গলিতে এ কমলের অভাব দেখা যায় না। দেখতে পাঁকের পদ্ম কিন্তু বাস্তবিক তারা প্রকৃত কমলিনী। তাদের লক্ষ্মীপনা, তাদের মানুষের উপর টান দেখে কালে কালে কত লোকই না চমৎকৃত হয়েছে। যদি তাদের এই অনন্ত প্রেমপ্রবাহকে লক্ষ্মীরূপা বলা না হয় তবে লক্ষ্মীপনা কি গাছে ফলে? একটা জাতি এই কমলদের আধার করিয়া রেখেছে—এই কমলরা তাদের ইষ্টদেব, দেবতা। ভক্তমাল এদের কাহিনী প্রকাশ করতে লজ্জা পাননি। ভাগবতের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক।

দ্বিতীয় স্তর সামাজিক রুক্মিণীগণের লক্ষ্মীপনা। প্রথমেই পিতৃকুলত্যাগ। খাস রুক্মিণীর আবার নাকি বাপ ভাই দুই কাটা পড়েছিল। সীতা বা সাবিত্রী বা দময়ন্তীর আমল হইতে এই রুক্মিণীদের বাপের বাড়ির দরজা ফুলেই যেতে হয়। বাপ ভাই, মা বোনের উপর একটু টান ধরা পড়লেই প্রতুল আর কি! এই সর্বহারা রুক্মিণীদের লক্ষ্মীপনার কোন মূল্যই নেই। তার উপর, তার উপর তাদের লক্ষ্মীপনা উপর্যুপরি সেবন করিয়া যায় বরে নিয়েও আবার সত্যভামার দরকার হয়। তারপর নারদ ঋষিদের ষোড়শ সহস্র। এই লক্ষ্মীকাহনের সীমা ও নেই অন্তও নেই। দেখা যায় লক্ষ্মী রুক্মিণীর ভাব কি আর লক্ষ্মী কমলিনীর কাছেই কি যেন কেনা বাদের প্রাপ্য হিসাবে লক্ষ্মীপনার উপভোগ কিবা সম্ভোগ করেন কিন্তু এক কড়ারও মর্যাদা দেন না। এ আদি নয়, আবহমানকাল এই ভাবেই চলে আসছে। এ চিত্রা নিবারণ করতে বুঝি চিত্রাঙ্গদও অপারগ।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে রুক্মিণীগণের অপেক্ষা কমলিনীগণের জোর বেশী ও বল বেশী। রুক্মিণীর বক্তব্য আমি ঔর আর কমলিনীর বক্তব্য তুমি আমার। কমলাটী পঙ্কজে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র কমার চরিত্র অঙ্কিত করিবার সময় এই কমলাটীর বাতিক্রম করিয়াছেন। যোগ হ'তে পূর্বসামাজিক রুক্মিণীকে জয় করে। এর উদাহরণ ভূরি ভূরি দেখা যায় আর এরূপ পাওয়া যায়। এই কমলিনী জৌলি দিক তার আধিপত্য। বঙ্কিমচন্দ্র এটা বেশ ব্যাপারে বিচ্ছ করিয়াছেন। জীবনচন্দ্র মজুমদার আর দেবেন্দ্র 'চৈত্র' আবার

পেয়ে তাদের একদিন বাইরেই দিয়েছিলেন আর 'নবীন তপস্বিনী'-র মালিনীর অবস্থায় ঝাপটে ঝাড়ি ঝাড়ি ডাক ছেড়েছেন। কিন্তু দিগিশচন্দ্র ভবানীচরণের উপর অবধারিত আধিপত্য দেখলে তাকে কখন যেন্নী ব'লে ভুল হতে পারে। ঐরকম আধিপত্য আজকালও নেই প্রচুরেরও নেই, উমাসুন্দরীর কোনকালে ছিলনা। অধিকন্তু তার 'আমারকে বাসে পুরে রাজ্যের হবে উঠে'-র দাবি আর একবারে লক্ষী ও সতী। নারীর উপর এই যে বুদ্ধি দূর করিবার প্রয়াস সুরেশ ইংলণ্ডোফির ক'রেছিল এবং তার সমকক্ষদের অনেকদিন যে বিকৃত রূপে দেখতে পারেনি। শিবনাথও সেখানে পরাস্ত, সুরেশ খাড়া ছিল। সুরেশের কোনরূপ নারী-চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না। সুরেশের কাছে নারী কেবলমাত্র লীলাসহচারিণী লীলার পুষ্টিবর্দ্ধিনী। নারী সবলাই হউক আর অবলাই হউক নারীচরিত্র চিরদিনই বিপন্ন। 'নারী নরকের দ্বারবর্তা' এ জ্ঞান সুরেশের নয়। নারী চিরদিন প্রেমময়ী, রসময়ী।

হুয়েন সাংএর ভারতে প্রবেশ ও ভ্রমণ

ভিক্ষু শীলভদ্র

আফগানিস্তান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে এক অরণ্যে হুয়েন সাং ও তাঁহার সহযাত্রীগণ দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। পরবর্ত্তী নগরে আসিয়া তিনি এক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ নিঃস্ব যাত্রীদিগকে প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি নিজে বৌদ্ধ মাধ্যমিকবাদে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া হুয়েন সাং তাঁহার নিকট এই মতবাদ শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইলেন এবং এইখানে প্রসিদ্ধনামা মাধ্যমিক আচার্য্য নাগার্জ্জুন এবং আর্য্যদেবের গ্রন্থ সকলও অধ্যয়ন করিলেন।

ইহার পর হইতে হুয়েন সাং যে যে স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন ঐ সকল স্থানে অনেকানেক প্রসিদ্ধ এবং মহাযানী আচার্য্য লাভ করা তাঁহার পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইয়াছিল। তিনি বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী চিনভুক্তি নামক স্থানে চতুর্দ্দশ মাস অবস্থান করিয়া মাধ্যমিক এবং হীনযান মতবাদীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। পরে তিনি জালন্ধর নগরে, এক ভিক্ষুর সহিত চারিমাস বাস করেন। ঐ সময়ে জালন্ধরে পঞ্চাশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।

ভ্রমণ করিতে করিতে হুয়েন সাং মথুরায় উপস্থিত হইলেন। এইখানে শারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, উপালি, আনন্দ এবং রাহুলের স্মৃতিচিহ্ন বৌদ্ধগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল।

মথুরার আম্রকুঞ্জের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়া হুয়েন সাং তথাকার আম্রবৃক্ষের 'অরণ্যের' উল্লেখ করিয়াছেন।

মথুরা পর্য্যটন শেষ করিয়া হুয়েন সাং কুরুক্ষেত্রের স্থানেশ্বরে (বর্ত্তমান থানেশ্বর) গমন করেন। ঐস্থান হইতে ক্রমাগত ভ্রমণ করিয়া তিনি বর্ত্তমান বিজনোর জিলার অন্তর্বর্ত্তী মতিপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে তিনি হীনযানের সর্ব্বাস্তিবাদ অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। মতিপুর হইতে কপিথে উপনীত হন। ঐস্থানে বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে স্বর্গস্থিতা মাতৃদেবীকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া মর্ত্ত্যে পুনরবতরণ করেন। হুয়েন সাং ঐ পবিত্র স্থানকে পূজা করিলেন। ক্রমে তিনি কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন।

ঐ সময়ে কান্যকুব্জ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল। হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নিহত হইয়াছিলেন। তদুপরি বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী শশাঙ্ক বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন করিতেছিলেন। ইহাই হর্ষবর্দ্ধনের শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানের কারণ। ছয় বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। হুয়েন সাং লিখিয়াছেন যে ঐ সময়ের মধ্যে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে আস্তরণ অপসারিত করিবার অবসর হয় নাই, সৈন্যগণ অহর্নিশি বর্ম্মপরিহিত ছিল। এই যুদ্ধে মগধের গুপ্তগণ হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফলে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত হর্ষের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কামরূপের রাজাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। হর্ষের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন ইতিপূর্ব্বেই হূনদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, উহার পরেও বর্ব্বরদিগের যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা নিঃশেষে হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াছিল। তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হর্ষের বাহিনী উত্তরে সুদূর ভোটাধিষ্ঠানের তুষারাবৃত পর্ব্বত পর্য্যন্ত হর্ষের জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। পশ্চিমদিকে হর্ষের রাজ্য গুজরাট ও কাথিয়াবাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রীয় রাজা চালুক্য পুলকেশী হর্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া ও দৃঢ়রূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতসম্রাট হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যের প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। হুয়েন সাং লিখিয়াছেন যে রাজ্যের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যের প্রভাবে হর্ষ আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। অশোকের ন্যায় তিনিও প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন; অশোকেরই ন্যায় তিনি সহস্র সহস্র স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তিনি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া পথিক, দরিদ্র ও আর্ত্তদিগকে খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হুয়েন সাং লিখিয়াছেন, "হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ, অথবা তাঁহাদের অমাত্য ও উচ্চ কর্ম্মচারীগণ সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্যকামী হইলে তিনি তাঁহা-

দিগের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় সিংহাসনে বসাইতেন, তাহাদিগকে বিদ্যা সংক্রান্ত সম্বোধিত করিতেন।" বর্ষার কয়েক মাস ব্যতীত বৎসরের অন্য সর্ব্ব সময়ে তিনি সর্ব্বদা সাম্রাজ্য পরিদর্শন ও সর্ব্ব বিষয়ে স্বয়ং অনুসন্ধানপূর্ব্বক অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতেন। প্রতিবৎসর তিনি সমস্ত জনপদ হইতে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া একত্রিত করিতেন, তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন, প্রচুর পরিমাণে দান করিতেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভিক্ষুকে স্বীয় সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতেন। স্বয়ং বৌদ্ধ হইয়াও তিনি প্রতিদিন এক সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত পাঁচশত ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইতেন। প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার তিনি সর্ব্বধর্ম্মের দরিদ্র ও যাচকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে দান করিতেন।

হুয়েন সাং কান্যকুব্জের ভদ্রবিহারে ৬৩৬ খৃষ্টাব্দের তিন মাসকাল বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ সময় তিনি ত্রিপিটকের টীকা পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। পুনরায় ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া হুয়েন সাং অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। নগরের নিকটে আম্রকুঞ্জবনে যে বিহারে দুই শতাব্দী পূর্ব্বে অসঙ্গ ও বসুবন্ধু তাঁহাদের উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মতের প্রচার করেন, তিনি ঐ বিহার দর্শন করিলেন। অযোধ্যা হইতে হুয়েন সাং নৌকাযোগে প্রয়াগে উপনীত হন।

ঐস্থানে এক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়া তাঁহার জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিল। তিনি গঙ্গাবক্ষে প্রায় দশ মাইল গমন করিয়া এমন এক স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন যেখানে নদীর উভয় তীর নিবিড় অশোক বৃক্ষের অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। ঐ অরণ্যে দস্যুদল লুক্কায়িত ছিল। দস্যুগণ যাত্রীদিগকে আক্রমণ করিল। ভয়বিহ্বল হইয়া আরোহীদের অনেকে জলে ঝাঁপ দিল, হুয়েন সাংএর নৌকা দস্যুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইল। তাহারা হুয়েন সাংকে ধৃত করিয়া তীরে লইয়া আসিল। সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, এমন কি তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহৃত হইল। তথাপিও হুয়েন সাং রক্ষা পাইলেন না। দুর্ব্বৃত্তগণ দস্যুগণ শক্তির (দুর্গা) উপাসক ছিল। প্রতি বৎসর শরৎকালে নরবলি দেওয়া তাহাদের প্রথা ছিল। ঐ উদ্দেশ্যে তাহারা কোন হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন পুরুষের সন্ধান করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া বলি দিত এবং তাহার রক্ত ও মাংস দেবীকে নিবেদন করিত। হুয়েন সাংএর বলিষ্ঠ ও সুন্দর দেহ দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে বলির উপযুক্ত স্থির করিল। হুয়েন সাং তাহাদিগকে বলিলেন, "যদি এই অকিঞ্চিৎকর ঘৃণিত দেহ হইতে তোমাদের বলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা হইলে আমার কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু আমি পুণ্যতীর্থসমূহের পূজা করিবার জন্য, পবিত্র গ্রন্থসমূহের সংগ্রহের জন্য, ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, দূর দেশ হইতে আগত; আমার ঐ সমস্ত কামনা এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই অবস্থায় যদি তোমরা আমার প্রাণ বিনাশ কর তাহা হইলে তোমাদের ঘোরতর অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।" সহযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ হুয়েন সাংএর পরিবর্ত্তে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না, দস্যুগণ কর্ণপাত। দস্যুদলপতি পুষ্পিত অশোক

কূলের মধ্য হইতে জল আনিবার জন্ত অনুচরগণকে প্রেরণ করিল এবং নদীর মৃত্তিকা দ্বারা বেদী নির্মাণ করিতে আদেশ দিল। তৎপরে দুইজন দস্যু হুয়েন সাংকে বলপূর্ব্বক বেদীতে স্থাপিত করিয়া খড়্গাঘাতে বলিদানে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু হুয়েন সাং-এর বদনমণ্ডলে কোন প্রকার ভয় বা উদ্বেগের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। তিনি দস্যুগণকে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

হুয়েন সাং বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়কে স্মরণ করিয়া বোধিসত্ত্বের স্বর্গাবাসে সর্ব্বতোভাবে লালায়িত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন তিনি যেন সেই স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া মৈত্রেয়ের পূজা করিতে পারেন, তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম শ্রবণ করিয়া সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, পরে তথা হইতে পুনরায় এই পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়া এই সকল দস্যুকে ধর্মোপদেশ দিতে পারেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের পাপবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু জীবন যাপন করিতে পারে, এবং সর্ব্বশেষে দূর-দূরান্তরে ধর্মের বাণী প্রচার করিয়া সর্ব্ব প্রাণীর সুখ ও শান্তির বিধান করিতে পারেন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তিনি সর্ব্ব বুদ্ধের পূজা করিলেন। পূজান্তে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার বোধ হইল তিনি যেন ঊর্দ্ধে—অতি ঊর্দ্ধে, সুমেরুর চূড়া যত উচ্চ তত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছেন, এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক, দুই, তিন দেবলোক অতিক্রম করিয়া জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে আরূঢ় দেবমণ্ডল পরিবেষ্টিত মৈত্রেয়ের দর্শন লাভ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী বাহ্যজ্ঞানশূন্য, শিরোপরি উত্থিত খড়্গ এবং রক্তপিপাসু দস্যুগণের উপস্থিতি একদম তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সহযাত্রীগণ বিলাপ ও অশ্রুমোচন করিতেছিল। হঠাৎ প্রবল ঝঞ্চা উত্থিত হইয়া বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিল, বালুকারাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল, নদীর জলে ভীষণ তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, ঐ তরঙ্গের আঘাত সহ্যে অক্ষম হইয়া নৌকাগুলি জলমগ্ন হইল। দস্যুগণ সন্ত্রস্ত হইয়া যাত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিল হুয়েন সাং কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন? তাহারা সন্ন্যাসীর পরিচয় প্রদান করিলে দস্যুগণ ভীতিবিহ্বল হইয়া হুয়েন সাং-এর চরণে পতিত হইল। কিন্তু কি ঘটিতেছিল হুয়েন সাং তাহা জানেন না। দস্যুগণের একজন হুয়েন সাং-এর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্ত তাঁহার বসনাঞ্চল স্পর্শ করিলে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার সময় উপস্থিত হইয়াছে কি না। নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি দস্যুদিগের দুঃখিত কথা শুনিলেন। অনন্তর দুর্জ্জনগণকে তিনি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা অঙ্গীকার করিয়া অস্ত্রাদি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিল। ঝঞ্চা প্রশমিত হইল, গঙ্গার বিক্ষুব্ধ জলরাশি শান্ত হইল, দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ হুয়েন সাংকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিল।

এস্থানে দস্যুদের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার পর হুয়েন সাং গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ নগরীতে উপস্থিত হইলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে প্রয়াগ গুপ্ত সম্রাটদিগের অন্যতম রাজধানী ছিল। হুয়েন সাং-এর আগমনকালে ঐ নগর বহু জনপূর্ণ ছিল, কিন্তু

অধিবাসীদিগের মধ্যে বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যাই অধিক ছিল। সেখানে দুইটি বিহার ছিল, দুইটিই হীনযানীদিগের।

প্রয়াগে গঙ্গা নদী হিন্দুগণ কর্তৃক কিরূপ পূজিত হইত হুয়েন সাং তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে সেখানে স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় শত শত নর নারী গঙ্গার জলে মৃত্যু প্রার্থী হইত। এমন কি মৃগ ও বানরের দলও গঙ্গাতীরে একত্রিত হইত, গঙ্গা জলে অবগাহন স্নান করিত, কখন কখন তাহারা সেই স্থানে আহারে বিরত হইয়া উপবাসে প্রাণত্যাগ করিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুয়েন সাং উল্লেখ করিয়াছেন যে সম্রাট হর্ষের রাজত্বকালে একটি বানর গঙ্গাতীরে জলের সন্নিকটে একটি বৃক্ষে বাস করিত। ঐ বানর আহার গ্রহণ না করিয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াছিল।

অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার মানুষকে কত দূরে লইয়া যাইতে পারে, উহার প্রভাবে মানুষের কিরূপ শোচনীয় মানসিক দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহা দেখাইয়া হুয়েন সাং প্রয়াগের একটি হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন: "নগরের মধ্যে একটী দেবমন্দির আছে, উহার ঐশ্বর্য্য চমৎকার; উহাতে বহু অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ঐস্থানে একটী মাত্র মুদ্রা দানের যে পুণ্য, ঐ পুণ্য অন্যস্থানে এক সহস্র মুদ্রা দান করিলে যে পুণ্য হয় তাহা অপেক্ষাও অধিক! শুধু তাহাই নয়, এই মন্দিরে যদি কেহ আত্মহত্যা করে সে স্বর্গ লাভ করে। প্রধান কক্ষের সম্মুখে একটী বৃহৎ বৃক্ষ আছে, উহার শাখা ও ঘন পল্লব-সমূহ হইতে নিবিড় ছায়ার সৃষ্টি হয়। এক নরমাংসভোজী রাক্ষস সেই বৃক্ষে বাস করে। সেই জন্যই বৃক্ষের দক্ষিণে ও বামে স্তূপীকৃত মনুষ্যের অস্থি। যে মুহূর্তে এই মন্দিরে কেহ প্রবেশ করে সেই মুহূর্তে সে আত্মহত্যা করে। নিজের ভ্রান্তি ও প্রেতের প্রলোভন দ্বারাই সে উহাতে প্রবৃত্ত হয়। প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত এই নিষ্ঠুর প্রথা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে।"

হুয়েন সাং-এর প্রয়াগে আগমন কালে ঐ মন্দিরে এক অতি শোচনীয় এবং লোমহর্ষক ঘটনা হইয়াছিল। এক দৃঢ়-চেতা ব্রাহ্মণ মন্দির সম্বন্ধে ঐ জঘন্য কুসংস্কার দূর করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিবা মাত্র আত্মঘাতী হইবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বৃক্ষ হইতে ঝুলিতে ঝুলিতে উচ্চৈস্বরে বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "আমি মরিব। আমি পূর্ব্বে বলিতাম উহাদের কথা মিথ্যা, কিন্তু এখন আমি দেখিতেছি উহা সত্য। ঋষি ও দেবগণ উপর হইতে তাঁহাদের নিকট যাইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিতেছেন। এই পবিত্র স্থানে এই ঘৃণিত দেহকে পরিত্যাগ করাই আমার কর্তব্য।" ইহা বলিয়া তিনি নিজেকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রয়াগ হইতে হুয়েন সাং বৎস রাজাদিগের অপর রাজধানী কৌশাম্বি গমন করেন। ঐস্থানে তখন দশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সবগুলিই হীনযানীর। ঐ সকল মঠে প্রায় তিন শত ভিক্ষু ছিল। উহা ব্যতীত সেখানকার একটী অশোক স্তূপ, যে বিহারে বুদ্ধ বহুদিন তাঁহার

একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ঐ গৃহ এবং অসঙ্গ যে আম্রকুঞ্জে বাস করিয়াছিলেন ঐ কুঞ্জ হুয়েন সাং দেখিয়াছিলেন।

কৌশাম্বি হইতে হুয়েন সাং তাঁহার ভ্রমণের গতি পরিবর্তিত করিয়া উত্তরাভিমুখী হইলেন। ঐদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি প্রথমে অযোধ্যায় শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান বর্তমানে সাহেত-মাহেত নামে পরিচিত। বুদ্ধের সময় উহা প্রাচীন কোশলের রাজধানী ছিল, তখন রাজা প্রসেনজিৎ ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে উহা প্রায় জনহীন হইয়াছিল, কেবল অতীতের নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি ধ্বংসের স্তূপ বর্তমান ছিল।

এই শ্রাবস্তিতেই জেতবন উদ্যান ছিল, যাহা অনাথপিণ্ডিক বৌদ্ধ সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোক স্তম্ভ ও শিলালিপি দ্বারা উদ্যানের ভূমি চিহ্নিত করিয়াছিলেন। হুয়েন সাং-এর আগমন কালে দুইটী স্তম্ভ এবং উহাদের নিকটস্থ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান ছিল। ঐ শ্রাবস্তিতেই বুদ্ধ তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধ এবং তাঁহার বিরোধী তিন জন তপস্বীর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিযোগিতায় বুদ্ধ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঋদ্ধি-বল দেখিয়া জনগণ স্তম্ভিত হইয়াছিল। তিনি শূন্যে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ হইতে নানা বর্ণের রশ্মি নির্গত হইয়াছিল, স্কন্ধদেশ হইতে অগ্নিস্রোত ছুটিয়াছিল, পাদদেশে শীতল স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়াছিল, তিনি নাগরাজগণ নির্মিত পদ্মাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন—দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে ইন্দ্র, অগণ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম ভূতল ও আকাশ ব্যাপ্ত করিয়াছিল—প্রত্যেক পদ্ম তাঁহারই মত এক একটী বুদ্ধকে বহন করিতেছিল!

ঐস্থানেই মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুণী বিহার যে স্তূপ দ্বারা চিহ্নিত ছিল, হুয়েন সাং সেই স্তূপ দেখিয়াছিলেন। উহার অদূরে অঙ্গুলিমালের স্তূপ ছিল। বিখ্যাত জনঘাতী দস্যু ও নরহন্তা অঙ্গুলিমাল বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কাশীরামদাস ও তাঁহার মহাভারত

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ]

১। **কাশীরামদাসের বংশ-পরিচয়।**—কমলাকান্তদাস দেবের পিতার নাম সুধাকর ও পিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর। কমলাকান্তের তিন পুত্র ছিলেন,—কৃষ্ণদাস, কাশীরামদাস ও গদাধরদাস। কমলাকান্তের ন্যায় তাঁহার এই তিন পুত্রই ঘোর নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস', কাশীরামদাস 'মহাভারত' ও গদাধরদাস 'জগন্নাথ-মঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

২। **কাশীরামদাসের জন্ম-স্থান।**—বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত কাটোয়া অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা ইন্দ্রাণী-পরগণার অন্তর্গত। কাটোয়ার প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে সিঙ্গি-নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই সিঙ্গি-গ্রামই কাশীরামদাসের জন্ম-স্থান।

৩। **কাশীরামদাসের জন্ম-সময়।**—কাশীরামদাসের ঠিক জন্ম-সময় পাওয়া যায় না। মুরশিদাবাদ-জেলার অন্তর্গত কান্দী-গ্রামের একখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথিতে বিরাট-পর্ব্বের শেষে এই কবিতাটী লিখিত আছে:—

"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥"

এই কবিতার অর্থ এইরূপ,—চন্দ্র = ১; বাণ = ৫; পক্ষ = ২, ঋতু = ৬। এখানে "অঙ্কস্য বামা গতিঃ", এই নিয়ম না ধরিয়া "দক্ষিণা গতিঃ" ধরিতে হইবে। অতএব ১৫২৬ শকাব্দ পাওয়া গেল। এখন প্রমাণ হইল যে, কাশীরামদাস ১৫২৬ শকাব্দে [১০১১ বঙ্গাব্দে বা ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে] আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এবং এই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। যদি ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিরাট-পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তখন তাঁহার বয়স্ অন্ততঃ ৭০ বৎসর। অতএব মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে, কাশীরামদাস ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ আকবর-বাদসাহ ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, কাশীরামদাস ও আকবর-বাদসাহের জীবিত-কাল প্রায় এক সময়েই বিদ্যমান ছিল।

৪। **কাশীরামদাসের মৃত্যু-সময়।**—পূর্ব্বেই প্রমাণ হইয়াছে যে, কাশীরামদাস ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এখন আমরা নিম্ন-লিখিত শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিব যে, তিনি এই চারিপর্ব্ব সমাপ্ত করিয়া এই বৎসরেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন:—

(১)

"আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
রচিয়া কাশীরাম গেলা স্বর্গপুর॥"

(২)

"ধন্য হইল কায়স্থ-কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥"

(৩)

"ধন্য ধন্য কায়স্থ-কুলেতে কাশীদাস।
চারি পর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥
আদি সভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্ব লোক ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্ব্বে তেঁহ আরম্ভিয়াছিল এই পুঁথি।
কালবশে মৃত্যু তাঁর হৈল দৈবগতি॥" (১)

উক্ত কবিতাগুলি দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কাশীরামদাস আদি, সভা ও বন এই তিনটী পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়া এবং বিরাট-পর্ব্বের কিয়দংশমাত্র রচনা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট পর্ব্বগুলি তাঁহার পুত্র নন্দরাম-দাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

৫। **নন্দরামদাস**।—নন্দরামদাস কাশীরামদাসের পুত্র ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, নন্দরাম কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র। নন্দরাম যে কাশীরামের পুত্র ছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত শ্লোকগুলি দ্বারা সপ্রমাণ হয়:—

(১)। "নন্দরাম দাস কহে সেবি রামাপতি।
তোমা বিনা প্রভু কৃষ্ণ নাহি মোর গতি"॥ (ক)

(২)। "দ্রোণ-পর্ব্ব কথা অমৃত সমান।
নন্দরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥"

(৩)। "নন্দরামদাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥"

(৪)। "পিতৃ পদ রজ লয়্যা কাশীর নন্দন।
জনকের আজ্ঞামত করিল রচন॥"

আদি, সভা, বন ও বিরাট-পর্ব্বে যেরূপ মনোহর ভাব ও শব্দ-সম্পদ আছে, তাহা অবশিষ্ট ১৪ পর্ব্বে নাই। "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি"; "দিব্য কবচ, কুণ্ডলাদি ভূষণ", "পীনোন্নতপয়োধরা পীনস্তনী"; "অরিন্দম যেন পাণ্ডবানে আচ্ছাদিত" ইত্যাদি সমস্ত ভাষার ভাব ও শব্দ-সম্পদ আদি হইতে বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বিরাট-পর্ব্বের পরে

(১)। মৎ-সম্পাদিত "সচিত্র সটীক ও বিশুদ্ধ কাশীরামদাস-মহাভারত" (ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস), ১১ পৃষ্ঠা।

(ক) (১) কলিকাতা ইউনিভার্সিটী পুঁথি নং ২১৪০, দ্রোণ; ১১০৩, ৯ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার। (২) ইউনিভার্সিটী পুঁথি নং ২১৩৮, দ্রোণ। (৩) ইউনিভার্সিটী পুঁথি, নং ২১৩৭, দ্রোণ, ১২৩৩ সাল, ১০ আশ্বিন। (৪) [illegible] পুঁথি, স্বর্গ।

ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কাশীরামের যেরূপ অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি ছিল, নন্দরামের সেরূপ ছিল না, ইহা প্রথম চারি পর্ব ও অবশিষ্ট চতুর্দশ পর্ব পাঠ করিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। মূল কথা এই যে, কাশীরাম প্রথম চারি পর্ব ও নন্দরাম শেষ চতুর্দশ পর্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন।

৬। **কাশীরামদাস-মহাভারতের বিশেষত্ব।**—কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" ও কাশীরামদাসের "মহাভারত" হিন্দু-নর-নারীর অতি পবিত্র ও আদরণীয় গ্রন্থ। কি পূর্ব-বঙ্গ, কি পশ্চিম-বঙ্গ, সমস্ত বঙ্গদেশেই উক্ত রামায়ণ ও মহাভারত ভক্তিভরে পঠিত হইত। শতাধিক বৎসর পূর্বেও এই দুইখানি পবিত্র গ্রন্থ তুলসী-চন্দন দ্বারা পূজিত হইয়া ধার্মিক গৃহস্থ-গণের গৃহে গৃহে বিরাজ করিত। পূর্বকালে যাঁহারা কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিতেন, তাঁহারাই ভক্তি-সহকারে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন। যাহারা কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিত না, তাহারাও অপরের মুখে পাঠ শুনিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দ অনুভব করিত। এই দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ বহুদিন হইতেই বঙ্গ-নর-নারীর মানসিক আহার প্রদান করিয়া আসিতেছে।

পূর্বে লোকের এরূপ দৃঢ় ধারণা ছিল যে, কাশীরামদাসের মহাভারত গৃহে থাকিলে কখনই কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে না। কাশীরামদাস তাঁহার মহাভারতের শেষভাগে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"সম্পূর্ণ ভারত যার গৃহে সর্বক্ষণ।
তার গৃহে রন্ সদা লক্ষ্মী-নারায়ণ॥
অগ্নি ভয় আর জল-চোর-মৃত্যু-ভয়।
পাপ তাপ শোক দুঃখ সব হয় ক্ষয়॥
রাক্ষস যক্ষ ও অকাল-মরণ।
ভূত প্রেত আদি দক্ষ সর্প তারণ॥
সম্পূর্ণ ভারত-গ্রন্থ থাকে যার ঘরে।
এ সকল পীড়া তারে কভু নাহি ধরে॥"

কাশীরামদাসের এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেকালের প্রায় গৃহস্থগণ এক একখানি কাশীরামদাস-মহাভারত গৃহে রাখিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতেন। এখন আর সেদিন নাই। এখন রামায়ণ ও মহাভারতের পরিবর্তে নাটক, উপন্যাস ও গল্পের বই অধিক-পরিমাণে বিরাজ করিতেছে। তবে মুদি-মশলার দোকান-গৃহে দুই একখানি রামায়ণ ও মহাভারত এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

৭। **কেরি-সাহেব ও জয়গোপাল-তর্কালঙ্কার কর্তৃক কাশীরামদাস-মহাভারতের সংস্কার।**—নদীয়া-জেলার অন্তঃপাতী বর্গী-বজ্রপুর অন্তর্গত বজ্রাপুর-নিবাসী জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনরি

(১) মৎ-সম্পাদিত "সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ কাশীরামদাস-মহাভারত" (দুই খণ্ড; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস) প্রথম খণ্ড ১০-১৬ পৃষ্ঠা।

পাদরী কেরি-সাহেবের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কেরি-সাহেব তাঁহারই নিকটে বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা করিয়া পরিশেষে "ফোর্ট-উইলিয়ম-কলেজে" বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি বাঙ্গালীদিগের নিমিত্ত কৃত্তিবাস-রামায়ণ ও কাশীরামদাস-মহাভারত লিখিয়া দিন।" জয়গোপাল ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেরি-সাহেবের নিকটে কর্ম করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল, কাশীরামদাস-মহাভারতের সংস্কার করিয়া তুলিলেন। তিনি দেখিলেন, এখন বাঙ্গালা-ভাষার যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে কাশীরামের স্বলিখিত মহাভারত হিন্দু নর-নারীর তত সুখকর হইবে না। তিনি আরও দেখিলেন, মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ পরস্পর বিভিন্ন। ইহা ভাবিয়া তিনি দুরূহ অপ্রচলিত শব্দের পরিবর্তে সরল ও প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি কাশীরামের পয়ার-ছন্দের কিছুমাত্র পরিবর্তন করিলেন না। তবে প্রাচীন পুঁথিতে এমন অনেক উপাখ্যান আছে, যাহা তাঁহার নিকটে সুখকর ও প্রীতিকর হইল না। এই হেতু, তিনি তাহা বর্জন করিলেন। তিনি এমন কয়েকটী উপাখ্যান স্বয়ং রচনা করিলেন, যাহা অন্য কোন পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জয়গোপাল "শ্রীরামপুর মিশন প্রেস" হইতে চারি-খণ্ডে "কাশীরামদাস-মহাভারত" প্রকাশিত করেন। প্রথম খণ্ডের টাইটেল পেজে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

[ইংরাজী]

The Mahabharat
A poem
Book the First
In four volumes
Translated from the original Sanskrit
By Kashee Ram Dass
Vol I
Serampore
Printed at the Mission Press
1801

[বাঙ্গালা]

মহাভারত
আদ্যোক্ত
পয়ারাদি ছন্দ
কাশীরামদাস বিরচিত
প্রথম বহি

৮। জয়গোপাল-তর্কালঙ্কার ও গৌরমোহন-বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক কাশীরাম-দাস-মহাভারতের সংস্কার। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার স্বাধীন-ভাবে দুই খণ্ডে সমগ্র অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত বাহির করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার এবিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া কাশীরাম-মহাভারতের বহুল পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহারা কাশীরামের কোন কোন উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া কোন কোন উপাখ্যান স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছেন। প্রথম-খণ্ডের 'টাইটল-পেজে' ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

[ইংরাজী]

The Mahabharat
Translated into Bengali Verse
by
Kasee Dass
and
Revised and collated with Various
Manuscripts
by
Joy Gopal Tarkalankar
of the Government Sanskrit College
Calcutta
In two Volumes
vol I
Printed at the Serampore Press
1836

[বাঙ্গালা]

মহাভারত
আদি সভা বন পর্ব্ব
গৌড়ীয় ভাষাতে কাশীরাম কর্তৃক পদ্য রচিত
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
কর্তৃক সংশোধিত হইল।
দুই বালম
অর্থাৎ প্রথম বালম
শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল
শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা
কলিকাতার লালদিঘীর ছাপাখানার ডিপোজিটরি
সাহেবের স্থানে বিক্রয়,
১৮৩৬

৯। মধুসূদন শীল ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কাশীরামদাস-মহাভারতের সংস্কার।—যখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক, তখন কলিকাতা-বটতলায় মধুসূদন শীল নামক একজন পুস্তক-বিক্রেতার আবির্ভাব হয়। ইনিই বটতলায় সর্ব্ব-প্রথম পুস্তকের দোকান খুলেন। কৃত্তিবাস-রামায়ণ ও কাশীরামদাস-মহাভারতের পুনরুদ্ধার করিয়া পাঠক-সমাজে ইহাদের প্রচার-বৃদ্ধি করাই মধুসূদনের অভিপ্রেত হইল। প্রাচীন পুঁথির ভাষা তাঁহার মনোমত হইল না। তিনি ১৩ জন সুকবি পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ইহাদের সংস্কার আরম্ভ করিলেন। এইরূপে প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির পাঠ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত, পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইল।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে, ৭ জানুয়ারি, শনিবার ও ১২ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার দিবসের "সংবাদ ভাস্করে" মধুসূদন শীলের মহাভারতের দুইটী 'বিজ্ঞাপন' দেখিতে পাওয়া যায়। "সংবাদ ভাস্করের" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) মধুসূদনের মহাভারত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"বিজ্ঞাপন। কাশীদাসি মহাভারত। কলিকাতা নগরীর শোভাবাজার বটতলাস্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারি শ্রীযুত বাবু মধুসূদন শীল কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীরামপুরীয় পাদরী শ্রীযুত মার্সমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার পরে এই ছাপা হইল, মধুসূদন শীল অগ্র গ্রাহকদিগের স্থানে চারি টাকা নগদ ক্রেতাদিগের স্থানে পাঁচ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে মহাভারত পাঠ শ্রবণ করিতে ধনিগণের সহস্র সহস্র টাকা পার হইয়া যায় আমাদিগের পাঠক মহাশয়েরা কি পাঁচ টাকাতেও সে মহাভারত পাঠ করিতে অশক্ত হইবেন"। (১)

মধুসূদনের মহাভারতের টাইটল-পেজে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশিবদুর্গে নমঃ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।
সংস্কৃত মূল মহাভারত।
যাহা কাটোয়া পরগণার এলাকায়
সিঙ্গিগ্রামনিবাসী ৺কমলাকান্ত
কাশীরাম দাস কৈল বাঙ্গালার
পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ করণে
শ্রীশ্রীশ্রীবিদুপদ মহোদয়ের বিজয়

(১) মৎ-সম্পাদিত "সচিত্র সটীক ও বিশুদ্ধ কাশীরামদাস-মহাভারত", ১৩ পৃষ্ঠা। মধুসূদন শীলের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজমোহন শীল মহাশয়ের দ্বিতীয় পৌত্র বন্ধুবর শ্রীঈশানচন্দ্র শীল মহাশয় আমাকে উক্ত "বিজ্ঞাপন" দেখিতে দিয়াছিলেন। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে সুশিক্ষিত লোকগণ কিরূপ বাঙ্গালা-ভাষা লিখিতেন, তাহা উক্ত "বিজ্ঞাপন" দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।—লেখক

মূ দৌং কৃষ্ণমণে পাঠ করিয়াছেন ও তৎকর্তৃক
করাইয়াছেন
আদি সভা বন বিরাট প্রভৃতি অষ্টাদশ
পর্ব্বের অনুবাদ
পয়ারাদি ছন্দে
৺কাশীরাম দাস অনুবাদকারী ও
প্রণয়নকারী।
১৮৭৪

১০। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (ওরফে ভট্টাচার্য্য)-কর্তৃক কাশীরামদাস-মহাভারতের সংস্কার। —জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মধুসূদন শীল এই মহাভারতের বহুল পরিবর্ত্তন করিলেন। বাজারে তাঁহাদের পুস্তকের বিলক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গৌরীশঙ্কর ভাবিলেন, আমিই বা ছাড়ি কেন !! তিনি বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কাশীরাম-মহাভারতের আমূল সংস্কার করিতে লাগিলেন। শোভাবাজারের রাজা ৺কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয়ের নিকটে যে সকল পুঁথি ছিল, তিনি তাহাদেরই সাহায্য বিশেষ-রূপে গ্রহণ ও আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দুই খণ্ডে মহাভারত প্রকাশ করিলেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন :—

"দ্রোণ পর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥
শ্রীগৌরীশঙ্কর বলে পুণ্য কথা বটে।
সংশোধনে ফেলিয়াছে আমারে সঙ্কটে॥"

গৌরীশঙ্করের মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ডের "টাইটল-পেজে" যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

মহাভারত
দ্বিতীয় খণ্ড
উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত
বঙ্গভাষা পদ্য
কাশীদাস বিরচিত
শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক
সংশোধিত
কলিকাতা
শোভাবাজার ভাস্কর যন্ত্রে
মুদ্রিত
সন ১২৫২ সাল পৌষ
প্রিন্টর শ্রীমহেশচন্দ্র দাস

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী শঙ্করানন্দ

গীতায় অন্যত্র ভগবান বলিয়াছেন, "হাজার হাজার লোকের মাঝে হয়ত একজন পূর্ণত্ব বা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করেন। এরূপ যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহাদের ভিতরেও অল্পসংখ্যকই মাত্র এই আত্মতত্ত্ব বা পূর্ণত্ব লাভ করিতে সক্ষম, আর বেশীর ভাগ লোকই এই তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য প্রস্তুত নহেন।" যাহারা এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য এখন প্রস্তুত নহেন, তাহারা কি কখনই এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইবেন না? না, তাহারাও এই তত্ত্ব অবগত হইবেন, তবে তাহার জন্য হয়ত তাহাদিগকে বহুজন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে, হয়ত বা এক বা দুই জন্ম পরেই তাহাদের এই জ্ঞানের উদয় হইতে পারে। যতদিন না তাহারা এই আপাত প্রতীয়মান, আপাতমধুর সংসারের ভোগসুখে বিরক্ত হইয়াছেন—যতদিন না তাহারা বুঝিয়াছেন এই জগৎ নশ্বর ও গতিশীল ততদিন তাহারা এই ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধির অজ্ঞাত ও অগোচর সত্য লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন না।

এই চিরসত্য—চির অপরিবর্তনশীল সত্তাকে জানিবার পথে সাধারণ মানব বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। বিষয়ভোগের বাসনা, সংসারে আসক্তি, শরীরের প্রতি আকর্ষণ ও নদীর স্রোতের ন্যায় গতিশীল জীবনকে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই কয়টিই হইতেছে প্রধান বাধা সমূহ। এমন আমাদের যাহা আছে তাহা আমরা হাতছাড়া করিতে রাজী নই, ইহাকে আমরা চিরকাল করতলগত করিয়া রাখিতে চাই, এই জীবনের ইন্দ্রিয়জ সুখভোগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া আমরা আর এই বিষয়াসক্তির রাজ্যের উপরে উঠিতে পারি না। এই আসক্তি বা "আমি" "আমার" রূপ এই সূক্ষ্ম অহং বোধের রজ্জু দ্বারা সমস্ত জগৎ আবদ্ধ হইয়া আছে। যেখানে এই "আমি" "আমার" জ্ঞান রহিয়াছে, জানিতে হইবে সেইখানেই সংসার আসক্তি বিরাজিত, ইহা ধ্রুব সত্য। নিজেকে অমুক দত্ত, অমুক বাবু, এইভাবে চিন্তা করিবার কি প্রয়োজন? যখনই আমরা এই সকল নাম ও রূপ হইতে নিজেদের পৃথক করিয়া ফেলিব, যখনই আমরা "এটী আমার" "ওটী আমার" এই মালিকত্বের ভাব বিদূরিত করিতে সক্ষম হইব, তখনই এই জগতের প্রতি আসক্তি দূর হইয়া যাইবে। এই জন্যই বিজ্ঞগণ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "হে প্রভো যাহা কিছু আমার, তাহা সকলই তোমার, যাহা কিছু তোমার তাহা সকলই আমার।"

যখন আমরা সকল দুর্নীতি পরিহার করিতে সক্ষম হইব, তখনই আমরা জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ প্রভৃতির আবাসভূমি এই দ্বৈতভূমি হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিব। তখনই আমরা এই আসক্তির সূক্ষ্ম রজ্জুকে ছেদন করিতে পারিব,

* পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের "Gita Lectures" অবলম্বনে।

তখনই আমরা যাহা সত্য, যাহা অনন্তকালস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনশীল তাহাকে জানিবার জন্য উন্মুখ হইব। সেই সময়ে যদি আমরা এমন কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই যিনি এই তত্ত্ব—এই অপরিবর্ত্তনশীল সত্তাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি এই তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে আমরা এই মুক্ত উপদেষ্টার নিকট গমন করিয়া, এবং তাহার অনুসরণ করিয়া সর্ব্বোচ্চ সত্য লাভ করিতে সক্ষম হইব। তখনই আমরা জানিতে পারিব জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত এই আত্মা মরণধর্মশীল নহেন—ইনি শরীরে বাস করেন বটে, কিন্তু শরীরের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, শরীর নাশ হইলেও তাঁহার কোনও ক্ষতি, হ্রাসবৃদ্ধি বা পরিণাম হয় না, সুতরাং শরীর নাশের জন্য আমাদিগের শোক প্রকাশ বা দুঃখ করা বৃথা।

এতক্ষণ আমরা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, যিনি বিনাশধর্মশীল শরীরে বাস করিলেও অবিনাশী। কিন্তু এখন আমরা, কর্ত্তা, যিনি চিন্তা করেন ও সর্ব্ববিধ কার্য্য করেন, তাঁহার কথা চিন্তা করি এবং দেখিতে পাই ইনিও অবিনাশী। শরীর নাশের পরও ইনি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারেন, ইহাও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে, ইঁহার সহিত সকল শক্তি সকল সংস্কারের আধার, সূক্ষ্মশরীর বা মন বিজড়িত আছে, ইহারও অনন্ত শক্তি আছে।

কতগুলি শক্তি অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এখন বিকশিত হইয়াছে, অন্যগুলি এইপ্রকার অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরে বিকশিত হইবে। বিশ বৎসর আগে আমরা যাহা ছিলাম, তাহা কি এখন আছি? বিশ বৎসর পরে এখন যাহা আছি, পরে তাহা থাকিব কি? আমাদের ভিতর এই সময়ের ভিতর নানাপ্রকার শক্তি বিকশিত হইয়াছে এবং আমাদের আরো পরিবর্ত্তন হইবে। প্রতি সাত বৎসরে আমাদের শরীরের প্রতি অণুপরমাণু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মস্তিষ্কের কোষসমূহও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং মন অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষের এই সূক্ষ্ম শরীর জন্মে জন্মে নব নব স্থূল শরীর ধারণ করিয়া তাহাদের কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, এবং যতদিন না আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন ইহা নিজের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করিবে, আত্মজ্ঞান হইলে—পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে—এবং সকল ধর্মের যে শেষ-লক্ষ্য তাহা লাভ করিতে সক্ষম হইলে এই শরীরের সহিত আত্মার যে অজ্ঞান তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহাই মুক্তি।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব

আগামী ১৭ই আশ্বিন ১৩৪৯ (৩রা অক্টোবর ১৯৪২) শনিবার কৃষ্ণানবমী তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে (১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট) বিশেষ পূজা, ভজন, সঙ্গীত ও আনন্দোৎসব হইবে।

FREEDOM OF THE SOUL

SWAMI ABHEDANANDA

The ideal of the universal religion of Vedanta is the attainment of absolute freedom, the emancipation of the soul from all bondage of selfishness, imperfection and earthly attachments. It is called in Sanskrit "*Moksha*" ("Mukti"), which literally means freedom. From very ancient times, the saints, sages, philosophers and spiritual teachers of this universal religion have upheld this grand ideal, have preached it amongst the masses, and have struggled themselves to attain it during their life-time. When we read the history of the Orient, we find that kings and princes have renounced their thrones, wealthy men and women have given away their riches and property, have cut off all earthly ties and have retired to the forest in order to attain this grand ideal. They have sacrificed all earthly relations and luxuires, considering them as the source of bondage and unhappiness. But before renouncing all these earthly objects of sense, they had realized the limitations of human existence, they had understood that the life of an ordinary mortal on this plane is like that of a slave, that it is a state of constant slavery to the masters who are governing us from within as well as from without. In fact, if we examine our own conditions of life, we find that no one of us is absolutely free; yet we do not realize our own state of slavery. When we look around us, we do not find a single man or woman who may be called perfectly free, but we see very few who have realized that the life which they are living is a life of constant drudgery and unhappiness. Few have realized that individual souls are enchained by the attractions of the objects of the external world. Fewer still, struggle for emancipation, and the rest delude themselves by thinking that they are free; they love their bondage and consider that this is the real condition of life, and that there is nothing higher or greater. Are we not slaves of our desires and passions? Do we not see around us men and women mad for material prosperity and powers, mad for name and earthly fame? Do we not serve these masters who are constantly ruling over our minds and souls? Where is our freedom? How can we call ourselves free, when we are slaves of anger, hatred, fear, jealousy, self-conceit, beauty, ambition and sense-pleasures? We have tied ourselves down to luxuries and bodily comforts, and we think we cannot live without them.! Is this state desirable? We may delude

ourselves for the time being by thinking that we are very happy, but the soul is not happy. The soul wants to get out of this condition of slavery. Are we not slaves when we consider how elated and flattered we feel when some kind words are uttered to us, and how wounded and hurt we are when we hear unkind and harsh words? Few people try to know the real condition of things. We go on living as the blind led by the blind. We do not ask any questions. We find many people who are willing to help and uplift others, but they should first of all try to uplift themselves, to correct their own faults and become free from all the slavery. Here we must not forget what Jesus the Christ said: "First cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote of thy brother's eye." No one can help another, no one can lift another from the mire of slavery, unless he himself has become free and has got a firm foothold upon the rock of absolute freedom.

We are now sleeping the sleep of self-delusion; we must wake up from this sleep. We must find out how slave-like and miserable we have become. Then we must search after that freedom, attain it and give it to others. The majority of people are chasing the phantoms of hope, which appears bright at first, but which as we approach them change their colours and suddenly vanish, to reappear again and attract the pursuers to chase them over again. We do no realize that these phantoms of hope are the causes of suffering, misery and disappointment. We do not learn the lesson. We go on doing the same thing over and over again, until we are tired and exhausted, until our nerves are shattered, and we are dead. In this way we are living and obeying the commands of these pitiless masters who are governing us. We never ask for a moment whether we are born to serve these relentless masters always, or how long we will continue in this manner. We never ask these questions. Each individual loves and strives after something, not knowing what it is or how to attain it; yet the individual soul cannot rest unless it has attained that ideal. But we must find out what that ideal is, what it is that our soul wants. Our soul wants freedom and happiness. We all seek for happiness, but we do not know the conditions under which true happiness comes to the soul, because we are living in the darkness of ignorance. True happiness never comes in slavery, but in absolute freedom. The conditions under which we are living to-day will never bring true happiness in our souls. We may think ourselves happy, a fool may delude himself by thinking that he is happy but when he wakes up from that foolish dream, he will discover that it was after all self-delusion, that he had not reached true happi-

ness. He is truly happy who has become absolutely free. True happiness is the constant companion of absolute freedom. True happiness does not change, it is eternal; and along with it come absolute peace and divine wisdom. These are the signs of true happiness. When we are truly happy, we must possess absolute peace and divine wisdom. Our spiritual eyes will be opened, we shall be able to see things in a different light, and then we shall have a glimpse of the Absolute. This freedom is the goal for all individuals. Every individual soul is bound to reach it sooner or later. It is also the goal of evolution. The evolution of nature, as well as of all individual souls, reaches its perfection, and has fulfilled its purpose when that ideal of freedom is gained.

In our everyday life, we find that we are truly happy, we have neither wants nor desires. When all our desires and wants have subsided, leaving a peaceful and restful state within us, then we are happy. As desires increase, our happiness decreases. When we want a great many things, we are not happy, because then we are limited by those wants. The soul is tied down by those desires and clamours for the fulfilment of them; it strives to regain that freedom which it had before these desires and wants took possession of it. And this desire, this want, is the cause of our misery. So long as there is one single desire or want left unsatisfied we cannot become absolutely happy. When we have certain wants, we seek to remove those wants and fulfil our desires; but, if we fail in our attempts we are unhappy. And this desire has been the cause of a great many of the troubles that we are going through. We cannot help it, because we were born with desires. These desires we have brought from our previous incarnations. In our previous incarnations we passed away with our desires unfulfilled, and we are trying to fulfil them in this incarnation.

There are two ways by which we can remove these wants and desires: First, by obtaining the objects of desires, by enjoying them; and, secondly, by removing these desires through proper discrimination, by subduing them. All those desires which are connected directly with the sustenance of life, like food and clothes, should be fulfiled by getting the objects of desire, because we must protect our body first. This body will be the means by which we shall attain to freedom, shall reach perfection. And this body is the abode of the soul; we must take care of it first in order to fulfil the purpose of our life, but other desires, other passions, we can easily remove by discrimination, by exercising self-control. If we can live in this way, we shall attain unbounded peace and happiness during this lifetime. What is the use of becoming slaves to ambition and greed

for wealth and possessions ; what is the use of increasing our wants and desires when that is only the condition under which we become unhappy and miserable ? Each individual soul is born with a tendency to create of "I" and "mine." Whatever we hear or percive with our senses, we want to bring within the limit of that circle of "I" and "mine," and call it our own. If we see anything in a shop, we want to get possession of it, that is, bring it within the circle of "I" and then we are happy. All the things that exist outside of the limit of that circle we crave to bring within the limit, and that is the tendency in each individual soul. In lower animals you will find the same thing ; but their desire is limited by hunger and appetite ; that is, they collect their food and keep it for the future. But we not only collect food, we collect other things which attract our senses, and this tendency you will find is at the bottom of all those works which produce trusts and make millionaires and wealthy people at the expense of others. The fulfilment of these desires may bring happiness to a few wealthy people, but it brings misery and suffering to a large number of individuals. Those who are living in this world, being attracted by that tendency, do not understand the real purpose of life. Their souls are enchained by greed, avarice and ambition. They try to get possession of as many things as they can. They want to be the rulers of all, but they forget that they cannot be the rulers of the whole earth ; it would be impossible for them. They are constantly serving the masters like anger, hatred, jealousy, ambition and greed for luxury and comforts. If you examine and study the characters of wealthy men and women, you will find that they are never happy. They are constantly trying to serve these pitiless masters ; they have no peace in their souls, they do not know what is meant by peace. They do not understand the purpose of life ; they are merely fooling away their time in running after this thing for a few minutes, then after that thing, and so on. They are following the phantoms of hope, chasing the objects of desire, and are always restless. Contentment—they do not know what it is

There are four kinds of souls that are to be found in this world. Those who are absolutely bound by these earthely desires and earthly tendencies ; they cannot get away from them. Next, those who are trying to be free ; they are called "*Mumukshu*." They are trying to get out of this slavery and to become free. The third, those who have attained to freedom ; and the fourth, those who are born free. They are like Christ, like Buddha, they are born not worldly, not as slaves as free souls. Their number is very small. True freedom comes to those who have reached

the knowledge of their true nature, who have realized that they are children of the Immortal Being, and whose wants and desires have become limited. This is the sign of spirituality. A truly spiritual man or woman needs very little, his desires are less. He does not seek any comfort or or luxury, he does not care for earthly possessions, he understands the transitoriness of earthly life, and he is contented and happy under all condition and circumstances, whether agreeable or disagreeable, whether pleasant or unpleasant, and he has become absolute master of his own animal tendencies and propensities, he exercises self-control and is free from the sense of "I," "me" and "mine." We must first of all become free from the sense of "I," "me" and "mine" before we can understand what God is. Where "I" exists God cannot come. God is far from that state.

And how are we going to get rid of "I" ? There are two ways by which we can get rid of this sense of "I", "me" and "mine." The first is the path of discrimination, and the second is the path of devotion. Those who travel on the path of discrimination realize that everything belongs to the universe and nothing belongs to the individual soul. Whatever belongs to the universe we cannot call our own. Through proper discrimination and analysis, they discover that when we cannot possess this physical body which we call our own, when we cannot keep it permanently, how can we expect to possess other things which are eternally related to this gross material body ? It is impossible. Therefore they abandon the sense of "I", "me" and "mine", and claim nothing, say that they do not possess anything. Nothing belongs to us ; everything belongs to the universe. They live as creation's servant, calling themselves nothing, and seeing everything in that Universal Being. They realize that they are not one with the body, but that the body is only a transitory abode, a shell, through which the soul is manifesting its powers. This world is like a stage where we are playing our parts, consciously or unconsciously. Some playing the part of a husband, others of a wife, others of a mother, or a father, friends, and so on. We do not know it. These are not our actual works which we have come to do, but these are the modes of expression by which we are gaining experience, learning the lessons regarding the true nature of things, how things exist in nature, and what benefit they can bring to the soul. If one part which we have played seems to be unpleasant or seems to produce undesirable results, then we try to play another part, and this is the way we are living in this world. But those who have had their eyes opened to the reality, to the Truth, have understood their true nature. And we can realize that we are not

one with the body, that we are souls, that we are children of immortal bliss ; then why should we run after material things which do not and cannot belong to us ? Why should we run after earthly objects which can never bring true happiness and freedom ? The wise man knows this, and therefore he renounces everything, renounces the attachment to earthly objects because he knows that earthly objects will never bring freedom and true happiness ; and, instead of wasting his time in chasing these objects of the senses, he devotes his time and energy to seeking the highest, the eternal, the Immortal Being, which is dwelling within us.

The other method by which a devotee reaches absolute freedom and happiness is through the path of devotion. The travellers on this path believe in the existence of a personal God. They understand that the Lord of the universe is one, and whatever exists in the universe belongs to Him. They do not claim anything as their own. House, property, children, furniture, wealth and other things—all of these things they declare belong to God. Nothing belongs to them. They say, "This child is not mine, but it is God's child This house, this property, do not belong to me." They give everything to God and think that He is the one Being in the universe. We are all His children. We cannot possess anything. They become free from that sense of "I", "me" and "mine", and, instead of "I," "me" and "mine," they say "Thou," "Thee" and "Thine". "Whatever is mine is Thine, O Lord," that is their constant prayer. Everything they possess they give to the Lord. "It belongs to Thee, O Lord, make me free from all this bondage, this attachment to earthly things, make me, O Lord, attached to Thee, the Infinite Immortal Being." And, gradualy, they rise above the plane of selfishness. Selfishness exists so long as we consider ourselves as independent of God. "This is I ; this belongs to me," and "This is you, and this belongs to you." This idea of separateness, of differentiation, makes us selfish. But, when we overcome our individual egoism and think of the Lord as the Universal Being who possesses all, then there is no room for selfishness. Think of Christ. Christ said : "Whatever is mine is Thine, O Lord ; let Thy will be done." He resigned his individual will to the will of the Lord, and in his lifetime you will notice that he never had his own will fulfilled but he did not care for it. He was happy when he found that the will of his Father was fulfilled. Now, how many of us can live that way ? Not caring for the fulfilment of our own little individual will, but for the fulfilment of the Divine Will that is governing these individual wills ? That state comes to a soul who has attained to freedom. The soul then

becomes the playground of the Almighty, the Almighty Being plays through him. He has become free from all desires and wants ; he does not care whether he possesses this thing or that thing ; if everything is taken away from him, he is still happy. If this body be taken away from him, he does not mind. It is not a state of indifference ; it is a state of strength. Very few people have realized this spiritual strength which comes to the soul who has resigned his individual will to the Will of the Lord. Resignation is necessary. In time of distress, of sorrow and suffering, when we cannot find any remedy, when we cannot find any help from ordinary mortals or from any earthly being, then we are resigned. And in resignation comes true peace and happiness. That is the real state which we are longing for. Because we cannot resign constantly ; we are unhappy. We want this and and we want that, and we suffer ; but a true devotee of the Lord is free from all wants and desires. He cares not whether his desires are fulfilled or not, but he prays to the Lord, saying : "O Lord, Thy Will be done ; not mine." He has absolute contentment and at the same time he understands the true nature of the soul, the relation which the individual soul bears to the Infinite Being. He understands that all individuals are children of the Almighty Being. He has neither enemy nor foe. All are friends, all are friendly to him. He has no attachment to any particular condition or particular object ; he does not care ; because he knows that he can possess nothing. Everything that he had, he has given to the Lord And then he enjoys that wisdom which we are longing for. That happiness comes to him in the present life, and, after the dissolution of the body, he remains happy always. He is no longer subject to birth and death ; he has transcended the laws of nature. He communes with the Lord and sees the presence of Divinity around him everywhere. He discovers that everything dwells in God, and God dwells in everything, and realizing this he lives for the good of humanity, and all the acts of his body become a free offering to the world. He does not seek any result, but he gives them as a free offering, and, having transcended the laws of nature, the law of action and reaction, the law of Karma, he attains to Divine glory and reaches perfection which lasts throughout eternity.

[illegible]

বিশ্ববাণী

চতুর্থ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দুর্গা-স্তোত্রম্

(হিমালয় কৃতম্)

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ]

পুরাণাদিতে লিখিত আছে, গিরিরাজ হিমালয়ের ঔরসে ও গিরিরাজ-মহিষী মেনকার গর্ভে ভগবতী দুর্গাদেবীর জন্ম হইয়াছিল। যিনি নিত্যা, যিনি পূর্ণা সনাতনী শক্তি, যিনি ত্রিজগতের মাতা, যাবতীয় দেবতা ভক্তিভরে দিবানিশি যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই দেবী ভগবতী যে গিরিরাজ হিমালয়কে পিতৃরূপে ও মেনকাকে মাতৃরূপে স্বীকার করিয়া লইবেন, ইহা তাঁহার মায়া ও লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই গিরিরাজ বিহ্বল হইয়া কহিতেছেন, "হে মাতঃ দুর্গে! যখন যাবতীয় দেবতা তোমার মহিমা বর্ণন করিতে অক্ষম, তখন আমার ন্যায় অজ্ঞান জন কিরূপে তোমার মহিমা বর্ণন করিতে পারিবে? লোকে যাহাকে স্বাহা ও স্বধা এবং হব্য ও কব্য ইত্যাদি নাম দিয়া দেবগণ ও পিতৃলোক-গণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে, তাহা তোমারই নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে মাতঃ! তুমি বাক্যের ও মনের অগোচর। অতএব তোমার স্বরূপ কীর্ত্তন করা অসম্ভব। হে জগজ্জননি! তোমাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া আমি মায়াপাশে আবদ্ধ আছি। এখন তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এই মায়া-পাশ হইতে মুক্ত কর। হে মাতঃ! আমি ধন্য, ভাগ্যবান্ ও কৃতার্থ হইলাম, কারণ তুমি নিত্যা বস্তু হইয়াও আমার কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। তোমার জননী মেনকাও পরম ভাগ্যবতী, কারণ তুমি স্বয়ং ত্রিজগতের জননী হইয়াও তাঁহাকে জননী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।" এই শ্লোকটী গিরিরাজ হিমালয়ের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও অভিব্যক্তি :—

(১)

মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে
ত্বং সর্ব্বং ন হি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যচ্ছিবে।
ত্বং বিষ্ণুর্গিরিশস্ত্বমেব হি সুধা স্বাহাসি শক্তিঃ পরা
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্যচরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া॥

এই ত্রিসংসার মাগো! চরাচরময়
তোমারি স্বরূপ বিনা আর কিছু নয়।

তুমি বিশ্বেশ্বরী মাগো ! তুমি বিশ্বধরী,
মোর প্রতি সুপ্রসন্না হও মা শঙ্করি !
তুমিই এ ত্রিসংসারে একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাই আর !
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তুমি পূর্ণশক্তি, তুমি দেবতা-নিকর !
ব্রহ্মাদি-দেবতা-গণ তোমার যখন
চরিত্র বর্ণিতে নাহি পারে কদাচন,
তখন অজ্ঞান আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া।

(২)

ত্বং স্বাহাঽখিলদেবতৃপ্তিজনিকা পিত্রাদিষু ত্বং স্বধা
তৃপ্তেস্ত্বং জনিকা সদৈব জগতাং ত্বং দেবদেবাত্মিকা।
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তথা দক্ষিণা
ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে দেবেশি তুভ্যং নমঃ ॥

যাবতীয় দেবতার তৃপ্তির কারণ
যে আহুতি দেয় লোক অনলে যখন,
সেই পুণ্য স্বাহাহুতি, স্বাহা নাম যার,
তব নামান্তর বিনা কিছু নয় আর !
মৃত-পিতৃ-পুরুষের তৃপ্তির কারণ
পিণ্ড জল যাহা কিছু যে দেয় যখন,
সেই পুণ্য পিণ্ড জল, স্বধা যার নাম,
তব নামান্তর তাহা, সার বুঝিলাম !
তুমিই এ জগতের তৃপ্তির কারণ,
দেবদেব মহাদেব তব প্রাণধন।
তুমি হব্য, দেব-লোক-তৃপ্তির কারণ,
তুমি কব্য, পিতৃ-লোক-তৃপ্তির সাধন।
তুমিই নিয়ম যজ্ঞ, তুমিই দক্ষিণা,
স্বর্গাদি যা কিছু ফল, তোমারি করুণা।
জয় সর্ব-ফল-দাত্রি ! জয় বিশ্বেশ্বরি !
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি।

(৩)

রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতমং যদ্ যোগিনো বিভ্রতি
শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং মাতঃ স্বরূপং তব ।
বাচামতিগমং মনোঽতিগমমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে
ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ ॥

অতি সূক্ষ্মতম রূপ জননি ! তোমার,
যাহা হ'তে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাহি আর,
যোগ-বলে ধরে যাকে যোগী সমুদয়
বিশুদ্ধ, স্বতন্ত্র পুনঃ পূর্ণব্রহ্মময় ।
বাক্য-অগোচর তুমি চিত্ত-অগোচর,
তোমার ত্রিলোক-বীজ-নাম নিরন্তর ।
তুমি শিবময়ী, তুমি বর-প্রদায়িনী,
ভক্তিভরে নমি আমি তোমায় জননি !
বিপদে পড়েছি মাগো ! দুঃখে দহে প্রাণ,
ওমা বিশ্বেশ্বরি ! মোরে কর পরিত্রাণ !

(৪)

উদ্যৎসূর্যসমপ্রভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া
দেবীমষ্টভুজাং বিশালনয়নাং বালেন্দুমৌলিং শুভাম্ ।
উদ্যৎকোটিশশাঙ্ককান্তিধবলাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং
ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি বিশ্বজননীং দেবি প্রসীদাম্বিকে ॥

সদ্য উদীয়মান সূর্যের সমান
তোমার উজ্জ্বল কান্তি হয় অনুমান ।
মোর ঘরে জন্ম নিলে করিয়া করুণা,
তুমি দেবী অষ্টভুজা বিশাল-নয়না ।
বালচন্দ্র শিরে তব কিবা শোভা ধরে,
পরম-মঙ্গলময়ী তুমিই সংসারে ।
আকাশেতে কোটি-চন্দ্র হইলে উদয়,
তোমার কান্তির সনে তবে তুল্য হয় ।
তুমি ধবলিমা বালা ত্রিনেত্র-ধারিণী,
একমাত্র শিবময়ী তুমিই জননি !
ওমা জগদম্বে ! আমি নমি ভক্তিভরে,
প্রসন্ন থাক মা সদা আমার উপরে ।

(৫)

রূপং তে রজতাদ্রিসন্নিভমলং নাগেন্দ্রভূষোজ্জ্বলং
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈর্ভীমৈঃ সমুদ্ভাসিতম্ ।
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজূটং শরণ্যে শিবে
ভক্ত্যাহহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে ॥

তোমার রূপের কথা কি বলিব আর,
রজত-পর্ব্বত-সম শুভ্র অনিবার ।
নাগেন্দ্র তোমার মাগো ! ভূষণ উজ্জ্বল,
তব শিরে রহে পঞ্চ বদন-কমল ।
ভীষণ ত্রিনেত্র মূর্ত্তি ক'রেছ ধারণ,
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে তব শোভে সর্ব্বক্ষণ ।
জটাভার ধরিয়াছ মস্তকে জননি !
তুমি শুভময়ী, তুমি আশ্রয়-দায়িনী ।
ওমা জগন্মাতঃ ! আমি নমি ভক্তিভরে,
প্রসন্ন থাক মা ! নিত্য আমার উপরে ।

(৬)

রূপং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং
দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনম্ !
দিব্যং বাহুচতুষ্টয়েন মিলিতং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ
পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিলব্রহ্মাদিদেবস্তুতম্ ॥

তোমার রূপের ছটা নিত্য বিদ্যমান,
কোটী-শরতের চন্দ্র ব'লে অনুমান ।
পরম-সুন্দর বস্ত্র কর মা ধারণ,
কিছুই সুন্দর নাই তোমার মতন !
যে পদ-কমলে তব দিব্য আভরণ,
রূপের ছটায় যার ভুলে ত্রিভুবন,
যাহে স্পর্শ করিয়াছে বাহু-চতুষ্টয়,
যাহা পূজা করে সদা দেবতা-নিচয়,
ভক্তিভরে বন্দি তব সে পদ-কমল,
মোর প্রতি, তুষ্ট মাগো ! থাক অবিরল

(৭)

রূপং তে নবনীরদদ্যুতিধরং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলং
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতম্।
বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিলসিতোরস্কং জগত্তারিকে
শক্ত্যাঢ্যং প্রণতোঽস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে॥

নবীন-নীরদ-সম তোমার বরণ,
প্রস্ফুটিত-পদ্ম-সম তোমার নয়ন।
কৃপায় তোমার ব্যাপ্ত এই ত্রিসংসার,
মৃদু-মন্দ হাস্য তব মুখে অনিবার।
রতন-কেয়ূরে তুমি শোভিছ সুন্দর,
বনমালা বক্ষে তব কিবা মনোহর!
রক্ষা করিতেছ তুমি এই ত্রিভুবন,
ভক্তিভরে পূজা করি তোমার চরণ।
করিয়া আমার প্রতি করুণা সদাই
সুপ্রসন্ন থাক মাগো! এই ভিক্ষা চাই।

(৮)

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুগুণৈর্দেবোঽথবা মানুষঃ।
তৎ কিং স্বল্পমতির্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈ-
র্মো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥

কিবা দেব, কিবা নর, এই ত্রিসংসারে
যত্ন করিলেও যুগ-যুগান্তর ধ'রে,
তথাপি তোমার গুণ, বিশ্বরূপ আর
বর্ণন করিতে পারে হেন শক্তি কার?
তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া!
নিজগুণে কৃপা-বিন্দু করিয়া সঞ্চার
মায়া-পাশে বদ্ধ মোরে করিও না আর।
মায়ার সমুদ্রে আমি মা অবিরাম,
ওমা বিশ্বেশ্বরি! তব চরণে প্রণাম!

(৯)

অদ্য মে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যৎ ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা ॥

এতদিনে হ'ল মোর জনম সফল,
এতদিনে সিদ্ধ মোর তপস্যার ফল।
ত্রিজগন্মাতা তুমি আসি মোর ঘরে
কন্যা-রূপে জন্ম নিলে মোরে কৃপা ক'রে !

(১০)

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যশ্চ মাতস্ত্বং নিজলীলয়া।
নিত্যাপি মদ্গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ ॥

ধন্য ধন্য ধন্য মাগো ! জনম আমার,
সার্থক জীবন মোর, বুঝিলাম সার।
তাহা যদি না হবে মা ! তবে কি কারণ
হইয়াও এসংসারে তুমি নিত্য ধন,
লীলাচ্ছলে তুমি মোর কন্যারূপ ধরি
পিতা ব'লে ডাকিলে মা ! মোরে কৃপা করি !

(১১)

কিং ব্রুমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জিতম্।
যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাঽভবৎ তব ॥

ধন্য ধন্য ধন্য মাগো ! ভাগ্য মেনকার,
শতজন্মে কত পুণ্য ছিল মা ! তাহার।
ত্রিজগন্মাতা হ'য়ে কন্যারূপ ধরি
মাতা ব'লে ডাকিলে মা ! তারে কৃপা করি !

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

(১১)

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী অ—সানফ্রান্সিস্কো হইতে এদেশে আসিয়া সানফ্রান্সিস্কোতে কি ভাবে বেদান্ত প্রচারিত হইয়াছে এবং তিনি কি ভাবে প্রচার কার্য্য করিয়াছেন তাহার একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছিলেন। সেই বিবরণীর মধ্যে স্বামী অভেদানন্দের স্থান হয় নাই! অথচ এমন সন্ন্যাসী প্রচারকেরও নাম আছে যাঁহারা মহারাজকে ওঁাহার কার্য্যে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালের ২৬শে জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায় এই বিবরণটী প্রকাশিত হয়। সেই বিবরণের যে অংশটী প্রয়োজনীয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—The Vedanta Society in San Francisco was established by Swami Vivekananda during his second visit to the (ইহার পর পুরাতন সংবাদপত্রের একটু স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়া পড়া যায় না)—Later (ছিন্ন) another disciple of Sri Ramkrishna (ছিন্ন) to carry on work, namely Swami Turiyananda, who remained in San Francisco for about 2 years He was followed by a third of Sri Ramkrishna's disciples, Swami Trigunatita who in 1905 built the Hindu Temple which still houses the Society, ...Swami Trigunatita's magnificient work in San Francisco was in great measure responsible for the firm foundation on which the Vedanta Society is established in that city. He was followed successively by Swami Prakashananda, Swami Madhabananda, Swami Dayananda and Swami Vividishananda all of whom did excellent work from which I am now benifitting greatly. I took charge of the Society in 1932, a few months after my arrival at San Francisco. The work began to increase in 1932 &c.

আজ মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা যে দিন অমৃতবাজার পত্রিকাখানি বগলে লইয়া গিয়া স্বামী অভেদানন্দকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া উঠিলেন। শুধু বলিলেন—"ওদের কথা ছেড়ে দাও!" মহারাজের সেই হাসি ও হাব-ভাব দেখিয়া সত্যই মনে হইয়াছিল যেন মহাপুরুষ তুলসীদাসের বাণী মূর্ত্ত হইয়া সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—

হাতী চলে বাজারমে
কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুজনকো দুর্ভাব নেহি
যব নিন্দে সংসার॥

এই সানফ্রান্সিস্কোর নিকটবর্ত্তী স্থানেই একদিন স্বামী অভেদানন্দের এক শিষ্যা

মিস্ বুক্ তাঁহাকে ১৬০ একর জমী দান করিয়াছিলেন এবং মহারাজ সেই জমি রামকৃষ্ণ মিশনকে অর্পণ করিলে স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে "শান্তি আশ্রম" স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সান্ফ্রান্সিস্কোর বেদান্তকেন্দ্র যে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল ইহা স্থানান্তরে একবার বলিয়াছি। সান্ফ্রান্সিস্কো ক্যালিফোর্ণিয়া ষ্টেটের রাজধানী। সান্ফ্রান্সিস্কো হইতে ক্যালিফোর্ণিয়া অধিক দূরে নহে। ক্যালিফোর্ণিয়া ষ্টেটের স্যাণ্টাক্ল্যারা কাউণ্টির একটি পার্বত্য প্রদেশে সান্ আন্টোন নদীর তীরে নির্জ্জন তপস্যার যোগ্য শান্তি আশ্রমেও স্বামী অভেদানন্দ গিয়াছেন এবং ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলেও বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার পথে স্থানে স্থানে বহুলোক সমবেত হইয়া তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়াছে ও তাঁহারা দেখা করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহারা কত অনুরোধ জানাইয়াছে। (১)

এইভাবে নানা স্থানে অভ্যর্থিত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ ২৯ জুলাই (১৯০০-০১) সান্ ফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথাকার বেদান্ত সমিতির নিয়মিত ক্লাসে কিছুদিন আচার্য্যের কার্য্যও করিয়াছিলেন। (He met the class of the Vedanta Society at its regular meetings) (২) ১লা সেপ্টেম্বর তথাকার ইউনিয়ন স্কোয়ার হলে তাঁহার যে বক্তৃতা হয় তাহার বিষয় ছিল, "বেদান্ত কি ?" সেই বক্তৃতার পর ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ("urgent solicitation") তাঁহাকে সেই কলেজের (Berkeley College) ফ্যাকাল্টি এবং ছাত্রদিগের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে হয়। 'শান্তি আশ্রমে' থাকিয়া কিছুদিন স্বামী অভেদানন্দ ১৯০১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে নিউইয়র্কে প্রত্যাগমন করেন এবং প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হন।

'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় ১৮৯৯ সালের ৩রা মে পর্য্যন্ত মহারাজের ডায়েরি প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সালের ডায়েরি দেখিতে পাইলে বলিতে পারা যাইত তিনি কোন্ কোন্ সময়ে এবং কতবার সান্ফ্রান্সিস্কো এবং ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে গমন করিয়া স্বামী অ—র পূর্ব্বে নানাভাবে অদ্বৈত বেদান্ত ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বামী অ - র বিবৃতিতে স্বামী অভেদানন্দের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত না থাকা যে একটি বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই !

প্রচার কার্য্যে স্বামী অভেদানন্দের প্রধান বাধা ছিল, আমেরিকার খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ। হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ও নীতির উপর তাঁহারা বহুভাবে আক্রমণ করিতেন এবং উহা যে বর্ব্বরতার

(১) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti 1915)—Vol. IV, Page 335.

(২) The Life of the Swami Vivekananda (Mayaboti, 1915)—Vol. IV, Page 334.

নিন্দা: তাহাই তাঁহাদিগের প্রচারের বিষয় ছিল। মহারাজ অত্যন্ত ধীরতা সহ তেজস্বীতার সহিত ইহাদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বক্তৃতার পর বক্তৃতায় আমেরিকাবাসিগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতের দর্শন এবং উহার যে পৃথিবীতে কেমন উহার মত আর দ্বিতীয় নাই। তিনি তাঁহাদিগকে আরও বুঝাইয়াছিলেন এবং শাস্ত্রাদি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, খৃষ্টান 'সত্যের দূতগণ' যাহা প্রচার করিতেছেন তাহা আদৌ ঠিক নহে। শেষে সত্যের জয় হইয়াছিল এবং বহু উদার হৃদয় ও সুপণ্ডিত ধর্মযাজকগণ কর্তৃক মহারাজ কিরূপভাবে অভ্যর্থিত ও সম্মানিত হইয়েছেন তাহা স্থানান্তরে বলিয়াছি। স্বামী অভেদানন্দ একস্থানে বলিয়াছেন—"বর্তমানে প্রেতবিদ্যা জানাইয়া দিয়াছে যে, আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরে আমাদের অনন্ত নরকে যাইতে হয় না। স্যার অলিভার লজের কথাই ধরুন। তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক এবং তিনি তাঁহার Reymond নামক পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা মৃত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি এবং তিনি এই সব বলিতে গর্ব অনুভব করেন। ক্যালিফোর্ণিয়াতে আমি তাঁহার এক বক্তৃতায় গমন করিয়াছিলাম। এই অশীতিপর বৃদ্ধ তখন একজন পাদ্রীর সঙ্গে বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলেন। তিনি সেই প্রকাশ্য সভাতেই বলিলেন, বন্ধুগণ, মৃত্যুর পর আমাদের অনন্ত নরকবাস হইবে না, আমরা এক নূতন রাজ্যে যাইব, সেখানে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হইবে।'

"তাহা হইলেই দেখুন, ইহা গোঁড়া খৃষ্টানীয় গণ্ডীর বাহিরে। গোঁড়া খৃষ্টানগণ কি বলেন? তাঁহারা বলেন আমরা মৃত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি না, কারণ তাঁহারা কবরে নিদ্রা যাইতেছেন এবং শেষ বিচারের দিন তাঁহারা দেবদূতের বাঁশী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ পূর্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া জাগিবেন। এই সব ধারণা শত শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। আজ বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এবং আমাদের বেদান্ত প্রচারের ফলে এই সকল শত শত বৎসরের কুসংস্কার সমূহ শরতের মেঘের ন্যায় পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক গগন হইতে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে দূর হইয়া যাইতেছে।" (৩)

মহারাজের মহাসমাধির পর কলিকাতার সুবিখ্যাত পত্রিকা The Hindusthan Standard (2. 10. 39) এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন সেই কথা আজ মনে পড়িতেছে—
In not a few of his speeches in America he challenged the scathing and sweeping denunciation of the religion and Society of the Hindus by the Christian Missionaries He fought for India in that country in the face of bitter race prejudice and sectarian jealousy, but through sheer zeal and perseverance he succeeded in making himself heard and appreciated. He dispelled not a few of the false ideas about India that were prevalent in America at the time,... "

(৩) আমেরিকায় বেদান্তের প্রভাব—স্বামী অভেদানন্দ; বিশ্ববাণী—পৌষ ১৩৪৭।

"He cited the authority of Monier Monier Williams to show that 'the Hindus were Spinozaites more than two thousand years before the existence of Spinoza; and Darwinists many centuries before Darwin; and evolutionists many centuries before the doctrine of evolution was accepted by the scientists of our time."

(মর্মানুবাদ) :—'পাদ্রী সম্প্রদায়ভুক্তগণ হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে সকল অত্যন্ত ভ্রান্তিকর ও সর্বব্যাপক মিথ্যাবাদ প্রচার করেন, তাঁহার অনেক বক্তৃতায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া উক্তিগুলিকে অপ্রমাণ করিতে বলিয়াছেন। সেই দেশে (আমেরিকায়) জাতীয় জাতিবিরোধ ও সম্প্রদায়গত ঈর্ষার বিরুদ্ধে তিনি ভারতবর্ষের হইয়া লড়াই করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধৈর্যের বলে তিনি নিজের কথা সে দেশকে শুনিতে বাধ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার কথার মধ্যেও যে গ্রহণযোগ্য বস্তু আছে তাহা স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন। সে সময়ে আমেরিকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত ভুল ধারণা ছিল তাহাদের অনেকগুলিকেই তিনি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।......'

"মনিয়ার-মনিয়ার উইলিয়মসের বাণী উদ্ধৃত করিয়া তিনি আমেরিকানদিগকে দেখাইয়াছেন যে, স্পাইনোজার জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই ভারতের হিন্দুরা স্পাইনোজা মতাবলম্বী, ডারউইনের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই তাহারা ডারউইনিষ্ট এবং বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বিবর্তনবাদ স্বীকার করিবার বহু পূর্ব হইতেই তাহারা বিবর্তনবাদী।"

হিন্দু কে?

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল রব উঠেছে যে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিশেষতঃ সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বাঙলায় হিন্দুর সংখ্যা কম—এইজন্য হিন্দু নেতাগণ বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তার কারণ, যদি হিন্দুরা সংখ্যায় কম হয়ে যায় তবে হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকার বিচ্যুত হবে নিজেদের পৃথক সত্তা হয়তো তাদের বিসর্জন করতে হবে। এই চিন্তায় হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে। এইজন্যই এই প্রশ্নের একটা অনুসন্ধান করা কর্তব্য। হিন্দু "ক্ষয়িষ্ণু" কিনা, এই প্রশ্নটিকে কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। এর প্রশ্নটিকে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়েও দেখতে হবে। কেবল রাজনৈতিক বুলি (slogan) চীৎকার ক'রে ও আওড়িয়ে, হিন্দুকে ভয় দেখিয়ে চকিত ক'রে হিন্দুদের ধর্মান্ধতা (fanaticism) জাগিয়ে রাজনৈতিক কার্য্য সাধন করলে এই প্রশ্নের মূলে উপনীত হওয়া যাবে না।

একথা সত্য যে এক সময়ে ভারতে অন্যদেশের লোক ছিল না। বিদেশীরা ভারতবাসীকে "হিন্দী" বলতেন। বোধ হয় একথার উৎপত্তি প্রাচীন পারসীকদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়। বেদে পাঞ্জাব ও বর্তমান আফগানিস্থানের কতকটা স্থানকে নিয়ে 'সপ্তসিন্ধব' বলা হতো। এটিকেই পারসীকদের কোন ধর্মগ্রন্থে 'হপ্তহেন্দব' বলা হয়েছে। সংস্কৃত 'স' ফারসীতে 'হ'—যেমন সংস্কৃত 'সপ্তাহ' ফারসীতে 'হপ্তাহ' সংস্কৃত 'সিন্ধু' পারসীক 'হিন্দু' ইত্যাদি।

এই 'হিন্দু' শব্দ পশ্চিম এশিয়াতে প্রচলিত হয়েছিল এবং গ্রীক বানান অনুসারে একে লেখা হতো 'Indos' এবং এর উচ্চারণ হতো 'Hindos' (হিন্দস)। তাই থেকে লাটিনে 'India, 'Indian' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত হয়। এর পর মুসলমান যুগে ফার্সী ভাষাতে 'হিন্দু' শব্দের অর্থ করা হয়। তাদের মতে হিন্দু শব্দের অর্থ ডাকাত, গোলাম, বিদ্রোহী, কালো-আদমী, চোর ইত্যাদি। এই অর্থগুলি ভারতে মুসলমান বিজয়ের পরই সৃষ্ট হয়। আসল কথা এই যে আলেকজাণ্ডারের সময় যখন ম্যাসিডোনীয়েরা ভারতে এসেছিল তাঁরা তখন ইণ্ডাসের সব লোককেই ইণ্ডিয়ান (Indian) এই কথায় ব্যবহার করেছেন। যখন ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, ভারতের উত্তরের লোকেদের রঙের বড় ইজিপ্টের লোকেদের মতো রঙের মতন—আর দক্ষিণ ভারতের লোকেদের রঙের বড় Ethiopian বা কাফ্রীদের মতন কালো। আর সম্ভবতঃ তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের কথা বলে গেছেন। পুনরায় আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারী গ্রীক লেখকেরা বলে গেছেন যে পাঞ্জাব অপেক্ষা সিন্ধুর লোকের রঙের বড় কালো বর্ণ। অবশ্য মেগাস্থিনিস ভারতের দুই প্রদেশের বিভিন্নপ্রকার লোকেদের আচারের কথা উল্লেখ করেছেন। এমন কি অপর দিকের লোকেরা সৌজন্যে বলে ধরে নেন। এর পরেই মুসলমান আক্রমণের সময় আরব ও ফার্সী লেখকেরা 'হিন্দের' লোককে 'হিন্দী' বলে গেছেন। আরবী লেখকেরা ভারতকে 'সিন্ধ হিন্দের দেশ' (the Land of Sind and Hind) বলতেন। বর্তমান আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং সিন্ধু উপত্যকার ভূমিকে নিয়ে তাঁরা 'সিন্ধ্' এবং তার পূর্ববর্তী স্থানকে 'হিন্দ্' বলতেন। এর পূর্বে, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতে আসেন। তিনি পাঞ্জাব পার হয়ে যখন মথুরাতে (বর্তমানের ...) আসেন তখন তিনি আসল ভারতবর্ষে এসেছেন বলে নির্দেশ করেন। আবার বিষ্ণুপুরাণে বর্তমান ভারতের সীমানাকে ভারতবর্ষ বলা হয়—এথেকে বোঝা যায় যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সীমারও পরিবর্তন হয়।

এখন আমাদের বিবেচ্য "হিন্দু" কারা? এইসব উক্তির দ্বারা আমরা এইটুকু বুঝি যে প্রাচীন বিদেশী লেখকেরা 'Indian' এবং 'হিন্দী' এই দুই শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করতেন। কারণ আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারী গ্রীক লেখকেরা বলেন—তাঁরা যখন আরাকোসিয়াতে (বর্তমান কান্দাহার) উপনীত হলেন তখন তাঁরা ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পান,

কিন্তু তারা 'খাঁটি ইণ্ডিয়ান' নয়। কিন্তু যখন পারোপনিষদ্-এ (বর্তমান হিন্দুকুশ) এলেন তখন তারা খাঁটি ইণ্ডিয়ানদের সাক্ষাৎ পান। প্রাচীন সাহিত্যসমূহ প'ড়ে জানা যায় যে পূর্ব আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্গত ছিল। এর বহু বহু শতাব্দী পরে গজনীর সাবক্তগীন হিন্দুদের কাছ থেকে কাবুল জয় করেন। তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ পাঞ্জাব জয় করেন। ইহারই রাজসভায় ঐতিহাসিক আলবেরুনী বলেছেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পর্বতবাসী জাতিগুলি যারা ভারতের শেষ সীমার অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জাতি অথবা তাদের সমজাতীয় লোক তারা অতি অসভ্য। এর দ্বারা এই অনুমিত হয় যে এঁরা বর্তমানে চিত্রাল, গিলগিট, দরদীস্থান প্রভৃতি স্থানের লোকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুসলমানেরা ভারতের প্রত্যেক লোককেই 'বুৎপুরস্ত্' (পৌত্তলিক) ব'লে থাকেন। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন—আরবেরা পশ্চিম এশিয়াতে বৌদ্ধদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধমূর্তির পূজা করতেন ব'লে তাই থেকেই তাদের বুদ্পুরস্ত্ বলা হতো। আরবেরা যখন কান্দাহার জয় করেন তখন তাঁরা আলবুদ্ (Al-budd) নামক একটি দেববিগ্রহ ভেঙে ফেলেন। এই থেকেই বোধ হয় তারা মূর্তিপূজকদের বোদপুরস্ত্ বলে। এই থেকেই বিদেশীয় মুসলমানদের কাছ থেকেই ভারতীয়েরা 'হিন্দী' ও তাদের ধর্ম 'বুৎপুরস্তি' (পৌত্তলিকতা) ব'লে অভিহিত হয়।

পৃথ্বিরাজের পতনের সত্তর বৎসর পরে মুসলমান কবি আমীর খসরু পাঞ্জাবের কোন এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে তুর্কী ছিলেন—এঁর পিতা অ-মুসলমান মঙ্গোলদের ভয়ে বাল্খ্ (বাহ্লীক দেশ) ত্যাগ ক'রে ভারতে পালিয়ে আসেন। তখনকার ভারতের মুসলমানরা সকলেই বিদেশাগত ছিলেন। এই সময় কিছু কিছু ভারতবাসী হিন্দুও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। বোধ হয় পরে দেশী ও বিদেশী মুসলমানেরা নিজেদের 'হিন্দী' নামে অভিহিত করতে লাগলেন এবং অন্যান্য ভারতবাসীদেরও 'হিন্দু' আখ্যা প্রদান করলেন। আমীর খসরুর লিখিত 'খালেখ্ বারি' নামক অভিধানে ভারতবাসী অর্থে 'হিন্দী' ও 'হিন্দবী' উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর এক কবিতাতে বলা হয়েছে যে খোরাসানীরা বলে যে হিন্দুরা বদখ্যাৎ (rebellious) ও বোকাভূত (ghoul)। (খোরাসানী ব গর্বেশ্ গুল ..)। এবং ইহারই প্রত্যুত্তরে আমীর খসরু বলেছেন, ইহা ঠিক বটে হিন্দু কালো (সিয়াহোয়স্ত্ হিন্দু হাবুদ্ নিস্তস্ত্) কিন্তু এই দেশই (ভারত) সর্বদেশের সেরা। তখনকার বিদেশী বংশোদ্ভূত মুসলমানেরা নিজেদের 'ভারতবাসী' বলেছেন। কাজেই বিধর্মীদের হিন্দুনামে অভিহিত করা হয়। ইহারও তিন শতাব্দী বাদে অমর কবি চাঁদ 'পৃথীরাজ-রাসো' নামক তাঁর মহাকাব্য গ্রন্থখানি লেখেন। (আজকালকার ঐতিহাসিক সমালোচকেরা প্রমাণ করেছেন যে এই পুস্তক সম্রাট আকবরের সময়ে লেখা হয় এবং তাঁকে পড়িয়ে শোনানো হতো। এইজন্য এতে অনেক আরবী ফার্সী শব্দ স্থান পেয়েছে। এই কাব্য পৃথ্বীরাজের সময়ে লেখা হয় নি।) এই পুস্তকে চাঁদকবি ভারতবর্ষের নাম দিয়েছেন 'হিন্দ-থান্-থান',

এবং এর একস্থানে উল্লেখ করা আছে পৃথ্বীরাজ নিজেকে 'হিন্দুপুত্র' বলেছেন। এই থেকে বোঝা যায় যে এই সময়ে 'হিন্দু' শব্দটি প্রচলিত হয়ে যায়। ইহা অমুসলমান অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান নয় তাকেই নির্দেশ করবার জন্যই ব্যবহৃত হ'ত।

মুসলমানেরা ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এক সংজ্ঞা ও এক পর্য্যায়েই ফেলেন। তাঁদের কাছে ব্রাহ্মণ্যবাদী, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এবং আদিম কৌমগণ (tribal) জাতিরাও হিন্দু। অর্থাৎ যে ভারতবাসী মুসলমান নয় সে ব্যক্তিই 'হিন্দু'। অবশ্য পরে মুসলমানেরা বুঝতে পারেন ভারতে বিভিন্ন উপভাষা (dialect) ও উপজাতি আছে। কিন্তু সেই সময় থেকেই 'ভারতের সব অমুসলমানেরাই হিন্দু' এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গেল। মুসলমানদের কাছে এই 'হিন্দু' শব্দটা একটা ঘৃণিত শব্দ ছিল কিন্তু সেইটাই হিন্দুদের কাছে একটা অহঙ্কারের বস্তু হয়ে উঠলো। এখন অনেক হিন্দুই এই শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজে বেড়ান!! প্রাচীন কালে উত্তর ভারতের লোকেরা নিজেদের 'আর্য্য' বলতেন। অবশ্য এই শব্দটি কৃষ্টিবাচক। বৈদিক যুগের পরে যাস্ক 'কিকট' দেশকে অনার্য্য জনপদ বলেন। অনেক পণ্ডিতের মতে কিকট হচ্ছে মগধ দেশ। পরে বৌধায়ন স্মৃতি অনুসারে স্থির হলো, 'আর্য্য' অর্থে 'বিশিষ্ট', 'শিক্ষিত ব্যক্তি' এবং বিভিন্ন স্মৃতিতে ইহাও বলা হয়েছে। মধ্য দেশের (যুক্তপ্রদেশের) লোকেরা 'আর্য্য' অর্থাৎ সুসভ্য ও সুশিক্ষিত এবং তাদের আচার ব্যবহারই অনুকরণীয়। এই সঙ্গে বৌধায়ন সিন্ধু দেশ ও অন্যান্য জনপদের লোকেদের মিশ্রিত জাতি ও আর্য্য সভ্যতার বহির্ভূত লোক বলেছেন। তাছাড়া ইহার বহু পরে দেখা যায় মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে কর্ণ শল্যকে গালাগাল দিয়ে বলছেন যে তারা অর্থাৎ পঞ্চনদের লোকেরা গোখাদক, ভাজাপিঠের সঙ্গে পিঁয়াজ দিয়ে মেষমাংস ও গোমাংস খায় এবং পিতা ও কন্যা এবং মাতা ও পুত্র 'বর্ব্বর হয়ে নাচে'—মেয়েরা মদ খেয়ে···বলে, 'আমরা স্বামী দিতে পারি, পুত্র দিতে পারি, কিন্তু নিজেদের পাত্র থেকে কাঞ্জিকা (মদ) দিতে পারিনা।' আবার এক ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বলছেন, 'সমগ্র পঞ্চনদে একটা আর্য্যত্ব খুঁজে পাইনি।' শেষে কর্ণ বললেন, 'পঞ্চনদ ব্রাহ্মণের বাসের অনুপযুক্ত দেশ—আর পঞ্চনদ, আরট্টক, সিন্ধুসৌবীর ব্রাত্য ও ব্রাহ্মণবর্জ্জিত।' একথার অর্থ বর্ত্তমানের পঞ্জাব, পূর্ব্ব-আফগানিস্থান ও সিন্ধুপ্রদেশ তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বহির্ভূত ছিল। পুনরায় শতবলি মহাভারতে পঞ্চনদের ব্রাহ্মণদের কুৎসিত আচারের ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতদ্বারা আমরা এই বুঝতে পারি এইখানে একদা বৈদিক আর্য্যদের বাসস্থান ছিল এবং যার মধ্যে বৈদিক পবিত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থান, (এখনকার আম্বালা জেলা) যেথায় বেদ রচনা হয়েছিল —যার মধ্যদিয়ে পবিত্র সরস্বতী নদী প্রবাহিতা হ'ত, ভারতের সেই ভূখণ্ডকে পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণেরা 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বহির্ভূত দেশ' ব'লে ঘোষণা করলেন। তেমনি অন্যদিকে ব্রাহ্মণ স্মৃতিকারেরা পূর্ব্বভারতের প্রতি সদয় ছিলেন না। এইদিকটাকে তাঁরা 'পক্ষিদের দেশ' বলছেন।

বৌধায়ন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রদেশে তীর্থযাত্রা বিনা ভ্রমণকে নিষেধ করে দিয়েছেন। কেবল

জৈন ও বৌদ্ধরা এদিকে আগমন ক'রে এদিককার লোকেদের মধ্যে, মগধের রাজগৃহ, অঙ্গের চম্পা, বঙ্গের তাম্রলিপ্তের জাতিদের 'উচ্চশ্রেণীর ক্ষত্রিয়' ব'লে ঘোষণা করেছেন। আর দক্ষিণাপথের লোকদের রামায়ণের বানর ও রাক্ষস বলা হয়েছে, এবং মনু প্রভৃতির স্মৃতিতে দক্ষিণের অন্ধ্রজাতিকে 'পতিত ও ব্রাত্য' বলা হয়েছে, মনু ও যমসংহিতাতে সিন্ধুদেশের মেদ মদ্র জাতিদের 'অন্ত্যজ' বলা হয়েছে। পুনরায় মনু উত্তর পশ্চিমের পাহাড় কাম্বোজ যবনদেরও ব্রাত্য ও ব্রাহ্মণবর্জিত বলেছেন। ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু এরা বৃষল বা ব্রাত্য হয়েছে। এই থেকে পুনরায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মধ্যদেশ অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণাদর্শ বিবর্ধিত হয় সেই স্থানকেই ব্রাহ্মণেরা আর্যাবর্ত বা আর্যদের দেশ বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে মুসলমান সংজ্ঞানুযায়ী ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি অমুসলমান ও অখৃষ্টান তাকেই 'হিন্দু' বলা হয় - তার ধর্মমত যা-ই হোক না কেন। এখন 'ভারতবাসী' 'হিন্দী' ও 'হিন্দু' একার্থবাচক নয়। বর্তমানের আইন পুস্তক বলেছে: যে হিন্দুর ঘরে জন্মেছে, যে হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষা করে এবং 'হিন্দু'-র আইনের দ্বারা পরিচালিত সে-ই হিন্দু।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র

(১)

দার্জিলিং
১২ই সেপ্টেম্বর

স্নেহের ভক্তবৃন্দ,

আজ এই শুভদিনে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে তোমরা সকলে সমবেত হইয়াছ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় সন্তান জেনে আমার প্রতি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছ জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এবৎসর আমি প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে পারিলাম না তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিবে এই ভাবটি যখন আমার মনে উঠে তখন আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া হৃদয়ে একটু শান্তি পাই। কিন্তু যদিও আমি স্থূল শরীরে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত নহি তথাপি সূক্ষ্ম শরীরে আমি তোমাদের মধ্যে বিরাজমান আছি ইহা নিশ্চিত জানিবে। তোমরা সকলে আমার শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিবে—আমি আশীর্বাদ করিতেছি যে তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি হউক এবং হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ কর। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

(১)

Darjeeling
24 5 37

স্নেহের—

তুমি Philosophy of Work-এ যাহা পড়িয়াছ তাহা practice করিবে। নিজেকে witness মনের সাক্ষী ভাবিবে। কাম ক্রোধাদি রিপু মনের ধর্ম্ম, তাহারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। হৃদয়ের মধ্যে আত্মাতে মনকে উঠাইয়া লইবে এবং বিচার করিবে যে কাম, ক্রোধাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে—এইরূপ ধ্যান করিবে এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্য আবৃত্তি করিতে করিতে আত্মার সাক্ষী চৈতন্য কেবল নিত্যশুদ্ধ ধ্যান করিবে। মনের বশীভূত হইবে না। এইরূপ প্রত্যহ অভ্যাস করিতে করিতে মনের চাঞ্চল্য দূর হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সংযমশক্তি ও শান্তি প্রার্থনা করিবে। Spiritual Unfoldment পাঠ করিতে practice করিবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তুমি মনে শান্তি ও আনন্দ লাভ কর এবং তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য হউক।

বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আশ্রমের সমস্ত কুশল। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

Darjeeling
29 6 37.

স্নেহের —

তোমার ২৬ তারিখের ভক্তিপূর্ণ-পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তুমি সংসারের বন্ধন অনুভব করিতেছ এবং শান্তি পাইতেছ না, এখন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার উপায় জানিবে। সংসারে বাস করিতে হইলে পাঁকাল মাছের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে হইবে এবং সমস্ত কর্ম্মের ফল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিবে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সংসারের কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিবে।

এখনও তব তোমার সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা নাই। তাহাদের ভার বহন করিতে হইলে কতটা শান্তি ও আনন্দ পাইবে উহা হইতেই তাহা অনুমান করিতে পার। কর্ম্মক্ষেত্রে যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ সেই কর্ম্মসকলকে "Work is worship" এই ধারণা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছ এই জ্ঞান রাখিবে এবং উহার ফলাফল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ (Resignation to the will of God) করিলে প্রাণে প্রাণে শান্তি পাইবে। "ফলেসক্তো নিবধ্যতে" অর্থাৎ যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা করে তাহারা কর্ম্ম বন্ধনে পড়িয়া অশান্তি পায়। তুমি তাঁহার দাস, বিজ্ঞান ভাবার যন্ত্র। তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেখানে যে অবস্থায় রাখেন এবং যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। তিনি সদয় হইলে তোমার আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তোমার প্রাণে নিশ্চয়ই শান্তি দিবেন।

তুমি বিচার করিয়া দেখিবে What is the aim of your life? (তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি) এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ অনুসন্ধান করিবে। এ বিষয়ে তোমাকে

তোমার মনের শক্তিকে analyse করিয়া দেখিতে হইবে। তৎপর আমাকে সেই aim (উদ্দেশ্য) জানাইলে আমি সেই বিষয়ে উপদেশ দিব। এখন এই পর্য্যন্ত রহিল।… … … … …তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।—ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

(৪)

দার্জ্জিলিং
২২।৭।৩৭

স্নেহের—… … …

যাহারা শ্রীঠাকুরের নিন্দা করে তাহাদের মুখদর্শন করিলে পাপ হয় জানিবে।

… … …

শ্রীমদ্ভাগবতে অথবা বেদে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কোন কথাই নাই; তোমাকে ভোগা দিয়া যাহা তাহা বুঝাইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও একঘেয়ে ভক্ত অথবা গোঁড়ামতাবলম্বীকে প্রশ্রয় দিতেন না। … … .. ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
অভেদানন্দ

(৫)

দার্জ্জিলিং
২২।৭।৩৫

স্নেহের—… … …

তুমি এখন প্রত্যাহার অভ্যাস করিতেছ এবং জপে আনন্দ পাইতেছ শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। জপ দ্বারা মন সহজে স্থির করা যায়—এবং উহা যোগসাধনের অঙ্গস্বরূপ। "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"—ইহা পাতঞ্জল দর্শনের একটী যোগসূত্র জানিবে। জপ করিতে করিতে যখন মন স্থির হইবে তখন ধ্যান আপনিই হইবে।

তুমি গবেষণা কার্য্যে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ যে দার্জ্জিলিং আসিতে পারিলেনা! কিসের গবেষণা করিতেছ? আত্মা সম্বন্ধে না অনাত্মা সম্বন্ধে? সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা হয়। … … … তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
অভেদানন্দ

(৬)

দার্জ্জিলিং
২৩।৮।৩৫

স্নেহের—… … …

তুমি লিখিয়াছ যে তোমার বাসনাগুলি তোমার মজ্জাগত হইয়া আছে। বড় বড় বাসনাগুলি নিত্যানিত্য বস্তু বিচারদ্বারা তাড়াইয়া দিবে এবং ছোট ছোট বাসনা বিষয়ের সহিত ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিবে। বহু জন্মের বাসনা হইতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। "রামপ্রসাদ একটি গান করিয়াছেন, "বাসনাতে দাও আগুন জেলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটি। কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই, মনের ময়লা ফেল কাটি।… … …

তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

শুভ আগমনী বন্দনা গানে

শ্রীমলিনীবালা বসু

সেদিন আবার আসিয়াছে ফিরে নিখিল ধরার বুকে,
যেদিন তোমার পরশ লভিয়া ধরণী জাগিল সুখে ;
শ্যামল কুঞ্জে জাগে শুক পাখী, পরিমলমাখা কুসুমেরে ডাকি'
সুনীল গগনে ভাস্কর জাগে আলো উজল করে —
আনন্দে দুলে উঠে তরুশির দখিন বায়ু ভরে।
অর্ঘ্য সাজায় নব ফুল দল, অর্ঘ্য সাজায় ধরা,
নয়নের দীপ জ্যোতির আলোকে অর্ঘ্য সাজায় তারা।
নব নীল মেঘ নির্ঝরধারে, অর্ঘ্য সাজালো গগন কিনারে,—
শুভ্র কমলে অর্ঘ্য গড়িল সুনীল সিন্ধুজল,—
শরৎ সাজায়ে শেফালি অর্ঘ্য আনে ভরি' অঞ্চল।
প্রকৃতির সাজে অপরূপ রূপ লাবণ্য ত্রিভুবনে,—
দেবতা! তোমার আগমনী গান বাজিছে ভবনে বনে।
নব শুভদিনে মঙ্গল ক্ষণে, হে প্রভু! আজিকে তোমারি স্তবনে,
শুভ আগমনী বন্দনা গানে তোমার উদয় হোক।
হেরি' প্রেমানন্দ মূরতি তোমার নিখিল জুড়াক শোক।
অম্লান মালা রহিয়াছে গাঁথা এখনো জ্বলিছে দীপ,—
মন্দিরে জ্বলে অগুরুর ধূপ, আঁখি জাগে অনিমিখ—
এসো দেব! এই আয়োজন মাঝে, দীপ্ত-মধুর উৎসব সাজে,
সুন্দর শিব সত্য রূপে জ্যোতির কনকালোকে,
হে পরম শুভ! উদয় তোমার হউক হৃদয় লোকে।
বাম করে তব রাজে বরাভয়, দক্ষিণে দেবাশীষ,
চরণপদ্মে পরম শান্তি ক্ষরিছে অহর্নিশ ;
[illegible] ললাট উপরে, নয়নে করুণা নিরন্তর ঝরে,
কণ্ঠে বাজিছে সুর-সুরধুনী অমৃত বাণীময়ী ;
চিত্তে বিরাজে শাশ্বত প্রেম অমরবরণজয়ী।
ভক্তজনের নয়ন-আসারে হোক অভিষেক তব—
চন্দন ফুলে চিত্ত কমলে হোক পূজা অভিনব—
বিকশিত হৃদি শতদল পরে, হে প্রভু! দাঁড়াও চির কৃপাভরে,
পুণ্য চরণ পরশে তোমার দূরে যাক তাপ জ্বালা
পদপদ্মে অঞ্জলি হবে অশ্রু-মুকুতা মালা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্ম্মসমন্বয়

শ্রীদুর্গানারায়ণ বসু বি-এ

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পবিত্র নাম দিব্যজীবন ও অপরূপ উপদেশ আজ শুধু ভারতবর্ষে নয় পরন্তু পৃথিবীর বহু দেশেই প্রচারিত ও পরিচিত। তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন অসাধারণ ত্যাগ তপস্যা পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সমুজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ। বহু শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীতে এমন আদর্শ ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে যেমন সম্পূর্ণভাবে জীবন্ত ও মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে এমন আর কোন মহাপুরুষের জীবনে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমহংসদেবের জীবন ও বাণী পৃথিবীর ধর্ম্ম-ইতিহাসে নূতন অধ্যায় নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। তিনি কোন প্রকার নূতন মত নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের অতীত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মকে আপনার জীবনে জীবন্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মমতই যে সত্য—প্রত্যেক আপাতবিরোধী ধর্ম্মমতের পিছনে যে একই চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে ইহা তিনি সমগ্র পৃথিবীতে নূতনভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। বিগত শতাব্দীতে মানুষ নাস্তিকতা, জড়বিজ্ঞান অথবা অন্য সমস্ত দেহতাত্ত্বিক মতবাদের কুহকে ঈশ্বর, পরলোক, মুক্তি, কর্ম্মফল পাপ-পুণ্যের পরিণাম প্রভৃতি উপহাস ও অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিতেছিল। সেই সময় বাঙ্গলাদেশের এক নির্জ্জন নিরালা স্থানে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, রামাৎ, বেদান্তী, ইসলাম এমন কি খৃষ্টান মত পর্য্যন্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম যে সেই একই ঈশ্বরে মানুষকে লইয়া যায় ইহাই রামকৃষ্ণদেব সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেন। পরমহংসদেবের জীবনে আমরা যাহাকে বলি লেখাপড়া বা বিদ্যাশিক্ষা এমন কিছুর সংস্পর্শে তিনি আসেন নাই। তাঁহার যে জ্ঞান তাহা তাঁহার নিজস্ব সাধনার লব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমুজ্জ্বল দিব্যজ্ঞান। এই বিষয়ে জগতের অন্য দুই ধর্ম্মগুরু যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদের সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই অপরিমেয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি, এই অশ্রুতপূর্ব্ব দিব্যজ্ঞানের বলে তিনি সশরীরে বিদ্যমান থাকিতেই তাঁহার সমসাময়িক বহুশত শিক্ষিত ব্যক্তির এমন কি বহু প্রধান প্রধান মনীষীগণেরও ভক্তি ও বিস্ময়ের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর সেই আধ্যাত্মিক প্রভাব দিন দিন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। জগতের ত্রিশটি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার জীবনী ও উপদেশ অনুবাদিত হওয়ায় তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মসাধক ভক্তিভরে অভিনন্দিত করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে আমরা এই শিক্ষা পাই ধর্ম্ম এক—কিন্তু সেই ধর্ম্মকে লাভ করিবার পথ বহু ও বিভিন্ন। মানুষের মনের রুচি ইচ্ছা ও শক্তি বহুমুখী ও বিবিধ—সেই কারণে ধর্ম্মকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মানুষ বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করিয়া

আসিতেছে। পরমহংসদেব বলিতেন, "সব ধর্মমতই সত্য, যত মত তত পথ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই নানা ধর্মের নানা সাধনার উৎপত্তি হয়েছে।" সাধারণতঃ দেখা যায় এক ধর্মের লোক অপর ধর্মের লোকের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ও বিদ্বেষপরায়ণ। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী ভাবিয়া থাকে তাহার অবলম্বিত ধর্মপথই সত্য আর সব ধর্মমত অসার ও মিথ্যা! এই প্রকার লোক মনে করে সত্য শুধু তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ, আর কোথাও সত্য নাই। মুক্তিলাভের জন্য তাহার ধর্মপথই একমাত্র পথ—আর সব পথ ভ্রান্তি অজ্ঞানতা ও নরকের দিকে লইয়া যায়। কিন্তু পরমহংসদেব পরধর্মের প্রতি দ্বেষ, হিংসা ঘৃণা ইত্যাদি এইসব হীন মনোবৃত্তির আদৌ প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি সাধনাবলে দেখিয়াছিলেন ও সমস্ত জগৎকে দেখাইয়াছিলেন—ঈশ্বর এক, ধর্মের মূলনীতিকে জীবনে অকপটভাবে প্রতিপালন করিলেই মানুষ যে নামেই যে ভাবেই ভগবানকে ডাকুক না কেন তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইবে। সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, ত্যাগ তপস্যা বিবেক, বৈরাগ্য শুদ্ধাভক্তি, সকল মানব ও জীবের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা যাহার আছে, তিনিই ভগবানকে পাইতে পারেন পরন্তু অপর কেহই নহে।

ধর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে জানিতে হইলে ধর্মের মূলনীতি অতি অবশ্যই জীবনে প্রতিপালন করিতে হইবে। ধর্মের মূলনীতি না মানিলে ধর্মজীবন শুধু একটা কথার কথা মাত্র। ধর্মের মূলনীতিকে না মানিলে ধর্ম সাধনার কোন অর্থই হয় না। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি ধর্মের অসার গৌণভাগ এবং সংযম, পবিত্রতা, ধ্যান-অভ্যাস, ভক্তি ব্যাকুলতা, মানবপ্রেম, অহিংসাই ইত্যাদিই ধর্মের আসল দিক। ধর্মের এই আসল দিককে বাদ দিয়া কোনক্রমেই ধর্মসাধনা হইতে পারে না। অথচ যাহারা 'ধার্ম্মিক' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ধর্মের এই মূলনীতি পালনের ধার দিয়াও যাইতে চাহেন না। তাঁহারা শুধু গতানুগতিক কতকগুলি যুক্তিহীন আচার, dogma, creed ও অলীক বিশ্বাসকে মানিয়া এবং অপর সম্প্রদায়ের লোককে গালাগালি দিয়াই ভাবেন ধর্মসাধনার চূড়ান্ত হইল! যাহারা এভাবে ধর্মসাধনা করিতে যান তাঁহারা কখনও প্রকৃত ধর্মসাধক হইতে পারেন না। সেইজন্য পরমহংসদেব তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে এ সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন 'একঘেয়ে হওয়া ভারী খারাপ, আমার ধর্মটি ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল একরকম ধারণা হীনবুদ্ধিদের কাজ। সত্য কারুর একচেটে সম্পত্তি নয়—গণ্ডীর ভেতরে থাকলে সত্যকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে জানবার জন্যে সাধনায় একেবারে ডুবে যাও। সেই একই ভগবান—তাঁকেই মানুষ ঈশ্বর, হরি, আল্লা, God, প্রভু প্রভৃতি নানা নামে ডাকছে।" যদি আমরা সকলভাবেই ভগবানকে পাওয়া যায় বিশ্বাস ও উপলব্ধি করি এবং তাঁহার উপদেশ জীবনে পরিণত করিতে পারি তাহা হইলেই আমরা রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত হইতে পারিব—নতুবা তাঁহার ভক্ত হওয়া কথার কথা একটা হাস্যকর বাক্য বিড়ম্বনা মাত্র।

জগতের প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব ঘৃণার ভাব, ভেদনীতি, মাৎসর্য্যতার

পরস্পরের মধ্যে এক প্রচণ্ড ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে সেই ভেদের প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সকল মানুষকে এক উদার বিশ্বভ্রাতৃত্বে মিলাইবার জন্যই রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিশ্বমানবতা, বিশ্বমৈত্রীর তিনি ছিলেন জীবন্ত বিগ্রহ। যদিও তিনি বাঙলাদেশে হিন্দুজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি সকল প্রকার জাতিভেদ বর্ণভেদ প্রভৃতির ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীরের মধ্যে কোনদিনই আবদ্ধ ছিলেন না। উদারতা, বিশ্বমানবতাই ছিল তাঁহার মহতী শিক্ষার বিশেষত্ব। তাঁহার ধর্ম-উপলব্ধি সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিল ভূমি হইতে বহু ঊর্দ্ধে—তাঁহার মানবপ্রেম দেশ জাতি বর্ণ সমস্ত গণ্ডী ভাঙ্গিয়া সমগ্র মানবজাতিকে প্রবল বন্যার ন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিল। মানুষে মানুষে তিনি কোন ভেদ রাখিতেন না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-মূর্খ সকলেই পরমহংসদেবের প্রেমের প্লাবনে ডুবিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। সকলের জন্যই ছিল এই অলোকসামান্য দিব্যমানবের অবারিত দ্বার। প্রকৃত কথা বলিতে কি জগতের সকল দেশের নরনারীকে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্যই পরমহংসদেব আসিয়াছিলেন। পরমহংস-দেবের শ্রীমুখের বাণী সূর্যালোকের ন্যায় প্রকৃত সাধকদের চিত্তাকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া মোহ অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছে। পরমহংসদেবের অভয়বাণী হতাশ, পতিত, উপেক্ষিত নরনারীর প্রাণে আশা, আনন্দ ও নবশক্তির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তিশালী মহাপুরুষ বাঙলার তথা ভারতের লুপ্তপ্রায় স্বধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন—নির্জীব ভারতবর্ষ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের চেতনস্পর্শে আবার নূতন জীবন, নবজন্ম লাভ করিয়াছে। সর্ববিধ ধর্মভাবের এমন অপূর্ব সমন্বয় এযুগে আর কোথাও দেখা যায় নাই। সমস্ত মানবজাতিকে যিনি প্রকৃত ধর্মলাভের সন্ধান দিলেন—যাঁহাকে দেখিয়া নাস্তিক অবিশ্বাসী মানুষের মনেও ধর্মবিশ্বাস মুহূর্তে জাগ্রত হইয়া উঠিল—যাঁহার প্রভাবে যথার্থ মুক্তিকামী সত্যান্বেষী নরনারী মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম হইল মানুষ মাত্রেই ভগবানের সন্তান—যাঁহার শক্তিতে ধর্মসাধকমাত্রেই বুঝিতে পারিল বাহিরের আচার অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্ম মূলতঃ এক—সেই দিব্যদ্রষ্টা অলোকসামান্য শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা কে ধারণা করিতে পারে? মহাযোগে সমাসীন নির্বিকল্প সমাধিস্থ নিখিল বিশ্বমানবের দুঃখ-দুর্গতিজনিত বেদনায় কাতর সকরুণ সজলনেত্র যাঁহার ভাবতন্ময় নির্মল নিরঞ্জন মূর্তির দর্শনে মানুষের জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি বিধৌত হইয়া যায়—মানুষ পরম সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয় সেই শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা কোথায়? সত্য সত্যই তিনি অপরূপ ও অতুলনীয়। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম।

গিরিশচন্দ্রের "আগমনী"

শ্রীরমাই মতিলাল

গায়েন নতুন হলে কি হয় আসরে নেমেই তান ছাড়লেন খেয়াল আর তাল রাখলেন ফেরতা। পুরানো গানগুলি এক রকম সয়েই এসেছিল, এ একখানি নতুন গলায় নতুন গান। একেবারে ঘরের গান—যে যে ঘরের ঘরের-লক্ষ্মী, ঘরের-কর্তা সব সংসারের ভার ও ভাবনায় ঘর সংসার করেন। ঘরের একমাত্র মেয়ে শ্বশুর-ঘর করতে গেছেন অনেক দিন। যার এক বিন্দু অদর্শনে মায়ের প্রাণ প্রবোধ মানে না, পাঁচটা নয় সাতটা নয়, সেই বাছার দুলালী ভাগ্যগুণে পড়েছে যেমোন ঘরেও নয়, এমন একজনের হাতে যার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। গানের ধরতাটা আমরা দেখি মায়ের সেই ভাবনা। এ মিছির আবদার নয়। ব্যাকুল যে তিনি হয়েছেন তা সেই সখীর থিয়েটার সিনেমা দেখার আশায় নয় অথবা গৃহস্থ ঘরের গিন্নির মেয়ের বাড়ী ইলিশ মাছের তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে নয়। যে ভাবনা তিনি ধরেছেন তা বড়ই বিষম। তিনি মেয়েটীকে একবার দেখতে চান—সেই গভীর ব্যাকুলই। তাঁর দুঃখ এই যে কর্তা এই একটা সোনার চাঁদ মেয়ের, বছর ফিরতে যায় কোন প্রাণে দিনেকের জন্যও খবর নেন নি। নারী হয়ে তিনি কি করে খবর নিতে পারেন? গানের এই ধরতাটা কীর্তনের লেফচারের মত শোনায় না, চিরাচরিত নাকি সুরের মত বিজনীও নয়। গাইতে বসেই গায়েন যেন গান আরম্ভ করলেন 'নি'-কে 'সা' করে। একটা পূর্ণ পুরাতন গায়েনদের অমরগীতি এই ধরতাতে ধরা পড়ে যায়। আমরা যেন শুনতে পাই সেই গান—যেখানে এক দেশের রাজার, কন্যার উপর যার কোন কর্তব্যই নেই। একদিন যখন যুবতী কন্যা ভাতের থালা রাজা বাপের সম্মুখে ধরে' দিতে এলেন, রাজা মশাই রাণীকে সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাণী এই কন্যেটী কে?" রাণীর জবাব, "ও পোড়া কপাল! এযে তোমারই মেয়ে।" আর আছে কোথায়, রাজাও গরম হয়ে বললেন, "এ্যাঃ এত বড় হয়েছে! কাল প্রাতঃকালে উঠে যার মুখ দেখবো তাকেই কন্যা সম্প্রদান করবো। এ দেশের যেন কন্যা সম্প্রদানের এটা একটা monopoly, তা রাজাই হউন আর অন্য কৌলীন্যী, উকিল, ডাক্তার আর মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক আর লেখাপড়ার যেন কেরাণীই হউন। এই হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য নারী জন্মের এই একই ধারা। বাপ কেঁদে আসেন, মা কাঁদেন। আর উমের দক্ষ প্রজাপতির আর প্রসূতীর পুরাণো কথা এই কথাটার উপরই কেবল রং চড়ান। এবারেও কি তাই? History repeats itself. সেই উমাপতিকে ধ'রে দেওয়া হয়েছে এক ভিখারীর ঘরে—তারপর ব্যাস্ একদম্ চুপ চাপ। মেয়েটা বেঁচে আছে কি নেই, কর্তার সে খবরই নেই। পার হয়েছে মা বাবাই গেছে। আমরা যখন এই নতুন গায়েনের সেই পুরাতন করুণ রোদন ধ্বনি শুনতে পাই তখন আমরা গায়েনের

নিজ কণ্ঠ থেকেই যেন শুনতে পাই যে "হ্যাঁ গো ভারতের কর্তারা তোমরা কি সত্যি সত্যি এই কোম্পানীর মুল্লুকেও 'দুধ না পিলিয়ে' ছাড়বে না ?"

কথা উঠতে পারে charges false, accused not guilty—এটা বেশ নতুন গায়েনের খেয়াল কিম্বা করুণ গেয়ে কৃত্তিবাসের ছড়া কাটানো—যাতে অন্ততঃ নারী সমাজ থেকে সিকেও পাওয়া যায় প্যালাও পাওয়া যায়। এটা কেবল গান জমাটির ফিকির। খেয়াল—খেয়ালতো বটেই। কোনটাই বা খেয়াল নয় : কোনটা বীরের খেয়াল, কোনটা শিল্পীর খেয়াল, কোনটা সাহিত্যের খেয়াল কোনটা পুণ্যের খেয়াল কোনটা ধর্মের খেয়াল। আবার বাবাজাচারী ধনীদাতা, ভিখারী বিদায়ের সময় বলেন, ভিখারীর ঐ বুকফাটা কান্নাটা, ওটাও ওর একটা খেয়াল। এখন আমাদের গায়েন এই গানের কর্তাদের পায়ে ধরে' বলতে চান, "হ্যাঁ-গা! তোমাদের সহানুভূতির খেয়াল জাগে না কেন ? তোমাদের মা-বোনেরাই, যাঁরাই আবার জননীরূপে ঘরে ঘরে বিরাজ করেন ও আর এক সেট তোমাদের মত কর্তাদের প্রসব করেন, কোন প্রাণে তাদেরই এত খোয়ার কর ? আর সহানুভূতি যদি তোমাদের এত ভীতির সঞ্চার করে তবে তোমরা এত উদবুকই বা কেন ? তোমরা এত বিদেশী লোক এই খানটায় এত দেশহিতৈষী কেন ? বোঝা উচিত সবই আরশীর মুখ দেখা, —হাস হাসবে, কাঁদ কাঁদবে, ভ্যাংচাও ভ্যাংচাবে।

আমরা এই গায়েনের গানে এক নতুন মাতৃনাম পাই। মাতা—অবশ্য যিনি সন্তান, প্রসব করেন, প্রসূত জীব প্রসূতীকে মাতা বলে ডাকে। এ সেখানের গান নয়—আবার এ ধারণা মাও নয়, যেমন পরস্ত্রীকে অথবা স্ত্রীমাত্রকেই কায়দা মাফিক মাতৃপদবাচ্য করা হয়। মানুষ যার গর্ভ থেকে বাহির হয় অথবা যাঁর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়, উভয়কেই শাস্ত্র মাতা বলে নির্দেশ করেছেন। একজন জননী অপরজন জায়া। জগৎ সংসারে নারীগণকে কেতাদোরস্ত 'জননী' নামে সম্বোধন করলে হয়তো কেউ আপত্তি না করলেও করতে পারেন কিন্তু জায়া সম্বোধন করলেই প্রলয় আর কি। আর্য্যজা এই দুইএর মধ্যবর্তিনী। কন্যার দেহটাই কেবল জায়ার অনুরূপ না চরিত্রগত মাতৃত্বও তাতে অশেষ আছে আর গর্ভধারিণী মায়ের চিহ্ন কন্যায় ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। এমনই মায়ের আগমনী গাইবার জন্য গায়েন ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু এই মা কোথায় গিয়েছিলেন, আর কোথা থেকেই বা আগমন করবেন ? "দেহুদ্ভাগমনেন কঃ।"

অবশ্য মা গিয়েছেন শ্বশুর-বাড়ি। আমার সময়কার বাকি্য জানা নেই কিন্তু বাক্যিটা আজও বহুত এবং বলবৎ আছে। "দুধ্‌ গা খাবেন শ্বশুর বাড়ি সর্ব্ব খাবে কে, ছেলেদের আছে দুলো বেড়াল গোঁফের বেরেছে।" এখন ক'লকাতার মায়েরা যখন শ্বশুর বাড়ি যান তখন গাড়ি পালকির ভিতর ঝিমিয়াগী বোকের ছেলেদের এক দুলো বেড়াল সাথী হেলাতে দোলাতে যায় বটে, কিন্তু গ্রাম থেকে গ্রামান্তর দুনি বেড়াবার জন্যে মায়েরা নাড়া পাকা মান-আমানে ফিরতে ফিরতে যখন যান তখন 'কা কস্য পরিবেদনা।' শাস্তরীর তো আমাই

বাড়ি যেতে নেই, শালাবাবুদের অপমান, ঘোষ কর্ত্তা হাতে হাতে সঁপে দেবার সময় একবার কেঁদেই খালাস। যখন ঐ এক বুনো বেক্কাল, বুঝিল আসান। গায়কের এই বা রীত হয়তো এইভাবেই যাত্রা করেছিলেন। একটা কথায় তার ইঙ্গিত আছে। যখন হিমালয় কর্ত্তাটিকে মেয়ের বাড়ি যেতে বলা হয় তখন তিনি একেবারে কুচি নাক দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'এঃ এই রজনীতে সেই ভবের কৈলাস পুরীতে!'—তবুও এ পাকা আর কাঁচা। কন্যাটিকে হিমালয় গ্রামেরই এক জনকে দান করেছিলেন। স্বয়ং রাজার চৌখাখার মণি মানিক কোণে, জামাইয়ের কিন্তু চালে খড় নেই আর যদিও দু-এক বাটি থাকে তাও কর্জ্জা। হয়তো গিন্নির অজান্তে টেনে টুনে হাড্ডিসার বুড়ো বলদের মুখেই ধরে' দিয়েছেন—সেখানে এই দেখতে যাওয়া! আরে ছ্যাঃ, ঘরের তো চাল চাল এই তার উপর থাকেন যত নীচ সব, ব্যাটারা ভূত আর কি! গিন্নি মাইনের চাকর। জামাই লেখাপড়া ক'রে আর উপার্জ্জনের দিকেও যায় না। এই উত্তর সঙ্গে সমস্ত দিন সিদ্ধি গাঁজায় টং হন। তাদের বুলির মধ্যে ঐ এক বুলি "গাঁজায় বুটি চিনিস" ঃ এমন গানেও ভদ্রসন্তান যায়, আবার মাথা নিচু করে! সবচিন বয়েজাজী জামাই প্রথম্ দর্শনের সময় শ্বশুরের সামনে মাথা হেঁট করেন নি। কিন্তু তবুও যেতে হবে "হার মেজেষ্টীস্ অর্ডার।" সুতরাং—

গ্রাম-ট্রেইনএর রাস্তা। রাজা হলেও পাওনা দিয়েছিলেন নিশ্চিত। মটরকার ছিল না আর Monthly Ticket-ও ছিল না বোধ হয়। চোখ কান বুঁজিয়ে দিয়েছিলেন। যেখানে দিয়েছিলেন সেখানকার হালচাল নিতান্তই মামুলী। নব্য আসরে নাক কোঁচকান, নাক বাড়ার তোয়াক্কা না রেখেই গা'য়েন যখন গান চালিয়েছেন তখন আমাদের মোটাবুদ্ধির দল জব্দ করলে চলবে কেন! সেই বাড়ির বিয়ের রাত্রে আমরা জানি হয়েছিল এক চণ্ড কাণ্ড। পাড়ার ছেলেরা সকলা আইনের দোহাই দিয়ে থানায় দেয় খবর যে গৌরীর বয়স নাকি আট বৎসর। তারপর ঐ ভদ্রলোকে কবিরা লেখেন কাব্য, সাহিত্য, সমালোচনা। আরে ছ্যাঃ হিঁদুয়ানী; এমন বেতস লতা ধ'রে দেওয়া হল এক বোমবোলের হাতে যিনি প্রায় বাপেরই বয়সী। যাই হউক সেই কন্যা এখন কিশোরী। তার তপস্যারি গৌর তনু নিরাভরণা। এ বরবর্ণি নবীনার গরব করতে পারেনের মাথায় বজ্রাঘাত হল না কেন? হা হতোষ্মি! সেই লেখা আবার ছাপানো? তাকে কি বোঝা বুঝি? তারপর শুনুন সেই বেরকেলে বেহায়া বুড়োর খোশামুদীটা। তাঁর কাপড়ের অবস্থা নেই অথচ বলেন, "তুমি গিরিশপ্রাণ, গিরিশ-ধ্যান গিরিশজায়া"—আরো কত কি। এই তো গায়ক গিরিশের কেরামতি, বাহাদুরি। খোসামোদের বহর দেখে টাপার কলি কি আর করেন, বলতে বাধ্য হলেন "আজ এত বিলম্ব কেন?"

গিরির যে এত সুখ ছিল তারও ছিল এক মতলব। হাসিল করবার তরে গোবদ্ধ' নামী জাতির এ একটা আর্ট। মতলবটি সমীচীন হলে কি হয় সেও আবার আস্পদের বিরোধী। ক্যামানটা হালও বটে আবার বেহালও বটে। সে-হালের কথায় আসাটা

বাড়িকের 'ওঁচড়া' আর রাণের কথায় শ্বশুর 'সাক্ষাৎ জামাই বরণ' করতে অনিচ্ছুক। সম্ভবতঃ অপমান বোধ করেন—যা একটু সম্পর্ক ঐ বিবাহেরই সাথে। কন্যা পিত্রালয়ে এ জামাতারা খুব নজর রাখেন যে পুঁটলী বেঁধে না সব নিয়ে যায়। যদি বৈধব্য কালে স্বামী অন্ততঃ একটা লাইফ ইনসিওর না ক'রে না যান তবে সেই কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থানের কথা না উল্লেখ করাই ভাল। 'বাপ রাজা তো রাজার ঝি, ভাই রাজা তো আমার কি?' কিন্তু কন্যাজন্ম এমনই complex যে তিনি কেবলই পতি'প্রিয় হতে চান না পতিকে পিতৃপ্রিয় করতে চান। এইটী পূর্ণ না হ'লে কন্যা জন্ম কোন মতেই সার্থক হতে পারে না। যে কন্যা আচরণ করেন যে শ্বশুর, ভাশুর, দেবরতো কেউই নয় এমন কি পিতা মাতাও পর, তাঁর পতিই একমাত্র 'ঈশ্বর' তিনি কন্যা নামের কলঙ্ক। এঁরা ধনী মাতাপিতার জীবিত কালে কোন প্রকারে পিতৃচরণ দর্শনের ফ্যাসান রাখেন বটে কিন্তু দরিদ্র পিতামাতা মরণাপন্ন হলেও তাঁদের সাধের পতিগৃহ ছেড়ে ক্ষণেকের নিমিত্তও, পিতৃসেবা করবার অবকাশ তাঁদের হয় না।

ইঁহাদের পতিপ্রেম প্রেম অভিধা পাইতে পারে না। কারণ প্রেম স্পন্দন-ধর্মী। কেন্দ্র হইতে উঠিয়া জগৎ প্লাবন করে। প্রেম স্বয়ংই তাহার নাদ-কেন্দ্র—অনাহত ভাবে তিনি মন্ত্র, আহত ভাবে সঙ্গীত। পিতামাতা মন্ত্র, পতি তাহার সঙ্গীত। খোঁড়া প্রেম কোন কাজেরই নয়। শাস্ত্রের এই চালাক মেয়েটী এই "হারামণির" তপস্যায় মশগুল। তাঁরই পক্ষে প্রেম অতুলনীয়। একবার এ চেষ্টা করে গিয়েছিল, এবারও পারি কি চাবি। আমরা দেখেছি পারেন এবার পেরেছেন।

কন্যার সঙ্গে জামাতাও শ্বশুরালয়ে যেতে থাকি, নিতান্ত বেহায়াই হবে। "কূজপ্রভ-পিশাচাস্তা!" এ একটা টানের মত টান বটে। কোন হালের জামাতা এই রকম দল নিয়ে শ্বশুর বাড়ির 'বঙ্কিম'-এ এগুতে সাহস করেন কি? তাঁর আগমনের একটা হেতু আছে।

তার পর খানের শ্বশুর পক্ষ হতে বাবে ফিরে ঝগড়া। দুজনের দেখা যদি হল তো যে যেহ চালা হল। যা না হলে তা অন্যের পক্ষে তুষ্ট অপার। বাক্যগুলো কোন পুরুষেরই মুখ থেকে বেরুলে বলা যেতে পারে যে তিনি 'উৎলোপ' করতে চান নিশ্চয়। যেক্ চোক্ত পতি নিন্দা "জামাই নাকি ভিক্ষা করে?" স্ত্রীর পিতৃকুল যৌতুক বিক্রমপুর চালান দেন, মরদের এই একমাত্র গুণ। এ ছ্যাঁচড়া মরদের ভাঁপে বটি মেয়েটো মাকেও একবার মনে করে না! সে এক জন পর বইতো নয়। কি করে ভোলালে কি এমন দিলে যা মাতৃস্তন্য অপেক্ষাও পীযূষবর্ষী। এমনকার মেয়ে হলে জবাব দিত, "মা! তুমি কার ঘর কর মা?" এ খাঁটি ঠ্যাকাঠ্যাকি বাংলার ঘরেই হয়ে থাকে, যার বলা হচ্ছে বুকভরা প্রেম, সতী মায়ের সতী মেয়ে, স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান। স্বামী ধ্যান জ্ঞান ব'লে যে গৌরব উঁহার, মায়ের পক্ষে তা যেন একটু অগৌরবের মত—কারণ তিনি সন্তানজননী। তিনি যে কি ক'রে একদিন সন্তানকে ভুলে ছিলেন সেইটাই সন্তানের ধাঁধা। মা-ই যদি এমন হবে বাপের পক্ষে কি

সম্ভব, কেন বাপ মা মেয়ের বিয়ের পর মেয়েকে সন্তান ব'লে মনে রাখেন না, শুধু মেয়েকে নয় মেয়ের স্বামীটিকেও? আর জামাইএর আদরেই মেয়ের যথার্থ আদর। মেয়েকে যদি বাপ মা যখন তখন না আনতে পারেন, জামাই পুরুষ মানুষ, আদর পেলে সন্তানের মতই তার শ্বশুর গৃহে নিত্য আসারই সম্ভাবনা।

যাঁরা বলেন বড় মেয়ে বিয়ে না দিলে স্বামী-স্ত্রীর ঠিক বনিবনা হয় না অর্থাৎ ভালবাসা হয় না তাঁরা ভালবাসার মূল তত্ত্বটিই জানেন না। শৈশব প্রেম বিশ্ববিজয়ী, বুড়ো মেয়ের আঁখির দেখা। যৌবন নিশার স্বপন, তা জমবার সময় পায় না। এর আরো একটা কারণ যৌবন ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং "ডিভোর্স কোর্টে" টানাটানি। তবে বাল্য-বিবাহ এক আর সদ্য বিবাহ সম্ভোগ অন্য কথা। যদি দ্বিতীয় কারণের জন্য বিবাহ দরকার হয় তবে তাঁরা যা বলেন তাই হয়তো ঠিক। কিন্তু গৌরীদান তো তা নয়। তবে তার উপর এত আক্রোশ কেন! Ip so facto আট বৎসরের কন্যার বিবাহ সম্ভোগের জন্য হতেই পারে না। এ কথাটা না বোঝার কারণ কি? সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে এই বালিকা বধূরাই পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ মহামানবদের প্রসব ক'রেছিলেন।

আর একটা কথা, যদি মা আনন্দই চাও তবে কন্যারূপিনী যৌবনাঢ্যা জননীরই আগমনী করিও।—গর্ভধারিণী জননীকে যৌবনোদ্ভিন্না রূপের কল্পনায় বিপদ আছে। সেই জন্যই আমাদের গায়েন আমাদের নবযুবতী জননীকে শিব অঙ্কে স্থাপন ক'রে গান শেষ করলেন। এই ছবি—এই গান বাঙালীর নিজস্ব প্রতি ঘরের সজীব চিত্র।

শারদীয়া

শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল এম-এ, বি-এল

(গান)

ওই জননী কল্যাণী জাগে।
সন্ততিগণ সবে জুড়ি' কর আশীষ মাগে।
শুভ শঙ্খ সে মঙ্গল গগনে বাজে,
কনক কিরণ ঝলে শ্যামল সাজে,
বিটপিলতাদলে বিহগ কূজন
অলস শ্রবণপরে লাগে।

গাহিছে মধুর মরাল মন্দিরা
সঙ্গীতে বাজায়ে বীণা,
অন্ধ তিমির ভয় আজি পোহাইল
ত্যজিল উষসী নবীনা;

বিজয় মন্ত্র কর জগতে প্রচারিত
পুণ্যবীথি কর সকলে অবারিত
ঘোষণা কর সবে নবযুগ আসি
শান্তি সমুজ্জ্বল জাগে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী শঙ্করানন্দ

এক্ষণে আমরা দুইটী তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়াছি, একটী হইতেছে আত্মা বিশ্বের মূল সত্তা, আর একটী হইতেছে শরীরধারী আত্মা, যাহাকে জীবাত্মা বলা হয়। এই জীবাত্মার বন্ধনের সহিত যখন আত্মা নিজেকে অভিন্ন মনে করেন, তখনই তিনি নিজকে বদ্ধ, অসহায়, মন-বুদ্ধিযুক্ত এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিন্তু এই সকলের অতীত, নিত্য আত্মা। ইনি জীবাত্মা হইতে অভিন্ন প্রতীয়মান হইয়া আমাদের অন্তরে বিরাজ করেন, অথবা সত্য কথা বলিতে—সকল প্রকার পরিবর্তনের অধীন এই জীবাত্মা ইঁহাকে (আত্মাকে) অবলম্বন না করিয়া নিজ অস্তিত্ব রাখিতে পারে না। এই সুখ-দুঃখের ভোক্তাকে যদি আত্মা বলা যায় তবে সেই নিত্য সাক্ষী বা সকল পরিবর্তনের অতীত সত্তাকে আত্মার আত্মা বলা যাইতে পারে। এই সকল কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা ও শিষ্য অর্জুনকে বলিলেন: "এই তত্ত্ব জানিয়া শোক পরিহার কর।" যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুর অধীন নহেন, অর্থাৎ তাঁহাদের যে মূল সত্তা তাহা বিনাশধর্মশীল নহে—তাহারকখনই বিনাশ হইবে না। তাঁহাদের যে শরীরী আত্মা, যাহা শরীরের সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিতেছে, তাহারও বিনাশ হইবে না, সুতরাং সকল চেতনার উৎস যে তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ তাহার বিনাশের প্রশ্নই আসে না। স্থূল শরীরই বার বার জন্মায় ও মরে, সুতরাং দুঃখ কিসের? তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিতেছেন: "তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছ, এবং এই বংশানুযায়ী ধর্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম। তুমি যদি তোমার স্বধর্ম পালন করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হও, তাহা হইলেও শোকের কারণ কোথায়? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহার অধিক আর কাম্য কি থাকিতে পারে?" অর্থাৎ স্বধর্মের দিক দিয়া দেখিলেও কর্তব্যজ্ঞানে যুদ্ধ করা অর্জুনের উচিত, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

যদিও এখানে শ্রীভগবান ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন, তথাপি তাঁহার উপদেশের লক্ষ্য বা অভিপ্রায় সার্বজনীন্। ইহা জগতের সকল মানবের—সকল শ্রেণীর—সকল জাতির কর্তব্য নির্দেশক। আমরা জীবনে যে সকল কর্তব্যের সম্মুখীন হই তাহা দুরূহ মনে করিয়া তাহা হইতে যাহাতে পশ্চাদপসরণ না করি—যাহাতে নিজ নিজ কর্তব্য কার্য সাধন করিতে পারি ইহাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য। অর্জুনের পক্ষে ধর্মরক্ষার্থ যুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য, কারণ ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবে।

* শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর ইংরাজী Gita lecture অবলম্বনে।

তৎকালে ক্ষত্রিয়কুল অতি প্রবল হইয়া সমাজের যথার্থ কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ সাধনের মহা অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা যথাযথ বিবর্জিত হইয়া ঐহিক সুখভোগকেই একমাত্র কাম্য স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। নিজ স্বরূপ আত্মার কথা ভুলিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া—আমি ভোগী, আমিই সব করিতেছি—এইপ্রকার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করাই জীবনের একমাত্র কাম্য উহাই স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায়, কপট পাশায় যুধিষ্ঠির হারিয়া গেলে, দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় লোকের সম্মুখে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, সকলেই তাহা মূকের মত দেখিতেছেন, কাহারও মুখ হইতে প্রতিবাদ শোনা যাইতেছে না—ইহার অধিক সমাজের অধঃপতন আর কি হইতে পারে! এই সমাজের এই অনাচারের বিরুদ্ধে ধর্মার্থী হইয়া পাণ্ডবগণ যথার্থ ধর্মযুদ্ধই করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাই অর্জুন যখন আত্মীয়-স্বজন হননের ভয়ে যুদ্ধত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন শ্রীভগবান তাঁহাকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহার স্বধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন: "কেন যুদ্ধ করিবে না? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম যথার্থ যুদ্ধই হইতেছে স্বর্গে যাইবার প্রশস্ত পথ।" তাঁহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া সম্মুখ সমরে হত হইলে তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন, এই বিশ্বাস ক্ষত্রিয়গণকে দুর্জয় যোদ্ধাতে পরিণত করিয়াছিল। যুদ্ধে তাঁহারা কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেন না, তাঁহারা সম্মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন এবং মনে করিতেন ইহাই তাঁহাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল। সৈনিকগণ সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করুন বা সংসার-ক্ষেত্রে বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করুন সকল যোদ্ধারই এই প্রকার মনোবৃত্তি হওয়াই উচিত। এই প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে যুদ্ধে কেহ কোনও জয় করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ এজন্য বলিতেছেন: "যদি যুদ্ধ না কর তাহা হইলে তোমার পাপ হইবে এবং ইহার জন্য শাস্তি পাইতে হইবে"। তিনি স্পষ্টভাবে সকলের নিকট প্রকাশিত; তাঁহার পক্ষে লোকনিন্দা মৃত্যুরও অধিক। মহারথীদিগের ভিতর অর্জুন অগ্রতম। যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আসিয়া শোক-মোহে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—ইহা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার। শ্রীভগবান বলিলেন: "এই মহারথীগণ তোমার মনের অবস্থা বুঝিবেন না। তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না যে তুমি শুধু আত্মীয় হননের ভয়ে যুদ্ধত্যাগ করিলে। তাঁহারা তোমাকে বিদ্রূপ করিবেন। তাঁহারা মনে করিবেন তুমি ভয়েই যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে। বল অর্জুন! ইহা হইতে দুঃখের—ইহা হইতে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? সুতরাং যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, যুদ্ধ কর। যদি যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয় তবে স্বর্গে গমন করিবে, আর যদি জয়ী হও তো পৃথিবী ভোগ করিবে।"

স্বর্গ বহু আছে বলিয়া হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। তাঁহারা মনে করেন—বিভিন্ন স্বর্গে ভিন্ন ভিন্ন কর্মফল ভোগ করিবার জন্য দেহবিমুক্ত আত্মা গমন করেন। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের কর্মানুসারী বিশেষ বিশেষ স্বর্গে গমন করিবেন। এই সকল স্বর্গ নিত্য বা অনন্ত কালস্থায়ী

নহে। সেই স্বর্গবাসীরাও পৃথিবীর লোকের ন্যায় মরণধর্ম্মশীল। পার্থক্য শুধু এইখানে যে, পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়—স্বর্গে শুধুই সুখ, শুধুই আনন্দ, দুঃখ বা নিরানন্দের লেশও সেখানে নাই। শ্রীভগবান তাই বলিতেছেন: "যদি যুদ্ধে হত হও তবে স্বর্গে গমন করিয়া অপার সুখ অনুভব করিবে। আর যদি জয়ী হও তবে পৃথিবী ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। হে কুন্তীনন্দন! শোক পরিহার করিয়া উত্থিত হও এবং সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়কে সমান ফলপ্রদ মনে করিয়া যুদ্ধ কর।"

শ্রীভগবানের উপদেশ এখানে আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ফলের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার মানে কি? সুখকে কেন বরণ করিব না, আর কেনই বা দুঃখকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিব না? ভগবান বলিতেছেন: "লাভ ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়ের কথা চিন্তা না করিয়া স্ব-স্ব স্বধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছি, এই ভাব নিয়া যুদ্ধ কর তবে তুমি শ্রেষ্ঠতর পাত্র লাভ করিবে।"

এখানে কর্ম্মযোগের কথা আসিয়া পড়িল। ইহাকে, কর্ম্মরহস্যও বলিতে পারা যায়। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ইহাকে অনুধাবন ও ঠিক ঠিক ভাবে অনুশীলন করিতে হইবে। যতদিন আমরা বাঁচিয়া থাকিব ততদিন এই জগৎই সমরক্ষেত্র, এখানে সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত আমরা যুদ্ধ করিতেছি। কখন কখন কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া এমন ব্যাপার হয়তো ঘটিয়া গেল যাহার ফলে আমরা শোক-দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তখন চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া গেল, ক্ষীণ আশার রশ্মিও চক্ষু দৃষ্টিপথে পতিত হইল না, তখন কি করিব? তখন কি সাধারণ অজ্ঞলোকের ন্যায় হতাশ হইয়া পড়িব এবং অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? না, তাহা কোন ক্রমেই ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। এই যে শোক-দুঃখের আক্রমণ, তাহার কারণ খুঁজিতে হইবে, কারণ খুঁজিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, আমরা, যাহা গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল তাহাকে স্থির ও সর্ব্ব পরিবর্ত্তন-রহিত এবং যিনি—স্থির, অচঞ্চল তাঁহাকে গতিশীল মনে করিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছি এবং তাহার ফলে এই শোক-মোহের কবলে পড়িয়াছি। আমরা যে কাজ করিয়াছি, তাহার ফললাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি এবং ফলে, সুখ-দুঃখদায়ক মিশ্র কর্ম্মফল উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মন হইতে সকল শান্তি, সকল আনন্দ হরণ করিয়া লইয়াছে। এখন আমাদিগকে জানিতে হইবে আত্মা কোনও প্রকার কর্ম্মের ফলই ভোগ করেন না। এই কথা জানিয়া কর্ম্মের ফল সুখদায়ক হইল কি দুঃখদায়ক হইল তাহা চিন্তা না করিয়া আমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে—আমাদিগকে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে।

ফলের আশা-ত্যাগ করিয়া কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ কাজের প্রয়োজন হইতেছে সেই কাজ হইতে যে ফল লাভ হইবে, তাহা লাভের বাসনা। কিন্তু আমাদিগকে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কাজ করিতে হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব? শরীর, মন ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহাদের কাজের নিয়ামক কি? তাহারা নিজের

কোন স্বার্থসাধন করিবার জন্য বিরামহীন, বিশ্রামহীন ভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যায়? এখানে হৃৎপিণ্ডের কথাই ধরা যাক, সমস্ত শরীরে রক্ত চালনা করিবার জন্য ইহা অবিরত কাজ করিতেছে, তাহার বিরাম বা বিশ্রাম নাই। এই অবিরাম কাজের কর্ত্তৃত্বে তাহার নিজের প্রয়োজন? তাহার এই কাজের ফলে সমস্ত শরীরটা বাঁচিয়া আছে। অথচ সমগ্র শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখাতে তাহাদের নিজেদেরও বাঁচা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড নিজে বাঁচিতে পারিব কিনা, সেই কথা চিন্তা না করিয়াই অবিরাম কাজ করিয়া যাইতেছে। মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়মণ্ডলী, গতিশীল, সর্ব্বদা চঞ্চল; ইহারা গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল ম্যাটার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—সুতরাং গতিই ইহাদের ধর্ম্ম। আমরা আরো দেখিয়াছি—এই গতিশীল দেহমনবুদ্ধির অতীত আর একটী সত্তার অস্তিত্ব আছে যাহা স্থির অচঞ্চল ও গতিহীন। এই সত্তা যখন ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধির গতির সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন, তখনই তিনি ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধিতে প্রতিভাত প্রকৃতির পরিণাম, জগতাংশ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি ভোগ করেন। তখনই তিনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৃত কর্ম্মকে নিজের মনে করেন ও তাহার ফল লাভের জন্য উদ্গ্রীব হন। তখনই তিনি শরীর মনবুদ্ধির সহিত একত্ব অনুভব করিয়া নিজেকে ছোট করিয়া ফেলেন এবং জগতের আর সকল হইতে নিজেকে পৃথক ভাবিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ঘোর স্বার্থপরতায় মগ্ন হন। এই অবস্থা হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হইলে তাহাকে ভাবিতে হইবে যে তিনি একা বাঁচিতে পারেন না। মনুষ্য সমাজ শরীরের তিনি অঙ্গ। হৃৎপিণ্ড যেমন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নিরপেক্ষ হইয়া বাঁচিতে পারে না, তেমনি মানব-সমাজ রূপ শরীর হইতে আলাদা হইয়া আমরা বাঁচিতে অক্ষম। হৃৎপিণ্ড যেমন নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া সমস্ত শরীরটা রক্ষার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে তাহাতে কি ফল হইল তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই তেমনি আমাদিগকে নিজেদের কথা ভুলিয়া গিয়া সমাজ শরীর রক্ষার জন্য কাজ করিয়া যাইতে হইবে। তাহাতে আমাদের লাভ হইবে কি ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এই ভাব মনে রাখিয়া আমাদিগকে সুচারুরূপে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং যাহাতে কাজটী সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। (১) প্রত্যেক কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় সেই কার্য্যের প্রয়োজন হিসাবে আমাদের

(১) কার্য্যের নিয়ামক মনোবৃত্তি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিভিন্ন। এদেশে আমরা কার্য্যের নিয়ামক মনোবৃত্তির নাম দেই কর্ত্তব্য (Duty) প্রতীচ্যে বলা হয় অধিকার (Right)। দুইটী শব্দ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবপূর্ণ। এদেশের শাস্ত্র আমাদিগকে অধিকার আদৌ ভুলিয়া আমাদিগের গৌরব বুদ্ধি বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং স্বার্থের সংঘাত কমাইতে পারিয়াছেন। কাজেই মনে তো আমাদের স্বার্থের সংঘর্ষ হইবার উপায় নাই আমরা যে রাজা, প্রজাকে, পিতা, মাতা, পুত্র কন্যা, এবং সমাজ শরীরের সকল অঙ্গের কাহাকে কি দিতে হইবে, তাহাই আমাদিগকে জানিতে হইবে, আমরা কাহার নিকট কি পাইব তাহার কোনও প্রশ্ন নাই। এই কর্ত্তব্য বুদ্ধিই আমাদিগকে স্বার্থপরতা হইতে—স্বার্থাকাঙ্ক্ষা হইতে বাঁচাইতে সক্ষম।

হবে, কার্য্যের ফল লাভ করিবার অভিসন্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু এই প্রকার মনোবৃত্তি নিয়া কাজ করিবার ফলে, তাহা দূর হইয়া যাইবে আপ্রাণ চেষ্টার ফলেও যদি কার্য্যটী বিফল হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে দুঃখে অভিভূত হইলে চলিবে না। কার্য্যটী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি— ইহাই—এই বোধই আমাদের মনের অশান্তি দূর করিবে। এই প্রকার মনের ভাব নিয়া যদি আমরা কাষ করি, তাহা হইলে কোনও প্রকার দুঃখ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। আমরা কাজ করিব বটে, তবে ইহাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিব যে কোনও প্রকার লাভের আশায় আমরা কাজ করিতেছি না। আমাদের ভবিতব্য হইবে আমরা এই অবস্থায় পড়িয়াছি সুতরাং এই অবস্থার উপযোগী যে কাজ আমাদের হাতের কাছে আছে তাহাই সুচারুরূপে এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা আমাদের দেহ মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া ফলের দিকে না চাহিয়া কাজ করিয়াছি। কাজের অনুরূপ ফল আসিবে বটে কিন্তু তাহা আমাদিগকে সুখী কিংবা দুঃখী করিতে পারিবে না।

"প্রত্যেকটী কার্য্য তাহার অনুরূপ ফল প্রদান করে। তুমি যদি ফলের দিকে না চাহিয়া, কোনও প্রকার ফাঁকি না দিয়া যথাযথ কাজ করিয়া যাও, তাহা হইলে, ফলের আশা না করিয়াই তুমি তাহার ফল ভোগ করিবে। আর সেই কর্ম্মের ফল তোমার মনের শান্তি নষ্ট করিতে পারিবে না, কারণ তুমি তো ইহা আশা কর নাই।"

আমরা যদি শুভ চিন্তা করি তাহা হইলে শুভফল পাইব, যদি অশুভ চিন্তা করি তাহা হইলে অশুভ ফল পাইব। কারণ চিন্তাটীও একটী কার্য্য, এবং পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, কার্য্য তাহার অনুরূপ ফলও উৎপাদন করে। যদি কেহ ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া চিন্তা করে, তাহা হইলে কি তাহার সেই চিন্তা নাশ হইয়া গেল? তাহা কি কোনও ফল প্রসব করিবে না? না, ফল নিশ্চয়ই প্রসব করিবে। মহান ঋষিগণ অরণ্যে ও গিরিগুহায় বাস করিতেন তাঁহারা কি এই সকল পরহিতব্রতী ও দ্বারে দ্বারে ভ্রমণকারী মহৎ লোক হইতে কম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন? না, তাঁহারা সমাজের আরো অধিক মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, কারণ বাজে কাজে তাঁহারা নিজেদের শক্তির অধিক অংশ অপচয় না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত শক্তি এক কেন্দ্রীভূত করিয়া যে শুভচিন্তা সমূহ করিয়াছেন, তাহা জগতের

ইহাই নিষ্কাম কর্ম। অপর পক্ষে প্রত্যেকের অধিকার বা Rightই সমাজ শরীর রক্ষার উপায়। সেখানে প্রত্যেকেই গ্রহীতা, প্রত্যেকেই উত্তমর্ণ। পিতা, মাতা, পুত্র কন্যা ও সমাজ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের নিকট হইতে আমার কি প্রাপ্য তাহা আগে জানিতে হইবে, এবং সহজে না পাইলে জোর করিয়া সেই প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। ইহাতে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। একজনের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সংঘাত বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে বাহুবল বা পশুবল এবং ইহা মানবকে ধীরে ধীরে পশুর পর্য্যায়ে নামাইয়া দেয়।

শুভচিন্তা গ্রহণোন্মুখ প্রত্যেক মনকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা শুভ কর্ম করিয়া লইতে সক্ষম।

বাহিরের সাহায্যে লোকের কতটুকু অভাবই আমরা দূর করিতে পারি। হয়ত আমরা লোকের কিছু অসুবিধা দূর করিয়া দিলাম, বা কতগুলি ঘর করিয়া দিলাম, কতকগুলি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহাতে লোকের অতি সামান্য অভাবমাত্র দূর হয়। তিনিই প্রকৃত সাহায্য করেন, যিনি শুভ চিন্তার তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া সকল মানব জাতির মনে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন। পৃথিবীর মহান আচার্য্যগণ এই প্রকার শুভ চিন্তা প্রবাহ প্রেরণ করিয়া মানবের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শুভ বুদ্ধি সকলকে জাগ্রত করিয়া এবং তাহাদের ভিতরের অশুভভাবকে দূর করিয়া লোক কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রকৃত কর্মযোগী। তাঁহারা কার্য্য করেন, তাহার জন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। যতদিন আমরা কাজের ফলের জন্য লালায়িত থাকি ততদিন আমরা যেন বেতনভোগী সৈন্যের মত শুধু অর্থের বিনিময়ে কাজ করি।

যে সকল রাজনীতিজ্ঞগণ স্বীয় দেশের জন্য কাজ করেন, তাঁহারা কি শ্রেষ্ঠ কর্মী? না, তিনিই শ্রেষ্ঠ কর্মী যিনি নিজ আদর্শ হইতে একটুও বিচ্যুত না হইয়া, আদর্শ রক্ষার জন্য কাজ করেন। যিনি কর্মের ফল না চাহিয়া নিজ আদর্শ রক্ষা করিয়া যথানির্দিষ্ট কাজ করিয়া যান তিনিই সকলের আদর্শ, আর এরূপ লোক লাখে একজন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তিনি সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, লাভ-ক্ষতির হিসাব না রাখিয়াই কাজ করিয়া যান।

আমরা কেন সাধারণ লোক হইয়া আছি? কারণ আমরা স্বার্থপরতার নিম্নভূমিতে অবস্থান করিতেছি, যিনি স্বার্থপরতার এই ভূমি হইতে উচ্চে উঠিয়াছেন, তিনিই আদর্শ. তিনি তাঁহার কাজের ফল চান না, কিন্তু তিনি কর্মত্যাগও করেন না, অনবরত কাজ করিয়া যান।

এই প্রকার কর্মীই ভগবান লাভ করিতে সক্ষম—যাহারা সামান্য লাভের জন্য, নামযশের জন্য, নানাপ্রকার অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর, তাহারা মানবের আদর্শ নহেন। এই খানেই স্বার্থপর ও স্বার্থপরতাহীন এই উভয় প্রকার কর্মীর পার্থক্য।

যে কেহ নিজ সমস্ত জীবন ধরিয়া নিজ অবস্থার অনুরূপ কর্মসমূহ কর্তব্য-জ্ঞানে করিয়া যান, এবং তিনি সেই কর্মের ফলের দিকে নজর না দেন, তিনি নিশ্চয়ই অবিলম্বে সকল ধর্মের উৎকৃষ্টতম ও শ্রেষ্ঠশক্তি লাভ করিবেন এবং নিত্য-সত্তার উপলব্ধি করিবেন। তিনি এই প্রকার কর্মের পথ অবলম্বন করিয়া—কর্মযোগের পথে থাকিয়া নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

এসেছে জননী

শ্রীসরোজকুমার মিত্র

এসেছে জননী উজলি ধরণী
উদার অসীম আলোকে,
এস সবে যাই পূজিতে মায়েরে
প্রাণের প্রণতি পুলকে।

করুণারূপিণী অভয়া বরদা,
ত্রিতাপতারিণী শুভদা সারদা,
মধুর মোহন মূরতি মাধুরী
মহিমার জ্যোতি ঝলকে।

ডাকিছেন মাতা সুমধুর রবে,
আপনার কাছে সুতাসুত সবে
সব ভেদাভেদ গেছে আজি চলে
দ্যুলোক মিশেছে ভূলোকে।

এস আজ কেবা কোথা আছ ভাই,
জননীর কাছে মিলি এক ঠাঁই,
ঘুচে যাবে দুখ ভয় মোহ লাজ
মায়ের আশীষে পলকে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ডক্টর হীরালাল হালদার—

ডক্টর হীরালাল হালদার মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ হইতে একটি বিরাট দার্শনিক মনীষীর অন্তর্ধান হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার অবদান সমগ্র ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। দর্শন শাস্ত্রে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দর্শনে একাধারে এমন অসাধারণ অধিকার, অগাধ পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত চিন্তাশীলতা আজিকার দিনে অতি অল্পই দেখা যায়। জ্ঞান-সাধনায় তিনি ছিলেন নীরব নিভৃত একনিষ্ঠ সাধক। "Neo-Hegelianism" নামক

তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থখানি ইউরোপের দার্শনিক পণ্ডিত সমাজে যে কতখানি সমাদর লাভ করিয়াছিল তাহা পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত সুপরিচিত কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত নাই। এই গ্রন্থখানির মুখবন্ধে ডক্টর হালদার স্বয়ং লিখিয়াছেন : "At the very commencement of my career as a teacher of philosophy 36 years ago, I wrote a little book (now out of print) with a view to give the student a general idea of the main principles of Neo Hegelianism. It was well spoken of by such authorities as Hutchinson Stirling and Edward Caird. And now when that career is drawing to a close, I feel happy to be able to offer to those who are interested in philosophy this account of what I regard, in the English-speaking world at least, as the greatest movement of thought in modern times. এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ভাইকাউন্ট হলডেনের অভিমত এখানে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম : "The book thus supplies a want which has been apparent to students of Modern Philosophy and I hope that Professor Haldar's treatment of it will find a large recognition. He has done his work as an Indian Professor, but with a knowledge that is second to that of no other Western study of his problem."

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নাম বাঙ্গলার সুধীসমাজে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ সন্দর্ভলেখক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকরূপে পরিচিত। তিনি 'থিওজফিক্যাল সোসাইটী'র একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গলার 'জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান', 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত জনসঙ্ঘের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে'র প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের সহিত তিনি পূর্বাপর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহু দুরূহ বিষয়ে তাঁহার গভীরভাবে জানাশোনা ছিল এবং তিনি সেই সকল বিষয়ে প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ ভাষায় আপনার বক্তব্যকে বেশ পরিস্ফুট করিতে পারিতেন।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী—

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ-প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলী একটি উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি [illegible] ছিলেন এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি দুরূহ বিষয় লইয়া তাঁহার যেসব জ্ঞানগর্ভ আলাপ ও আলোচনা হইত সেইগুলি "স্বামি-শিষ্য সংবাদ" নামে দুই খণ্ডে গ্রন্থাকারে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া "সাধু নাগ মহাশয়" নামক জীবনচরিত, 'শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible]' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার রচিত। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একাধারে যেমন সুপণ্ডিত তেমনি সদাশয় বিনয়ী সরল একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রেমপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে অন্ততঃ একবারও আসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার চরিত্রমাধুর্যের কথা ভুলিতে পারিবেন না।

HEALING POWER OF BREATH

SWAMI ABHEDANANDA

Our earthly life consists in a continued adaptation to environments. A living substance is that which is capable of adapting itself to its surroundings and the very moment when it completely fails to do so, it is dead. The more perfect the adaptation, the more perfect is the manifestation of life. All vegetable, animal, and human life is subject to this great law of adaptation. This law manifests itself and governs every step of the existence, growth, evolution and development of a living creature. That power by which an organism can adapt itself to its environments is not a mechanical power, not merely a chemical force, but it is what we understand by the word life-force or vital energy. Wherever there is the manifestation of this life-force there is a natural tendency to bring a perfect harmony with the surrounding condition as well as with the laws that govern them. This tendency is to be found in all living beings, in every department of nature, whether vegetable, animal or human. Therefore, the fulfilment of this tendency, the establishment of a perfect harmony with the environment and obedience to the natural laws are implied in the meaning of adaptation, and these are the products of the life-force or vital energy.

The normal manifestation of the life-force under favourable environments, creating perfect harmony with them and obeying the laws that govern them, is the state which is ordinarily understood by the common expression "health;" or, in other words, health means life under natural conditions, where the law of adaptation and other laws that govern the environments are not violated in the least. But if these laws be violated, if the conditions be abnormal, and if the adaptation be imperfect, then the result will be lack of health, or that state which is meant by such expressions as ill-health, sickness, or disease—all of which mean lack of health. Disease is not a real entity, which stands outside of ourselves as the enemy of health and attacks us from time to time, as some people may think; but it is simply an imperfect manifestation of life-force under abnormal conditions. It does not take possession of us from outside, but it is produced by the inability of the life-force to adapt itself to its environments and to obey the laws of nature. In order to adapt ourselves to our surrounding conditions, whether internal or external, we need a certain amount of

energy and force, and when that amount decreases, either by waste, or dissipation, or by lack of proper nourishment, or by the violation of the hygienic laws, then we grow weak and consequently become unable to resist the environmental influences which are constantly working against earthly existence and are trying to crush it ; then we succumb under the pressure and become subject to various ailments. For example, when the temperature of the atmosphere is low, if we cannot adapt ourselves to that external change by getting enough of warmth, our system will be affected ; we shall catch cold or be frozen. If the food be too rich or unwholesome, our system will try its best to assimilate it, but if it fails, then the result will be indigestion, etc. If water which we drink contains germs or impure substances, they will enter into our system and try to dwell there, produce various symptoms of abnormal conditions which our system will naturally struggle to throw off and recover its normal condition.

If there be enough of life-force, the organs will destroy all the germs of disease, all the microbes and bacteria which are constantly entering into our bodies through breath, food and drink, as well as through the pores of the skin, and attacking the cells and tissues. An abundance of life-force is necessary to resist their influences or to drive them away or to kill them and eventually bring back the normal condition, which we understand as health. No disease can arise in the system if there be a sufficient amount or life-force, and if the cells are able to resist the influences of the common environments. The life-force has the primary tendency to preserve itself. This tendency for self-preservation is manifested not only by the individual being, but also by every organ, every tissue, nay, in every minute cell of the whole organism. Propelled by this force, each cell acts instinctively, as it were, to protect its normal or healthy state and to remove all such obstacles as stand its way. If any part of the body be wounded or injured, immediately the minute cells which are floating in the blood begin to work with extra force to remove that obstacle, to attack that enemy, and to recover the normal state of that part. As in a bee-hive, when any part is injured, thousands of bees will rush to attack and remove the enemy, to repair and restore the natural state of the hive, so when the body receives any injury, or when any germ enters the system and attacks the cells, the other cells rush forward with tremendous force and fight against the enemy ; and if they succeed in driving that enemy away or killing that germ, the health or normal condition of the body is restored ; but if they fail, the result will be pain, aches, or disease. Each cell possesses that life-force or power by which it

preserves itself and heals the wound. Ordinarily we say that the healing power is generated by drugs and medicines which are given by physicians, but do they impart the healing power to us? Take a concrete example. When a bone is broken, what does the medical surgeon do? He simply sets it in its proper place, and with the help of the bandage keeps it in the same position for a few days. The mending and repairing are done by nature, as we all say. But what do we mean by nature? Nothing else but the life-force or vital energy which dwells in the organs and cells. No other force of nature than the life-force can perform this task. It is the healing power of nature which manifests itself in the human body in the same manner as in all animals and vegetables When the bark of a tree is scratched or torn the same life-force of the tree heals it and makes it perfect. The healthy condition of the body is the result of the normal activities of the vital energy or life-force. We all know that if the life-force or vital actions are perfect a man can easily recover from any injury or disease however malignant it may be. But when the vital force is wasted, the nervous system is run down, the recovery becomes much more difficult, and recuperation is impossible when the life-force is impaired or extremely weakened or compelled to work continuously under adverse conditions.

No disease will ever arise if free scope is given to the vital energy or life-force to act under proper conditions On the other hand, limit its scope and provide adverse conditions, the life-force will naturally take vigorous measures to overcome or remove the obstacles. The results of this effort will appear in the form of aches and pains, and, eventually failing to resist and recover the normal activities, the organism will die under heavy pressure, producing the symptoms of incurable disease.

Thus we can understand that nature has supplied us with a certain amount of healing power. This power dwells in every form of living substance. But its quantity varies in different individuals; some have tremendous power of healing; others have little. A healthy child possesses an abundance of life-force. If a bone is broken or any organ is injured, it will be cured in a shorter time than in a grown-up person whose life-force is wasted by dissipation.

In the science of Yoga this healing power of nature is called Prana. It is a Sanskrit term, meaning life-force, or vital energy, sometimes translated the "breath of life." That breath of life, which is described in the 7th verse of the Second Chapter of Genesis: "And the Lord God had formed a man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the

breath of life"; and again in the Book of Job, Chapter XXXIII, Verse 4, "The Spirit of God hath made me and the breath of the Almighty hath given me life," does not mean merely the atmospheric air which enters into the nostrils, but it means the life-force, or Prana. It does not signify that a specific quantity of air was bottled up in the human system by God at the time of our birth which must be exhausted before death comes, but it means the power of Prana, which is the source of life, the cause of the respiratory process and the producer of vital actions.

According to the science of breath, each living soul possesses the power of Prana, by which are caused the activities of the motor and sensory nerves. The nerve-currents which travel through these nerves are produced by the vibration of Prana. The nerve-centres in the spine are the storehouse of this life-force where it is generated and kept; in case of emergency this life-force goes through the different parts of the body, distributing the healing powers. The more we can store away this power of Prana, the stronger we shall be physically and mentally. He who possesses sufficient quantity of this breath of life or Prana has perfect health and enormous vitality and strength, which he can impart to others if he wishes to do so.

This is the secret of magnetic healing. The loss of Prana, or nerve-force, is the cause of nervous prostration and of all other diseases. He who has gained mastery over this breath of life can consciously direct the healing power of Prana to the diseased part, generate new vibrations in the cells of those parts and by the higher breathing exercises, destroying the cause of the disease, he can easily gain perfect health and strength. He can bring health and strength constantly to every part of his body. By polarizing the activities of the cells he will remove the obstacles that prevent the normal vibration of the vital current of those cells. The cells are moving in certain directions, but he can make them all obey his will-power, and then he can do anything with them and cure all diseases. But an ordinary person who has no control over the breath of life cannot do it. A true Yogi claims that he can gain mastery over this breath of life and can cure all diseases—of course, such diseases as have not produced decomposition or disorganization; but all other diseases in the preliminary stages can be cured by these higher breathing exercises. The breathing exercises will bring actual control over this nerve-force and they will help us to draw Prana from the atmospheric air, from food, water, etc., because this life-force is all-pervading.

The manifestation of this force is only to be found through the

nerve-centers and nerves ; therefore, if we know the secret of drawing from the atmosphere life-force, or Prana, into our system, since the quantity of air, which passes through our lungs, possesses Prana, if we can extract it and store it in the nerve-centers, then we can use it at any time when it is needed

Nature possesses it, but no individual can give it, unless that individual possesses a superabundance of Prana. Therefore, when we go to a healer he may give it and we may feel better for the time being, but as soon as it is used up, we shall be obliged to return to him once again. The true Yogi, however, says if you know the method by which you can manufacture that life-force in yourself, then there will be no need of your going to others and borrowing it from them

Christian Scientists, Faith Healers and Mental Healers can cure diseases without using drugs, but if they knew the secret of manufacturing the life-force or Prana through the breathing exercises, as taught by the Yogis of India, they would surely gain more marvellous results Having learned the secret of manufacturing the power or life-force, a Yogi says one can easily become master of his body and mind. Here we must not forget that all these different methods, either by the power of arousing the healing power of Prana in the patient through suggestion, or by transmitting that power of Prana to the patient A Yogi can cure diseases by the power of touch or by the power of command, by simply saying, "Be thou cured, be thou healed ;" such instances of instantaneous cures can be found in all countries. Jesus the Christ was one who possessed the power of command, Buddha and Sri Ramakrishna also had this power.

The power which is developed through the breathing exercises as given in the Yoga classes, held under the auspices of the Vedanta Society of New York, will produce wonderful results in a very short time. Those who know the secret of manufacturing and storing away the Prana possess perfect health. But this cannot be achieved in a day or in a month ; it will require some time to gain that mastery over the breath of life ; it will also require an absolute self-control. One should live a pure and chaste life and should learn the secret of transmuting the nervous energy and sex energy into the will-power by practising the higher breathing exercises of a Yogi.

In order to cure diseases, we must wield a tremendous will power. There are Yogis who can cure diseases by simply willing and their will never fails, and that will-power can be strengthened and increased by the breathing exercises. This development of will-power is one of the ideals

of a Yogi or a student of the science of breath. The first effect of successful breathing exercises is the control of the nerves, or what we call freedom from nervousness, as well as from all diseases which proceed from nervous disorder. Physical strength will be almost unlimited and the person will be so strong and so hardy that he will not be easily affected by sudden changes of weather, nor by hunger or thirst; a small quantity of food or drink will be enough to produce great results. Any one who practises the breathing exercises faithfully as given in the Yoga classes will gain highly beneficial results both in body and mind. He will remove all impurities from his system and overcome all abnormal and diseased conditions. He will no longer be subject to rheumatism, stiffness of joints or muscles, paralysis and other ills, for the higher vibrations of Prana will destroy their causes. Every individual, whether young or old, man or woman, is bound to get some result if the exercises by properly practised for six months. He is furthermore sure to cure mental *dis-ease*, that is, a restless state of mind. He will be master of his senses, as well as of passions and animal desires. He will conquer anger, hatred, anxiety, jealousy, worry, by raising the vibration of Prana on the higher plane of psychic activity.

This Prana produces the will-power, and this will-power is the highest manifestation of power, and spiritual power will also come to him who has gained absolute mastery over himself. Thus gradually conquering hunger and thirst, gaining mastery over his body, mind and senses, he will live in the world like a true Yogi; then he will know what this breath of life is and how wonderful is the healing power of Prana.

সম্পাদক—স্বামী [illegible] ও স্বামী [illegible]—কলিকাতা ১৯বি, [illegible]
[illegible] মঠ হইতে স্বামী [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত এবং
[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কাব্যলহরী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূর্ব্বাপর ঘটনা সম্বলিত সম্পূর্ণ জীবনী

উক্ত প্রথম সংস্করণ—মূল্য দুই টাকা বার আনা মাত্র

প্রায় সাড়ে ছয়শত-পৃষ্ঠার মধুর সুললিত পয়ার ছন্দে লিখিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরূপ নিখুঁত অথচ চিত্তাকর্ষক জীবনচরিত-কথা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহু সুধী মনীষী কর্তৃক উক্ত প্রশংসিত।

কতিপয় (Shop-soiled) বিপনিকীর্ণ প্রথম সংস্করণের পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার সন্তান এবং ভক্তগণের জন্মতিথি সম্বলিত ১৩[illegible] সনের শ্রীরামকৃষ্ণ দেওয়াল-পঞ্জিকা প্রার্থীকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা:—

স্বামী শ্যামানন্দ

১নং উমেশ দত্তের গলি, (বিডন ষ্ট্রীট,) কলিকাতা

JUST OUT JUST OUT

CHRISTIAN SCIENCE AND VEDANTA

by

SWAMI ABHEDANANDA

NEW IMPRESSION EXCELLENT GET-UP

[illegible] 1 only

To be had of:—

Manager, Publication Department,
Ramakrishna Vedanta Math,
19B, Raja Rajkrishna Street,
Calcutta.